সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত।

ঊনবিংশ বর্ষ।

১৩১৫।

কলিকাতা।

[illegible]১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
২৭১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

ভ

ম

র

ল

শ

ষ

স

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

দ

ন

প

ব

কথা-সাহিত্য।

——:o:——

এ দেশের লোকেরা সাধারণতঃ আপনাদের ভোগবিলাসে কুণ্ঠিত ছিলেন। নিজেরা খড়ো ঘরে থাকিয়া দেবমন্দির পাকা করিয়া গাঁথিতেন। তাঁহাদের যাহা কিছু উৎসব, তাহা ঠাকুর দেবতা লইয়া। দ্বিজ জনার্দ্দন, কাণা হরিদত্ত প্রভৃতি কয়েক জন প্রধান কবি অতি ছোট-খাটো ব্রতকথার রচনা করিয়াছিলেন। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা দেখিতে বহু লোক সমবেত হইত। গৃহস্থ তাঁহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। এই উপলক্ষে ব্রত-কথা 'গানে' ও 'গান' 'কাব্যে' পরিণত হইল। ষষ্ঠী, শীতলা, ত্রিনাথ, সত্যনারায়ণ, শনি, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতি হিন্দু ও অহিন্দু সমস্ত দেবতারই ছোট-খাটো ব্রতকথা আছে। এই সকল ব্রত-কথার সকলগুলিই উত্তরকালে বিকাশ পায় নাই; অনেকগুলি কোরক-অবস্থাতেই লয় পাইয়াছে। বড় বড় দেবতার ব্রত-কথা শুনিতে আসর জমিয়া যাইত। সেগুলি ক্রমশঃ কবিগণের তুলিকায় সুরঞ্জিত ও সুচিত্রিত হইয়া বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিভা চিরকালই পূজামণ্ডপে বিকশিত হইয়াছে। যজ্ঞবেদীর আয়তন নির্ণয় করিতে রেখা-গণিতের সৃষ্টি হইয়াছে; যজ্ঞের কালশুদ্ধি-বিচারের জন্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের সূত্রপাত হইয়াছে। ঋক্ মন্ত্রে দেবতার যে আহ্বান ও প্রার্থনাবাণী শ্রুত হওয়া যায়, এই সকল ব্রত-কথার মুখবন্ধে অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি দেবতার স্তবে অনেক স্থলে সেই আদি স্তোত্রের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান যুগে আমাদের শ্রুতিগোচর হয়।

উড়িষ্যার জগন্নাথ-মন্দিরের গাত্রে যেরূপ মনুষ্য-সমাজের বিচিত্র চিত্র উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহার সকলগুলি ঠাকুর-দালানে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। অনেক চিত্র শীলতাকে অতিমাত্রায় ব্যতিক্রম করিয়াছে। সেইরূপ, পূর্ব্বোক্ত ব্রতকথাগুলির মধ্যে নিদয়ার গর্ভ ও তদবস্থায় তাহার রুচিকর খাদ্যের তালিকা হইতে বিদ্যা ও সুন্দরের নির্লজ্জ ইন্দ্রিয়-সেবা প্রভৃতি অনেক বিষয়ই অবতারিত হইয়াছে। এ সমস্তই ঠাকুরকে শুনাইবার জন্য

দেশে ঠাকুর গৃহস্থের অনেকটা অন্তরঙ্গ। তিনি প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে একটি প্রকোষ্ঠ অধিকার করিয়া পারিবারিক সমস্ত সুখ-দুঃখের সূক্ষ্মতম অবস্থার সন্ধান রাখেন; গৃহস্থ তাঁহাকে লুকাইয়া কোনও আমোদ করিতে সাহস পান না।

ব্রত-কথাগুলি প্রধানতঃ চণ্ডী, মনসা, শীতলা, সত্যনারায়ণ, এই সকল দেবতা লইয়াই বিশেষ ভাবে জমিয়া গিয়াছিল। কিন্তু শিব-গীতিই বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে বিরচিত হইয়া থাকিবে। "ধান্ ভান্তে শিবের গীত" প্রবাদ অতিপ্রাচীন। প্রাচীন "শিবায়ন" দুই একখানি পাওয়া যায়। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কবিচন্দ্র একখানি শিব-গীতির রচনা করেন। কৃত্তিবাসের উত্তর-কাণ্ডে শৈবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। উহা প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ স্বয়ং বাল্যকালে 'শিব-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আত্ম-পরিচয়ে লিখিয়াছেন।

কিন্তু শিব-গীতি এ দেশে তেমন বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। শঙ্কর-প্রণোদিত শৈব-ধর্ম্মের মূলে অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের মতে জীব স্বয়ং শিব। সাধারণ লোক বেদান্তমূলক এই উন্নত ধর্ম্মভাব-গ্রহণে সমর্থ নহে। তাহারা স্বয়ং সাহস করিয়া ঠাকুরের আসন গ্রহণ করিতে পারে না; যে দেবতা দুঃখের সময়ে তাহাদিগকে ধরিয়া তুলিবেন, বিপদে সহায় হইবেন, চণ্ডী, মনসা সত্যনারায়ণ তাহাদের নিকট সেইরূপ প্রত্যক্ষ দেবতা। দ্বৈতবাদ স্বীকার না করিলে সাধারণ লোকের প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে; এই জন্য বঙ্গদেশে চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতার গানের দল এইরূপ অসামান্য পুষ্টি লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব ও শাক্তধর্ম্মোক্ত প্রত্যক্ষ-দেবতা-বাদ হিন্দুকে প্রত্যক্ষ-ঈশ্বরবাদী জ্বলন্ত-বিশ্বাস-পরায়ণ ইসলামের আকর্ষণ হইতে রক্ষা করিয়াছিল; শৈবধর্ম্ম জন-সাধারণকে ইসলামধর্ম্ম-গ্রহণ হইতে রক্ষা করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

চণ্ডী ও মনসা প্রভৃতি দেবতা-সম্বন্ধীয় কাব্যের আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, শিব স্বীয় ভক্তগণ সম্বন্ধে একবারে নিশ্চেষ্ট। চন্দ্রধর সদাগর শিবের পরমভক্ত; মনসা দেবীর কোপে পড়িয়া তিনি কতই না কষ্ট সহ্য করিলেন; যে হস্তে তিনি শূলপাণির পূজা করিয়া থাকেন, তাহার অঞ্জলি অন্য কোনও দেবতার পদে দেয় নহে, এই অকুণ্ঠিত বিশ্বাসের ফলে আজীবন কষ্ট সহিলেন। এমন ভক্ত-শ্রেষ্ঠের বিপদে শিব একবারও সহায় হইলেন না। ধনপতি সদাগর চণ্ডীর কোপে কারারুদ্ধ হইলেন; জগদ্দল প্রস্তর তাঁহার

বক্ষের উপর স্থাপিত হইল। চণ্ডী তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু তিনি সেই অযাচিত সাহায্য উপেক্ষা করিয়া চণ্ডীকে বলিলেন, "যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" অথচ শিব এহেন ভক্তকে রক্ষা করিবার কোনই চেষ্টাই করিলেন না। চন্দ্রকেতু রাজা শীতলা দেবীর নিগ্রহে কত বিপদে পতিত হইলেন, তথাপি তিনি শিবের প্রতি বিশ্বাসে অটল রহিলেন; কিন্তু শিব তাঁহারও কোনও সহায়তা করেন নাই।

শৈব ধর্ম্মের সহিত শাক্ত ধর্ম্মের বিরোধের আভাস আমরা এই সকল উপাখ্যানে প্রাপ্ত হই। শিবের নিশ্চেষ্টতা ও অপরাপর দেবতাদের ভক্তকে রক্ষা ও অবিশ্বাসীকে দণ্ড দিবার আগ্রহের মূলসূত্র আমরা এই স্থানে দেখিতে পাই। শৈব ধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ-রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; উহাতে সাহায্যকারী উপাস্য ও সাহায্যপ্রার্থী উপাসক,—কেহ, নাই। জীব ও শিব অভিন্ন। কিন্তু শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলে দ্বৈতবাদ; সেখানে দেবতা ভক্তের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট।

শৈবধর্ম্মাবলম্বী আপনাকেই যথাসাধ্য বড় করিয়া দেখিয়াছেন; নিজে বড় হইয়া জীব ব্রহ্মের আসন পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সাহসী হইয়াছেন। বাঙ্গালা শিব-সঙ্গীতে শিবের মাহাত্ম্য চণ্ডী প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য অপেক্ষা স্বতন্ত্র। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে শিব সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে;—গঙ্গাদেবী কোনও সময়ে সুমন্ত মুনির আশ্রমে ছিলেন। একদা দেবগৃহে রন্ধন ও পরিবেশনাদির জন্য দেবতারা মুনির নিকটে গঙ্গা-দেবীকে প্রার্থনা করেন। সুমন্ত মুনি গঙ্গাদেবীকে যাইতে অনুমতি দান করেন; কিন্তু বলিয়া দেন, যেন তিনি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আশ্রমে ফিরিয়া আসেন। কর্ম্মবাহুল্যবশতঃ গঙ্গাদেবীর ফিরিয়া আসিতে অনেক রাত্রি হয়। সুমন্ত মুনি গঙ্গাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-ভাবে বলিলেন, "এত রাত্রে তুমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছ; দেবতাদিগকে পরিবেশন করিবার কালে তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তাঁহাদের লোলুপ-দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; তাঁহাদের দুষ্ট দৃষ্টির ভাজন হইয়া তুমি পতিতা হইয়াছ; আমি তোমাকে এই আশ্রমে আর স্থান দিতে পারি না।" অপবাদ-ভয়ে কোনও দেবতাই গঙ্গাকে স্থান দিতে সাহস করিলেন না। গঙ্গা অনাথিনীর বেশে ঘাটে ঘাটে কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে পাগল ধূর্জ্জটী তাঁহাকে মস্তকে স্থান দিয়া কৈলাসে লইয়া

আসিলেন। পরিত্যক্তাকে এরূপ আশ্রয় তিনি ভিন্ন দেব-সমাজে আর কে দিতে পারিত? সমুদ্র-মন্থনকালে যে সকল রত্ন উঠিয়াছিল, তাহা দেবতাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। তখন মহাদেব শ্মশানভস্ম দেহে মাখিয়া পাগলের ন্যায় হাসিতেছিলেন। কিন্তু যখন হলাহল উঠিয়া জগৎ ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল, অমরাবতী ভস্মসাৎ হইবার সম্ভাবনা ঘটিল, তখন শ্মশানচারী মহাদেব আসিয়া সেই হলাহল পান করিলেন; ত্রিভুবন রক্ষা পাইল! কিন্তু সেই বিষ-ভক্ষণে তাঁহার যে উৎকট যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহার ফলে মহাদেবের কণ্ঠ নীলবর্ণ হইয়া গেল। বৈষ্ণব-পদে দেব-গোষ্ঠ-বর্ণনায় লিখিত আছে,—গোপ-বালকবেশী হরি যখন গোষ্ঠে লীলা করিতেছিলেন, তখন ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি সকল দেবতা আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন; গোপ-বালকের অপাঙ্গদৃষ্টিতেই তাঁহারা কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভস্মভূষিতদেহ শ্মশানবাসী পাগলবেশী শিব উপস্থিত হইলেন, তখন হরি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে গুরু বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং বলিলেন, "আপনি আমার বৈষ্ণবী মায়া অতিক্রম করিয়াছেন, এই জন্য আমার প্রণম্য। আপনাকে আমি স্বর্ণময়ী কৈলাসপুরী দিয়াছিলাম, কুবেরকে আপনার ভাণ্ডারী করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি সেই দিগম্বরই আছেন, এবং শ্মশানের ছাই অঙ্গে মাখিয়া থাকেন; আমার সমস্ত শক্তি আপনার নিকট পরাজিত!"

এই দেব-মাহাত্ম্য, ত্যাগের এই উন্নত আদর্শ জনসাধারণ ততটা বুঝিতে পারে না; কিন্তু তাহারা ভোগের দেবতাদের প্রভাব ও তাঁহাদের প্রদত্ত ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারে। পরবর্ত্তী শিবায়নগুলিতেও শিব অপেক্ষা চণ্ডীর মাহাত্ম্য বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহা খাঁটী শিব-সঙ্গীত নহে।

প্রাচীন সাহিত্যে বর্ণিত মনসা, চণ্ডী, শীতলা প্রভৃতি দেবতাদিগের কার্য্যকলাপ সর্ব্বত্র শোভনভাবে বর্ণিত হয় নাই। মনসা দেবী লক্ষীন্দরের লৌহ-বাসরে সর্পপ্রবেশযোগ্য একটি ছিদ্র রাখিবার জন্য গৃহ-নির্ম্মাতা কাবিলাকে অনুরোধ করিতেছেন; কখনও বা চাঁদ সদাগরের সংগৃহীত ভিক্ষার ঝুলির তণ্ডুল-কণা নষ্ট করিবার জন্য গণদেবের নিকট একটি মূষিক ভিক্ষা করিতেছেন; চাঁদ সদাগরকে বিপদে ফেলিবার জন্য কখনও বা হনুমানকে সমুদ্রে ঝড় উঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন! চণ্ডীদেবীও নানা সূত্রে

ধনপতি ও শ্রীমন্তকে বিপন্ন করিতেছেন; ভক্তের স্মরণমাত্র ইঁহারা যে সকল ক্রিয়া-কলাপে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তাহা সর্ব্বত্র শোভন বা মর্য্যাদাযুক্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বিষয়টি অন্য ভাবেও আলোচনীয়। জনসাধারণের বিশ্বাস কতক পরিমাণে অমার্জ্জিত থাকিবেই; তাহাদের জন্যই এই সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য এই সকল রচনার সর্ব্বত্র সুরুচি ও সুভাব রক্ষিত হয় নাই। পাঠক প্রাচীন রচনায় সর্ব্বত্র খাঁটী সোনার প্রত্যাশা করিবেন না। আকরের স্বর্ণে যেরূপ অন্য ধাতুর মিশ্রণ থাকে, খাদ বর্জ্জন করিয়া তবে খাঁটী সোনার উদ্ধার করিতে হয়, তেমনই এই দেব-উপাখ্যানের মধ্যেও একটা উজ্জ্বল সত্য আছে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবতার পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে একটা সামগ্রীর প্রাচুর্য্য আছে;—তাহা সন্তানের জন্য মাতৃ-হৃদয়ের ব্যাকুলতা। উপায় ও কার্য্যপ্রণালীতে উচ্চ নীতির সঙ্গতি থাকুক আর না থাকুক, সন্তান কষ্টে পড়িলে মাতা যেরূপ নানা উপায়ে তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হন, এই সকল দেবতার বিচিত্র কার্য্য সেই প্রকার সচেষ্ট মাতৃ-ভাব-প্রণোদিত।

এক দিকে বেদান্ত-মূলক শৈবধর্ম্ম, নির্গুণ ঈশ্বর-তত্ত্ব। তাহা যতই উচ্চ হউক না কেন, সাধারণ লোকে তাহাতে প্রত্যক্ষ ও সগুণ দেবতার প্রতি অচলা ভক্তি, তৃপ্তি পায় নাই। অপর দিকে অশোভন প্রণালীতে পরিব্যক্ত হইলেও, বেদান্তের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও শৈব-ধর্ম্মের ত্যাগের মহিমা সকলের আয়ত্ত নহে। তাহার স্থলে ভক্ত দুর্ব্বল, অসহায় ও পাপী তাপী হইলেও, শরণ লইবামাত্র তাহার জন্য দেবতার ক্রোড় প্রসারিত হয়, এই বিশ্বাস সাধারণের চিত্তে এক অভূতপূর্ব্ব শান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল; পদ্মাপুরাণ, শীতলা-মঙ্গল, হরি-লীলা, চণ্ডী-মঙ্গল প্রভৃতি কাব্যোক্ত দেবতার উপাখ্যান এই ভাবে দেখিলে অনেক বিসদৃশ প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে।

এই কথা-সাহিত্যের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয়েও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতি-প্রাচীন সাহিত্যে বরং পুরুষ-চরিত্রগুলিতে কতকটা পৌরুষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ভাষার উন্নতির সহিত এই কথা-সাহিত্যের অন্তর্গত কাব্যগুলি যতই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন হইতে লাগিল, ততই কাব্য-নায়কগণের চরিত্র খর্ব্ব ও হীনতর বর্ণে চিত্রিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে পৌরুষ ও চরিত্র-বলের যে অধো-গতি হইয়াছে, প্রাচীন-সাহিত্যের আলোচনা করিলেও তাহা সপ্রমাণ হয়।

কবিগণ যে সকল উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা কাব্যনায়কগণের চরিত্র অতি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিতে পারিতেন। কিন্তু কাব্যে তাহার বিপরীত হইয়াছে।

মনসার ভাসানে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের যে আভাস আছে, তাহাতে ইঁহাকে পুরুষকারের জীবন্ত উদাহরণ বলিয়া মনে হয়। মনসাদেবীর ক্রোধে ইঁহার গুয়াবাড়ীর ধ্বংস হইল; একটি একটি করিয়া ছয়টি পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিল; সপ্ত ডিঙ্গা ও সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ 'মধুকর' জলযান দেবীর কোপে কালীদহে ডুবিয়া গেল;—চাঁদ সদাগর একটিবার বাম হস্তে মনসার পদে অঞ্জলি দিলেই এই সকল উৎপাতের অবসান হইত। তখনও যদি সদাগর সম্মত হইতেন, তাহা হইলে মনসার কৃপায় মৃত পুত্রগণের পুনর্জীবন ও নষ্ট বৈভবের পুনরুদ্ধার হইত। কিন্তু চাঁদ সদাগরের পণ বজ্র-কঠিন। কালীদহের আবর্ত্তে পড়িয়া চাঁদ মৃতকল্প, সুবিস্তৃত-পত্র-সঙ্কুল পদ্ম-লতা দেখিয়া আশ্রয়ের জন্য চাঁদ হস্তপ্রসারণ করিয়াছেন, কিন্তু মনসার এক নাম পদ্মা, ইহা স্মরণ হইবামাত্র নামের সংস্রব হেতু চাঁদ ঘৃণায় হস্ত প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইলেন! তিন দিন অনাহারের পর প্রিয়সুহৃৎ চন্দ্রকেতুর গৃহে আহার করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রকেতুর গৃহে মনসাদেবীর ঘট স্থাপিত আছে; তখন কিছুমাত্র না খাইয়া সরোষে বন্ধুগৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর বিপদ উপস্থিত হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র, শোক-দগ্ধা সনকা-রাণীর বক্ষের ধন লক্ষ্মীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হইল। কিন্তু চাঁদ সদাগরের সঙ্কল্প অটুট রহিল! এরূপ বীরপুরুষের মর্য্যাদাও প্রাচীন কবিগণ কিছুমাত্র রক্ষা করিতে পারেন নাই; বরং নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের পদ্মা-পুরাণে চাঁদ সদাগরের চরিত্রবলের সম্মান কথঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইয়াছে; কিন্তু কেতকাদাস, ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কবিগণ এই তেজস্বী চরিত্রকে উপ-হাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছেন।—যখন তিনি কালীদহে পতিত হইয়াছেন, তখন কবি বর্ণনা করিয়াছেন,—"ঢোকে ঢোকে জল খায় চাঁদ অধিকারী।" চন্দ্রকেতুর আলয় হইতে যখন তিনি সরোষে উঠিয়া আসেন, তখনকার বর্ণনা এইরূপ,—

"পাগল দেখিয়া তারে, কেহ ঢোকা ঢুকি মারে,
কেহ মারে মাথায় ঠোকর।"

বনের পাখীগুলি চাঁদ সদাগরের পাদক্ষেপে উড়িয়া গেল; ব্যাধগণ আসিয়া তাঁহাকে বলিল,—

"কেন তুই পক্ষী দিলি ছেড়ে,
কোথা হোতে কাল তুই এলি ভেড়ের ভেড়ে।"

কাঠের বোঝা মাথায় রাখিতে না পারিয়া মনসাদেবী কর্ত্তৃক চাঁদ যখন বিড়ম্বিত হইতেছেন, তখন কবি লিখিয়াছেন,—

"কাষ্ঠ বোঝা ফেলে সাধু পড়ে ঘন পাকে।
ঘাড়ে হস্ত দিয়া সাধু বাপ বাপ ডাকে।"

এমন কি, স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াও অন্ধকারে তিনি স্বীয় ভৃত্য নেড়া কর্ত্তৃক চোর-ভ্রমে দণ্ডিত হইতেছেন ;—

"কলাবনে চাঁদ বেণে খুসুর মুসুর নড়ে।
লম্ফ দিয়া নেড়া তার ঘাড়ে গিয়া পড়ে।
চোর চোর বলিয়া মারিল চড় লাথি।
বিনা পরিচয়ে তাহে অন্ধকার রাতি।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, এই তেজস্বী বীর-চরিত্রের মহিমা কবিগণ কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারেন নাই ; হীন উপহাস ও বিদ্রূপের খেলনা-স্বরূপ করিয়া তাঁহাকে আমাদিগের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন।

কালকেতুর উপাখ্যানটি মুকুন্দরামের ন্যায় প্রতিভাবান্ কবির রচিত। কালকেতুর বীরত্ব অতি অপূর্ব্ব। পশু-জগতের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার যে পরাক্রম দেখিতে পাই, তদপেক্ষা মহত্তর বিক্রম তাঁহার চরিত্রবলে বিদ্যমান। ব্যাধযোগ্য বর্ব্বরতার ত্রুটী নাই, কিন্তু তাঁহার নৈতিক সাবধানতা ঋষি-তুল্য। দেবী চণ্ডী রূপসী ললনা সাজিয়া তাহা পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ব্যাধ-নায়ক তাঁহার কপট নীরবতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিতেও উদ্যত হইয়াছিল। এই অমার্জ্জিত চরিত্র যেমন নৈতিক-বল-সম্পন্ন, তেমনই উদার ও সরল। মুরারি শীলের ন্যায় শঠ বণিকের সহিত তাঁহার ব্যবহারে আমরা সেই সারল্যের চিত্র সমুজ্জলরূপে চিত্রিত দেখিতে পাই। এ পর্য্যন্ত মুকুন্দরাম পৌরুষের যে পট অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা নিখুঁৎ। কিন্তু কলিঙ্গ-রাজের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কালকেতু যে ভীরুতা প্রদর্শন করিল, তাহাতে বাঙ্গালী-কবি পৌরুষের চিত্রাঙ্কনে স্বভাবতঃই কিরূপ অপটু, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মুকুন্দরাম এত বড় কবি হইয়াও কালকেতুর চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার বিশেষ অপরাধ নাই। যে সমাজে তিনি বাস করিতেছিলেন, সে সমাজে পুরুষের বীর্য্যবত্তা বিদায়োন্মুখ

হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ কবিগণ সমাজের প্রতিলিপিই প্রদান করিয়া থাকেন। কালকেতু যুদ্ধে হারিয়া স্ত্রীর উপদেশে ভীরুতার একশেষ দেখাইল,—

"ফুল্লরার কথা শুনি, হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বীর বাঁধন ঘরে।"

কিন্তু মাধবাচার্য্যের তুলিতে কালকেতুর চরিত্র এ ভাবে নষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য কবি-কঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী; তিনি পূর্ব্ব-বঙ্গের কবি। সে সমাজে প্রাচীন আদর্শ তখনও বিনষ্ট হয় নাই। মাধবাচার্য্য অন্য সর্ব্ববিষয়ে কবি-কঙ্কণ অপেক্ষা অল্পশক্তিশালী হইয়াও কালকেতুর চরিত্র-বর্ণনে বীর্য্যবত্তার আদর্শ অধিকতর অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন। যখন কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর ফুল্লরা কালকেতুকে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইবার উপদেশ দিল, তখন,—

"শুনিয়া যে বীরবর, কোপে কাঁপে থর থর,
শুন রামা আমার উত্তর।
করে লয়ে শর গাণ্ডী, পূজিব মঙ্গলচণ্ডী,
বলি দিব কলিঙ্গ-ঈশ্বর ॥
যতেক দেখহ অশ্ব, সকল করিব ভস্ম;
কুঞ্জর করিব লণ্ডভণ্ড।
বলি দিব কলিঙ্গ-রায়, তুষিব চণ্ডিকা মায়,
আপনি ধরিব ছত্রদণ্ড ॥"

বন্দী অবস্থায় কালকেতু যখন রাজ-সভায় আনীত হইল, তখন, "রাজ-সভা দেখি বীর প্রণাম করে।"

ধনপতির চরিত্র-বর্ণনাতেও এই ভাবের অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। তাঁহাকে সিংহলরাজ বন্দী করিয়া অন্ধকূপে রাখিয়া দিলেন। বক্ষে গুরুভার পাষাণ। এই ভাবে বহুবৎসর যাপন করিয়াও তাঁহার অদম্য তেজ কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হইল না। চণ্ডীদেবী এই অবস্থায় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "যদি আমার পূজা কর, তবে তোমার নষ্ট সৌভাগ্য উদ্ধার পাইবে।" পাষাণ-নিপীড়িত-বক্ষ, অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর ধনপতি উত্তর করিলেন—"যদি বন্দী-শালে মোর বাহিরায় প্রাণী। মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি।" এমন চরিত্রবান্ ব্যক্তি গৌড়ে যাইয়া গণিকা-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন, এবং খুল্লনা ও লহনা সপত্নীদ্বয়ের বিবাদে যে নিশ্চেষ্ট ভীরুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিলে আমাদের কষ্ট হয়।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেনের চরিত্রও প্রাচীন কবিগণ এই ভাবে শ্রীহীন করিয়াছেন। কাব্যে তাঁহার যে সকল বীরত্ব ও কীর্ত্তির কথা উল্লিখিত আছে, তাহা দ্বারা একখানি মহাকাব্য রচিত হইতে পারিত। লাউসেন কাঙুরের কামধলকে অজেয় কাটারীর প্রভাবে পরাস্ত করিতেছেন; ঢেকুর দুর্গের ইছাই ঘোষ তাঁহার হস্তে নিহত হইল; গৌড়েশ্বর-প্রেরিত প্রবীণ মল্লগণ তাঁহার বলপ্রভাবে পরাজয় স্বীকার করিল; নয়ানসুন্দরী, সুরিক্ষা প্রভৃতি গণিকাগণ তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া হতগর্ব্ব হইল; চারি দিকের রাজন্যবর্গ তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব ও চরিত্র-প্রভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়া লাউসেনকে আপনাদের রূপলাবণ্যবতী দুহিতাদিগকে পত্নীস্বরূপ উপহার দিয়া ধন্য হইল। অবশেষে লাউসেন দুশ্চর তপস্যা দ্বারা হথণ্ডে সিদ্ধিলাভ করিলেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবের পূর্ণতার চিহ্নস্বরূপ সূর্য্যদেব পশ্চিম দিক্ হইতে উদিত হইলেন। এই সকল কথা কাব্য-ভাগে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; তদ্দ্বারা আমাদের চক্ষেও কোন উজ্জ্বল বীর-চরিত্র প্রতিফলিত হয় নাই। ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনের বিপদ্দর্শনমাত্র তাঁহার গাত্র হইতে মশকটি পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিতেছেন। সুতরাং লাউসেনের কোনও চরিত্র-গৌরব উপলব্ধি করিবার অবকাশ কবিগণ রাখেন নাই। তিনি বিপন্ন হইবামাত্র স্বয়ং ঠাকুর আসরে অবতীর্ণ হইবেন, দুই এক পালা পাঠ করিবার পরেই পাঠকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়; তখন লাউসেনের বিপদে পাঠকের কোনও ত্রাস উপস্থিত হয় না, এবং তাঁহার জয়েও তদীয় চরিত্রের প্রতি কোনও শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না।

এই সকল কাব্যে দেবমাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই কবিগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; মনুষ্য-চরিত্র কবির চক্ষে তত দূর শ্রদ্ধেয় হয় নাই। এই সকল চিত্রে বঙ্গসমাজে পুরুষ-চরিত্রের অধোগতিই সূচিত হইতেছে। ক্রমশঃ পুরুষগণ দুর্ব্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুন্দর, কামিনীকুমার, চন্দ্রভান ও চন্দ্রকান্ত কাব্য-নায়ক-রূপে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ইঁহারা অন্তঃপুরের নায়কতায় যেরূপ পটুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদের জাতীয় লজ্জার বিষয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল কবি রমণী-চরিত্র-অঙ্কনে অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন! এ দেশে সীতার পার্শ্বে বেহুলা অনায়াসে স্থান পাইতে পারেন। কোথায় বাল্মীকি, আর কোথায় কেতকাদাস; স্বর্ণ ও সীসে যে প্রভেদ,

এই উভয় কবির প্রতিভায় তদপেক্ষাও অধিকতর তারতম্য; অথচ যদি আমরা অমার্জ্জিত কথা মার্জ্জনা করি, গ্রাম্যতা ও মূর্খতা সহ্য করিয়া পল্লী-কবির কাব্য পাঠ করি, তাহা হইলে দীন হীনা বেহুলার চরিত্র পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় বেদনাতুর হইবে। এই রমণীকে ব্যাসের সাবিত্রী বা বাল্মীকির সীতা অপেক্ষা কোনও অংশে হীন মনে হইবে না। কলার মান্দাসে অকূল নদীতরঙ্গে বেহুলা ভাসিয়া যাইতেছেন; স্বামীর শবে তিনি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন, এই তাঁহার সঙ্কল্প। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখিয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে। তাঁহার নব যৌবন ও অনিন্দ্যরূপ দেখিয়া কত দুষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু বেহুলা জগৎকে উপেক্ষা করিয়া ভেলায় ভাসিতেছে; কখনও নবঘনবিনিন্দিত নিতম্বলম্বী কেশপাশ মুক্ত করিয়া রূপপ্রতিমা বেহুলা দেব-সভায় নৃত্য করিতেছে; কখনও স্বামীর শব হইতে কৃমিকীট তাড়াইয়া নিবিষ্ট-মনে তাহা হইতে মাছিতা ভাঙ্গিতেছে; কখনও কর্ণে কুণ্ডল ও গলায় শঙ্খের মালা পরিয়া বেহুলা যোগিনী-বেশে মাতা অমলা ও পিতা সায় বেণেকে সান্ত্বনা দিতেছে; কখনও বা ডুমুনী সাজিয়া লক্ষের ব্যজনী-হস্তে শ্বশুর-গৃহের সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। বেহুলার দুশ্চর তপস্যা এই সমস্ত ব্যাপারকে শ্রদ্ধেয় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। পাঠক বেহুলার কথা পড়িয়া না কাঁদিয়া থাকিতে পারিবেন না। পল্লী-কবিগণের মূর্খতা ও সহস্র ক্রটী তাঁহার নিকট মার্জ্জনা লাভ করিবে।

ফুল্লরার চরিত্রেও সেই উজ্জ্বল পাতিব্রত্য। দরিদ্র স্বামিগৃহে ভেরাণ্ডার থাম, তাহা কাল-বৈশাখীতে প্রত্যহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গ্রীষ্মকালের দারুণ রৌদ্রে পথের বালি উত্তপ্ত হয়, পা পুড়িয়া যায়; ফুল্লরা মাংসের পসরা মাথায় করিয়া হাটে হাটে পর্য্যটন করে। শীতকালে পুরাতন দোপাট্টাখানি গায়ে দিতে শত স্থান ছিন্ন হয়; বনে তখন শাক পাওয়া যায় না। ফুল্লরার তাল-পত্রের ছাউনী ভাঙ্গা কুঁড়েতে একখানি মাটিয়া পাথর পর্য্যন্ত নাই; গর্ত্ত করিয়া আমানি রাখিতে হয়। কখনও পসরা মাথায় করিয়া পরিশ্রান্ত ফুল্লরা তৃষ্ণায় ছটফট্ করিতেছে; যদি বা কোথাও মাংসের পসরা নামাইয়া পুকুরের জল খাইতে গিয়াছে, অমনই চিলে আধা-আধি মাংস সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আশ্বিন মাসে যখন বঙ্গের ঘরে ঘরে উৎসব,

তখন দুঃখিনী ফুল্লরার মাংসের বিক্রয় নাই; কারণ, সকলে দেবীর প্রসাদ-মাংস লাভ করিত, ফুল্লরার পসার কে কিনিবে? সেই সময় চতুর্দ্দিকে আনন্দের চিত্র;—নববস্ত্র-পরিহিত নরনারী আমোদে মত্ত; ফুল্লরা বস্ত্রের অভাবে হরিণের ছাল পরিয়া থাকিত। বসন্তকালে প্রেমোৎসব; যুবক ও রমণীরা সুধাভিলাষী; ফুল্লরা ক্ষুধার জ্বালায় কুঁড়ে-ঘরে ছট্‌ফট্ করিত। এই তাহার বার মাসের কথা। কিন্তু যে দিন ষোড়শীরূপিণী চণ্ডী অতুল ঐশ্বর্য্যে প্রলুব্ধ করিয়া দুঃখিনী ব্যাধরমণীর স্বামিপ্রেমের কণিকা প্রার্থনা করিলেন, সে দিন দেখা গেল, স্বামিপ্রেমের তুলনায় কুবেরের অতুল ঐশ্বর্য্যও অতি অকিঞ্চিৎকর। ফুল্লরা কালকেতুর সোহাগে দুঃসহ দারিদ্র্য মাথায় বরণ করিয়া লইয়াছিল, তাহাতেই তাহার সমস্ত বল ও সেই প্রেমের কণামাত্র হানি হইলে সে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে। এইরূপ রমণী-চরিত্র হিন্দু কবির কাব্য ভিন্ন অন্যত্র সুলভ নহে।

খুল্লনা অতি তরুণবয়স্কা। এই বয়সেই নারী প্রথম ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া থাকে। কবিকঙ্কণ ছেলি রাখিবার ছুতায় বনে আনিয়া চম্পক ও কাঞ্চন কুসুমের পার্শ্বে এই কাঞ্চনপ্রতিমাকে স্থাপন করিয়া কাব্যের সাধ মিটাইয়াছেন। সেখানে সে যুক্তকরে ভ্রমরকে বলিতেছে, সে যদি ফিরিয়া গুঞ্জরণ করে, তবে ভ্রমরীর মাথা খাইবে—এই শপথ। কোকিলকে বলিতেছে, সুদূর গৌড় দেশ, যেখানে তাহার স্বামী আছে, সেইখানে যাইয়া কোকিল কেন ডাকে না? অশোকতরুকে লতাবেষ্টিত দেখিয়া সে লতাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে, এবং 'সই' বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতেছে! এই নায়িকা শুধু কাব্যের উপযোগিনী নহে, ইহাকে সুগৃহিণী ও সন্তানবৎসলা রূপে পরিণত করিয়া কবি ক্ষান্ত করিয়াছেন। যেখানে খুল্লনার ছেলেগুলি ধান্যক্ষেত্রে উৎপাত করিতেছে, এবং কৃষকগণ তাহাকে গালি দিতেছে, সেই সময় ইহার দুঃখমলিন মুখখানি আমাদিগকে বেদনা প্রদান করে। আর যে দিন সর্ব্বসী ছাগলকে শৃগালে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, লহনা জানিতে পারিলে তাহাকে মারিয়া খুন করিয়া ফেলিবে, আশঙ্কায় ও কষ্টে খুল্লনা চণ্ডীর শরণ লইতেছে, সেই দিন তাহার চিত্রখানি ভক্তিগঙ্গায় অবগাহন করিয়া উজ্জ্বলতর হইয়াছে; তাহার কষ্ট সত্ত্বেও সেদিন আর তাহাকে কৃপা করা যায় না। ইহার পরে আর এক দৃশ্য,—খুল্লনা স্বামী ও জ্ঞাতিবর্গের ভোজনের জন্য রন্ধন করিতেছে, রন্ধনশালায় ফুল্লরা অন্নপূর্ণা-

রূপিণী, এবং যখন স্বামী জ্ঞাতিবর্গকে নিরস্ত করিবার জন্য উৎকোচদানে উদ্যত, তখন গর্ব্বিতা সাধ্বী স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া উৎকট পরীক্ষা দিতেছে, তখন খুল্লনা আমাদের নমস্যা হইয়াছে। তখন আর কৃপা করা যায় না।

অপর দিকে কাণেড়া ও কলিঙ্গার যুদ্ধে গর্ব্ব ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি বঙ্গেতিহাসের সুদূর অধ্যায়ে ইঙ্গিত করিতেছে; সে অধ্যায় ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাম্রশাসন ও প্রস্তরলিপির যুগ। তখন বঙ্গীয় বীরগণ দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ছিলেন; গৌড়েশ্বর পালরাজগণের আদেশে তখন এক দিকে কামরূপ ও অপর দিকে উড়িষ্যার রাজারা এক পতাকার নিম্নে সমবেত হইতেন। বঙ্গীয় মহিলাগণের তখন কবি-বর্ণিত কটাক্ষ-সন্ধানই একমাত্র গুণবত্তা ছিল না। তাঁহারা ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেন। কাণাড়ার যুদ্ধকে আমরা কেবল কাব্য-কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। দুর্গাবতী, ঝাঁসীর রাণী প্রভৃতির ছবি তখনও বঙ্গ দেশ হইতে লুপ্ত হয় নাই।

সুতরাং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে দেবলীলা ও অদৃষ্টবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষ-চরিত্রের গৌরব লুপ্ত হইলেও, রমণী-চরিত্রের মহিমা সুচিত্রিত হইয়াছিল। যাঁহারা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বামীর চিতানলে আরোহণ করিতেন, সীতা সাবিত্রীর পবিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, এবং নানা প্রকার পারিবারিক দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছিলেন, কবিগণ তাঁহাদের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

ক্রমে যখন কবিগণ হিন্দু অন্তঃপুরের আদর্শ ত্যাগ করিয়া মুসলমান কবির বর্ণিত জেনানার বিলাস ও লালসার সূচক চিত্রের ভাবে অধিকতর অনুপ্রাণিত হইলেন, তখন হীরা মালিনী ও বিদ্যার ন্যায় উপনায়িকা ও নায়িকাগণের সৃষ্টি হইল। কিন্তু তখনও এ দেশের স্নেহশীলা সাধ্বীগণের প্রভাব বঙ্গসাহিত্য হইতে বিদায়গ্রহণ করে নাই। কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজবল্লভের মুসলমানী দরবারের আদর্শে গঠিত রাজসভা হইতে সুদূরে পল্লী-কবিগণ 'কবি' ও যাত্রা-সঙ্গীতে উমা, মেনকা, যশোদা প্রভৃতির চিত্রে এ দেশের অন্তঃপুরবাসিনীগণের ছায়া পুনঃপুনঃ প্রতিভাত করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কথাসাহিত্যের অন্তর্গত নহে।

ছেঁড়া পাতা।

১

অনেক আত্মসংবরণ করিয়া, খানিকটা দেশের জন্য, খানিকটা নিজের গৌরবের জন্য, খানিকটা সুপাত্রীর অভাবের জন্য, পরেশনাথ বিবাহ করিয়া উঠিতে পারে নাই। করিলেও চলিত, কিন্তু না করিয়াও চলিতেছিল। অর্থাৎ, কখনও কখনও দীর্ঘনিশ্বাসটা উঠিলে চাপিতে হইত; কখনও কখনও হৃদয়টা ব্যাকুল হইলে ঘুমাইতে হইত। মোটের মাথায়, চেয়ার, টেবিল, আলমারী, দর্পণ, কার্পেট, কোচ, নেটের মশারি প্রভৃতিতে গৃহ পরিপূর্ণ থাকিলেও মনটা কেমন শূন্য শূন্য বোধ হইত। আলমারীর পার্শ্বে উঁকি মারিবার লোক নাই; দর্পণে মুখ দেখিবার লোক নাই; মশারি ছিঁড়িয়া গেলে শেলাই করিবার লোক নাই; ইত্যাদি।

তাই সে দিন, সেই শীতকালে, যখন লোকে চা খায়, অর্থাৎ বেলা আটটার সময়, সমগ্র গরম চার পেয়ালা ও প্রিন্সেপের ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইন, উভয়ে এক সঙ্গে পরেশের পায়ের উপর পড়িয়া গেল। পা খানিকটা পুড়িয়া গেল; খানিকটা ভিজিয়া গেল; খানিকটা ফুলিয়া গেল। ইহাতে চটিবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ, ভূমণ্ডলে মাধ্যাকর্ষণবশতঃ গুরু পদার্থ নীচে পড়িয়া যায়। পরেশ তাহা বুঝিল না। আরদালীকে ধরিয়া মারিল। আফিসে গেল না। মোকদ্দমাগুলি মুলতুবি করিয়া রাখিল।

আপনারা বোধ হয় খানিকটা বুঝিয়াছেন যে, পরেশ এক জন হাকিম। তবে ছেলেমানুষ, অর্থাৎ তেইশ বৎসর মাত্র বয়স। জৌনপুরের অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। দেখিতে খুব ফুট্‌ফুটে। এ দিকে ব্রাহ্মণের সন্তান। বাহিরে সাহেবিয়ানা থাকিলেও ভিতরে বড় ছিল না। ইংরাজেরা সন্দেহ করিত যে, পরেশ মনে মনে 'স্বদেশী'। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট পরেশকে ভালবাসিতেন।

বিলেতফেরতের যেমন প্রথমতঃ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, অর্থাৎ একাকী, শূন্য গৃহে, পুঁথি-পাঁথি লইয়া. মোকদ্দমার নথি লইয়া, সিগারেট টানিয়া, মধ্যে মধ্যে সোডাটা, জিঞ্জারেডটা, 'আস্‌টা' পান করিয়া পরেশের দিন রাত্রি কাটিতেছিল।

সে দিন তাই পা পুড়িবার পর পরেশের মনটা উচাটন হইল। জন্মভূমির কথাটা মনে পড়িল। আরও কত কি ভাবিতে লাগিল, তাহা পরেশ বুঝিতে পারিল না।

২

কমিশনর গ্রাণ্ট বাঙ্গালা গবর্মেণ্টকে লিখিয়া পরেশকে হুগলী জেলায় বদলী করিয়া দিলেন। ছয় মাস পরে পরেশ রাঁচীতে বদলী হইল। সেখান হইতে তিন মাস পরে আরায় বদলী হইল, এবং সেখান হইতে দুই মাস পরে সাঁওতাল পরগণায় বদলী হইল। অনেকটা অগ্নি-পরীক্ষার মত।

হুগলীতে গিয়া পরেশ একবার বাঁশবেড়ের পৈতৃক ভিটাটা দেখিয়া আসিয়াছিল। সে বাড়ী তখন অন্ধকার। পিতা রুগ্ন; সামান্য জমীদারীটা বিচ্ছিন্ন, বেবন্দোবস্ত; ঘর চামচিকায় ও ঝুলে পরিপূর্ণ। সবই রুক্ষ, শুষ্ক, মলিন, মুমূর্ষু ও ভগ্ন। মাঠ কৃষকহীন, শস্যহীন। পুষ্করিণী জলশূন্য। বাগান বাঁশঝাড়ে আকীর্ণ। গোশালা শালিকে পরিপূর্ণ।

পরেশ ভাবিল, "এই ত দেশ! চাকুরী করিয়া কি হইবে?"

বৃদ্ধ পিতা ভগ্নস্বরে বলিলেন, "বাবা, যাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে। আমরা এখন সমাজচ্যুত। তুমি এমন সময় চাকুরী ছাড়িলে যে বিশেষ মঙ্গল হইবে, তাহা ত বোধ হয় না।"

পরেশ। বাবা, আমি একবার 'রুকি'কে দেখ্‌ব।

পিতা। তার শ্বশুর এখন পাঠাবে না।

পরেশ। আমি যদি লইয়া আসি?

পিতা। তোমার যাওয়া উচিত নয়। আর এখন তাকে আন্‌লে দেখ্‌বে 'কে'?

সেই সময় বোধ হয় বৃদ্ধের চক্ষু একটু ছল ছল করিয়াছিল, এবং পরেশ কাঁদিয়াছিল। কে দেখিবে? পরেশের মাতা দুই বৎসর পূর্ব্বে কন্যার বৈধব্য-শোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেই আদরের কন্যা রুক্মিণী।

পরেশ ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, যার মা নাই, স্নেহের ভগ্নী থাকিয়াও নাই, যার পিতাকে যত্ন করিবার কেহই নাই, তাহার দাসত্ব কার জন্য? তার জীবন কিসের জন্য?"

বৃদ্ধ আবার ধীরে ধীরে বলিল, "দেশের জন্য—"

পরেশ। কিসের দেশ ?

পিতা। যে গিয়াছে, তাহার দেশ ; যে থাকিয়াও নাই, তাহার দেশ ; যাহার যত্ন নাই, তাহারই দেশ—ভিটা, মাটী ও মৃত্যুশয্যা। আবার যাহা আসিবে, তাহাই দেশ। যাও বাবা, কর্ম্মস্থলে যাও ; আমি এখনও বাঁচিব। তুমি উচ্চ হও, বংশের মুখ উজ্জ্বল কর, বিবাহ কর, সংসারে আশার সঞ্চার কর, ভাঙ্গা ঘর বাঁধ।"

পরেশ চক্ষু মুদিয়া শুনিল ; পিতার পদ-ধূলি গ্রহণ করিল।

পরেশ। বাবা, তোমার ভুল হইতেছে। আমাকে যে ব্রত লইতে বলিয়াছ, তাহাতে বিবাহের কথা তোলা পাগলের মত।

বৃদ্ধ পিতা ঈষৎ হাসিলেন।

"বৌ আসিলে রুকিও আসিবে। বৌ রুকির সঙ্গে আমার মাথার শিয়রে বসিবে। অন্ধের নয়নে আলো দিবে। তেমনই একটি বৌ বাছিয়া লইও।"

পরেশও হাসিল ; কোনও উত্তর দিল না। পিতার সেবা-শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিয়া কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল।

৩

পরেশ এ দিকে রাজভক্ত। কিন্তু তবুও একটু যেন কেমন 'বেতর' বোধ করিয়া, সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর পরেশের মনের ভাবটা তলাইয়া দেখিবার জন্য পরেশকে ডাকিলেন।

ডিঃ কমিঃ। মিষ্টার মুখার্জ্জি ! 'স্বদেশী' সম্বন্ধে তোমার মত কি ?

পরেশ। কথাটা বড় ঘোরাল ও প্যাঁচালো। আমার নিজের বিশেষ কিছু মত নাই।

ডিঃ কমিঃ। কিন্তু এ আন্দোলনটা ?

পরেশ। খানিকটা ভাল, খানিকটা মন্দ। কিন্তু আমার মতে রাজদ্রোহ নহে। কেবল মনের ভাবটা ঠিক প্রকাশ করিতে না পারিয়া কতকগুলা জঞ্জাল বাধিতেছে।

ডিঃ কমিঃ। তবে তোমাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি ?

পরেশ। স্বচ্ছন্দে পারেন। আমরা বিশ্বাসঘাতক নহি। আপনি বোধ হয় এ দেশের কথা বিশেষ ভাবিয়া দেখেন নাই। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা

সহৃদয় ছিলেন, তাঁহারা ভাবিতেন। তাঁহারা চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহাদের হাতে সাত কোটী প্রজা সুখ-দুঃখ ধন-সম্বল সকলই সঁপিয়া দিয়াছিল। যখন এ দেশ উৎপীড়িত. ক্লিষ্ট ও জরাজীর্ণ, তখন আপনাদিগের প্রবল বাহুর আশ্রয়ে আমরা মাথা তুলিয়াছিলাম। আমাদিগের জননীর মুখে আপনারা যখন জল দিয়াছিলেন, তখন আমরা নির্ব্বিবাদে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সব সহিয়া গিয়াছি। আমরা কিছু চাহি নাই। আমরা ছিন্ন কন্থা পরিয়া, রুগ্নশয্যায় শুইয়া, আপনাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। এই সমগ্র সপ্ত কোটী প্রজা মানবই হউক, বা পশুই হউক, তাহারা স্নেহের দাস। আমার বোধ হয়, এ সম্বন্ধে এ দেশ জগৎকে বরাবর শিক্ষা দিয়াছে, এবং এখনও দিতেছে। যদি ভাবিয়া দেখেন. তবে আমার বোধ হয় যে, এই সপ্ত কোটী দীন কৃতজ্ঞ প্রজাই আপনাদিগের গৌরব ও প্রতাপ জগতে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। ভারতে এখনও স্নেহের মূল্য আছে, ধর্ম্মের মূল্য আছে, এখানে এক মুষ্টি অন্ন দিলে আজীবনের আশীর্ব্বাদ পাওয়া যায়। অন্য দেশে সেটা কত দূর ?

ডিপুটী কমিশনর কিছু লজ্জিত ও কিছু সঙ্কুচিত হইলেন।

"মিষ্টার মুখার্জ্জি! আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না। তুমি আমার বন্ধু, এবং আমি তোমার মূল্য বুঝি। কিন্তু যাহাতে প্রজাগণ বিগড়াইয়া না যায়, তাহার বিধান করা উচিত। যাহারা অশিক্ষিত, তাহারা তোমার ন্যায় উচ্চভাবাপন্ন নয়। এই সাঁওতাল পরগণাটায় মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ হইয়া গিয়াছে। এখানে বিশেষ সাবধান হইলে ক্ষতি নাই। আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। তোমার কি তাহা মত নহে ?

পরেশ। অবশ্য; কিন্তু সাঁওতালগণ অসভ্য, এবং তাহাদের মধ্যে কোনও রাজদ্রোহিতার ভাব এ সময় হঠাৎ সঞ্চারিত হইবারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

ডিঃ কঃ। এ দেশে কতকগুলি বাঙ্গালী জমীদার বসতি করিয়াছে। রাজমহলের পার্ব্বতীপুরে এক ঘর বড় জমীদার আছেন; তাঁহাদের মতি-গতি বড় ভাল দেখিতেছি না। আমার ইচ্ছা, তুমি একবার মফঃস্বলটা পর্য্যটন করিয়া যাহাতে এইরূপ লোকের মনে রাজভক্তির বৈলক্ষণ্য না ঘটে, তাহা দেখ। আমি অনর্থক ভদ্রলোককে উৎপীড়ন করিতে চাহি না। যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে আমাদিগের মধ্যে সখ্য অটুট থাকে, তাহাই আমার অভিপ্রেত।"

৪

ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকটা সেকালের জমীদার। স্থির, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। অতএব মালা-জপ তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। পার্ব্বতীপুরের জমীদারী বহুবর্ষে, বহুক্লেশে ও বহু মামলা মকদ্দমার পর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তগত হইয়াছিল।

সন্তানের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বি. এ, এবং খোকা,—অপ্রাপ্তবয়স্ক। কন্যার মধ্যে অবিবাহিতা সরযূ।

পিতা পুত্র স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পিতা সাবধান, পুত্র অসাবধান। গৃহিণী মালতী দেবী কলিকাতার মেয়ে। কাজেই ঝাড়টা স্বদেশী।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট পরেশনাথের সমারোহপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিতে গেলেন। ডালি, হাতী, ঘোড়া ও মুর্গীর ডিম সঙ্গে গেল, দুগ্ধবতী গাভী গেল, ফুলের তোড়া গেল। পরেশ যথারীতি খাতিরযত্ন করিয়া সব ফেরত দিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবীন হাকিমের ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরেশ। আপনার ছেলে কয়টি?

বাঁড়ুয্যে। দুটি। একটি এবার বি. এ. পাশ করিয়াছে।

পরেশ। শুনিয়া বড় প্রীত হইলাম। আমি কল্য আপনার সঙ্গে দেখা করিব। বোধ হয়, কোনও আপত্তি নাই?

বাঁড়ুয্যে। সে কি কথা? মহাশয়ের আগমন—আমার পরম সৌভাগ্য।

ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাগমনের পরদিন তাঁহার গৃহে একটা বিপ্লব উপস্থিত হইল। ধীরেন্দ্র মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের আগমন-সংবাদ তুচ্ছ করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিল। খোকা ও সরযূ কাছারীবাটীর ঘরে লুকাইয়া রহিল। গৃহিণী গঙ্গাস্নানে গেলেন।

সূর্য্যদেব মধ্যাহ্নপাটে। বার ক্রোশ পার্ব্বতীয় গ্রাম সকল প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক পরেশ পার্ব্বতীপুরের কাছারী-বাটীর নিকট একটি বৃক্ষতলে অশ্ব বাঁধিয়া সহিসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

স্থানটি অতি রমণীয়। দু'ধারে কামিনীগাছ; ঘন বৃক্ষশ্রেণী দুই সারিতে বরাবর কাছারী-বাড়ী পর্য্যন্ত বাহু বিস্তৃত করিয়া আছে।

পরেশ তৃষ্ণাতুর হইয়াছিল। ক্রমে অগ্রসর হইয়া একটি কূপের নিকট গেল।

সেখানে বৃক্ষচ্ছায়ায় একটি বালক ও একটি বালিকা বসিয়া ছবি টানিতেছিল। পরেশ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া নিকটে গেল।

বালক 'সাহেবে'র মত একটা লোক দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বালিকা বলিল, "চুপ, ভয় নাই।"

পরেশ মস্তক হইতে 'হ্যাট' নামাইয়া উভয়কে অভিবাদন করিল।

"তোমরা আমাকে একটু জল খাওয়াইতে পার?"

বোধ হয়, বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বালকের সাহস হইল।

বালক। দিদির কুঁজোয় জল আছে।

অদূরে কামিনীগাছের নীচে সুন্দর কুঁজো দেখিয়া পরেশ হাতে উঠাইয়া এক নিশ্বাসে তাহার অর্দ্ধেক জল পান করিল। অনেকটা জল গড়াইয়া গলদেশ বাহিয়া পড়িল। নেকটাই, কোট প্রভৃতি ভিজিয়া গেল।

বালক হাসিয়া উঠিল।

বালিকা আবার বলিল, "চুপ্।"

বালিকাটি বার তের বৎসরের। পিপাসাতুর পরেশ তাহাকে প্রথমে ভাল করিয়া দেখে নাই।

পরেশ কিছু স্মিতমুখে, কিছু রূপমুগ্ধ ভাবে, কিছু আত্মপ্রাধান্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

বালিকা। সরযূ।

পরেশ। তুমি কি ছবি টানিতেছিলে?

বালিকা। আমি লিখিতেছিলাম; ছবি টানি নাই।

পরেশ বলিল, "দেখি—"

সরযূর মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। সরযূ বলিল, "না।"

পরেশ খাতাখানি হস্তগত করিল। বালিকা দৃঢ়স্বরে বলিল, "দেখিবেন না। আমি বাবাকে বলিয়া দিব।"

পরেশ বলিল, "আমি তোমার বাবাকে ভয় করি না।"

এইরূপ দস্যুতাচরণে বালক-বালিকা সভয়ে দৌড়াইয়া পলাইল। এক ছুটে বৃক্ষশ্রেণী পার হইল; মাঠের দিকে গেল; পশ্চাতে চাহিল না।

পরেশ একদৃষ্টে তাহাদিগের গতি দেখিতে লাগিল। সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের উভয়ে দুইটি শুভ্র প্রজাপতির ন্যায় উড়িয়া পার্ব্বতীপুরের জমীদারের সিংহদ্বার-মধ্যে প্রবেশ করিল। আর দেখা গেল না।

৫

পরেশ খাতাখানি খুলিল। তাহার মধ্যে একটা গরুর ছবি, একটা বানরের ছবি দেখিল। একটা গোলাপফুলের শুষ্ক পাপড়ি, একটা চুল-বাঁধা ফিতা।

তার পর আর একটি পাতা। তাহাতে সুন্দর অক্ষরে "বন্দে মাতরম্"—তার পর—"সরযূ"—তার পর আবার "বন্দে মাতরম্"—তার পর—"আমার মা"—তার পর "মা জন্মভূমি, তোমারই সরযূ"।

কথাটা বিশেষ কিছু নয়; লেখাটাও কিছু নয়; ছবিগুলাও কিছু নয়। কিন্তু বোধ হয়, খাতাটার সঙ্গে পরেশের জীবনেরও একটা পাতা বিযুক্ত হইল।

পরেশ সেই পাতাটা খাতা হইতে ছিঁড়িয়া 'ব্রেষ্টপকেটে' যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিল; খাতাখানি লইয়া বরাবর জমীদার ভবানীবাবুর বাটীতে গিয়া পঁহুছিল।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অতি সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া পরেশকে বৈঠক-খানায় বসাইলেন। অনেকক্ষণ পরে পরেশ জানিতে পারিল যে, তাহার টুপি কূপতলেই রহিয়া গিয়াছে, এবং ঘোড়া বৃক্ষতলেই বাঁধা আছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বড় বাবু ধীরেন্দ্রনাথ একটু শুষ্কভাবে ঘোড়া ও টুপি আনিয়া হাজির করিল।

পরেশ। আমাকে মার্জ্জনা করিবেন, আমি সকাল হইতে রৌদ্রে পুড়িয়াছি। আমার মাথার ঠিক ছিল না।

ধীরেন্দ্র। আপনি এখন পর্য্যন্ত স্নানাহার করেন নাই?

পরেশ। না।

ধীরেন্দ্র। আমাদের শাক-ভাত খাইতে কোনও আপত্তি নাই?

পরেশ। যদি এক সঙ্গে বসিয়া খাও, তবে খাইব।

ধীরেন্দ্র। নিশ্চয় খাইব।

ধীরেনের এরূপ অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ও জাতিবিচার-হীনতা দেখিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মালাহস্তে সরিয়া গেলেন। নিমেষের মধ্যে ধীরেনের সহিত পরেশের বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল।

স্নান করিয়া পরেশ আহার করিল। আহারের সময় বোধ হয়, জানালার পার্শ্বে কে উঁকি মারিয়াছিল।

৬

বিলেত-ফেরতের সঙ্গে একত্র আহার কিছুই আশ্চর্য্য নহে; টুপি ফেলিয়া আসাও কিছু আশ্চর্য্য নহে।

তবে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার ছেঁড়া পাতাখানি লইয়া নাড়া-চাড়া করা একটু আশ্চর্য্য! খাতাখানির ইতিহাস বন্দোপাধ্যায়-পরিবারের কেহই জানিত না। বাহির-বাটীর টেবিলের উপর অপহৃত খাতা পাইয়াও সরযূর মনের উদ্বেগ মিটে নাই। সরযূ বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহার খাতার পাতা চুরি গিয়াছে। কিন্তু উনি চুরি করিলেন কেন? ওঁর অধিকার কি? ইহা আলোচনা করিতে গিয়া সরযূ নির্জ্জন ঘরে বসিল। অত ছোট বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয় বিচারাসনে বসিয়া ক্রমে বড় হইল। ছি, ভারি অন্যায়! ওঁর ফিরাইয়া দেওয়া উচিত। ভয় ও লজ্জায় সরযূর হৃদয় পরিপ্লুত হইল।

কিন্তু বালিকা কার কাছে নালিশ করিবে? সে সহায়হীনা। যে বন্ধন তাহাকে টানিতেছিল, তাহাতে ধর্ম্মাধিকরণ নাই! সরযূর মন ভারাক্রান্ত হইল। কেন? তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

বাহিরের কামরায় পরেশ 'ব্রেষ্ট-পকেট' হইতে ছেঁড়া পাতাখানি আবার বাহির করিল। মুখের কাছে লইয়া গেল। বোধ হয়, চুম্বন করিতে গিয়াছিল; কিন্তু নিজের অবস্থা দেখিয়া লজ্জা বোধ হইল। আবার তুলিয়া লইল;—দেখিল, কেহই নাই; হৃদয়ে রাখিল, আবার লইল। এবার চুম্বন করিল। পরেশ ভাবিল, বোধ হয়, আমার জীবন-ব্রতের এই প্রথম আভাষ। পরেশ অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িল। একবার 'তাহাকে' কি করিয়া আবার দেখি?

প্রায় সন্ধ্যা। বাগানে সন্ধ্যাফুল ফুটিতেছিল। পরেশ বাগানে গেল। সেখানে খোকা বেড়াইতেছিল। খোকার ভয় ভাঙ্গিয়াছে। খোকা ছুটিয়া পরেশের নিকট আসিল।

পরেশ কম্পিতস্বরে বলিল, "তোমার দিদি কই?"

খোকা উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "ঐ যে!"

বাস্তবিক তাই। ফুলগাছের এক কোণে উন্মনা হইয়া সরযূ বসিয়া ছিল। জড় প্রকৃতির ফুল ও মানব প্রকৃতির ফুল,—উভয়ে এক বৃন্তে ফুটিতেছিল।

৭

পরেশ উভয়কে স্পর্শ করিল। ফুল লইয়া সরযূর হাতে দিল।

সরযূ বিস্মিত হইল না। কিন্তু ভাবিতেছিল।

পরেশ বলিল, "তোমার খাতার পাতা ছিঁড়িয়াছি, রাগ করিও না—"

সরযূ ঘাড় নাড়িল। তাহার বিচারে তখন পরেশ নিষ্পাপ।

পরেশ আবার বলিল, "কিন্তু আমি ফিরাইয়া দিব না। কেন জান ?"

সরযূ কথা কহিল না।

পরেশ বলিল, "তবে আমি বলি। আমি ঐ ছেঁড়া পাতাটুকু সযত্নে লুকাইয়া রাখিয়াছি। কারণ,—আমি—আমি—তোমাকে—ভালবাসিয়াছি। আমি জগতে অন্য কিছু চাই না। যদি তোমাকে না পাই—যদি সমাজ তোমাকে না দেয়, তবে ঐ পাতাই আমার জীবনকে চালিত করিবে। কেবল তুমি—তুমি—আমাকে মনে রাখিও।"

এ সব বড় কথার অর্থ কি ক্ষুদ্র বালিকা বুঝিয়াছিল ? যদি না বুঝিয়াছিল, তবে সরযূর ওষ্ঠ কম্পিত হইল কেন ? সরযূ চক্ষু নত করিল কেন ?

পরেশ অতি ধীরে সরযূর হাত ধরিল। সরযূ কোনও কথা কহিল না।

পরেশ আবার বলিল, "মনে থাকিবে ত ? আমার জীবনের প্রথম ও শেষ তারা তুমি। তোমার সুধামাখা অক্ষরে আমার জীবনের কর্ত্তব্য প্রথমে দেখিয়াছি।• তুমি যেমন 'মা'র সরযূ, আমিও তাই। তোমার নিকট সে বারতা যে লইয়া আসিয়াছিল, অলক্ষ্যে সেই আমারও নিকট আনিয়াছে। তুমি বালিকা, বোধ হয়, কিছুই বুঝিতে পার নাই। কিন্তু মনে রাখিও। বুঝিলে ত ?"

কিন্তু সরযূ কথা কহিল না। তবে কি সরযূ বুঝিতে পারে নাই ? যদি না বুঝিয়া থাকে, তবে তাহার চক্ষু মুদিল কেন ? তবে সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যা-সমীরণ সরযূর রুক্ষ কেশদাম উড়াইয়া পরেশের মুখ ছাইয়া ফেলিল কেন ? সেই কেশগুচ্ছের মধ্যে দুইটি পবিত্র, একব্রত কুমার ও কুমারীর মুখ চির-বন্ধনে পরস্পরকে স্পর্শ করিল কেন ?

অথচ সরযূ কোনও কথা কহিল না।

৮

আপনারা বোধ হয়, মনে করিতে পারেন যে, বিলেত-ফেরতের সঙ্গে ধীরেন্দ্র শাকভাত খাওয়াতে বাঁড়ুয্যে-পরিবার জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ব্রাহ্মণের মুর্গী খাইলেও জাতি যায় না, তখন একটা মুর্গী অপেক্ষা পবিত্র জীবের সহিত এক ঘরে বসিয়া খাইলে জাতি না যাইবার সম্ভাবনাই

অধিক ; বিশেষতঃ স্বয়ং বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের হাতে তখন জপমালা ছিল, এবং গৃহিণী রীতিমত স্নান আহ্নিকে রতা ছিলেন। এহেন সময়ে জাতি দেহ ছাড়িয়া পলাইবার কোনও পথ পায় নাই।

তবে সরযূর সহিত পরেশের একটা চিরসম্বন্ধ স্থাপিত করিতে সকলকে বাধা পাইতে হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে বাদী সমাজ ও প্রতিবাদী ধীরেন্দ্র, খোকা ও খোকার মা।

সওয়াল-জবাবের মধ্যে এক দিকে শাস্ত্রের বিধান, অন্য দিকে প্রণয়ের বিধান। দুইটি বিধান একত্রিত হইয়া ইহাই দাঁড়াইল যে, এরূপ বিবাহে সমাজ কখনও যোগদান করিতে পারেন না; তবে বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের একই কন্যা, এবং তাঁহার উভয় উত্তরাধিকারী এ বিষয়ে নাছোড়বান্দা, অতএব বিবাহটা হইলেও হইতে পারে।

বাকি খাজনা মাফ্ পাইয়া ভাটপাড়ার ব্রহ্মোত্তর-ধারী ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ কিঞ্চিৎ নস্যগ্রহণানন্তর বলিলেন, "পূর্ব্বে সমুদ্র-গমনের প্রথা ছিল। নহুষের পুত্র যযাতি বোধ হয় এইরূপ প্রথার পক্ষে ছিলেন, এবং জরাগ্রস্ত হইয়াও পিতার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।"

'একষ্ট্রীমিষ্ট'গণ বলিলেন যে, "ধীরেন আমাদের প্রধান ভরসা। তাহাকে আমরা ছাড়িতে পারিব না। লাগে বিবাহ!"

বাঁড়ুয্যে মহাশয় সুযোগ দেখিয়া কাশী গমন করিলেন। কিন্তু গৃহিণী বরণডালার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

বিবাহের ফুলের সহিত জীবনের ফুল ফুটিয়া উঠিল।

ডেপুটী কমিশনর নিতান্ত হৃষ্টচিত্তে 'ব্রাইড'কে একটি 'ব্রুচ' উপঢৌকন পাঠাইলেন, এবং তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, এই মিলনে 'স্বদেশী'র বিষ মরিবে।

"থ্রি চিয়ারস্!"

৯

তাই আমরা পুনর্ব্বার বাঁশবেড়িয়ায় আসিতে বাধ্য হইলাম।

সেই পুরাতন গৃহে নূতন জাতি। এক জাতি যাইতেছিল, অন্য জাতি আসিতেছিল।

বৃদ্ধের শিয়রে কনে-বৌ;—সরযূ।

"বাবা, তোমার পাকা চুল আর কত তুলিব? মাথা ন্যাড়া হয়ে যাবে!"

পরেশের পিতা সদানন্দ মুখোপাধ্যায় বহুদিন পরে প্রাণ ভরিয়া হাসিলেন।

"মা, পাকা চুল না তুলিলেও চলে, কিন্তু তোলাটাই স্নেহের। আমরা শাস্ত্রের পাকা চুলটা লইয়া অনেক দিন টানিতেছি। শাস্ত্রের ব্যথা লাগিলেও বলে, 'চলুক—পুনর্জ্জন্ম ত আছে!' তোমরাও সেই নবীন জন্মের লোক, নবীন পথের যাত্রী। তোমাদের ছেলেপুলে আবার তুলবে।"

কিন্তু ঐ যে পদতলে অনাথা বিধবা—সাধের কন্যা রুক্মিণী!

কৈ, রুক্মিণীর ত চ'খে জল নাই। তার জীবনে এত আনন্দ কেন?

"রুকি! তোর মুখে হাসি দেখে আজ আমার কান্না পা'চ্ছে।"

বৃদ্ধের চখে জল দেখিয়া রুক্মিণী ধীরে ধীরে কাছে গেল।

"বাবা! ও কি, ছি! আমার জীবনে কি আর কোনও সাধ আছে? আমিও এই দেশের। আমার ও সরযূর একই ব্রত।"

ঠিক তাই। যে দেশের বিলেত-ফেরত, সেই দেশেরই ফুটন্ত সরযূ। যে দেশের হিন্দুজাতি, সেই দেশেরই ব্রহ্মচারিণী বিধবা। একই ঘরের সন্ন্যাসিনী ও প্রেমিকা। অথচ তাহারা একই ব্রতে ব্রতী।

কি আশ্চর্য্য!

ইতিহাসের এটা ছেঁড়া পাতা। এটাকে লুকাইয়া রাখ। ইহা লইয়া গণ্ডগোল করিও না।

দশপদী কবিতা।

—:০:—

কেন গাহে কবি?

কেন গাহে কবি? কেন সূর্য্য উঠে? বর্ষে বারি মেঘে
কেন গাহে নদী? কেন সিন্ধু শ্বাসে প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে?
কেন জ্যোৎস্না-পক্ষ তুলে' চন্দ্র ভেসে চলে নীলাকাশে?
স্পর্শ পেয়ে রবির কিরণ বসুন্ধরা কেন উঠে জেগে?
শিউরে উঠে কুঞ্জভবন পত্রে পুষ্পে কেন মধুমাসে?
পাখী কেন গেয়ে উঠে, মলয়-পবন কেন ধীরে বহে?

মাতা কেন ভালবাসে, গাহে মানুষ, শিশু কেন হাসে ?
নিজের প্রাণের আবেগে সে ; তোমাদিগের স্তুতির জন্য নহে ;
তোমাদিগের স্তুতির মূল্য, হা রে ! সে কি লাগে তার কাছে ?
—যে ধনে ধনী সে কবি, যে ভাবে সে বিভোর হ'য়ে আছে !

কবির দান।

যা পেয়েছি বিধির কাছে, ক্ষুদ্র কান্না, ক্ষুদ্র হাসিখানি,
সামান্য মস্তিষ্কটুকু, পূর্ণ হৃদয়, শূন্য এই প্রাণ,
তোমাদিগে করি আমি সে সম্পত্তি অকাতরে দান ;
তোমরা ধনী হবে না তাতে কিছু,—তাহা আমি জানি ;
আমি দিয়ে ধনী হ'ব ; তোমাদিগের হৃদে পাই স্থান—
এতটুকু,—তাও ভাল, অতুল বিভব একা ভোগ হ'তে ;
তোমার কাছে প্রতিবাসী ! তাইতে আসি, তাইতে গাহি গান !
ইচ্ছা,—তুমি শোন ; দেখ,—ভাল যদি লাগে কোন মতে ;
ভাবি আমি—আমার ভাবে আমি বিভোর, নত তারি ভারে,
তোমাদিগের কিছুই ভাল লাগিবে নাকি, এ কি হতে পারে ?

কবির অভিমান।

যদি কেউ না শোনে, তবু হে কল্পনা ! তোমার অনুরাগে
গেয়ে ওঠ উচ্চকণ্ঠে, তোমার এমন দুঃখ নাইক কোন ;
নিজের কুঁড়ের দ্বারে বসে', নিজেই গাহো, নিজেই তাহা শোন ;
নেহাৎ খারাপ সে গান নহে যদি তোমার নিজের ভাল লাগে।
ঊষার রাগে সন্ধ্যা-রাগে মিলিয়ে একটি মধুর স্বপ্ন বোনো,
তোমার নিশীথ-নিদ্রাখানি আলোকিত করবে তাহার আলো !
কেন মূঢ় ! অলস ভাবে দিনের দীপ্ত প্রহরগুলি গোণো ?
গাহ, গাহ, কবি ! অন্যের লাগে, কিংবা নাহি বা লাগে ভালো ;
আরও, যে সম্পত্তি তুমি নিয়ে কবি ! এসেছ এ ভবে,
গাইতে নাহি চাহ যদি অভিমানে, গাইতে তবু হবে !

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

২১শে কার্ত্তিক।—জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে আগামী দুই দিবস স্কুল বন্ধ। জগদ্ধাত্রীকে ধন্যবাদ দিয়া ২টার ট্রেণে কলিকাতায় প্রস্থান করিলাম। পঞ্চুরাম ঘরের ভিতর খেলা করিতেছিল; আমাকে প্রথমতঃ দেখিতে পায় নাই, অপর দিকে হামাগুড়ি দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহার মনোযোগ আকৃষ্ট করিলাম, সে ফিরিল; মুহূর্ত্তমধ্যেই আমার কোলের উপর অধিষ্ঠিত হইল। কথা এখনও নূতন কিছু শিখে নাই। তাহার যে সকল জিনিস খাদ্য নহে, তাহা সে দেখিতে পাইলে, আমরা "ছি! খাইতে নাই" এইরূপ বলি দেখিয়া, সে তাহার অনুকরণ করিয়া "ছি ছি" বলিতে শিখিয়াছে। অনেক সময় নিজেই "ছি" বলিতে বলিতে নিজেই আপনাকে সংবরণ করিতে পারে না। অসুখ না হইলে এত দিনে বোধ হয় একটু একটু চলিতে পারিত। ডাক্তার বাবু যাহাই বলুন, শিশুটির জীবন সম্বন্ধে আমার এখন অনেকটা আশা হইয়াছে। ভগবান্ আমাকে শিক্ষা যাহা দিবার, যথেষ্ট দিয়াছেন; বোধ হয়, নূতন আর কোনও বিপদে সম্প্রতি নিক্ষেপ করিতেছেন না। সে যাহা হউক, শিক্ষা পাইয়াও আমি এখনও পাপের হস্ত হইতে উদ্ধার হইতে পারিলাম না। বাসনার বন্ধন এখনও সেইরূপ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কবে ছিড়িবে, ঈশ্বরই জানেন। * * *

২২শে কার্ত্তিক।—বন্ধুবর অ—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সাহিত্য সম্বন্ধে বহুবিধ আলাপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার নব-রচিত একটি গাথা পাঠ করিয়া শুনাইলেন। নাম "রঘুনাথ"। উহা এখনও শেষ হয় নাই। যাহা শুনিলাম, মন্দ লাগিল না। ইতিপূর্ব্বে আরও দুই একটা শুনিয়াছিলাম; তদপেক্ষা বর্ত্তমান রচনাটিকে ভাল বলিয়া বোধ হইল। "রঘুনাথ" এক জন দারিদ্র্য-প্রপীড়িত নব্যযুবা। দারিদ্র্যবশতঃ নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়া অবশেষে হয় ত তাহাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইবে। কবি রঘুনাথের হৃদয়-ভাব বেশ জীবন্ত ভাষায় বিবৃত করিয়াছেন। অ—বাবু "সাহিত্য"-সম্পাদকের মাসিক সাহিত্য সমালোচনা প্রণালীর দোষ দিতেছিলেন। সম্পাদক কোনও প্রকার বিশ্লেষণ না করিয়া, হেতুবাদ একবারে ছাড়িয়া দিয়া, কেবল ভাল কি মন্দ, এইরূপ একটা মতামত প্রদান করেন।

তিনি আপনার রুচিকেই সাহিত্য-সৌন্দর্য্যের মাপকাটি করিতে চান বলিয়া মনে হয়। ইহা সমালোচনার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি নহে, এ কথা এই ডায়েরীতে আমিও অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি। সম্পাদকের বহুদর্শিতার প্রয়োজন।

* * *

২৩শে কার্ত্তিক।—ফরাসী কবি ভিক্টর হুগো প্রণীত Le Roi S'amuse (The King's Diversion) নামক নাটকখানি পাঠ করিলাম। ইংরাজকবি টেনিসন যে হুগোকে "lord of human tears" ইতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সুসঙ্গত। দুঃখ-যন্ত্রণার এরূপ হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ অতি অল্প কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাণসমা কন্যার মৃত্যু দর্শন করিয়া ত্রিবুলের গগনভেদী চীৎকার, মহাকবি সেক্ষপীয়র-কৃত লিয়রের উন্মাদ-রোদনের সহিত তুলনীয়। আমাদের পরিচিত হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় এই নাটকখানি অবলম্বন করিয়াই তাঁহার "দুলালী" উপন্যাস লিখিয়াছেন, অথচ তাহা স্বীকার করেন নাই। সমালোচক-প্রবর চন্দ্রনাথও তাহা ধরিতে না পারিয়াই ডিপ্লোমা দিয়াছেন।

২৪শে কার্ত্তিক।— * * * *

* * * গত কল্য হুগোর যে নাটকের কথা লিখিয়াছি, তাহাতে একটা বিশেষ অভাব লক্ষিত হইল। নাটকখানিতে চরিত্রের তেমন বৈচিত্র্য নাই। ত্রিবুলের চরিত্রই গ্রন্থের প্রাণস্বরূপ। তাহার নিম্নে ত্রিবুলের কন্যা। রাজা ফ্রান্সিস্ এক জন ইন্দ্রিয়-সেবক নরপশু। কিন্তু হুগো পশুটিকে তেমন পরিস্ফুট করিয়া তুলেন নাই; তাহার পরিণাম কি হইল, তাহাও পাঠককে জানিতে দেন নাই। ইহা নাটকের একটা অসম্পূর্ণতার মধ্যে গণনীয়। পাপের বর্ণনা করিতে গিয়া তাহার পরিণাম না দেখাইলে কোনও গ্রন্থেরই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না।

২৫শে কার্ত্তিক।—প্রায় একাদশ বৎসর অতীত হইল, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "মায়াবিনী" রচনা করি। তার পর আজ পর্য্যন্ত সাহিত্য-রাজ্যে কত দূর অগ্রসর হইয়াছি, ভাবিয়া দেখিলে মন নিতান্ত নিরাশায় নিমগ্ন হইয়া যায়। কিন্তু ক্রমশঃ এই নিরাশা ও নিস্ফলতাও আমার অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে। হয় ত সমস্ত জীবনটাই এইরূপে কাটিয়া যাইবে। সুতরাং সে জন্য আর দুঃখ করি না। তবে আর একটা আনন্দের কারণ আছে;

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার মতামত ও রুচি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত ও পরিমার্জ্জিত হইয়াছে। নিজে রচনা করিয়া সর্ব্বদা সুখভোগ যদিও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, তথাপি প্রকৃত কবিত্বের ও সৌন্দর্য্যের আধার কোনও গ্রন্থ বা ক্ষুদ্র রচনা পাইলে তাহা বিলক্ষণ উল্লাসের সহিত উপভোগ করিতে পারি।

কোনও কোনও সমালোচক "মায়াবিনী"কে রবীন্দ্রের ছাঁচে ঢালা বলিয়াছিলেন। ছাঁচটা বাস্তবিক রবীন্দ্রের কি না, সে কথা অনেকেই ভাবিয়া দেখেন না। স্বর্গীয় কবি বিহারীলালই বর্ত্তমান Romantic যুগের প্রবর্ত্তয়িতা। আমি তাঁহার "সারদা-মঙ্গল" পাঠ করিয়া এবং কয়েক জন কবির কবিতা আলোচনা করিয়াই Romantic পদ্ধতিতে দীক্ষিত হই। রবীন্দ্রনাথ, অধরলাল, অক্ষয়কুমার, রাজকৃষ্ণ রায়, ইঁহারা সকলেই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিহারীলালের কাব্য-শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় কেবল পুস্তকগত। "সারদা-মঙ্গল"-পাঠের পূর্ব্বে রবীন্দ্রের কোনও কবিতাই পাঠ করি নাই। রবীন্দ্রের পূর্ব্বে অধরলালের "নলিনী" পাঠ করিয়াছিলাম। তবে এ কথা বলিতেছি না যে, "মায়াবিনী" রচনার আগে রবীন্দ্রের একটা কবিতাও পড়ি নাই। যখন ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়ি, আমার সহাধ্যায়ী যোগিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় পুরাতন "ভারতী"র কয়েক সংখ্যা আমাকে পড়িতে দিয়াছিলেন। তাহাতে রবীন্দ্রের নাম ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার কবিতা ছিল। সেই দুই একটি কবিতাই পড়িয়াছিলাম। * * * * *

২৬শে কার্ত্তিক।—গত কল্য পঞ্চুর জন্য নূতন একখানা লেপ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছি। ঘরের জানালাগুলার দোষ সংশোধন করিতে না পারিলে, মনের তৃপ্তি হইতেছে না। * * *

২৭শে কার্ত্তিক।— * * * শুনিলাম, ভিক্টর হুগোর সহিত "দুলালী" উপন্যাসের সাদৃশ্য-সম্বন্ধে বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় মৃত মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় বলিয়াছেন যে, তিনি হুগোর পুস্তক পাঠ করেন নাই। তাঁহার এ কথা কত দুর সত্য, বলিতে পারি না। হয় ত তিনি এ বিষয়ে প্রকৃত কথা একটুকু গোপন করিয়াছেন। তিনি হুগোর গ্রন্থখানি নিজে অধ্যয়ন যদি না করিয়া থাকেন, এমন হইতে পারে, কোনও বন্ধুর নিকট উহার উপাখ্যানাংশের বিষয় অবগত হইয়া তাহারই অনুকরণে আপনার উপন্যাসের ভিত্তি গঠন করিয়াছেন। দুই জন গ্রন্থকারের মনে যে

নিঃসম্পর্কভাবে একই বিষয়ের উদয় হইতে পারে না, এমন কোনও কথা নাই। তবে হারাণ বাবুর মনটা সেই দরের কি না, তাহাতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন।

২৮শে কার্ত্তিক।—আজ রাস-পূর্ণিমা। পরপারে সুখচর গ্রামে বিহারীলাল পাইন মহাশয় এতদুপলক্ষে তাঁহার ঠাকুরবাড়ীটিকে বেশ সজ্জিত করিয়াছেন শুনিয়া, একখানা জেলে-ডিঙ্গীর সাহায্যে জ্যোৎস্না-সমুজ্জ্বল জলরাশির উপর দিয়া সৌন্দর্য্য-বিহ্বল-হৃদয়ে ভাগীরথীকে অতিক্রম করিলাম। উপরে উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রবেশ করিবার পথে, দুই পার্শ্বে, নানাবিধ চিত্র সংসারী জীবের নানাবিধ অবস্থা প্রতিফলিত করিতেছে। কোথাও পাপ, কোথাও ক্রোধ, কোথাও লোভ, লাম্পট্য, অর্থতৃষ্ণা প্রভৃতি, সম্পূর্ণ সুকল্পিত না হউক, অনেকটা হৃদয়গ্রাহিভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তার পর যমালয়ে পাপী জনের নানা প্রকার শাসন ও যন্ত্রণার চিত্র। সর্ব্বথা সুসঙ্গত না হউক, দেখিলেই প্রাণটা চমকিয়া উঠে। সংসারে পাপী নহে কে? ভিতরে রাসমঞ্চের সম্মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আশৈশব সমস্ত লীলাগুলি চিত্রবদ্ধ রহিয়াছে। প্রবেশ করিয়া সহসা চারি দিকে সেই সুদৃশ্য ছবিগুলি দেখিলে আপনাকে সেই পবিত্র দ্বাপর যুগেরই পবিত্র মানব বলিয়া মনে হয়। হৃদয়দেশ যেন কি পুণ্যা-লোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। কিন্তু হায়! সে সব সুখের দিন কোথায় চলিয়া গিয়াছে! আর সে সুখস্বচ্ছন্দতা নাই, সে পুণ্য-পবিত্রতা নাই, সে শান্তি সৌন্দর্য্য, আনন্দ-উৎসব, পূজার্চ্চনা, সকলই লোপ পাইয়াছে। মহারাসে আর সে রস নাই, পূর্ণিমায় আর সে সৌন্দর্য্য নাই। রাসবিহারী স্বয়ং এই ভারতভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। সেই জ্বলন্ত, সজীব, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য আর নাই; তাই তাহার বিবিধ কষ্টকল্পিত প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া আমরা যথাসাধ্য তাহার সাধ মিটাইতেছি। কিন্তু মানুষের প্রাণ ত কিছুতেই তৃপ্তি মানিতেছে না। হায়! কবে আমরা সেই সজীব সৌন্দ-র্য্যের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইব? আমাদের সকল সাধ পূরিবে?

২৯শে কার্ত্তিক।—কলিকাতায় গিয়া পঞ্চুকে দেখিলাম। এই তিন দিবস আর জ্বর হয় নাই। শিশুটিকে অনেকটা সুস্থ বলিয়া মনে হইল। তাহার প্রফুল্লতাও পূর্ব্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে। কয়েকটি নূতন কথা শিখিয়াছে। শিশুটি এখনও সম্পূর্ণরূপে রোগ-বিমুক্ত হইতেছে না দেখিয়া বাটীর স্ত্রীলোক-

গণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা কাহারও কাহারও নিকট সুখ্যাতি শুনিয়া অপরাপর দুই এক জন ডাক্তার কবিরাজের নাম করিতেছেন; এবং তাঁহাদিগকে আনাইয়া দেখাইতে বলিতেছেন। এরূপ অস্থিরতায় কোনও ফল নাই জানিয়া আমি এ সকল কথায় ততটা কর্ণপাত করি না। আমার মনে হইতেছে, যদি ভাল হয়, তবে বর্ত্তমান ডাক্তার মহাশয়ের হাতেই হইবে। কারণ, ইনি অনেকটা উপকার দেখাইতে পারিয়াছেন। তবে, আবার যদি বাড়াবাড়ি হইয়া উঠে, তখন কাজেই চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

সুহৃদ্বর হীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি "সাবিত্রী লাই-ব্রেরী"র জন্য বক্তৃতা প্রস্তুত করিতেছেন। কাব্য-সাহিত্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কথাবার্ত্তা হইল। তিনি আজকাল রবীন্দ্রনাথের প্রতি একটু বেশী মাত্রায় বিরূপ হইয়া পড়িতেছেন। এক একবার তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। ইহার একটা কারণ, তিনি রবীন্দ্রের কবিতার আলোচনা অনেক দিন করেন নাই। আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই ইহার জন্য দোষ দিয়া থাকি। তিনি সময়াভাবের কথা বলেন। কিন্তু যখন সাহিত্যের আলোচনা করিতেছেন, তখন বর্ত্তমান কবিতার প্রাণস্বরূপ রবীন্দ্রকে উপেক্ষা করা নিতান্ত অন্যায়।

৩০শে কার্ত্তিক।—ফরাসী কবি হুগোর Hernani নামক নাটক-খানি পাঠ করিয়াছি। ইহাতে প্রধানতঃ এক জন অরণ্যচারী বিদ্রোহী দস্যুর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। একমাত্র নায়িকার প্রতি তিন জনের প্রেম-সঞ্চার হয়। প্রেমিক-ত্রয়ের মধ্যে Hernani দস্যু এক জন। তিন জনেরই চরিত্র অতীব দক্ষতার সহিত সুকৌশলে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু, তিন জনের ভিতর যিনি পরিশেষে স্পেনের সম্রাট্ হইলেন, তাঁহারই চরিত্রে সমধিক মহত্ত্ব বিদ্যমান। যে তাঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত আজীবন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল, তিনি তাঁহারই করে আপন প্রণয়পাত্রীকে সমর্পণ করিয়া দিয়া ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাইলেন। কবি নায়িকার চরিত্রেও প্রেমের প্রগাঢ়তা-বর্ণনে সবিশেষ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। নাটকখানি পাঠ করিয়া পরম পরি-তোষ লাভ করিয়াছি। বাঙ্গলা নাটক পাঠ করিয়া অনেক সময় এইরূপ আনন্দ উপভোগ করিবার বাসনা হয়। সে শুভ দিন কবে আসিবে, ভগবান্ জানেন।

ভিক্টর হুগোর নাটক ও তাঁহার গদ্য উপন্যাসাবলীর মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মনুষ্য-প্রকৃতির মহত্তর দেবোপম গুণসমূহেরই প্রাধান্য। মানুষ কত দূর উন্নত ও মহান্ হইতে পারে, ঐ সকল গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শন করা তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাটকগুলির প্রকৃতি সেরূপ নহে। ইহাতে মানব-মনের নিকৃষ্টতা অংশেরই প্রাধান্য। Hernaniর প্রতিশোধ-স্পৃহা বা Triboulet এর হৃদয়-নিহিত ঘৃণা ও প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি যেরূপ উজ্জ্বল ও সুপরিস্ফুট, অপর কোনও চরিত্রের কোনও মহান্ বা সাধু ভাব সেরূপ নহে।

১লা অগ্রহায়ণ।—Victor Hugo প্রণীত Ruy Blas নামক নাটকখানি পাঠ করিলাম। King's Diversion অথবা Hernaniর সহিত তুলনায় ইহা দাঁড়াইতে পারে না। নাটকের যবনিকা যেন হঠাৎ পড়িয়া গেল; কোনও চরিত্রই তাদৃশ পরিস্ফুট হইল না। নাটকখানির উদ্দেশ্যও ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। ইহা পাঠ করিয়া আদৌ সন্তোষ লাভ করিতে পারি নাই। একমাত্র রাণীর প্রতি Ruy Blasর প্রেম ছাড়িয়া দিলে, ইহাতে প্রশংসার কথা তেমন কিছুই নাই। নাটকখানি হুগোর উপযুক্ত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

পুরাতন বঙ্গদর্শনের পাতা উল্টাইতেছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দুর্ব্বলতা দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। তিনি যেরূপ স্বাধীনতা ও সতর্কতার সহিত অপরিচিত গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতেন, পরিচিত বা আশ্রিত লেখকদিগের সম্বন্ধে সেরূপ করিতে পারিতেন না। আশ্রিত-বাৎসল্য জিনিসটা মন্দ নহে। কিন্তু সাহিত্যের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে উহার প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত হওয়া উচিত। নহিলে, প্রশংসাগুলা নিতান্তই গায়ে-পড়া-গোছের হইয়া পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কৃত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং গঙ্গাচরণ সরকারের সমালোচনা উল্লিখিত হইতে পারে। যেখানে এই আশ্রিতানুরাগের সম্পর্ক নাই, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র বেশ নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করিয়া কেবল সাহিত্য ও সৌন্দর্য্যের দিক্ হইতে মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। তবে, তাঁহার কৃত পরিচিত ও আশ্রিত গ্রন্থকারের সমালোচনা যে একেবারে অন্যায় ও অযৌক্তিক, এমন কথা বলিতেছি না। প্রশংসার সুরটা চড়িয়া উঠিত, কেবল ইহাই বক্তব্য। * * *

২রা অগ্রহায়ণ।—কার্ত্তিক মাসের "নব্যভারতে" নব্যভারতের কবি গোবিন্দদাস "পুরাতন প্রেম" শীর্ষক একটি কবিতা বাহির করিয়াছেন। কবিতাটিতে তিনি পুরাতন প্রেমকে পুরাতন ঘৃতের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কবির দৃষ্টি অতি সূক্ষ্ম, সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয়, এই নবাবিষ্কৃত ঘৃতটা মালিস করিতে হইবে, কি খাইতে হইবে, কবিবর সে বিষয়ে কোনও ব্যবস্থা প্রদান করেন নাই। ইতিপূর্ব্বে এই মহাকবিই কিশোরীর কঠোর স্বভাবকে নিদাঘের নেয়াপাতী ডাবের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের করুণার্হ কবি কালিদাসের, উপমা সম্বন্ধে যে একটুকু গৌরব ছিল, গোবিন্দ বাবু বোধ হয় এত দিনের পর তাহা হইতেও বেচারীকে বঞ্চিত করিলেন! হায়, বাঙ্গালার কবিতা! তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া শৃগাল কুক্কুরের চক্ষেও জল আসিতে পারে, তথাপি বাঙ্গালার সম্পাদক-কুলের চৈতন্য হইবে না। * * *

৩রা অগ্রহায়ণ।—"চৈতন্যের দেহত্যাগ" কবিতা সম্বন্ধে বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছিলেন যে, কবিতাটিতে ঘটনার স্থাননির্দ্দেশ অতি সুন্দর ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু আসল বিষয়-টাকে যেন কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া ফেলা হইয়াছে। অর্থাৎ, তাঁহার মতে চৈতন্য দেবের আভ্যন্তরিক অবস্থা আরও একটু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হওয়া উচিত ছিল। আমি তাঁহার এই সমালোচনা সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না। যে অবস্থায় মহাপ্রভুর মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে কোনও প্রকার বাহ্যাড়ম্বর আদৌ সম্ভাবিত নহে। প্রকৃতি শান্ত, নিস্তব্ধ, নিশ্চল;—যেন আপনার সৌন্দর্য্যে আপনিই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। নিমাইও বাহ্যজ্ঞানশূন্য; আপনার ভাবে আপনি বিভোর। তাঁহার শরীরে চাঞ্চল্যের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হইতেছে না বটে, কিন্তু অন্তরপ্রদেশে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইতেছে। তিনি হ্রদোপরি কমলাসনবিহারী যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিলেন, তাহাও তাঁহার ভাববিমুগ্ধ হৃদয়েরই প্রতিবিম্বমাত্র। তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতার অবসর ছিল না। যেখানে উপভোগ ও তৃপ্তির পদার্থ সম্মুখে সাক্ষাৎ বিরাজমান, সেখানে কাঙ্গালের অবলম্বন কথার প্রয়োজন কি? তিনি সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রাধিষ্ঠিত, সৌন্দর্য্যপরিবেষ্টিত আপনার অভীষ্ট দেবতাকে দেখিলেন,—আর তাঁহাতে মগ্ন হইতে ছুটিলেন। এখানেও যাহা কিছু ক্রিয়া, তাহা তাঁহার প্রাণের ভিতরেই নিবদ্ধ। কেবল প্রাণটা

দেহের আকারে রহিয়াছে বলিয়াই উহাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। প্রাণ সৌন্দর্য্যে মিশিল, মাটীর দেহ পড়িয়া রহিল।

৪ঠা কার্ত্তিক।—আবার সেই পুরাতন কথা। ভাগিনেয় চারুচন্দ্র মল্লারপুর হইতে বিবাহার্থ অনুরোধ করিয়া এক সমন জারি করিয়াছেন। অকালের কল্যাণে কথাটা কয় মাস চাপা পড়িয়াছিল। শুভ অগ্রহায়ণের আগমনের সহিত আবার নবোদ্যমে গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, বেচারী যখন কানের কাছ পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন এই ডায়েরীতে ইহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা না করা ভাল বলিয়া মনে হয় না। অতএব, হে কথা! হে বিদেশী! হে বিবাহ-প্রস্তাব! তুমি আমার এই বৈরাগ্যোন্মুখ মনের এক কোণে এই আসনখানি গ্রহণ কর। হায়! মল্লারপুর কোন্নগর কয় মাসের পথ, কে জানে? কিন্তু, তোমাকে বাষ্পবেগে আসিতে হইয়াছে; আত্যন্তিক শ্রমবশতঃ তোমাকে কতই ক্লেশানুভব করিতে হইয়াছে। আহা বন্ধু! তুমি কি সারা পথ কেবল কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়াছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ এত আর্দ্র কেন? এ কি! এখনও যে তোমার কপোলদেশে বর্ষার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে! তোমার হৃদয়দেশ মুহুর্মুহু ওরূপ স্ফীত হইয়া উঠিতেছে কেন, ভাই? হে প্রিয়! হে বিবাহ-প্রস্তাব! তুমি আর কাঁদিও না; তোমার হৃদয়াবেগ প্রশমিত কর; নহিলে তোমার বুক ফাটিয়া যাইবে। কেন ভাই, সে কত কাল হইল,—সেই বহু-পুরাতন কথা কি তোমার মনে পড়িয়া গিয়াছে? কে এক জন ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিতে চাহিত, আজ সে কোন্ দেশে চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। তুমি কি সেই হতভাগিনীর কথা ভাবিতেছ? আর কেন ভাই? সে নির্দ্দয় তোমাকে ভুলিয়াছে; তুমি কি অন্তিমেও তাহাকে ভুলিতে পারিবে না?

৫ই অগ্রহায়ণ।—শ্রীমতী ব্রাউনিঙের দুই একটি কবিতার আলোচনা করিতেছিলাম। কাব্য সম্বন্ধে তাঁহার যে অতি পবিত্র উচ্চ আদর্শ ছিল, তাহা তাঁহার যে কোনও কবিতা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তিনি কেবল চিত্তবিনোদনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বোধ হয়, কখনও একটি ছত্রও ছন্দে গ্রথিত করিতেন না। ক্ষণিক আনন্দ তাঁহার কোনও কবিতার উদ্দেশ্য নহে। মানবচরিত্রের সংস্কার ও উন্নতি, এই তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়ে অতি দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি জড় জগৎ বা পার্থিব জীবনের কথা লিখিতে

গিয়া কখনও তাহাকেই সর্ব্বোচ্চ করিয়া তুলিতেন না। তাঁহার দৃষ্টি প্রতিনিয়ত সেই জড়ের অতীত আলোকরাজ্যের অনন্ত পবিত্রতার পানেই প্রধাবিত হইত। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এই মর্ত্তলোকের পশ্চাতে যে ত্রিদিবের ছায়া বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিতান্তই হেয় ও অসুন্দর, অপদার্থ হইয়া উঠে। তাই তিনি উক্ত দুইটি পদার্থকে সর্ব্বদাই সম্মিলিত করিয়া রাখিতে চাহিতেন। নিদ্রিত শিশুর সুষমা বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি কেবল বিরামদায়িনী নিদ্রার কথা ভাবিতেন না। সেই পবিত্র শুভ মুহূর্ত্তে শিশুর চারি পার্শ্বে যে স্বর্গীয় দেবতারা আসিয়া তাহার মুখের পানে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিয়াছেন, শিশুহৃদয় যে অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখিতেছে, তিনি প্রধানতঃ তাহাই আমাদিগকে দেখাইলেন। তবে এমন কথা বলিতেছি না যে, ব্রাউনিঙ-পত্নী আমাদের বর্ত্তমান জগৎ ও জীবনের প্রতি একবারে উদাসীন ছিলেন। সহস্র অভাব থাকিলেও এই সৃষ্ট পদার্থরাজির যে সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তিনি বিলক্ষণ অনুভব করিতেন, কিন্তু সে সৌন্দর্য্যকে তিনি স্বর্গরাজ্যেরই প্রতিবিম্ব বলিয়া জানিতেন। যে সৌন্দর্য্যের ছায়া লইয়া জগৎ এত সুন্দর, কবিদের একমাত্র কর্ত্তব্য,—তাঁহারই প্রতি মানবের মন আকৃষ্ট করেন।

বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত।*

অতি অল্পকাল হইল, বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষায় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা সূচিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের সহিত এই আলোচনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী জাতির পক্ষে ইহা শুভলক্ষণ বলিয়াই বোধ হয়। স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাসের ন্যায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক গত দশ বৎসরের মধ্যে অনেক রচিত হইয়াছে। এমন কি, এক জন খ্যাতনামা ইংরাজ অধ্যাপকও বঙ্গভাষায় ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু মূল সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া নিরপেক্ষভাবে এতদ্দেশবাসী কোনও ব্যক্তিই স্বদেশের ইতিহাস প্রণয়ন করেন নাই। খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের বহুকালব্যাপী পরিশ্রমের ফল এখনও সাধারণের গোচরীভূত হয় নাই। সংপ্রতি শ্রীযুত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কোষগ্রন্থ ও মাসিকপত্রিকার প্রকাশিত প্রবন্ধ-সমুদ্রের মন্থন করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের স্বদেশের ও স্বজাতির যে বিবরণ

* বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত :—শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ বি. এল. প্রণীত।

সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বীরভূম জেলার অন্তর্গত দুবরাজপুরের মুন্সেফ্। এতদ্দেশীয় মুন্সেফগণ আজীবন দারুণ পরিশ্রম করিয়া প্রায়ই অকালে কালকবলে পতিত হন। রাজকার্য্য ব্যতীত অন্য কোনও বিষয়ের আলোচনা করিবার সময় তাঁহাদের থাকে না। এমন অবস্থায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রৌঢ়বয়সে যে এরূপ দুঃসাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অসীম মানসী শক্তির পরিচায়ক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমাদিগের কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। পরে আমাদের সন্দিগ্ধ বিষয়গুলি পত্র দ্বারা জানাইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে কতকগুলি বিষয়ের সদুত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগের সন্দেহভঞ্জন করিয়াছেন; কিন্তু অধিকাংশ বিষয়গুলি এখনও অনিশ্চিত রহিয়াছে। সেই বিষয়গুলি সুমীমাংসার জন্য সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থকর্ত্তা বঙ্গদেশের প্রাকৃতিক বিবরণ ও জাতি-সমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই। তবে জাতিভেদ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেতর-জাতীয়গণের কিছু বক্তব্য থাকিতে পারে। ৯৩ পৃঃ একটি বিষয় আমাদের অত্যন্ত বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়:—

"শকসেন বংশ শকজাতির এক শাখা। ইংলণ্ডের স্যাক্সন ও শকসেন অভিন্ন বলিয়া বোধ হয়।"

ইয়ুরোপের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে একটি ক্ষুদ্রদ্বীপবাসী জাতি কিরূপে গোবিমরুভূমিনিবাসী বিশাল শকজাতির শাখা বলিয়া কথিত হইতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। পত্রোত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ধ্রুবানন্দ মিশ্র ও পুরুষোত্তম দত্তকে শৈকসেনার বংশ বলিয়াছেন, তাহাতে শকসেন বংশের উল্লেখ দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থজাতির শকসেন নামক এক শাখা আছে, তদ্দ্বারাও শকসেন-বংশের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। পদ্মপুরাণে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে তাহাদিগকে সূর্য্যোপাসক শকজাতির এক শাখা বলিয়া বোধ হয়।" নগেন্দ্রবাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে শকদ্বীপী ব্রাহ্মণ-বিবরণের চতুর্দ্দশ পৃষ্ঠায় শকসেন স্পষ্টই শকজাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে। শকসেন নামটি দ্বারাও তাহাই বোধ হয়। যতদূর স্মরণ হয়, অক্ষয় বাবুর "ভারতীয় উপাসক-সম্প্রদায়" নামক পুস্তকে শকসেন এবং স্যাক্সন অভিন্ন বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে Todd's Rajasthanএ বোধ হয় আলোচনা আছে, এবং বহুদিন হইল, 'নব্যভারতে'ও এক জন লেখক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। অন্যান্য গ্রন্থেও এরূপ আলোচনা দেখিয়া থাকিতে পারি। শেষোক্ত বিষয়ে আমি নিজে বিশেষ আলোচনা করি নাই। অন্যের আলোচনা দৃষ্টে লিখিয়াছি। বর্ত্তমান গ্রন্থের পক্ষে শকসেন এবং স্যাক্সন্ অভিন্ন কি ভিন্ন, তাহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।" গ্রন্থকার স্বয়ংই যখন বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তখন এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কিন্তু কোনও ঐতিহাসিকই বোধ হয় Todd বা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের এরূপ উক্তি ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। বিগত পঞ্চাশৎবর্ষের মধ্যে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং তাহার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত মনীষিদ্বয়ের উক্তিসমূহও সংশোধিত হইতে পারে।

গ্রন্থের ১০১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে,—খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পাটলী ও বর্দ্ধমান বঙ্গদেশের দুইটি প্রধান নগর ছিল। বর্দ্ধমানের প্রাচীনত্ব-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তথাপি খৃঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান নগরের অস্তিত্ব ছিল, এরূপ উক্তি কত দূর যুক্তিসঙ্গত, তাহা বিচার্য্য। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পত্রোত্তরে জানাইয়াছেন যে, বরাহমিহির বর্দ্ধমান নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্দ্ধমান নগরের নাম দেখা যায়। বরাহমিহির কোন্ শতাব্দীর লোক, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণকে কেহই খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন নাই। সুতরাং বরাহমিহিরের গ্রন্থে বা মার্কণ্ডেয়পুরাণে উল্লিখিত থাকায় খৃঃ-পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান নগরের অস্তিত্ব কিরূপে সপ্রমাণ হইতে পারে? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আরও লিখিয়াছেন যে,—"জৈন গ্রন্থে অবগত হওয়া যায়, মহাবীরের নামানুসারে বর্দ্ধমানের নামকরণ হইয়াছে। জৈনগ্রন্থে আছে যে, মহাবীর রাঢ়ের যে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহাই পরবর্ত্তী সময়ে বর্দ্ধমান নামে পরিচিত হয়।" চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পাটনা জেলার বিহার মহকুমার তিন ক্রোশ দক্ষিণ পাওয়াপুরী গ্রামে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাঢ়দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকিতে পারেন, যে স্থানে তিনি প্রথম ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাহাও পরবর্ত্তী কালে বর্দ্ধমান নামে পরিচিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে কিরূপে বর্দ্ধমান নগরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়? বর্দ্ধমান নগরের অনতিদূরে 'সাত দেউলে আজাপুর' নামক স্থানে প্রাচীন জৈন-ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 'এসিয়াটিক সোসাইটী'র পত্রিকায় ডাক্তার ওয়াডেল ঐ স্থানের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থকার মহাশয় বোধ হয় এ বিষয় অবগত নহেন।

গ্রন্থের ১০৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, "খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে কর্ণসুবর্ণ নাম বিলুপ্ত হয়।" ইহার প্রমাণস্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে উক্ত প্রদেশের নাম কর্ণসুবর্ণ বলিয়া কোন গ্রন্থে উল্লিখিত দেখি নাই, তবে কতকটা স্থল 'কানসোনা' নামে উল্লিখিত দেখা যায়।"

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্‌থ্‌সং কর্ণসুবর্ণ প্রদেশের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার পর উক্ত নামের উল্লেখ যদি কোনও স্থানে পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মৌলিক আবিষ্কার বলিয়া গণনা করিতে হইবে। ১০৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—মুসলমানগণের বঙ্গাধিকারের পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত হয়। পত্রে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"লক্ষ্মণসেন লক্ষ্মণাবতী নগর স্থাপন করেন বটে, কিন্তু সমগ্র গৌড় হিন্দুরাজগণের সময়ে লক্ষ্মণাবতী নামে কথিত হইতে দেখি নাই। মুসলমান আমলেই লক্ষ্মণাবতী নামের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার দেখি। সমগ্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির নাম লক্ষ্মণাবতী বলিয়া উল্লেখ নাই। একাংশমাত্র ঐ নামে উল্লেখিত দেখা যায়।" পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির উল্লেখ সেন ও পাল বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে এক নগরও ছিল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থপাঠ করিলে, তিনি ভুক্তির কথা বলিতেছেন

কি নগরীর কথা বলিতেছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে গৌড়নগরী লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত হইয়াছিল। হজরত্ পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম যদি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হয়, তাহা হইলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনও লক্ষ্মণাবতী নামে আখ্যাত হইয়াছিল, স্বীকার করিতে হইবে। মুসলমান-রাজ্যকালেও সমগ্র গৌড়দেশ লক্ষ্ণৌতী নামে পরিচিত ছিল না। আক্‌বরের সময়ে সর্ব্বপ্রথমে 'সরকার লক্ষ্ণৌতী'র উল্লেখ পাওয়া যায়।

গ্রন্থের ১২০ পৃষ্ঠায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের ঐতিহাসিকতার সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারতের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থের আমূল ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা অসমসাহসের কার্য্য। সমগ্র মহাভারতের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে, কি শ্বেতাঙ্গ, কি কৃষ্ণাঙ্গ, অদ্যাপি কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন,—"মহাভারত প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার কোনই কারণ নাই।"—তাহা সহজে বোধগম্য নহে। তিনি স্বয়ং যদি এ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে তিনি সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র।

গ্রন্থের ১২৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে জাতিতত্ত্ব-বিষয় সম্বন্ধে কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়;—

১। যৌধেয় ও যাদব একজাতি।

২। আভীর ও যৌধেয় জাতি পরস্পর প্রতিবাসী ও সম্পর্কিত বলিয়া বোধ হয়।

যৌধেয় ও যাদবগণের মধ্যে সম্পর্ক নির্দ্দেশ করিবার কোনও কারণই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; শব্দসাদৃশ্যই বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমানের মূল। এ স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে যৌধেয় বা যাদবগণের বাসস্থান কোথায় ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। যৌধেয় জাতির নামযুক্ত বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উক্ত জাতির অস্তিত্বের অপর কোনও প্রমাণ পরেশবাবু বোধ হয় দেখেন নাই। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের জুনাগড় শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, যৌধেয় জাতি তৎকর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। হরিসেন-রচিত প্রয়াগের অশোকস্তম্ভগাত্রস্থ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি হইতে জানা যায় যে, যৌধেয় জাতি প্রবলপরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাটের দিগ্বিজয়যাত্রায় বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলায় সুনেত নামক গ্রামে প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি মৃন্ময় শিলা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; ডাক্তার হোর্ণলি এ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।*

আভীর ও যৌধেয় বা যাদব জাতি সম্পর্কিত বলিলে হিন্দুশাস্ত্রের অবমাননা করা হয়। বিষ্ণু, মৎস্য ও বায়ুপুরাণে কণ্ব ও আন্ধ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর যে সমুদয় বর্ব্বর জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিবে বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাদিগের মধ্যে আভীর-জাতি অন্যতম। আভীরগণ চিরকালই ব্রাহ্মণগণের ঘৃণিত ও হেয়। ১০২ শকাব্দে খোদিত ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ বা 'মহাসেনাপতি' আভীর ছিলেন। ইহা দেখিয়া ক্ষোদিত-লিপি-প্রকাশকালে ডাক্তার বুলার অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ

---

* Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 1884, pp. 138—40.

করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আভীর-জাতির সহিত জগদ্বিখ্যাত যাদবগণের সম্পর্ক-নির্দ্দেশ করিতে গেলে হিন্দুশাস্ত্রের অবমাননা করা হয় না কি? কিন্তু ঐতিহাসিক সারসত্যের আলোচনা করিতে গেলে আধুনিক 'শাস্ত্র'সমূহের অবমাননা করিতে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনও আবশ্যক নাই। যে সময়ের কথা লইয়া পরেশবাবু আলোচনা করিতেছেন, সে সময়ে আভীর-জাতি ভারতে আসিয়াছিল, কি মধ্য আসিয়ার মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাদব-জাতির অস্তিত্ব সম্বন্ধে এরূপ কোনও সন্দেহ নাই। যাদব-জাতিভুক্ত কাণ্ক্ষত্রিয়গণ খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধুনদের সাগরসঙ্গমস্থানে বাস করিত। ঐতিহাসিক সারসত্য নিরূপণ করা যত সহজ বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা তত সহজ নহে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বোক্ত পত্রাঙ্কের শেষভাগে লিখিয়াছেন,—"যৌধেয়-জাতির ষড়াননমূর্ত্তিযুক্ত অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও মহাস্থানগড়েও কার্ত্তিকেয়ের মন্দির বিদ্যমান ছিল।" পরেশবাবু বোধ হয় বলিতে চান যে, যে স্থানে কার্ত্তিকেয়ের মন্দির ও যৌধেয়গণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইবে, সে স্থানে নিশ্চয়ই যৌধেয়-জাতির বাস ছিল। যৌধেয় জাতি কখনও বাঙ্গালায় আসিয়াছিল কি না, মুদ্রাতত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া তাহা স্থির করা কঠিন।

গ্রন্থের ১৩০ ও ১৩১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"শ্রবণ বেলগোলার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ভদ্রবাহু মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন।" "এই বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রগুপ্ত ৩৫৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দেরও পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।" বিষয়টি সুকঠিন; মহাবংশ ও জৈন-সূত্রসমূহের মতে বুদ্ধদেব ও মহাবীর বর্দ্ধমানের যে আবির্ভাবকালনিরূপিত হয়, এবং মৌর্য্যবংশীয় রাজগণের যে রাজ্যকাল নির্ণীত হয়, অশোকের শিলালিপি হইতে তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি বিষম আপত্তি উত্থিত হয়। মহাবংশ ও জৈন ঐতিহাসিক মতের অনুসরণ করিতে গেলে অশোককে আলেকজান্দারের সমসাময়িক বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বে অনেকেই এই মতের অনুমোদন করিয়াছেন। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি কাশীর গবের্মেণ্ট কলেজের অধ্যাপক নর্ম্মান সাহেব এ বিষয়ে 'এসিয়াটিক সোসাইটী'র পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। এই মতাবলম্বিগণের প্রমাণ,—বৌদ্ধ ও জৈন ইতিহাস গ্রন্থানুসারে চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক আক্রমণের প্রায় পঞ্চাশবর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী।

শ্রবণ বেলগোলার শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ষষ্ঠ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। (ভদ্রবাহু গ্রীক অভিযানের অন্ততঃ ত্রিংশদ্বর্ষকাল পূর্ব্বে দেহত্যাগ করেন) সুতরাং চন্দ্রগুপ্ত গ্রীক অভিযানের অন্ততঃ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অতএব গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত সান্দ্রাকোটস ও চন্দ্রগুপ্ত কখনই এক ব্যক্তি নহেন। এইরূপ উক্তির উপর বিশ্বাস করিয়াই বোধ হয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন, "অশোকই গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের উল্লিখিত সান্দ্রাকোটস বলিয়া বোধ হয়।" এই মতের বিপক্ষবাদ করিতে গেলে বর্ত্তমানকালে "শ্বেতাঙ্গ-পদচুম্বন-লোলুপ" ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে; আমি তাহা জানিয়াও অগ্রসর

হইতেছি। অশোকের পর্ব্বতশিলালিপি-সমূহের ত্রয়োদশ অনুশাসনে যে পাঁচ জন যোন বা যবন রাজার নাম পাওয়া যায়, আলেকজান্দারের পূর্ব্বে কি তাহাদের নাম শ্রুত হইয়াছিল? কোন্ তুরময়, কোন্ মক, কোন্ আন্তিয়াক মাসিদোনিয়ায় আলেকজান্দারের পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন? সত্য বটে, শ্রবণবেলগোলার ক্ষোদিত লিপিতে চন্দ্রগুপ্তের কালনিরূপণ হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, অশোকের শিলালিপি অপেক্ষা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ক্ষোদিত শ্রবণবেল-গোলার ক্ষোদিতলিপি কি অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য? কতবার জৈন শাস্ত্রসমূহ নূতনাকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভদ্রবাহু ও চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল তাহাই শ্রবণবেলগোলা মন্দিরের স্তম্ভে স্তম্ভে ক্ষোদিত হইয়াছিল। তাহা হইতে সহস্রাধিকবর্ষপূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সত্যাসত্যতা নিরূপণ করিবার চেষ্টা বৃথা। অশোকের শিলালিপির বিরুদ্ধে পূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বিগণ কি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন, তাহা দ্রষ্টব্য ও বিচার্য্য। পত্রোত্তরে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন যে—"পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের সহিত জৈনদিগের গ্রন্থ প্রভৃতির সামঞ্জস্য করা কঠিন। কোনটি গ্রহণ করা যাইবে, তাহা এখনও ঐতিহাসিকদিগের ইচ্ছাধীন। এ বিষয়ের শেষ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে, তাহা আমার বোধ হয় না এ বিষয়ের আরও আলোচনা ও শেষ মীমাংসা হওয়া উচিত।" কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান না করিয়া অন্য মত অবলম্বন করা উচিত কি?

গ্রন্থের ১৩৯ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"সুন্দরবনের অরণ্যময় স্থান কালক বন নামে কথিত হইয়াছে।" প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশিষ্টের পূর্ব্বদিকস্থ গিরিদ্বয়মধ্যবর্ত্তী বন অদ্যাপি কাল্কা জঙ্গল নামে খ্যাত।

গ্রন্থের ১৪১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলেন,—"বর্দ্ধমান বাঁকুড়া বীরভূম প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি শিবলিঙ্গ আছে, তাহা অতিবৃহৎ, এক একটি শিবলিঙ্গ উর্দ্ধে তিন চারি হাত হইবে, এবং চারি পাঁচ জন লোক হাত-ধরাধরি করিয়া বেষ্টন করিলে এই লিঙ্গগুলিকে বেষ্টিত করা যায়। এই লিঙ্গগুলি শকরাজগণের সময়ের বলিয়া বোধ হয়।" পত্রোত্তরে পরেশবাবু জানাইয়াছেন—"শিবলিঙ্গগুলি অতি প্রাচীন এবং শককালের মূর্ত্তিগুলির বিবরণ যেমন অন্যান্য গ্রন্থে দেখিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া অনুমান করিয়াছি মাত্র।" শককালের মূর্ত্তি সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার একখানি ফরাসী ভাষায় ও অপরখানি ইংরাজিতে লিখিত; কিন্তু কোনও গ্রন্থেই এরূপ লিঙ্গের বর্ণনা পাই নাই।

গ্রন্থের ১৪৭ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"গুপ্তগণ অন্ধ্রভৃত্য বলিয়া কোনও কোনও গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।" পত্রোত্তরে গ্রন্থকার জানাইয়াছেন যে,—তিনি বহু বৎসর ধরিয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছেন, পল্লীগ্রামে ঐ সকল গ্রন্থ একত্রে পাওয়া দুষ্কর।" পুরাবৃত্ত-প্রণয়নকালে, অনেক সময় কেবল স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই লিখিত হইয়াছে। পুরাবৃত্ত-সম্পর্কীয় গ্রন্থের অভাব সময়ে সময়ে কলিকাতাতেও বিলক্ষণ অনুভব করিতে হয়, পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই। কিন্তু কথাটি অত্যন্ত গুরুতর। গুপ্তগণ পাটলীপুত্রবাসী ঘটোৎকচ গুপ্ত হইতে উৎপন্ন ও বৈশালীর লিচ্ছবী রাজগণের দৌহিত্র-বংশ। ইঁহারা আর্য্যবংশাবতংস মিশ্র-জাতীয়।

আন্ধ্রাজগণ দক্ষিণাপথবাসী দ্রাবিড়-বংশোদ্ভব ও সম্ভবতঃ অনার্য্য। এতদ্ব্যতীত ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন। আন্ধ্র সাম্রাজ্য অতি প্রাচীন, অশোকের শিলালিপিসমূহে ত্রয়োদশ অনুশাসনে অন্ধ্রগণের নাম পাওয়া যায়,—

ভোজপিতিনিকেষু অন্ধপুলিন্দেষু ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত মৎস্য ও বায়ুপুরাণ হইতে জানা যায় যে, অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ কাণ্বংশীয় ব্রাহ্মণ-রাজগণের পর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অন্ধ্র-সাম্রাজ্য অনুমান ৫০০ শত বর্ষকাল বিদ্যমান ছিল, খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর অর্দ্ধাংশ অতীত হইবার পূর্ব্বে অন্ধ্র সাম্রাজ্যের ধ্বংস হয়। সুতরাং অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্যগণকে গুপ্তগণের নামান্তর বলা বোধ হয় যুক্তিযুক্ত নহে। গ্রন্থকার ফুটনোটটি উঠাইয়া দিতে চাহিয়াছেন; ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে তাহাই করিবেন।

গ্রন্থের ১৮৪ পৃষ্ঠা হইতে জানা যায়,—"ঢাকা জেলার অধীন রায়পুর থানান্তর্গত আসুরফপুর গ্রামে দেবখড়্গের এক তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজ-রাজভট্ট তত্রত্য বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং বৌদ্ধ অমাত্য পুরাদাসের উপর ঐ শাসন-লিপি প্রচারের ভার অর্পিত হয়।"

গত বৎসর স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর আসরফপুরের তাম্রশাসনদ্বয়ের যে উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিযাছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, রাজরাজ দেবখড়্গের পুত্র ও বৌদ্ধ পুরাদাস লেখকমাত্র ছিলেন। রাজপুত্র রাজরাজ কয়েকটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ভরণ পোষণের জন্য উক্ত তাম্রশাসন-দ্বয় দ্বারা কিঞ্চিৎ ভূমিদান করিয়াছিলেন। যথা,—

"শ্রীদেবখড়্গো নরপতিরভবৎ তৎসুতো রাজরাজঃ দত্তং রত্নত্রয়ায় ত্রিভবভয়ভিদা যেন দানং স ভূমেঃ"। "জয়কর্ম্মান্তবাসকাৎ লিখিতং পরমসৌগতপুরাদাসেনেতি।"

গ্রন্থের ২২৯ ও ২৩০ পৃষ্ঠায় সারনাথের ক্ষোদিত লিপির যেরূপ উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত অশুদ্ধ। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বাদশ ভাগে এই ক্ষোদিত লিপির পাঠ প্রকাশিত হইয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই। ২৩০ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার বলিয়াছেন,—"নালন্দ" তিতওয়ারা এবং বুদ্ধগয়ার তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ আছে।" পত্রোত্তরে তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি স্বচক্ষে কোনও তাম্রশাসনই দেখেন নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঐতিহাসিকগণ যাহা লিখিয়াছেন, তদ্দৃষ্টে শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত স্থানত্রয়ে পালরাজগণের কোনও তাম্রশাসন এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বুদ্ধগয়ার দুইটি ও তিতওয়ারা গ্রামের একটি মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, ঐগুলি মহীপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নালন্দের মন্দির হইতে একখণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছে; তাহা হইতে জানা যায় যে, মহীপালের একাদশ রাজ্যাঙ্কে বালাদিত্য নামক এক ব্যক্তি উক্ত মন্দিরের সংস্কার করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই ক্ষোদিত লিপিগুলি সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশ করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি; সুতরাং এ বিষয়ে এখানে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

গ্রন্থের ২৯৩ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার জ্যোতিবর্ম্মা হরিবর্ম্মা প্রভৃতি রাজগণের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। পত্রে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি হরিবর্ম্মার সময়নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু

এ বিষয়ে বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। শূর ও বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণের কালনিরূপণ অত্যন্ত কঠিন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কিরূপে এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর পাইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিলে সাধারণের মহদুপকার সাধিত হইবে। হরিবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন নগেন্দ্রবাবু প্রকাশ করিয়াছেন। ভুবনেশ্বর মন্দিরে আর একখানি শিলালিপি আছে। এতদ্ব্যতীত বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কুলাচার্য্যগণের কুলগ্রন্থসমূহের বিচার আবশ্যক। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে কি নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা জানিতে বোধ হয় অনেকেই উৎসুক হইয়াছেন। আর একটি কথা উপস্থিত করিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব।

গ্রন্থের ৩৩৫ পৃষ্ঠায় বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে কমরুদ্দিন তৈমুর খাঁর পর যে সৈফুদ্দিন উঘনতাত্তের নাম দেখা যায়, তাহার অস্তিত্বের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পত্রোত্তরে গ্রন্থকার জানাইয়াছেন,—তবকাত-ই-নাসিরী, রিয়াজ-উস্-সালাতিন, আইন-ই-আকবরী, কনিংহাম সাহেবের Archaelogical survey reports vol XIV, ষ্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস, মার্সমান সাহেবের ইতিহাস, বিশ্বকোষ প্রভৃতি গ্রন্থ দৃষ্টে মুসলমান সুলতান ও বাদশাহদিগের কাল-নিরূপণ করিয়াছি।” বঙ্গের প্রথম মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের ইতিহাস সম্বন্ধে তবকাত-ই-নাসিরী, অপেক্ষা পূর্ব্বোক্ত অন্য কোনও গ্রন্থই অধিক বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবকাত-ই-নাসিরী অনুসারে তৈমুর খাঁর পর কোন্ও সৈফুদ্দিনেরই নাম পাওয়া যায় না। গ্রন্থের ৩৩০ পৃষ্ঠায় এক সৈফুদ্দিন ও ৩৩৫ পৃষ্ঠায় আর এক সৈফুদ্দিনের নাম পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু সৈফুদ্দিন আয়বক-ই উঘনতাৎ নামক এক জন মুসলমানই সৈফুদ্দিন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে গৃহীত কয়েকটি হস্তী দিল্লীতে প্রেরণ করিয়াছিলন। এই জন্য সুলতান আল্তাম্স্ তাঁহাকে উঘনতাৎ উপাধি দিয়াছিলেন।

বিংশতি বর্ষকাল মফস্বলে থাকিয়া শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বিশাল ঘটনা-রাশি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে এখনও বিলম্ব আছে। কতকগুলি বিষয়ের সুমীমাংসা কখনও হইবে কি না সন্দেহ। অনিশ্চিত বিষয়গুলি সংবাদপত্রে বা মাসিকপত্রে আলোচনা করিয়া পরে গ্রন্থ প্রকাশ করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত বলিয়া আমাদের বোধ হয়। এই হতভাগ্য দেশে মাতৃভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের যদি কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে প্রবীণ ঐতিহাসিক বোধ হয়, আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন।

শ্রীবিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ।

রায় বাহাদুর।

১

অনন্তপুরের মুখোপাধ্যায়গণ ধানী মহাজন্। বংশপতি রমাকান্ত মুখোপাধ্যায় স্থানীয় পাঠান জমীদারের দাওয়ান ছিলেন। তখন দেশের লোক বুঝিত,—ধান্যেই লক্ষ্মী, সকল ঘরেই সঞ্চিত ধান্য থাকিত। মুখোপাধ্যায়ের ঘরে ধান্য কিছু অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে পাঠান জমীদারের অধঃপতন হইয়া গেল; দেশেও নূতন অবস্থায় নূতন ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হইল। গৃহস্থের ঘরে সঞ্চিত ধান্য ফুরাইল—নূতন বাণিজ্যনীতিতে দেশের ধান্য বিদেশে চলিল। তখন রমাকান্তের পৌত্র লক্ষ্মীকান্ত ধান্য দাদন করিতে লাগিলেন। ব্যবসায় প্রসারিত হইতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে লাভও বাড়িয়া উঠিল।

সেই হইতে তিন পুরুষ মুখোপাধ্যায়গণ সেই ব্যবসা চালাইয়া আসিতেছেন। পল্লীগ্রামে বাস—সহরের ব্যয়বাহুল্য নাই; মোটা চাল; কাজেই ব্যয় আয় অপেক্ষা অল্প—ফলে সঞ্চয়। মুখোপাধ্যায়-পরিবারের ভাগ্যে ধান্যে সত্য সত্যই লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইয়াছিল; ধান্য হইতে ক্রমে ভূমিসম্পত্তিলাভ ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমানে মুখোপাধ্যায়গণ সে অঞ্চলে যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী ও সর্ব্বপ্রধান মহাজন।

শ্যামাকান্ত মুখোপাধ্যায় লক্ষ্মীকান্তের প্রপৌত্র। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন—তিনিই বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ। এত দিনে সম্পত্তি প্রভৃতি বহুভাগে বিভক্ত হইয়াছে; কিন্তু শ্যামাকান্তের বিষয়বুদ্ধিবলে তিনি অনেক সরিকের অংশ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। বলিতে গেলে মুখোপাধ্যায়-বংশে তাঁহার অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ছিল।

শ্যামাকান্ত আপনার পল্লীভবনে বসিয়া কেবল সম্পত্তি-বৃদ্ধির উপায় চিন্তা করিতেন; কর্জ্জা টাকার সুদ কসিতেন; ধান্যের বাড়ির হিসাব করিতেন; আর পুত্র রতিকান্তকে বিষয়কর্ম্ম শিখাইতেন। রতিকান্ত জেলার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্যামাকান্ত ব্যয়বাহুল্যভয়ে ও অনাবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে আর পড়ান নাই। রতিকান্ত গৃহে থাকিয়া বিষয়কর্ম্মে পিতার সাহায্য করিতেন।

শ্যামাকান্তের কয়টি অপবাদ ছিল,—কার্পণ্যের অপবাদ তাহার মধ্যে অন্যতম। পৌত্র নলিনীকান্ত ব্যতীত আর কেহ তাঁহার নিকট কিছু অর্থ বাহির করিতে পারিত না। এমন কি, শ্যামাকান্ত ইহাও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নলিনীকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইবেন।

২

শ্যামাকান্ত একরূপ সুখেই জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন; এমন সময় একটি অঘটন ঘটিল। রমাকান্তের এক ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ হীনাবস্থ হইয়া গ্রামে বাস করিতেন। কেবল এক জন ডেপুটী হইয়াছিলেন। তিনি কখনও গ্রামে আসিতেন না; বিদেশেই থাকিতেন।

বহুদিন চাকরীর পর বিদায় লইয়া তিনি কলিকাতায় আসিয়া—কলিকাতাতেই বাড়ী কিনিয়া বাসের চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময় কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া রায়বাহাদুর রমানাথ অনেক চিন্তা করিলেন; একবার ভাবিলেন, কাশীবাসী হইবেন; শেষে অনেক ভাবিয়া তিনি—কি জানি কি মনে করিয়া—পরিত্যক্ত অনন্তপুরে জীবনের শেষ কাল অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

রায়বাহাদুরের কর্ম্মচারী অনন্তপুরে যাইয়া পৈত্রিক গৃহে তাঁহার জীর্ণ অংশ সুসংস্কৃত করিল। পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংস্কারের পর ভবনের সে অংশ নবীন শ্রী ধারণ করিল, এবং জীর্ণ অংশগুলিকে উপহাস করিয়া আপনার অধিকারীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিল।

রমানাথ গ্রামে আসিয়া সকলের সহিত, বিশেষ আত্মীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ, শ্যামাকান্ত বংশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবীণ বলিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিলেন। তিনি আত্মীয়দিগের বিপদে আপদে, রোগে শোকে, তত্ত্ব লইয়া ও যথাসম্ভব সাহায্য করিয়া, সহজেই তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল,—দীর্ঘকাল পরে জীবনের সায়াহ্নে যখন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন,—তখন সেই গ্রামে লোকের আশ্রয় ও সহায় হইয়া তাহাদের উপকার করিবেন। সে উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল।

কিন্তু শ্যামাকান্ত মনে করিতে লাগিলেন, রমানাথ উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন;—গ্রামে তিনিই প্রধান ছিলেন, তাঁহার অধিকারমধ্যে আসিয়া রমানাথ তাঁহার প্রাপ্যের অংশ লইতেছেন। তিনি বিরক্ত হইলেন,

—ক্রমে শঙ্কিত হইলেন। আশঙ্কা যত বাড়াও, ততই বাড়ে। শ্যামাকান্তের আশঙ্কাও কেবল বাড়িয়া চলিল। তিনি পদে পদে আপনার ক্ষমতা খর্ব্ব হইবার সম্ভাবনা দেখিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন,—কি করি?

এক উপায়,—রমানাথকে একঘরে করা। কিন্তু তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে বহুবার আহার করিয়া ও তাঁহাকে স্বগৃহে আহার করাইয়া সে সম্ভাবনার শেষ উপায় নষ্ট করিয়াছেন। বিশেষতঃ, এখন রমানাথ আত্মীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ঠতাসূত্রে বদ্ধ—এতকাল পরে সে চেষ্টা করা নির্ব্বোধের কার্য্য। শ্যামাকান্ত আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন,—এবং আপনার অক্ষমতায় আপনিই ক্লিষ্ট হইতে লাগিলেন। গ্রামে তাঁহার অসীম ক্ষমতায় এই প্রথম আঘাত; আঘাতও প্রবল। জীবনের শেষ দশায় এ আঘাত নিতান্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

ইহার উপর যখন থানার নূতন দারোগা মোকর্দ্দমায় শ্যামাকান্তকে কিছু না বলিয়া কেবল রমানাথেরই পরামর্শ লইতে আরম্ভ করিলেন, তখন শ্যামাকান্ত ভাবিলেন,—সিংহাসন আর থাকে না। তিনি পুত্রকে ডাকিলেন,—পিতা-পুত্রে সিংহাসন-রক্ষার পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

৩

রতিকান্ত স্বভাবতঃই অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। এখন আবার আবশ্যক হেতু তিনি বিশেষভাবে পিতার অনুগ্রহপ্রার্থী। তাঁহার পুত্র নলিনীকান্ত সেবার প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; তাহাকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে—সে বিষয়ে পিতার সম্মতি আবশ্যক। শ্যামাকান্ত পুত্রকে ডাকিয়া প্রথমে সেই কথাই বলিলেন,—"নলিনীকে কলিকাতায় পাঠাইতে হইবে।" তখন তাঁহার ইচ্ছা,—পৌত্র বিদ্যার্জ্জন করিয়া ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট হইবে।

পিতাকেই এই প্রস্তাব করিতে দেখিয়া রতিকান্ত যেমন বিস্মিত—তেমনই প্রীত ও আনন্দিত হইলেন।

এই কথার পর শ্যামাকান্ত অন্য কথার উত্থাপন করিলেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইলেন, গ্রামে তাঁহাদের মান, সম্ভ্রম, প্রতাপ ও প্রভাব রমানাথের আগমনে বিপন্ন হইয়াছে;—অবিলম্বে ইহার উপায় করা আবশ্যক। গ্রামের লোক তাঁহার বশ হইয়াছে—দারোগাও তাঁহার পরামর্শে পরিচালিত; দুই দিন পরে প্রজারা ও খাতকগণও রমানাথের নিকট যাইতে আরম্ভ করিবে।

আসন্ন বিপদের অনিবার্য্য সম্ভাবনার কথা পুত্রকে বুঝাইয়া শ্যামাকান্ত বলিলেন,—"উহার ক্ষমতার কারণ,—ঐ উপাধি,—লোক উহাতেই ভুলিতেছে।"

রতিকান্ত বলিলেন,—"তা বটে।"

শ্যামাকান্ত বলিলেন,—"ইহার একমাত্র উপায়,—তোমাকে 'রায়বাহাদুর' হইতে হইবে।"

রতিকান্ত বিস্মিতনেত্রে পিতার দিকে চাহিলেন।

শ্যামাকান্ত বলিলেন,—"সব পয়সার খেলা। আমি যত আবশ্যক, ব্যয় করিব;—দেখি, তোমাকে 'রায়বাহাদুর' করিতে পারি কি না।"

রতিকান্ত কথাটা বুঝিতে পারিলেন না।

৪

শ্যামাকান্ত সত্য সত্যই পুত্রকে 'রায়বাহাদুর' করিবার জন্য যত আবশ্যক ব্যয় করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কখনও জেলার সদরের সঙ্গে তাঁহার মোকদ্দমা ও লাটের খাজনা দাখিল ব্যতীত সম্বন্ধ ছিল না;—এখন তিনি সদরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতাইতে লাগিলেন। ছোটলাটের সফরের সময় তিনি উপযাচক হইয়া চাঁদা পাঠাইলেন;—কমিশনার আসিলে পুত্রকে পাঠাইলেন। লোকালবোর্ডে পুত্রকে পাঠাইতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত সে থানায় নির্ব্বাচনই হইত না। এবার শ্যামাকান্ত বিশেষ উৎসাহের সহিত 'ভোট' সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। রতিকান্ত বোর্ডের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। তাহার পর শ্যামাকান্ত পুত্রকে অবৈতনিক বিচারক করিবার প্রয়াসী হইলেন। কথাটা তিনি রমানাথের নিকট গোপন রাখিতে চাহিলেন; ভয়,—পাছে রমানাথ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া রমানাথ বৈতনিক ও অবৈতনিক উভয়বিধ চাকরীর উপরই বিতৃষ্ণ হইয়াছিলেন; রতিকান্তকে ইচ্ছুক জানিয়া তিনি স্বয়ং চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে অবৈতনিক বিচারক ও জেলাবোর্ডের সভ্য করিয়া দিলেন। শ্যামাকান্ত মনে করিলেন,—রমানাথ কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য এ মিত্রতা—এ উদারতা দেখাইতেছেন।

সে যাহাই হউক, রতিকান্ত সফলকাম হইয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘন ঘন সেলাম করিবার শুভ অবসর পাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও বাড়িয়া উঠিল। শুধু 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না'—বিনাব্যয়ে উপাধিলাভ ঘটে না।

এই ভাবে দুই বৎসর কাটিল। নলিনী এফ্ এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইল।

এমন সময় পুত্রকে 'রায়বাহাদুর' লক্ষ্যের মধ্যপথে রাখিয়া শ্যামাকান্ত লোকান্তরে গমন করিলেন।

শ্যামাকান্ত যখন লোকান্তর গমন করিলেন, তখন রতিকান্তের হৃদয়ে পিতার রোপিত বিষবৃক্ষ ফলবান হইয়াছে। পুত্রের হৃদয়ে তখন 'রায়বাহাদুর' হইবার বাসনা প্রবল নেশার মত হইয়া উঠিয়াছে।

৫

পিতামহের শ্রাদ্ধের পর নলিনীকান্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। তখন বঙ্গ-বিভাগের ফলে বঙ্গদেশে ধূমায়িত অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কলিকাতার রাজপথ "বন্দেমাতরম্" গানে মুখরিত। সমস্ত বঙ্গদেশ নবীন জীবনে জাগিয়া আপনাকে নবীন শক্তিতে শক্তিশালী বুঝিতে পারিতেছে। যাঁহারা দীর্ঘকাল স্বদেশহিতৈষণার দোহাই দিয়া রাজনীতির ধূলা লইয়া আবির খেলিয়াছেন,—সাধা গলার বাঁধা সুরে ইংরাজের রাজদরবারে দূতীগিরি করিয়াছেন,—'গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মণ্ডল'-রূপে দেশের প্রতিনিধি বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা তখন দেশের নূতন ভাব দেখিয়া, শ্যাম রাখেন কি কূল রাখেন ভাবিয়া, দুই-ই রাখিবার চেষ্টায় কপটতা দেখাইতেছেন। জাতীয় জীবনের অরুণোদয়ে কেহ কেহ আপনার ধর্ম্মমত বা রাজ-নৈতিক মত দেশে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। তখন স্বার্থলেশশূন্য তরুণহৃদয় উৎসাহী যুবকগণ বৃদ্ধদিগের শঙ্কিত দ্বিধা ও কাপুরুষোচিত বিচার উপেক্ষা করিয়া নূতন জাতীয় জীবনের তূর্য্যধ্বনি ধ্বনিত করিতেছে;—দেশের লাঞ্ছিত ললাটে গৌরবের টীকা দিতেছে।

নলিনী সেই যুবকদিগের মধ্যে এক জন। সে সোৎসাহে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিল। বাধা, বিঘ্ন, বিপদ তুচ্ছ করিয়া সে স্বদেশী আন্দোলন করিতে লাগিল। তাহার পর যখন স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান হেতু মফঃস্বলে ছাত্রদল লাঞ্ছিত হইতে লাগিল, তখন সে বিদ্যালয় ছাড়িয়া দিল।

ইহার পর স্বদেশীপ্রচারের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইতে লাগিল; পল্লীপ্রাণ বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে স্বদেশী প্রচারকল্পে যুবকগণ কৃতসঙ্কল্প হইল। নলিনীকান্ত আপনার গ্রামে গমন করিল।

পিতাপুত্রে প্রথম সাক্ষাতে পিতা বিদ্যালয়-ত্যাগ ও অনাবশ্যক 'হুজুকে' যোগদানহেতু পুত্রকে তিরস্কার করিলেন। নলিনী পিতার কথায় কোনও প্রতিবাদ করিল না; কিন্তু সঙ্কল্প অটল রহিল। তাহার জননীও তাহাকে অনেক বুঝাইলেন। নলিনী তাঁহাকে আপনার মত বুঝাইল। এই সময় নলিনীর একমাত্র ভগিনী শ্বশুরালয় হইতে পিত্রালয়ে আসিল। তাহার স্বামী উকীল—স্বদেশী আন্দোলনের সহায় ও নেতা। নির্ম্মলা দাদার পক্ষ লইল। এ স্থলে জননীর পক্ষে আর বিরুদ্ধমত অবলম্বন করা অসম্ভব। সহজেই জননী পুত্র-কন্যার পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট আর এক রূপ গড়িতেছিলেন। অনন্তপুরের বাজারে 'স্বদেশী' প্রচারিত হইতেছে,—বিদেশী দ্রব্যের বিক্রয় হইতেছে না, এ সংবাদ দারোগার দপ্তর হইতে ক্রমে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পঁহুছিল। ফলে সহসা থানায় সংবাদ আসিল, অচিরে গ্রামে ম্যাজিষ্ট্রেটের আবির্ভাব হইবে। হইলও তাহাই। স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সরেজমীন তদন্তে আসিয়া হাজির হইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসিয়া সবিশেষ শুনিলেন,—বাজারের মহাজনদিগকে ডাকাইলেন, তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন। রতিকান্ত কিছুক্ষণ পূর্ব্বে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সেলাম করিতে আসিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে অপেক্ষা করাইতেছিলেন। সর্ব্বশেষে তাঁহাকে ডাকিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সর্ব্বসমক্ষে বলিলেন, "দেখা যাইতেছে, সম্পূর্ণ দোষ আপনার।"

রতিকান্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "আমি নিরপরাধ,—পুত্র আমার অবাধ্য।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি এ সব অযৌক্তিক কৈফিয়ৎ শুনিতে আসি নাই। পুত্র কি স্বয়ং উপার্জ্জন করিয়া থাকে? গৃহ কি তাহার?"

রতিকান্ত নিরুত্তর রহিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "দেশ ইংরাজের—আপনার বা আপনার পুত্রের নহে। আমি সাত দিন সময় দিতেছি। ইহার মধ্যে আপনি প্রতিকার করেন ভাল, নহিলে আমি প্রতিকার করিব।"—তিনি মহাজনদিগকে বলিলেন, "জমীদার যদি কোনও অত্যাচার করে—সরকার তাহার ব্যবস্থা করিবেন।"

অপমানিত রতিকান্ত গৃহে ফিরিতে ফিরিতে স্থির করিলেন,—বালকের

অবিমৃষ্যকারিতায় তাঁহার বহুযত্নসংগঠিত কীর্ত্তিমন্দির কিছুতেই নষ্ট হইতে দিবেন না।

তিনি গৃহে ফিরিয়া পুত্রকে যথেষ্ট গালি দিলেন। নলিনী মর্ম্মাহত হইল, কিন্তু কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেইদিন অপরাহ্ণেই নলিনী বাজারে সভা ডাকিয়া স্বদেশী প্রচার করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা দেখিলেন।

সেই দিন রাত্রিকালে ম্যাজিষ্ট্রেট সদরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে সভার সংবাদ শুনিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট যত না রুষ্ট হইয়াছিলেন—রতিকান্ত তত রুষ্ট হইলেন। তিনি পুনঃ পুনঃ নলিনীকে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন। নলিনী ফিরিয়া আসিলে পিতা বলিলেন,—"দূর হও। আমার গৃহে তোমার স্থান নাই।"

নলিনী তখনও ভাবস্রোতে ভাসমান;—আর দ্বিরুক্তি করিল না। সে জননীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল।

মা কাঁদিতে লাগিলেন।

নলিনী ফিরিল না।

গৃহ হইতে বাহির হইয়া নলিনী কেবল মার জন্য ব্যথিত হইল, মনকে সান্ত্বনা দিল—যত দিন সে সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা, বঙ্গে, ততদিন সে মাতৃ-অঙ্কে।

প্রভাতে ম্যাজিষ্ট্রেটকে পুত্রবর্জ্জন কীর্ত্তির কথা অবগত করাইতে রতিকান্ত সদরে যাত্রা করিলেন।

নলিনীর জননী মর্ম্মব্যথায় অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

৬

নলিনী যখন চলিয়া গেল, নির্ম্মলারও তখন আর থাকিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু মার অবস্থা দেখিয়া সে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু কিছু দিন পরে সেও শ্বশুরালয়ে চলিয়া গেল। নলিনীর জননী সেই শূন্য গৃহে—শূন্যহৃদয়ে বাস করিতে লাগিলেন। প্রবাসী পুত্রের জন্য জননীর হৃদয় সর্ব্বদাই ব্যথিত হইত। তাঁহার দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র কলিকাতায় থাকিত। তাঁহারা নলিনীর সংবাদ দিত।

শরতে প্রকৃতি যখন মেঘালোকে ক্রীড়াশীলা চঞ্চলার প্রকৃতি ধারণ করিল, সেই সময়, নলিনীর জননীর জ্বর হইল। তিনি মনে মনে

দেবতাকে ডাকিলেন,—এইবার যেন আমার সকল জ্বালার অবসান হয়। রতিকান্ত তখন আপনার জমীদারীতে স্বদেশী দলনে ব্যস্ত, সর্ব্বদা সদরে গতায়াত করেন। গৃহের সন্ধান লইবার সময় কোথায়? পত্নীর পীড়ায় ডাক্তার ডাকাইয়া তিনি ভাবিলেন, যথেষ্ট হইল,—যথারীতি চিকিৎসা হইবে।

বসন্তের শেষে জ্বর সারিল, কিন্তু আবার বর্ষার বারিপাতের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল। দেহ অস্থিচর্ম্মসার—বলহীন হইয়া আসিল। শেষে এমন দাঁড়াইল যে, রতিকান্তও ভীত হইলেন। তিনি পত্নীকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। নলিনীর সহিত সাক্ষাতের আশায় রোগিনী তাহাতে আপত্তি করিলেন না।

৭

মা কলিকাতায় আসিতেছেন,—তাঁহার শরীর অসুস্থ। নলিনী স্থির করিল, মা'র কাছে যাইবে;—পিতার উপর ক্রোধও যেন মিলাইয়া গেল। একদিন সে ভাবিতে ভাবিতে একটি সভায় যাইতেছে,—এমন সময় অদূরে গোল শুনিয়া সেই দিকে গেল। কয়টি বালক একটি দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ক্রেতাদিগকে বিদেশী বর্জ্জন করিতে বলিতেছিল। দোকানদার পুলিসে সংবাদ দিয়াছিল;—পুলিস আসিয়া বালকদিগকে ধরিয়াছে। নলিনী বালকদিগের পক্ষ হইয়া তাহাদিগের গ্রেপ্তারে আপত্তি করিল। পুলিস কড়া কথা বলিল;—কথায় কথায় হাতাহাতি হইল। শেষে কয় জন পাহারাওয়ালা নলিনীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।

পরদিন বিচারে তাহার বেত্রাঘাত দণ্ড হইল।

যুবকের কোমল অঙ্গ বেত্রধারীর বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইল; কিন্তু তাহার মুখে যন্ত্রণাসূচক শব্দমাত্র বাহির হইল না।

যে দিন এই ঘটনা ঘটিল, সেই দিন রতিকান্ত পীড়িতা—মৃত্যুমুখগতা পত্নীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন।

৮

কলিকাতায় আসিয়া পরদিনই নলিনীর মাতার পীড়ার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। দুর্ব্বল শরীরে পথশ্রম সহিল না। ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি কোনও আশা দিতে পারিলেন না।

রতিকান্ত আপনার কলিকাতায় যাত্রার সংবাদ ম্যাজিষ্ট্রেটকে

দিয়া আসিয়াছিলেন। সে সংবাদ কলিকাতায় রাজকর্ম্মচারী-মহলে পঁহুছিয়াছিল।

অপরাহ্নে—যখন দিনান্ত-তপন পশ্চিমমেঘে স্বর্ণ বিলাইতেছিল,—সেই সময় এক জন চাপরাশী খুঁজিয়া খুঁজিয়া রতিকান্তের গৃহে উপনীত হইল; জিজ্ঞাসা করিল,—"এই কি অনন্তপুরের রতিকান্ত মুখোপাধ্যায়ের বাসা?" ভৃত্য বলিল,—"হাঁ।"

চাপরাশী ভৃত্যকে একখানি পত্র দিয়া বলিল, "বাবুকে দাও—বড় জরুরী পত্র।"

রতিকান্ত তখন পত্নীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন;—পত্নীর শীর্ণ আননে মৃত্যুর গাঢ় ছায়া ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছিল।

ভৃত্য আসিয়া পত্র দিল।

রতিকান্ত পত্র খুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে সংবাদ ছিল,—তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই। তিনি 'রায় বাহাদুর' খেতাব পাইয়াছেন;—তিন দিন পরে গেজেটে সে সংবাদ প্রকাশিত হইবে।

পত্রখানি পাঠ করিয়া রতিকান্তের মনে একবার আনন্দালোক বিকশিত হইল। কিন্তু মৃত্যুর অন্ধকারে আনন্দালোক বিকশিত হইবার অবকাশ পায় না। তিনি পত্রখানি রাখিয়া দিলেন।

এ দিকে চাপরাশী সুসংবাদ আনিয়াছে বলিয়া বক্‌সিসের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কর্ম্মচারী বলিল, বাটীতে গৃহিণী মরণাপন্না—আর এক দিন আসিয়া বক্‌সিস লইও। সে শুনিল না। শেষে কর্ম্মচারী তাহাকে একটি টাকা দিতে গেল। চাপরাশী অবজ্ঞাভরে তাহা ফিরাইয়া দিয়া বলিল,—আমি দশ টাকার কম লইব না। কর্ম্মচারী যতই গৃহে বিপদের কথা বলিতে লাগিল,—চাপরাশীর ক্রোধ ও কণ্ঠস্বর ততই বাড়িতে লাগিল। সরকারের চাপরাশী আপনাকে মৃত্যুর অপেক্ষা বলবান্ মনে করে।

এমন সময় গৃহদ্বারে জনতার কোলাহল ও 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি ধ্বনিত হইল।

যুবকগণ সভা করিয়া নলিনীকে অভিনন্দন করিয়াছিল। সভাভঙ্গের পর নলিনী মাতৃদর্শনে আসিতেছিল; জনতাও সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। শকটে মাল্যদাম-ভূষিত নলিনী—আর সেই শকট ঘিরিয়া 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে করিতে বিপুল জনতা।

শকট গৃহদ্বারে স্থির হইল। কয় জন বন্ধু বেত্রাঘাতব্যথিতদেহ নলিনীকে ধরিয়া নামাইল।

চাপরাশী বেগতিক দেখিয়া চলিয়া গেল।

৯

পুত্রকে দেখিয়া মার মৃত্যু অন্ধকার-ছায়া-মলিন নয়ন একবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল;—পাণ্ডুমুখে একবার আনন্দকিরণ ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল।

নলিনী কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল,—"মা!"

জননী তাহাকে বসিতে ইঙ্গিত করিবার চেষ্টা করিলেন।

জননীর পার্শ্বে বসিয়া নলিনী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল; বিন্দু বিন্দু অশ্রু জননীর রুক্ষ কেশে ও পাণ্ডু আননে পড়িতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধ্যার কিছু পরে পতি, পুত্র ও কন্যা রাখিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন।

১০

পত্নীর চিতাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রতিকান্ত ভাবিতে লাগিলেন। সেই চিতালোকে তাঁহার মনের অন্ধকার যেন অপনীত হইল। তিনি পত্নীর অকাল-মৃত্যুর জন্য আপনাকে দায়ী বোধ করিলেন। তাঁহার মনের বিষম যন্ত্রণায় নয়নের অশ্রু শুষ্ক হইয়া গেল।

শ্মশান হইতে রতিকান্ত যখন গৃহে ফিরিলেন, তখন প্রভাত হইয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মৃতপত্নীর শয্যায় জননীবিয়োগ-বিধুরা কন্যা কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

তাঁহার যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া উঠিল।

তিনি সর্ব্বাগ্রে পূর্ব্বদিন-প্রাপ্ত পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কর্ম্মচারীরা ভাবিল, পত্নীর মৃত্যুও তাঁহাকে 'রায়বাহাদুরী' নেশা ছাড়াইতে পারিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পত্রে তিনি আপনার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে দুই দিন পরে প্রকাশিত 'রায় বাহাদুরে'র তালিকায় রতিকান্তের নাম প্রকাশিত হইল না।

* * * *

তাহার পর পিতাপুত্র এক সঙ্গে অনন্তপুরে গমন করিলেন। নির্ম্মলাও আসিলেন। রতিকান্ত পুত্র ও কন্যার নিকট আপনার ভ্রমের কথা বলিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই অনন্তপুর স্বদেশী প্রচারের একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

গ্রীক-লিখিত ভারত-বিবরণ। *

—:*:—

অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের সহিত গ্রীসের পরিচয় হইয়াছিল। বহুসংখ্যক গ্রীক লেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই সকল বিবরণের অধিকাংশই অতিরঞ্জনদুষ্ট। বৈদেশিক গ্রীক লেখকগণের রচনায় ভারতবর্ষের স্থানসমূহের নাম বিকৃতি-প্রাপ্ত হইয়াছে; আধুনিক পাঠকগণের পক্ষে ঐ সকল স্থান চিহ্নিত করা দুরূহ। যাহা হউক, এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা গ্রীক-লিখিত বিবরণ হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি।

যে সকল গ্রীক লেখক ভারতবর্ষের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। গ্রীকবীর বিশ্ববিখ্যাত আলেকজাণ্ডার খৃষ্টপূর্ব্ব ৩২৬ অব্দে সসৈন্যে ভারতবর্ষে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের লেখকগণের মধ্যে কেহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই; ভারতভ্রমণকারিগণের সঙ্কলিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়াই তাঁহারা আপনাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তার পর আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে বহুসংখ্যক গ্রীকপণ্ডিত ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অবস্থিতিকাল অত্যল্প ছিল বলিয়া, তাঁহারা সুবিস্তীর্ণ স্থানে পর্য্যটন করিয়া ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। এই সমস্ত প্রতিকূল বিষয় বিবেচনা করিলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্যই আমাদের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ কর্ত্তব্য।

আলেকজাণ্ডারের পূর্ব্ববর্ত্তী চারি জন গ্রীক লেখকের ভারত-বিবরণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহাদের নামোল্লেখ করিতেছি।

স্কাইলাক্স;—ইনি সিন্ধুনদবিধৌত নিম্ন প্রদেশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

---

* 1. Ancient India--W. M'cRindle.

2. Ancient India, its Invasin By Alexander the Great.—W. M'c-Rindle.

3. India as known to Ancient and Mediæval India.—P. Ghosh.

হিকাটোস; ইনি ভারতবর্ষের ভূগোল-বৃত্তান্তের লেখক; ইঁহার গ্রন্থে সিন্ধু (Indus) প্রভৃতি নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিরোডোটাস;—হিরোডোটাস ইতিহাস-লেখকথকুলের আদিপুরুষরূপে পরিচিত।

টিসিয়াস;—টিসিয়াস পারস্য-রাজসভায় চিকিৎসা উপলক্ষে অবস্থিতি করিতেন।

টিসিয়াসের সময়ের ন্যূনাধিক সত্তর বৎসর পরে মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। গ্রীকবীরের এই আক্রমণের কালে যে কেবল তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যের খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে, তাহা নহে; তাঁহার যত্নে ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্বার বৈদেশিকগণের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, এবং মানবজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত হয়। আলেকজাণ্ডার নিজে এক জন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন; তদীয় সহচর-বৃন্দের অনেকে নানা বিদ্যায় বিশারদ বলিয়া লব্ধপ্রতিষ্ঠ ছিলেন। এই সকল সহচরের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় প্রভুর দিগ্বিজয়ের বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গ্রীক-অধ্যুষিত গ্রীকগণের আগমন কালে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, সেই সকল গ্রন্থে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা ঐ সমুদায় লেখকের নামোল্লেখ করিতেছি। টলেমি, আরিষ্টোবুনাস, নিয়ারকাস, অনেসিক্রিটাস, ইউমেনেস, চারেস, কালিসথেনিস, ক্লিটুরকাস, পলিক্লেইটাস, এনাক্সিমেনিস, ডায়োগনিটাস, বিটন, কিরসিলাস প্রভৃতি। আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী কালে তিন জন প্রসিদ্ধ গ্রীকপণ্ডিত রাজদূতপদে বৃত হইয়া ভারতবর্ষে পাটলিপুত্রের রাজদরবারে আগমন করিয়াছিলেন; সিরিয়ার রাজদরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত মেগাস্থিনিস ও দেইমাকস ও মিশর-রাজদরবার কর্ত্তৃক প্রেরিত দিওনিসিয়াস, এই তিন জন ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী কালের আর দুই এক জন গ্রীক লেখক দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিয়া স্বচক্ষে ভারতীয় সভ্যতার যে চিত্র দেখিয়াছিলেন, তাহাই আপনাদের গ্রন্থে অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। এই তিন জন রাজদূতের মধ্যে মেগাস্থিনিস চিরকালের জন্য কীর্ত্তি-মন্দিরে স্থান লাভ করিয়াছেন; অপর দুই জনের নাম বিদ্বৎসমাজে তাদৃশ পরিচিত নহে। মেগাস্থিনিসের বর্ণনা অধিকাংশ স্থলেই সত্যানুমোদিত ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ভারতবর্ষের সীমা ও অবস্থান, আকার ও আয়তন, প্রাকৃতিক

দৃশ্য ও জল-বায়ুর অবস্থা ও জনসমূহের আচার-ব্যবহার ও স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধীয় তথ্য সকল সত্যপ্রিয় মেগাস্থিনিসের লিখিত গ্রন্থ দ্বারাই ইউরোপ প্রভৃতি স্থানে প্রচারিত হইয়াছিল।

কেবল উত্তর-ভারত, অর্থাৎ কাবুল ও পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশের সঙ্গে আলেকজাণ্ডার ও তদীয় সহচরগণের পরিচয় ঘটিয়াছিল; কিন্তু মেগাস্থিনিস তদপেক্ষা বিস্তৃত স্থানের পরিচয় লাভ করেন। কারণ, তিনি শতদ্রু উত্তীর্ণ হইয়া সিন্ধু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া অনুগাঙ্গ-প্রদেশস্থিত প্রসিদ্ধ মৌর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হন। এই স্থানে মেগাস্থিনিস সুদীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলেন। এই সময়মধ্যে তিনি অনেকবার মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন; সম্ভবতঃ তাঁহার মহিষীরও দর্শনলাভ করেন। ইনি তদীয় প্রিয়বন্ধু সিরিয়াধিপতি সেলুকাসের দুহিতা ছিলেন। পাটলিপুত্র নগরে অবস্থিতিসময়েই মেগাস্থিনিস তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও অনুসন্ধিৎসাবলে ইণ্ডিকা নামক ভরতবর্ষসম্বন্ধীয় সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থে লিপিকুশলতা, তীক্ষ্ণদর্শিতা ও অনুসন্ধাননিপুণতা এত সুস্পষ্ট যে, ইহা ভ্রম-প্রমাদশূন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গণ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালের লেখকগণ প্রধানতঃ এই গ্রন্থ হইতেই তাঁহাদের ভারত-বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। ষ্ট্রাবো মেগাস্থিনিসকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার বহু স্থলে প্রমাণস্বরূপেও তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন! বর্ত্তমানকালেও মেগাস্থিনিস সত্যপ্রিয় লেখকরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন; তিনি ভারতীয়গণের আচার ব্যবহার, সমাজানুশাসন প্রভৃতির যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা যথাযথ বলিয়া আধুনিক অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত হইয়াছে। মেগাস্থিনিস লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতের কয়েক জাতীয় লোকের দেহ দানবতুল্য প্রকাণ্ড; তাহাদের আকৃতি এত দূর কদর্য্য যে, তাহা মানব-দেহে সম্ভবপর নহে। এই বর্ণনাই ষ্ট্রাবোর মেগাস্থিনিসকে আক্রমণ করিবার প্রধান কারণ। সংস্কৃত সাহিত্যে ঐ সকল জাতীয় লোকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়; মেগাস্থিনিস কেবল স্থানে স্থানে নামের পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় ভাষার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ঐ সকল উপাখ্যান তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে; ভারতবাসীদিগের নিকট হইতেই তৎসমুদয় সংগৃহীত হইয়াছে। যে সকল আর্য্য ভারতবিজয় করিয়াছিলেন,

ইঁহারা তাঁহাদেরই উত্তরপুরুষ। ভারতীয় আর্য্যগণ আদিম অধিবাসী-দিগকে ঘৃণা করিতেন; কারণ, তাহারা তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইয়া ছিল।

দেইমাকসও ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহা এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেইমাকসের গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দেইমাকস স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের আয়তন অতিরঞ্জিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া-ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সে সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় নাই। দিওনিসিয়াস আর এক জন গ্রন্থকার। তাঁহার গ্রন্থও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্লিনি বলেন, টলেমি ফিলাডেলফস তাঁহাকে রাজদূতপদে বরণ করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। দিওনিসিয়াসও মেগাস্থিনিসের ন্যায় ভারতীয় সৈন্যের পরিমাণ স্বদেশে লিখিয়া পাঠান।

মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ লিখিত হইবার কিছু কাল পরে পেট্রোক্লিস একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এই গ্রন্থে কেবল এ দেশের বিবরণই লিপিবদ্ধ হয় নাই; সিন্ধুতীর হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত প্রসারিত ভূভাগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। পিট্রোক্লিস, সেলুকাস, নিকেটার ও প্রথম এণ্টিওকাসের প্রতিনিধিরূপে এই ভূভাগের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ষ্ট্রেবো অনেক স্থলে প্রমাণস্বরূপে পিট্রোক্লিসের উল্লেখ করিয়া তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার প্রশংসা করিয়াছেন।

ইরাটোস্থিনিস পিট্রোক্লিসের গ্রন্থের সবিশেষ প্রশংসা করেন। তদীয় গ্রন্থের অনেক অংশও উহা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৪০ অব্দ পর্য্যন্ত ইরাটোস্থিনিস আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগারের অধ্যক্ষ ছিলেন। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর অসংবদ্ধ ভৌগোলিক তত্ত্ব-সমূহ সংগ্রহ ও তৎসমুদয় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জীকৃত করিয়া, তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভূবিদ্যাকে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত করেন। কিন্তু ভারতের আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা যথার্থ নহে। তিনি মনে করিতেন যে, ভারতোপদ্বীপের অগ্রভাগ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে প্রসারিত, দক্ষিণদিগভিমুখী নহে; এমন কি, গঙ্গানদীর মুখ অতিক্রম করিয়াও কিয়দ্দূর পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই স্থানে তিনি পিট্রোক্লিস-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করেন নাই। অধিকন্তু তিনিও হিরোডোটাসের ন্যায় মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষ পৃথিবীর শেষসীমায় সমুদ্রের তীরে অবস্থিত।

ইরাটোস্থিনিসের পর পলিবিয়সের নাম উল্লেখযোগ্য। পলিবিয়স খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৪ অব্দে স্বীয় ইতিহাস প্রণয়ন করেন। তাঁহার পুস্তকে সেলুকাস-বংশীয় নরপতিগণের সমসাময়িক ভারতের অনেক মূল্যবান্ তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই গ্রন্থের অধিকাংশ পরিচ্ছেদই লোপ পাইয়াছে।

পলিবিয়সের পর যে লেখক ভারত-বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন. তাঁহার নাম আরটিমিডোরাস; ইনি ইকিসাস-বাসী ছিলেন। খৃষ্টের জন্মের শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। আরটিমিডোরাস একখানি ভূগোল প্রণয়ন করেন। সম্ভবতঃ তিনি কোনও অপ্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে ভারত-সম্পর্কীয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সংগৃহীত অনেক বিবরণ ভ্রমসঙ্কুল। অধিকাংশ লেখকই এই ভ্রম করিয়াছেন যে, গঙ্গানদী পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিতা; আরটিমিডোরাস কিন্তু এই ভ্রমে পতিত হন নাই।

এই সকল গ্রন্থের আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মেগাস্থিনিসের পর ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে ইউরোপের জ্ঞানভাণ্ডার সবিশেষ বর্দ্ধিত-কলেবর হইতে পারে নাই। আমাদের বিবেচনায় পার্থিয়ান শক্তির অভ্যুদয়ই ইহার কারণ। পার্থিয়া, সিরিয়া ও তদধীন পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী রাজ্যসমূহের মধ্যে অবস্থিত থাকায় পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বিতীয় এণ্টিওকাসের রাজত্বকালে এ সকল স্থান অধীনতা-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে।

এই কারণে পূর্ব্বদেশ প্রতীচ্যদেশ হইতে এত দূর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক দেশে যাহা ঘটিত, অন্য দেশের লোক তাহা জানিতে পারিত না। এই অজ্ঞানতা কি প্রকার গভীর ছিল, আমরা তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর অনুসন্ধানফলে জানা গিয়াছে যে, কোনও কোনও ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক নরপতি নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ঈদৃশ গুরুতর ঘটনাও ইউরোপীয়গণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। উত্তর-আফগানিস্থানেও বাক্ট্রিয়ার ঐ সকল নরপতির নামাঙ্কিত মুদ্রা বহুলপরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ এই সকল মুদ্রা ও প্রাচীন সাহিত্যিকগণ আপনাদের গ্রন্থের দুই এক স্থলে প্রসঙ্গতঃ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তদবলম্বনেই পুরাতত্ত্ববিদ্ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

যাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভারতবর্ষের কথা অবগত ছিলেন, দুঃখের বিষয়, তন্মধ্যে এক হিরোডোটাস ভিন্ন আর কোনও লেখকের গ্রন্থই বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে যে সকল অংশ স্ব স্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কেবল তাহাই এখন বিদ্যমান।

এক্ষণে আমরা তৃতীয়-শ্রেণীস্থ গ্রীক লেখকগণের বিষয় উল্লেখ করিতেছি। খৃষ্টের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী কালে যে সকল লেখকের উদ্ভব হইয়াছিল, তাঁহারাই এই শ্রেণীভুক্ত।

এক বিষয়ে খৃষ্টের আবির্ভাবের পরবর্ত্তী লেখকগণের সহিত তাঁহাদের পূর্ব্বগামিগণের, অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের যুগের লেখকগণের প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় যুগের দুই এক জন ব্যতীত আর কাহারও সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে এ দেশের সহিত পরিচয় ঘটে নাই। Periplus of the Erthyrean Sea নামক গ্রন্থের প্রণেতা ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যক্ষেত্র সকল দর্শন করেন। কসমাস ইণ্ডিকো প্লিসটিস সিংহল দ্বীপ ও মালাবার উপকূলে আগমন করেন। এই দুই জন লেখক ব্যতীত আর কেহ ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ভারত-বাণিজ্যলিপ্ত বণিক্, ভারত ভ্রমণকারী, রোম ও কনস্তান্তিনোপলের রাজদরবারে সমাগত ভারতবর্ষীয় রাজদূত ও আলেকজ্যাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি স্থানবাসী ভারতীয়গণের নিকট তাঁহারা যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্য সকলও তাঁহাদের পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় যুগের যে সকল গ্রীক-লেখক ভারতসম্পর্কীয় জ্ঞানভাণ্ডারে নূতন তথ্যের সংযোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পূর্ব্বকথিত পেরিপ্লাসের অপরিজ্ঞাত রচয়িতা, প্লিনি, টলেমি, পরফিরি, ষ্টোবস, কসমাস ইণ্ডিকো প্লিসটিসের নাম সবিশেষ পরিচিত। পেরিপ্লাসের অজ্ঞাতনামা লেখক ও প্লিনি ভারতবর্ষের ভূবৃত্তান্ত ও বৈদেশিক বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রচার করেন। টলেমি সিংহল, ভারতবর্ষের অন্তর্ভাগ ও গঙ্গার অপরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও ভ্রমবশতঃ ভারতের মানচিত্র এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন যে, তাহা এ দেশের মানচিত্র বলিয়াই চিনিতে পারা যায় না। টলেমির অঙ্কিত ভারতবর্ষের মানচিত্রে পশ্চিম উপকূলে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে কুমারিকা অন্তরীপ

অভিমুখে না চলিয়া বোম্বাইর কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়াছে; এ কারণ ভারত উপদ্বীপের দক্ষিণভাগ একেবারেই লোপ পাইয়াছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ অংশে বার্দ্দিসানেস নামক এক জন গ্রন্থকারের আবির্ভাব হয়। তাঁহার গ্রন্থ অবলম্বনে পরফিরি ও ষ্টোরস ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও বৌদ্ধশ্রমণ সম্বন্ধে অনেক কৌতুকাবহ বিবরণ স্ব স্ব গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন।

আলেকজাণ্ডারের সহচর ও সমসাময়িক লেখকগণ ভারতবর্ষের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ছয় জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে। দিওদোরাস সেকুলস, আরিয়ান, প্লুটার্ক, কিউকুরটিয়াস, জাষ্টিনাস, এই পাঁচ জন; ষষ্ঠ লেখকের নাম অপরিজ্ঞাত। এই শেষোক্ত লেখক সম্রাট্ দ্বিতীয় কনষ্টান্‌টিয়াস পারস্যের বিরুদ্ধে যে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার সুবিধার জন্য "ইটিনারেরিয়ম্ আলেকজণ্ড্রি ম্যাগনি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করেন। "রণকৌশল" নামক একখানি পুস্তকের রচয়িতা পলিনাস ভারত-অভিযানকালে মহাবীর আলেকজাণ্ডার কর্ত্তৃক অবলম্বিত কৌশলসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। ফ্রনটিনাস-প্রণীত "রণনীতি" পুস্তকেও এই বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচ্য যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ষ্ট্রাবো-প্রণীত ভূগোলবৃত্তান্ত। এই গ্রন্থ ১৯ খৃঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। ষ্ট্রাবোর পরেই টলেমির স্থান নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে ভারতবর্ষের নগর ইত্যাদির যে সকল নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেকগুলির উল্লেখ আর কোনও পুস্তকে নাই। সম্ভবতঃ ষ্ট্রাবো এই সমস্ত নাম সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক-বৃত্তান্ত-সংবলিত আর চারিখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিখানি পুস্তকের প্রণেতার নাম পম্পোনিয়াস মেলা, সোলিনাস, ডাওনিসিয়াস ও মারসিনাস। মেলা ও সোলিনাস রোমান লেখক। ৪২ খৃঃ অব্দে মেলার গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। মেলা স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁহার জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তদীয় লিখিত বিবরণ গ্রীক-লিখিত বিবরণের সারসঙ্কলনমাত্র। মেলার সময় ভারত-উপকূল পর্য্যন্ত রোমান বাণিজ্য প্রসারিত হইয়াছিল। ফলতঃ তৎকালে রোমান বণিকগণের প্রমুখাৎ ভারতের

ভৌগোলিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিবার উপায় বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মেলা তত দূর কষ্ট স্বীকার করেন নাই। গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই সঙ্কলন করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সোলিনাস ২২৮ খৃঃ অব্দে স্বগ্রন্থ প্রকাশ করেন; প্লিনির গ্রন্থ তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল; এতদ্ব্যতীত মেলার গ্রন্থ হইতেও তিনি উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সোলিনাসের পুস্তক জনাদর লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাওনিসিয়াস প্রাচ্য সম্রাট ব্যাকস কর্ত্তৃক ভারত-বিজয়ের কাহিনী গ্রথিত করেন। ৪০০ খৃষ্টাব্দে মারসিয়ানাস কর্ত্তৃক লিখিত ভূগোলবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল, পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল সম্পর্কে যে সকল গ্রীক লেখক লেখনী-পরিচালনা করিয়াছিলেন, আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিলাম। এই সমস্ত লেখকের গ্রন্থ ব্যতীত প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের নানা স্থানে প্রসঙ্গক্রমে ভারত-কথা আলোচিত হইয়াছে। ঐ সমুদয় আলোচনা হইতে পুরাকালে ভারতবর্ষের সহিত রোমান বাণিজ্যের অবস্থা ও ভারতবর্ষ হইতে যে সকল রাজদূত রোম ও কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজদরবারে গমন করিতেন, তাঁহাদের বিবরণ জানিতে পারা যায়।

সহযোগী-সাহিত্য।

—:০:—

মিণ্টন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত অধ্যাপক কামাখ্যানাথ মিত্র এম্ এ., বি. এল্. কর্ত্তৃক লিখিত কবিবর মিলটনের জীবনবৃত্তান্তের সারাংশ সঙ্কলিত হইল।

মিণ্টনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জীবনচরিতের লেখক ডাক্তার ডেভিড্ ম্যাসন সম্প্রতি পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত মহাকবি মিণ্টনের Milton the Man and the Lessons of his Life—জীবনচরিতের আমি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতেছি। আমার মতে, আমি তাঁহার কবি-প্রতিভার—Milton the Poet—আলোচনা না করিয়া, তাঁহার অনন্যসাধারণ চরিত্রের,—Milton the Man,—সমালোচনা করিব। চরিত্রের মহত্ত্বই মিণ্টনের স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়ীভূত। সে চরিত্র মহীয়ান্ তেজোগর্ব্বে পরিপ্লুত; তাহা মানবের ইতিহাসে অতি বিরল; সে চরিত্র গাম্ভীর্য্যে ও সরলতায় অনন্ত উন্মুক্ত নীলাম্বরের ন্যায় স্বচ্ছ। আমি সেই মহাবীরকে কাব্যজগতেরও মহাবীর বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার বর্ণিত জিহোবা যেরূপ বজ্রমুষ্টিতে বিদ্যুৎপুচ্ছ অশনি ধারণ করিয়াছিলেন, মহাকবি মিণ্টনও তাঁহার হস্তে সেইরূপ ভাবে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন।

"Translation of Homer" সম্বন্ধে বর্ণনাকালে ম্যাথু আর্নোল্ড 'Maxonian' গায়ক—মহাকবি হোমারের প্রতিভা সম্বন্ধে 'মহীয়সী' এই বিশেষণ পর্য্যাপ্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন। মহাকবি মিল্টনের প্রতিভাকেও 'মহীয়সী' ভিন্ন অপর আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না। কবিত্ব-প্রতিভায় যদিও তিনি মহান, কিন্তু মনুষ্যত্ব ও চরিত্র বিষয়ে তিনি মহত্তর।

দুই শতাব্দী অতীত হইল, মহাকবি মিল্টন যে 'অস্ফুট জ্যোতির্বিন্দুকে মনুষ্য পৃথিবী বলিয়া উল্লেখ করে' ('This dim spot which men call Earth.') সেই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার উদার অত্যুন্নত আকৃতি আজও বাষ্পমুক্ত Teneriff বা Atlas পর্ব্বতের ন্যায় পৃথিবীর পৃষ্ঠে দৃশ্যমান হইতেছে, এবং আজও পর্য্যন্ত তাঁহার রেখাঙ্কনগুলি জীবন্ত অনুভব করিতেছি। যদিও চিরদিনের জন্য তিনি নির্ব্বাক্ হইয়াছেন, কিন্তু জলপ্রপাতের অবিশ্রান্ত গম্ভীর নির্ঘোষের ন্যায় তাঁহার ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে অহরহঃ ধ্বনিত হইতেছে।

মিল্টনের জীবন-নাটকের তিনটি অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অঙ্ক,—খৃঃ অঃ ১৬০৮ হইতে ১৬৩৯, এই ত্রিশ বৎসর। ইহা তাঁহার ছাত্র-জীবন। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তিনি কখনও শয়ন করিতেন না। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া তিনি হরটন প্রদেশে পিত্রালয়ে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি L'Allegro, Comus, Il Pensereso Arcades. এই কয়খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তকেই একটা গভীর বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। এই বিষাদ তাঁহার প্রকৃতিগত। মহাকবি মিল্টনের বিষণ্ণতার মধ্যেও মহত্ত্বের অভিব্যক্তি অনুভূত হয়। Lycidas করুণ রসের কবিতা-পুস্তক। ইহার মধ্যে বিষাদবহ্নি প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত আছে। তাঁহার জীবন-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে উক্ত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে উহা ভস্মাচ্ছাদিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। Lycidas সমাপনান্তে তাঁহার হৃদয়ে Ansonia, Dante, Petrarch, Tasso ও Ariosto প্রভৃতি মনীষিগণের জন্মস্থান-পরিদর্শনের বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। শিক্ষার ভিত্তি গভীর ও প্রশস্ত করিবার মানসে তিনি ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল স্থান-পরিদর্শনের জন্য যাত্রা করেন। প্রবাসে তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন। 'তত্ত্বজ্ঞানোৎসুক' 'অতিবৃদ্ধ', 'কারারুদ্ধ' Tuscan Artist Galileo মহাত্মার সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। Socrates, Plato ও অন্যান্য মনীষিগণের জন্মস্থান দেখিতে যাইবার তাঁহার বাসনা ছিল। কিন্তু সুদূর ইংলণ্ডে ভূমিকম্পের অশুভসূচক বজ্রনিনাদ তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হওয়ায় তাঁহার প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগরিত হইয়া উঠে। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন,—'স্বাধীনতার জন্য যখন আমার দেশবাসিগণ প্রাণপাত করিতেছেন, তখন আনন্দ-লাভ-মানসে দেশপর্য্যটনে দিন-যাপন আমার পক্ষে ঘৃণার্হ।' অতঃপর তিনি ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দের অগষ্ট মাসে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অকপটতা মিল্টন-চরিত্রের একটি প্রধান ধর্ম্ম। যাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন; সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ইটালীভ্রমণকালে সম্রাট ও খৃষ্টান-যাজক-নীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইটালীর ধর্ম্মান্ধ যাজকেরা তাঁহাকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু কবিবর তাহা অবজ্ঞাসহকারে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কবির জীবন-চরিতের দ্বিতীয় অঙ্ক আরব্ধ হয়। Lycidas পুস্তক সমাপ্ত করিয়া তিনি অভিনব প্রণয়-কাব্য-প্রণয়নে অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। কবিবর আমাদিগের মনোহর উদ্যান ও শস্যশ্যামল কান্তারের দৃশ্যাবলী না দেখাইয়া নর-শোণিত-রঞ্জিত জনহীন প্রস্তরের ও ভীষণ হত্যাকাণ্ডের বিভীষিকা-দৃশ্য দেখাইয়াছেন। তিনি এক্ষণে আর কবিত্ব-চিন্তায় নিভোর নহেন। 'লৌহকায় ক্রমওয়েলে'র ন্যায়

অদম্য উৎসাহে ও অকুতোভয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। মহাত্মা বেকনের চিন্তা ও তৎসাধনার পথ অনুসরণ করিয়া কবিবর এই সময় সংবাদপত্রের এক জন স্বাধীনচেতা লেখক হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি পাঁচখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ইংলণ্ডে প্রচলিত ধর্ম্মাচার ও বিবাহনীতির বিরুদ্ধে তিনি সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জগৎ তাহাতে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। সহধর্ম্মিণী-পরিত্যাগ (Divorce) বিষয়ে তিনি অনেক চিন্তাপূর্ণ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা-সম্বন্ধে তিনি একখানি পত্রিকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার মতে, যে শিক্ষার ফলে মানব জ্ঞানী, স্বদেশবৎসল ও সৈনিক পুরুষ না হয়, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। তৎপরে তিনি 'মারষ্টন মুরে'র যুদ্ধ-বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার গদ্যগ্রন্থ Areopagitica ভাষা ও উন্নত চিন্তায় অদ্যাবধি ইংরাজী সাহিত্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে কবিবর মিল্টন অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। তিনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে তাঁহাকে দ্বিতীয়া পত্নীর বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। কবির জীবনে মর্ম্মবেদনার অন্ধকার ছায়া এইরূপে ঘনীভূত হইতে লাগিল।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে মিল্‌টনের জীবন-চরিতের তৃতীয় অঙ্ক আরব্ধ হয়। তাঁহার জীবনের এই অংশ অতীব মর্ম্মন্তুদ, কিন্তু অতীব মহান্। তাঁহার 'Samson'এর ন্যায় 'fallen on evil days and evil tongue with darkness and danger compassed round'—তিনি রাজপুরুষ কর্ত্তৃক বন্য পশুর ন্যায় অনুসৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে তিনি কারামুক্ত হন। লণ্ডন নগরের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে তাঁহার গৃহও ভস্মীভূত হইয়া যায়; বহুযত্নেও তিনি দুর্ভাগ্য-রাক্ষসীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিতে পারেন নাই। তাঁহার গৃহ শ্মশান হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার একমাত্র আশার স্থান দুই কন্যা তাঁহার অবাধ্য ছিল। এই জন্য তাঁহার জীবন যদিও মরুময় হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অজেয় ইচ্ছা-শক্তি তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই।

মিল্‌টনের কবি-প্রতিভার অসামান্য ফলস্বরূপ Paradise Lost', Paradise Regained ও Samson Agonistes তিনখানি গ্রন্থ এই সময়ে প্রণীত হয়। অন্ধ, দারিদ্র্যক্লিষ্ট, কারারুদ্ধ, অসহায় কবির আত্ম-জীবনের ছায়া সাহিত্যজগতে এরূপ মর্ম্মগ্রাহী ও উদারভাবে কোথাও কোন পুস্তকে প্রকটিত হয় নাই। আমি এই তিনখানি গ্রন্থের ধারাবাহিক সমালোচনা করিতেছি না: এক জন সুপ্রসিদ্ধ সমালোচকের 'মিল্‌টনের নরক' ও 'পরাজিত শয়তান' সম্বন্ধে কয়েকটি কথার উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। Paradise Lost গ্রন্থে উল্লিখিত 'স্বর্গ'ই 'নরক'; ঈশ্বরের ইতিবৃত্ত 'শয়তান'ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট 'অভিনেতা'। যদিও শয়তান পরাজিত হইয়াছিল, তথাপি সে অজেয়: সে যদিও বজ্রদণ্ডে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, তথাপি সে নির্ভীক; যদিও সে জিহোবা অপেক্ষা হীনবল তথাপি সে মহৎ। শয়তান সুখের জন্য অধীনতা স্বীকার না করিয়া স্বাধীনতার জন্য অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ ও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছিল। তিনি পরাজয় ও অনন্ত যন্ত্রণাকে স্বাধীনতা ও আনন্দ বলিয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। হতভাগ্য শয়তান বীরদর্পে বলিতেছে,—

"Farewell, happy fields
Where joy for ever dwells! Hail, Horrors, Hail etc.

এমন অচল অটল বীরত্বের উপমা আর কোথায়? চরিত্রের যে ছবি তিনি অঙ্কিত করিলেন, তাহা স্বয়ং মিল্টনে কোথায়।

কবিবর মিল্‌টনের রচিত Samson Agoniste'সএর উপাখ্যান-বস্তু কবির আত্মজীবনের প্রকৃত ঘটনা। Samsonএর অন্ধত্ব, মহাকবির নিজের অন্ধত্ব; Samsonএর Dalilaই মিল্টনের পরিণীতা; Dagonই ইংরাজ ধর্ম্মমন্দির, Philistinesদের বিপক্ষে Samsonএর ভীষণ বাহুবলের বর্ণনা।

"As with the force of winds and waters pent,
When mountains tremble, those two massy pillars
With horrible convulsion to and fro,
He tugged, he shook, till down they came and drew
The whole roof after them with burst of thunder
Upon the heads of all who sat beneath
Lords, ladies, captains, counsellors or priests
Their choice nobility and flowers, not only
Of this, but each Philistine city round
Met from all parts to solemnise this feast.

কবিবরের সম্রাট্-তন্ত্রের সুগভীর ভিত্তির উপর স্থাপিত 'শাসন-স্তম্ভ' বাহুবলের দ্বারা বিধ্বস্ত করিবার উন্মত্ত প্রয়াস। উন্মত্ত ক্রোধান্ধ Samsonই স্বয়ং মিল্টন।

'Samson Haraptaকে বলিতেছেন।

Go, baffled coward, lest I run upon thee
Though in these chains, bulk without spirit vast
And with one buffet lay the structure low
Or swing thee in the air, then dash thee down
To the hazard of thy brains and shattered sides."

কি ভীষণ ক্রোধ! ইহা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা; বজ্র অপেক্ষাও ভীষণতর। ইহা কি ন্যায়ানুগত? অমিতপরাক্রমশালী বীর্য্যবান্ ব্যক্তির পক্ষে বাহুবলে তাহার ন্যায্য অধিকার লাভ করিবার জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া আততায়ীর প্রতি অশনিনিক্ষেপ আমার মতে ন্যায়ানুগত।

তাঁহার Samsonএর পর তিনিও আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে Samson প্রকাশিত হয়। তিন বৎসর পরে মিল্টন মানবলীলা সংবরণ করেন।

মিল্টনের ধর্ম্মমত—স্বাধীনতা, সচ্চরিত্রতা ও যাবতীয় মানবের প্রতি সহানুভূতি। স্বাধীনতার প্রতি একাগ্র ভালবাসা ও আন্তরিকতা মিল্টন-চরিত্রে অনন্যসাধারণ।

পাশ্চাত্য ইতিহাস পাঠে আমরা অবগত হই যে, Giardono Bruno স্বাধীনতা-লাভের জন্য অগ্নিস্তূপে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বজনীন-প্রেম-মন্ত্রের আদিগুরু ছিলেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা,—ফরাসী-বিপ্লবের মূল মন্ত্র স্বাধীনতা। কাব্যজগতের অভিনেতা, Goethe, Schiller, Byron, Wordsworth, Shelly, Keats প্রভৃতি মনীষিগণের জীবনে সেই স্বাধীনতা-স্পৃহা বলবতী দেখা যায়। প্রাচ্য ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? কোথায় ইহার মহত্ত্ব ও বিজয়গৌরব নিহিত আছে? আমাদের উত্তর-ভারতবর্ষে বুদ্ধধর্ম্মের যাজক ও প্রচারকগণের মূলমন্ত্রে উক্ত মহত্ত্ব ও বিজয়-গৌরব নিহিত। বুদ্ধদেবের দীক্ষা 'স্বাধীনতা-দীক্ষা'; ভারতবর্ষে অদ্যাবধি ইহার বিকাশ হয় নাই। কিন্তু সুদূর জাপানে—উদীয়মান স্বাধীনতা-রবির স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসিত দেশে আজ সেই স্বাধীনতা-মন্ত্রের উন্মেষ দেখিতে পাইতেছি। সভ্যতার অঙ্কুর ভারতবর্ষেই প্রথম অঙ্কুরিত হয়, এবং আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষেই তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি লাভ করিবে।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। চৈত্র। শ্রীযুত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় "ভূতনামানো" প্রবন্ধে বিলাতী ভূত নামাইবার পদ্ধতি—'টেবিল-চালা'র বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রবন্ধে বিশেষত্বের অত্যন্ত অভাব। 'চীনে ধর্ম্মচর্চ্চা' শ্রীযুত রামলাল সরকারের রচনা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ধর্ম্মচর্চ্চা অপেক্ষা আচারের পরিচয় অধিক। লেখক ভাষা সম্বন্ধে অত্যন্ত অনবধান; এই প্রবন্ধে আবার ইংরাজী শব্দের সহিত বাঙ্গলা শব্দের সন্ধি করিয়াছেন। যথা,—'টেবলোপরি'! এক স্থলে আছে,—'ক্রমে সেই ধ্বনির পুনর্ধ্বনি হইতে হইতে সদর দরজায় গিয়া উপস্থিত হয়।' কে? শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'জাপানে কৃষি' নামক অনূদিত সন্দর্ভটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পিরিউর মূল ফরাসী হইতে 'সমসাময়িক ভারত' প্রবন্ধে এবার গ্রাম্য-ভারতের ছবি দিয়াছেন। ফরাসী লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। কবে আমাদের সাহিত্যে এইরূপ মৌলিক রচনা দেখিতে পাইব? বিদেশী আমাদের গ্রাম্য-ভারতের মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, সহৃদয় তত্ত্বদর্শীর ন্যায় গ্রাম্য সমাজের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা চক্ষুষ্মান অন্ধ,—তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাই না।—আর 'সাহিত্যে'র একনিষ্ঠ উপাসক জ্যোতিরিন্দ্র বাবু যেরূপ অক্লান্তভাবে স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যকুঞ্জ হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া মাতৃভাষার পূজার জন্য অর্ঘ্য রচনা করিতেছেন এই অলসের রাজ্যে তাহাও অতুলনীয়। সাহিত্যসেবাই তাঁহার ধর্ম্ম; সাহিত্য-শ্রমই তাঁহার জীবনের সুখ। মার প্রসাদে তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরীর রচিত 'দেবদূত' নামক নাটক ও শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত 'গোরা' নামক একখানি উপন্যাস 'প্রবাসীতে' ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। ক্রমশঃ-প্রকাশে নাটক একবারে খুন হইয়া থাকে; উপন্যাসও জখম হইয়া যায়। অথচ কৌতূহলী পাঠকের জন্য লেখকগণকে আত্মবলি দিতে হয়।—'গোরা' তর্কের খনি,—গল্প খুব অল্প। শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবীর 'দলিত কুসুম' এই সংখ্যায় সমাপ্ত হইল। রচনাটি বিশেষত্বহীন। ভাষা অনেক স্থলেই পঙ্গু। একটু দেখিয়া শুনিয়া ছাপিলে ভাল হইত। 'দলিত-কুসুম' যেমন করুণ রসের সৃষ্টি করে, দলিত ভাব, ভাষা ও কবিত্বও সেইরূপ করুণার উদ্দীপক। আজকাল রচনার প্রসাধনে কবিগণ অত্যন্ত উদাসীন। প্রতিভা প্রসাধনে বীতরাগ বটে, কিন্তু সকলের ভাগ্যে তাঁহার আশীর্ব্বাদ ঘটে না। অতিবিস্তৃতি দোষেও রচনাটি অনেক স্থলে শোথ-গ্রস্ত হইয়াছে; লেখিকা একটু চিন্তা করিলে তাহা বুঝিতে পারিতেন। শ্রীযুত দেবকুমার রায় চৌধুরী পৌষ মাসে 'দুই রাজনৈতিক দল' নামক প্রবন্ধটি রচিয়াছিলেন; তখন সুরাট কংগ্রেস-ভঙ্গের কাহিনী রহস্য-কুহেলিকায় আচ্ছন্ন ছিল। সে সময়ে 'সত্য'ও প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু চৈত্র মাসে সুরাট-দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গের সত্য ইতিহাস ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। পৌষ মাসে লেপমুড়ি দিয়া লেখক যাহা লিখিয়াছিলেন, চৈত্রের আলোকে তাহা প্রকাশিত করিয়া তিনি এক পক্ষের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক ওজস্বিনী ভাষায় যে আন্তরিকতা প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহা উপভোগ করিয়াছি। কিন্তু যে 'ভাড়াটে গুণ্ডা'রা কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া ছিল—তাহারা কি এই ধর্ম্মের কাহিনী, একতার বাণী শুনিবার লোক? যাক, এত কাল পরে আর 'পুরাতন কাসুন্দী ঘাঁটিয়া' কোনও লাভ নাই। শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের 'লর্ড কেলভিন' উল্লেখযোগ্য, কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, পড়িয়া সাধ মেটে না। শ্রীযুত মুদ্রারাক্ষস 'আসামের নাগাজাতি' নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ অপেক্ষা লেখকের নামটি অধিকতর রমণীয়। 'মুদ্রারাক্ষস' এই স্বদেশী যুগেও সহজে পরিপাক হয় না। ঘটকের মুখে বরের নাম 'ভজহরি' শুনিয়া

কনের বাপ আর পাত্র দেখিতে যান নাই; বলিয়াছিলেন, ১২৩৫ সালের পরে আর কেহ ভজহরি নাম রাখে নাই। পাত্র নিশ্চয় বুড়ো,—আর দেখিবার আবশ্যক নাই! 'মুদ্রারাক্ষস' নাম শুনিয়া গল্পটি মনে প্‌ড়িল। নিজের নাম নিজে রাখিবার পদ্ধতি নাই, তাই রক্ষা। নতুবা ঘটোৎকচ, বভ্রুবাহন প্রভৃতি বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইতেন! শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'আদিনা' একটি ক্ষুদ্র রচনা। লেখক উপসংহারে বলিয়াছেন,—'আদিনা একখানি সুলিখিত মহাকাব্য।' কবিত্ব বটে। লেখকের রচনাটি একটি সুগঠিত কথার মসজিদ;—লেখকের অলঙ্কারেই তাঁহার প্রশংসা করিলাম। 'যেমন গঙ্গা পূজে গঙ্গাজলে!' শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ রায়ের "পিপীলিকা" নামক প্রবন্ধটি মৌলিক,—আমরা সকলকে পড়িতে বলি। লেখকের গবেষণা-শক্তি প্রশংসনীয়।

পথিক। একখানি নূতন মাসিকপত্র। আমরা 'শৈশির' ও 'বাসন্তী' সংখ্যা পাইয়াছি। 'প্রেসিডেন্সী কলেজ থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব 'হ্যামলেট' অভিনেতা' এই সংখ্যায় 'পুরুষ-অংশে নারী অভিনেত্রী' নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রচনাটি আলোচনার যোগ্য। কিন্তু 'অংশ' বলিলে অভিনেয় চরিত্র বা Part বুঝায় না। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রে তাহার নাম 'ভূমিকা'। ভূমিকার বদলে 'অংশ' যেন উপকথার 'নাকুয়ার বদলে নরুণ'! শ্রীযুত যতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মার 'বঙ্কিম-দ্বাদশ-বার্ষিকী' পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। মহাকবির তর্পণ,—ভক্তের ভক্তিচন্দনসুরভি শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি। আমরা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'সম্মুখে পবিত্রসলিলা ভাগীরথী। সুরতরঙ্গিণীর দুই পারে দুই চিতা প্রজ্বলিত। পশ্চিমে গগন-সূর্য্যের চিতা নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। পূর্ব্বপারে বঙ্গসাহিত্য-সূর্য্যের চিতা ধূধূশব্দে প্রস্ফুরিত হইতেছে। দুই চিতার আলোকে সমস্ত নীলাকাশ পিঙ্গলবর্ণ, গঙ্গার ধবলধারা পাটলীকৃত। দুই চিতা দুই পারে নিবিল। তমোময়ী রজনী পুত্রশোকাচ্ছন্না জননীর ন্যায় চিতাচিহ্ন দেখিতে আসিল। সেই অন্ধকারে বঙ্গে ১৩০১ অব্দের চৈত্রমাসের নবম দিন ডুবিয়া গেল। দশম দিনে গগন-সূর্য্য নবীনকিরণে পূর্ব্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া আবার উদিত হইলেন। কিন্তু বঙ্গের সাহিত্য-গগনে সেই বরেণ্য সূর্য্য আর উঠিলেন না। দিনের পর দিন গেল, মাসের পর মাস গেল, ঋতুর পর ঋতু কাটিল, বৎসরের পর বৎসর ঘুরিল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল। আজ সেই ৯ই চৈত্র। চক্ষের সম্মুখে হৃদয়-বিদারক সেই সূর্য্য-অবসানের চিত্র। চতুর্দ্দিকে আবার সেই শোকভার,—যামিনীর অন্ধকার। বঙ্গের এই গভীর নৈশ অন্ধকার দূর করিতে বঙ্গের সেই হিরণ্যবর্ণ জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ আর উদিত হইবেন না। হে বঙ্গসাহিত্যগুরু, জ্ঞানের আনন্দা-লোক লইয়া তুমি আর আমাদের নেত্রপথে আবির্ভূত হইবে না। তোমার পবিত্রচরণ রজঃ আর আমরা শিরে গৌরব-পরাগরূপে ধারণ করিতে পাইব না। হে দিব্যজ্যোতিঃ, ভারতীর বরপুত্র—তুমি সমগ্র এ গৌড়ের ভক্তিপুষ্পমালা বক্ষে ধারণ করিয়া চন্দনকাষ্ঠের সৌরভময় অগ্নিরথে আরোহণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে সেই যে ত্রিদিবধামে চলিয়া গেলে, আর আসিলে না। সে অবধি তোমার জন্য আমরা নিত্য বিলাপ করিতেছি। আমাদের এ বিলাপ তোমার সে সুখ-ধামে পৌঁছায় কি না, জানি না। কিন্তু তুমিই একদিন তোমার হৃদয়বন্ধু দীনবন্ধুর শোকে বিলাপ করিয়া বলিয়াছিলে,—

'ক্ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসংঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ॥'

এ বিলাপের শেষে তুমিই আবার বলিয়াছিলে,—

'স্বর্গে মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত এইরূপ উৎসর্গ হইল।'

'হে দীনবন্ধুর ভাববন্ধু, আমরাও আজ তোমার কথায় তোমার জন্য বিলাপ করিতেছি। তোমাকে আমাদের বার মাসই মনে পড়ে। তোমাকে লইয়াই আমাদের ঋতুবর্ণনা ও বর্ষগণনা

হয়। বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিলেই দেবীরাণীর ঋণজাল হইতে ব্রজেশ্বর সেদিন মুক্ত হউন আর নাই হউন, তোমাকেই মনে পড়ে। জ্যৈষ্ঠমাস তুফানের সময় আসিলেই নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর মাথার দিব্য মাথায় করিয়া নৌকাযাত্রা করুন আর নাই করুন, তোমাকেই মনে পড়ে। যখন কালধর্ম্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরব্ধ হয়, তখন নৈশগগন নীল নীরদমালায় আবৃত হইলে কোনও বিপন্ন অশ্বারোহী বিদ্যুদ্দীপ্ত মান্দারণের পথে অশ্বচালনা করুন আর নাই করুন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন নিদাঘের দারুণ রৌদ্রে পৃথিবীর অগ্নিময় পথের ধূলিসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ, তখন সেই অগ্নিতরঙ্গ সন্তরণ করিয়া মহেন্দ্র ও কল্যাণী শিশুকন্যা কোলে লইয়া পদচিহ্নগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাউন আর নাই যাউন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন বর্ষার জলপ্লাবনে নদী কূলে কূলে পরিপূর্ণ হইয়া টল টল করিতে থাকে, তখন প্রাবৃটের সেই ম্লানকৌমুদী-রঞ্জিত খরস্রোত ত্রিস্রোতাবক্ষে বিচিত্র বজরার উপরে ঢল-ঢল-যৌবনা জ্যোৎস্নাবর্ণা দেবী সুন্দরীর দিব্যকরে বীণা ঝঙ্কার দিয়া বাজিয়া উঠুক আর নাই উঠুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন নবীন শরদুদয়ে বহুত পিয়াসার চন্দ্রমাশালিনী সা মধুযামিনী নির্ম্মলনীলাকাশে স্থলে জলে বাপীকূলে হাসিতে থাকে, তখন বিকচনলিনে যমুনাপুলিনে মৃণালিনীর জনম সাধ মিটুক আর নাই মিটুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন যোজনের পর যোজন ব্যাপিয়া হরিদ্বর্ণ ধান্যক্ষেত্র মাতা বসুমতীর অঙ্গে বহুযোজনবিস্তৃতা পীতাম্বরী শাটীরূপে শোভা পায়, তখন ধরিত্রীর সেই মনোমোহিনী সুষমা দেখিতে দেখিতে ললিতগিরির পদতলে হস্তিগুম্ফার অভিমুখে সঞ্চারিণী দীপশিখার মত দুইটি সন্ন্যাসিনী পথ আলো করিয়া চলুন আর নাই চলুন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন কার্ত্তিক মাসে মাঠের জল শুকাইয়া আসে, পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসে, কৃষকেরা ক্ষেত্রে ধান কাটিতে আরম্ভ করে, যখন প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে, সন্ধ্যাকালে প্রান্তরে প্রান্তরে ধূমাকার হয়, তখন অভাগিনী সূর্য্যমুখীর সংবাদগ্রহণে মধুপুর গ্রামে নগেন্দ্রের শিবিকা বাহকস্কন্ধে ছুটুক আর নাই ছুটুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন মাঘমাসে আমাদের দেশে সাগরের শীত পড়ে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করে, তখন সাগরসঙ্গমে দিগ্‌ভ্রান্ত নৌকাযাত্রীর স্বার্থানুবন্ধসূত্রে বিপন্ন নবকুমার সেই গম্ভীরনাদিবারিধিকূলে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে অবেণীসম্বন্ধসংসর্পিতকুন্তলা কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শনে বিহ্বল হউন আর নাই হউন, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। যখন বসন্তে সুখের স্পর্শে এ সংসার শিহরিয়া উঠে, অসংখ্য প্রস্ফুট কুসুমের গন্ধে আকাশ মাতিয়া উঠে, কোকিল পাপিয়ার শব্দতরঙ্গে নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তখন গোবিন্দলালের মনোরমবৃক্ষবাটিকার বারুণী পুষ্করিণীতে জল আনিতে গিয়া কুহু-কুহু-কুহু রবে উন্মনা রোহিণী 'দূর হ কালামুখো' বলিয়া রসিকরাজ পিকবরকে সমাদর করুক্ আর নাই করুক, তখন তোমাকেই মনে পড়ে। প্রকৃতির এই বিচিত্র রঙ্গালয়ে যখনই কোথাও সুন্দরে ভয়ানকে মিশে, যখনই করুণে গম্ভীরে—যখনই উজ্জ্বলে মধুরে মিশে, তখনই তোমাকে মনে পড়ে। তাই বলিতেছিলাম, বারমাসই তোমাকে মনে পড়ে। কি শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, কি করালবদনী নিশীথিনী—কি রৌদ্রোজ্জ্বল দিবা—কি বাদলের অন্ধকার—সকল সময়েই তোমাকে মনে পড়ে। তুমি যেন দিবা নিশা ষড়ঋতু দ্বাদশ মাস সংবৎসর রূপে আমাদের নয়নে প্রতিভাত হও। হে সৌম্য, হে অসেচনক, তোমার এই বিবিধরূপেই তবে তোমাকে নমস্কার করি।—'

পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

—:০:—

আমার বয়স যখন ৩৫ বৎসর, তখন প্রথম আমার চোখের দোষ হয়। দূরে ভাল দেখিতে পাইতাম না। এ দোষকে তখন short sight বলা হইত; এখন near sight বলে। short শব্দের পরিবর্ত্তে near শব্দ ব্যবহার করিয়া কি লাভ হইতেছে, বুঝিতে পারি না। ইংরাজেরা এখন এইরূপ অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছেন, পরিবর্ত্তনপ্রিয়তা ভিন্ন ইহার অন্য কারণ দেখিতে পাই না—Change for the sake of change—ইংরাজদের একটা রোগ, একটা বাতিক, একটা নেশা হইয়া পড়িয়াছে। চিরকাল তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখিয়াছিলাম—"He did his best", এখন তাঁহাদিগকে বলিতে ও লিখিতে দেখি—"He did his *level* best"; "*level*" শব্দটা কেন ঢোকানো হইল, বুঝিতে পারি না। আমার প্রিয়তম বন্ধু স্বর্গীয় কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খুব ভাল ইংরাজী জানিতেন, এবং খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর অনেক ইংরাজের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাই তাঁহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"level" শব্দটা জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে কেন? তিনি বলিতে পারিলেন না। তাই বলি, আগেকার "short sight" ছাড়িয়া এখনকার "near sight"-এ আর কিছুই বুঝায় না, কেবল ইংরাজের একটা বাতিক বুঝায়। বাতিকের জন্য অনেক ভাল জিনিসও মন্দ হইয়া যায়। দূরে ভাল দেখিতে না পাওয়াকে short sight বলিলে তাহা যেমন পরিষ্কার বুঝায়, near sight বলিলে তেমন পরিষ্কার বুঝায় না। change for the sake of change যাহাদের সংসার-ধর্ম্মের একটা মূলমন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সংস্রবে থাকিয়া আমরাও অনেক ভাল জিনিস ছাড়িয়া মন্দ জিনিস ধরিতেছি—আর ঐ বাতিকগ্রস্তদের ন্যায় মনে করিতেছি যে, আমাদের নির্জ্জীবতার পরিবর্ত্তে সজীবতা হইতেছে। আমার short sight হইয়াছিল বটে, কিন্তু তজ্জন্য আমি চশ্‌মা লই নাই। দুই কারণে লই নাই। তখন

ধৃত হওয়া আমার ইচ্ছা ছিল না—কেন ছিল না, নাই বা এখন বলিলাম। অপর কারণ এই যে, অনেকে আমাকে বলিয়াছিলেন—ও দোষটা আপনা আপনি সারিয়া যাইবে, চশ্‌মা লইলে বোধ হয় সারিবে না। ঔষধে বুঝি উপকার অপেক্ষা অপকারই বেশী হয়, এই ভাবিয়া আমি চশ্‌মা লই নাই। চারি পাঁচ বৎসরে দোষটা সত্য সত্যই সারিয়া গিয়াছিল। পরে কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে শীঘ্রই আর একটা দোষ জন্মিল—নিকটে আর ভাল দেখিতে পাইতাম না। ইহাকে বলে long sight। Long sight হওয়াতে বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। গবর্মেন্টের কাজ করিয়া দিতে বিলম্ব হইলে তাঁহারা বড় রাগ করেন। ইংরাজ নিজে যেমন ঘোড়ায় জিন দিয়া থাকিতে ভালবাসেন, তাঁহাদের চাকর বাকরেরও তেমনি ঘোড়ায় জিন না থাকিলে তাঁহারা ক্ষেপিয়া উঠেন। চাকরী হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে তখন ডাক্তারদের পরামর্শ লইলাম। তাঁহারা বলিলেন—চোখ strain করা ভাল নয়, আপনি চশ্‌মা লউন। আমি চশ্‌মা লইলাম। ডাক্তারেরা যখন আমাকে চশ্‌মা লইতে বলেন, তখন আর একটি কথা বলিয়াছিলেন, রাত্রে লেখা পড়া করিতে বারণ করিয়াছিলেন। এটা বড় চমৎকার উপদেশ। আমাদের দায়ে পড়িয়া লেখা পড়া করিতে হয়, যদি ইচ্ছাসুখে লেখা পড়া করিতে হইত, তাহা হইলে দেখিতে, পৃথিবীতে একটি ছেলেও লেখা পড়া করিত না। আহ্লাদে আটখানা হইয়া আমি রাত্রে লেখা পড়া বন্ধ করিলাম। সন্ধ্যার পরই আমার শয়নগৃহের একধারে একটি ডবল্ বোনা বালান্দা মাদুর পাতিয়া, আর একটা তাকিয়া লইয়া চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকিতে লাগিলাম। দুই চারি দিন এই রকম পড়িয়া থাকিতে থাকিতে দেখিলাম, মনে নানা কথা ওঠে, উঠিয়া আবার চলিয়া যায়, আবার ওঠে, আবার চলিয়া যায়, যেন শৃঙ্খলাহীন, বন্ধনীহীন, এলো মেলো, কিন্তু বড়ই মোহকর, বড়ই আনন্দজনক। টপ, টপ করিয়া আসে, ফস ফস করিয়া যায়, কিন্তু যাইয়াও যায় না, আর পাঁচটাকে আনিয়া দেয়। আনিয়া আমাকে জালে জড়ায়। দুই চারি দিনের মধ্যেই ইহাকে চিনিয়া ফেলিলাম —ইহাকে *Reverie* বলিয়া চিনিলাম। ইংরাজ চিনাইয়া না দিলে আমরা এখন আর কিছুই চিনিতে পারি না, আমাদের বেদ বেদান্তগুলাও আর চিনিতে পারি না। তাই ঐ এলো মেলো ব্যাপারটাকে যখন reverie বলিলাম, তখন মনে হইল, ওগুলাকে নিজেও চিনিয়াছি, অপরকেও চিনাইয়াছি।

এখন ঐরূপ কথা দু একটি বলি:—এই রকম করিয়া চক্ষু পড়িয়া থাকিতে থাকিতে এক দিন আমার বাল্যকালের কথা মনে উঠিতে লাগিল। তখন আমার বয়স ৮।১০ বৎসরের বেশী নয়। আমি তখন পাঠশালায় পড়ি, আমার স্বভাব কিছু চঞ্চল, কিন্তু আমি দুষ্ট বা দুরন্ত নই। আমার চঞ্চলতা দেখিয়া আমাদের এক বয়স্ক কুটুম্ব আহ্লাদ করিয়া আমাকে বিচ্ছু বলিয়া ডাকেন। তাহাতে আমি ভারী খুসী। তখন আমার চক্ষু আর এক রকম ছিল কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু এ কথা বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধা হয় না যে, তখন যাহাই দেখিতাম,—রৌদ্র, জ্যোৎস্না, গাছপালার রঙ, মাটী, মাঠ, ঘাস—যাহাই দেখিতাম, তাহাই যেন এখন হইতে ভিন্ন রকম দেখিতাম—বড় মধুর, বড় মিঠা, বড় বিশুদ্ধ, বড় সরল, বড় নির্দ্দোষ, বড় পবিত্র। কিছুই মনে অপবিত্র বা আবিলভাব উঠাইয়া দিত না, সকলই আমার মনে একটা কোমল, কলুষহীন আনন্দের ভাব তুলিয়া দিত। সে আনন্দের বর্ণনা হয় না, যে অনুভব করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারে, সে কি অপূর্ব্ব, কি অনিন্দ্য জিনিস, কত নির্ম্মল, কত শীতল, কত সাদাসিদে। সেই আনন্দে ভাসিতে ভাসিতে কত বেলা অবধি মাঠে মাঠে কত বেড়াইতাম, দূরে চাষার গান শুনিতাম, আশে পাশে গরুর হাম্বারব শুনিতাম। বুঝিয়াছি, ব্রহ্মচারীর চক্ষে না দেখিলে বাহ্য প্রকৃতির সে আকার দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন প্রথম যৌবনোদ্ভেদ (puberty) হইয়াছিল, এবং সেই জন্য মনে ভোগস্পৃহা জন্মিয়াছিল, তখন হইতে যাহাই দেখিয়াছি, তাহাই বাল্যকালের সেই নির্ম্মলতা, সেই অপূর্ব্বত্ব, সেই পবিত্রতাহীন দেখিয়াছি—তাহা যেন সেই বাল্যদৃষ্ট স্বর্গীয় জিনিস নয়। তাহা যেন একটা আবিল জগতের আবিল জিনিস। আবিল পৃথিবীকে চিরকাল নির্ম্মল স্বর্গরূপে অনুভব করিতে হইলে চিরকাল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে হয়। সমস্ত জীবন অসীম আনন্দ উপভোগ করিতে হইলে সমস্ত জীবন ব্রহ্মচারী থাকিতে হয়, বিধাতার এই বিধান। এই সব ভাবিতে ভাবিতে আবার যেন সেই জন্মস্থানে সেই রকম বালক হইয়া সেই রকম বাল্যলীলায় মত্ত হইয়া ঠিক সেই রকম নির্ম্মল বাল্যানন্দে ভরপুর হইয়াছি—কি সুখ, কি নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, ঠাণ্ডা, বিশুদ্ধ সুখ! বাল্যকালের সৌন্দর্য্য বালকে বুঝিতে পারে না, বৃদ্ধে বুঝিতে পারে। বৃদ্ধে যখন বুঝিতে পারে, তখন বাল্যকালের সৌন্দর্য্য

আরও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের আবিলতা দূষ্ট হইয়া যাওয়ায়, যাহা নির্ম্মল, যাহা বিশুদ্ধ, তাহার আদর আরও বাড়িয়া যায়, তাহার পবিত্রতা আরও বেশী অনুভূত হয়। তখন বার্দ্ধক্যের রোগ শোক দুঃখ কোথায় চলিয়া যায়, তৎপরিবর্ত্তে সেই আনন্দপূর্ণ বাল্যকাল আবার আসিয়া পড়ে। সেই সঙ্গে আবার সেই অপূর্ব্ব নির্ম্মল আনন্দের উপভোগ হইতে থাকে। নোনাপোতা, মনসাপোতা, ধনপোতা, চারিদিকে ধান ক্ষেত, মাঝখানে খানিকটা করিয়া উঁচু জমী, তাহাতে চাষ হইত না, গরু চরিত, আর আমরা খেলা করিতাম। নোনাপোতা আমাদের বাড়ীর অতি নিকটে, ঘরে শুইয়া বসিয়া দেখিতাম। সেখানে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ আছে, নোনা গাছ কখনও দেখি নাই। মধ্যে মধ্যে শুক্‌না পাতা ঘুরিতে ঘুরিতে উড়িত, আর রাত হইলে আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিত। তাই প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধারা বলিতেন, নোনাপোতায় ভূতপ্রেত আছে। আমরাও নোনাপোতার নামে একটু কাঁপিয়া উঠিতাম—তাই ভাবিয়া এখন কত আনন্দ। যে নোনাপোতায় ভূতপ্রেতের বাস, সেই নোনাপোতায় বল্‌দেরা তাঁবু ফেলিয়া * দু এক দিন করিয়া বাস করিত। যতক্ষণ তাহারা থাকিত, ততক্ষণ আমরা নোনাপোতাকে ভয় করিতাম না। প্রত্যূষে উঠিয়া গিয়া তাহাদের তাঁবুর ভিতর বসিয়া থাকিতাম। দেখিতাম, এক যায়গার ধান চাল আর এক যায়গায় যাইতেছে; বুঝিতাম না কেন যায়। কিন্তু যাহারা লইয়া যাইত, তাহাদিগকে দেখিয়া, আমরা শিশু, আমাদের ভূতের ভয় পর্য্যন্ত পলাইয়া যাইত। মনে মনে বাসনা হইত, তাহারা যেন ঘন ঘন আমাদের ভূতের জায়গায় তাঁবু ফেলে। সেই নোনাপোতায় আমার ভাইপো শ্রীমান সর্ব্বেশচন্দ্র সম্প্রতি একটী হাট বসাইয়া বহু গ্রামের বহু লোকের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘজীবী হউন। মনসাপোতা আমাদের বাড়ী হইতে কিছু দূরে। শীতকালে প্রায় প্রতিদিন সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেখানে যাইতাম। এবং প্রকাণ্ড হরিৎবর্ণ মাঠের আইলের উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই দিকের ধানক্ষেত হইতে ধানের শীষ ছিঁড়িতাম। তাহার পর মনসাপোতায় প্রকাণ্ড হরিৎ বর্ণ মাঠের প্রকাণ্ড ছায়া, খেঁকশিয়ালের খেলা ও অদূরে বাগ্‌দীদের ঘরের

* মহামহোপাধ্যায় হইলে লিখিতাম,—'তাঁবু গাড়িয়া'।

চাল ভেদ করিয়া ধোঁয়া উঠিতে দেখিয়া কি যে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না; কিন্তু চক্ষু বুজিয়া এই রকম করিয়া ভাবিতে ভাবিতে এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তখনকার অপেক্ষা অধিকমাত্রায় আনন্দ উপভোগ করি। মনসাপোতায় গোটা কতক গর্ত্তে খেঁকশিয়ালি থাকিত। আমরা সেখানে গিয়া দেখিতাম, কোনটা কাঁকড়া মুখে করিয়া, কোনটা মাছ মুখে করিয়া বোঁ করিয়া দৌড়াইয়া আসিয়া গর্ত্তে ঢুকিতেছে, তাই দেখিয়া আমরা হাততালি দিয়া উঠিতাম। ধনপোতা মনসাপোতার খানিক দক্ষিণে। উহার হইতে নিকটে মানুষের বাস দেখা যাইত না, সেখানে যাইতে গাটা যেন একটু ছম্ ছম্ করিত। একদিন একলা গিয়াছিলাম, বড় ভয় করিয়াছিল। তবু কিন্তু কতকগুলা লাল কুঁচ তুলিয়া আনিয়াছিলাম। লাল কুঁচ দেখিলে এখন ভয় করে। অনুজ অক্ষয়চন্দ্রের একটি ছেলে আমার দেওঘরের বাসায় একটি কথা বলিয়াছিল, সেই কথাটি মনে পড়ে, আর ভয় করে। সে কথাটি এই, "রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, এ হেন সুন্দরী বনে কেন দেখা?" রক্তে ডুবু ডুবু কাজলের ফোঁটা, একি সেই Lady Macbeth-না কি? আমি তবে ভারি দুঃসাহসিক, একলা Lady Macbeth পোতায় গিয়াছিলাম! তখন Lady Macbeth—পোতায় গিয়া ভয় হইয়াছিল, এখন সেই কথা ভাবিতে আনন্দের সীমা থাকে না। মানুষের জীবন সত্য সত্যই আনন্দময়। আর একটা আনন্দের কথা বলি। সেই পূজার আনন্দ :—

৭ই আশ্বিন সপ্তমীপূজা। ৪ঠা আশ্বিন ইস্কুল করিয়া ছুটী হইবে। আমরা ৫ই আশ্বিন বাড়ী যাইব। ৫ই আশ্বিনের জন্য আমরা ধড়ফড় করিতেছি। আজ ২৯ এ শ্রাবণ। আমরা সাতটী সমবয়স্ক ছেলে এক বাড়ীতে থাকিতাম। আমার অগ্রজ দ্বারকানাথ, আমার দুই ভাইপো প্রিয়নাথ ও অঘোরনাথ, আমার জাটতুত ভাই উমেশচন্দ্র, আমার মাসতুত ভাই রাধিকাপ্রসাদ, এবং আমার জাঠতুত ভাই বৃন্দাবনচন্দ্রের কনিষ্ঠ শ্যালক বৈদ্যবাটী নিবাসী গিরিশচন্দ্র মিত্র। দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। আছি কেবল আমি, রাধিকা, এবং গিরিশ ভায়া। কর্ত্তারা আমাদিগকে রাত্রি নয়টার সময় শুইবার অনুমতি করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিনের পড়া যতক্ষণ না নিখুঁতরূপে আয়ত্ত হইত, ততক্ষণ

আমরা শুইতাম না। শুইতে কোন দিন ১০টা, কোন দিন ১১টা, কোন দিন ১২টা বাজিয়া যাইত। তথাপি পূজা যখন নিকটবর্ত্তী হইত, তখন আমরা কয় জনে সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে উঠিয়া একত্র হইতাম, এবং বাড়ী যাইবার আর ৩৫ দিন আছে, এই বলিয়া গা-টেপাটিপি করিতাম, আর একটু চাপা রকম খিল খিলও করিতাম। তাহার পর দিন আবার তেমনি করিয়া একত্র হইয়া বলিতাম, আর ৩৪ দিন আছে, আর গা-টেপাটিপি ও খিল খিল করিতাম। এইরূপে যখন ৪ঠা আশ্বিন আসিত, তখন আবার সূর্য্যোদয়ের ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে উঠিয়া তেমনি একত্র হইয়া "কাল হে কাল" মহোল্লাসে এই কথা বলিতাম, আর শব্দ না হয় এমনি করিয়া নাচিতাম, কারণ, কর্ত্তারা তখনও নিদ্রিত। এই সব কথা মনে উঠিলে ঠিক সেই সময়ে গিয়া পড়িতাম, দ্বারকানাথ, প্রিয়নাথ, অঘোরনাথ ও উমেশচন্দ্র, যাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা যেন আবার সশরীরে ফিরিয়া আসিতেন, আর সকলে জড়াজড়ি করিয়া "কাল হে কাল" বলিয়া আবার সেইরূপ উল্লাস উপভোগ করিতাম। এইরূপ পূর্ব্ব কথা মনে উঠিলে, পূর্ব্বের সেই আনন্দ ও উল্লাসও যেন শরীর প্রাপ্ত হইয়া মনের ভিতর আসিত, বৃদ্ধ বয়সে আবার ঠিক সেইরূপ বালক হইয়া বাল্যকালের সেই নির্ম্মল শরীরী আনন্দ ও উল্লাস প্রত্যক্ষ করিয়া অসীম আনন্দ ও উল্লাস উপভোগ করিতাম। আজ ৫ই আশ্বিন। আজ বাড়ী যাইব। কেমন আহ্লাদ করিতে করিতে যাইতাম, *Oriental Miscellany* নামক একখানি ইংরাজী মাসিকপত্রে একবার লিখিয়াছিলাম। সেই লেখাটুকু প্রথম ক্রোড়পত্রে তুলিয়া দিব। পূজার সময় বাড়ী যাইবার যে এত আনন্দ, তাহা কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম বলিয়া কত যে বাড়িয়া যাইত, তাহা আর কি বলিব? ইস্কুলে জল খাইবার জন্য যে পয়সা পাইতাম, তাহাই বাঁচাইয়া বাঁচাইয়া কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি এবং আটচালায় জ্বালাইবার জন্য একটি লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। কর্ত্তাদের প্রতিমার সাজসজ্জার দিকে বেশী দৃষ্টি ছিল না, তাঁহাদের বেশী দৃষ্টি ছিল কাঙ্গালী বিদায়ের দিকে, এবং লোকজনের ভোজনের দিকে। আমরা তখন বালক, প্রতিমার সাজ সজ্জা ভাল হয়, আমাদের তখন বড় ইচ্ছা। তাই আমরা আপন হাতে প্রতিমা সাজাইতাম, এবং কার্ত্তিকের জন্য ভাল পাগড়ি কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর কর্ত্তাদের বাহারের দিকে দৃষ্টি ছিল না বলিয়া আমাদের তত বড়

আটচালায় চারিটির বেশী বড় লণ্ঠন জ্বলিত না। সেটা আমাদের ভাল লাগিত না। তাই আমরা প্রতিবৎসর একটা করিয়া ছোট লণ্ঠন কিনিয়া লইয়া যাইতাম। আর সেই লণ্ঠনটি যখন জ্বলিত, তখন ভাবিতাম, আমাদের খুদে লণ্ঠনটি সরকারী বড় বড় লণ্ঠনগুলির চেয়েও ভাল। এই সব করিয়াও যে ক্ষোভটুকু থাকিত, তাহা মিটাইবার জন্য সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী, চারি দিন খুব ভোরে উঠিয়া স্নান করিয়া আটচালায় সমস্ত নৈবেদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতাম। এইরূপে আমরা Volunteerএর কাজ করিতাম। এ কাজ করিয়া যে পবিত্র আনন্দ অনুভব করিতাম, তাহার বর্ণনা হয় না, কিন্তু এই বৃদ্ধ বয়সেও এই রকম করিয়া আবার অনুভব করিয়াছি। বিধাতার কি অপূর্ব্ব মঙ্গলময় বিধান! তিনি বুড়ো মানুষকেও বালক করিয়া বাল্যকালের নির্ম্মল পবিত্র আনন্দের অধিকারী করেন! কয়দিনই সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেলে, আমরা মহা আনন্দে আটচালায় নাচিতাম। ঢুলী নাচের বাজনা বাজাইত, আর আমরা নাচিতাম। চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে ঠিক সেই নাচ নাচি, এবং ঠিক সেই আনন্দ অনুভব করি। হায়! দেশের কি দুর্ভাগ্য! এখনকার বালকে বুড়োর মত হইয়াছে, লজ্জায় ও গাম্ভীর্য্যে এক কিম্ভূতকিমাকার জীব। যাহাদের বালকে আনন্দ ও উল্লাস করিতে পারে না, তাহাদের মঙ্গল হওয়া কি সম্ভব? তখন বুড়াতেও বালকের ন্যায় আনন্দ করিত। আমাদের সেই পরাণ জেঠা বয়সে প্রায় সত্তর; কিন্তু আনন্দে উল্লাসে আমাদের সঙ্গে নাচিতে ঠিক আমাদেরই মতন বালক। নবমীর বলিদানের পর যে কাদামাটী হইত, পরাণ জেঠাই ত তাহার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। নিজে কলসী কলসী জল ঢালিয়া নিজে প্রথমে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতেন। আমরা অমনি নাচিয়া উঠিতাম। ১০।১৫ জনে গড়াগড়ি আরম্ভ করিতাম, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, সেই কাদা-মাখা গায়ে পরাণ জেঠার সঙ্গে পাড়ার অন্য অন্য পূজা-বাড়ীতে গিয়া সেখানে আবার কাদামাটী করিতাম, আমাদের ঢাক ঢোল আমাদের সঙ্গে যাইত। ক্রমে অন্যান্য বাড়ীর ঢাক ঢোলও আমাদের সঙ্গ লইত। যখন শেষ বাড়ীতে কাদামাটী করিয়া নাচিতে নাচিতে পুকুরে নাইতে যাইতাম, তখন ঢাক ঢোলের শব্দে দশখানা গ্রাম কাঁপিয়া উঠিত, দশখানা গ্রামের লোক ছুটিয়া দেখিতে আসিত। তখন আমাদের বড় পুকুরে ঝপাং ঝপাং করিয়া পড়িয়া পুকুর তোলপাড় করিতাম। সেই সেকালের

উল্লাস, কিন্তু বুড়ো বয়সে এই রকম করিয়া চক্ষু বুজিয়া যেন শরীরিবৎ আবার দেখিয়াছি, দেখিয়া তাহার সহিত আবার সেই তখনকার মতন মাতামাতি করিয়াছি। মানুষের সুখের সীমা আছে কি? মানুষের সুখের ভাণ্ডার ফুরাইবার নয়। সকলেরই জীবনে, বিশেষ বাল্যকালে, এইরূপ আনন্দোপভোগ হইয়া থাকে। বুড়া হইয়া সকলেই যদি আমার মতন চক্ষু বুজিয়া সেই বাল্যানন্দের ছবি মনে ফলাইয়া তোলেন, সকলকেই স্বীকার করিতে হয় যে, কৃপাময় ভগবানের মঙ্গলময় বিধানে পৃথিবীতে সকলেরই সুখের ভাণ্ডার যথার্থই অসীম অনন্ত অফুরন্ত। লোকে যে এখন বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, পৃথিবীতে সুখ নাই,

"অনেক দুঃখ আছে হেথা, এ জগৎ যে দুঃখে ভরা",

এ কেবল কুশিক্ষা, কুদৃষ্টান্ত এবং ঈশ্বরপরায়ণতার অভাবের ফলে বলিতেছে। ঐ যে ইংরাজ কবি বলিয়াছেন,—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought—

ওটা এখানকার ইউরোপের একটা ঢং; সুতরাং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বড় ভাল লাগে, এবং ইংরাজীওয়ালা বাঙ্গালীর বাঙ্গালা সাহিত্যে এত প্রবল এবং আদৃত হইতেছে। তা নয়, তা নয়; এই বুড়ো বয়সেই বাল্যকালের অসীম, নির্ম্মল আনন্দের সাক্ষাৎ পাইয়া আমি জোর করিয়া বলিতেছি— এ জগৎ সুখে ভরা, মানুষের সুখের পরিমাণ হয় না—ভগবানের দয়া ও কৃপা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে বৃদ্ধ বয়সে আমার বর্ণিত প্রণালীতে বাল্যকালকে মূর্ত্তিমান করিয়া বাল্যানন্দ প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। কাজ অতি সহজ। চক্ষু বুজিয়া ধ্যানস্থ হইলে ভগবানেরই নিয়মে অতি সহজে সম্পন্ন হয়।

পূজার কথা ভাবিতে ভাবিতে, সন্ধিপূজার ভীষণতাপূর্ণ আনন্দের কথা মনে উঠিল। গভীর রাত্রে সন্ধিপূজা না হইলে আমাদের মন খারাপ হইত। গভীর রাত্রে হইলে আমোদের আনন্দের সীমা থাকিত না। সন্ধিবলিদান একটা বিষম ব্যাপার। ঠিক মুহূর্ত্তে না হইলে মায়ের পূজা একরকম পণ্ড হয়, গৃহস্থের ঘোর অনিষ্টের সম্ভাবনা। মুহূর্ত্ত-মাহাত্ম্য সকল মহৎ কাজেই আছে; কিন্তু আমাদের সন্ধিপূজায় যেমন দেখিয়াছি, আর কিছুতেই তেমন দেখি নাই। একটু বলি:—

সন্ধিপূজা ও বলিদান আমাদের দুর্গাপূজার সর্ব্বপ্রধান অংশ। আজ রাত্রে সন্ধিপূজা ও বলিদান। সকাল হইতে মেয়ে পুরুষ, পাড়া প্রতিবেশী সকলেরই

মুখে কেবল ঐ কথা—সকলেই যেন ভীত সন্ত্রস্ত। সন্ধ্যার সময় তাঁবি বসিল। সেটা কি, বোধ হয় অনেকে জানেন না। যখন ঘড়ি ছিল না, তখন সন্ধিপূজা ও বলিদানের মুহূর্ত্ত নিরূপণ করিবার জন্য তাঁবি পাতা হইত। ঘড়ির চলন হইলেও, পুরাতন বুনিয়াদি বাড়ীতে তাঁবি পাতা হইত। আমাদের বাড়ীতে এখনও পাতা হয়। আমাদের পাড়ার আচার্য্যেরা চিরকাল আমাদের বাড়ীতে তাঁবি পাতিতেছেন। এখনও তাঁহাদেরই এক জন পাতেন। ঠিক সূর্য্যাস্তের সময়, বৈঠকখানায় একটা নূতন হাঁড়িতে এক হাঁড়ি জল বসান হয়। একটি পাতলা তামার বাটির তলায় এমন একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যে, বাটিটি হাঁড়ীর জলের উপর বসাইয়া দিলে যতক্ষণে জলপূর্ণ হইয়া ডুবিয়া যায়, ততক্ষণে ১ দণ্ড হয়। ডুবিবামাত্র উহা তুলিয়া আবার বসাইতে হয়। উহা যতবার ডোবে, হাঁড়ির গায়ে ততবার এক একটি চূণের দাগ দিতে হয়। তাহাতে দণ্ডের সংখ্যা ঠিক থাকে। রাত্রি যত দণ্ড হইলে সন্ধিপূজা আরম্ভ হয়, হাঁড়ির গায়ে ততগুলি চূণের দাগ পড়িলেই পুরোহিত মহাশয়কে চেঁচাইয়া বলা হয়, মহাশয়, এতবার তাঁবি পড়িয়াছে। সন্ধিপূজা আরম্ভ হইবে শুনিলে আমি তাঁবির জায়গা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে সন্ধিপূজার মন্ত্র শুনিতে যাইতাম। চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া দেখিতাম, বসু গোষ্ঠীর সমস্ত স্ত্রীলোক সেখানে গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, চণ্ডীমণ্ডপ ধূনার ধোঁয়াতে পরিপূর্ণ, মাকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না, আর চণ্ডীমণ্ডপে ৺কালী-পূজার দীপান্বিতার ন্যায় অসংখ্য দুর্গাপ্রদীপ জ্বলিতেছে—কারণ, সন্ধিপূজায় মায়ের চামুণ্ডারূপে পূজা করা হয়,—বড় শক্ত পূজা. সেই ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তের মধ্যে, দুই একটি নয়, কোটী যোগিনীর পূজাও শেষ করিতে হয়, আর সন্ধি-বলিদানের সময় মহিষের শৃঙ্গোপরি রক্ষিত সরিষা যতটুকু সময় থাকে, ততটুকু সময়ের জন্য মায়ের একবার আবির্ভাব হয়, এবং সেই আবির্ভাব-কালের মধ্যে যাহাতে সন্ধিবলিদান হয়, তাহাও করিতে হয়। বড় ভয়ানক, বড় শক্ত পূজা! ঐ যে মহিষের শৃঙ্গের সরিষার কথা, ওটা অতুলনীয় কবিকৌশল। সেই ভীষণ পূজার দুই একটা মন্ত্র শুনুন; শুনিলে বুঝিবেন, এ পূজার কল্পনা যাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছুই নাই, অন্ততঃ অসাধ্য হওয়া উচিত নয়। এমন ভীষণতা যাহাদের এত প্রিয়, এত মনের ও হৃদয়ের সামগ্রী, তাহাদের কিছুতেই ভীত ত্রস্ত

হওয়া উচিত নয়; তাহারা ভীত ত্রস্ত হইলে বুঝিতে হয়, তাহাদের সারবত্তা আর নাই, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এত স্ত্রী ও পুরুষ, কিন্তু কাহারও মুখে কথাটি নাই, এমন কি, চপল চঞ্চল বালকেরা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক নিস্তব্ধ, আমি যেন সে বিচ্ছু নই, সে বালক নই, রোমাঞ্চিত হইয়াছি; ঢাকী ঢুলী ঢাক ঢোল ঘাড়ে করিয়া তাহাদের সেই একচালাখানি ছাড়িয়া আটচালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা থাকিয়া থাকিয়া "মা গো" "মা গো" শব্দ করিতেছেন, ইংরাজীওয়ালারা পর্য্যন্ত তাকিয়া, ফরাস, সট্‌কা ছাড়িয়া যেন স্তম্ভিত হইয়া বসিয়াছেন, ধুনার ধোঁয়ায় আটচালা পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়াছে, আমি কাঁপিয়া উঠিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়াছি, এমন সময়ে যেন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভীত ত্রস্ত করিয়া তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রপাঠ করিলেন ঃ—

জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎপীনোন্নতপয়োধরাম।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে ধ্যেয়ং খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটিভীষণাননম্॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্।
কিঞ্চিদূর্দ্ধ্বং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥
স্তূয়মানঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ॥

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা॥
অষ্টাভিঃ শক্তিভিস্তাভিঃ সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতাম্॥
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

ইহা দুর্গাপূজা নয়, কালীপূজা নয়, ইহা চামুণ্ডার পূজা—যে মূর্ত্তিতে মা অসুর নাশ করেন, ইহা মায়ের সেই চামুণ্ডামূর্ত্তি। এ মূর্ত্তির ধারণা আমাদের আর হয় না—ভীষণতা যতদিন আমরা এমনই করিয়া আবার ভোগ করিতে না পারিব, ভীষণতায় যতদিন আবার এমনই করিয়া ধ্যানস্থ হইয়া থাকিতে না পারিব, ততদিন আমাদের এ মূর্ত্তির ধারণা আর হইতে পারিবেও না। আমরা এখন বছর বছর শক্তি, আদ্যাশক্তির পূজার কথা কহিয়া থাকি, কিন্তু সে কেবল ফাঁকা কথা। আদ্যাশক্তির মর্ম্ম আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ভুলিয়া গিয়া আমরা বেজায় মোলায়েম হইয়া পড়িয়াছি, মোলায়েম হইয়া আমরা আর কষ্ট সহিতে পারি না, কষ্ট দেখিতে পারি না, সুতরাং কঠোর হইতেও পারি না। তাই আমরা ভীষণতা দেখিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দে ভরপূর না হইয়া ভীত ত্রস্ত হই—বলি, ও ছাগবলি বন্ধ কর, ও রক্তপাত বড় নিষ্ঠুরতা। আরে রক্তপাত যদি নিষ্ঠুরতা, তবে কোমলতা আসিবে কোথা হইতে? যাঁহারা এই ভীষণ পূজার কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের করুণা কোমলতার কথা এখনি বলিব, শুনিও।

সন্ধিপূজা শেষ হইলেই দেখিলাম, আটচালায় হাড়িকাঠ পোঁতা হইয়াছে, বৃদ্ধ কালী কামার স্নান করিয়া ছাগল নাওয়াইয়া আনিয়া মায়ের সম্মুখে উপস্থিত। আমি অমনই চণ্ডীমণ্ডপ হইতে নদীর ধারে গেলাম। আমাদের সদর বাড়ীর পূর্ব্ব দিকেই কৌশিকী নদী। আমরা ৪।৫ জনে সেই নদীর ধারে গিয়া বসিলাম। ঘড়ি দেখিয়াও সন্তুষ্ট নয়, তাঁবি পাতিয়াও সন্তুষ্ট নয়, শুনিতে হইবে হরিপালের রায়েদের বাড়ীর বন্দুকের শব্দ। সেখানে যেমন সন্ধিবলিদানের কোপ হয়, চিরকাল অমনই বন্দুক ছোঁড়া হয়। যেমন বন্দুকের শব্দ শুনা, অমনই চেঁচাইয়া বলা—বন্দুক হইয়াছে। অমনই পুরোহিত হাড়িকাঠ পূজা করিলেন—কর্ত্তারা তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয়ের অনুমতি চাহিলেন—ঘোষাল মহাশয় বলিলেন—হাঁ, ঠিক সময় হইয়াছে, অষ্টমী দণ্ড কাটিয়াছে। অমনই মা মা শব্দে সেই ভীষণতা ভীষণতর হইয়া উঠিল। ঈশ্বর দাদা ও কানাই জ্যেঠার বাড়ীর

লোক সেই সংবাদ লইয়া ছুটিল। খুঁটি ছাড়, খুঁটি ছাড় শব্দ উঠিল; বৃদ্ধ কালী কামার সেই বৃহৎ খাঁড়া তুলিয়া কোপ করিল—বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল— যে সকল বাড়ীতে পূজা, সর্ব্বত্রই সন্ধিবলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিল। ঘর দ্বার গাছপালা পথঘাট স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকা— সমস্ত গ্রাম যেন কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে যে সন্ধিবলিদান হইয়া গেল, ইহাতে সমস্ত গ্রাম আনন্দে ভরপূর হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। এমন তন্ন তন্ন করিয়া যাঁহারা ভীষণতার সাধনা করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালী হইলেও তাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত মানুষ, মনুষ্যমধ্যে যথার্থ আর্য্য। ভীষণতা লইয়া যে খেলা করিতে ভালবাসে সেই পৃথিবী লাভ করে— প্রকৃত মানুষ হয়। আট্‌লাণ্টিকরূপ ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই ইউরোপ আমেরিকার অন্নভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। আর উত্তমাশা অন্তরীপের ভীষণতার সহিত খেলা করিতে পারিয়াছিল বলিয়া ইংলণ্ড ভারতের স্বর্ণভাণ্ডার লাভ করিয়াছে। তান্ত্রিক সাধক ভীষণতা লইয়া খেলা করে বলিয়া সাধকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—মানুষের মধ্যে jelly নয়, লৌহদণ্ডবৎ কঠিন ও শক্ত। ধ্রুব ছিলেন তান্ত্রিক সাধক। তাই বিধাতার নিকট হইতে ধ্রুবলোক আদায় করিতে পারিয়াছিলেন। তান্ত্রিকের শবসাধনাদি বড় ভীষণ সাধনা। বোধ হয়, প্রহ্লাদও তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তেমন আষ্টে পৃষ্ঠে দড়—জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, বিষ খাইয়া হজম করে, হাতীর পদভরে ভাঙ্গে না—তান্ত্রিক সাধক না হইলে হইতে পারে কি? ভবানীর বরপুত্র ছত্রপতি শিবাজী তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। আমরা jelly হইয়া পড়িয়াছি—তাই কষ্ট দেখিলে কাতর হইয়া পড়ি, কঠোরতাকে বর্ব্বরতা বলি, আর কঠিন কাজে পশ্চাৎপদ হই। আমাদের দুর্গোৎসব, দুর্গোৎসব নয়, কমলাকান্তের দুর্গোৎসবও দুর্গোৎসব নয়। আমাদের দুর্গোৎসব পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য—Iliad অপেক্ষা বড়, Æneid অপেক্ষা বড়, Paradise Lost অপেক্ষা বড়, Inferno অপেক্ষা বড়, Jerusalem Delivered অপেক্ষা বড়। এই মহাকাব্য যাহাদের হৃদয়োদ্ভূত, আমরা তাহাদের উপযুক্ত বংশধর নহি। যদি জগতে আবার উঠিতে হয়, আমাদিগকে তান্ত্রিক সাধক হইতে হইবে—তান্ত্রিক সাধনায় ইন্দ্রিয় জয় করিতে হইবে। সে সাধনায় ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বাড়ে, ওটা বড় ভুল কথা। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্যই সে সাধনা। আমরা বড় ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়াছি। তাই আমাদের তান্ত্রিক

সাধনার প্রয়োজন হইয়াছে। আমাদিগকে লোহার সমান কঠিন হইতে হইবে।

আবার ভোরে বাজনা শুনিয়া ঘুম ভাঙ্গিল—অমনই প্রাণ যেন কাঁপিয়া উঠিল—আজ যে বিজয়া দশমী—মা আজ বাড়ী যাবেন। স্নান করিয়া নৈবেদ্য করিয়া দিলাম। কিন্তু আজ নৈবেদ্যের সংখ্যা অল্প, প্রধান নৈবেদ্য একেবারেই নাই—বড় মন খারাপ; আনন্দের পরিবর্ত্তে আজ ঘোর নিরানন্দ—কিন্তু বড় আনন্দময় নিরানন্দ। আনন্দময়ী তিন দিন—তিন দিন কেন—তিন মাসের অধিক আনন্দ দান করিয়া আজ বাড়ী যাইবেন বলিয়া আজ আনন্দময় নিরানন্দ— আনন্দাত্মক বিষাদ। চণ্ডীমণ্ডপে দর্পণ বিসর্জ্জন আরম্ভ হইল। স্ত্রীলোকেরা আজ মলিন বস্ত্র পরিয়া গলায় কাপড় দিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। কর্ত্তারা বৈঠকখানা ছাড়িয়া চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়াছেন—আটচালায় অসংখ্য গ্রামবাসী গলায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তন্ত্রধারক ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ঘোষাল মহাশয়ের গলা বড় মিষ্ট ছিল, এবং অনুরাগভরে কথা কহিলে সে গলা একটু কাঁপিত। সেই মিষ্ট গলায় ঈষৎকম্পিত সুরে ঘোষাল মহাশয় মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন :—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি।
সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চ ॥

মন্ত্র শুনিয়া সকলেরই চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হইল। সকলেই ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কচি মেয়েটি বিবাহের পর দিন যখন প্রথম শ্বশুরবাড়ী যায়, তখন বিবাহবাড়ীতে কেবলই যেমন ফোঁস ফোঁসানি, আজ বিজয়া দশমীর দিন বাঙ্গালীর বাড়ীতে তেমনই কেবলই ফোঁস ফোঁসানি। দুর্গতিনাশিনী দুর্গা তো আমাদের দেবী নয়, আমাদের ঘরের মেয়ে, আমাদের সতীসাধ্বীদের গর্ভের সন্তান। তাই ত আজ বৈকালের সেই অপূর্ব্ব, অননুভবনীয়, অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয় ব্যাপার। মায়ের প্রতিমা নদীতে নিক্ষেপ করিবার সময় হইয়াছে। প্রতিমা চণ্ডীমণ্ডপ হইতে আটচালায় নামান হইয়াছে। পুরুষেরা বাটীর বাহিরে গিয়াছেন—ঢাকী ঢুলী বাটীর বাহিরে গিয়া বিসর্জ্জনের বাজনা আরম্ভ করিয়াছে। সদরদরজা বন্ধ করা হইয়াছে। স্ত্রীলোকেরা মাকে বরণ করিতে আসিয়াছেন। জলের ঝারা দিয়া তাঁহারা প্রতিমা প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর মাকে বরণ করিলেন। তাহার

পর কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের, লক্ষ্মীঠাকুরাণীর, সরস্বতীর, গণেশের, কার্ত্তিকের, সিংহবাহিনীর সিংহের, মায়ের বর্ষাবিদ্ধ অসুরের পর্য্যন্ত মুখে সন্দেশ গুঁড়া করিয়া এবং ছেঁচাপান টিপিয়া টিপিয়া দিলেন, এবং প্রত্যেককে মাথার দিব্য দিয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে আবার আসিতে বলিলেন, সর্ব্ব-শেষে আপন আপন বস্ত্রাঞ্চলে সিংহটি অসুরটির পর্য্যন্ত প্রত্যেকের পদধূলি পরম পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিলেন—তাহার পর আবার কাঁদিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে আমার মা প্রতিমার পিছনে দাঁড়াইয়া বস্ত্রাঞ্চল পাতিলেন, আমার পিতা সম্মুখ দিক হইতে তাহাতে কনকাঞ্জলি অর্থাৎ থালা শুদ্ধ চাল ও টাকা ফেলিয়া দিলেন। তখন পুরুষেরা প্রতিমা নদীতীরে লইয়া গেলেন। আচার্য্যদিগের নদীতে চিরকাল আমাদের প্রতিমা বিসর্জ্জন হয়। সেই নদীতীরে প্রতিমা বসান হইল। অনেকক্ষণ রাখা হইল। কারণ নদীর অপর পারে অনেক স্ত্রীলোক মাকে দেখিবেন বলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারাও কাঁদিতেছেন। তাহার পর প্রতিমা নদীর জলে নিমজ্জিত হইল। আমরা বালক—দুই একখান ডাক খুলিয়া লইলাম। তাহার পর ঢাকী ঢুলী সঙ্গে লইয়া নীলকণ্ঠ পাখী দেখিতে যাওয়া হইল। ঢাক ঢোল কিন্তু বাজি-তেছে না। প্রতিবৎসরই নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়া তবে বাড়ী ফেরা হয়। চিরকাল শুনা আছে যে, বিসর্জ্জনের পর মহাদেব নীলকণ্ঠ পাখীর রূপ ধারণ করিয়া একবার দেখা দিতে আসেন। প্রতি বৎসরই বাগ্দীপাড়ায় একটা নয় আর একটা গাছে নীলকণ্ঠ পাখী দেখিয়াছি। দেখিতে পাওয়া গেলেই ঢাক ঢোল বাজিয়া ওঠে, আর পাখী উড়িয়া যায়। সকলে পাখীকে প্রণাম করিয়া বাড়ীতে ফিরি। বাড়ীতে ঢুকিয়া চণ্ডীমণ্ডপ শূন্য দেখিয়া বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু তখনই আবার আহ্লাদে বুক নাচিয়া উঠে। সে কিসের আহ্লাদ বলি শুন। বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর সমস্ত বাঙ্গালার স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ শিশুকন্যা শিশুপুত্র ধনী নির্ধন সকলেই আপন আপন অবস্থানুসারে আজিও নূতন বস্ত্রাদি পরিয়া থাকে। আমরাও তখন পরিতাম। কিন্তু সে জন্য তখন আমার এত আহ্লাদ হইত কেন? সমস্ত বৎসর ধরিয়া সেই আনন্দোপভোগের প্রতীক্ষায় থাকিতাম কেন, খুলিয়া না বলিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে না। আমি এবং আমার দাদা দ্বারকানাথ আমার বাপের দুই পুত্র ছিলাম। বাবা আমাদিগকে কখন ভাল কাপড় জুতা দিতেন না। আমরা সংবৎসর মোটা

কাপড় পরিয়া, মোটা মার্কিণ থানের পিরাণ এবং মুড়ি শেলাই চাদর গায়ে দিয়া এবং নাগরা জুতা পায় দিয়া স্কুলে বল, নিমন্ত্রণে বল, সর্ব্বত্রই যাইতাম। কেবল পূজার সময় বাবা আমাদের দুই ভাইকে একখানি করিয়া ঢাকাই কাপড় ও চাদর, একটি করিয়া সাদা ফুলতোলা কাপড়ের জামা, একজোড়া করিয়া সাদা মোজা এবং এক জোড়া করিয়া জরির জুতা দিতেন। সেগুলি আমরা বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা-বিসর্জ্জনের পর পরিয়া যাত্রা করিয়া আসিয়া সদরবাটীতে শান্তিজল লইয়া সকলকে প্রণাম করিয়া বেড়াইতাম। সেই কাপড় জুতা পরিবার আনন্দের প্রত্যাশায় সংবৎসর থাকিতাম। তাই আজ বিসর্জ্জন-জনিত অত বিষাদের মধ্যেও অত আনন্দ। চক্ষু বুজিয়া যখন বিজয়া দশমীর কথা ভাবি, তখন সেই অতুলনীয় বিষাদও যেমন, সেই অপরিমিত আনন্দও তেমনই শরীর লাভ করিয়া আবার আমার কাছে আসে, আর তখনকারই মতন আমাকে উৎফুল্ল করিয়া দেয়। সেটা কত প্রত্যক্ষবৎ বলি শুন। এক দিন চক্ষু বুজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। আমার স্ত্রী বলিলেন—শুধু শুধু অত হাসি কেন? আমি বলিলাম—শুধু শুধু নয়। ও আমার বাল্যকালের হাসি। স্ত্রী—সে আবার কি রকম? আমি—তবে বলি শুন। আমরা নয়ানচাঁদ গলির একটা বাড়ীতে অনেক দিন ছিলাম। তখন ইস্কুলে পড়িতাম। কিন্তু বৃন্দাবন দাদার এমনই শাসন ছিল যে, ইস্কুলে যাইবার সময়ে ভিন্ন অন্য কোনও সময়ে আমরা সদর দরজার চৌকাঠের বাহিরে পা দিতে পারিতাম না। একটা রবিবারে বেলা ৮টা কি ৯টার সময় চৌকাঠের উপর বসিয়া আছি, এমন সময় একটি লোক আসিল। কিছু দীর্ঘাকার, কৃষ্ণবর্ণ, তাহার চক্ষু দুটি এত বড় যে, ঘুমাইলেও সমস্তটা বুজিত না। বোধ হয় নেশা করিবার দরুণ তাহার চক্ষু এরূপ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন আমাদের বাড়ীতে তিলকুটো সন্দেশ দিয়া যাইত। সেদিন কিন্তু তাহার হাতে সন্দেশের হাঁড়ি ছিল না। আমি মনে করিলাম—বোধ হয় সন্দেশের দাম পাওনা আছে, তাহাই আদায় করিতে আসিয়াছে। এমন সময়ে আমার গিরিশ ভায়া আসিয়া তাঁহার সেই স্বাভাবিক উদ্ধত ভাবে তাহাকে বলিলেন—কে হে তুমি, যাও, যাও, যাও। সে কিন্তু গম্ভীরভাবে তাহার সেই মোটা গলায় আধ বোজা চক্ষে উত্তর করিল—চিন্তে পারবে কেন; চিন্তে পারবে কেন? হাঁড়ি নাই যে। হাঁড়ি নাই যে। আমরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। এ সেই হাসি, বুঝিলে?

আটচালা জুড়িয়া সপ পাতা হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে স্ত্রীলোকেরা বসিয়াছেন। ঘোষাল মহাশয় এবং আমাদের কুলপুরোহিত ৺ঈশ্বরচন্দ্র বালিয়াল মহাশয় এবং আমাদের পাড়ার ৺কালাচাঁদ আচার্য্য মহাশয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মস্তকে মায়ের অর্ঘ্য বুলাইয়া ছোঁয়াইয়া, মায়ের ফুল দিয়া আম্রশাখা দ্বারা সর্ব্বশরীরে শান্তি জল সেচন করিতেন। তাহার পর নূতন কাগজে নূতন কালি দিয়া নূতন কলমে তিনবার করিয়া এইরূপে দুর্গানাম লেখা হইত।

শ্রীশ্রীদুর্গা	শ্রীশ্রীদুর্গা	শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং	শরণং	শরণং

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বকনিষ্ঠ পর্য্যন্ত পর পর দুর্গানাম লেখা হইত। তাহার পর জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ অনুসারে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে প্রণাম করিত, তাঁহাদের পায়ের ধূলা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহাদের সহিত কোলাকুলি করিত। তাহার পর অন্দরে গিয়া স্ত্রীলোকদিগকে প্রণাম করিতাম, এবং তাঁহাদের পায়ের ধূলা লইতাম, তাঁহারাও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং চিরকাল বেঁচে থাক, বিদ্যা হউক, ধন হউক, চিরকাল এমনি করিয়া মাকে আনিও, এই বলিয়া আমাদের দাড়িতে হাত দিয়া চুমো খাইতেন। আমরা আর এক যায়গায় যাইতাম, সেখানেও ঐরূপ হইত, এবং রসকরা বা থইচুর একটু একটু খাইতাম। বাগ্দীপাড়ায়, মুসলমানপাড়ায় এবং চাষাপাড়ায় গিয়াও এইরূপ প্রণাম করিতাম, পায়ের ধূলা লইতাম, হইল বা মিষ্টমুখ করিতাম, আর প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ লইয়া নাচিতে নাচিতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম। তখন রাত্রি প্রায় দুই প্রহর। সে যে কি অপূর্ব্ব সুখ, এখনকার লোকে তাহা জানেন না, জানেন না বলিয়াই কাহারও সুখে সুখানুভব, কাহারও দুঃখে দুঃখানুভব করেন না। বঙ্গে বিজয়া দশমী আর হয় না। বঙ্গে সুখে সুখী দুঃখে দুঃখীও আর নাই। বাঙ্গালীর উত্থান বড় কঠিন হইয়াছে। বাঙ্গালী বলিদানে বিরক্ত ও বিমুখ হইয়াছে। কিন্তু বলি ভিন্ন বল ও বিভব অসম্ভব। তাই সন্ধিবলিদানের কথা বাঙ্গালীকে বলিলাম। ভীষণতায় ভীত হইলে, ভীষণতায় উন্মত্ত না হইলে, আমরা বলি দিতে পারিব না, বলি দিতে না পারিলে বড় হইতেও পারিব না। "শক্তিপূজা" "শক্তিপূজা" করিলে কিছুই হইবে না। বলি দিতে হইবে। বলিই যে শক্তিপূজার সার বস্তু।

বলি দিতে শেখ, সন্ধিবলিদানের ন্যায়, ভীষণ বলি দিতে শেখ, তবেই শক্তি লাভ করিবে, নহিলে কিছুই হইবে না। কমলাকান্তর দুর্গোৎসবে বলিদান নাই। সে দুর্গোৎসবের কথা ভুলিয়া যাও। ভুলিয়া তান্ত্রিক বাঙ্গালীর তান্ত্রিক প্রণালীতে মায়ের পূজা কর, শক্তি সামর্থ্য সুখৈশ্বর্য্য আসিয়া পড়িবে।

আর একটা আনন্দের কথা বলি। বৈশাখ মাসে ইস্কুলে গ্রীষ্মের ছুটী হইলে বাড়ী যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, কৌশিকী শুষ্কপ্রায়। নদীতে মাছ ধরিবার সুবিধা। নদীর এ পার হইতে ও পার পর্য্যন্ত ৪।৫ হাত অন্তর দুইটা মাটীর বাঁধ দেওয়া হইত। তাহাকে আমরা ডেঁ বলিতাম—আমি প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহামহোপাধ্যায় হইলে নিশ্চয় বলিতাম, ইউরোপে হলাণ্ড দেশকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে ডাইক (dyke) আছে, আমাদের এই ডেঁ শব্দ গ্রিম সাহেবের নিয়মানুসারে তাহারই অপভ্রংশ। যাহাই হউক, দুই বাঁধেই একটা করিয়া ঘুনি বসান হইত। দুই দিক হইতে চূণা মাছ আসিয়া ঘুনিতে ঢুকিত—মধ্যে মধ্যে ঘুনি তুলিয়া তাহা ঝাড়িয়া লওয়া হইত। এইরূপ করিয়া প্রতিদিন ১/০ মণ ১॥০ মণ করিয়া চূণা মাছই ধরা হইত। আর বোয়াল প্রভৃতি বড় বড় মাছ দুই দিক হইতে জোরে আসিতে আসিতে বাঁধে বাধা পাইয়া বাঁধের মধ্যস্থিত খালে লাফাইয়া পড়িত। অমনই চাবিজালে * গ্রেপ্তার হইত। কাঁচা তেঁতুল দিয়া সেই বোয়াল মাছের অম্ল রান্না হইত—তাহা খাইতে অমৃততুল্য হইত—রাশি রাশি খাইতাম, কিছুমাত্র অসুখ হইত না। ডেঁতে যখন আর বেশী মাছ পড়িত না, তখন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সমস্ত নদী গাবান হইত; অর্থাৎ নদীর জল এমনই আলোড়িত করা হইত যে, তলার পাঁক উপরে উঠিয়া পড়িত, সমস্ত জল ঘোলা হইত, আর সমস্ত মাছ তাড়া পাইয়া ভাসিয়া উঠিত। আমরা ছেলেরা নদী গাবাইতাম, আর সেই মাছ ধরিতাম। অধিকাংশই টেংরা মাছ। কিন্তু টেংরার কাঁটার ভয় করিতাম না। টপাটপ ধরিতাম, আর কোঁচড়ে ফেলিতাম। উপরে অসংখ্য চিল উড়িতেছে, জলে অসংখ্য মাছ ছুটিতেছে, আমরা অদম্য সাহসে এবং অসীম আনন্দে একবেলা ধরিয়া পাঁক ভাঙ্গিয়া মাছ ধরিতেছি, আর সেই ডুমুর গাছের তলায় মাকাল ঠাকুরের পূজা

---

* চাবিজাল কাহাকে বলে, যিনি না জানেন, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি—আপনি এই পাড়াগেঁয়ে লোকের পাড়াগেঁয়ে কথা না পড়িলেই ভাল হয়।

হইতেছে। সেওড়াপুলি হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রেল বসিয়াছে। পোড়া রেল-রাস্তার জন্য আমাদের সেই ডুমুর গাছটি মারা গিয়াছে। পোড়া পথটা ঐখানে দু' হাত বাঁকাইয়া লইয়া গেলে আমাদের মনে এত ঘা লাগিত না। একটু বিবেচনা করিয়া লোকের প্রিয়বস্তুর প্রতি একটু একটু লক্ষ্য রাখিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করিলে উহা এত অভিশাপগ্রস্ত হয় না; লোকের মর্ম্মান্তিক দুঃখের কারণ হয় না। কি আনন্দের ব্যাপার, এই বৃদ্ধ বয়সে চক্ষু বুজিয়া তাহা আবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি—সেই অতুলনীয় নির্ম্মল আনন্দ শরীরী হইয়া আবার আমার কাছে আসিয়া আমাকে কোল দিয়াছে। বিধাতার কি করুণা, মানুষের জন্য তিনি অসীম সুখের কি সহজ, সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন! তবু মানুষ বলে, জগতে সুখ নাই, কেবল দুঃখ। মানুষ বড়ই নিমক্‌হারাম, ঈশ্বরে অনাস্থাবান—নহিলে শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সুখের স্রোতে ভাসিত, আনন্দের ঢেউ সামলাইতে পারিত না। আর কবি—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

এরূপ গান না গাহিয়া গাহিতেন,—

Our sweetest songs are those that tell of purest thought.

বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যাহাকে Puberty বা যৌবনোদ্ভেদ বলে, তাহা ঘটিলে বুঝিতে পারা যায়, মন মলিন হইয়া পড়িয়াছে। শৈশবের সে রৌদ্রের সেই রং, উদ্ভিজ্জের সেই রং, বাতাসের সেই সুন্দর শান্তিময় নিশ্বাস আর নাই—অন্তর্জগৎ বহির্জগৎ সবই যেন মলিন বা আবিল হইয়া উঠিয়াছে। কিছুই যেন পূর্ব্বের ন্যায় নিখিরকিচ্, নাই, সকলেতেই যেন কি রকম একটা খিরকিচ আসিয়া ঢুকিয়াছে। তখন শৈশবের সেই আনন্দে আমার আর কুলাইল না। অন্য আনন্দের স্পৃহা হইল। বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইল। বিবাহ হইল। বিবাহ করিয়া যত সুখ যত আনন্দ পাইব মনে করিয়াছিলাম— বিবাহ করিবার পর তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সুখ ও আনন্দ পাইলাম। যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তিনি আমাতে এত মিশিলেন যে, তাঁহাকে একদিন না দেখিলে আমি অস্থির হইয়া পড়িতাম। এই যে ৪৪ বৎসর তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছি, ইহার মধ্যে ২৫ দিন মাত্র তাঁহার কাছ ছাড়া থাকিয়াছি। এই ২৫ দিনের মধ্যে ১৯ দিন

তাঁহাকে দেওঘরে রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া ছুটী মঞ্জুর করাইতে লাগিয়াছিল। ২০ দিনের দিন দেওঘরে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে আর দেখি নাই, তাঁহার কেবল কঙ্কালখানা দেখিয়াছিলাম। তবুও ঐ ১৯ দিনে কলিকাতা হইতে আমি তাঁহাকে ১৯ খানা পত্র লিখিয়াছিলাম। যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া ঢাকায় গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিব না বলিয়া আমার ঋণের পরিমাণ বাড়াইয়াছিলাম। যখন জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া যাই, তখনও ঠিক তাই করিয়াছিলাম। সে ঋণ আমার শোধ হইয়াছে। তাঁহাতে এত মিশিবার কারণ এই যে, তাঁহার গুণে তিনি আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার কোনও পার্থিব কামনাই দেখি নাই। কখনও আমার কাছে একখানি অলঙ্কার কি একখানি ভাল কাপড় কি আপন প্রয়োজনে একটি টাকা চান নাই। তীর্থে যাইতে বলিলে. বলেন, তুমিই আমার তীর্থ, আমি তীর্থে যাইব না। তাই সম্প্রতি আমার মেজ মেয়ে নানুমা আমার বাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানের কথায় বলিয়াছিল, মাকে একদিনও গঙ্গা নাইতে বা কালীঘাটে যাইতে দেখিলাম না। যখন জয়পুরে ছিলাম, তখন পুষ্কর তীর্থ আমাদের অতি নিকটে, কিন্তু আমার পত্নী সাবিত্রীর মাথায় সিঁদুর দিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন নাই। যখন জয়পুর হইতে ফিরিয়া আসি, তখন এলাহাবাদে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে ২ দিন ছিলাম। কিন্তু তখনও তিনি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ডুব দিতে চাহেন নাই। এইরূপ পত্নী পাইয়া আমি চিরজীবন সেই বাল্যকালের নির্ম্মল আনন্দের ন্যায় আনন্দে ভরপূর হইয়া আছি। আমার রোগ শোকের এত যে বাহুল্য, ইহাতে আমি সেই জন্য কাতর নহি। আমার পত্নীর সন্তান বলিয়া আমার হরনাথ, আমার প্রকাশনাথ, আমার নানু, আমার বুগা আমার এত প্রিয়। ইহাদের ভালবাসায় ভক্তিতে আর সেবায় আমি চরিতার্থ। ইহাঁদিগকে সন্তান রূপে পাইয়া আমার জন্ম ও জীবন সার্থক হইয়াছে। ভগবান ইহাঁদিগকে চিরকাল সুখে ও সাধুতায় রক্ষা করুন। ইহাঁদের সাধুতায় আমি সর্ব্বসুখে সুখী। বিধাতার পৃথিবী সুখে ভরা। আর প্রিয়তমা হইয়াছিল আমার সেই তুলুমা। সে আজ কয়দিন মাত্র স্বর্গে গিয়াছে। আমার মহালক্ষ্মীর চক্ষে জল পড়িতেছে—এমন পুণ্যবতীর এমন শোক কেন হয়? কেন হয়, বুঝিয়াছি। আমি মহাপাতকী—আমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছেন বলিয়া

তাঁহার এমন শোক। আমার পত্নীর ন্যায় আমার মেয়েগুলিরও ভাল বস্ত্রালঙ্কারের কামনা নাই। ভগবানের অসীম কৃপায় আমার তিনটি পুত্রবধূও সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্যা—ভাল জামা, ভাল অলঙ্কার কিছুই চান না, গরীবের পুত্রবধূর ন্যায় দিন রাত কেবল সংসারের কাজ করেন। বিধাতার কৃপায় আমার তিনটি জামাই এক একটি রত্ন। তিন জনেই অর্থাৎ শ্রীমান উমাপতি, শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্রলাল, এবং শ্রীমান আশুতোষ, তিন জনেই সুশিক্ষিত, তিন জনেই সচ্চরিত্র, তিন জনেই নিষ্কলঙ্ক। আমার এখন পাঁচটি পুত্র—উমাপতি, জ্ঞানেন্দ্রলাল, আশুতোষ, হরনাথ এবং প্রকাশ-নাথ। পাঁচটি পুত্রের চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও সর্ব্বপ্রকার সাধুতার জন্য আমি অসীম সুখের অধিকারী। ইঁহাদের কাহারও ভোগবিলাসের স্পৃহা নাই। হরনাথ কিছু সৌখীন বটে, কিন্তু তাঁহার ন্যায় পরোপকারপ্রিয় হৃদয়বান উদারচেতা সদালাপী সামাজিক মহামনা বালক আমি আর দেখি নাই। গৃহস্থালী কর্ম্মে প্রকাশনাথ অতুলনীয়। তাঁহাকে মুটেও বলিতে পার, মজুরও বলিতে পার। অল্প বয়সে আশুতোষের ঘাড়ে বৃহৎ সংসারের ভার পড়িয়াছে, কিন্তু তিনি অতি সাবধানে অতি সুবোধের ন্যায় সেই ভার বহন করিতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল স্বাধীনচেতা ধর্ম্মভীরু বাপের স্বাধীনচেতা পুত্র—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অধ্যয়নপ্রিয়; উমাপতি অল্পবয়সে বড় ঘা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মনের মাঝা শক্ত, তিনি অটল অবিচলিত থাকিবেন। ইঁহারা সকলেই দরিদ্রের মহামনা সন্তানের ন্যায় দরিদ্রতা শ্লাঘার বস্তু মনে করেন, এবং দরিদ্রের ন্যায় মোটা চাল চলনে জীবন যাপন করিতে ভালবাসেন। আমার এখন যে পাঁচটি কন্যা আছেন—অর্থাৎ তিন পুত্রবধূ ও দুই কন্যা—ইঁহারা এখনকার মেয়ের মতন নহেন; ভাল গহনা, ভাল কাপড়, ভাল জামা, গন্ধদ্রব্য, এই সকলের অভাবে ইঁহারা অসুখী বা অসন্তুষ্ট নহেন, এবং এ সকল থাকিলেও তাহাতে ইঁহাদের একরূপ অনাদর—এই সকল গুণের জন্য আমি ইঁহাদের পাইয়া অনন্ত সুখে সুখী। আমার সুখের কি পরিমাণ আছে? আমার দুইটি বড় নাতিনী—ইন্দুবালা এবং সরযূবালা বা চমু—ইহারাও যে ইহাদের ঠাকুরমা, মা, খুড়ী জেঠাইয়ের মতন সর্ব্বরকমে নিঃস্পৃহ—সদাই গৃহকাজে ব্যাপৃত, এবং বুড়ো ঠাকুরদাদার সেবায় নিযুক্ত। আর আমার জামাইগুলির ন্যায় আমার নাতিনীজামাই, আমার ইন্দুরাণীর পতি, দাদা অমূল্যচন্দ্র মিত্রও নানাগুণের অধিকারী,—সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র,

নিষ্কলঙ্ক। চরিত্রের বিশুদ্ধতায়, বৃথাভিমানশূন্যতায় এবং চালচলনের নম্রতায় আমার অমূল্যচন্দ্র যথার্থই অমূল্য। আমার পৌত্র শ্রীমান মহেন্দ্রনাথ অল্প বয়সে পিতৃহীন, কিন্তু প্রলোভনপূর্ণ কলিকাতা সহরে নিষ্কলঙ্ক আছেন। আমার সুখের সীমা নাই। আমি বড় ভাগ্যবান। আমার উপর বিধাতার বড়ই কৃপা। আমার কর্ম্মফলে দুই চারিটা শোক পাইয়াছি বলিয়া বিধাতার নিন্দা করিলে বা তাঁহার উপর রাগ করিলে আমার নিমকহারামীর সীমা থাকিবে না, পরকালে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে। বিধাতা পরম সুখদাতা—পৃথিবী নানা সুখে পরিপূর্ণ। কে বলে জগতে সুখ নাই? যে বলে, সে সংসারের শত্রু, ভগবানের শত্রু।

চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মন ভরিয়া গেল, সেই কালীপূজার আনন্দে। দুর্গাপূজা হইয়া গেল, স্কুলের ছুটী ফুরাইল, তবুও কিন্তু আমরা দেশেই রহিয়াছি। কালীপূজা আসিল—কালীপূজার দিন আজো পাঁজো না করিয়া কলিকাতায় আসা হইতে পারে না। পাঁকাটীর আঁজো পাঁজো ত হইবেই। তাহার উপর একটা বৃহৎ অগ্নিকাণ্ড করিতে হইবে। আজ প্রায় এক মাস কাল ধরিয়া আমরা শুকনো তালপাতা কুড়াইয়াছি, এবং ১৫।২০ হাত লম্বা একটা বাঁশে সেই সকল তালপাতা বাঁধিয়াছি, এবং আমাদের বড় পুকুরের পশ্চিম পাড়ে সেই বাঁশটা পুতিয়াছি। আজ কালীপূজা; সন্ধ্যার পরই পাঁকাটির আঁটি জ্বালাইয়া আঁজো পাঁজো করিয়াছি—আঁজো পাঁজো করিতে করিতে সমস্বরে—চীৎকার করিয়াছি :—

আঁজোরে পাঁজোরে বুড়ো বাপ্পারে
ডাব নারকেল চিনির পানা খাওরে।

পাঁকাটির আঁজো পাঁজো শেষ করিয়া নাচিতে নাচিতে বড় পুকুরের ধারে গিয়া সেই তালপাতায় আগুন দিয়াছি। শুক্‌নো তালপাতা জ্বলিয়া সমস্ত কৈকালার মাঠ আলোকিত করিয়াছে—কি আহ্লাদ বল দেখি। শুনিতাম, মাঠের অপর পারের দুল্লা প্রভৃতি গ্রামের লোকেরা সেই ভীষণ আলোক দেখিয়া ভীত হইত। তাহাতেই আমাদের আরও মজা, আরও আহ্লাদ। সেই আহ্লাদ যেন জমাট বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, সেই জমাট এবং শরীরী আহ্লাদের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়াছি। তেমনই আর একটা আহ্লাদের কথা বলি শুন। বৈশাখ মাস গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছি। কালবৈশাখী আরম্ভ হইল। তেমন কালবৈশাখী এখন আর

হয় না। দিগন্তব্যাপী কাল মেঘ, তাহার পরেই ঝড়। অমনই মেয়ে পুরুষ বালক বৃদ্ধ সকলেরই আঁব-বাগানে যাওয়া। ঝড়ে আঁব পড়িতেছে—সেই আঁব কুড়ানো—যত আনন্দের কথা মনে ওঠে, এ আনন্দ সে সব আনন্দের চেয়ে বেশী। আঁধার আকাশের নীচে আঁধার পৃথিবীতে আঁব পড়িতেছে—দেখা যাইতেছে না। আঁব খুঁজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি,—

খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি।

এমন করিয়া কত আঁব পাইয়াছি, বলিতে পারি না। কি আনন্দ, কি সুখ! এই বুড়া বয়সে, চক্ষু বুজিয়া আবার সেই আনন্দ, আবার সেই সুখ! বিধাতার পৃথিবীতে সুখের কি সীমা আছে! সুখ কতই নির্ম্মল, কতই প্রগাঢ়! নির্ম্মল নিষ্পাপ বাল্যকালের সুখ কি না। ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন :—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thonght.

আমি দম্ভ করিয়া বলিতেছি, এটা ভুল কথা। গান ঠিক হয় যদি গাওয়া যায় :—

Our sweetest songs are those that tell of purest thought.

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

জাপানী কবিতা।

বাতুলতা।

['ম-ন্যো-স্যু' হইতে।]

নদীর জলে লেখার চেয়ে বড় একটা মাত্র আছে বাতুলতা,—
সেটা কেবল তারি কথাই ভাবা, ভাবে না যে জন্মে তোমার কথা

জ্যোৎস্নার কুহক।

['ৎসিমাতু' হইতে।]

ভঙ্গুর ভাবনা কত শত, কত শত অস্ফুট বেদনা,—
মর্ম্মরিয়া প্রাণে উঠে জেগে, দাঁড়ায়ে যখন আনমনা।
চেয়ে থাকি লাবণ্যতরল শরতের চাঁদে আত্মহারা ;
তবু সে রূপালি কুহেলিতে একা আমি পড়ি নাই ধরা!

বাতাসের শাস্তি।

['শো-সী' হইতে।]

বসন্তের ফুলদল যে বায়ু ঝরায়—
কোন অন্ধকূপে থাকে সেই লক্ষীছাড়া?
লুকায়ো না, ব'লে দাও জান যদি, তায়
এমনি শোনাব যে, সে হবে দেশছাড়া।

সৌন্দর্য্য ও সাধুতা।

['হেণ্ড্জু' হইতে।]

ভাবিতাম পদ্মপর্ণ! এ বিশ্ব সংসারে
নাহি কিছু তোমা সম পুণ্য সুবিমল,
তবে কেন কুক্ষিগত শিশিরকণারে
মুক্তা বলি' লোক মাঝে প্রচার কেবল?

পুষ্পজন্ম।

['উকিকাজী' হইতে।]

এবার বসন্তে, মরি, এ তনু আমার,
সুলঘু কুহেলি যবে ফণা তুলি ধায়,
ধরিতে পারে গো যদি ফুলের আকার,
হে নির্ম্মম! তুমি তারে নেবে নাকি হায়?

স্বদেশ।

['ইসী' হইতে।]

বসন্তের লঘু হিম অগ্রাহ্য করিয়া
উত্তরে ছুটিয়া কেন চলে হংসকুল?
সে কি নিজ দেশ চিরসুন্দর বলিয়া
যদিও সেথায় হেন নাহি ফুটে ফুল?

কংফুশিওর কথা।

[জাপানী হইতে।]

শিষ্য সহ কংফুশিও লঙ্ঘিছেন যবে
টাই নামে পর্ব্বতের শ্রেণী,—
শুনিলেন আচম্বিতে হাহাকার রবে
কাঁদে এক নারী অভাগিনী।
আজ্ঞায় চ'লল শিষ্য নারীর উদ্দেশে,
দেখা পেয়ে কহিল তাহারে,—
"হেন শোক হয় শুধু মহা সর্ব্বনাশে,—
হাঁগো মাতা! হারায়েছ কারে?"
নারী কহে, "যা কহিলে সত্য সে সকলি;
বাঘের কবলে গেছে স্বামী,
শ্বশুর গেছেন, গেছে নয়নপুত্তলি
একই মরণে, আছি আমি।"
"তবু তুমি দেশ ছেড়ে যাও নাই চলে?"
জিজ্ঞাসিল কংফুশিও মুনি;
"সে কেবল সু-রাজার রাজ্যে আছি ব'লে।"
উত্তরিল নারী। তাহা শুনি'
শিষ্যদলে ডাকি' মুনি কহিলেন শেষ,—
"বাঘ হইতে ভয়ঙ্কর কু-রাজার দেশ।"

অক্ষয় প্রেম।

['ম-ন্যো-স্যু' হইতে।]

বলেছি ত ভালবাসা ফুরাবে না মোর,—
যতদিন পর্ব্বতেরে চলোর্ম্মি না গ্রাসে;
সে গিরির উচ্চ চূড়া ঘিরিয়া বিভোর
নৃত্য করি মেঘমালা অনন্ত উল্লাসে!

কোকিল।

['ম-ন্যো-শু্য' হইতে।]

আর এক পাখী বেঁধেছিল বাসা,
অতিথির বেশে হ'ল তোর আসা,
বাসার সকলে হ'ল কোণঠাসা
কোকিল, ও রে কোকিল!

অচেনা জনক-বিহগের কাছে
অজানা জননী-বিহগীর কাছে
কণ্ঠে না জানি কি যে তোর আছে
পাগল যাহে নিখিল।

ছাড়িয়া আপন কানন-নিবাস
যেথায় রূপালি কুসুমের হাস
সুরে ভ'রে দিয়ে ফাল্গুনী বাতাস
এস তুমি হেথা এস;

কমলালেবুর সাথে নেমে পড়—
ফুলগুলি যার ঝরে ঝর-ঝর,
ফুল ঝর-ঝর গান নিরন্তর,
এস এস কাননেশ!

সারাটি সকাল সকল দুপুর
সারা দিনমান শুনি ওই সুর,
লাগে না যেন গো কভু অমধুর
ও সুর আমার কানে,

প্রাণ দিব দান, এস লয়ে যাও,
দূর দেশে আর হয়ো না উধাও,
কমলালেবুর শাখে গান গাও,
থাক থাক এইখানে!

ঘুমপাড়ানিয়া গান।

ঘুমো আমার সোনার খোকা! ঘুমো মায়ের বুকে ;
আকাশ জুড়ে উঠলো তারা, ঘুমো রে তুই সুখে!
হাত পা নেড়ে কান্না কেন, কান্না কেন এত ?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমো রে তুই সোনার চাঁদের মত!
একটি দিয়ে চুমো—ঘুমো রে তুই ঘুমো!

ঘুমো আমার সোনার পাখী! মায়ের বুকের প'রে!
ঘুমের ঘোরে ডরিয়ে কেন উঠিস অমন ক'রে ?
ও কিছু নয়, শব্দ ওঠে হাওয়ায় বাঁশের ঝাড়ে ;
(আর) চকা-চকী ডাকাডাকি করছে পুকুরপাড়ে ;
ঘুমো রে তুই ঘুমো—দিয়ে একটি চুমো!

ঘুমো আমার সোনার যাদু! কিসের তোমার ভয় ?
কে কি করে তোমার কাছে মা যে তোমার রয় ;
আমার খোকায় ছুঁতে নারে ঘাসের বনের সাপ ;
বাজ পড়ে মা যতই খুসী হোক না মেঘের দাপ ;
ঘুমো মাণিক ঘুমো—একটি দিয়ে চুমো!

ঘুমো মনের সাধে, শুধু স্বপন দেখিস না রে!
ভয় পাছে পাস জেগে, হুতোম ডাকছে যে আঁধারে ;
গুটি গুটি মাথাটি রাখ আমার বুকের পরে ;
হাস্ রে শুধু সারাটি রাত হাস্ রে ঘুমের ঘোরে ;
ঘুমো মাণিক ঘুমো—ঘুমো রে তুই ঘুমো!

ঘুমো আমার সোনার খোকা, ঘুমো আমার কোলে,
ভূমিকম্পে পাহাড় যখন ঘর বাড়ী নে' দোলে ;
পাপের কর্ম্ম যে করেছে, দেবতা তারেই মারে ;
নির্দ্দোষ মোর সোনার খোকা, কেউ না ছুঁতে পারে!
ঘুমো মাণিক ঘুমো, একটি দিয়ে চুমো!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কর্ম্ম।

——:০:——

অনুষ্ঠানের দিক্ হইতে এই বিষয়ের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি। কর্ম্ম কিরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, তাহা "দেহ ও কর্ম্ম", "ভাব ও কর্ম্ম" ইত্যাদি প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে সফলতার দিক্ হইতে এই বিষয়ের আলোচনা করিব। কর্ম্ম কিরূপে সফল হইতে পারে, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। এ বিষয়েও প্রসঙ্গতঃ কিছু কিছু বলা হইয়াছে, কিন্তু বিশেষভাবে কয়েকটি কথা বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। কথায় বলে, যেখানে ইচ্ছা আছে, সেখানে উপায় আছেই। প্রকৃতপক্ষেও প্রবল ইচ্ছা থাকিলে উপায় উদ্ভাবিত হইবেই, কর্ম্মও সফলতা লাভ করিবেই। কর্ম্মকে সফলতা দিতে হইলে প্রবল ইচ্ছা চাই, ভাবের মত্ততা চাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভাবের মত্ততা থাকিলেও, কর্ম্ম তত্তৎকালে সফল না হইতে পারে, কিন্তু কর্ম্ম সফল হইতে হইলে ভাবের মত্ততা চাই-ই।

এক দিকে যেমন মন ভাবে মত্ত হইবে, অন্য দিকে তেমনই বুদ্ধি সর্ব্ব-প্রযত্নে উপায় চিন্তা করিবে। এক ব্যক্তি দ্বারা এই কার্য্য সিদ্ধ হয় ভাল; নতুবা সমাজস্থ বহু ব্যক্তির সহায়তা-গ্রহণ আবশ্যক। কেহ বা ভাবের বিস্তৃতি সাধন করিবেন, কেহ বা উপায় উদ্ভাবন করিবেন। এইরূপে কর্ম্মকে সফলতার দিকে লইয়া যাইতে হয়।

কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, কর্ম্ম স্বার্থশূন্যভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। যেখানে স্বার্থ, সেইখানেই বিপদাশঙ্কা। কি জানি, বাঞ্ছিত পথে কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া স্বার্থ-হানি হয়, এ আশঙ্কা অনিবার্য্য। স্বার্থ সে আশঙ্কাকে জয় করিতে অক্ষম। কিন্তু যেখানে স্বার্থ নাই, অথবা থাকিলেও কেবল পারত্রিক মঙ্গলের সহিত জড়িত, যেখানে কর্ত্তব্যজ্ঞানে নির্ম্মল-হৃদয়ে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, পরিণামফল কি হইবে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া ভগবৎ-পদে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে বিপদাশঙ্কা থাকিতেই পারে না। কর্ম্মী প্রশান্ত-নির্ভয়-হৃদয়ে সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়া থাকেন। যিনি অন্তরে ইহা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ

করিতে পারেন যে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন", * তিনিই সফল কর্ম্মী। যিনি এইরূপ অনুভব করিতে পারেন, তিনি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত বিচলিত হইতে পারেন না। তার পর, কর্ম্ম আমার নহে, কর্ম্ম সমাজের, দেশের, বিশ্বমানবের;—এই ভাবে কর্ম্মকে দেখিলে, এক দিকে যেমন স্বার্থ দূরে পলাইয়া যায়, অন্য দিকে তেমনই হৃদয় প্রশস্ত ও বিস্তৃত হয়। স্বার্থ হৃদয়কে ক্ষুদ্র করে; তাই কর্ম্ম প্রতিহত হইতে পারে। কিন্তু সমাজ, দেশ ও বিশ্বমানবের উপর হৃদয় বিস্তৃত হইয়া পড়িলে যে অপরিমিত বলসঞ্চয় হয়, তাহাতে দেহ ও মন একাগ্রতা লাভ করে; সহস্র বাধা-বিপত্তি সে বলের নিকট পরাভূত হয়; কর্ম্ম সফলতা লাভ করে। কায়, মন ও বাক্য এক না হইলে কর্ম্ম সফল হয় না। স্বার্থশূন্য, উদার, বিস্তৃতহৃদয় ভগবানের পদে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারই কর্ম্ম সম্পাদন করে, নিজের কথা ভাবেও না; অথবা ভাবিলেও কেবল এইমাত্রই ভাবে যে, "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।" ইহার অধিক আর কোনও ভাবনা তাহার একাগ্র হৃদয়ে স্থান পায় না।

কর্ম্ম একাগ্র ভাবের ফল। ভাবেরই অনুশীলন করিতে হয়। ভাব আসিলে উপায়ের অভাব হইতেই পারে না। একাগ্র ভাবের মূল,—বিশ্বাস। ফলে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে একাগ্র ভাব আসিতেই পারে না। এক জন প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট সহস্র বাধা পরাভূত হয়। মানবজাতি প্রকৃত-বিশ্বাসীর পদে মস্তক লুণ্ঠিত করিবেই; প্রকৃত বিশ্বাসীকে দেখিলেই মানব আকৃষ্ট হয়। যিনি স্বার্থশূন্য হইয়া ভগবৎ-কর্ম্মমাত্র করিয়া যান, তিনিই বিশ্বাসী। "আমি তাঁহারই আদেশ প্রতিপালন করিতেছি; আমি কি নিষ্ফল হইতে পারি? তাহা কখনই নহে। তাঁহার কার্য্য তিনি করিবেনই, আমি উপলক্ষ মাত্র"—এইরূপ ভাব হৃদয়ে যে এক দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, সফলতার মূর্ত্তি নেত্রপথে উদ্ভাসিত করে, তাহাই অদম্য শক্তির প্রেরক ও উত্তেজক। এই মহাশক্তির পদে জগৎ লুণ্ঠিত হয়। সফলতায় দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে সফল হওয়া অসম্ভব। যিনি মনে করেন, "আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আমার দ্বারা এই বৃহৎ কর্ম্ম হইবে না"—তিনি ভ্রান্ত। যাঁহার কার্য্য, তিনি করেন, ক্ষুদ্র বৃহৎ কিছু নাই। এক জনের কথায় কোটী কোটী ব্যক্তির

---

* কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে

মতিগতি, আচার-ব্যবহার উল্টাইয়া গিয়াছে; তখন তাঁহাকে দেবতার, অবতার বলিয়া জগৎ পূজা করিয়াছে। কিন্তু প্রথমে তাঁহাকেই কত ভীষণ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। যাঁহার প্রতি জগৎ প্রথমতঃ অত্যাচার করে, তিনিই সফলকাম হইলে, জগৎ তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করে। একা, অথবা মুষ্টিমেয় বলিয়া ভগ্নোদ্যম হইবার কোনও কারণ নাই। যিনি বিশ্বাসী, অর্থাৎ সফলতায় বিশ্বাসী, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী, তিনি কখনই নিষ্ফল হইতে পারেন না।

আর এক কথা, কৰ্ম্ম চঞ্চল মনে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত নহে; উহা শান্ত মনে অনুষ্ঠিত হওয়া অত্যাবশ্যক। আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই, তাড়াতাড়িতে কাজ হয় না। যে কৰ্ম্ম ব্যস্ততার সহিত করিতে আরম্ভ করি, তাহা ভাল হয় না, আর যাহা স্থিরচিত্তে চারি দিক্ বিবেচনাপূর্ব্বক করি, তাহা সুসম্পন্ন হয়। মনে একাগ্র, অচঞ্চল, দৃঢ় ভাব চাই; একলক্ষ্য ভাবই মত্ততা; কিন্তু চাই অচঞ্চল-মত্ততা। মন ভাবে নিমগ্ন থাকিবে; বুদ্ধি অতি-সাবধানে উপায় উদ্ভাবন করিবে; প্রত্যেক বাধা বিঘ্ন ও কৰ্ম্মাঙ্গ পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করিয়া বুদ্ধি উপায় স্থির করিবে। সফলতার পরিণামফল চিত্তে স্থায়িরূপে অধিগত হইবে; চিত্ত তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইবে। তখনই কৰ্ম্ম সফল হইবে, তখনই পূর্ব্বকথিত অহংজ্ঞান পূর্ণ হইবে। ইহাই সফলতার একমাত্র পথ।

কিন্তু বাধা-বিঘ্ন পূর্ব্ব হইতে বিবেচনা করিব কেমন করিয়া? সকল বাধাই কি বিবেচনা করা যায়? নিশ্চয়ই যায় না। এই অভাব পূর্ণ করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান বাধা-বিঘ্নের প্রতি লক্ষ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থা হই-তেই ভবিষ্যৎ অনুমান করিতে হয়। কৰ্ম্ম সাধারণভাবে বংশগত, সুতরাং, পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট; কিন্তু, বিশেষভাবে, বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার ফল। সুতরাং বর্ত্তমান বাধা-বিঘ্ন যেমন এক দিকে ভবিষ্যৎ পথ দেখাইয়া দেয়, তেমনই হৃদয়ে প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি করে, বাহুতে বলসঞ্চার করে। এ দিক্ হইতে বিবেচনা করিলে অত্যাচারীর বাধা বিঘ্নই ভাববিস্তারের ও * ভাবের দৃঢ়তা-

---

* The character of the inclination was determined long ago by heridity from Parents and ancestors; the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment.—
Haeckal, the Riddle of the Universe. p. 74.

সম্পাদনের প্রধান সহায়। এ হিসাবে অত্যাচারী পরম বন্ধু। কেহ কেহ আশঙ্কা করেন, অত্যাচার নবাগত ভাবকে বিনষ্ট করিতে পারে। তাঁহারা অবিশ্বাসী। জগতের ইতিহাসে, ভাবের ইতিহাসে কখনও কোনও ভাব বিনষ্ট হয় নাই, এবং হইতে পারে না। অত্যাচারে ভাবের বিস্তৃতি ভিন্ন নাশ হওয়া অতীব অসম্ভব। যাঁহারা ঐরূপ আশঙ্কা করেন, তাঁহারা কি দেখাইয়া দিতে পারেন, কোন দেশে কোন যুগে কোন ভাব অত্যাচার কর্তৃক নষ্ট হইয়াছে? কখনই না। মানব ত দূরের কথা, অত্যাচার কখনও কোনও জীবকেও বিনষ্ট করিতে পারে না। প্রাচীনতম যুগে বহু প্রাণী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য; কোনও কোনও মানবসমাজও বিলুপ্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু সে অত্যাচারবশতঃ নহে। জীব-বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহাই জানা যায় যে, জীববিলুপ্তির প্রধান কারণ দুইটি। (১) ভূপৃষ্ঠের প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন; (২) খাদ্যাভাব ও তজ্জনিত জীবন-সংগ্রাম। এই দুই প্রধান কারণের সহিত আরও কতিপয় ক্ষুদ্র কারণ মিলিত হইয়া জীবকে বিনষ্ট করে। তাহারা এই :—(৩) বিভিন্ন-জাতির সংসর্গে পীড়া ও অকাল-মৃত্যুর আবির্ভাব; (৪) জননশক্তির হীনতা, ইত্যাদি। খাদ্যাভাব ও পীড়া হইতেই, এবং মনের প্রফুল্লতা গিয়া অবসাদ উৎপন্ন হইলেই, (সাধারণতঃ) জননশক্তির হ্রাস হয়। ইহাই জীব-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যাহা হউক, সে অনেক কথা। এ স্থলে আমরা এইমাত্র বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অত্যাচার জীব-নাশের অথবা ভাব-নাশের কারণ নহে। বরং স্থলবিশেষে ভাববিস্তৃতির পথ-প্রদর্শক।

কর্ম্মে সফলতা আনিতে হইলে (১) ভাবের একাগ্রতা চাই। (২) সফলতায় দৃঢ় বিশ্বাস চাই। (৩) আত্মশক্তিতে বিশ্বাস চাই। (৪) ধীর শান্তভাবে উপায় উদ্ভাবন করা চাই। এ স্থলে ইহা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক যে, প্রথম তিনটি থাকিলে উপায় আপনা হইতেই উদ্ভাবিত হয়। - ঘটনাচক্র এরূপ ভাবে আবর্ত্তিত হয় যে, উপায়ের নিমিত্ত বিশেষ কষ্টকল্পনা করিতে হয় না।

প্রথমটির সম্বন্ধেও একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ভাবের একাগ্রতা চাই, তাহার বিস্তৃতিও চাই; বিস্তৃতি না থাকিলে সমবেত চেষ্টা হয় না। কিন্তু সফলতার নিমিত্ত সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিতেই ভাব বিস্তৃত হওয়া অত্যাবশ্যক নহে। কতিপয় ব্যক্তি ভাব-গত হইলেই যথেষ্ট। অপরে প্রতিকূলভাবাপন্ন থাকিলে, বিশেষ কোনও ক্ষতি নাই। উহারা পরে যখন সফলতা নিকটবর্ত্তী দেখিবে, তখন আপনিই আসিয়া সহায়

হইবে। কর্ম্ম সুসিদ্ধ করিতে যে পরিমাণ উপকরণ আবশ্যক, যে সংখ্যক কর্ত্তার প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা অধিক উপকরণ কিংবা অধিক ব্যক্তি সমাজে বিদ্যমান থাকিলে, প্রত্যেকের সহায়তা অত্যাবশ্যক নহে। তদ্ব্যতীতও কর্ম্ম সফল হইতে পারে। সুতরাং ভাব প্রত্যেক ব্যক্তিতে বিস্তৃত হওয়া যদিও বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অত্যাবশ্যক নহে। ভাব কখনই বিনষ্ট হইবার বস্তু নহে। ভাব থাকিলে, আজি হউক, দু' দিন পরে হউক, কর্ম্ম সফল হইবেই।

শ্রীশশধর রায়।

প্রার্থনা।

হে বাঞ্ছিত, হে আরাধ্য, হে পরম ধন,
তুমি জান প্রিয়তম, প্রাণের যাতনা,
অভিশপ্ত জীবনের জ্বালা কি ভীষণ—
আপনার মাঝে নিত্য কি আত্ম-লাঞ্ছনা!
তুমি দেখাইছ পথ পতিতপাবন,
শ্রীপদে দিয়াছ স্থান দয়াল শ্রীপতি,
তবু কাঁপিতেছে সদা এ দুর্ব্বল মন,
আরো দয়া কর দাসে অগতির গতি!
জাগ হে সুন্দর রূপে নয়নে নয়নে,
ওঙ্কার অমৃত রূপে স্মৃতির মাঝারে,
অনন্ত আনন্দ রূপে থাক নাথ! মনে
দাও সে পরমা তৃপ্তি—দুর্লভ সংসারে।
অণু পরমাণু মোর আনন্দে শিহরি'
গাউক তোমার নাম নিস্তারণ হরি!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্বার্থের যুক্তি।

——:o:——

It is difficult to believe that Englishmen and Christians, even in that period of profligacy, could have adopted such a train of reasoning to justify the ruin of an innocent prince.—*Marshman. vol ii, p.* 379.

স্বার্থ চিরদিন অন্ধ। স্বার্থ যেখানে সকলের বড়, সেখানে ধর্ম্ম থাকে না;—সেখানে শাস্ত্র-শিক্ষা পরাভূত হয়। পৃথিবীর ইতিহাস নানা ভাবে, নানা ঘটনায়, নানা উপলক্ষে এই কথা কহিয়া আসিতেছে। ইতিহাসকে অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। কিন্তু স্বার্থ যেখানে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠে, সেখানে নয়ন মুদিত করিতে হয়। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

বহুদিন গত হইল, মান্দ্রাজের সেই জগদ্বিখ্যাত সন্ধির পূর্ব্বে—যে সন্ধি-সূত্রে প্রবলপ্রতাপশালী ইংরাজ-সিংহ মহীশূরের হায়দর আলির নিকট একরূপ পরাজয়ই স্বীকার করিয়াছিলেন,—সেই সন্ধির পূর্ব্বে, ইংরাজের সহিত হায়দরের যে যুদ্ধ হইতেছিল, সে যুদ্ধে তাঞ্জোর-রাজের কোনও ক্ষতি হয় নাই। তাঞ্জোর-রাজ ইংরাজের মিত্র ছিলেন বলিয়া হায়দর আলি তাঁহার রাজ্যে কোনও অত্যাচার বা উৎপাত করেন নাই। কিন্তু মহীশূর ও মান্দ্রাজ-সংঘর্ষে ইংরাজ স্বতঃই মনে করিয়াছিলেন যে, বন্ধু তাঞ্জোর-রাজের নিকট হইতে আশানুরূপ সাহায্য পাইবেন। যে যাহা চায়, সে যদি তাহা পাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর অনেক পাপ দূর হইত। ইংরাজ যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, সেরূপ হইল না;—ক্ষুদ্র তাঞ্জোরের ভক্ত বন্ধু নিজের অবস্থা বুঝিয়া কিছু সৈন্য ও অর্থ মান্দ্রাজে প্রেরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজ বাহাদুর তাহাতে তৃপ্ত হইলেন না। ভিক্ষা যেখানে ন্যায্য দাবীর আকার ধারণ করে, সেখানে এইরূপই হইয়া থাকে।

ইংরাজের পরম বন্ধু কর্ণাটিকের নবাব মহম্মদ আলি কর্ণাটিকের গদীতে বসিয়া অবধি তাঞ্জোর অধিকার করিবার জন্য লুব্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঞ্জোরের উপর তাঁহার কোনও ন্যায্য দাবী ছিল না। দাবী না

থাকিলে কি হয়? তাঞ্জোরে শ্যাম শস্যক্ষেত্র ছিল; সেই সকল ক্ষেত্রে কনক ফলিত; তথায় রাজপ্রাসাদ ছিল; রাজপ্রাসাদে অর্থাগার ছিল; অর্থাগারে প্রভূত অর্থও ছিল! (১) এ দিকে মহম্মদ আলিও ইংরাজ উত্তমর্ণের নিকট প্রাণের দায়ে আত্মবিক্রয় করিতেছিলেন! (২) ইংরাজ বান্ধবের বিলাস-বিভ্রমের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবার জন্য মহম্মদ আলি নিজরাজধানী আর্কট পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। ইংরাজের রাজ্যলিপ্সার সম্মুখে কোনও শক্তিশালী নৃপতির স্থান ছিল না। দুর্ব্বল সেখানে নির্ব্বিবাদে বাস করিয়া ঋণ করিত, এবং আপন রাজত্ব হইতে তাহার সুদ দিত। ইংরাজ উত্তমর্ণগণ সেই অর্থে আমাদের থলি পূর্ণ করিতেন! সেকালে এইরূপই ছিল।

প্রলুব্ধ, হীনশক্তি, ঋণজালে বিজড়িত মহম্মদ আলি ভাবিলেন, তাঞ্জোরের পূর্ব্ব-নৃপতিদিগের নিকট হইতে কর্ণাটিকের পূর্ব্ব-নবাবগণ ৬০।৭০।৮০, এমন কি, কথনও ১০০ লক্ষ মুদ্রা পর্য্যন্তও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ এখন তাঞ্জোরাধিপ তাহা দিতেছেন না; সুতরাং তাঁহাকে একবার বাজাইয়া দেখিতে হইবে। মহম্মদের নিজের শক্তি ছিল না, সৈন্য ছিল না। যাহারা ছিল, তাহারা রণে অপটু; সুতরাং তিনি বান্ধবের দ্বারে ভিখারী হইলেন। ইহাতে তাঁহার লজ্জা ছিল না; লজ্জা করিবার কারণও ছিল না। লজ্জা একদিন মাত্র আইসে। ভিক্ষাপাত্রই যাহার প্রাণ-সম্বল, তাহার আবার ভিক্ষায় লজ্জা কি? মহম্মদ আলি অকুণ্ঠিত-চিত্তে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিলেন, "আমাকে সাহায্য করুন, আমি একবার তাঞ্জোর-নরপতিকে বাজাইয়া দেখি।" (৩)

(১) Mahommed Ally, amidst all his difficulties, had never his eyes off the fertile little realm of Tanjore, on which in reality he had no past claim whatever.—*History of India, J. Keightly, p.*113.

f. Marshman' vol ii, p. 378.

(২) Mahommed Ali never could liquidate the claims of the company, and drifted more and more into debt......made assignments of his land revenues to his British money-lenders, until virtually the whlole of his territories passed into the hands of his creditors.—*Economic History of British India by R. C. Dutt. p.* 98.

(৩) He (Mahommed Ali) importuned the Madras Council to aid him in *fleecing the Raja.—Marshman, vol ii, p* 378.

এ দিকে হায়দর আলির সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াই ডিরেক্টার-সভা দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারাও তাই শক্তিসঞ্চয়ের জন্য তাঞ্জোরের বিভবাদির দিকে উৎসুক-নেত্রে চাহিয়াছিলেন, এবং মান্দ্রাজ-সভাকে লিখিয়াছিলেন,—'রাজা যদি যুক্তি-তর্ক না মানিতে চাহেন, তবে নবাব যাহা বলেন, সেইরূপই করিও!' (১)

রাজা যুক্তি-তর্ক মানিতে পারিলেন না। পৃথিবীতে কেহ কখনও পারে নাই! আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে তুলিয়া দিয়া আমি নির্ব্বিবাদে ফকীর হইব, এবং ফকীর হওয়াই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত, এরূপ যুক্তি সংসারে বাস করিয়া মানুষ মানিতে পারে না; তাঞ্জোর-রাজও মানিলেন না। তাই ইংরাজ বাহাদুর শেষে নিরুপায় হইয়া, মহম্মদ আলির একান্ত অনুরোধ অতিক্রম করিতে না পারিয়া, তাঞ্জোরাভিযানের আয়োজন করিলেন! সুধু বান্ধবের অনুরোধ-রক্ষার জন্যই মান্দ্রাজের ইংরাজ এরূপ করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহাদের স্বার্থ ছিল না!

মানুষ আর সকলকে ফাঁকি দিতে পারে, সে কেবল আপনার হৃদয়ের কাছে পরাজয় মানে। হৃদয়ের সহিত অন্যায়-সমর চলে না। তুমি যাহাই কর না কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দরবারে যদি তাহার কৈফিয়ৎ দিতে না চাও, কেহই সে কৈফিয়ৎ তোমার নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতে পারে না; কিন্তু আপনার হৃদয়ের নিকটে তোমার সর্ব্বশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়; সেখানে তোমাকে একটা কৈফিয়ৎ দিতেই হয়; তোমার কৈফিয়ৎ মিথ্যা কি সত্য, পৃথিবী তখন তাহার বিচার করে। তাঞ্জোর-রাজ ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, ইংরাজের বিপদের দিনে অর্থ ও সৈন্য দিয়া সাহায্যও করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারই বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিতে হইল! মান্দ্রাজ-সভা কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাদিগের অর্থের প্রয়োজন ছিল, তাঞ্জোরে অর্থও ছিল, সুতরাং সে অর্থ লইতেই হইবে, এ কথা সুসভ্য ইংরাজ-সভা প্রকাশ্যে বলিতে পারিলেন না! তাঁহারা ভাবিলেন, তাঞ্জোর-রাজ যখন আমাদের এত অল্প সাহায্য করিয়াছেন, তখন আর তাঁহাকে বিশ্বাস করা যায় না;

---

(১) The Court of Directors, impoverished by the expenses of late war, *looked to the resources of Tanjore with a wistful eye*, and had instructed their servants at Madras to support the views of the Nabob, if the Rajah refused to *submit to reasonable terms*. —*Ibid*

তিনি নিশ্চয়ই শত্রু; হায়দার আলির সহিত মিলিত হইয়াছেন! ইংরাজ ঐতিহাসিক কহিতেছেন যে,—তাঞ্জোরের উপর অবিশ্বাস করিবার কারণও ছিল। সে কারণ কি?—রাজার দেশ উর্ব্বর ছিল; তাঁহার রাজকোষ রত্নালঙ্কারে পূর্ণ ছিল; কোনও বৈদেশিক শত্রু আসিয়াও তাঞ্জোর লুণ্ঠন করে নাই। (১)

যখন মান্দ্রাজে সংবাদ আসিল যে, তাঞ্জোর-সৈন্য সান্নুপতির পলিগরের রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তখন নবাব মহম্মদ আলি ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "কি, এত দূর সাহস! আমার জায়গীরদারের উপর অত্যাচার!" নবাবের অনুরোধে ইংরাজ সৈন্য প্রস্তুত হইল। ত্রিচিনা-পল্লীতে সমরবাদ্য বাজিয়া উঠিল। শেষে একদিন সেনাপতি স্মিথ বীরদর্পে বন্ধু তাঞ্জোর-রাজের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সমরঘোষণা করিলেন। অবিলম্বে ভেলোর দুর্গ অবরুদ্ধ হইল। ইংরাজের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল। ভেলোরের দুর্গ-প্রাচীর চূর্ণ হইয়া গেল। তাঞ্জোর তখন আত্মসমর্পণ করিবার আয়োজন করিতেছিল। এমন সময়ে ইংরাজ-সেনাপতি শুনিলেন, সন্ধি হইয়াছে, আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই।

কে সন্ধি করিয়াছে, কেন সন্ধি করিয়াছে, সেনাপতি তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিতেন না। তিনি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে, ইংরাজ-বন্ধু কর্ণাটিক নবাবের জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্ট লক্ষ মুদ্রা পেষ্‌কস্‌ ও যুদ্ধাদির ব্যয়স্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা পাইবার ভরসায় সন্ধি করিয়াছেন। সৈনিকগণ সন্ধির কথা শুনিয়া রুষ্ট হইল; কারণ, যুদ্ধ হইলে তাঞ্জোর লুণ্ঠন করিয়া তাহারা অর্থশালী হইবে ভাবিয়াছিল। মান্দ্রাজ-গবর্মেণ্টও সন্ধিতে বিরক্ত হইলেন; তাঁহারা দেখিলেন, নবাব-পুত্রের লোভে তাঞ্জোর-বিজয় ঘটিল না। তাঁহারা অবিলম্বে সেনাপতি স্মিথকে বলিয়া পাঠাইলেন, কখনও ভেলোর দুর্গ ছাড়িও না; তাঞ্জোরাধিপ প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে বিলম্ব করিলেই যুদ্ধ করিবে।

(১) They believed likewise, *because his country was fertile and had suffered no recent invasions, that he was immensely rich*; and they longed for a *fair pretext* on which to draw from his exchequer a portion of that treasure of which they were equally in want.

Gleig, vol ii, p.286.

[illegible]টান্ন লক্ষ মুদ্রা দিতে তাঞ্জোর-রাজের বিলম্ব হইল। তাঞ্জোর-রাজ তাঁহার রাজভাণ্ডারের ভূষণ ও মূল্যবান তৈজসাদি বন্ধক (!) দিয়া (১) ৪৬ লক্ষ মুদ্রা শোধ করিলেন। কেবল দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা তখনও বাকি ছিল। রাজা তাহা পরিশোধ করিবার জন্যও সচেষ্ট হইলেন। এমন অবস্থায় অতি বড় শত্রু যে, তাহারও দয়া হয়!

তাঞ্জোর-রাজ ইংরাজের বন্ধু ছিলেন। ইংরাজ নবাব মহম্মদ আলির বন্ধু ছিলেন! নবাব ভাবিলেন, তাঞ্জোরাধিপ যখন বারো লক্ষ মুদ্রা দিতে বিলম্ব করিতেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই হয় হায়দর আলির, না হয় মহারাষ্ট্রদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন,—অবিলম্বেই ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবে; বান্ধব-বাক্য ইংরাজ-সভা কিরূপে অবিশ্বাস করিবেন? মান্দ্রাজ-সভাও বুঝিলেন যে, তাঞ্জোর-রাজ বড় দুষ্ট!

অন্ধ স্বার্থ সেকালের মান্দ্রাজ-সভাকে আরও অন্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা ভাবিয়া দেখিলেন যে, নবাবের গ্রাস হইতে তাঞ্জোর রক্ষা করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব;—তাঞ্জোর-রাজকে সাহায্য করিবেন বলিয়া বাক্যদান করাও ততোধিক অসম্ভব। তখন তাঁহাকে ধ্বংস করাই বিধি! কারণ, ধ্বংস না করিলে তাঞ্জোর-রাজ হয় ত ভবিষ্যতে (!) ফরাসীদিগের সহিত যোগ দিতে পারেন,—অথবা কোনও দেশীয় নৃপতির সাহায্য লইতে পারেন। (২) যদি তিনি হায়দর আলির আশ্রয় লয়েন, তবেই ত ভয়ানক বিপদ! সুতরাং শঙ্কার মূল যাহাতে চিরদিনের জন্য উৎপাটিত হয়, তাহাই অবশ্যকর্ত্তব্য। (৩) ঐতিহাসিক মার্শম্যান তাই বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—তখনকার সেই হীনতার যুগেও খৃষ্টিয়ান ইংরাজ এক জন

---

(১) "By pledging his jewls and plates had paid all."

Gleig, vol ii, p. 288,

(২) Gleig, vol ii, p288.

He (Nabob)promised no more than a gratuity of ten lacs of pagodas; yet for this poor sum the English Government consented to intrust to his keeping the persons of the devoted Rajah and of all his family.—

Gleig, vol ii, p. 288.

(৩) Still they resolved to take the present opportunity of destroying him, lest, as they could not give him "a firm promise of support in his just right," he might on some future occasion join the French or some native power.—*History of India, T. Keightly, p.* 113.

নির্দ্দোষ নিরীহ নৃপতির ধ্বংসের জন্য এইরূপ যুক্তি অবলম্বন কার[illegible] ইহা বিশ্বাস করা নিতান্ত দুরূহ। মান্দ্রাজের ইংরাজ অবশেষে তাঞ্জোরের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির করিয়াছিলেন।

তাঞ্জোরের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মাসাধিক কাল অবিশ্রাম যুদ্ধের পর ইংরাজের প্রবল বাহিনী ক্ষুদ্র তাঞ্জোরকে ভস্মসাৎ করিয়া দিল। ইংরাজ দশ লক্ষ প্যাগোডা লইয়া হৃষ্টচিত্তে মিত্র তাঞ্জোর-রাজকে সপরিবারে কর্ণাটিকের নবাবের চরণতলে উপহার প্রদান করিলেন!

ডিরেক্টর-সভা এই ঘটনাকে "অন্যায় ও ভয়াবহ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া মান্দ্রাজসভার সভাপতি উইল্‌টকে সরাইয়া দিয়া সভার সভ্যদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলেন! পর বৎসর তাঞ্জোর-রাজ পুনরায় তাঁহার নিজের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ইংরাজকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। কেবল হতভাগ্য মহম্মদ আলির বড় আশায় ছাই পড়িয়াছিল।

এসো।

এসো, সন্ধ্যার মত ধীরে, নিশীথের মত ছেয়ে,
মলয়ের মত মধুর,—
এসো, কন্যার মত সেবায়, জননীর মত স্নেহে,
ব্রীড়ায় সম বধূর;
এসো, কুসুমের মত গন্ধে, জ্যোৎস্নার মত ভেসে,
কল্পনার মত সেজে;
এসো, আকাশের মত চেয়ে, প্রভাতের মত হেসে,
দুঃখের মত বেজে;
এসো, হতাশার উপর ধেয়ে, আনন্দের মত বেগে,
করুণার মত গড়াও;
এসো, আত্মার উপর আমার, জীবনের মত জেগে,
মৃত্যুর মত জড়াও!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়

কুলটা।

——:০:——

১

কুলটার কলঙ্কিত কাহিনী কে কবে সংগ্রহ করিয়া রাখে? যে আঘ্রাত কুসুম ঘটনাক্রমে পঙ্কিল প্রবাহে পড়িয়া কর্দ্দমকলুষিত কূলে উপনীত হয়, তাহার ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে না। তাই সতীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শারদা কি ছিল, কোথায় ছিল,—সে সকল কথা আমি বলিতে পারি না।

সতীশ আমার বাল্যকালের সহপাঠী। সেও অনেক দিনের কথা। তাহার পর যেমন হইয়া থাকে,—বাল্যবন্ধুরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঘটনাচক্রে কখনও কোথাও সাক্ষাৎ হয়—হয় ত দু' চারিটি কথা হয়—নহে ত কেবল কুশল-প্রশ্নের আদানপ্রদানেই কথা শেষ হয়। সতীশের সঙ্গেও তেমনই কালে ভদ্রে দুই এক দিন সাক্ষাৎ হইয়াছে মাত্র। আমি তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অবগত ছিলাম না।

শীতকাল। রাত্রি দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমি লেপ মুড়ি দিয়া অকাতরে অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময় 'ডাক-ঘণ্টা' বাজিয়া উঠিল। বুঝিলাম, কোনও রোগীর জন্য ডাকিতে আসিয়াছে। নিম্নতলে বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিলাম, আমার সরকার এক জন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছে। আমাকে দেখিয়া সরকার বলিল, "আপনাকে একবার বাহিরে যাইতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "সব কথা স্থির হইয়াছে?"

সরকার আমাকে দর্শনীর বাবদ কয়খানি নোট দিল।

আমি বলিলাম, "গাড়ী আনিতে হইবে।"

আগন্তুক বলিল, "আমি আনিয়াছি।"

"কি রোগ?"

"রোগিণীর নিশ্বাসরোধ হইতেছে। তিনি বহুক্ষণ মূর্চ্ছিতা।"

আমি কম্পাউণ্ডারকে ডাকাইয়া ব্যাগে কয়টি ঔষধ দিতে বলিলাম।

আমি পুনরায় শয়নকক্ষে গমন করিলাম। ডাক আসিয়াছে—বাহিরে যাইতেছি, এ কথা জাগরিতা গৃহিণীকে জানাইলাম; তাহার পর যথেষ্ট গরম কাপড়ে আবৃত হইয়া রোগি-দর্শনে চলিলাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই গাড়ী রোগীর গৃহদ্বারে উপনীত হইল। একটি ভৃত্য দ্বারের নিকট হাতলণ্ঠন জ্বালিয়া ঝিমাইতেছিল। সে আমাকে পথ দেখাইয়া দ্বিতলে একটি কামরায় লইয়া গেল। গৃহস্বামী রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন; উঠিয়া আমার অভ্যর্থনা করিলেন। আমি দেখিলাম, —সতীশ। আমাকে দেখিয়া সতীশ যেন কেমন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, কথা কেমন বাধ-বাধ বোধ হইল। কিন্তু তাহার সে সঙ্কোচ মুহূর্ত্ত-মধ্যেই অপনীত হইল। সে রোগিণীকে তাহার পত্নী বলিয়া পরিচয় দিল।

আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, রোগ মূর্চ্ছা। রোগিণীর মূর্চ্ছারোগ ছিল। শ্বাসরোধ—সম্ভবতঃ তাহারই এক রূপ। অধিকক্ষণ থাকিবার প্রয়োজন হইল না। ব্যবস্থার কথা বুঝাইয়া আমি গৃহে ফিরিলাম।

পথে ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। সতীশ কলিকাতাবাসী; কিন্তু এ ত তাহার গৃহ নহে! গৃহে অন্য কোনও পুরুষ আত্মীয়ের অদর্শনে ও রোগিণীর নিকট অন্য কোনও স্ত্রীলোকের অভাবে আমার কেমন বোধ হইয়াছিল। তাই লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছিলাম,—রোগিণীর সীমন্তে সধবার চিহ্ন সিন্দূরের রেখা নাই। আমি ভাবিলাম, ইহার অর্থ কি?

২

গৃহে আসিয়া গৃহিণীকে সন্দেহের কথা বলিলাম। শুনিয়া তিনি হাসিলেন, এবং আমার ও সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ জাতির বুদ্ধির উপর দোষারোপ করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি সহজ উপায় ছাড়িয়াছি,—দীর্ঘকাল রোগশয্যায় থাকিলে প্রসাধনের অভাবে ও শয্যার ঘর্ষণে সিন্দূরচিহ্ন অস্পষ্ট হইয়া আসিতে পারে—দীপালোকে তাহা সহজে লক্ষিত হয় না। কিন্তু হিন্দুসধবার বাম হস্তের অলঙ্কার দক্ষিণ হস্তের অলঙ্কার অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক হয়;—সধবার 'লোহ' স্ব-রূপেই হউক, বা স্বর্ণমণ্ডিতই হউক, সধবার বাম মণিবন্ধে বিরাজ করে।

সঙ্কেত জানিলাম। সঙ্কেত-ব্যবহারের সুযোগও ঘটিল। কয় দিন পরে পূর্ব্বরোগের পুনরাবির্ভাবে আবার আমার ডাক পড়িল। দেখিলাম, রোগিণীর দুই মণিবন্ধে অলঙ্কারের সংখ্যা সমান। দেখিয়া দুঃখিত ও ব্যথিত হইলাম। সতীশের পদস্খলনে মনে বড় ব্যথা পাইলাম।

রোগিণীর চিকিৎসার জন্য আমাকে মধ্যে মধ্যে যাইতে হইত। ফলে সতীশের সহিত পূর্ব্বের ঘনিষ্ঠতা ক্রমে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। সতীশ বুঝিতে পারিল, আমি প্রকৃত রহস্য জানিতে পারিয়াছি।

বলি বলি করিয়া এক দিন আমি সতীশকে আমার বেদনার কথা বলিয়া ফেলিলাম। সতীশ আপনার সব কথা বলিয়া ফেলিল। শুনিয়া মনে হইল, সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে স্বীকার করিল, আমাকে দেখিলে সে বিব্রত হইত, পাছে আমি ঐ কথা জিজ্ঞাসা করি—তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে,—ইত্যাদি। এখন আমাকে সব কথা বলিয়া সে যেন ভারমুক্ত হইল। দেখিলাম,—শারদার মোহে সে যেরূপ মত্ত, তাহাতে সহসা তাহাকে সে মোহ হইতে মুক্ত করা অসম্ভব। সতীশ আরও বলিল, তাহা হইলে শারদার কি হইবে—সে কি তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিয়া ভাসাইয়া দিবে? সে তাহা পারিবে না। সতীশের দোষের মধ্যে আমি তাহার এই সম্বন্ধে সামান্য গুণ-পরিচয় পাইলাম।

৩

কয় মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর এক দিন সতীশের পত্নীর চিকিৎসার জন্য আমাকে সতীশের বাড়ীতে যাইতে হইল। পঠদ্দশার পর সেই প্রথম সে বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। সতীশের পত্নীকে দেখিয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সতীশের পত্নী অসামান্য রূপে রূপবতী—যেন কবির কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। আবার প্রচ্ছন্ন বিষাদের ভাব সে সমুজ্জল সৌন্দর্য্যে যে স্নিগ্ধ কোমলতার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহাতে সে রূপরাশি যেন আরও চিত্তহারী হইয়াছিল;—তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, দীপ্ত-কর দিবা-দ্যুতির অপেক্ষা স্নিগ্ধ-শশধর-কর কেন অধিক সুন্দর! সে বিষণ্ণতায় সতীশের পত্নীর সৌন্দর্য্যে দেবত্বের আভাষ মিশিয়াছিল।

আমি দেখিলাম, সতীশের পত্নীর তুলনায় শারদা রূপগর্ব্বহীনা। অথচ সতীশ তাহারই জন্য পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছে,—কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে! ভ্রমর কেন বিকশিত কমলবন ত্যাগ করিয়া সপ্তপর্ণে আকৃষ্ট হয়, তাহা কে বলিবে?

শ্রীরাধা যখন বিরহবেদনায় ব্যথিতা—স্বর্ণপ্রতিমা যখন ধূলায় লুণ্ঠিতা, কুব্জা তখন শ্যামসোহাগিনী! ইহা অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বটে।

সতীশের জননী আমার নিকট অনেক দুঃখ করিলেন। সতীশ তাঁহার একমাত্র সন্তান। বধূর ব্যবহারগুণে তিনি তাহাকে কন্যার মত স্নেহ করিতেন। তিনি আপনি দেখিয়া তাহাকে বধূ করিয়াছিলেন। এখন সে সতীশের ববহারে মনঃকষ্টে শুকাইয়া যাইতেছে—তাহার দুঃখে ও পুত্রের ব্যবহারে জননীর হৃদয় অহরহঃ ব্যথিত হইতেছিল। সে কথা বলিতে বলিতে তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি যখন আমাকে এই দুঃখকাহিনী বলিতে-ছিলেন, তখন কক্ষের দ্বারান্তরালে কাহার দীর্ঘনিশ্বাসপতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কি করিব? সতীশের ব্যাধি শিবের অসাধ্য। সে দিনের মধ্যে কেবল একবার গৃহে যাইত। প্রভাতে গৃহ হইয়া আফিসে যাইত। পত্নীর সহিত ক্বচিৎ তাহার সাক্ষাৎ হইত। আমি কি করিয়া তাহাকে ফিরাইব?

৪

এক বৎসর কাটিয়া গেল। বৎসরের মধ্যে সতীশের কোনও পরিবর্ত্তন ঘটিল না। আমি ক্রমে তাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইতে লাগিলাম।

এই সময় এক দিন দেখিলাম, সতীশের মুখ অন্ধকার। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সতীশের জননী আসন্ন অর্দ্ধোদয় যোগে বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতে চাহেন। শুনিয়া আমি বলিলাম, "তাহার আর ভাবনা কি? আমার মাও যাইতে উৎসুক। এমন সঙ্গী পাইলে তাঁহারও যাওয়া ঘটিবে।" সতীশ কিন্তু সন্তুষ্ট হইল না।

প্রকৃত কথা এই যে, সতীশের জননী যেমন বারাণসী যাইতে উৎসুক হইয়াছিলেন—শারদাও যাইবার জন্য তেমনই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিল। কাযেই সতীশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

সতীশ জননী ও শারদা উভয়কেই নিরস্ত করিবার প্রয়াস পাইল। কিন্তু সফল হইল না।

শেষে দাঁড়াইল এই যে, আমি আমার জননীর সঙ্গে সতীশের জননীকেও লইয়া যাইবার ভার লইলাম। সতীশ সরকার ও দাসী সঙ্গে দিয়া শারদাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিল। সে স্বয়ং গেল না।

যাইবার দিন দেখিলাম, সতীশের জননীর সঙ্গে তাহার পত্নীও চলিয়াছে। তাহার যাইবার কথা পূর্ব্বে শুনি নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করায় সতীশের

জননী অশ্রুগদ্গদ কণ্ঠে বলিলেন, "কি করিব, বাবা? তুমি ত সবই জান। বৌমা কাঁদিতে লাগিল, বলিল, 'মা, জন্মান্তরের কর্ম্মফলে এ জন্মে এই দুর্গতি। এ জন্মে পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিলে হয় ত জন্মান্তরে সুখী হইতে পারিব।' কাযেই আমি লইয়া যাইতে সম্মত হইলাম। নহিলে কি বৌমার তীর্থ-ধর্ম্ম করিবার বয়স?" তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। আমারও চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। দেখিলাম, আমার মাও কাঁদিতেছেন।

কয়টি রমণী, কয় জন ভৃত্য ও কতকগুলি দ্রব্য লইয়া আমি বারাণসী যাত্রা করিলাম। বহুকষ্টে 'রিজার্ভ' কামরার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। কাযেই যাত্রীর বিষম বাহুল্যেও কোনরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। আমরা নিরাপদে বারাণসীতে আসিয়া উপনীত হইলাম।

৫

যোগের দিন প্রত্যূষে জনকোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হইল। বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, রাজপথ গঙ্গাস্নানার্থী ও গঙ্গাস্নার্থিনীতে পূর্ণ—বর্ষার বারিপ্রবাহের মত জনস্রোতঃ অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। সে দৃশ্য দেখিয়া মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল—পুণ্যকামীদিগকে দেখিয়া মনে বিস্ময় ও ভক্তি সমুদিত হইল।

গঙ্গাতীরে আসিয়া সে ভাব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবক, যুবতী—কি আগ্রহে গঙ্গার পুণ্যপ্রবাহে অবগাহন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করিতেছে! এ আগ্রহ যে অটল বিশ্বাসের ফল—সে বিশ্বাস মানুষকে দেবত্বের সন্নিহিত করে; এ বিশ্বাসের ফলেই মানুষ সকল পার্থিব সম্পদই হেলায় পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,—এ বিশ্বাস আমাদের অধিকৃত ছিল,—আর নূতন শিক্ষায় ও নূতন দীক্ষায় আমরা এই বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছি। ইহা উন্নতির চিহ্ন, না অবনতির নিদর্শন?

বহু চেষ্টায় কোনরূপে মা'কে, সতীশের জননীকে ও সতীশের পত্নীকে স্নান করাইয়া লইলাম। সে জনতায় গঙ্গায় অবগাহন যে কিরূপ দুষ্কর, তাহা যে না দেখিয়াছে, তাহাকে বুঝাইতে পারিব না। তাঁহারা তীরে ভিখারী দিগকে দান করিলেন।

তাহার পর তাঁহাদিগকে লইয়া আমি গৃহে চলিলাম।

৬

গৃহে ফিরিবার সময় নদী হইতে অদূরে পথের উপর কয় জন লোক একত্র হইয়াছে দেখিয়া কৌতূহলবশে চাহিয়া দেখিমাম,—এক জন মরণাহতা রমণী পথে পড়িয়া আছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কি সর্ব্বনাশ!—এ যে শারদা। বুঝিলাম, অভাগিনী বারাণসীতে আসিয়াছিল;– বিসূচিকায় আক্রান্তা হইয়াছে;—তাহার ভৃত্যবর্গ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে;—সে রাজপথে ধূলিশয়নে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছে।

আমি বিষম দুশ্চিন্তায় পড়িলাম;—কি করি? সতীশের জননীর—বিশেষতঃ তাহার পত্নীর নিকট এ কথা গোপন রাখিতে হইবে। কিন্তু শারদা-কেই বা বিনা চিকিৎসায় কেমন করিয়া পথে মরিতে ফেলিয়া যাইব? শেষে ভাবিলাম, আমার সহযাত্রীদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিয়া শারদার যেরূপ হয় একটা ব্যবস্থা করিব।

তাহাই স্থির করিয়া আমি শতীশের জননীকে বলিলাম, "চলুন, গৃহে যাই। বেলা হইয়াছে।"

কিন্তু আমি যখন একরূপ ভাবিতেছিলাম, অদৃষ্ট তখন অন্যরূপ গড়িতে-ছিল। সতীশের পত্নী মরণাহতা রমণীকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে তাহার শ্বাশুড়ীকে বলিল, "মা, ঐ দেখ, কে পথে পড়িয়া মরিতেছে। চল, উহাকে গৃহে লইয়া যাই।" শুনিয়া আমি বলিলাম, "উহার আর বাঁচিবার আশা নাই। বৃথা উহাকে লইয়া গিয়া কি হইবে?" সতীশের পত্নী আবার তাহার শ্বাশুড়ীকে বলিল, "না, মা! তীর্থে আসিয়া যদি সেবা করিয়া উহাকে বাঁচাইতে পারি—তবে তীর্থদর্শন সার্থক হইবে।"

আমি বিপদে পড়িলাম। কি করি? শেষে বলিলাম, "আপনাদের গৃহে রাখিয়া আসিয়া আমি উহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দিব। এখন গৃহে চলুন।" ততক্ষণে সতীশের পত্নীর দয়া তাহার সহযাত্রী রমণীগণের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়াছে। আমার মা বলিলেন, "ততক্ষণ বাঁচিবে কি?" আমি বলিলাম, "তবে কি করিব?" সতীশের পত্নী আমার জননীকে কি বলিল। আমার মা বলিলেন, "বৌমা যাহা বলিতেছে, না হয় তাহাই কর। উহাকে সঙ্গে লইয়া চল।"

আমি আপত্তি করিলাম। বিদেশে বিসূচিকাগ্রস্ত রোগীকে লইয়া বিপন্ন হইতে হইবে। তাহার সেবা শুশ্রূষার কি হইবে?

কিন্তু তখন তিনটি রমণীহৃদয়ে দয়া-প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। সে প্রবাহে আমার যুক্তি-তর্ক সব ভাসিয়া গেল। তিন জনের অনুরোধ আমি অবহেলা করিতে পারিলাম না; অগত্যা—লোক সংগ্রহ করিয়া সংজ্ঞাশূন্যা শারদাকে গৃহে লইয়া চলিলাম।

আমি ভাবিতে ভাবিতে চলিলাম,—না জানি কি হইবে? যদি শারদাকে মৃত্যুর মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া সতীশের পত্নী তাহার পরিচয় পায়? তখন সে হৃদয়ে কি বিষম বেদনা পাইবে? আবার শারদা যখন জানিতে পারিবে, সে তাহার জীবনদাত্রীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছে, তখন সেই বা কি ভাবিবে?

আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কিন্তু আশঙ্কায় হৃদয় চঞ্চল হইয়া রহিল। না জানি কি ঘটিবে?

৭

গৃহে শারদার সেবাশুশ্রূষার ক্রটী হইল না। সতীশের পত্নী যে ভাবে তাহার সেবা করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আমি—চিকিৎসাব্যবসায়ী আমিও বিস্মিত হইলাম।

রোগিণীর অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল।

সুখের বিষয়, সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন শারদার জ্ঞানসঞ্চার হইল, তখন সে কক্ষে আমি ব্যতীত আর কেহ ছিল না। শারদা আমাকে দেখিয়া কিছুক্ষণ বিস্ময়ে কথা কহিতে পারিল না;—তাহার পর বলিল, "এ কি? আপনি?"

আমি দেখিলাম, সকল কথা বলিলে দুর্ব্বলদেহা শারদার বিপদের বিশেষ আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই কেবল বলিলাম, "সব পরে বুঝাইয়া বলিব। সাবধান, তুমি যে আমাকে চেনো, তাহা প্রকাশ করিও না।"

শারদা আরও বিস্মিতা হইল।

দুই দিন কাটিয়া গেল। শারদার রোগমুক্তিতে সতীশের পত্নীর আনন্দ যেন আর ধরে না।

শারদা তাহার শুশ্রূষায় ক্রমেই কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিল। শেষে তৃতীয় দিন সে সতীশের পত্নীকে বলিল, "আপনি ভগিনীর অধিক যত্নে ও স্নেহে এ অভাগিনীর শুশ্রূষা করিতেছেন। কিন্তু আমার পরিচয় পাইলে আপনি আমাকে কেবল ঘৃণা করিবেন।"

সতীশের পত্নী বলিল, "না। ঘৃণা করিব কেন?"

শারদা স্থিরভাবে বলিল, "আমি গৃহস্থের পবিত্র গৃহ কলুষিত করিয়াছি। আমি—কুলটা।"

সতীশের পত্নী মুহূর্ত্তমাত্র বিস্ময়ে মূক হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কুলটাকে ঘৃণা করিবার অধিকার আমার নাই'।"

শারদার নয়ন বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল! সে জিজ্ঞাসা করিল, "সে—কি?"

সতীশের পত্নী উত্তর করিল, "আমার স্বামী আমার সে অধিকার আর রাখেন নাই। স্বামী যাহাকে জীবন সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেন,—পত্নীর তাহাকে ঘৃণা করিবার অধিকার নাই।" কথাটা বলিতে বলিতে সতীশের পত্নীর গলাটা ধরিয়া আসিল। তাহার পর সে উঠিয়া চলিয়া গেল। এমন অবস্থায় কোন পতিপ্রেমবঞ্চিতা মর্ম্মবেদনা-মথিত অশ্রু সংবরণ করিতে পারে?

সেই দিন আমি শারদাকে সকল কথা বলিলাম। শুনিয়া শারদার রোগশীর্ণ আনন রক্তলেশশূন্য হইয়া গেল। সে কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া কাতরভাবে আমাকে বলিল, "আপনি সব জানিয়া কেন আমাকে এখানে আনিলেন?"

আমি বলিলাম, "আমি ত বলিয়াছি, আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি।"

শারদা আর কিছু বলিল না;—ভাবিতে লাগিল।

আমি অবিলম্বে কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। মা'র ও সতীশের মা'র মত হইল না। তিন দিন পরে আর একটি যোগ ছিল—তাঁহারা বলিলেন, সেই 'যোগে' স্নান করিয়া ফিরিবেন। সতীশের পত্নীও সেই মত করিল। বুঝিলাম,—তাহার কারণ—আরও তিন দিনে শারদা সম্পূর্ণ সুস্থ ও কিছু সবল হইতে পারিবে।

৮

আমরা যে দিন কলিকাতা যাত্রা করিব, সেই দিন প্রত্যুষে পরিচিত কণ্ঠের কলরবে নিদ্রাভঙ্গ হইল। কি হইয়াছে জানিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলাম। মা, সতীশের জননী ও সতীশের পত্নী দাসীকে তিরস্কার করিতেছেন। মা বলিলেন, "তুমি কি বলিয়া তাহাকে যাইতে দিলে? দুর্ব্বল শরীরে এই শীতে প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান কি সহ্য হইবে?" দাসী বলিল,

"আমি কি করিব? তিনি জিদ করিয়া বাহির হইলেন; সঙ্গে যাইতে চাহিলাম—নিষেধ করিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, শারদা গঙ্গাস্নান করিবার জন্য বাহির হইয়া গিয়াছে! "আর বকাবকি করিয়া কি হইবে? আমি যাই, দেখিয়া আসি"—বলিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

অদূরে গঙ্গা। নিকটবর্ত্তী ঘাটগুলিতে ঘুরিলাম, শারদা নাই। তখন আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, হয় ত সে কোথাও চলিয়া গিয়াছে। অজ্ঞাত আশঙ্কা আমার হৃদয়কে পীড়িত করিতে লাগিল।

শেষে সন্ধানে সফল না হইয়া আমি গৃহে ফিরিলাম। শারদার কক্ষে যাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে তাহার উপাধানতলে দুইখানি পত্র পাইলাম;—একখানি সতীশের পত্নীকে, অপরখানি সতীশকে লিখিত।

সতীশের পত্নীকে শারদা লিখিয়াছে:—"যে অভাগিনী আপনার সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়াছিল—আপনি তাহাকেই জীবন দান করিয়াছেন। এ কথা ভাবিয়া আমি ঘৃণায়, লজ্জায়, অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। মৃত্যু ব্যতীত আমি সে শান্তি পাইব না। আমি তাহারই সন্ধানে চলিলাম। জীবনই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়—আপনি আমাকে তাহাই দান করিয়াছেন। আর আমি কি তাহার প্রতিদানে আপনাকে আপনার অধিকার ফিরাইয়া দিতে পারিব না? আমিও রমণী! আপনি সতী। আপনাকে পতিপ্রেম হইতে কেহ চিরবঞ্চিতা রাখিতে পারিবে না। আপনার অগ্নিপরীক্ষা-পূত প্রেম আজ জয়ী হইয়াছে। আপনি পুণ্যবতী—আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হইবে। তাই আজ আপনার নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি—যেন জন্মান্তরে আর কাহাকেও এমন মনোবেদনা দিবার দুর্ভাগ্য আমার না ঘটে। আমার অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে সতীশের স্ত্রীর নয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। রমণীর পূত দয়াপ্রবাহে শারদার অপরাধ বিধৌত হইয়া গেল। তাহার প্রার্থনা সফল হইল।

শারদা সতীশকে লিখিয়াছে,—"আমার অদৃষ্ট এত দিনে আমাকে আমার জীবন-পথের শেষ দেখাইয়াছে। তুমি আমাকে অযাচিতভাবে অপ্রত্যাশিত সুখে সুখী করিয়াছ; আজ আমি তোমার সুখের পথ হইতে সরিয়া তোমার

পক্ষে সে পথ মুক্ত করিতে যাইতেছি। তুমি ডাক্তার বাবুর নিকট সকল কথা শুনিতে পাইবে। তুমি কেমন করিয়া আমার মায়ায় অভিভূত হইয়া, আমি যাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহি, তাঁহাকে ভুলিয়াছিলে? অমৃতের উৎস ত্যাগ করিয়া তুমি তাপতপ্ত মরুভূমিতে বিচরণ করিয়াছ। আজ আমি স্বহস্তে সে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দিতেছি। প্রকৃত প্রেম মানুষকে কখনও ভ্রান্ত করিতে পারে না; পরন্তু তাহার তুল্য ভ্রান্তিভেষজ আর নাই। সে প্রেম উচ্ছৃঙ্খলতাকে সংযত ও যৌবনাবেগ প্রশমিত করে; প্রেমাস্পদকে ধ্বংসের প্রশস্ত ও সুগম পথ হইতে উন্নতির সঙ্কীর্ণ ও দুর্গম পথে ফিরাইয়া আনে। সে প্রেমে যাহার উদ্ধার সংসাধিত না হয়, তাহার আর উদ্ধারের আশা নাই। আজ সেই প্রেম তোমাকে ভ্রান্তি হইতে মুক্তি দিতেছে। সেই প্রেমে তুমি সুখী হইবে। তোমার নিকট আমি শত অপরাধে অপরাধী। আমার সে সকল অপরাধ ক্ষমা করিও।"

আমরা সেই দিন কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

শারদার কথাই সত্য হইল। শারদার অন্তর্ধান সতীশের পক্ষে বিষম বেদনার কারণ হইল; কিন্তু পত্নীর প্রেমে সে বেদনা অপনীত হইল। পত্নীর প্রেম তাহাকে প্রকৃত সুখে সুখী করিল।

আমি সতীশকে কখনও শারদার কোনও কথা জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতাম, শারদার সমুজ্জ্বল আত্মদান তাহাকে নারী-হৃদয়ের এক অদৃষ্টপূর্ব্ব মহত্ত্ব দেখাইয়াছে। সে তাহা ভুলিতে পারে নাই।

আমিও তাহা ভুলিতে পারি নাই। সেই আত্মত্যাগে তাহার কলঙ্ক-কলুষিত জীবনের সকল কালিমা প্রক্ষালিত হইয়াছিল;—শুভ্র, সুন্দর নারী-হৃদয়ের মহত্ত্ব সপ্রকাশ হইয়াছিল। মৃত্যুর আলোকে তাহার জীবনের তমোরাশি বিদূরিত হইয়াছিল—সেই আলোকে পুণ্যপূত রমণীহৃদয় উদ্ভাসিত

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

উত্থান-সঙ্গীত।

হে পতিত, হে ব্যথিত, হে পদদলিত ;
উঠ, উঠ ; শুনিছ না শুভ শঙ্খরোল ?
নামে গঙ্গা—হরিপাদপদ্ম-বিগলিত,
দেখ, দেখ, কি অমৃত আলোক-হিল্লোল !

অই শুন সুগম্ভীর নব বেদধ্বনি—
মৃত্যুঞ্জয়-মহাকণ্ঠে উঠেছে বাজিয়া !
মৃত্যুর অশিব-শান্তি-স্তম্ভিতা-ধরণী
প্রচণ্ড তাণ্ডবে পুনঃ উঠিছে নাচিয়া !

মুছ অশ্রু, মুছ ভালে ও পদাঙ্কধূলি ;
স্নান করি' ওই জ্যোতিঃ-জাহ্নবীর জলে
লহ মন্ত্র—লহ লহ শীঘ্র হাতে তুলি'
সত্যের শাণিত খড়্গ কর্ম্মরণস্থলে !

অনন্তের বংশধর, শক্তির সন্তান !
কোথা মৃত্যু ? মোহ শুধু মৃত্যু এ সংসারে ;
দেখ আপনার মাঝে—চন্দ্রদ্যুতিমান্
কার পাদপদ্ম জ্বলে দীপ্ত সহস্রারে !

বাজায়ে বিজয়-শঙ্খ অম্বুদনিনাদে,
ভক্তের হৃদয়-রক্তে সিক্ত করি' পথ,
অর্ঘ্যভার পূর্ণ ঘট তুলি' লয়ে মাথে,
ফিরায়ে আনিগে চল মার স্বর্ণরথ !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রতিভার ক্ষয়।

আজ কাল সকল দেশেই প্রতিভার যেন লয় হইতেছে। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল দেশ প্রতিভাসম্পন্ন মনীষিগণের জ্ঞানালোকে বা কল্পনা-কৌমুদীতে উদ্ভাসিত হইতেছিল, আজ সেই সকল দেশ যেন গভীর অন্ধতমসে সমাবৃত হইতেছে। কেবল আমাদের এই অধঃপতিত দেশই যে বিদ্যাসাগরের সেই অলোকসামান্য বিদ্যাবত্তা, দীনবন্ধুর সেই কৌতুক-ময় রসালাপ, মাইকেলের সেই গম্ভীর মুরজ-রাব, বঙ্কিমের সেই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, হেমচন্দ্রের সেই ললিত কল্পনা, কৃষ্ণদাসের সেই রাজনীতিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহা নহে; পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই যেন প্রকৃত প্রতিভা আর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। যেন কেমন এক বিশ্বব্যাপিনী কুহেলিকা সমগ্র জগৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে; তাহারই ফলে প্রতিভার কুসুম-কোরক যেন অঙ্কুরেই লয় পাইতেছে। স্বাধীনা, স্ফূর্ত্তিমতী ব্রিটানিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, সেখানেও দেখিবেন,—সকল ক্ষেত্রেই প্রতিভার কুসুম-কোরক যেন অকালেই শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। তথাকার কাব্যকুঞ্জে—সেক্সপীয়র, মিলটন, বায়রণ দূরের কথা, টেনিসনের মত শুভ্র যূথিকা আর ফুটিতেছে না; ব্রাউনিঙের মত মালতী আর সৌরভ বিতরণ করিতেছে না; সুইনবর্ণের মত শেফালিকা চিরতরে শুকাইয়া যাইতেছে; আর্ণল্ডের মত মল্লিকা মালঞ্চ শূন্য করিয়া যেন চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে! এখন তথাকার সমগ্র কাব্যকুঞ্জ কেবল ভাঁটফুলে ছাইয়া ফেলিয়াছে। কাব্য-কানন ছাড়িয়া ধর্ম্মারণ্যে প্রবেশ করুন, দেখিবেন, সেখানেও সেই একই প্রকারের দুর্গতি। নিউম্যান, ষ্টান্‌লী, লাইটফুট, মার্টিনো, বা ম্যানিঙের মত পাদপ আর তথায় জন্মিতেছে না,—এখন ধর্ম্মের বাগানে এরণ্ডই ক্রম বলিয়া আত্মগৌরব প্রকাশ করিতেছে। ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করুন:—গ্রীণ বা ফ্রুডের মত ঐতিহাসিক আর এক জনও খুঁজিয়া পাইবেন না;—ক্ষেত্রটি যেন তৃণশস্পহীন মরুতে পরিণত হইয়াছে। কার্লাইল ও রস্কিনের মত প্রবন্ধলেখক আর নাই। মিল, স্পেন্সার ও টমাস গ্রীণের মত চিন্তাশীল দার্শনিকের দল বিদায় লইয়াছেন,—এখন তথাকার উষরক্ষেত্রের উত্তপ্ত বালুকারাশি পূতিগন্ধময়-বায়ু-বাহিত হইয়া লোকলোচনকে অন্ধ করিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের সম্পদগর্ব্বে ব্রিটানিয়া আত্মহারা। কিন্তু তাঁহার সেই বিজ্ঞানের নন্দন-কাননে দার্ব্বিন, হক্সলি, টিণ্ডেল প্রভৃতি পারিজাত, মন্দার ও পলাশ নাই, তাহা কেবল শাল্মলী বৃক্ষে সমাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ঔপন্যাসিকের বাগিচাও শ্রীভ্রষ্ট। জর্জ্জ এলিয়ট, থ্যাকারে, ডিকেন্স, মেরিডিথের মত উপন্যাসের রসাল বৃক্ষ আর জন্মিতেছে না—এখন তথায় তিন্তিড়ী ও আমড়া গাছেরই বাহার খুলিয়াছে। রাজনীতিক্ষেত্রে গ্লাডষ্টোন ও ডিজরেলীর মত রাজনীতিকের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে। কলাবিদ্যায় টার্ণার, রসেটী, লেটন, মিলে ও বার্ণ জোন্সের সমকক্ষ আর নাই। সুতরাং বলিতে হয়, ইংলণ্ডের সর্ব্ব দিকে সর্ব্বপ্রকার প্রতিভাই লয় পাইতেছে। যদি কেবলমাত্র এক দিকেই এই প্রতিভার

ক্ষয় হইত, তাহা হইলে না হয় বুঝিতাম, এই ক্ষয় সাময়িকমাত্র। কিন্তু যখন এককালে সকল দিকেই এই ক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশমান,—তখন বুঝিতে হইবে, কোনও গূঢ় অদৃষ্ট-চর কারণে ধরাপৃষ্ঠ হইতে প্রতিভাবান লোক লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। বিলাতের 'নেশন' পত্রে এই প্রসঙ্গে সম্প্রতি একটি প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। প্রবন্ধে প্রতিভালোপের কারণও সংক্ষেপে সামান্য ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় আমরাও এই সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে বিলাতে যে সমস্ত প্রতিভাসম্পন্ন লোক ছিলেন,—তাঁহাদের প্রত্যেকেরই এক একটি বিশিষ্ট নিজস্ব ছিল,—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব ও নিজত্ব যেমন পরিস্ফুট ছিল,—শব্দ-বিভূতি ও শব্দ-শক্তির প্রভাবে তাঁহাদের রচনায় যেরূপ ভাব-তরঙ্গ খেলিত, বর্ত্তমানে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত, তাঁহাদেরই মত প্রভুতা-সম্পন্ন কোনও সাহিত্যিকেরই সেরূপ বিশেষত্ব, নিজত্ব, বা শব্দ-বিভূতি নাই,—এ কথা অকুণ্ঠকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বতন কবি, কলাবিৎ, সন্দর্ভলেখক ও বৈজ্ঞানিক মানব-জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তাতরঙ্গের অগ্রবক্তা ছিলেন। সেই সময় নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছিল। তাহারই ফলে মানব-চিন্তার শত অভিনব পথে কল্পনার উদ্দাম বেগ সবেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। মানবের সেই পরিবর্ত্তনশীল চিন্তা ভবিষ্যতে কোন্ নূতন, বিশাল, অভিনব পথে প্রধাবিত হইবে, কোন্ নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইবে,—ইঁহারা তাহা অনেকটা বুঝিতে পারিতেন, এবং জানিয়া শুনিয়া বুঝিয়া জনসাধারণের নিকট সেই পরিবর্ত্তনশীল নবীন ভাবের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়া দিতেন। কোনও দূরদর্শী অগ্রণী পথিমধ্যে উচ্চ শৈলচূড়ায় আরোহণ করিলে, দূরস্থ গন্তব্য দেশ ও তাহার সরিৎ, সরোবর, প্রান্তর, কান্তার, অটবী, বিটপী প্রভৃতি যেমন সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নয়নগোচর হয়,—তখন তিনি যেমন সেই পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত তাঁহার অনুচরগণকে সেই গন্তব্য দেশের কথা পূর্ব্বেই বলিয়া দিতে পারেন, সেইরূপ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, কলাবিৎ, সন্দর্ভ-লেখক ও বিজ্ঞানবিৎ পূর্ব্বাহ্লেই মানবমণ্ডলীর ভবিষ্যৎ পরিবর্ত্তন-শীল চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের মনে মানব জাতির ভবিষ্যৎ চিন্তার এই অগ্রসূচনা তাঁহাদের চিন্তার পুষ্টি ও বিকাশ করিয়া দেয়। যাঁহাদের কল্পনা-শক্তি প্রখর ও জনসমাজের প্রতি যাঁহাদের সহানুভূতি প্রবল, তাঁহারাই কেবল প্রতিভাবলে ভবিষ্যতের ভাবানুমানে সমর্থ হইতেন। নূতন বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণী ভাব যখন মানুষের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তির উপর ক্রিয়া আরম্ভ করে, তখন বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি স্বাধীন ভাব ধারণ করে, ও ইন্দ্রজালমুগ্ধ ব্যক্তির মত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। এক জন জন্মান্ধ যেমন হঠাৎ দৈববলে চক্ষুষ্মান হইয়া যে বস্তুতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, সেই বস্তু-দর্শনেই তাহার হৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া যায়, যতই নূতন নূতন বস্তু দেখে, ততই তাহার বিস্ময়াপ্লুত মনোবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি আপন আপন সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাব ধারণ করে, সসীমতার শৃঙ্খল কাটিয়া অসীমতার দিকে ধাবিত হইতে থাকে,—সেইরূপ নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক ও বিশ্লেষণী ভাবের অভ্যুদয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও মনোবৃত্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্বাধীনভাবে দৌড়িতে থাকে। মানবের

ইতিহাস নিয়মের অধীন, শক্তিসঞ্চয়ের নিয়ম, জড়শক্তিসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধ, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি নিয়মগুলি তখনও কুম্ভকারের হস্তস্থিত কর্দ্দমের ন্যায় কোমল ও কমনীয় ছিল ; সেই কোমল মৃত্তিকা দ্বারা তদানীন্তন কবি, দার্শনিক প্রভৃতি আপনাদের ইচ্ছামত মতামত গঠন করিয়া লইয়াছেন।

এই শ্রেণীর ভাবুক, চিন্তাশীল ও ভবিষ্যদ্বক্তা অধুনা নীরব। কেবল কবি বলিয়া নহে, বর্ত্তমান সময়ের রাজনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও সংস্কারকগণের মধ্যে পূর্ব্বতন যুগের সেই স্বাধীন চিন্তার তূর্য্যনাদ আর শ্রুত হইতেছে না। যে চিন্তা পূর্ব্ববর্ত্তী জনসাধারণকে নূতন ভাবে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল, সেই চিন্তাই বর্ত্তমান যুগে লোকসমাজকে কঠোর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, এবং যেন কতকটা অসাড় করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা এখন বড় অগ্রপশ্চাৎ বিচারের যুগে আসিয়া পড়িয়াছি,—এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সাধারণ চিন্তার সাবেক গোঁড়ামীর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যে কেবল এই অবস্থা ঘটিয়াছে,—তাহা নহে ; পূর্ব্বতন যুগের নূতন ভাবের পোষক চিন্তার চাঞ্চল্য শান্ত হইয়া গিয়াছে, সেই জন্যই এই অবস্থা ঘটিয়াছে। বিজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে মানবের চিন্তা ও মানবের জীবনকে যেন কলের মত 'একঘেয়ে' ও জড়বৎ স্বাধীনতাশূন্য করিয়া তুলিয়াছে। এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ের শিল্পের যে দশা ঘটিয়াছে,—মানব-জীবনের ও চিন্তারও ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে। নূতন চিন্তা হইতে অভিনবত্বের 'জলুস' ও উদ্দীপনা চলিয়া গিয়াছে ;—এখন কেবল শুষ্ক নীরস বাঁধা গৎটুকু মাত্র পড়িয়া আছে। ফলে সাবধানে সন্তর্পণে শনৈঃ শনৈঃ বুদ্ধি খাটাইয়া কর্ত্তব্যসাধন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

'নেশনে'র লেখক বুঝাইতে চাহেন,—পূর্ব্বাপেক্ষা এখনকার লোকের স্বাভাবিক বুদ্ধি কমে নাই, তবে বর্ত্তমান যুগের অবস্থাবশে মানুষ অধিক সাবধান হইয়াছে। ইনি বলেন,—এখনকার লোকের মন উদার ও প্রশস্ত বটে, কিন্তু চিত্তবৃত্তি তাদৃশ প্রখর ও গভীর নহে। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে মানুষ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক কায়িক সুখ সম্ভোগ করিতেছে। এখন সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজমান। লোকের আর্থিক স্বচ্ছলতাও অতিশয় বাড়িতেছে। কাজেই লোক আর পূর্ব্বের মত কোনও বিষয়ে কল্পনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিতে চাহে না ;—বহুবার অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কোনও বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে সাহস করে না। বিশেষতঃ, নানা দিক হইতে এখন লোকের মনে নানা ভাবের,—নানা মতের—সংক্রমণ হইতেছে,—ইহাতে লোকের মনে কোনও ভাবই বদ্ধমূল হইতেছে না ;—কাজেই লোক পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধান ও বিতর্কপরায়ণ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের মনে হয়, প্রতিভানাশের নিদান-তত্ত্ব-নির্ণয়ে 'নেশন' সকল কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মানুষের জ্ঞান-নদীতে যত দিন জোয়ার বহিতে থাকে,—তত দিন নূতন নূতন তথ্যও আবিষ্কৃত হইতে থাকে,—প্রতিভাশালী লোকের মনোদর্পণে তত দিন নূতন নূতন ভাবও প্রতিফলিত হইতে থাকে। কিন্তু নদীতে যখন ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হয়, তখন সেই পুরাতন ভাবই গলিত ও দুষ্ট অবস্থায় নানা আবর্জ্জনার সহিত মিশিয়া আবার ফিরিয়া আসে। মানুষ ক্রমশঃ উন্নতির শৈলে যতই উঠিতে থাকে, ততই দূরস্থ নূতন নূতন দৃশ্য তাহার নয়নপথে পতিত হয় ;—নূতন নূতন দৃশ্য মনে নূতন নূতন চিন্তার

প্রবাহ ছুটাইয়া দেয়। কিন্তু কাল-চক্রনেমির আবর্ত্তনে যখন তাহার অধিরোহণ রুদ্ধ হইয়া যায়, এবং অবরোহণ আরব্ধ হয়, তখন সেই পুরাতন দৃশ্যগুলি অন্ধকারে আবৃত হইয়া অস্পষ্টভাবে চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে থাকে; সেই অস্পষ্ট পুরাতন দৃশ্য মনে নূতন ভাবের সঞ্চার করিয়া দিতে পারে না। তখন সকল দিকেই প্রতিভার ক্ষয় হইতে থাকে। জগতের ইতিহাস ইহার চিরন্তন সাক্ষী।

'নেশন' বলিয়াছেন,—বিজ্ঞান বর্ত্তমান যুগে মানব-জীবন ও মানবের চিন্তাকে কলের মত 'একঘেয়ে', জড়বৎ ও স্বাধীনতা-শূন্য করিয়া তুলিয়াছে। এ কথা প্রকৃত। কল যেমন একঘেয়ে ভাবে চিন্তা-পরিশূন্য হইয়া কাজ করিয়া যায়, উহার যেমন স্বতন্ত্র সত্তা বা স্বাধীনতা নাই,—বর্ত্তমান যুগের মানুষও যেন ঠিক সেইরূপ কলের পুতুল হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে লোকের অর্থপিপাসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন, কি ধনী, কি নির্ধন, কি রাজা, কি প্রজা, সকলেই অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যাকুল। এখন সভ্যদেশে কেবল জীবন-রক্ষার জন্য জীবন-সংগ্রাম চলিতেছে না,—এখন অর্থবলে সকলের উপর প্রাধান্যলাভের জন্য, ব্যক্তি ও জাতি, উভয়ের মধ্যেই পরস্পর অহর্নিশ সংগ্রাম চলিতেছে। এখনকার সভ্যতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, সর্ব্বভূতে সমদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিপোষক নহে; উহা কেবল বণিক্-বৃত্তিরই পরিপোষক। সেই জন্যই আজ সমগ্র সভ্যজাতি বৈশ্যধর্ম্মেরই সেবক হইয়া পড়িয়াছে। এখন জগতের সর্ব্বত্রই বাণিজ্য-সংগ্রাম চলিতেছে। কিন্তু যেখানে বণিগ্‌ভাবের আবির্ভাব, সেখানেই উদারতা, মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের তিরোভাব অবশ্যম্ভাবী। বণিগ্‌বৃত্তি মানুষের মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া দেয়। যেখানে সঙ্কীর্ণতা, সেখানে প্রতিভা কখনই স্ফূর্ত্তি পায় না। ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। আমাদের দেশে যে প্রতিভার ক্ষয় হইতেছে, তাহার কারণ কতকটা স্বতন্ত্র। বণিগ্‌বৃত্ত জাতির সহিত সংস্রবে আমাদের দেশ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে,—স্বাধীন বৃত্তি ও স্বাধীন চিন্তার অভাবে হৃদয় ও মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। ফলে, সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে প্রতিভা ফুটিতে পাইতেছে না। ইউরোপেও শেষোক্ত কারণের অসম্ভাব নাই। বণিগ্‌বৃত্ত সভ্যতার প্রভাবে তথায় কতকগুলি লোকের হস্তে অত্যধিক অর্থাগম হইতেছে,—অবশিষ্ট অনেকে জীবন-সংগ্রামে মরণের সহিত অহোরাত্রি যুঝিতেছে। কাজেই তাহাদের মধ্যে প্রতিভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। সর্ব্বদেশের সহযোগী সাহিত্যে সেই প্রতিভা-হীনতার লক্ষণ পরিস্ফুট। ইহাতেই মনে হয়, বর্ত্তমান বণিগ্‌বৃত্ত সভ্যতার জোয়ারের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে,—এখন সেই সভ্যতার গঙ্গায় ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই প্রতিভাও ক্ষয় পাইতেছে।

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

প্রবাসী। বৈশাখ। প্রথমেই শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' নামক বিতর্ক-বাদ, বা উপন্যাস। ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথের ইদানীন্তন বিবিধ প্রবন্ধে যাহা পড়িয়াছি, 'গোরা' নামক কথোপ্রাকেও সেই সকল পুরাতন 'গৎ' বাজিতেছে। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসেও বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—'ভারতবর্ষের ধর্ম্মতন্ত্র একটি বিশেষ পথ দিয়ে ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়।

এবং এই ধর্ম্মতত্ত্ব ও অন্য বিবিধ তত্ত্বের' উপদ্রবে 'গোরা' উপন্যাসের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। 'উদ্দেশ্যমূলক' উপন্যাস বর্ত্তমান যুগের 'ফ্যাশান' বটে; কিন্তু 'গোরা'র উদ্দেশ্য এক নয়, বহু,—এবং কিছু গুরুতর। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে জগতের বহু তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে যে তর্কজালের উদ্ভব হইয়াছে, পাঠকের মন নিতান্ত নাচার-ভাবে সেই লূতাতন্তুজালে জড়াইয়া যাইতেছে। শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'ভূগোল-শিক্ষা' নামক প্রবন্ধে জার্ম্মাণী দেশে প্রবর্ত্তিত ভূগোল-শিক্ষাদানের নূতন পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছেন। সে পদ্ধতি যেমন সুন্দর, তেমনই সহজ। এ দেশে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে ভাল হয়। এ দেশের শিক্ষা-বিভাগে নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তন অসম্ভব;—যাহা 'সরকারী' ছাঁচে ঢালা নয়, তাহা কখনও ভারতের শিক্ষাবিভাগে গ্রাহ্য হইতে পারে না। এ দেশের কূপমণ্ডূক শিক্ষা-বিধাতারা মামুলী পথের পথিক; 'নূতন' তাঁহাদের চক্ষুঃশূল। আবার রাজপুরুষেরা 'শিব গড়িতে' বসিয়া প্রায়ই 'বানর গড়িয়া' থাকেন! 'কিণ্ডার-গার্টেনে' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। অতএব 'ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অফ্ এডুকেশন' বা 'জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ' বিচার করিয়া দেখুন—জার্ম্মানীর পদ্ধতি এ দেশে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না? শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ 'ধর্ম্মসাধন বা চরিত্রের উন্নতি-সম্পাদন' প্রবন্ধে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—'ধর্ম্মার্থী, পুরুষকার ও ব্রহ্মকৃপার সাহায্যে চরিত্রের উন্নতি সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাধন স্বীয় দৈহিক সংগঠন ও বংশপ্রভাব দ্বারা নিয়মিত এবং অনুরঞ্জিত হয়।' এই জন্যই বাঙ্গালা দেশে প্রবাদ আছে,—'স্বভাব যায় না মলে।' বিষয়টি গুরুতর, এবং চিন্তাশীলগণের চিন্তনীয়। দৈহিক গঠন ও বংশপ্রভাব যদি অনতিক্রমণীয় হয়, তাহা হইলে, জগতে শিক্ষার উপযোগিতা থাকে না। শিক্ষা যদি নিষ্ফল হয়, তাহা হইলে জগতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হইয়া যায়। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উপন্যাসের ন্যায় মধুর ভাষায় পাণ্ডুয়ার প্রত্ন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—'পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের পুরাতন নাম কিরূপ ছিল, কেহ তাহার তথ্যাবিষ্কারে কৃতকার্য্য হইলে, দৃশ্যমান অট্টালিকাদির ইষ্টক প্রস্তর মুখরিত হইয়া উঠিবে—তাহারা বিবিধ বিলুপ্ত কাহিনীর সন্ধান প্রদান করিবে, যাহা নাই, তাহার কথায়, যাহা আছে, তাহাকে হয় ত নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিবে। ভবিষ্যতের পর্য্যটকগণ কেবল কৌতূহল চরিতার্থের জন্য শ্রম স্বীকার না করিয়া, এই সকল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রবন্ধ-রচনার সকল প্রয়াস চরিতার্থ হইবে।'—আশা করি, লেখকের এই আহ্বান বিফল হইবে না। বিশারদ মহাশয় প্রশান্ত মহাসাগরের গর্ভে প্রবালশয্যায় সুপ্তিমগ্ন, এখন 'পর্য্যটক' চলিতে পারে।—কিন্তু 'কৌতূহল চরিতার্থের জন্য' বোধ করি রায় সাহেব হারাণচন্দ্রের 'নিরঙ্কুশ' ব্যাকরণের নিজস্ব। অক্ষয় বাবুর মত নিপুণ লেখকও যদি বিশেষ্য-বিশেষণের প্রভেদ 'একাকারে' মিশাইয়া দেন, তাহা হইলে, ব্যাকরণের বালাই ঘুচিয়া যায় বটে,—কিন্তু 'অর্থ' বেচারীও অপঘাতে অকা-লাভ করিবে। 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবেতরো জনঃ'—তাই এই সামান্য ত্রুটীর উল্লেখ করিলাম। অনর্থক বিশেষ্য-বিশেষণের শ্রাদ্ধ করিয়া কোনও লাভ নাই। 'ভেরা সেজোলোভা' অষ্টাদশবর্ষীয়া রুস-বালিকা,—'বিপ্লব-বাদিনী। ভেরার জীবন বিচিত্র বটে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভেরা'র সম্বন্ধে

লিখিয়াছেন,—'এই প্রবন্ধের নায়িকার স্বদেশপ্রেমে আত্মোৎসর্গের আশ্চর্য্য বিবরণটি আমাদের নিষ্ঠা উদ্রেকের পক্ষে উপযোগী।' রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের শেষে স্বদেশী, বয়কট ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে সুদীর্ঘ পরামর্শ দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের 'পথ ও পাথেয়' প্রভৃতি ইদানীন্তন প্রবন্ধ-সমূহেও সেই পরামর্শই প্রতিফলিত হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্র বাবু স্বদেশীর উদ্বোধনকালে যে শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন, এখন সেই শাখাই ছেদন করিতেছেন! রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—'আশুপ্রয়োজনসাধনের প্রলোভনে ধর্ম্মভ্রষ্ট হওয়াই দুর্ব্বলের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বিপদ। 'বয়কট' উদ্যোগের ব্যাপারে আমরা তাহার পরিচয় দিয়াছি।' রবীন্দ্রনাথের 'আমরা' ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছেন কি না,—রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'ই তাহা বলিতে পারে;—কিন্তু 'স্বদেশী' ও 'বয়কটের' নেতা ও ভক্তগণ 'ধর্ম্মভ্রষ্ট' হইয়াছিলেন, বা হইয়াছেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। রবীন্দ্রনাথ অকারণে দেশের নেতা ও দেশবাসীদের 'মানহানি' করিয়া লঘুপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার পরেই লিখিয়াছেন,—'বিদেশী সামগ্রী বিক্রয় যাহাদের উপজীবিকা, এবং বিদেশী সামগ্রী ক্রয়ে যাহাদের প্রয়োজন বা অভিরুচি, তাহাদের প্রতি অন্যায় জবরদস্তি করা হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই।' 'ইহাতে' রবীন্দ্রনাথের 'সন্দেহমাত্র' না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদের সন্দেহ আছে, আপত্তি আছে। 'বয়কট' উপলক্ষে কোথাও কখনও 'অন্যায় জবরদস্তি' হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা 'নিয়মের ব্যতিক্রম'। এ দেশে 'জবরদস্তি' 'বয়কটে'র সহায় বা সাধন নহে। প্রজার স্বাধীন ইচ্ছার উপর তাহা নির্ভর করে। রবীন্দ্র বাবু 'বয়কটে' জবরদস্তির আরোপ করিয়া সত্যের অলাপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই নূতন সৃষ্টি—নূতন সত্য দেশবাসী গ্রহণ করিবে না। কবি-কল্পনা অতিরঞ্জনের সোহাগিনী প্রণয়িনী, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু সে যখন কাব্যকুঞ্জ হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত হইয়া বাস্তব-জগতে অতিরঞ্জনের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহাকে অগত্যা 'তথ্যে'র ও 'সত্যে'র অধিকার হইতে নিষ্কাশিত করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গানে, কবিতায়, বক্তৃতায় ও রচনায় 'বয়কট' প্রচার করিয়াছিলেন। যদি কোথাও বয়কট উপলক্ষে 'জবরদস্তি' হইয়া থাকে, সে জন্য তিনিও সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় সমান দায়ী। যাহা হউক,—আমরা তাঁহার উপদেশ 'নীর'টুকু পরিত্যাগ করিয়া 'ভেরা'র আত্মোৎসর্গের 'ক্ষীর'টুকু গ্রহণ করিলাম। পাঠক-হংসের পক্ষেও তাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য। রবীন্দ্রনাথের জন্য আমরা একটু শঙ্কিত হইয়াছি; এই সকল 'পরামর্শে'র অনুবাদ পড়িয়া গবর্মেণ্ট যদি সহসা তাঁহাকে 'রায় সাহেব' করিয়া দেন, তাহা হইলে দুঃখ রাখিবার স্থান থাকিবে না! 'কুকি ও মিকির' প্রবন্ধে শ্রীযুত 'মুদ্রারাক্ষস' সংক্ষেপে এই দুই জাতির পরিচয় দিয়াছেন। সুখপাঠ্য। শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্ত 'ভক্ত ও কবি' প্রবন্ধে 'নির্জ্জলা-'রবি'-ভক্তি-সিক্ত বন্দনা রচনা করিয়াছেন। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর',—এই প্রবন্ধে বৈষ্ণব-সাহিত্যের এই সত্যটি অত্যন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছে। লেখকের ভক্ত-হৃদয়ের বিশ্বাসে প্রবন্ধটি রচিত হইয়াছে, সেই জন্যই বোধ করি তিনি তর্কের ও যুক্তির সন্নিহিত হন নাই। নমুনা-স্বরূপ ভক্তির একটি উচ্ছ্বাস উদ্ধৃত করিতেছি;—'রবীন্দ্রনাথ * * * নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থাবলীর

প্রত্যেকখানি কাব্যের ভূমিকা স্বরূপ যে এক একটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, সাহিত্যে তাহা অতুলনীয়। এই সকল কবিতার মধ্যে কবি তাঁহার কোন্ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন? বলিয়াছেন, ঈশ্বরের অনন্ত বিশ্বলীলার কাহিনীই তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি, রবীন্দ্র বাবুর যে সকল হাস্য কৌতুকের কবিতা আছে. তিনি তাহাকেও ঈশ্বরের কৌতুককাহিনী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার 'কৌতুক' কাব্যের ভূমিকায় ঈশ্বরকে বলিতেছেন,—

'আজ আসিয়াছ কৌতুক-বেশে
মাণিকের হার পরি' এলোকেশে,
নয়নের কোণে আধ হাসি হেসে
এসেছ হৃদয়-পুলিনে!
* * * *
আজ এই বেশে এসেছ আমারে
ভুলাতে!'

যে কবি আপনার সুখ দুঃখ শোক তাপ হাস্যামোদ সকল অবস্থা ও সকল ভাবের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখেন, এবং স্বরচিত কাব্যের মধ্যে তাঁহার নানা ভাবের বর্ণনা করেন; তিনি যদি ভক্ত না হন ত ভক্ত কে?' বাস্তবিক, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। আমরা বলি, তিনি যদি ভক্ত না হন, ক্ষতি কি? কেন না, তাঁহার সমালোচক যে বিষম 'ভক্ত', সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ভগবান রবীন্দ্রনাথকে এই নিদারুণ 'ভক্তে'র সমালোচনা হইতে রক্ষা করুন! রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাশালী কবি, এমন করিয়া কি তাঁহার লাঞ্ছনা করিতে আছে? 'কৌতুক' কাব্যের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'ঈশ্বরে'র কৌতুকময়ী' কল্পনা করিয়াছেন, অমৃত বাবু কোন ঈশ্বরের প্রেরণায় এই অমূল্য সত্যের আবিষ্কার করিলেন? সে ঈশ্বর কি রাসভ-লোকের অধীশ্বর? ইতিপূর্ব্বে আর কোনও ঈশ্বর,—কোনও খোদা, আল্লা, জিহোবা, 'গড', সাঁওতালদের 'চান্দোবোঙ্গা', কুকিদের 'পুথেন,'—এমন কি 'সুমৈশী'ও ['পুথেন-পুত্র খিলার উপপত্নীজ পুত্র 'সুমৈশী' অশুভ-সমূহের দেবতা'।—ইতি 'কুকি ও মিকির' প্রবন্ধ;—'প্রবাসী'।] কৌতুক-বেশে, মাণিকের হার পরি এলো. কেশে, নয়নের কোণে আধ-হাসি হেসে, কোনও ভক্ত-কবির—এমন কি, কবীর, নানক, তুকারাম প্রভৃতির 'হৃদয়-পুলিনে' অবতীর্ণ হন নাই! অমৃত বাবু এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের অপমান করিয়াছেন; 'সমালোচনা'র অপমান করিয়াছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের অপমান করিয়াছেন; বাঙ্গালী পাঠকের অপমান করিয়াছেন; নিজের বুদ্ধির অপমান করিয়াছেন,—অবশ্য ভক্তির ভাঁড়ে জীর্ণ হইবার পর যদি সেই দুর্ল্লভ সামগ্রীর কিছু অবশিষ্ট থাকে! 'বোধোদয়ে' পড়িয়াছিলাম,—'ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।' এখন দেখিতেছি, বিদ্যাসাগর মিথ্যাবাদী,—ঈশ্বরের এলো চুল, কানে দুল, গলায় মাণিকের হার, নয়নের কোণে আধ-হাসির ক্ষুরধার;—পরিধানে কি ফরাসডাঙ্গার ভক্ত-ধাক্কা পাছা-পেড়ে? পায়ে কি?—ঘুমুর, না মল? আমরা অমৃত বাবুকে 'ঈশ্বরে'র আর একখানি ছবি উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। অমৃত বাবু বোধ হয় জানেন না,—রসের সাগর দীনবন্ধুও কৌতুক-কবিতায় 'ঈশ্বরে'র ছবি আঁকিয়াছিলেন। যথা,—

'এলো-চুলে বেণে-বউ আলতা দিয়ে পায়,
নোলক নাকে, কলসী কাঁকে জল আনতে যায়!'

এই বেণে-বউ যে 'ঈশ্বর', সে বিষয়ে এক কুঁচও সন্দেহ হইতে পারে না; কেন না. তাহার চুল এলো!·পায়ে আলতা,—বোধ হয় বলির,—ভক্ত-ভেড়ার রক্ত মাড়াইয়া আসিয়াছেন! নাকে নোলক, অর্থাৎ 'প্রণব'! আর 'কাঁকে কলসী'—আহা কি মধুর! ইহা যে না বুঝিতে পারে, তাহার কণ্ঠে ছিঁড়ি!—এখন অমৃত বাবু কি বলেন,—দীনবন্ধু মিত্র 'ভক্ত'—কবি কি না? প্রবাসী' এই 'রাবিশ' মুদ্রিত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। গোড়ায় 'গোরা',

শেষে 'ভক্ত ও কবি'—বোধ করি 'পাষাণ ভাঙ্গিয়াছেন'! 'হয়ে দয়ে হাঁটু জল' হইয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। 'প্রবাসী বাঙ্গালীর কথা' ও 'গোয়ালিয়রে জমী ও গ্রাম' উল্লেখযোগ্য।

জাহ্নবী। বৈশাখ। এই সংখ্যায় 'জাহ্নবী' চতুর্থ বর্ষে প্রবাহিত হইল। প্রথমেই শ্রীযুত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের রচিত 'বর্ষ-বন্দনা' নামক একটি সুন্দর সনেট। মুনীন্দ্র বাবুর কবিতার শব্দ-চয়ন সুন্দর—ভাব-গাম্ভীর্য্য উপভোগ্য, উদ্দীপনা জ্বালাময়ী। নব-যুগে নব-ভাবের নব মন্ত্রে মুনীন্দ্রনাথ মার আবাহন করিতেছেন। তাঁহার শক্তির ক্রম-বিকাশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত আশান্বিত হইয়াছি। 'বর্ষ-বন্দনা' উদ্ধৃত করিলাম,—

'হে রুদ্র, হে দিব্য-দীপ্ত, হে দেব বিরাট!
স্বাগত! এসেছ আজি নবরূপ ধরি';
চন্দ্র-চন্দনের রেখা চিত্রিত ললাট,
ভানু-কোহিনুর জ্বলে কিরীট-উপরি।
স্বর্ণ-পীত উত্তরীয়,—স্বর্ণ-পীত বাস,
জ্যোতিষ্ক-কমলমালা কণ্ঠে আন্দোলিত;
অঙ্গে অঙ্গে অগ্নিবর্ণ লাবণ্য-উচ্ছ্বাস,
প্রণবের সুধা-মন্ত্রে দিগন্ত কম্পিত!
এনেছ কি যজ্ঞহবিঃ—সমিধ্‌ সম্ভার?
নাচিছে তাণ্ডব নৃত্যে দৃপ্ত উদ্দীপনা,
সংক্ষুব্ধ জীবন-সিন্ধু;—মন্থনে এবার
পারিবে কি আহরিতে সুধা এক কণা?
জ্বাল বহ্নি,—ঢাল হবিঃ, এ শ্মশান-শিখা
হোক পুণ্য হোমানল—যাক্‌ বিভীষিকা!'

এই 'পেসিমিষ্টিক' যুগে শ্রীযুত সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'উৎসবে'র সমর্থন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। বাঙ্গালায় 'উৎসব' লুপ্ত হয় নাই। 'উৎসব' নিষ্প্রভ হইতে পারে, বাঙ্গালীর উৎসব ব্যসনের ছায়াপাতে মলিন হইতে পারে, কিন্তু তাহা লুপ্ত হয় নাই। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বঙ্গ-লক্ষ্মীর পূজা সফল হউক, বাঙ্গালা আবার উৎসবের আনন্দে মাতিবে। শ্রীযুত আনন্দনাথ রায়ের 'বারভূঞা' উল্লেখযোগ্য। বহুকাল পূর্ব্বে শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'ভারতী'র সারস্বতকুঞ্জে 'বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকে'র কাহিনী বিবৃত করিয়াছিলেন। লেখক তাহার আলোচনা করেন নাই। এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক প্রবন্ধে পূর্ব্ব-বিবৃত তথ্যের বিশ্লেষণ, বিচার ও—যদি সম্ভব হয়,—নূতন তথ্যের সমবেশ করিলে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। চর্ব্বিত-চর্ব্বণে বিশেষ কোনও লাভ নাই। 'কর্ত্তব্য-লঙ্ঘন' একটি চলনসই ইংরাজী গল্পের অনুবাদ। শ্রীযুত জগদানন্দ রায়ের 'মাখন' একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। এখন জগদানন্দ বাবুই 'ছিটে ফোঁটা' দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের পূজা করিতেছেন। শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'শাখীনামা' নামক শিখ-গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; 'জাহ্নবী'র এই সংখ্যায় প্রথম অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। 'শাখীনামা তেগবাহাদুরের ও গুরু গোবিন্দের ভ্রমণবৃত্তান্ত। ইহাতে ১২০ এক শত কুড়িটি শাখী বা বৃত্তান্ত আছে। গুরুমুখী হইতে সর্দ্দার আতর সিংহ ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এ পুস্তকখানিতে উক্ত দুই গুরুর বিষয় কিছু কিছু জানা যায়। অধিকন্তু শিখদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও অনেক তত্ত্ব ইহাতে নিহিত আছে।' 'শাখীনামা' ইংরাজী হইতে বাঙ্গালায় অনূদিত হইতেছে। যত দিন বাঙ্গালী প্রতিবাসী জাতিদের ভাষা শিখিয়া তাঁহাদের জীবন ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে না পারেন, তত দিন আমাদের 'দুধের সাধ ঘোলেই মিটিবে'। কিন্তু বসন্ত বাবুর ঘোল যেন বিশুদ্ধ হয়। 'লুকাইত' নয়, লুক্কায়িত। 'প্রাচীরগুলি 'পুরু' করিয়া দিবে';—'পুরু' এ স্থলে সুপ্রযুক্ত নহে। অনুবাদক এইরূপ ঘোলের মাছিগুলি ছাঁকিয়া দিলে ভাল হয় না? বহুকালের পর শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বড়ালের 'হৃদয়-শঙ্খ' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি।

বর্ষা-সঙ্গীত।

—:০:—

আজি, মেঘ-মঙ্গল-শঙ্খ করেছে
তব আগমন ঘোষণা!
বিপুল গভীর মধুর মন্দ্রে,
নিখিল আকুল কি মোহমন্ত্রে,
আজি এ বিশ্ব-বীণার তন্ত্রে
ঝঙ্কারি' উঠে মহা-সঙ্গীতে
ব্যাকুল বিশ্ব-বাসনা!
ধূসর ধরণী তিমির-বরণী,
প্রকৃতি সুনীলবসনা!
দিকে দিকে উঠে মহা-সঙ্গীত-
তব মঙ্গল-ঘোষণা!

২

মরি, দিগ্‌ দিগন্ত রঞ্জিত কিবা
পুঞ্জ জলদ-অঞ্জনে!
দলমল, দল ঘোর ঘনঘটা,
পিঙ্গল নীল মঞ্জুল ছটা,
ধূর্জ্জটী যেন খুলি' লোল জটা,
পঞ্চ বদনে গাহিছেন গান
শ্যামার হৃদয়রঞ্জনে,
গুরু গুরু গুরু বাজিছে ডমরু
গুরু অভিমান-ভঞ্জনে!
দিগ্‌ দিগন্ত রঞ্জিত কিবা
মেঘের নবীন অঞ্জনে।

৩

কোথা, মদিরেক্ষণা প্রাবৃট-লক্ষ্মী,
কোথা গো নিখিলশরণে!
এস, সহসা স্তব্ধ দ্যুলোকে ভূলোকে,
দীপ্ত দীর্ঘ দামিনী-ঝলকে,
মুক্ত ধারায় স্পর্শ-পুলকে,
মন্দ্রে, ছন্দে, কুসুমগন্ধে,
নিখিলের গ্লানিহরণে,
এস, চির-সুমধুর ঝঞ্ঝা-নূপুর
বাঁধি চঞ্চল চরণে।
এস, ছায়া-মায়াময়ী প্রাবৃট-লক্ষ্মী,
এস গো নিখিলশরণে!

৪

এস, দিকে দিকে তব লীলা-চঞ্চল
নীল কুন্তল উড়ায়ে!
এস, গর্ব্বী গিরির তুঙ্গ শিরসে,
কমলফলিত স্বচ্ছ সরসে,
লীলা-লুণ্ঠিতা তটিনী-উরসে,
কল্লোলাকুল রুদ্র সাগরে
শ্যামল মাধুরী ছড়ায়ে।
এস, স্নেহ-সুধারসে, অমৃত-পরশে,
দগ্ধ ভুবন জুড়ায়ে!
গগনে গগনে, স্নিগ্ধ পবনে
নীল অঞ্চল উড়ায়ে!

৫

আজি, মেঘে মেঘে মেঘে কর চিত্রিত
ইন্দ্রধনুর মাধুরী!
বাজুক রাগিণী মেঘমল্লার,
ফুটুক কেতকী, নীপ, কহ্লার,

তুলুক চাতকী কলঝঙ্কার;
সুখ-পরশন ধারা-বরষণ,
হরষে ডাকুক দাহুরী।
কেকা-কলরবে কলাপী পুলকে
দেখাক্ নৃত্য-চাতুরী!
আজি, সপ্ত বরণে কর চিত্রিত
ইন্দ্রধনুর মাধুরী!

৬

ওই ছায়া গাঢ়তর—গুরু গর্জ্জন—
চমকে মুগ্ধা হরিণী,
নামে বারিধারা যোজন যোজন,
সন সন নাসে হেলে নীলবন,
ত্যজিয়া দলিত কমলকানন,
পঙ্কজ-রেণু সুরভি গণ্ডে,
গিরিমূলে এল করিণী।
কলরব করি' উঠিল শিহরি'
নিদ্রিতা নির্ঝরিণী।
গুহা-গৃহে গৃহে গম্ভীর ধ্বনি—
স্তম্ভিতা ভয়ে হরিণী।

৭

গুরু গুরু মেঘ, ঝর ঝর ধারা,
শীতল কাননতল,
নব যূথিকার অমল অধরে,
রজতবরণ কদম-কেশরে,
স্থলকমলের দলরাজি প'রে,
মুক্তা ছড়ায়ে মুক্তকণ্ঠে
গাহিছে জলদদল।
পথে প্রান্তরে উছলে প্রবাহ
কল কল ছল ছল্!
গুরু গুরু মেঘ, ঝর ঝর ধারা,
শীতল কাননতল!

৮

আলোকে, আঁধারে, গর্জ্জনে, গানে
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া,
অমৃতসরসা নবীনা বরষা,
নব-কুবলয়-স্নিগ্ধ-পরশা,
হাতে ঝলমল বিদ্যুৎ-কশা—
মায়ামেঘরথে আসিল মরতে
মধুর মূরতি ধরিয়া!
চরণে অর্ঘ্য ঢালে নিসর্গ
বকুল পড়িছে ঝরিয়া!
আসিল বরষা, অমৃতসরসা,
দিগ্‌দিগন্ত ভরিয়া!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বিষম সমস্যা।

—:০:—

চন্দ্রবংশীয় মহাত্মা পঞ্চপাণ্ডবের পবিত্র প্রেম পুঞ্জীভূত হইয়া পাঞ্চালীর জন্য কুরুক্ষেত্রে যখন একটা কুরুক্ষেত্র উৎপন্ন করে, তখনও মৌর্য্যবংশীয় নরপতি চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল আরম্ভ হয় নাই; এবং লক্ষ্মণ সেন যখন গৌড়ের রাজা, সে সময়ে পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি যদিও জন্মান নাই, তথাপি পুরাতত্ত্ববিৎরা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক না কেন, মৌর্য্যবংশীয় কেহ কখনও পঞ্চাননের পূজা করিয়া গৌড়ীয় নামক কোনও সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন কি না, পদ্মপুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে শ্রীমহেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা বিম্বাবতীর সহিত ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীগোবর্দ্ধন সরকারের বিবাহ হওয়ার কথার আদৌ কোনও মূল নাই। সিরাজদ্দৌলা অতি দয়ালু ছিলেন, সে কথা প্রবাদ আছে। এমন কি, আমি তাঁহার সাময়িক ইতিহাস পড়িয়া

যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, সিরাজ-দ্দৌলার অন্য নাম ছিল রাজবল্লভ পরমহংস। এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি না থাকিলেও, এটি নিশ্চিত যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কোনও নৃপতি সে সময়ে মীরগঞ্জে যান নাই।

ঠিক কোন্ বৎসর শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় বর্দ্ধমানে সেতার বাজাই-তেছিলেন, তাহার নির্দ্ধারণ করা দুরূহ। তবে সে সময়ে নবদ্বীপে লক্ষ্মণ সেন নামে কোনও নরপতি যে ছিলেন না, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। হরেকৃষ্ণ ঘোষের একটি অশ্ব ছিল, তাহার নাম 'শৈবাৎ'। এ শৈবাৎ শব্দ শৈব শব্দের পঞ্চমীর এক বচন, কিংবা দৈবাৎ শব্দের অপভ্রংশ, তাহা জানিবার এখন উপায় নাই। সম্ভবতঃ ইহা নিপাতনে সিদ্ধ। যাহা হউক, সব্যসাচী সেই অশ্বের একটি তত্ত্ব দিল্লী নগরীতে আবিষ্কার করেন। দিল্লী নগরীই পুরাতন হস্তিনাপুর, এ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, এবং অর্জ্জুনের অপর নাম সব্যসাচী। অতএব, হরেকৃষ্ণ ঘোষ অর্জ্জুনের সমসাময়িক, বা পূর্ব্ববর্ত্তী? তিনি যদি অর্জ্জুনের পরবর্ত্তী হইতেন, তাহা হইলে অর্জ্জুন তাঁহার অশ্বের তত্ত্ব আবিষ্কার করিবেন কিরূপে? অতএব সম্ভব, "হরে" শব্দ "শ্রী" শব্দের অপভ্রংশ। কিংবা ইহাও অসম্ভব নহে যে, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণকে "হরেকৃষ্ণ" বলিয়াও ডাকিত। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব ছিল, এ কথা কোনও পুরাণেই লেখে না। অতএব, এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্তই হয় না।

এ সকল অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। পুরাকালে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনা ছিল না বলিলেই হয়। তাহার উপর সে সময়ে সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় নাই। সে যাহাই হউক, আমি বোধ হয় মহাশয়দিগের কাছে প্রমাণিত করিয়াছি যে, চন্দ্রগুপ্ত এক জন ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন।

জটিল পুরাতত্ত্ব ছাড়িয়া বর্ত্তমান সময়ে আসা যাউক। কারণ, প্রত্নতত্ত্বের সহিত আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের কোনও সংস্রব নাই। আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণাদি সংগ্রহ যত দূর করিতে পারিয়াছি, তাহাই আজ সুধীবৃন্দের সমক্ষে বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইব।

ভদ্রগণ! এই ভারতবর্ষ দেশটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিলে, সেটা যে একটা দেশ, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকে না। ইহার জনসংখ্যা সম্বন্ধে ইহা সাহসের সহিত বলা যায় যে, এখানে পুরুষ ও নারী দুইই আছে। এ দেশের উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে ভারতসমুদ্র। জাপান হইতে তাতারে

একটি রেখা টানিলে, তাহার উত্তরে থাকে গ্রীস। স্যাল্যামিসের নীচেও সমুদ্র। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে চন্দ্র ঘুরে, এ কথা সকল জ্যোতির্ব্বেত্তাই স্বীকার করেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানের একটা সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব।

লৌহের সহিত দ্রাক্ষারসের কোনও মূল্যবান সংস্রব না থাকিলেও, ইহা একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, উত্তাপ যত বাড়ে, শীতে তত কমে। বিদ্যুৎ আলোক প্রদান করে বটে, কিন্তু শব্দের গতি তাপমান-যন্ত্রের দ্বারা পরিমিত হয় না। যবক্ষারজান বায়ব পদার্থ। বৃক্ষ তাহা বাতাস হইতে গ্রহণ করিতে পারে না। সেই জন্য নীলমণি কাব্যতীর্থ গীতার টীকা লিখিয়া উদ্ভিদ হইতে যবক্ষারজান বাহির করিতে পারেন নাই। ভূতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিলেও বোঝা যায় যে, বঙ্গদেশ এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। জীবাণু মনুষ্যশরীরেও আছে। পক্ষিজাতীয় সমস্ত জীবেরই পক্ষ আছে। সেই জন্য মানুষ যে বানর জাতি হইতে উদ্ভূত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অতএব, অর্থনীতি কখন কি আকার ধারণ করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা আর্য্যজাতি। সম্রাট আকবর যে পূর্ব্ববঙ্গের সেন-বংশীয় কেহ ছিলেন না, তাহা সপ্রমাণ করা আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য প্রয়োজন হইতেছে না।

অতএব হে বন্ধুগণ! আমাদের বর্ত্তমান নৈরাশ্যের এক ক্ষীণরেখা আমাদের গ্রামের পুষ্করিণী। আমাদের উপনিষদে জীবনের সমস্ত প্রশ্নেরই মীমাংসা আছে। মহাশয়েরা তাহা পাঠ করুন। আমি স্বয়ং তাহা পাঠ করিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমি কোনও মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না।

আজ যাঁহারা ভীতচকিতনেত্রে বর্ত্তমানের দিকে চাহিতেছেন, তাঁহারা বিশ্বসৌন্দর্য্যের অখণ্ডমূর্ত্তি ধ্যান করুন, এবং কৃকলাসের সহিত অলাবু ভক্ষণ করুন, এবং নবীন উদ্যমে ব্যর্থতাকে পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রবৃত্তিকে আত্মাভিমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করুন। আমাদের পিতৃপিতামহদিগের তিতিক্ষার পরম বেদনার সুগম্ভীর আত্মগৌরব আমাদের মধ্যে সমাবিষ্ট হইয়া যেন মনুষ্যত্বের সঞ্চার করে; এবং বিনাশকে স্বীকার করিয়াও ঐক্যের প্রতাপকে ক্ষুণ্ণ না করে। যাহা বিচিত্র, তাহা ধৈর্য্যকে বিচ্ছেদবহুল না

করিয়া ক্ষুদ্রকে যেন সমগ্রের মধ্যে অবিচলিত সংঘাতে পরাস্ত করে। আমরা এই অশুভ যোগে ম্রিয়মাণ শক্তিপুঞ্জকে প্রমত্ত অভিব্যক্তির মধ্যে অব্যাহত রাখিয়া নিন্দাকে ঔদাসীন্য দ্বারা সংহত করিব—এবং এই কৃত্রিমতার চাকচিক্য দ্বারা আপাতবুদ্ধির—উর্ণনাভ-জালে পড়িব না। অধৈর্য্য কোনও কালে ধীরভাবে বিচার করিতে পারে না। এবং নিষ্ঠুরতা ধর্ম্মবুদ্ধিকে সংক্ষিপ্ত করে। অতএব, অনিষ্টকে শ্রদ্ধার আবরণে ঢাকিয়া ভাষার ইন্দ্রজালে তাহার অসংযমকে যেন আমরা বড় করিয়া না দেখি। সহিষ্ণুতার দুর্ম্মূল্যতা উত্তেজনার ভৈরব হুঙ্কারে অধ্যবসায়কে ডিঙ্গাইয়া যায়। অতএব হে বন্ধুগণ! আমি এই গাঢ় অন্ধকারের কৃষ্ণতাকে উদ্যত উন্মাদনার বিপ্লব হইতে বাঁচাইয়া লইয়া দেশের সমগ্র হিতকে কল্যাণের দিকে লইয়া যাইব। কারণ, ঈশ্বরের নাম পরব্রহ্ম।

মহাশয়গণ! সূর্য্যের গতির সঙ্গে প্রেমের বীর্য্যের একটু অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য সেই চন্দ্রবংশীয় গৌরবকে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত উত্তপ্ত লৌহখণ্ডবৎ সংশ্লিষ্ট করিয়া, যবক্ষারজানের সার্থকতা—ভূতত্ত্বের মধ্যে জাগাইয়া তুলুক, এবং জীবাণুর সহিত অর্থনীতির অদ্ভুত সম্মিলন করিয়া পুষ্করিণীজাত উদ্ভিদকে সঞ্জীবিত করুক। এবং লক্ষ্মণ সেনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলেও সিরাজদ্দৌলার মহিমায় মহিমান্বিত ভাগীরথীর বিশাল বক্ষের উপর বজরা ভাড়া করিয়া উজান দাঁড় টানিয়া ভুমার দিকে লইয়া যাউক। আমাদের তদ্ভিন্ন আর উপায় নাই। আমরা আজ সংকল্পকে বিকল্পে কষ্টকল্পিত করিয়া হ্রস্বর মধ্য দিয়া দীর্ঘ করিয়া তুলিব। কারণ, গোবর্দ্ধন সরকার যাহাই বলুন না কেন, সব্যসাচী এবং ব্যক্তিয়ার খিলিজি যে সমকালীন ছিলেন না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। বিশেষতঃ, যখন সত্য এক। স্বয়ং বিষ্ণুশর্ম্মাই বলিয়াছেন,—

অস্তি গোদাবরীতীরে বিশালঃ শাল্মলীতরুঃ।

মহাশয়গণ! আমার বক্তব্যটা আপনারা ঠিক বুঝিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। সত্য কথাটা কি, আমি নিজেই সেটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। আর সে বিষয়ে যতই ভাবিতেছি, ততই তাহা খুব শক্ত বোধ হইতেছে। তবে বক্তৃতা একটা করিতে হইবে, তাই করিলাম। আপনারা করতালি দিউন। *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

---

* পূর্ণিমা-মিলনে পঠিত।

বিষম সমস্যার সমালোচনা।

অদ্যকার এই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। বক্তৃতাটি যে বিস্তর গবেষণায় পূর্ণ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ভাষা প্রাঞ্জল, বুঝিতে কোনও কষ্ট হয় না, পূর্ব্বাপর সুন্দর সামঞ্জস্য, এবং সিদ্ধান্তও সুন্দর। বক্তার সর্ব্বতোমুখী বিদ্যার যথেষ্ট পরিচায়ক। তজ্জন্য বক্তা আমাদের সাধুবাদার্হ। তবে ইহার মধ্যে অনেকগুলি অসঙ্গতি দোষ আছে; সেগুলির উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

১ম। বক্তা বলিয়াছেন,—গৌড়ীয়েরা পঞ্চাননের পূজা করিতেন। কিন্তু তাঁহারা চিরকালই একাননের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। পঞ্চানন কাহারও ছিল না, এবং পূজাও হয় নাই।

২। বক্তা লক্ষ্মণসেনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, বস্তুতঃ লক্ষ্মণের অস্তিত্ব রামায়ণ-প্রসিদ্ধ, এবং সেন-বংশীয় তরণী সেনের নামও রামায়ণে পাওয়া যায়।

৩। সিরাজউদ্দৌলাকে পরমহংস বলা হইয়াছে। সিরাজের পদদ্বয় থাকিলেও পক্ষাভাবে তাঁহার হংসত্ব অসম্ভব, পরম ত নয়ই।

৪। বক্তৃতায় চন্দ্রগুপ্ত বলা হইয়াছে। চন্দ্র প্রতি মাসে দুই তিন দিন মাত্র অপ্রকাশ থাকিলেও, অন্য সময়ে স্বপ্রকাশ; অতএব চন্দ্র-গুপ্ত বলায় অত্যুক্তি দোষ ঘটিয়াছে।

৫। গোবর্দ্ধন সরকার বলায় ব্যাকরণ দোষ ঘটিয়াছে। সকলেই জানেন, গোবর্দ্ধন পর্ব্বত, এবং তাঁহার নিবাস বৃন্দাবন, ভট্টপল্লী নহে। বলা উচিত, গোবর্দ্ধন গিরি।

৬। সকলেই হরেকৃষ্ণ ঘোষের অশ্বের উল্লেখ শুনিয়াছেন। কিন্তু উহা নিতান্ত অসঙ্গত। হরেকৃষ্ণ না বলিয়া কৃষ্ণ বলিলেই হইত; আর সেই কৃষ্ণ নন্দ ঘোষের গৃহে পালিত হইলেও, নন্দ ঘোষের পুত্র নন; সুতরাং হরেকৃষ্ণ ঘোষ হয় না, বসুদেবের পুত্র হরেকৃষ্ণ দেব বলা উচিত। এবং তাঁহার ঘোড়া ছিল না, গরু ছিল বটে।

৭। বক্তা যে সময়ে সংবাদপত্রের অভাব ঘোষণা করিয়াছেন, তখন সংবাদও ছিল, পত্রও ছিল। সংবাদ না থাকিলে সখী-সংবাদ, দূতী-সংবাদ হইত না, এবং পত্র না থাকিলে, জয়দেবের পত্র কেমন করিয়া বিচলিত হইবে? ইহা অপ্রত্যক্ষানুভূতিদোষ।

৮। বক্তা জাপান হইতে তাহারে রেখা টানিতে বলেন। তাহা করিতে গেলে, সমুদ্রজলে কালি ধুইয়া যাইবে, অধিকন্তু জলের ঢেউয়ে হাবুডুবু খাইবার সম্ভাবনা। সুতরাং তাহা অসম্ভব।

৯। বক্তা বলেন, চন্দ্র ঘোরে! ইহা একেবারে কল্পনা। কেহ কখনও চন্দ্রকে লাট্টুর মত ঘুরিতে দেখেন নাই। চন্দ্র ডোবে, আর উঠে।

১০। লৌহের সহিত দ্রাক্ষারসের সম্বন্ধ একেবারে নাই, এ কথা বলা যায় না। দেখা যায় যে, দ্রাক্ষারসপানে কাহারও কাহারও পৃষ্ঠচর্ম্ম লৌহবৎ কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। নচেৎ প্রহার-আহারে সামর্থ্য হইত না।

১১। উত্তাপের আধিক্যে শৈত্যের হ্রাস হয়, এ কথা কে বলিল? তবে সূর্য্যের অতিসন্নিহিত হিমাচল-শিখরে এত শীত কেন?

১২। বক্তা বলেন, মানুষ বানর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইলে, প্রাচীন আর্য্যগণের বানরত্বের উল্লেখ পাওয়া যাইত। তাঁহারা মানুষই ছিলেন। বরং এখন মানুষের মধ্যে অনেক বানর দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে বুঝা যায় যে, মানুষ হইতে বানরের উৎপত্তি।

১৩। ভূতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জাগিবার অর্থ বোধ হইল না। মানুষ ভূতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলে আর মানুষ থাকে না; দেহও থাকে না, তবে—জাগিবে কেমন করিয়া?

এইরূপ অনেকগুলি অসঙ্গতি ও অসত্য সত্ত্বেও এতাদৃশী বক্তৃতার জন্য বক্তা করতালি-প্রাপ্তির যোগ্য, সন্দেহ নাই।

শ্রীপ্রসাদদাস গোস্বামী।

লুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের উপায়।*

ভারতীয় সাহিত্য।

ভারতীয় সাহিত্য বলিতে গেলে, সাধারণতঃ সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্য বুঝায়। এ ক্ষেত্রেও সেই অর্থই অবলম্বিত হইল। যে সময়ের ইতিহাস এককালে লোপ পাইয়াছে, সে সময়ে ভারতে কোনও বিদেশীয় ভাষার বিশেষ চর্চ্চা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের দুই স্থানে দুইটি জাতি অতি প্রাচীন কালে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মের

---

* পূর্ণিমা-মিলনে পঠিত।

শৈশবে সিরিয়া দেশবাসী খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ ভারতের দক্ষিণ কূলে আসিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে উপবেশন স্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে ইহারা অনেক দাক্ষিণাত্যবাসীকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ইহারা সম্ভবতঃ নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান। কথিত আছে, একবিংশ খৃষ্টাব্দে প্রেরিত টমাস ভারতে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা বলেন যে, ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণই টমাসের শিষ্য। ইঁহাদিগের ধর্ম্মযাজকগণ এখনও সিরিয়ার প্রধান ধর্ম্মযাজক কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা যাহাই হউন, মুসলমানদিগের অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব হইতে যে ইঁহারা ভারতে বাস করিতেছেন, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। ইঁহাদিগের আগমনের বা তাহার পরবর্ত্তী কালেরও কোনও ঘটনার উল্লেখ বা বর্ণনাও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। এই সম্প্রদায়ের অবস্থা অতি হীন ; সুতরাং ইঁহাদিগের সাহিত্যানুরাগ প্রবল নহে। এই ত গেল একটি বিদেশীয় উপনিবেশের কথা। য়াজদাজির্দ ৩য় পরাস্ত হইলে, বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত পারসীক ধর্ম্মনাশভয়ে সমুদ্রপথে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই সৌরাষ্ট্র নগরে আসিয়া ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাই দ্বিতীয় বিদেশীয় উপনিবেশ। বিত্তশালী সম্ভ্রান্ত পারসীক জাতি অতি অল্প দিন হইল ইতিহাস-উদ্ধারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ; কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ প্রয়োজনীয় কোনও কথাই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ঐতিহাসিক যুগে শত শত জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, জয় করিয়াছে, এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু আশ্রয়ভিখারী পারসীক ও সিরীয় জাতি ব্যতীত অপর সকল জাতিই বিলুপ্ত হইয়াছে, বা হিন্দু সমাজের নিম্ন স্তরে মিশিয়া গিয়াছে। শক, যবন, পহ্লব, পারদ, খস, হূণ, দরদ প্রভৃতি সকল জাতিই অবশেষে হিন্দুজাত্যভিমানের ভিখারী হইয়া স্ব স্ব বিশেষত্ব লুপ্ত করিয়াছে। যে দুইটির অস্তিত্ব আছে, তাঁহাদের সাহিত্যের মূল্য অধিক নহে। সেই জন্যই ভারতীয় সাহিত্য বলিতে গেলে, এখনও সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যই বুঝায়। নূতন আবিষ্কারে এতদ্ব্যতীত আরও দুইটির উল্লেখ করা যাইতে পারে ; তবে তাহা উল্লেখমাত্র।

মান্দ্রাজের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর ভেকায়া ও ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডাক্তার হুল্‌জ্‌ অতিপ্রাচীন তামিল ভাষায় লিখিত কতকগুলি বীরগাথার আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাতে অনেকগুলি দ্রাবিড়বাসীর

নাম ও কীর্ত্তিকলাপের বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটী সাহিত্যে পারসীকগণের ভারতে আগমনের কাহিনী ও সৌরাষ্ট্ররাজ কর্ত্তৃক তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার বর্ণনা পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও ইহার সময়নির্দ্দেশ হয় নাই। অনুমান হয়, ভট্টার্কবংশীয় বলভীরাজগণের মধ্যে কোনও এক জন পারসীকগণকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলেন।

(ক) পালি সাহিত্য।

পালি সাহিত্য ভারতীয় হইলেও, বিদেশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। মহাযানের অভ্যুত্থানের পর পালি ক্রমশঃ স্বদেশ হইতে তাড়িত হয়। অনেকের সংস্কার,—হিন্দু ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সহিত বৌদ্ধ অর্থাৎ পালি সাহিত্য তাড়িত হইয়া বিদেশে আশ্রয় লয়। কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্য বলিলে কেবলমাত্র পালি সাহিত্য বুঝায় না। বৌদ্ধ সাহিত্য—কেবল ভারতীয় বৌদ্ধ সাহিত্য নানা ভাষায় রচিত। বাঙ্গালা, মৈথিলী, প্রাকৃত, পালি, সংস্কৃত প্রভৃতি বহুবিধ ভাষায় বৌদ্ধ সাহিত্য-গ্রন্থ আছে। অধিকাংশ হীনযানীয় গ্রন্থই পালি ভাষায় রচিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত হীনযানীয় গ্রন্থের অভাব নাই। পালি সাহিত্যের আয়তন অতি সামান্য, কিন্তু ইহার অধিকাংশ গ্রন্থই ঐতিহাসিক হিসাবে মূল্যবান। সেই জন্যই ঐতিহাসিকের নিকট পালি সাহিত্যের আদর অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতের ইতিহাসে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবকাল হইতেই ঐতিহাসিক যুগ আরব্ধ হইয়াছে। এই সময়ের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান পালি সাহিত্য। ত্রিপিটক সম্বন্ধে নূতন বক্তব্য আর কিছুই নাই। প্রায় তিন শত বর্ষ পূর্ব্বে শ্যাম দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র ইউরোপে নীত হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ তদীয় "বুদ্ধদেব" নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে ত্রিপিটকের আবিষ্কারকাহিনী বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; সুতরাং তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক। ত্রিপিটকের নানা স্থলে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালীন ঘটনাসমূহের সুন্দর আখ্যায়িকা প্রকাশিত হইয়াছে। সামান্য পরিশ্রমেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গের আখ্যায়িকা, সামাজিক অবস্থা, ধর্ম্মমত প্রভৃতি সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ত্রিপিটক হইতেই বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজগণের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে, এবং হইতেছে। কোনও ভারতীয় পণ্ডিতের চেষ্টা ব্যতীত এ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে বলিয়া মনে হয় না। সকল বিষয় বিদেশীয় অনুসন্ধিৎসুর সহজে বোধগম্য নহে।

ত্রিপিটক হইতেই বৈশালীর পরাক্রান্ত লিচ্ছবি জাতির বিবরণ ও বৃদ্ধি, বা বর্জ্জি জাতির সাধারণতন্ত্রের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধচরিত প্রভৃতি গ্রন্থের ভিত্তিও বোধ হয় ত্রিপিটক। মহাযানীয় ত্রিপিটকে এই সকল উপাখ্যান বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছে। সুতরাং পালি ত্রিপিটক অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য।

পালি ভাষায় যে দুইখানি ইতিহাস আছে, তাহা ভারতীয় নহে। সিংহল দেশে মহাবংশ রচিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য অতি সামান্য বলিয়াই এই স্থলে মহাবংশ ও দীপবংশের উল্লেখ করিতেছি। মহাবংশ হইতেই অশোকের সমসাময়িক ঘটনার ইতিহাস রচিত হইয়াছে। মহাবংশ প্রাচীন বৌদ্ধ ইতিহাসের রত্নাকর। অশোক-চরিত্র সম্বন্ধে যে ভূরি ভূরি গ্রন্থ নানা ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, এবং হইতেছে, তাহার প্রধান উপাদান মহাবংশ। সিংহলের সিভিলিয়ান টর্ণর (Turnour) বহুপূর্ব্বে ইহার অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই অনুবাদও ক্রমশঃ দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। ইহা আরবী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে। মহাবংশের ঐতিহাসিক প্রামাণ্য সম্বন্ধে একটি বিষয় ব্যতীত আর কোনও সন্দেহ নাই। এই বিষয়টি,—বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের কাল। সিংহলে প্রচলিত নির্ব্বাণাব্দ হইতে গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, তদনুসারে ৫৪৩ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের গণনা অনুসারে ৫৭৭ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের দেহত্যাগ হইয়াছিল। ইউরোপীয় জগতের গণনার মূল অশোকের ক্ষোদিত লিপিসমূহের ত্রয়োদশ অনুশাসন। অশোকের পর্ব্বতগাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপিসমূহের ত্রয়োদশ অনুশাসনে পাঁচটি যবন বা যোন রাজার নাম পাওয়া যায়,—

আংতিয়াক, তুরময় আংতিকিনি, মক ও আলিকসুন্দর।

আংতিয়াক—আন্তিয়াক Antiochos.

(২) তুরময়—তুলময়—টলেমি, বা টলেমায়োস্ (Ptolemy or Ptolemaios)

(৩) আংতিকিনি—Antigonus or (Antigonues)

(৪) মক—মগ (Magas)

(৫) আলিকসুদর—আলিকসুংদং—আলে সান্দ্রে। (Alexander or Alexandros)।

আংতিয়াক বা Antiochos নামে অশোকের পূর্ব্বে তিন জন রাজা ছিলেন। আলেকজান্দারের অন্যতম সেনাপতি সিলিউকস ৩১২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে অপরাপর সেনাপতিদিগকে পরাজিত করিয়া যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা হিন্দুকুশ পর্ব্বত হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সিলিউকসের পুত্র আন্তিয়োক ১ম ও তৎপুত্র আন্তিয়োক ২য়। আন্তিয়োক ২য়ের পুত্র সিলিউকস ২য় ও তৎপুত্র আন্তিয়োক ৩য়। অশোকের শিলালিপি অনুসারে উক্ত পাঁচ জন রাজা সমসাময়িক ছিলেন। এক আন্তিয়োক ৩য় ব্যতীত অপর কোনও আন্তিয়োকের রাজত্বকালে গ্রীক অধিকারে পূর্ব্বোক্তনামধারী পাঁচ জন সমসাময়িক রাজা পাওয়া যায় না। সুতরাং অশোকের শিলালিপির আন্তিয়োক যোন রাজা সিরিয়া-রাজ ৩য় আন্তিয়োকস্ ব্যতীত অপর কেহই নহেন, ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য। মহাবংশের মতে বুদ্ধের নির্ব্বাণের ১৫০—১৬০ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্ত রাজা হন। সুতরাং তদনুসারে চন্দ্রগুপ্ত ১১৭ খৃষ্টাব্দে নন্দ-বংশের উচ্ছেদ করেন। জৈন ঐতিহাসিকগণের সহিত এ বিষয়ে মহাবংশ-কার স্থবির মহানামের মতৈক্য হইয়াছে। কিন্তু আলেকজান্দারের অনুচর বলিয়া গিয়াছেন, ভারতের প্রাচ্যসীমান্তাধিপতির পুত্র চন্দ্রগুপ্ত বা Sandracettus আলেকজান্দারের শিবিরে আসিয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধমতে আস্থা স্থাপন করিতে হইলে, গ্রীক ঐতিহাসিকগণকে মিথ্যাবাদী বলিতে হয়। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ অত্যন্ত সত্যবাদী নহেন; কারণ, ভারত সম্বন্ধে অনেক অসম্ভব কথা তাঁহাদিগের গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই প্রমাণবলে কোনও কোনও ভারতীয় লেখক বলিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং আলেকজান্দারের শরণাগত যুবক তাঁহার পৌত্র ও তক্ষশিলা নগরীর তৎকালীন শাসনকর্ত্তা অশোক। কিন্তু অশোককে ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ফেলিতে গেলে, শিলালিপিগুলিকে জাল, অথবা পরবর্ত্তী অপর কোনও রাজা কর্ত্তৃক ক্ষোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এখন অশোক তাঁহার জীবনের প্রারম্ভে নৃশংসাচরণের জন্য কালাশোক বা চণ্ডাশোক নামে খ্যাত হন। স্থবির মহানাম তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের গণনায় ভ্রম ও প্রবাদের সত্যতার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে কালাশোক নামে অপর এক জন রাজার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়াছেন, ইহাই মহাবংশের একমাত্র কলঙ্ক। স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এ বিষয়ের বিচার করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, কালাশোক ও ধর্ম্মাশোক

দুই জন পৃথক ব্যক্তি। অশোকের ক্ষোদিত লিপিগুলি তিন ভাগে বিভক্ত :—

১। পর্ব্বতগাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপি;

২। শিলাস্তম্ভগাত্রস্থ ক্ষোদিত লিপি;

৩। শিলাস্তম্ভ, গুহা, পর্ব্বতগাত্র প্রভৃতি দ্রব্যে ক্ষোদিত শিলালিপি।

ইহার মধ্যে পর্ব্বতগাত্রে ১৪টি ও স্তম্ভগাত্রে ৭টি অনুশাসন পাওয়া যায়। পর্ব্বতগাত্রের প্রথম সাতটি ও স্তম্ভগাত্রের অনুশাসনগুলি এক নহে। দ্বিতীয়তঃ, স্তম্ভগাত্রে মোট ৭টি অনুশাসন আছে; সুতরাং স্তম্ভগাত্রে যবন রাজগণের নাম নাই। এই প্রমাণদ্বয়ের উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছেন যে,—স্তম্ভানুশাসনগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কালাশোক কর্ত্তৃক ও পর্ব্বতগাত্রস্থ অনুশাসনগুলি পরবর্ত্তী অশোক কর্ত্তৃক ক্ষোদিত। কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় একটি বিষয় উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। সে বিষয়টি অক্ষর-তত্ত্ব।

অতি অল্পকাল হইল, প্রকৃত অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছে। সুতরাং এ দেশের অনেকের কর্ণেই এখনও শব্দটি বোধ হয় পৌঁছে নাই। পূর্ণ বাবুর মৃত্যুর পর প্রায় পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। তিনি যে সময়ে কপিলবস্তুর আবিষ্কারকাহিনী প্রচারিত করেন, সে সময়ে ইংরাজী ভাষাতেও অক্ষর-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনার সূচনা হয় নাই। অতি অল্পকাল হইল, ডাক্তার ফ্লীট বুলার-প্রণীত "ভারতীয় অক্ষর তত্ত্ব" ইংরাজীতে অনূদিত করিয়াছেন। অশোকের ক্ষোদিত লিপিসমূহের অক্ষর-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে,—

(১) এলাহাবাদ, রাধিয়া, মাথিয়া, রামপুরওয়া ও কপিলবস্তু স্তম্ভলিপির অক্ষর অন্যান্য অশোকাক্ষর হইতে বিভিন্ন হইলেও, দিল্লীর স্তম্ভলিপি ও ধৌলির পর্ব্বতলিপির অক্ষর একরূপ।

(২) অশোকের সময়েও আর্য্যাবর্ত্তে স্থানভেদে অক্ষরসমূহের আকারভেদ হইয়াছিল।

সুতরাং দুই জন অশোকের অস্তিত্ব ক্ষোদিত লিপি হইতে সপ্রমাণ করা যায় না। স্থবির মহানামের বহুপরিশ্রমের ফল অগ্রাহ্য করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হইয়াছেন; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, অগ্রাহ্য না করিয়া উপায় নাই। দুই জন অশোকের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, অশোককে আন্তিয়োক

ত্তয়ের সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্তকেই যবন ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক বর্ণিত সান্দ্রাকোটস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলেই বুদ্ধদেবের মৃত্যু অনুমান ৪৭৭ খৃষ্টপূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, বলিতে হইবে। সম্প্রতি জাপানের অধ্যাপক ডাক্তার তাকা কুসু চীনদেশীয় কোনও একখানি গ্রন্থ দেখিয়া স্থির করিয়াছেন;—৪৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বুদ্ধদেবের মৃত্যু হইয়াছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্ত্তী কালের ঘটনাসমূহ-সঙ্কলনে পালি সাহিত্যের কোনও সাহায্য পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহলরাজ ভারতেশ্বরের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। কিন্তু এ ঘটনা অদ্যাপি বিশেষরূপে প্রমাণিত হয় নাই। পালি সাহিত্য আমাদিগের হারানিধি। বঙ্গদেশে দিন দিন পালির চর্চ্চা বাড়িতেছে। ভরসা করি, ভারতের সকল প্রদেশেই ইহার চর্চ্চা হইবে।

(খ) সংস্কৃত সাহিত্য।

সংস্কৃত সাহিত্যে কি ছিল, না ছিল, তাহা বলা সাধ্যাতীত। ঐতিহাসিকের নিকট সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্য অত্যন্ত অধিক নহে। কারণ, অন্যান্য দেশের ন্যায় কেবলমাত্র সাহিত্য অবলম্বন করিয়া ভারতের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, কতকগুলি ইংরাজ ঐতিহাসিক সংস্কৃত সাহিত্যের অযথা অনাদর করিয়াছেন। নূতন ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্ ইঁহাদিগের অগ্রণী। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, ঐতিহাসিক মূল্য হিসাবে সেগুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম,—প্রকৃত ইতিহাস, কহ্লণের রাজতরঙ্গিণী। ডাক্তার ষ্টাইন কর্ত্তৃক প্রকাশিত অনুবাদে ভ্রম থাকিলেও, তাঁহার অনুক্রমণিকা অতিশয় আদরণীয়। কিন্তু তাঁহার মূল গ্রন্থের সম্পাদন অতি সুন্দর হইয়াছে। দ্বিশতবর্ষাধিক পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনায় কহ্লণকে বিশ্বাস করিবার উপায় নাই। পৌরাণিক বিবরণ কীর্ত্তন করিতে গিয়া তিনি কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস-সঙ্কলনে যে ব্যাঘাত রাখিয়া গিয়াছেন, কোনও কালে তাহা দূর হইবে কি না সন্দেহ। কাশ্মীরের প্রাচীন মুদ্রার অক্ষরতত্ত্ব হইতে ইতিহাসের সম্পূর্ণ উদ্ধার হইতে পারে। শুনিতেছি, কাশ্মীররাজ প্রত্নতত্ত্বচর্চ্চায় মনোযোগী হইয়াছেন। সম্প্রতি এক জন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিলাতে গিয়া Archœology শিখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট অনেক আশা করা যায়।

দ্বিতীয়,—জীবনচরিত। হর্ষচরিত সর্ব্বজনপরিচিত। কিন্তু হর্ষচরিতের ন্যায় কত জীবনচরিত পরে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালে বাঙ্গালার পালবংশীয় রাজা রামপাল দেবের জীবনচরিতের আবিষ্কার করিয়াছেন। রামপালচরিত শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় গত বর্ষের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় জানাইয়াছেন যে, তিনি শ্যামলবর্ম্মচরিত নামক বাঙ্গালার বর্ম্মবংশীয় রাজা শ্যামল বর্ম্মদেবের জীবনীবৃত্তের আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালার বর্ম্ম-রাজ-বংশের নাম অতি অল্প দিন প্রকাশিত হইয়াছে। হরি বর্ম্মদেবের রাজ্যকালীন একখানি ক্ষোদিত লিপি উড়িষ্যায় ও একখানি তাম্রশাসন পূর্ব্ববঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্যামল বর্ম্মের নাম প্রথম শুনা গেল। পশ্চিম ভারতে বিক্রমাঙ্কচরিত প্রভৃতি কয়েকখানি জীবনচরিত আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুত স্মিথের ইতিহাসে হর্ষচরিত ও বিক্রমাঙ্কচরিত ব্যতীত আর কোনও জীবনচরিতের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার এগুলির নাম অদ্যাপি শোনেন নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমণ্ডলীর জন্য উক্ত ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইবে, শুনিয়াছি। তাহাতেও এ বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে কি না সন্দেহ।

তৃতীয়,—সাধারণ সাহিত্য। সাধারণতঃ হস্তলিখিত পুস্তকমাত্রেরই শেষভাগে গ্রন্থের, গ্রন্থকারের ও লেখকের নামের সহিত রাজার নাম ও তাঁহার রাজ্যাঙ্ক, বা অন্য কোনও মান পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত এইরূপ একখানি পুঁথি নেপাল হইতে এ দেশে আনয়ন করিয়াছেন। মহীপাল, নয়পাল প্রভৃতি রাজগণের রাজ্যকালে লিখিত পুঁথি নেপাল দরবারের ও কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয়ে দেখিতে পাওয়া যায়। গত বৎসর শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে একখানি পুঁথি আনিয়াছেন। তাহা হইতে স্পষ্ট সপ্রমাণ হয় যে, রাঢ়ীয় কায়স্থগণ খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সাহিত্যের অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলিকে অন্য উপায়ে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া লইতে হয়। অনেক পুস্তকে হূণ, পারদ, পহ্লব, আভীর প্রভৃতি বর্ব্বর জাতির নাম

পাওয়া যায়। কিন্তু ক্ষোদিত লিপি ও মুদ্রাতত্ত্ব হইতে এই সমুদয় জাতির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তোরমাণ ও মিহির কুলের ক্ষোদিত লিপি না থাকিলে, ও প্রভাকরবর্দ্ধনের হূণ-বিজয়কাহিনী তাম্রফলকে ক্ষোদিত না থাকিলে, মহাবস্তু অবদান ও ভারত নাট্যশাস্ত্র অবলম্বন করিয়া ভারতে আটিলার (Attila) স্বজাতির উপদ্রব-কাহিনী সপ্রমাণ করা কঠিন হইত। পহ্লব শিবস্কন্দ বর্ম্মা হিন্দু, কিন্তু তিনি বর্ব্বর পহ্লব জাতির অধিপতি। আভীরগণ চিরকাল গোচারণ করে নাই; তাহারাও পঞ্চনদের আর্য্যদিগকে নির্ম্মূল করিয়া গোচারণস্থান অধিকার করিয়াছিল। দুই একটি আভীর রাজার ক্ষোদিত লিপিও পাওয়া গিয়াছে। বহুকাল পরে পারদ ও পারসীক পার্থিব (Parthia) শব্দের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে।

কতকগুলি পুরাণে অনেক ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। যথা,—বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্য। তবে সমস্ত পুরাণই একটি বিশেষ দোষে দুষ্ট—বৌদ্ধ বা জৈন রাজগণের নাম ইঁহারা এক বারে স্পর্শও করেন নাই। মৎস্য ও বায়ু পুরাণে আন্ধ্র বংশের নামাবলী পাওয়া যায়, এবং বিষ্ণুপুরাণে গুপ্ত বংশের নাম পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য পুরাণসমূহ বিশ্বাসযোগ্য নহে। পুরাণগুলির বিশ্লেষণ আজিও সম্পূর্ণ হয় নাই। কার্য্য শেষ হইলে কিছু ফললাভ হইতে পারে, আশা করা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে ঐতিহাসিকের প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া যায় না। অনেকেই উক্ত কাব্যদ্বয়ের ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত অতি প্রাচীন কালে রচিত, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাদের মূলে কোনও সত্য আছে কি না সন্দেহ।

(গ) প্রাকৃত সাহিত্য।

প্রাকৃত ভাষার এ পর্য্যন্ত যত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই জৈনধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাবলী। এই জন্য অনেক ইউরোপীয় প্রাকৃত সাহিত্য বলিলে জৈন সাহিত্য বুঝিয়া থাকেন। জৈন ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে ঐতিহাসিক অনেক কথা থাকিলেও, অতি প্রাচীনকালের ঘটনাবলী অত্যন্ত দুর্লভ। জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র অতি প্রাচীন হইলেও, বর্ত্তমান গ্রন্থগুলি তত পুরাতন নহে। দুই তিনবার জৈনগণ অত্যাচারে পীড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য শাস্ত্রগ্রন্থগুলি

বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত, সকল জৈন গ্রন্থই অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সংস্কৃতের ন্যায় প্রাকৃত সাহিত্যেও ঐতিহাসিক মূল্যানুসারে গ্রন্থ-সমূহ তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে ;—

১। ইতিহাস,—মেরুতুঙ্গের নাম কনিংহামের অনুগ্রহে অনেকেই জানিয়াছেন। মেরুতুঙ্গের বিষয় খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। দুঃখের বিষয়, অদ্যাপি মেরুতুঙ্গের উত্তম অনুবাদ হয় নাই।

২। জীবনচরিত ;—কুমারপালচরিতে সে সময়ের বিখ্যাত জৈনধর্ম্মাবলম্বী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বিবরণ পাওয়া যায়। জৈন সাহিত্যের অধিকাংশই অজ্ঞাত। জৈন পুরোহিতগণ সাগ্রহে গ্রন্থগুলি শিক্ষিত বা বিদেশীয়গণের চক্ষুর অন্তরাল করিয়া রাখেন, সুতরাং কত রত্ন যে এখনও মালব ও সৌরাষ্ট্রে ক্রমশঃ নষ্ট হইতেছে, তাহা আর বলিবার নহে। এ দেশে দুই এক জন জৈনধর্ম্মাবলম্বী সৎশিক্ষা পাইয়াছেন। গুজরাটবাসিগণ শিক্ষায় অন্যান্য ভারতবাসী জৈন সম্প্রদায় অপেক্ষা অধিকতর উন্নত। মুনিধর্ম্ম বিজয়জী সুশিক্ষিত ও উদারচেতা ; তাঁহার নিকট অনেক আশা করা যায়।

৩। সাধারণ সাহিত্য—জৈন হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থেই ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি অদ্যাপি বিশদ-রূপে আলোচিত হয় নাই। কোনও কোনও বঙ্গীয় সাহিত্যরথী গৌড়বহো কাব্যখানিকে ঐতিহাসিক কাব্য বিবেচনা করিয়া বাঙ্গালীর গৌরবকাহিনী ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু গৌড়বধের কাহিনী সত্য হওয়া সম্ভব নহে ; কারণ, সে সময়ে কোনও কাশ্মীরাধিপতির পক্ষে সমুদয় উত্তরভারত জয় করা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। সত্য হইলেও, সে গৌড় যে বঙ্গদেশ, তাহার প্রমাণ কি? জৈন, সাহিত্যের বিশেষ আলোচনা এখনও হয় নাই। জৈন গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করা বহু আয়াসসাধ্য ও বহু ব্যয়সাধ্য। বিংশতি বর্ষকাল পরিশ্রম করিয়া শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটীর জন্য যে সমুদয় জৈন বা প্রাকৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় তাহা মুষ্টিমেয়।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা সুদর্শন।

[দেবীপুরাণ অবলম্বনে।]

পূর্ব্বকালে কোশলদেশে ধ্রুবসন্ধি নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। * সরযূ-তীরবর্ত্তিনী অযোধ্যা নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। নৃপতির দুইটি পত্নী ছিল,—জ্যেষ্ঠা পত্নীর নাম মনোরমা ও কনিষ্ঠা পত্নীর নাম লীলাবতী। দুই পত্নীই রূপ-লাবণ্যশালিনী ছিলেন। বিবাহের কিছু দিন পরে, মনোরমা শুভসময়ে রাজলক্ষণাক্রান্ত এক পরমসুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন। নৃপতি নবকুমারের সুদর্শন নাম রাখিলেন। সুদর্শনের জন্মের এক মাস পরে লীলাবতীর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা এই পুত্রের শত্রুজিৎ নাম রাখিলেন। প্রথমতঃ তনয়দ্বয়ের উপর রাজার সমান স্নেহ ছিল। শত্রুজিৎ অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন, তজ্জন্য মন্ত্রিবর্গ ও প্রজাগণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন; রাজাও শত্রুজিতের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

নৃপতি ধ্রুবসন্ধি অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত ছিলেন। তৎকালে ভারতভূমিতে নিবিড় অরণ্যানীর অভাব ছিল না। একদা রাজা এক ভীষণ নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়া মৃগয়া করিতেছেন, এমন সময়ে দংষ্ট্রাকরাল, ভীষণজটাজালমণ্ডিত এক ভয়ঙ্কর সিংহ মেঘবৎ গর্জ্জন করিতে করিতে রাজার সম্মুখীন হইল। নৃপতি তাহাকে আসিতে দেখিয়া, দক্ষিণকরে অসি ও বামকরে চর্ম্মফলক গ্রহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিলেন। রাজার অনুচরবর্গও সেই সময়ে সিংহের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু সেই ভীষণ সিংহ কোনও বাধা না মানিয়া রাজার উপর আসিয়া পড়িল। রাজা তাহাকে খড়্গ দ্বারা প্রহার করিলেও, সে খরনখরনিকর দ্বারা রাজার শরীর বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। রাজা ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন; সিংহও রাজানুচরগণের অস্ত্রপ্রহারে গতায়ু হইল।

সৈনিকগণ রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক প্রধান মন্ত্রীকে সমস্ত ঘটনা জানাইলেন। মন্ত্রিগণ বনস্থলীতে গমন করিয়া রাজার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পৌর ও জানপদপ্রধানেরা, পুরবাসিগণ ও বসিষ্ঠের সহিত মন্ত্রণা করিয়া সুদর্শনকে রাজা করিবার জন্য মন্ত্রিগণকে অনুরোধ

---

* ইনি রামের পর পঞ্চদশ পুরুষে আবির্ভূত হন। হরিবংশ-মতে ইঁহার নাম অর্থসিদ্ধি।

করিলেন। অমাত্যবর্গ সম্মত হইলেন। শত্রুজিতের পক্ষেও বিস্তর লোক ছিল। শত্রুজিতের মাতা লীলাবতী উজ্জয়িনীদেশাধিপতি রাজা যুধাজিতের কন্যা ছিলেন। যুধাজিৎ দৌহিত্রকে রাজা করিবার জন্য সত্বর সসৈন্যে অযোধ্যায় আগমন করিলেন। সেই সংবাদ শ্রবণে মনোরমার পিতা, কলিঙ্গদেশের রাজা বীরসেন, দৌহিত্রের হিতার্থ, অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেনা-পদ-ভরে অযোধ্যা কম্পিত হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষই মন্ত্রিগণকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যুধাজিতের দৌহিত্র গুণজ্যেষ্ঠ ছিলেন,—কিন্তু সুদর্শন জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত বলিয়া, রাজ্যে তাঁহার দাবীই অগ্রগণ্য বলিয়া অনেকে বিবেচনা করিলেন। যুধাজিতের দাম্ভিকতার জন্য মধ্যস্থতায় মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল। তিনি বীরসেনকে নিজের প্রতাপখ্যাপন করিয়া ভয়প্রদর্শন করিলেন। অযোধ্যার প্রজাগণ যুদ্ধোন্মুখ সেনাদলের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কোশল-রাজ্যের সমীপস্থ রাজগণ যুদ্ধাভাবে এতদিন মনঃক্ষোভে কাল কাটাইতে ছিলেন। যুদ্ধের সুযোগ উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা বহুসৈন্যসমভিব্যাহারে, উভয়পক্ষে আসিয়া যোগদান করিলেন। শৃঙ্গবের পুরীর নিষাদগণ, ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুসংবাদশ্রবণ করিয়া, রাজদ্রব্য সকল লুণ্ঠন করিবার জন্য সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইল।

নিষাদ জাতি গঙ্গাপার হইয়া মধ্যে মধ্যে অযোধ্যা আক্রমণ করিত। রাজা ক্ষমতাশালী হইলে, উহারা বশীভূত থাকিত;—নতুবা রাজ্যমধ্যে উপদ্রব করিতে বিরত থাকিত না। মহারাজ দশরথ একদা গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন; সেই সময়ে নিষাদ জাতি রাজসেনা আক্রমণ করে। কিন্তু নিষাদরাজ পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজসমীপে আনীত হয়। নিষাদ-পতির তখনই প্রাণ যাইত, কিন্তু করুণাসাগর রামের অনুরোধে নিষাদ-রাজের জীবন রক্ষা পায়। নিষাদ-রাজ রাজপুত্রের মহত্বে মুগ্ধ হয়; সে বর্ব্বর হইলেও, আজীবন কৃতজ্ঞ ও রামের অনুগত ছিল। রাম একটু ইঙ্গিত করিলেই, সে অযোধ্যায় গিয়া ভরতপক্ষীয় লোকদিগকে আক্রমণ করিতে ইতস্ততঃ করিত না।

রাজকুমারদ্বয় বালক; অযোধ্যায় ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত;—এই সংবাদ পাইয়া দেশদেশান্তর হইতে তস্করগণ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ভীষণ উপদ্রব ও অরাজকতা চলিতে লাগিল। যখন সন্ধি-

সম্ভাবনা তিরোহিত হইল, তখন রাজযুগল ক্ষাত্রধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। লোকবিস্মাপন ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল। বহুসেনা সংগ্রামস্থলে জীবনবিসর্জ্জন করিল। বীরসেন যুধাজিতের বাণে ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন; তদীয় সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

রাজ্ঞী মনোরমা পিতৃ-নিধন-বার্ত্তা-শ্রবণে ভীত হইয়া, বিদল্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রিপ্রবর বলিলেন,—"মাতঃ, আমার বিবেচনায় আপনার আর এখানে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা উচিত হয় না। এখানে থাকিলে যুধাজিৎ নিশ্চয়ই আপনার পুত্রকে বিনষ্ট করিবে। বারাণসীর অরণ্যমধ্যে সুবাহু নামক আমার এক মাতুল আছেন; সেখানে গেলে তিনি আপনাকে রক্ষা করিবেন।" এইরূপ পরামর্শ স্থির হইলে, বিদল্ল, রাজা যুধাজিৎকে দেখিবার ভাণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। মনোরমাও লীলাবতীকে কহিয়া নগরের বাহিরে আসিয়া, যুধাজিতের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক মৃত পিতার সৎকারাদি করিলেন। অনন্তর এক জন সৈরিন্ধ্রীর সহিত ভয়ব্যাকুলচিত্তে কম্পিত-কলেবরে দুই দিবস পরে ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিদল্ল আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। এ দিকে নিষাদেরা তথায় আসিয়া তাঁহার সমুদয় ধন-সম্পত্তি অধিকার করিল। দস্যুগণ আসিয়া রথখানি কাড়িয়া লইল। তখন একমাত্রবসনপরিধায়িনী মনোরমা পুত্রকে লইয়া সৈরিন্ধ্রীর করগ্রহণপূর্ব্বক প্রভুভক্ত বিদল্লের সঙ্গে গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। নিষাদ ও দস্যুগণের ভয় অপেক্ষাও যুধাজিতের ভয় তাঁহার অন্তরে জাগরূক ছিল। তিনি ভেলাতে চড়িয়া ভাগীরথী পার হইয়া ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন। এতক্ষণ পরে তিনি কিয়ৎপরিমাণে নির্ভয় হইলেন।

ভরদ্বাজাশ্রমের সহিত অযোধ্যার সংস্রব ছিল। রামচন্দ্র দক্ষিণরাজ্যে প্রবেশের পূর্ব্বে ভরদ্বাজাশ্রম দিয়া গিয়াছিলেন। ভরত রামান্বেষণে যাইবার সময় এই আশ্রম দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। বনবাস হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন-কালে রামচন্দ্র ভরদ্বাজাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক অযোধ্যার সংবাদ গ্রহণ করেন। রাজ্ঞী মনোরমাও ভরদ্বাজাশ্রমে আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

তাপসগণ সাক্ষাৎ রমার ন্যায় মনোরমাকে দেখিয়া তাঁহার পরিচয়জিজ্ঞাসু

হইলেন। রাজ্ঞীর অনুমতিক্রমে বিদল্ল তাঁহাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। মনোরমার বিপদে ঋষিগণের করুণার সঞ্চার হইল। ভরদ্বাজ তাঁহাকে বলিলেন,—"হে কল্যাণি, তুমি এ স্থানে নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান করিয়া তোমার পুত্রকে পালন কর। এখানে যুধাজিৎ-কৃত কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নাই।" মনোরমা এই অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া মুনিদত্ত পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যুধাজিৎ সমরক্ষেত্র হইতে অযোধ্যায় আসিয়া, সুদর্শনকে সংহার করিবার জন্য মনোরমার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অনুসন্ধানার্থ চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন। এখন তিনি শত্রুজিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রজাগণ মহোৎসবে মত্ত হইল। পুরোহিত ও মন্ত্রিবর্গ নূতন রাজার অভ্যুদয় কামনা করিতে লাগিল। কিন্তু রাজ্ঞী মনোরমা ও রাজপুত্র সুদর্শনের জন্য শোক করিবার লোকও এককালে বিরল ছিল না;—তাঁহারা গৃহমধ্যে বসিয়া অসহায় মাতা ও পুত্রের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

রাজা যুধাজিৎ দৌহিত্রকে রাজা করিয়া এবং মন্ত্রিগণের উপর রাজ্য-রক্ষার ভারসমর্পণপূর্ব্বক, স্বীয় রাজধানীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শুনিতে পাইলেন,—মনোরমা পুত্রের সহিত ভরদ্বাজাশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। তৎকালে বল ও দুর্দ্দর্শ, এই উভয় নামে পরিচিত এক জন নিষাদ শৃঙ্গবেরপুরে রাজত্ব করিতেছিল; যুধাজিৎ তাহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। যুধাজিৎ বলকে অগ্রগামী করিয়া সসৈন্যে ভরদ্বাজাশ্রমের নিকট উপনীত হইলেন। যুধাজিতের আগমন-সংবাদ পাইয়া, মনোরমা পুত্রের জীবনাশঙ্কায় ভীত হইলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ অভয়বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

ভরদ্বাজ স্বয়ং অগ্রগামী হইয়া যুধাজিতের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যুধাজিৎ বলিলেন,—"আপনি সপুত্রা মনোরমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন।" ভরদ্বাজ যুধাজিৎকে অনেক সদুপদেশ দান করিলেন, এবং বালক সুদর্শন হইতে তাঁহার ভয়ের কোনও কারণ নাই, ইহাও বলিলেন; কিন্তু দর্পান্ধ যুধাজিৎ ভরদ্বাজের কোনও উপদেশেই কর্ণপাত করিলেন না; তিনি বলিলেন,—"আপনি আমার কথা না শুনিলে আমি বলপূর্ব্বক সুদর্শনকে গ্রহণ করিব।"

সে সময়ে ক্ষাত্রতেজ ব্রাহ্মণতেজে বিনীত হইত। ক্ষত্রিয়দের অত্যাচার হইতে প্রজাসাধারণ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইত। অনার্য্য দস্যুগণও ক্ষত্রিয়-দের অপেক্ষা ব্রাহ্মণদিগকে ভালবাসিত। এক এক মুনির আশ্রম জ্ঞান ও শারীরিক তেজের কেন্দ্রস্থল ছিল; তাহাতে সশস্ত্র ও সশাস্ত্র তাপসগণ বাস করিতেন। এক জন রাজাকে বাধা দিবার তাঁহাদের সামর্থ্য ছিল। ভরদ্বাজ বলদর্পিত যুধাজিতের বাক্য-শ্রবণে ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন -"ক্ষমতা থাকে ত আমার আশ্রম হইতে মনোরমাকে লইয়া যাও।" এই বলিয়া ভরদ্বাজ আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন।

যুধাজিৎ তপস্বীর তেজস্বিতা দেখিয়া বিস্মিত ও ভীত হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে হঠকারিতা প্রদর্শন করিতে নিষেধ করিলেন। যুধাজিৎ ভরদ্বাজকে প্রণাম করিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন।

এ দিকে সুদর্শন ভরদ্বাজাশ্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। ভরদ্বাজ তাঁহাকে উপনীত করিয়া সাঙ্গ বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। কাশীরাজ স্বীয় কন্যা শশিকলার স্বয়ংবরের উদ্যোগ করিতেছিলেন। সেই স্বয়ংবরস্থলে সুদর্শন উপস্থিত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে কয়েক জন নিষাদ-রাজ সুদর্শনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বলবৃদ্ধি করিয়াছিল। শত্রুজিতের প্রতি অযোধ্যার কেহ সন্তুষ্ট ছিল না; ধীরে ধীরে অযোধ্যায় সুদর্শনের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। স্বয়ংবরে নিমন্ত্রিত হইয়া নানা দেশের রাজারা বারাণসীতে সমাগত হইয়াছিলেন। রাজা যুধাজিৎ ও শত্রুজিৎ, উভয়েই আসিয়াছিলেন। সুদর্শনকে স্বয়ংবরক্ষেত্রে আসিতে দেখিয়া যুধাজিৎ প্রকাশ্যভাবে তাঁহাকে বিনাশ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কাশীরাজ, গোলযোগ দেখিয়া, কন্যার সম্মতিক্রমে, গোপনে সুদর্শনের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। যুধাজিৎ ক্রোধান্ধ হইয়া কাশীরাজকে আক্রমণ করিলেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে ভয়াবহ সংগ্রাম উপস্থিত হইল। যুধাজিৎ ও শত্রুজিৎ, উভয়েই সমরশায়ী হইলেন। সুদর্শন প্রজাবর্গের আহ্বানে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমেই শত্রুজিতের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মধুরবচনে তাঁহার শোকাপনোদনের চেষ্টা করিলেন। মনোরমাও তাঁহাকে আপনার ভগ্নী হইতে বিভিন্ন জ্ঞান করিতেন না।

কথিত আছে, রাজা সুদর্শনের সময়ে কোশল রাজ্যে ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। কাশীরাজ সুবাহু এই সময়েই নিজ রাজধানীতে দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। এখনও সেই দুর্গাবাড়ী বর্ত্তমান আছে।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

প্রতিশোধ।

১

শ্যামাশঙ্কর রায় যখন বর্ত্তমান ছিলেন, তখন পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য হরিদাসের কর্ত্তৃত্ব সামান্য দাসদাসীগণকে অতিক্রম করিয়া প্রভুর পুত্রকন্যাগণ, এমন কি, গৃহিণী পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিচক্ষণ শ্যামাশঙ্কর পুত্র অপেক্ষা হরিদাসকে অধিক বিশ্বাস করিতেন, এবং দক্ষিণ হস্ত অপেক্ষা তাহাকে অধিক প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিতেন। কোনও সঙ্কট উপস্থিত হইলে শ্যামাশঙ্কর গোপনে হরিদাসের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই প্রভুভক্ত ভৃত্যটির বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির পরিচয় পাইয়া অবধি বিজ্ঞ শ্যামাশঙ্কর সংসারের অর্দ্ধেক কার্য্যের ভার তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন।

আজ এক মাস হইল, শ্যামাশঙ্কর ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিপর্য্যস্ত শোকাকুল সংসারের মধ্যে এখনও সে স্বাভাবিক শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে নাই। ভূমিকম্পের পর কোনও নগরের যেমন অবস্থা দাঁড়ায়, রায়-পরিবারের বর্ত্তমান অবস্থাও কতকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বের সে অভগ্ন সংযত অবস্থা কোথাও নাই; সব গ্রন্থি, সব বন্ধন শিথিল হইয়াছে। কিন্তু সংসারের নিয়ম, ভূমিকম্পের পর আবার নগর গঠিত হয়; ধনীর প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই নিয়মানুযায়ী ক্রমশঃ রায়-পরিবারের রন্ধনশালায় রন্ধনের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, গোয়ালে যথারীতি গোসেবা হইতেছে, অর্থলোলুপ দাস দাসীর অবিশ্রান্ত চৌর্য্যবৃত্তিতে বাধা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, দ্বি-প্রহরে বধূ হেমলতার নির্জ্জন কক্ষে তাস-হস্তে প্রতিবেশিনী বালিকাগণের প্রবেশ আরম্ভ হইয়াছে, এবং সন্ধ্যার পরে বৈঠকখানায় পরেশনাথের বন্ধুর সংখ্যা ও হারমোনিয়ম্ তবলার শব্দ দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে।

ইহাই সহজ ও চিরান্তন নিয়ম; ইহার বিরুদ্ধে কাহারও কোনও অনুযোগ ছিল না। কিন্তু হরিদাসের চক্ষে এই অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছিল। কর্ত্তার জীবদ্দশায় তাঁহার অগোচরে তাস খেলাও চলিত, এবং সময়ে সময়ে হারমোনিয়মও বাজিত;—কিন্তু তাহার মধ্যে যথেষ্ট সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের ভাব ছিল। শ্যামাশঙ্কর অন্দর হইতে বহির্বাটীতে আসিলে, অন্দরে তাস চলিত; এবং গ্রামান্তরে গমন করিলে হারমোনিয়ম্ বাজিত। এখন সে সংযত ভাব সম্পূর্ণ রূপে অন্তর্হিত হইয়াছে;—যখন ইচ্ছা অন্দরে তাস চলিতেছে, এবং বাহিরে হারমোনিয়ম্ বাজিতেছে! এত দিন হারমোনিয়ম্ ও তাস শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুর অপেক্ষায় যেন প্রচ্ছন্ন ছিল; এখন অবসর পাইয়া তাহারা সম্পূর্ণ সচ্ছন্দতা ভোগ করিতেছে; যেন তাহারা শ্যামাশঙ্করের মৃত্যুশোকসময়ের মধ্যেও অসঙ্গত দাবী স্থাপন করিতে চাহে। ব্রাহ্মণের ঘর না হইলে এত দিনে যে অশৌচও শেষ হইত না!

পরেশনাথ ও হেমলতার হৃদয়হীনতার নির্ম্মম আঘাতে ক্ষুব্ধ হরিদাস অস্থির হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু কাহাকে সে দোষ দিবে, কি বলিয়া সে অভিযোগ আনিবে, তাহা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিপ্রহরে হেমলতা যখন সঙ্গিনীগণের সহিত তাসখেলায় মগ্ন থাকে—হরিদাস ভাবে,—সে গিয়া বলে,—"বউমা, কাযটা ভাল হইতেছে না।" কিন্তু কেন ভাল হইতেছে না, তাহা সপ্রমাণ করা বড় কঠিন হইবে। হৃদয়ের এত সূক্ষ্ম অদৃশ্য অপরাধের নিকট তর্ক নিশ্চয় পরাস্ত হইবে। এ কথা যে স্বয়ং বুঝিতে না পারে, যুক্তির দ্বারা তাহাকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র। হেমলতা যদি জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, "কেন ভাল হইতেছে না?" তাহা হইলে সেই দণ্ডেই হরিদাসকে পরাজয় মানিতে হইবে। সংসারের এক জন ভৃত্যের এরূপ আচরণ দেখিয়া রহস্যরসভোগিনী সঙ্গিনী-গণের পক্ষে হয় ত হাস্যসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিবে। হেমলতা হয় ত এমন একটা কথা বলিয়া ফেলিবে, যাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে হইলে হরিদাসকে রায়-পরিবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হয়।

সন্ধ্যার পর যখন পরেশনাথ বন্ধুগণে বেষ্টিত হইয়া হারমোনিয়মের সহিত গান ধরে, তখন হরিদাস পার্শ্বের ঘরে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়া থাকে। হারমোনিয়মের সাতটা সুর সপ্তরথীর মত তাহার ক্ষুব্ধ চঞ্চল হৃদয়কে চারি

দিক হইতে আক্রমণ করে। তাহার ইচ্ছা হয়, পরেশনাথের অসাক্ষাতে গোপনে তাহার সখের হারমোনিয়ম্ চূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং তাহার তবলার সটান চর্ম্মের মধ্যে একটা বড় ছিদ্র করিয়া দেয়। কিন্তু পরেশের উক্তপ্রকার ক্ষতি হইবার পূর্ব্বেই তাহারই হৃদয়ের কতকটা চূর্ণ ও কতকটা ছিন্ন হইয়া যায়! এখনও মাসাধিক হয় নাই পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ইহারই মধ্যে পুত্রের এরূপ আচরণ দেখিয়া হরিদাস অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইত। বউমা ত পরের বাড়ীর মেয়ে, তাহার কথা স্বতন্ত্র;—কিন্তু পরেশনাথের এ আচরণ হরিদাস কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না।

২

একদিন সন্ধ্যাবেলা হেমলতা পরেশনাথকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিল, "দেখ, হরি আমার শ্বশুরের পুরাণো চাকর, কিন্তু আমিও ত তাঁহারই পুত্রবধূ। আমি ত' সংসারে ভেসে আসি নাই!"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "এ দুটোই ধ্রুব সত্য, কিন্তু তার সঙ্গে তৃতীয় সত্য,—তোমার পিতৃকুলকে তুমি ভাসিয়ে এসেছ!"

অন্য সময় হইলে হেমলতা এ কথা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিত। তাহার বিবাহের সময়ে অর্থ লইয়া তাহার দরিদ্র পিতার প্রতি অন্যায় উৎপীড়নের বিষয়ে নানাপ্রকার তর্ক ও যুক্তি দ্বারা অর্দ্ধঘণ্টাকাল বচসা করিত, এবং হয় ত সেই উপলক্ষে দুই তিন দিবস স্থায়ী মান অভিমানের একটা বিষম গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কিন্তু এখন মনের অবস্থা অন্যরূপ। সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া হেমলতা বলিল, "রঙ্গ রেখে, কথাটা শুন্‌বে?"

ঘাড় নাড়িয়া পরেশ বলিল,—"রঙ্গ রাখিলাম, কথাটাও শুন্‌ব, অতএব বল।"

কথাটা সহজভাবে প্রকাশ করিতে হেমলতা একটু সঙ্কোচ বোধ করিল। পরেশের নিকট সে যে অভিযোগ রুজু করিতে আসিয়াছে, তাহাতে সে সম্পূর্ণ নিরপরাধা, সে বিষয়ে যেন সে ঠিক নিঃসন্দেহ নহে। প্রভু ও ভৃত্যের বিবাদে যে বেসুরা কর্কশ স্বর বাজিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে,—তাহার বাঁশী যেন হরিদাস নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং হেমলতা যেন সেই বাঁশীতে ফুঁ দিয়াছে। হেমলতার মনে হইতেছিল, বিচারে বোধ হয় এক-তরফা ডিক্রি তাহার ভাগ্যে ঘটিবে না। তাই কথাটা একটু ঘুরাইয়া বলিল, "তোমার চাকর তোমার স্ত্রীর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করে না।"

পরেশ বলিল, "বল কি? যাঁর আদেশ পালন কর্‌তে পার্‌লে আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করি, আমার ভৃত্য তাঁর আদেশ পালন করা কর্ত্তব্য বলে' মনে করে না!"

বিচারকের এরূপ শোচনীয় গাম্ভীর্য্যের অভাব ও লঘুত্ব দেখিয়া বাদিনীর কপোল দুটি লাল হইয়া উঠিল। তাহার অলকের গুচ্ছ টানিয়া দিয়া বলিল, "তুমি যদি আর ঠাট্টা কর ত' আমি——"

পরেশ হাসিয়া বলিল, "মাটী! একেবারে অত বড় শপথটা করে ফেল্লে। আচ্ছা, তবে আসল কথাটা খুলে বল।"

"আমি আজ বাজারের ফর্দ্দের সঙ্গে একজোড়া তাস কিন্‌তে দিয়েছিলাম; হরি ফর্দ্দ থেকে তাসের জায়টা কেটে দিয়ে ফর্দ্দ আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে, এবং বলে পাঠিয়েছে যে, কর্ত্তার আমলে কেহ কখনও তাহাকে তাস কেনবার আদেশ করেনি। কর্ত্তার মৃত্যুর এক মাসের মধ্যে যদি তাকে তাসের দোকানে ঢুক্‌তে হয়, তা হ'লে অল্প দিনেই তার দুর্দ্দশার সীমা থাকবে না; সে তাস কিন্‌তে পারবে না। দেখ দেখি, এ কি চাকরের কথা!"

পরেশ বলিল, "না, ঠিক চাকরের কথা নয়; কিন্তু এইটে মনে রেখো হেম, এই চাকরটিই কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তোমার স্বামীকে সকল বিষয়ে শাসন করত, এবং এখনও প্রয়োজনকালে করে' থাকে। এটা ভেবে তুমি তাকে ক্ষমা করতে পার। যাই হোক, কথাটা হরির ভাল হয়নি।"

"ভাল যে হয়নি, সেটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।"

"কায নেই; পুরাতন লোক, কিছু বল্লে মনে কষ্ট পাবে। আমাদের শাসন করতে পারে মনে করে' ও যদি একটু সুখ পায়, তাতে ক্ষতি কি?"

এ কথার উপর কিছু বলিতে যাইলে স্বামীর সহিত বচসা করিতে হয়। রায়টা হেমলতার মোটেই পছন্দ হইল না। বিচারে হরিদাসেরই সম্পূর্ণ জিৎ হইল। সে মনে মনে স্থির করিল, আর যদি কখনও হরিদাসের সহিত বিবাদ হয় ত পরেশের নিকট আর বিচারের জন্য আসিবে না। এবার স্বয়ং তাহাকে শাসন করিবে!

এই ঘটনার পর হইতে প্রায়ই হরিদাসের সহিত হেমলতার বিবাদ বাধিতে লাগিল। অতি সামান্য কারণ পাইলেই হেমলতা তাহাকে অপমান

করে, এবং হরিদাসও এই অল্পবয়স্কা পরগৃহাগতা দাম্ভিকা বধূর অসঙ্গত কর্ত্তৃত্ব কোনও প্রকারেই সহ্য করিতে পারে না। হেমলতা যখন তাহার অবগুণ্ঠন একটু সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে দুইটা অপমানবাণী শুনাইতে যায়, তখন হরিদাস এমন একটি কথা বলিয়া প্রস্থান করে, যাহা শুনিয়া হেমলতার একবার স্বামীর নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়, এবং একবার পিত্রালয়ে যাইতে ইচ্ছা হয়। কোনও বিবাদ উপস্থিত হইলে, হেমলতা দশটা কথা বলিলে হরিদাস একটা কথা বলে ; কিন্তু এমনই একটা গুরুতর কথা বলে, যাহার কঠিন আঘাতে হেমলতার দশটা কথা চূর্ণ হইয়া যায়,—রাগে ও অপমানে তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হয়।

এই প্রকার ছোট ছোট অবিশ্রান্ত পরাজয়ে বধূ হেমলতার অন্তরে যে বহ্নি প্রত্যহ সঞ্চিত হইতেছিল, একদিন সহসা তাহা সহস্রশিখায় জ্বলিয়া উঠিল।

হেমলতার বিশ্বস্ত পরিচারিকা গোলাপ হেমলতার আদেশানুসারে হরিকে বলিল, "হরিদাস, মা বলিলেন, তুমি বাজারের জন্য যেমন পয়সা নাও, তেমন জিনিস আসে না।" দুই একবার ইতস্ততঃ করিয়া, ঢোক গিলিয়া বলিল, "মা বল্‌লেন, বড় বাড়াবাড়ি হয়েছে।"

ক্রোধে ও ক্ষোভে হরিদাসের সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সামান্য একটা দাসীর মুখে এমন স্পর্দ্ধা ও অপবাদের কথা শুনিয়া তাহার হিতাহিত-জ্ঞান লোপ পাইবার উপক্রম হইল। হরিদাস গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কিসের বাড়াবাড়ি রে ? তুই যদি আর কোনও কথা মুখে আন্‌বি ত তোর মুণ্ড ছিঁড়িয়া দিব।"

ক্ষণভঙ্গুর দেহ-রক্ষার জন্য মুণ্ডের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দাসীর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, এবং সমুণ্ড দেহের মায়াও তাহার অল্প ছিল না। সেই সযত্ন-রক্ষিত দেহের সম্বন্ধে এইরূপ আশঙ্কাজনক প্রস্তাবের পর গোলাপ দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া বিবেচনা ও সতর্কতার পরিচয় দিল।

৩

ঠিক সেই সময়ে ফুলবাগানের দিকে দক্ষিণের বারাণ্ডায় একটা বেঞ্চের উপর হেমলতা ও পরেশ উপবেশন করিয়া গ্রীষ্মকালের সবটুকু সুখ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সুশীতল স্নিগ্ধ পবনে বাগানের সব ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে ; সপ্তমীর শশাঙ্কের ক্ষীণালোকে সমস্ত বাগানটি

মায়াজালে জড়িত একটি অস্পষ্ট স্বপ্নরাজ্যের স্থায় দেখাইতেছে; এবং দূরে মালীর ঘরে মালীর এক কন্যা উচ্চস্বরে ছড়া পড়িতেছে।

হেমলতার হস্ত ধারণ করিয়া পরেশ বলিল, "জীবনটা যদি ঠিক এই-খানে আট্‌কে যায় ত মন্দ হয় না। গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা, ফুলের বাগান, চাঁদের আলো, আর তুমি!"

হেমলতা অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিল, গোলাপের নিকট অপমানিত হইয়া হরিদাস কি করিবে। তাহার মনে একটু ভয়ও হইতেছিল। শ্বশুরের এই অতি পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যের প্রতি সে যেমন দিন দিন নির্ম্মম হইয়া উঠিতেছিল, তেমনই তাহাকে একটু ভয়ও করিত। এই স্বতন্ত্রপ্রকৃতি নির্ভীক স্পষ্টবাদী ভৃত্যকে অতি যত্নেও হেমলতা সামান্য একটা বেতনভোগীর মত মনে করিতে পারিত না। রূঢ় আচরণের দ্বারা সে সেই ভাবই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে মনে হয়, সে যেন অন্ততঃ তাহার এক জন সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। এইরূপ একটা অসহনীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হৃদয়ে বহন করিতেছিল বলিয়াই হেমলতা স্থির করিয়াছে, যে এবারে এরূপ একটা বাণ নিক্ষেপ করিতে হইবে, যাহার তাড়নায় হরিদাসের বিশাল গর্ব্বস্ফীত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া তাহার ভৃত্যত্বের দীন মূর্ত্তি সকলের সমক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে, এবং হেমলতার প্রভুত্ব এই নিরুপায় লাঞ্ছিত ভৃত্যত্বকে ক্ষমা করিয়া স্বীয় মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিবে! নারীহৃদয়ের কোন অজ্ঞেয় প্রবৃত্তির উত্তেজনায় সে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা সামান্য কৌতূহলের বিষয় নহে। সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া সেও হয় ত আপনার দুর্ব্বলতার বিষয়ই চিন্তা করিতেছিল, তাই স্বামীর সোহাগবচনের সবটা তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই; লজ্জিত হইয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি কি?"

তাহার কবরীর মধ্য হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইয়া পরেশ বলিল, "তুমি আমার স্ত্রী!"

"সেটা কি আজ প্রথম অনুভব করলে?"

"প্রথম না হলেও, প্রথমদিনকার মতনই আজ যেন অনুভব করছি।" বলিয়া পরেশনাথ হেমলতার রক্তিম কপোল আরও একটু রক্তিম করিয়া দিল।

কঠোর আদান-প্রদান-ময় কর্কশ গদ্যপূর্ণ সংসারের মধ্যে এতটা কাব্যের সৃষ্টি বোধ হয় সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তাই ভাগ্যদেবতার অভিশাপস্বরূপ সমস্ত কবিত্ব নষ্ট করিয়া পশ্চাতে ক্রোধকম্পিত গুরুগম্ভীর স্বরে ধ্বনিত হইল, "বউমা, গোলাপকে দিয়ে কি বলে' পাঠিয়েছ? আমি চোর? আমি তোমার বাজারের পয়সা চুরি করি?"

পূর্ব্ব হইতে কতকটা প্রস্তুত থাকিলেও, হেমলতা আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া পড়িল; প্রেমের সুশীতল বারিসেচনে তাহার অন্তর যখন বেশ সিক্ত হইয়া আসিয়াছে, ঠিক সেই সময়ে এক ক্রুদ্ধ উৎপীড়িত অন্তঃকরণ সুযোগ পাইয়া সেই অসংযত হৃদয়কে আক্রমণ করিয়াছে! অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সহিত যুঝিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কিছু কঠিন। হেমলতা বাক্যহীন হইয়া বসিয়া রহিল। পরেশের পক্ষে ব্যাপারটা আরও আকস্মিক, পূর্ব্বে সে এ বিষয়ে কিছুমাত্র অবগত ছিল না।

হরিদাস বলিল, "এত বয়সে মা, তোমার মত বালিকার সহিত ঝগড়া করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু তুমি যে কথা আজ আমাকে বলেছ, ত্রিশ বৎসরের মধ্যে তোমার শ্বশুর এক দিনও আমাকে সে রকম কথা বলেন নি।"

হেমলতা এতক্ষণে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে তাহার চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; সে বলিল, "তুমি আজ আমার চাকর; তোমাকে যাহা ইচ্ছা বল্‌তে পারি, তোমাকে বল্‌তে পারি তুমি চোর, তুমি বেয়াদব্!"

ক্রোধে হরিদাস চারি দিকে অন্ধকার দেখিল, বলিল, "অন্যায় কথা বোলো না বউমা; তুমি স্ত্রীলোক, পরেশের স্ত্রী, তোমাকে আজ ক্ষমা করব প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু বেশী রাগিয়ো না মা, রক্তটা আমার গরম, কি জানি যদি তোমার সম্মান রেখে না চল্‌তে পারি।"

পরেশ বলিল, "দেখ হরি, তোমার অনেক অপরাধ ক্ষমা করেছি—কিন্তু আর তোমাকে ক্ষমা কর্‌তে পারি না। তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা, তুমি আমার সম্মুখে আমার স্ত্রীকে অপমান কর? যাও, তুমি দূর হয়ে যাও।" কথাটা এরূপ কঠিন ভাবে বলিবার ইচ্ছা ছিল না,—কিন্তু কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কাঠিন্য অনিবার্য্যভাবে আসিয়া পড়িল। স্থিরভাবে হরিদাস বলিল, "যাব ভাই, তাই যাব। তবে যাবার আগে বৌমাকে দুটো কথা

বলে যেতে চাই। দেখ বউমা, তোমার মা! আমি অনেক চুরি করেছি, আজ এক মাস আমি তোমার চাকর, এই এক মাসের মধ্যে যখন যা সুবিধা পেয়েছি চুরি করেছি। মোটামুটি একটা হিসাবে চুরিটার শোধ দেবার জন্য এক শ' টাকা এনেছি। কিছু যদি কম পড়ে ত' ক্ষমা কোরো। ত্রিশ বৎসরের একটা পাকা চোর আজ তোমার হাতে ধরা পড়ে' বিদায় নিচ্ছে। বিদায় নিতে তার চ'খে যদি জল এসে থাকে ত মনে কোরো, এই ত্রিশ বৎসরের লোভটা বন্ধ হ'ল—সেই দুঃখের সে মায়াকান্না। আজ থেকে তোমার সংসার নিষ্কণ্টক হ'ল!"

বারাণ্ডার আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া হরিদাসের দীর্ঘদেহ সরিয়া গেল। হেমলতা ও পরেশনাথ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া রহিল; কাহারও কথা কহিবার শক্তি ছিল না। তাহাদের পদতলস্থিত টাকার থলির মধ্য হইতে প্রত্যেক মুদ্রা তাহাদিগকে কশাঘাত করিতে লাগিল। মালীর কন্যা তখন দুর্গার অধিবাস ও বিবাহের ছড়া শেষ করিয়া পড়িতেছে,—

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।

কিন্তু হায়, ধরা পড়িয়াছে! এই বড় বিদ্যায় বিদ্বান না হইয়াও যে অপমানিত লাঞ্ছিত হইয়া আজ ধৃত হইয়াছে, তাহার সান্ত্বনার জন্য কোনও ছড়া আছে কি না, জানি না।

৪

সেই রাত্রেই হরিদাস রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া আপনার গৃহে চলিয়া গেল। ভূতকালের পুরাতন ভৃত্যের অভাব বোধ করিয়া পরেশনাথ অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়াছিল, এবং হেমলতাও বোধ হয় একটু অনুতপ্ত হইয়াছিল। কিছুদিন পরেই তাহারা এই কষ্টটুকু ভুলিয়া গেল, এবং সুখে দুঃখে বিজড়িত হইয়া তাহাদের সংসার আবার পূর্ব্বের মত চলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রায় তিন বৎসর পরে একদিন সহসা এই সুখ-দুঃখ-মিশ্রণের মধ্যে দুঃখের অংশটা চূড়ান্তপরিমাণে বাড়িয়া উঠিল। গ্রামে একটা হত্যা হইয়া গেল, এবং তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল যে, প্রাতঃস্মরণীয় শ্যামশঙ্কর রায়ের কুলাঙ্গার পুত্র পরেশনাথের দ্বারা এই প্রণয়ঘটিত দুষ্কর্ম্ম ঘটিয়াছে। তদন্তের জন্য পুলিস যখন সদলবলে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন পরেশের এক দল শত্রু হলফ্ লইয়া সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা স্বচক্ষে পরেশকে হত্যা করিতে দেখিয়াছে। পুলিসসাহেব সন্তুষ্টচিত্তে পরেশনাথকে চালান দিলেন।

এই আকস্মিক বিপদে ভয়ে ও ভাবনায় হেমলতা অবসন্ন হইয়া পড়িল। কি উপায়ে তাহার নির্দ্দোষ স্বামী এ বিপত্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহা কোনমতেই তাহার বুদ্ধিতে আসে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া যখন কোনও উপায়ই সে করিতে পারিল না, তখন তাহার পিতাকে লিখিল, "বাবা অভাগিনীকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার কর, নহিলে বিষ খাইয়া মরিব।"

অজস্র অর্থব্যয় ও পিতার প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোনও ফল হইল না। বিচারপতি পরেশনাথকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া মোকর্দ্দমা সেশনে দিলেন। অশেষচিন্তাগ্রস্ত হেমলতার পিতা বলিলেন, "কিছু ভয় নাই মা, এখনও হাতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আছে।"

সেশন-জজের নিকট পরেশনাথের বিচারের দিন বিচারালয় লোকারণ্য। বিচারের ফল জানিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। এই অতিবিপন্ন ভদ্রসন্তানটির দুঃখে সকলেরই মন বিষণ্ণ। সকলেই বলিতেছে, আহা এ যেন বাঁচিয়া যায়। পরেশনাথের পক্ষাবলম্বী ব্যারিষ্টার তাঁহার সাধ্যমত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া আসন গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে হেমলতার পিতা হরমোহন বাবু দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গানাম স্মরণ করিতেছেন।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুখমণ্ডল বিকৃত করিয়া বিচারক পরেশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষ হইতে তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাকে অব্যাহতি দিতে পারি না, প্রতিকূল প্রমাণের বলে তোমার মৃত্যুদণ্ড স্থির হইল।"

গৃহমধ্যে সহসা বজ্রাঘাত হইলেও সকলে সেরূপ চমকিত হইত না। সকলেই অনুমান করিয়াছিল যে, পরেশনাথ একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে না; কিন্তু এরূপ ভীষণ দণ্ড তাহাকে বহন করিতে হইবে, তাহা কেহও মনে করে নাই। ব্যারিষ্টার টেবিলে হস্তাঘাত করিয়া বলিল, "Lord, this is hard indeed!" হরমোহন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এবং পরেশনাথ স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাক নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সহসা তাহার আকৃতির মধ্যে এমন একটা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া দিল, যাহা দেখিয়া বিচারক পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠিলেন, এবং সম্মুখে একটা দর্পণ থাকিলে তাহাতে নিজমূর্ত্তি দেখিয়া পরেশনাথের উন্মত্ত হইতে বিলম্ব হইত না। তাহার

হৃদয়ের স্পন্দন রহিত হইবার উপক্রম হইল, তাহার চক্ষের আলো নিভিয়া আসিল। মনে হইল, বিশ্বসংসারের সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত সম্পদ, একটা রজ্জুতে বদ্ধ হইয়া নির্ম্মম কঠিন ফাঁসিকাঠে ঝুলিতেছে;—মনে হইল, বহির্জ্জগতের অপরিমেয় বায়ুরাশির সহিত তাহার শ্বাসনালীর সংযোগ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। ভয়ে ও নৈরাশ্যে তাহার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, এবং উন্মত্তের ন্যায় চক্ষু ধক্ ধক্ করিতে লাগিল।

হস্তে পৈতা জড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে হরমোহন বলিল, "ভগবান! আমার নির্দ্দোষ জামাইকে রক্ষা কর, আমার অসহায় কন্যার সহায় হও। এ কথা শুনিলে সেও দড়ীতে ঝুলিবে!"

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। সহসা জনতার মধ্য হইতে ঠেলিয়া ঠুলিয়া আরক্তনয়নে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে হরিদাস বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার সুদীর্ঘ দেহ উত্তেজনায় কম্পিত হইতেছে, মুখে উৎকট চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ় চিহ্ন অঙ্কিত, এবং চক্ষু দুইটা আবেগে ঠিকরিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে।

সে কহিল, "ধর্ম্মাবতার! আপনি বিচার করুন, আমি আর পাপ লুকাইয়া রাখিতে পারিতেছি না; যন্ত্রণায় আমাকে পাগল করিয়া দিবে। এ খুন আমি করিয়াছি। ধর্ম্মাবতার! আর একটা খুনের দায় থেকে আমাকে রক্ষা করুন। পরেশের কোনও দোষ নাই, যাহারা তাহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহারা মিথ্যা বলিয়াছে। এতদিন ভয়ে কিছু বলি নাই—আজ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া সত্য কথা বলিয়া ফেলিলাম—আমাকে দণ্ড দাও, আমার বাঁচিয়া সুখ নাই।"

পরেশের কৌন্সিলি উল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন, "Here is the culprit—the devil!" হরমোহন কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন,—"ভগবান মুখ তুলে চাও!" জজ হরিদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহার প্রমাণ কি?"

ভীষণ মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে ফাঁসিকাঠে ঝুলিতে আসিয়াছে, তাহার আবার প্রমাণের অভাব! সে এমন ভাবে গুছাইয়া বানাইয়া কৌশলে মিথ্যার রাশি বলিয়া গেল যে, তাহার যুক্তি ও সঙ্গতি দেখিয়া জজ তখনই লিখিত রায় কাটিয়া ফেলিলেন, এবং পরেশনাথের পরম শত্রু মিথ্যা সাক্ষিগণ আশঙ্কায় দুর্গানাম স্মরণ করিতে লাগিল। পরেশনাথের

ব্যারিষ্টার রক্তবর্ণনেত্রে গর্জ্জন করিয়া ধমক দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে সত্যটুকু বাহির করিয়া লইলেন। তাহার দ্বারা এই সপ্রমাণ হয় যে, কে খুন করিয়াছে, তাহা তাহারা অবগত নহে; শুধু পরেশনাথের এক পরম শত্রু জমীদার-পুত্রের প্ররোচনায় ও নির্য্যাতনে তাহারা পরেশের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়াছে।

৫

সন্ধ্যাকাল। শুভ্র জ্যোৎস্নায় জেলখানার ফুলের বাগানটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। নীড়ে প্রত্যাগত পক্ষিগণ তখনও তাহাদের ক্ষুদ্র বাসায় রাত্রিযাপনের জন্য সম্পূর্ণ সুবিধা করিয়া লইতে পারে নাই। আম্র-শাখার অন্তরালে তাহাদের পাখার ঝাপট শুনা যাইতেছে। এক ঝাড় কামিনী ফুল ফুটিয়া জেলখানার সমগ্র প্রাঙ্গন গন্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। দূরে আলোকসমুজ্জ্বল দ্বিতলকক্ষে ইংরাজ জেলরের স্ত্রী ও কন্যা পিয়ানো বাজাইয়া গান গাহিতেছে। বন্দীরা সকলেই কারাকক্ষে আশ্রয় লইয়াছে—কেবল হরিদাসকে এক জন প্রহরী ফুলবাগানের এক নির্জ্জন প্রান্তে লইয়া আসিয়াছে।

হরিদাস নীরব, অত্যন্ত উদাসীন। অনন্ত আকাশের নীলিমার দিকে চাহিয়া হরিদাস ভাবিতেছিল, মানুষ মরিয়া কোথায় যায়! এই অনাদি অনন্ত বিশ্বসংসারের কোন প্রান্তে কোন কোণে তাহার বিশ্রাম করিবার অবসর ঘটে! শেষ বিশ্রামের অবকাশ ঘটে! সে বিশ্রাম কত দিন স্থায়ী হয়, কোথায় কবে তাহার শেষ! আবার কি কোনও জগতে তাহাকে জন্ম লইতে হয়! মানুষ যখন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন সে কত মুক্ত, কত সুখী! তার পর যেমন দিন দিন তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, এক একটি করিয়া গ্রন্থি আসিয়া কেমন একটি সম্পূর্ণ জাল তাহার চতুর্দ্দিকে বুনিয়া দিয়া যায়; কোনও দিকে তাহা মুক্ত নহে—একটি সম্পূর্ণ সমগ্র জাল! এই জাল বুনিতে বুনিতেই জীবনের শেষদিন আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন জাল ছিন্ন করিবার পালা। সমগ্র জীবনের গ্রথিত জাল এক মুহূর্ত্তে ছিন্ন করিতে হইবে! জীবনের এ অংশটা এত কঠিন, এত ভয়ানক কেন করেছ, ভগবান্!

এই রাত্রি শেষ হইলেই একটা কঠিন রজ্জুর গ্রন্থির দ্বারা তাহার জীবনের সব গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যাইবে। সেই নির্ম্মম জীবনান্তক গ্রন্থির সাহায্যে কল্য হইতে তাহাকে যে নূতন সূত্র অবলম্বন করিতে হইবে, তাহার আকার

প্রকার, দৈর্ঘ্য, গতি ও গন্তব্য তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আবার কাল প্রভাতে পৃথিবীতে নিত্যকার মত সূর্য্য উঠিবে, নিত্যকার মত জেলখানার বাগানে ফুল ফুটিবে,—নিত্যকার মত বিশ্ববাসীর সমস্ত তুচ্ছ ও মহৎ কার্য্য চলিতে থাকিবে। কেবল তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া চল্লিশ বৎসরের অভ্যস্ত, চিরপরিচিত সূর্য্যালোকিত আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিয়া একটা সংশয়পূর্ণ আশঙ্কাপূর্ণ অন্ধকারের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই দুইটি অতি-পরিচিত ও অতি-অজ্ঞাতের সন্ধিস্থলে কেবল দুইটি তুচ্ছ কাঠ ও একগাছি অকিঞ্চিৎকর রজ্জু! তাহারাই অবলীলাক্রমে এই দুইটা অসামান্য বিপর্য্যয়ের সংযোগ ঘটাইয়া দিবে!

পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রসংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া গেল। এক জন প্রহরীর সহিত পরেশনাথ প্রবেশ করিল। প্রহরী দুই জন কিছু দূরে গিয়া বসিল। পরেশ আসিয়া হরিদাসের পার্শ্বে বসিল। হরিদাস ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন এমন করে তুমি এখানে আসো? কেউ জান্‌তে পারলে আবার যদি কোনও বিপদ হয়। যাও; তুমি বড় ছেলেমানুষ।"

এই আশঙ্কাজনিত স্নেহের ভর্ৎসনায় পরেশের চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। বলিল, "হরি, আমার সমস্ত জীবনটা শূন্য করে' দিয়ে গেলে!"

"উপায় যে ছিল না ভাই, মানুষে কি সহজে প্রাণের মায়া ছাড়ে? কি করব বল, সব ভগবানের ইচ্ছা!"

"তুমি আমার জন্য প্রাণ দিলে হরি, আমি তোমার কিছু করতে পারলাম না! এই রকম করে কি উপকার করতে হয় ভাই? প্রত্যুপকার করবার আর অবসর দিলে না!"

শুনিয়া হরিদাসের গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মনটা মহাশূন্য নীলিমার রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া আবার জালে গ্রন্থি দিতে আরম্ভ করিল। বাল্যকালের কথা মনে পড়িল। তখন জীবনটা কত সুখের, আর পৃথিবী কত সুন্দর মনে হইত! বাপ মা'র মুখ তেমন মনে পড়ে না, কিন্তু যে দিন রায়-পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সেদিকনার কথা বেশ মনে পড়ে। কর্ত্তার পিতার ন্যায় স্নেহ, গৃহিণীর মাতার ন্যায় যত্ন! আহা! তাঁহারা যেন দেবতা ছিলেন! সেদিনকার কথা বেশ মনে পড়ে, যেদিন কর্ত্তা ও গৃহিণীর উদ্যোগে তাহার বিবাহ হইল। কিন্তু কত দিনের জন্যই বা! সে এখন কোথায় আছে, কে জানে! তাহার পর একদিন পরেশ জন্মগ্রহণ করিল—

একটি ফুটফুটে চাঁদ্! তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিল, তাহার আবার একদিন বিবাহ হইল। গৃহিণীর মৃত্যু, তাহার পর কর্ত্তার মৃত্যু। আহা, সেদিন কি দুঃখের দিন! তাহার পর হেমলতার ব্যবহারের কথা মনে পড়িল। সে দিন কি ভয়ানক,—যেদিন সে অপমানে পীড়িত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ অভিমান লইয়া রায়-পরিবার ত্যাগ করিয়া-চলিয়া গেল। কিন্তু মাথার উপর ভগবান আছেন! সেই অন্যায় অপমানের চূড়ান্ত প্রতিশোধ লইবার সুযোগ উপস্থিত হইল! এ লোভ কি সবংরণ করা যায়! হরিদাস সেই অপমানের আজ প্রাণান্তক প্রতিশোধ লইয়াছে। হেমলতার আজ সম্পূর্ণ পরাজয়! আত্মপ্রসাদে হরিদাস সর্ব্বান্তঃকরণে হেমলতাকে ক্ষমা করিল।

"হরি!"

"কি ভাই?"

"একটা কথা বল্‌ব?"

"বল।"

"সে এসেছে।"

"কে, বৌমা?"

"হঁ্যা, সে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে এসেছে।"

হরিদাস জিব কাটিয়া বলিল, "ও কথা বোলো না, পাপ হবে। কিন্তু তাঁকে এখানে এনে ভাল কর নি।"

"তাকে নিয়ে আসব? কোনও ভয় নেই; আমি এদের অনেক ঘুস্ দিয়েছি।"

"অন্যায় করেছ ভাই, তুমি বড় ছেলেমানুষ। বৌমাকে এখানে এনো না, তুমি যাও।"

"তবে তুমি তাকে ক্ষমা করো নি?"

"ভাই! ক্ষমা না করলে কি প্রাণের মায়া ত্যাগ করতাম? তুমি যাও, তাঁকে আমার প্রণাম জানিয়ো।"

দূরে কিসের শব্দ হইল। প্রহরী বলিল, "চলে আও বাবু! চলে আও, সাহেব আতা হ্যায়।"

হরিদাস যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। পরেশ তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, "হরি, ভাই আমাকে ক্ষমা করো———"

"আর জ্বালা দিস নে ভাই, আমি চল্লাম্।"

আর এক দিনের মত হরিদাস আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া গেল।

সে দিন হরিদাস চোর ছিল না, কিন্তু চোরের অপবাদ বহন করিয়াছিল। আজও সে খুনী নয়, কিন্তু আজ সে মিথ্যাবাদী। এ মিথ্যার পুরস্কার বোধ হয় স্বর্গ।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

হিরোডোটস।

গ্রীক ইতিহাসলেখক হিরোডোটস ঐতিহাসিকগণের আদিপুরুষরূপে সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। হিরোডোটস ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঙ্কীর্ণ ও অনিশ্চিত ছিল। তিনি এইমাত্র জানিতেন যে, ভারতবর্ষ পারস্য সাম্রাজ্যের একাংশ; কিন্তু ভারতবর্ষের আকার ও অবস্থান সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। হিরোডোটস খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৮৪ অব্দে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও গ্রীক লেখক সাক্ষাৎভাবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার লিখিত ভারত-বিবরণ অতি সংক্ষিপ্ত ও ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ হইলেও, পাঠকগণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত করিয়া থাকে। আমরা ঐ বিবরণের মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম।

আমরা যত জাতির বিষয় অবগত আছি, তন্মধ্যে ভারতীয়গণ সংখ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। তাহারা পারস্যের রাজাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজকর প্রদান করে। এই রাজকরের বার্ষিক পরিমাণ তিন শত ষাট Talent স্বর্ণরেণু। * পারস্য সাম্রাজ্য বিংশতি ভাগে বিভক্ত; ভারতবর্ষ তাহার বিংশতম ভাগ।

ভারতীয়গণ নিম্নলিখিত প্রণালীতে বহুল স্বর্ণ সংগ্রহ করে। ভারতবর্ষের

---

* This tribute must have been levied mainly from countries situated to the west of the Indus, for it is certain that the Persian Power never extended beyond the Panjab and the lower valley of the Indus. In the time of Alexandar it was bounded by that river—*J. W. Mc. Rindle.*

যে অংশ সূর্য্যোদয়দিগ্বর্ত্তী, তাহা কেবল বালুকাময়। আমরা যে সকল জাতির সহিত পরিচিত, অথবা যে সকল জাতির বিষয় নিশ্চিতভাবে পরিজ্ঞাত, তাহাদের মধ্যে ভারতবাসীই সূর্য্যোদয়ের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করেন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশ বালুকাময় বলিয়া মরুভূমিমাত্র। ভারতবাসী বহু জাতিতে বিভক্ত; তাহাদের সকলের কথিত ভাষাও এক নহে। কোনও কোনও ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রচর; তাহারা 'টোল' ফেলিয়া ভ্রমণ বা বাস করে। কোনও জাতি নদীতটস্থ জলাভূমিতে বাস করে, এবং অপক্ক মৎস্য আহার দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে; এই সকল জাতি 'নল'-নির্ম্মিত নৌকায় আরোহণপূর্ব্বক নদীতে বিচরণ করিয়া মৎস্য ধরে। তাহারা একপ্রকার জলজাত তৃণ 'চুনট' করিয়া অঙ্গরাখা প্রস্তুত করিয়া তাহাই পরিধান করে।

এই জাতির আবাসস্থলের পূর্ব্ব দিকে রাষ্ট্রচর জাতির বাস। ইহারা প্যাদেন নামে পরিচিত। প্যাদেনেরা অসিদ্ধ মাংস ভোজন করে। তাহাদের সমাজে যে সকল রীতি নীতি পরিদৃষ্ট হয়, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি। যদি কোনও পুরুষ রোগগ্রস্ত হয়, তবে তাহার আত্মীয়গণ দীর্ঘকালব্যাপী পীড়ায় মাংস অপচিত হয় বলিয়া, অচিরে তাহাকে হত্যা করিয়া মহাসমারোহে ঐ নরমাংস ভোজন করে। যদি কোনও স্ত্রীলোক পীড়াগ্রস্ত হয়, তবে তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে হত্যা করিয়া সমারোহ-পূর্ব্বক ঐ নারীমাংস ভোজন করে। ইহাদের কেহ বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলে, তাহার হত্যা নিশ্চিত। প্যাদেনগণ বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ হত্যা করিয়া তাহাদের মাংস ভোজন করে। কিন্তু এই জাতির মধ্যে কদাচিৎ কেহ বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কারণ, তৎপূর্ব্বেই প্রায় সকলেই পীড়াগ্রস্ত হয়, এবং যে কেহ পীড়িত হয়, সেই স্বজাতি কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকে। *

ভারতবর্ষে আর একজাতীয় লোক দেখা যায়, তাহারা কোনও প্রাণী হত্যা করে না, কোনও শস্য বপন করে না, বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করে না। তাহারা শাক সবজি আহার করিয়া জীবনধারণ করে; যে

---

* We hear from Duncker that the practice still prevails among the aboriginal races inhabiting the Upper Nerbudda among the recesses of the Vindhyas.—*J. W. Mc. Rindle.*

সকল ধান্য স্বতঃ জন্মে, তাহারা তাহাই সংগ্রহপূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া আহার করিয়া থাকে।

কাস্পাটিরাস নগর (এক জন পণ্ডিত নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কাবুল পুরাকালে কাস্পাটিরাস নামে পরিচিত ছিল। অপর কেহ বলেন,—কাস্পাটিরাস কাশ্মীর।) এবং প্যাকটাইসি দেশের নিকটবর্ত্তী ভারতীয়গণ আচার ব্যবহারে ব্যাকট্রিয় গ্রীক জাতির সদৃশ ছিল। এই সকল ভারতবাসী অন্যান্য স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক সমরপ্রিয়। ইহারাই স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকে; কারণ, ইহাদের বাসস্থানের অদূরেই বালুকাপূর্ণ মরুভূমি। এই মরুভূমিতে বালুকার মধ্যে এক জাতীয় পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পিপীলিকা আকারে কুকুর অপেক্ষা ছোট, কিন্তু শৃগাল অপেক্ষা বড়। পারস্যাধিপতির নিকট এইরূপ কতকগুলি পিপীলিকা আছে, তিনি সেগুলি ভারতবর্ষ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, ঐ সকল পিপীলিকা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বাসস্থান প্রস্তুত করিবার সময় মৃত্তিকা তুলিয়া ফেলে; এই উত্তোলিত বালুকাস্তূপ হইতে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। এই কারণে ভারতীয়গণ ঐ সমুদয় স্বর্ণকণা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে মরুভূমিতে গমন করে। ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে দুইটি উষ্ট্র ও একটি উষ্ট্রী থাকে। অগ্রে ও পশ্চাতে উষ্ট্র গমন করে, মধ্যস্থলে উষ্ট্রীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া স্বর্ণ-সংগ্রহকারী পথ অতিবাহিত করে। এই উষ্ট্রীর সদ্যোজাত শাবকটিকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। উষ্ট্র উষ্ট্রী দ্রুতগমনে অশ্ব অপেক্ষা হীন নহে; কিন্তু ভারবহন কার্য্যে শ্রেষ্ঠতর বলিয়া পরিগণিত।

দিবাভাগের যে সময় সূর্য্যকিরণ খরতর হয়, সেই সময় ভারতীয়গণ স্বর্ণ সংগ্রহ করিবার জন্য মরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সময় বালুকা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় বলিয়া পিপীলিকা সকল ভূগর্ভস্থিত বাসস্থানে লুক্কায়িত হয়। এই দেশে প্রাতঃকালেই সূর্য্যকিরণ খরতর হইয়া থাকে; অন্যান্য দেশের ন্যায় মধ্যাহ্নকালে অধিক প্রখর হয় না। গ্রীস দেশে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের উত্তাপ যে প্রকার তীব্র হয়, এই দেশে সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্যশালাসমূহের ক্রয়-বিক্রয়-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক তীব্র থাকে; এ জন্য ভারতীয়গণ প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর শীতল রাখে। অন্যান্য দেশবাসীরা মধ্যাহ্নকালে যে প্রকার উত্তাপ অনুভব

করে, ভারতীয়গণও তদ্রূপই অনুভব করে। কিন্তু অপরাহ্নকালে সূর্য্যের প্রখরতা কমিয়া যায়; প্রাতঃকালে অন্যান্য দেশে যেরূপ থাকে, সেইরূপ হয়; তার পর দিবা-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য অধিকতর শীতল হইতে থাকে; সূর্য্যাস্তের পর অত্যন্ত শীতলতা অনুভূত হয়।

ভারতীয়গণ মরুক্ষেত্রে উপনীত হইয়া তাড়াতাড়ি স্বর্ণময় বালুকা সংগ্রহ করিয়া, যত শীঘ্র সম্ভব, গৃহাভিমুখে ধাবিত হয়। কারণ, পিপীলিকা-গুলি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঘ্রাণ দ্বারা তাহাদের আগমনসংবাদ জানিতে পারে, এবং তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবন করে। এই সকল পিপীলিকা অতি দ্রুতগামী; কোনও জন্তুই তাহাদের তুল্য দ্রুতগমনে সক্ষম নহে। পিপীলিকাগুলি সংগ্রহকারীদের আগমনসংবাদ জানিতে পারিলেই, তাহাদিগকে ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে এক স্থানে সম্মিলিত হয়। তাহারা সম্মিলিত হইতে হইতে যদি স্বর্ণসংগ্রহকারীরা অনেক দূর অগ্রসর হইতে না পারে, তবে সকলকেই নিহত হইতে হয়। দ্রুতগমনে উষ্ট্র উষ্ট্রী অপেক্ষা হীন। উষ্ট্র সকল কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই, অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে চলিতে আরম্ভ করে; কিন্তু উষ্ট্রী সকল গৃহাবদ্ধ শাবকের মমতায় সমভাবেই চলিতে থাকে। পারসীকগণের মতে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্বর্ণ ই এই প্রণালীতে সংগৃহীত হয়।*

ভূমণ্ডলে যত দূর মানবজাতির বাসস্থল বিদ্যমান আছে, তাহার শেষ অংশে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত জন্মে। আমি ইতিপূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, পূর্ব্ব দিকে ভারতবর্ষই মানব জাতির শেষ বাসস্থল; ভারতবর্ষের পূর্ব্ব

* মেগাস্থিনিস ও নিয়ারকসের গ্রন্থে স্বর্ণপিপীলিকার বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ারকস লিখিয়া গিয়াছেন যে,—তিনি নিজে ভারতবর্ষের এক স্থলে স্বর্ণপিপীলিকার চর্ম্ম দেখিয়া গিয়াছিলেন। আধুনিক পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে,—ইহা গিরিমূষিক বা তৎজাতীয় অন্য কোনও গর্ত্তবাসী জন্তুর চর্ম্ম।

যাহা হউক, অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষীয় স্বর্ণপিপীলিকার প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। অধ্যাপক উইলসন স্বীয় Ariana নামক গ্রন্থে মহাভারত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; এই শ্লোকে পিপীলিকা কর্ত্তৃক সংগৃহীত স্বর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের স্বর্ণপিপীলিকা তিব্বতবাসী স্বর্ণ-খননকারী ভিন্ন আর কিছু নহে। কারণ, মেগাস্থিনিস নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, দেরদাই অর্থাৎ দারদিস্থানের জনসমূহের নিকট হইতে স্বর্ণ নীত হইয়া থাকে।

দিকে আর মানব জাতির বাসস্থল নাই। ভারতবর্ষের পশু পক্ষী অন্যান্য দেশের পশু পক্ষী অপেক্ষা আকারে বৃহৎ; কিন্তু অশ্ব সম্বন্ধে এই নির্দ্দেশ প্রযোজ্য নহে; মিদিক জাতীয় লিসিয়ান অশ্ব ভারতবর্ষীয় অশ্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে পর্য্যাপ্তপরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়। এই স্বর্ণরাশির কিয়দংশ খনি হইতে উত্তোলিত হয়; কিয়দংশ নদীগর্ভ হইতে সংগৃহীত হয়; অবশিষ্ট পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে অর্জ্জিত হয়। ভারতবর্ষের কোনও কোনও বৃক্ষে ফলের পরিবর্ত্তে পশম জন্মে; এই পশম সৌন্দর্য্যে ও গুণে ছাগলের লোম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতীয়গণ এই বৃক্ষজাত পশম (তুলা?) দ্বারা আপনাদের ব্যবহারার্থ বস্ত্র বয়ন করে।

পারস্যাধিপতি দারিয়াসের আদেশ অনুসারে পারসীকগণ এসিয়া মহাদেশের অনেকাংশ অনুসন্ধান করিয়াছিল। সিন্ধুনদ কোন স্থানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তাহা অবগত হইবার জন্য পারস্যাধিপতি অভিলাষী হন। এই জন্য তিনি এক দল বিশ্বাসী অনুসন্ধানকারীকে অর্ণবপোতযোগে প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রেরিত নাবিকগণ কাস্পাইরাস ও প্যাকটাইসি দেশ (বর্ত্তমান পেশোয়ার জেলা) উত্তীর্ণ হইয়া অর্ণবপোতে আরোহণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। তাঁহারা ত্রয়োদশ মাসে একটি প্রসিদ্ধ স্থানে উপনীত হন। এই স্থান হইতে মিশরাধিপতির আদেশে ফিনিসিয়ানগণ লিবিয়ার চতুঃপার্শ্ব পরিভ্রমণের জন্য অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পারসীকগণের সেই ভ্রমণ শেষ হইলে, দারিয়াস ভারতবর্ষীয়দিগকে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি সর্ব্বদা এই সমুদ্রে উপনীত হইতেন।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

৬ই অগ্রহায়ণ।—পঞ্চুরামের জন্য মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। শিশুটি কেমন আছে, কি করিতেছে, তাহাই ভাবিতেছি। আমার বিরহে তাহার শৈশব-হৃদয়ে কোনও প্রকার ক্লেশের উদয় হয় কি না, কে বলিতে পারে? আর হইলেও, সে বোধ হয় তাহার প্রকৃতি বা কারণ আদৌ অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না। শুধু তাহার কিশোর অস্তিত্ব কেমন অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। হয় ত কেবল কাঁদিতে থাকে। পরিজনবর্গ সেই

ক্রন্দনের হেতু নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া বিবিধ বিফল উপায়ে তাহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করেন। আমি যে সর্ব্বদা তাহার নিকটে থাকিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার প্রকৃতির চর্চ্চা করিতে পারিতেছি না, আজ কাল ইহাই আমার প্রধান দুঃখ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিগত রাত্রে একটা স্বপ্ন দেখিয়াছি। পঞ্চুরামের পুরাতন চিকিৎসক কবিরাজ মহাশয় আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে যেন এক নিহত বালিকার চিকিৎসা করিতে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিতে পাইয়া শিশুটির কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, পঞ্চু সম্প্রতি ভাল আছে। তিনি শুনিয়া আর কিছু বলিলেন না। সেই অজ্ঞাতনাম্নী আহত বালিকার প্রতি মনোনিবেশ করিতে গেলেন। উক্ত বাটীতে বাস্তবিক একটি বালিকা-বধূ দেখিয়াছি বটে। কিন্তু তাহার সম্বন্ধে অকস্মাৎ আমার মনের ভিতর এরূপ দুঃস্বপ্নের উদয় কেন হইল, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। আমার জাগ্রত জীবন দুঃখ শোকে পরিপূর্ণ বলিয়া স্বপ্নগুলাও কি এরূপ ভীষণ হইবে? কত আশা করি, তবু একটা সুন্দর স্বপ্ন কখনও দেখিলাম না।

৭ই অগ্রহায়ণ।—পঞ্চুকে দেখিবার জন্য কলিকাতায় আসিলাম। * * * আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি, শিশুটি কোনও কারণে চটিয়া গিয়া কাঁদিতেছিল। আমি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিয়া নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে চুপ করিল, আমার কোলে উঠিল। আমি একটা পুঁতুল লইয়া গিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। আর সকল পদার্থের একমাত্র যে নাম তাহার প্রিয়, সেই "জুজু" বলিয়াই তাহারও নাম-করণ করিল। পঞ্চুর আজকাল ক্রোধটা কিছু বেশী হইয়াছে। কোনও বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় মত কাজ না হইলেই আর রক্ষা নাই। আঁচড়িয়া, কামড়িয়া লোককে অস্থির করিয়া তুলিবে। কিন্তু ঐ দুইটি কার্য্য কেবল তাহার ক্রোধ-প্রকাশেরই উপায় নহে। অনেক সময়ে তাহার আমোদ ও আদরের পরিচয়ও উক্ত দুই প্রকার তীব্র উপায়ের দ্বারাই প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই জন্য তাহাকে কোলে লইয়া সর্ব্বদা সাবধান থাকিতে হয়; কোন্ মুহূর্ত্তে তাহার উল্লাসরাশি মাত্রা অতিক্রম করিয়া উঠিবে, তাহার স্থিরতা নাই। অনেক সময়ে রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া দেয়। আজকাল তাহার এই সব লীলাখেলা দেখিয়া আমার সময়টা বেশ সুখে কাটিয়া যায়। কিন্তু, শিশুটি

সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিতেছে না, দেখিয়া মাঝে মাঝে ভাবনা আসিয়াও উপস্থিত হয়।

৮ই অগ্রহায়ণ।—ডাক্তার বাবু শিশুটিকে দেখিলেন। * * * অগ্রহায়ণের "সাহিত্যে" প্রকাশিত "চৈতন্যের দেহত্যাগ" কবিতার অনেকেই প্রশংসা করিতেছেন শুনিয়া প্রীত হইয়াছি। সু—চন্দ্র নাম প্রকাশ না করিয়া একটা রহস্যের অবকাশ করিয়া দিয়াছেন। কেহ কেহ সম্পাদক মহাশয়কেই উহার রচয়িতা বলিয়া অনুমান করিতেছেন। শুনিলাম, স্কুলপাঠ্য-রচনাকারী কোনও ব্যক্তি তাঁহার এক সংগ্রহ-পুস্তকে কবিতাটিকে স্থান দিবার মানস করিয়া সু—চন্দ্রের নিকট লেখকের নাম জানিতে চাহিয়াছেন। কবিতাটি বালকদিগের আয়ত্তাধীন হইবে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। অধুনা বাঙ্গালার স্কুলসমূহে সচরাচর যে সকল সংগ্রহ-পুস্তকের অধ্যাপনা হইয়া থাকে, তাহাতে সংগ্রহকারিগণ কবিত্বের দিকে সর্ব্বদা তেমন মনোযোগী, হন না। যাহাতে প্রকাশ্যরূপে কোনও নীতি-উপদেশের প্রসঙ্গ নাই, এরূপ কবিতা সংগ্রহে প্রায়শঃ স্থান পায় না। সৌন্দর্য্যের আরাধনাই যে মানব-হৃদয়ের একটা গভীরতম নীতি, সকল সংগ্রহ-কার তাহা বুঝেন না। তবে নব্য সম্প্রদায়ের এ দিকে একটুকু দৃষ্টি পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মাঝে মাঝে কোনও কোনও পুস্তকে বর্ত্তমান গীতিকবিকুলের অগ্রগণ্য রবীন্দ্রনাথের এক আধটা কবিতা দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

* * * *

৯ই অগ্রহায়ণ।—সন্ধ্যার সময় সু—বাবুর সহিত সাক্ষাৎ। কিয়ৎকাল পরে "ভারতী"র ভ্রমণকারী জলধর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন তিনিও "সাহিত্যে"র ঘরের লোক হইয়া পড়িয়াছেন। সাহিত্য-সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে আরও আত্মীয় করিয়া লইয়া বোধ হয় একচেটিয়া করিবার অভিপ্রায়ে ফিরিতেছেন। কিন্তু সোমরাজের সর্ব্বদা উচ্চারিত শ্লোকটার প্রতি তাঁহার একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত,—

"সখি, জলধরে ধরিব কেমনে ?"

ও দিকে আবার রবীন্দ্রনাথ নূতন কাগজের ফাঁদ পাতিয়া জলধরকে ধরিবার চেষ্টায় আছেন। শেষে হয় ত তাঁহাকেও বলিতে হইবে,—

"সখি, জলধরে ধরিব কেমনে ?"

তা, জলধরের সহিত সম্পর্ক কেবল ত বৃষ্টির! সে বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত।

যেখানে যান, সেইখানেই বর্ষণ করেন। জলধরে জলের কখনও অভাব হয় না। আমাদের জলধর বাবুও যে প্রবন্ধরূপ বারিবর্ষণে কখনও কাহারও প্রতি কার্পণ্য প্রকাশ করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। ভ্রমণেই ত তাঁহারও বর্ষণ।

১০ই অগ্রহায়ণ।—সাবিত্রী লাইব্রেরীর সভায় বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা শুনিলাম। বক্তৃতার বিষয়,—"বাঙ্গালীর অভাব ও অবস্থা"। হীরেন্দ্রনাথ সবিশেষ পরিশ্রম সহকারে প্রবন্ধটি প্রস্তুত করিয়াছেন। রচনাটি বেশ হইয়াছে। কোনও একটা বিষয়কে রীতিমত পাকড়াও করিয়া সকল দিক ও সকল বিভাগ হইতে তাহার আলোচনা করিবার বন্ধুবরের বেশ ক্ষমতা আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নূতন কথা তেমন কিছুই নাই বটে; কিন্তু, তথাপি রচনার গুণেই মুগ্ধ হইয়া শ্রোতৃবর্গ বেশ মনোযোগের সহিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। দুই এক স্থলে দুই একটি উপমা বেশ সুপ্রযুক্ত হইয়াছে। Perorationএর অংশটি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। একটা বিষয়ে বক্তৃতা-টির অসম্পূর্ণতা দেখিয়া অনেকেই দুঃখ করিলেন। হীরেন্দ্রবাবু বাঙ্গালীর অভাবের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা অতি যথাযথ হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সেই সব অভাবমোচনের কোনও উপায় আছে কি না, তদ্বিষয়ে আদৌ কোনও প্রসঙ্গ করেন নাই। তিনি কেবল ভগবানের উপর নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ভগবৎ-বিধানে ভক্তি অচলা। এমন কি, বাঙ্গালী জাতির উচ্ছেদই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহাতেও তিনি কাতর নহেন। আমার বোধ হয়, যাঁহার মনে এরূপ ভাব বর্ত্তমান, এ সব বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা করিবারও তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি হাত পা গুটাইয়া, চক্ষু মুদিয়া, বসিয়া থাকুন। ভগবানের কাজ ভগবান করিবেন।

১১ই অগ্রহায়ণ।—১২৯৪ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখের "প্রয়াণ" নামক একটা কবিতা সংশোধন করিয়া, হারাণ বাবুর অনুরোধে, তাঁহার নিকট পাঠাইলাম। কবিতাটি এইখানেই নকল করিয়া রাখিলাম।

১

আর কেন বসিয়া হেথায়?
সৌন্দর্য্যের সন্ধ্যা তুই,
সাথে ক'রে নিয়ে এলি
শত তারা, শত চাঁদ, দীপ্ত জোছনায়;

যদি রে প্রভাত-কালে
সবই তারা গেল চ'লে,
শূন্য হৃদি, ভগ্ন বুক, শুষ্ক-শীর্ণ কায়,
আর কেন বসিয়া হেথায় ?

২

সুদূর সমুদ্র আশে ছুটিলি তটিনী তুই,
দীর্ঘ এক সূত্রসম সরল যে শিশুপ্রাণে
আসিলি টানিয়া,
অকস্মাৎ গেল সে ছিঁড়িয়া !
তপ্ত বালুরাশি মাঝে
একবিন্দু অশ্রু তোর গেল শুকাইয়া !
তাই বলি, তাই বলি, হায়,
বৃথা কেন বসিয়া হেথায় ?

৩

যতনে জীবন সঁপি'
গঠিলি কবিতা-গৃহ,
প্রচণ্ড প্রলয়-ঝড়ে চূড়া তার পড়িল ভাঙ্গিয়া ;
কল্পনা-কুসুম-রাশি
মাটীতে মিশিল আসি',
কাল-নিশি আইল ঘনিয়া !
সহস্র গৃহের মাঝে গৃহহীন কবি তুই,
সারাজন্ম কাঁদিবি কি, হায় ?
মিছে কেন বসিয়া হেথায় ?

৪

সেথায় ডাকিছে তোরে,
নিতান্ত কাঙ্গাল তুই,
ভালবেসে কেউ তোরে ডাকে না হেথায়,
তাই মৃত্যু ডাকিছে সেথায় !
স্মৃতির শ্মশানে যার
জলন্ত যাতনা-ভার,

কোথা সে পাইবে আর শান্তি-সোম-সুধা
বিনা সেই চরণের ছায় ?—
আর কেন বসিয়া হেথায় ?

১২ই অগ্রহায়ণ।—ইংলণ্ডের চিন্তা-রাজ্যে যুগান্তরের প্রবর্ত্তয়িতা জন্ ষ্টুয়ার্টমিল্ কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের এক জন পরমভক্ত ছিলেন। কেবল ভক্তি নহে, তিনি কবির গ্রন্থাবলীপাঠে যে মহদুপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য চিরজীবন সহস্র পরিহাসের মধ্যেও তাঁহার প্রতি অবিচল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। নিরবচ্ছিন্ন শুষ্ক চিন্তাবশে মিলের হৃদয়দেশ নিতান্ত পাষাণবৎ কঠোর হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কোমলতর বৃত্তি সমুদয় এক প্রকার সমূলে লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই অবস্থায় এক দিবস তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার জীবন স্নেহ, প্রেম, করুণা ও সৌন্দর্য্যের পবিত্র স্নিগ্ধ সলিলে সিক্ত হইয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, হৃদয়-বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ অনুশীলন না করিয়া তিনি এতকাল প্রকৃত ও পূর্ণতম মনুষ্যত্বের পন্থা হইতে আপনাকে বিচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বুঝিলেন, মানসবৃত্তি সমুদয়ের ন্যায় অপরাপর বৃত্তিগুলির পর্য্যালোচনা ও পরিপুষ্টি-সাধন করাও মনুষ্যজীবনের অবশ্যকর্ত্তব্য। তাঁহার এই মহাশিক্ষার মূলীভূত হেতু, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতা। কবির কাব্যনিচয় এইরূপে আর কত লোকের হৃদয় সরস করিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতিচর্চ্চা ও প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে ? বাস্তবিক, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের কবিতা অনেক সময়েই এই বিষাদকণ্টকাকীর্ণ জগতে আমাদের আত্মার অতিদৃঢ় অবলম্বনস্বরূপ। তিনি প্রকৃতিকে যে ভাবে দেখিতেন, সে ভাবে চিন্তা করিতেন, তাহাতে অনুপ্রাণিত হইতে পারিলে আমাদের অনেক ব্যাধি সহজেই শমিত হইয়া যায়। বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হইয়াও তিনি বলিতেন,—

"Such sights as these before me now
Not without hope we suffer or mourn."

এই বিশ্বাস কি জগতের অসামান্য মঙ্গলকর নহে ?—

১৩ই অগ্রহায়ণ।—আজ কলিকাতায় আসিয়া পঙ্কুরামকে দেখিলাম। * * * শিশুটি আজ কাল দিনে দিনে বেশ সুস্থ ও

প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। শিশুটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিলক্ষণ সুস্থ দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। সে প্রত্যহই এক একটা নূতন কথা শিখিতেছে। কুকুরকে "কু" বলে। "জল", "ঝি", "চা", "হাম্" প্রভৃতি কথা সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। কাগজ বা পুস্তক হাতে পাইলেই "ক, খ" বলিয়া উঠে। এখনও কিন্তু তাহার পা হইল না। বোধ হয়, অসুখ না হইলে এত দিনে চলিতে পারিত। আমাকে পান খাওয়াইয়া দেওয়া তাহার একটা আনন্দ।

শিশুটিকে লইয়া দিনগুলা একপ্রকার বেশ কাটিয়া যাইতেছে। অর্থাভাব জন্য মাঝে মাঝে একটু বিব্রত হইতে হয় বটে, কিন্তু অর্থচিন্তা আমাকে কখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। সে বিষয়ে আগ্রহ বা যত্ন থাকিলে এত দিনে এখনকার অপেক্ষা যে বেশী কিছু ঘরে আনিতে পারিতাম, তাহাতে সন্দেহ নাই। সে সব চিন্তা আদৌ নাই। এখন কিসে আত্মজয় করিতে পারি,—এই ভাবনাই মনের ভিতর বিশেষরূপে জাগিতেছে। প্রবৃত্তিমার্গে প্রবেশ রীতিমত যদি করিতে পারিলাম না, তবে একবার নিবৃত্তিমার্গটা চেষ্টা করিয়া দেখিবার বড় বাসনা হয়। কিন্তু মন বড় চঞ্চল; রিপু সমুদয় এখনও সাতিশয় প্রবল। কোনও বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

১৪ই অগ্রহায়ণ।—সেপ্টেম্বর-সংখ্যা "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে রবীন্দ্রনাথের "সোনার তরীর" একটি সংক্ষিপ্ত সমালোচনা বাহির হইয়াছে। গীতি-কবিতাবলীর সমালোচন উপলক্ষে লেখক আক্ষেপ করিয়াছেন যে, আজ কাল যে কেহ চতুর্দ্দশ অক্ষর মিলাইয়া, গোটাকতক মিল যোগাড় করিয়া, কয়েকটী পাতা পূর্ণ করিতে পারিতেছে, সেই উহাদিগকে ছাপাইয়া নিরীহ বাঙ্গালী পাঠকদিগের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতেছে। রচনার উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি নাই, বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা বা গাম্ভীর্য্যের প্রতি লক্ষ্য নাই, কেবল কতকগুলা প্রলাপের উদ্গিরণ করিতে পারিলেই অনেকে আপনাদিগকে গ্রন্থকারশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেছেন। ইহা নিতান্ত হীনতার পরিচায়ক। যাঁহার মনে বাস্তবিক কোনও কথা বলিবার নাই, তিনি কিসের জন্য লোকসমক্ষে দাঁড়াইয়া উঠেন, তাহা বলা যায় না। "রিভিউ"র সমালোচক রবীন্দ্র বাবুর বিষয়-নির্ব্বাচনের উপর বিশেষ দোষারোপ করিয়াছেন। তাঁহার কলম দিয়া যাহা নির্গত হয়, তিনি তাহাই মুদ্রিত করেন; রচনার

গাম্ভীর্য্যের ও স্থায়িত্বের প্রতি অনেক সময় আদৌ লক্ষ্য করেন না, এই কথা আমি ইতিপূর্ব্বে এই ডায়রীতে লিখিয়াছি। ইহা যে তাঁহার একটা বিশেষ দোষ, সে কথা তিনি বোধ হয় নিজেই ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত গীতিকবিতাবলীর সংশোধন, সংস্কার ও পরিবর্জ্জন ইহার প্রমাণ। তবে "রিভিউ"র সমালোচক "সোনার তরী"র শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির কোনও উল্লেখ করেন নাই দেখিয়া দুঃখিত হইলাম। তিনি কি আগাগোড়া না দেখিয়াই সমালোচনকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন? ভাল কবিতাগুলি পাঠ করিলে, তিনি উহাদের বিষয়ে কখনই নীরব হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

১৫ই অগ্রহায়ণ।—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী-সংখ্যা Westminister Review পত্রে টেইন সাহেব কৃত "ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস" সমালোচন উপলক্ষে "রিভিউ"র সমালোচক কয়েকটি বেশ সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। ফরাসী লেখক টেইন বলেন, ইংরাজ নবেলিষ্টদিগের অপেক্ষা ফরাসী নবেলিষ্টগণ অধিকতর artistic; কারণ, তাঁহারা সত্যের স্বরূপ বর্ণনা করেন; কোনও বিষয় গোপন করেন না, বা ঢাকিয়া রাখেন না। Thakeray বা Dickensএর অপেক্ষা Balzac বা George Sand এ হিসাবে অধিকতর শিল্পকুশলী। এই কথার জবাব দিতে গিয়া "রিভিউ"র সমালোচক বলিতেছেন,—

"Granting that an artist, with pen or pencil, should always aim at being truthful, it does not follow that he is bound to depict the Goddess of truth in a state of nakedness, and making a parade of her condition. There are certain states of feeling and events of life about which an artist should be reticent, certain acts are natural, but are none the less disgusting. That they are incident to humanity is no reason for discribing them. If an artist sometimes drape Truth, he will act like Nature. John Bell, the eminent surgeon, very happily remarked, far from exposing naked, knotty bones, nature has been indulgent to our finer feelings * * * A true artist should omit from his picture those paints which would

shock without improving a rightly organised mind. No man who is responsible for his actions would commit to paper and publish every one of his daily thoughts. Rousseau has written the most detailed of autobiographies. Yet even his "Confessions" are in many respects incomplete. What a man would not venture to do when telling his own story, he should refrain from doing when telling the stories of others" ফরাসী নবেল ফরাসী পাঠকেরই প্রিয়, ইংরাজী নবেল ইংরাজী পাঠকেরই উপযোগী, কিন্তু যিনি সমগ্র জগতের উপযোগী উপন্যাস লিখিতে চান, তাঁহাকে উভয় দলের গুণরাশির সমন্বয় করিতে হইবে।

আক্‌বর ও এলিজাবেথ।

আক্‌বর ও এলিজাবেথ, উভয়ে কতটুকু সৌসাদৃশ্য বা বৈসদৃশ্য আছে, তাহাই এই প্রবন্ধে দেখাইতে প্রয়াস পাইব। বাস্তবিক একটু ধীরভাবে অনুশীলন করিলে এই দুই সমসাময়িক মহৎচরিত্রের কার্য্যকলাপে বিশেষ ঐক্য আছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতির সহিত ইংলণ্ডের এক জন শ্রেষ্ঠা রাজ্ঞীর কোন কোন বিষয়ে কার্য্যের সমতা ও বৈষম্য ছিল, তাহা জানিবার জন্য মন স্বতঃই উৎসুক হয়। আমরা এই প্রবন্ধে উভয়ের কিরূপ শাসননীতি ছিল, তাহারই প্রধানতঃ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব, এবং পরিশেষে ব্যক্তিগতভাবে উভয়ের তুলনা করিব।

প্রথমে শাসনপ্রণালী লইয়া বিচার করিলে আমরা লক্ষ্য করি যে, উভয়েই যেন একই উদ্দেশ্যে চালিত হইয়াছিলেন। কি প্রকারে বিভিন্ন সম্প্রদায়-গুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করিতে পারা যায় ও কিরূপে জাতীয় বিরোধ-গুলির সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত শক্তির সৃষ্টি দ্বারা দেশকে বহিঃ ও অন্তঃ শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহাই উভয়ের লক্ষ্য হইয়াছিল। এইখানেই প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়। কোনও জাতির নেতা হইবার অভিপ্রায় থাকিলে যে নিরপেক্ষতা, দূরদর্শিতা ও প্রভূত বিচারনিপুণতা দেখাইতে হয়, উভয় রাজনীতিকই সেই গুণে বঞ্চিত ছিলেন না। এলিজাবেথ ও আক্‌বর উভয়ের মধ্যে কেহই কোনও সম্প্রদায়বিশেষের

প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই। এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন আকবর এ বিষয়ে যত দূর নিরপেক্ষ ছিলেন, এলিজাবেথ তত দূর উদারতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

উভয়ে অতিসঙ্কটময় সময়ে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়ের শাসনের প্রারম্ভেই বিপ্লব। এলিজাবেথকে ধর্ম্মগত বিপ্লবের সহিত ও আকবরকে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। উভয়েই ধীর ও অবিচলিতচিত্তে বিপদের সম্মুখীন হইয়া রাজ্যমধ্যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন Catholic ও Protestantদিগের ধর্ম্মগত তুমুল বিবাদ চলিতেছে। Maryর অত্যাচারের পর হইতেই Protestantগণও Catholicদিগের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হইয়াছিল। আকবর যখন শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন, তখন ধর্ম্মগত বৈষম্যের জন্য তাঁহাকে চিন্তিত হইতে হয় নাই। এলিজাবেথ তাঁহার রাজত্বের প্রাক্কালে সিংহাসনরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হন নাই। প্রজাবর্গ তাঁহাকে তাঁহার পৈতৃক আসনে সমাদরে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আকবরের সিংহাসন পৈত্রিক হইলেও অতিশয় কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই বালককে স্বকীয় বাহুবলে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইতে হইয়াছিল।

এখানে আমরা যেন আকবরের কার্য্যের গুরুত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত না হই। আকবরের প্রথম চেষ্টা শত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা ; এলিজাবেথের প্রথম যত্ন ধর্ম্মের ঐক্যসম্পাদন। দুই জনের কার্য্য বিভিন্ন প্রকারের হইলেও, অত্যন্ত দুরূহ ছিল। স্বীকার করি যে, বায়রাম খাঁর সাহায্য না পাইলে আকবর সিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিতেন না। কিন্তু অষ্টাদশবর্ষমাত্র বয়সে যখন আকবর তাঁহার বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে দমন করিতেছিলেন, তখন ত বায়রাম তাঁহার পার্শ্বে ছিলেন না। এমন কি, প্রতাপান্বিত বায়রাম খাঁ বিদ্রোহে নিষ্ফল হইয়া আকবরের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এলিজাবেথও এক অভিনব Protestant ধর্ম্মের প্রকাশ দ্বারা যেরূপে Catholic ও Protestantদিগের তীব্র শত্রুতা দমন করেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রশংসা না করিলে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হইব। সমুদ্রে ঝড় উঠিবার সময় কর্ণধার বিচলিত হইলে যেমন অর্ণবপোতের রক্ষা অসম্ভব, সেইরূপ রাজ্যমধ্যে অশান্তির ঝড় উঠিলে রাজার চিত্ত যদি অধীর হয়, তাহা

হইলে দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি ভিন্ন শান্তিস্থাপনও অসম্ভব। যখন দেশে রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টদিগের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা ও বিদ্বেষের বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া দেশকে ছারখার করিতে উদ্যত, তখন এলিজাবেথ্ নারী হইয়াও সমস্ত চপলতা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র স্থিরবুদ্ধির সাহায্যে দেশের সমস্ত অশান্তির দমন করিয়াছিলেন। এলিজাবেথ্ শুধু একটু ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধির প্রচার করিয়াই এই বিরোধ দমন করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদারমত অবলম্বন করিয়া উভয়েই রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আকবরের সামর্থ্য অসীম হইলেও যে অজেয় নহে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট্ আকবর দেখিলেন যে, প্রকৃতপক্ষে মোগলবংশকে ভারতে বদ্ধমূল করিবার বাসনা করিলে, জেতা ও বিজিতের প্রভেদ দূরীভূত করিতে হইবে। মুষ্টিমেয় মুসলমান যদি বহুকোটী হিন্দুর ধর্ম্ম আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা যে অচিরাৎ দেশ হইতে বিতাড়িত হইবে, ইহা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। যাহাতে হিন্দুওমুসলমানের রক্তের সংমিশ্রণে জাতিগত ও ধর্ম্মগত বিবাদের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত তিরোহিত হয়, সে বিষয়েও আকবরের প্রখর দৃষ্টি ছিল। দুইটি বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে এক জাতিতে পর্য্যবসিত করিতে হইলে, উভয় পক্ষকেই তুল্যরূপে দেখিতে হয়। এই সত্যটি দুই জনেই সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মান্ধ হইলে রাজ্যে একতা অসম্ভব। বলপ্রকাশ করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে যাইলে নিষ্ফলতা অবশ্যম্ভাবিনী। তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মেরী ও আওরঙ্গজেব। আকবর ও এলিজাবেথ উভয়েই দেখিলেন যে, সকল সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতে অক্ষম হইলে, জাতীয় ঐক্যের আশা বাতুলতামাত্র। আকবর নিজে হিন্দু বা খাঁটী মুসললান ছিলেন না; এলিজাবেথ্ও খাঁটী catholic বা protestant ছিলেন না। আকবর মুসলমান হইলেও, তিনি মুসলমানধর্ম্মের অনেক বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। Elphinstone বলেন, "His fundamental doctrine was that there were no prophets" এলিজাবেথ protestant হইলেও, কতকগুলি বিষয়ে ক্যাথলিকদিগের সহিত একমত ছিলেন। তিনি কৃতদার যাজকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এমন কি, তিনি Mrs Parkerকে archbishopএর ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রটেষ্টাণ্ট্‌দিগের আপত্তিকর খৃষ্ট ও খৃষ্টভক্তদিগের আলেখ্য ও প্রতিমূর্ত্তি রাখিতে ভালবাসিতেন।

আক্‌বরের ন্যায় এলিজাবেথেরও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা ছিল। উভয়েই জানিতেন যে, কঠোরতার একটা সীমা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আক্‌বরের অন্তিম দশায় বিদ্রোহী পুত্র সেলিমের প্রতি আচরণ ও এলিজাবেথের জাতির বিরক্তিকর monopolyর উচ্ছেদসাধনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গায়ে হাত বুলাইয়া যত কাজ হয়, কঠোর অত্যাচারেও তত হয় না, এ সরল সত্য আমরা সকলে বুঝিলেও, সময়ে ব্যবহার করিতে পারি না। দূরদর্শিনী প্রতিভা যথাসময়ে তাহার প্রয়োগ করিতে পারে; তাহাতে প্রতিভার বিশেষত্ব দিব্যালোকে ফুটিয়া উঠে। সেলিমের ব্যবহার এত অশিষ্ট হইয়াছিল যে, অন্য কোনও সম্রাট্ হইলে তাঁহাকে রাজমুকুট হইতে বঞ্চিত করিতেন। সেলিম নিজে সম্রাট্ হইয়া আপন পুত্র খস্‌রুকে ঠিক্ এই অপরাধের জন্যই কিরূপ কঠোর শাস্তি দিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। আক্‌বর সেলিমকে উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহার দাক্ষিণাত্যে অভিযান করিবার পর-মুহূর্ত্তেই সেলিম স্বীয় কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া আগ্রা আক্রমণ করিবার মানসে অগ্রসর হইলেন। তথায় বিফলমনোরথ হইয়া তিনি এলাহাবাদের রাজকোষ লুণ্ঠন করিলেন, এবং আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার নিষ্ঠুর প্রকৃতি ও কোপনস্বভাবে আক্‌বরের মনোবেদনার সীমা ছিল না। এত দোষ সত্ত্বেও আক্‌বর সেলিমকে শাস্তি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন নাই। আক্‌বর জানিতেন যে, তাঁহার রাজ্যে বহুকষ্টে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; লাঞ্ছিত পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্যমধ্যে তুমুল বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া, ছিন্ন-ভিন্ন মোগল-সাম্রাজ্যটিকে শত্রুর হাতে তুলিয়া দিবে, ইহা দূরদর্শী সম্রাট্ আক্‌বরের বুদ্ধির অগম্য হয় নাই। অমাত্যগণ আক্‌বরকে সেলিমের দুর্ব্যবহারে ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ দেখিয়া সেলিমের পুত্র ও রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় খসরুকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিবার জন্য পরামর্শ দিতেছিলেন। বৃদ্ধ নরপতি দেখিলেন যে, পুত্রকে শাস্তি দিলে তাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার বহ্নি আরও তীব্রভাবে জ্বলিতে থাকিবে। দীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দীর কঠোর পরিশ্রমার্জ্জিত রত্নটি সামান্য সতর্কতার অভাবে বুঝি বা অপহৃত হয়! শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার পুত্রের প্রতি অবিচলিত স্নেহ ও মমতা সেলিমের কঠোর হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিয়াছিল।

এলিজাবেথও monopolyর লোপসাধন করিয়া যথেষ্ট সদ্বিবেচনা ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তৎকালে ইংলণ্ডে রাজপ্রসাদপ্রাপ্ত

কতিপয় ব্যক্তি বস্তুবিশেষের একচেটিয়া বিক্রয়াধিকার প্রাপ্ত হইত। ইহাতে দ্রব্যের মূল্য মহার্ঘ্য হওয়াতে জনসাধারণের বড় আর্থিক ক্ষতি হইত; ১৬০১ খৃষ্টাব্দে House of Commons monopolyর বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ আবেদন প্রেরণ করেন। এলিজাবেথ প্রায় কখনও Parliamentএর মতানুসারে কার্য্য করিতেন না। কিন্তু তিনি এবারে সভ্যগণের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা দেখিয়া বুঝিলেন যে, মহাসভার আবেদন অগ্রাহ্য করিলে রাজ্যমধ্যে মহা অশান্তি ও অরাজকতার সৃষ্টি হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ monopoly উঠাইয়া দিলেন, এবং commons সভার সভ্যদিগকে তাঁহাদের আন্দোলনের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আপনার লোকপ্রিয়তা আরও বর্দ্ধিত করিলেন।

আরও কয়েকটি বিষয়ে আমরা এলিজাবেথের সহিত আকৃবরের কার্য্যের ঐক্য দেখাইব। প্রজারঞ্জন ও প্রজার কল্যাণকামনা যে রাজার প্রধান কর্ত্তব্য, তাহা উভয়ের মনেই সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। এলিজাবেথের সহস্র ত্রুটীও ছিল; কিন্তু তিনি প্রজার মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত ও নিঃস্বার্থ পরিশ্রম করিতেন। আকৃবরও প্রজাহিতকর কার্য্যে এরূপ ব্যাপৃত থাকিতেন যে, ২।৩ ঘটিকার অধিক তিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিবার অবসর পাইতেন না। স্বীকার করি যে, আকৃবরের সংস্কার এলিজাবেথের অপেক্ষা মহত্তর ও গুরুতর; কিন্তু এলিজাবেথ স্ত্রীলোক হইয়াও যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেন, এ কথাটি যেন আমরা স্মরণ রাখি। একটি কারণে এলিজাবেথকে আকৃবরের উচ্চে স্থান দেওয়া যায়। তিনি ইংলণ্ডের কল্যাণার্থ সাংসারিক সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। এলিজাবেথের ব্যক্তিগত ভাবে বিবাহ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, রাজনীতিক কারণবশতঃ তিনি সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এলিজাবেথ দেখিলেন যে, ক্যাথলিক বা প্রটেষ্টাণ্টের মধ্যে কাহাকেও মাল্যপ্রদান করিলে, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার নিরপেক্ষতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে; সামান্যমাত্র কারণেই ইংলণ্ড পুনরায় ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্টের রক্তে প্লাবিত হইতে পারে। এমন কি, ঘটনাচক্রে তিনি যখন বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্পা, তখনও তিনি স্বেচ্ছানুসারে আপনার মনোনীত ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করিতে পারিলেন না। এলিজাবেথ যদি ইংলণ্ডের সম্রাজ্ঞী না হইয়া এক জন সাধারণ ভদ্রমহিলা হইতেন, তাহা হইলে তিনি Earl of Leicesterকে বিবাহ করিলে সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সম্রাজ্ঞী হইলেও সামান্যা

রমণীর অধিকার হইতেও বঞ্চিতা। প্রবল স্পেন যখন বিষদৃষ্টি-নিক্ষেপে ক্ষুদ্র ইংলণ্ডকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছিল, তখন এই বুদ্ধিমতী রমণী ফ্রান্সের সহিত মৈত্রীকরণই স্পেনের লোলুপদৃষ্টির একমাত্র মহৌষধ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তখন তিনি পঞ্চাশদ্বর্ষীয়া হইলেও, তাঁহা অপেক্ষা একবিংশ বৎসরের কনিষ্ঠ ফ্রান্স-রাজভ্রাতা কুচরিত্র Duke of Alenconএর সহিত পরিণীতা হইবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার দেশের প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের সম্মান আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তাঁর স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে Invincible Armadaর বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছিল।

এইবার আমরা কয়েকটি বিষয়ে উভয় নরপতির পার্থক্য দেখাইবার চেষ্টা করিব। আক্‌বর কখনও জটিল পথ অবলম্বন করিতেন না। ইহার প্রধান কারণ, আকবর সবল ও এলিজাবেথ দুর্ব্বল। আরও বলি, আকবর পুরুষ ও এলিজাবেথ নারী। এলিজাবেথের রাজত্বের প্রাক্কালে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও স্পেনের তুলনায় নগণ্য ছিল। আক্‌বরও যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন তাঁহার রাজ্যও দুর্ব্বল।

উভয়ে একই মূলধন লইয়া রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু আক্‌বর এক জন মহাপুরুষ; অল্পদিনেই বুদ্ধি ও বীর্য্যবলে তিনি পরাক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। অতএব তিনি সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া শঠতা বা প্রবঞ্চনার আশ্রয়ে কোনও কার্য্য করেন নাই। এলিজাবেথ আক্‌বরের ন্যায় প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন নাই; তবে তাঁহার যতটুকু প্রতিভা ছিল, তাহার পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যয় করিয়াছিলেন। এলিজাবেথের সময়ে ইউরোপে যে সকল প্রবল রাজ্য ছিল, ইংলণ্ড তাহাদিগকে শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুতরাং বাধ্য হইয়া, রাজ্যরক্ষার্থ এলিজাবেথকে শঠতা ও চাতুরীর জাল বিস্তার করিতে হইত। আক্‌বর কখনও প্রতারণা বা শঠতার সাহায্যে সাম্রাজ্য-বিস্তার বা অন্য কোনও কার্য্যই করেন নাই। এলিজাবেথ প্রায় প্রত্যেক কার্য্যে দ্ব্যর্থসূচক ও অকিঞ্চিৎকর বাক্য ব্যবহার করিয়া বিপক্ষকে প্রকাশ্য শত্রুতার অবসর দিতেন না। আমরা সংক্ষেপে ইহার দুই একটি দৃষ্টান্ত দিয়া নিরস্ত হইব। স্পেন-সম্রাট্ Philip যখন এলিজাবেথকে তাঁহার বন্ধুদিগের নামোল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি কাহাকে পতিত্বে বরণ করিবে,

তখন এলিজাবেথ অত্যন্ত সবিনয়ে উত্তর দিতেন, কখনও বা মৌন থাকিতেন। স্পেনপোত-লুণ্ঠন দেখিয়া ক্রুদ্ধ ফিলিপ যখন তাঁহাকে Hawkins, Crake প্রভৃতি নাবিকগণকে শাস্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিতেন, তখন এলিজাবেথ মিষ্টকথায় ফিলিপকে তুষ্ট করিয়া গোপনে লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশ লইয়া প্রকারান্তরে লুণ্ঠনক্রিয়ায় উৎসাহ দান করিতেন।

এলিজাবেথের হৃদয় আকবরের ন্যায় উদার ছিল না। আকবর তাঁহার শত্রুকে অকপট-হৃদয়ে মার্জ্জনা করিতেন। এলিজাবেথের এ গুণ ছিল না। আকবরের উদারতা প্রকৃতিগত ছিল। ত্রয়োদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যখন বায়রাম বন্দী হিমুর শিরশ্ছেদ করিবার জন্য আকবরের হস্তে তরবারি দিতেছিলেন, এবং তাঁহাকে 'গাজী' হইতে প্রলুব্ধ করিতেছিলেন, তখনও বালকের হৃদয় অবিকৃত ছিল। বিদ্রোহী ও পরাজিত হিমুর প্রতি আকবরের উদারভাব কি প্রশংসনীয় নহে?

এলিজাবেথের মন আকবরের ন্যায় উন্মুক্ত ও সরল ছিল না, বরং অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল। এলিজাবেথ নিজে চিরকৌমার্য্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সকল আত্মীয়াকেই স্বদলভুক্ত করিবার অভিলাষিণী ছিলেন। Catharine Grey নাম্নী তাঁহার এক আত্মীয়া এলিজাবেথের মত না লইয়া বিবাহ করাতে কারাগারে প্রেরিত হইয়াছিলেন। কোনও রাজনীতিক কারণে ক্যাথারিণ গ্রে কারাবদ্ধ হন নাই। আমি ঐতিহাসিক Gardinerএর মত উদ্ধৃত করিতেছি।—

"Her treatment of the Lady Catharine was doubtless caused far less by her fear of the claims of the Suffolk line than by her reluctance to think of one so near to her as a happy wife, and as years grew upon her she bore hardly on those around her who refused to live in that state of maiden-hood which she had inflicted on herself."

এলিজাবেথের সর্ব্বাপেক্ষা নীচাশয়তার দৃষ্টান্ত Mary Queen of Scotsএর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ। বিপন্না শরণার্থিনী নারীর ঊনবিংশ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের পর প্রাণদণ্ডবিধান নিষ্ঠুরতার একশেষ। কোমল-প্রকৃতি নারী এরূপ নৃশংস কার্য্যে সম্মতি দিতে পারে, ইহা চিন্তারও অগোচর!

এলিজাবেথের প্ররোচনায় মেরীর বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা অভিযোগ—এলিজাবেথের চিরস্থায়ী কলঙ্ক। তিনি নিজে হত্যার আদেশ দিলেও, স্বীয় দোষক্ষালনের জন্য Maryর কারাধ্যক্ষ Davisonকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া কর্ম্মচ্যুত করিলেন। এলিজাবেথের প্রকৃতি যে আকবর অপেক্ষা মহত্তর ছিল না, তাহা তাঁহাদের প্রজাপুঞ্জের সহিত ব্যবহারেও পরিস্ফুট হয়। আকবর হিন্দুদিগকে যেরূপ উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন, এলিজাবেথ catholic-দিগকে তদ্রূপ উন্নীত করেন নাই। অল্পসংখ্যক catholic তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়াছিল বলিয়া এলিজাবেথ নির্দ্দোষ ক্যাথলিকদিগের প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন নাই। Armadeর সময়ে এক জন ক্যাথলিক ইংরাজ-সেনার সেনাপতি ছিল বটে, কিন্তু স্পেনের এই ব্যর্থ চেষ্টার পর হইতে এলিজাবেথ ক্যাথলিকদিগকে উক্ত পদে আর নিযুক্ত করেন নাই।

আকবরের শেষ জীবনের সহিত এলিজাবেথের অন্তিমকালের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। আকবর অন্তিমদশায় পুত্রশোক ও সুহৃদ্‌বিয়োগে ব্যথিত হইয়াছিলেন। এলিজাবেথও বৃদ্ধবয়সে অমাত্য ও প্রিয়জনের বিরহে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। উভয়ের জীবনই অত্যন্ত romanric; উভয়েই অদ্ভুত ভাবে নানা বিপদ অতিক্রম করিয়াছিলেন। আকবর যখন বাল্যাবস্থায় খুল্লতাতগৃহে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার প্রাণনাশের বহু চেষ্টা হইয়াছিল; সম্রাট্ হইয়াও তিনি বহুবার মৃত্যুর মুখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। Bloode Maryও Elizabethকে সামান্য অপরাধেই নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর চক্রান্তের উপর চক্রান্তে তাঁহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সাদৃশ্য অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ইহার অধিক আলোচনা করিলাম না।

পক্ষপাতশূন্য হইয়া উভয়েরই তুলনা করিলে আকবরকে উচ্চতর স্থান না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। আকবরের ন্যায় স্নেহশীল ভূপতি কি এলিজাবেথ? আকবরের ন্যায় কি তাঁহার অক্ষুণ্ণবিশ্বাস, ক্ষমা, সরলতা ছিল? এলিজাবেথ শুধু ইংলণ্ডের; আকবর সমগ্র জগতের।

শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

পদ্মের স্বপ্ন।

খুলি' গেল একে একে রসপূর্ণ লাবণ্যের দল,
আনন্দে কহিল পদ্ম, "ধন্য ধন্য জনম সফল!
চরিতার্থ এ জীবন পরিপূর্ণ সার্থক সুন্দর!
অমৃত-সৌন্দর্য্য-রাগে রঞ্জিত এ নয়ন, অন্তর!
লহ মধু—লহ গন্ধ—লহ লহ লাবণ্য বিমল!
মোর মাধুরীতে আজি পরিব্যাপ্ত হোক্ জলস্থল।
আর কিছু নাহি চাই—ফলিয়াছে সৌন্দর্য্যস্বপন,
এস এস, হিরণ্য-জ্যোতির মাঝে পূর্ণ নির্ব্বাপণ!
সুন্দর করেছ মোরে হে বাঞ্ছিত! হে মোর সুন্দর!
চারি পাশে ঝরিতেছে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোকনির্ঝর!
সমুদিত শুভলগ্ন, বিশ্ব নব মিলন-বাসর।
ও আলোক-সিন্ধুমাঝে লহ মোরে লহ প্রাণেশ্বর!
এ কি হর্ষ, প্রেমস্পর্শ, পরিপূর্ণ অসহ পুলকে,
প্রাণ যেন বিকীর্ণ হইয়া পড়ে দ্যুলোকে ভূলোকে!
এ কি এ কি জীবনের বাধা-বন্ধ দুখ সুখ স্মৃতি
তোমার সৌন্দর্য্যে মিলি' ধরিতেছে অপূর্ব্ব আকৃতি।
পলকে জাগিছে চিত্তে এ বিচিত্র জীবন-স্বপন!
অন্ধকারমাঝে মোর নিরন্তর বন্ধন-ক্রন্দন।
সেই অতি ধীরে ধীরে নীল নীরে স্বপ্ন-অভিসার!
বিচিত্র বর্ণের খেলা—অপরূপ মাধুরীসঞ্চার!
চন্দনের বিন্দু সম অতি ক্ষুদ্র কোমল অঙ্কুর—
ছিনু বন্দী পঙ্কমাঝে মোহমুগ্ধ সুখস্বপ্নাতুর!
কত যুগ বহি গেল সে বন্ধনে সে পঙ্ক-শয়নে।
স্বপ্ন তবু ছিল গাঁথা ক্ষীণদৃষ্টি এ রুদ্ধ নয়নে!
মনে পড়ে একদিন সহসা করিনু অনুভব,
কে যেন দিতেছে দোল—তালে তালে তুলি' কলরব

রুদ্ধ মুগ্ধ হৃদয়ের কুহেলিকামাঝে অকস্মাৎ
কার যেন বর্ণ-তুলি অতি দ্রুত করিল আঘাত!
রঞ্জিত হইল স্বপ্ন, শিহরি' উঠিল তনু-মন,
অণু পরমাণু-মাঝে উপজিল অপূর্ব্ব স্পন্দন!
স্বপ্ন ছায়ালোকে মরি সে অবধি নিত্য অনুক্ষণ
দেখিতাম কভু দীপ্ত, কভু স্নিগ্ধ মাধুরী-মিলন!
বীণার মূর্চ্ছনা সম কম্পিত কোমল কর-রাশি—
লক্ষ হীরকের হাসি ক্ষণে ক্ষণে যেন পরকাশি',
কভু স্বর্ণ-রেণুরাজি—কভু খণ্ড ছিন্ন ইন্দ্রধনু
ছড়ায়ে নাচিত ঘিরি' স্বপ্নমুগ্ধ এ তরুণ তনু!
অম্বুতল হ'তে উঠি' বিকম্পিত মুক্তা-বিম্বমালা,
বরষি চলিয়া যেত কি উজ্জ্বল কি কোমল জ্বালা!
যেন কোন স্বপ্নদেবী ইন্দ্রজালে লইতেন তুলি'
নীল জলতল হ'তে সূত্রহীন রত্নহারগুলি!
কখন গভীর ছায়া অন্ধকারে ঢাকিত হৃদয়;
ভাঙ্গিত সুখের স্বপ্ন রূপরশ্মিরাগে মধুময়;
ক্ষোভে রোষে বেদনায় মুহুর্মুহু কাঁপিয়া কাঁদিয়া,
চঞ্চল স্মৃতির ছিন্ন, বিকম্পিত বর্ণালোক দিয়া,
চাহিতাম বিরচিতে সুখস্বপ্ন—রূপমরীচিকা;—
কিন্তু বৃথা, নিভে যেত শ্রান্তি-ভরে মিথ্যা স্বপ্নশিখা
অলসে তন্দ্রার বশে সুকোমল মৃণাল-আসনে
থাকিতাম রূপমুগ্ধা—সুপ্তি শেষে স্নেহ-আলিঙ্গনে
জুড়া'ত সকল জ্বালা, ধীরে পুনঃ ফুটিত স্বপন।
কে জানিত হেন তীব্র সুখমাখা উগ্র জাগরণ!
যায় কাল;—নব নব বেশে নিত্য যত স্বপ্ন ফুটে,
মনের মাধুরী তৃষা তত যেন উগ্র হয়ে উঠে।
তার পর একদিন—শুভদিন—পুণ্যদিন মোর!
জড়াইল দেহে মনে লক্ষ লক্ষ লাবণ্যের ডোর!
দেখিলাম পাশে মোর সুবিরাট আলোকমণ্ডল,
জীবনের পূর্ণ স্বপ্ন, রুদ্র-কান্ত রূপে ঝলমল!

ফুলিয়া উঠিল বুক, টুটি' গেল অযুত বন্ধন ;
থর-বিকম্পিত তনু পুলকপূরিত প্রাণ-মন !
আনন্দ-বিস্ময়-মগ্না ! চারি ভিতে কি সঙ্গীত বাজে,
আচম্বিতে দিব্যদৃষ্টি বিকশিল আপনার মাঝে !
সে মহিমা, সে মাধুরী, ঢল ঢল সে স্বর্ণ-মদিরা
আকণ্ঠ করিনু পান সুধাবেশে পিপাসা-অধীরা !
সে মাধুরী, সেই প্রেম—অশরীরী সে স্পর্শমাণিক,
রূপ রস বর্ণে গন্ধে সাজাইল মোরে, প্রাণাধিক !
তার পর, অঙ্গে অঙ্গে পরশ-হিল্লোল—সহস্র চুম্বন
স্বপ্ন ভাঙ্গি' দেখা দিল—সত্য ধ্রুব পূর্ণ জাগরণ।
অতৃপ্তিতে এ কি তৃপ্তি, অদীপ্তিতে কি দীপ্তি-বিকাশ—
অন্তর অন্তরমাঝে কি মধুর অমিয়-উচ্ছ্বাস !
এ প্রেম তোমারি কীর্ত্তি, এ সৌন্দর্য্য তব ইন্দ্রজাল,
তোমাতে কৃতার্থ হোক খুলে দাও বন্ধন মৃণাল !
হে দিব্য দেবতা মম ! হে বাঞ্ছিত ! হে মোর দুর্লভ !
প্রাণের অধিক প্রাণ ! আদি-অন্ত-হৃদয়-বল্লভ !
সুদূর মধুর মম, চিরারাধ্য হে পরমধন !
আমার সর্ব্বস্ব লহ—দেহ প্রিয় ! চির-আলিঙ্গন !”

ভাঙ্গিল দিবার মেলা ; মন্দপদে আসিল গোধূলি ;
দিনের সোনার তরী চলে যায় স্বর্ণপাল তুলি।
গ্রাম-রেখা ছায়াময়, স্তব্ধ হ'ল রাখালের বেণু,
কোমল অনিল ধীরে বিলাইছে কমলের রেণু !
কবরী আবরি' লাজে ঘাটে যায় মুগ্ধ-আঁখি বধূ—
মুদিতা শেফালিবুকে ধীরে ধীরে ফলিতেছে মধু।
নীল জল ঢল ঢল, স্বর্ণালোকে কাঁপে পদ্মবন।
পদ্মের ফুরায়ে এল সুধামাখা সোনার স্বপন।
মরাল মেলিছে পাখা, চঞ্চুপুটে অমল মৃণাল।
মর্ম্মরিছে মৃদুনাদে তালীবন, শ্যামল তমাল !

দিবার সৌন্দর্য্যগীতি মুছিয়ে মিলায়ে যায় ধীরে ;
কেকারব করে শিখী উচ্চচূড় সপ্তপর্ণশিরে !
কোকিল কুহরে কুঞ্জে ; আর্ত্তস্বরে ডাকে চক্রবাকী ;
স্বর্ণমেঘ-শয্যা'পরে মুদে আসে তপনের আঁখি !
সহসা উচ্ছ্বসে বায়ু, বৃন্ত'পরে শিহরে কমল,
ঝর-ঝরি ঝরি' পড়ে দলে দলে ক্লান্ত লঘু দল !
রঙ্গভঙ্গে নীল-নীরে হিল্লোলিয়া পবন অমনি
ভাসাইলা দলরাজি—অপ্সরার বিলাস-তরণী !
চকিতে দেখিনু চাহি' ছিন্নদল শীর্ণ পদ্ম হতে
বাহিরিল দিব্যমূর্ত্তি কিরণ-রঞ্জিত শূন্যপথে !
লাবণ্য-কল্যাণী বালা—স্বপ্নময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী—
অঙ্গে অঙ্গে তরঙ্গিত শান্ত স্নিগ্ধ লাবণ্য-লহরী !
সূর্য্যকান্ত-মণিময় অতি শুভ্র কমনীয় তনু,
রূপের কিরণজালে বিকশিছে শত ইন্দ্রধনু !
সে বর তনুর মাঝে পরিপক্ক-দ্রাক্ষারস সম
ঢল ঢল মাধুর্য্যের পলে পলে লীলা অনুপম !
শুচিশোভা শুক্তিশুভ্র দীর্ঘ দীপ্ত পদ্মদলরাজি
স্কন্ধ হ'তে স্কন্ধান্তরে সমুত্তিন্ন বৃত্তাকারে সাজি'।
কাঁপিতেছে দলে দলে ; সায়াহ্নের স্বর্ণরবি-বিভা
শরতের শুভ্র অভ্রে লীলাময়ী দামিনী-সন্নিভা—
মুক্তাপ্রান্ত রেণুলিপ্ত হিরণ্ময় কোমল কেশর
শোভে অবগুণ্ঠ সম ঘনকৃষ্ণ কেশের উপর !
মাধুর্য্যমণ্ডিত মৌন স্বপ্নময় স্নিগ্ধ মুগ্ধ মুখে
করুণ কিরণমালা খেলিতেছে কি গভীর সুখে !
অশোক-অধরে হাসি, ললাটেতে প্রেমের গরিমা—
ফুটায়েছে সুন্দরীর সুপবিত্র পূর্ণ মধুরিমা !
আয়ত সুনীল নেত্রে বিকশিত প্রেমস্বপ্নরাগ
পীনস্তনতট হ'তে ঝরিতেছে কনক-পরাগ।
দুলিছে অলকদল কুন্দকান্তি কোমল কপোলে,
পদ্মদলমালা কণ্ঠে লীলাভরে মন্দ মন্দ দোলে !

কোমল চরণযুগে ভাবি' নব প্রফুল্ল কমল,
মুখর মঞ্জীর সম গুঞ্জরিছে মত্ত অলিদল!
পদ্মমুখ, পদ্মবুক, পদ্মনেত্র, পুণ্য পদ্মপাণি—
খসিছে মৃণালসূত্রময় লজ্জাবাসখানি।
উদ্যত মৃণালভুজ তুলি' দীপ্ত সূর্য্যলোক-পানে
উঠিতেছে ধীরে ধীরে বাঞ্ছিতের সুদূর আহ্বানে;
বক্ষমাঝে লক্ষ হীরা দিব্যদীপ্তি প্রতিবিম্ব—রবি
প্রেমের স্বপনে গাঁথা অনির্ব্বাণ মাধুরীর ছবি!
সহসা ভাঙ্গিল ঘুম,—কোথা পদ্ম, কোথায় তপন!
আমারি কল্পনামাঝে কি বিচিত্র মুক্তির স্বপন!
বাসনার পঙ্ক হ'তে রুদ্ধ মুগ্ধ কলঙ্কী হৃদয়
ফুটিয়া উঠিবে কবে হে সুন্দর, হে আনন্দময়?
পূর্ণ সৌন্দর্য্যের মাঝে কবে ক্ষুদ্র জীবন-স্বপন
ভূমানন্দে মগ্ন হয়ে পাবে চির পূর্ণ নির্ব্বাপণ!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্বদেশসেবায় বঙ্গরমণী।

সম্প্রতি আমাদের দেশে যে স্বদেশপ্রীতির প্রবাহ বহিয়াছে, বঙ্গরমণী এখনও সে অমৃতপ্রবাহে অভিষিক্তা হইবার আনন্দে বঞ্চিতা হইয়া আছেন। দেশকে যে নিতান্ত আপনার মনে করিয়া ভালবাসিতে হইবে, জননী জন্মভূমিকে স্নেহময়ী মায়ের মূর্ত্তিতে প্রাণমন্দিরে বরণ করিয়া লইতে হইবে, এ কথাটি আমাদের দেশের মেয়েদের কাছে একটা নূতন কথা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কথাটা নিতান্তই নূতন নয়! এখনও ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জনশূন্য বাসগ্রামের পৈত্রিক ভিটা ত্যাগ করিতে হইলে অনেক কল্যাণী "সাত পুরুষের ভিটা" বলিয়া চোখের জল ফেলিয়া থাকেন। যে আমবাগানে বালিকাকালে সঙ্গিনীগণের সঙ্গে চুল এলো করিয়া আম কুড়াইয়া বেড়াইয়াছি, তার মাটীকে কি মাটী বলিয়া মনে হয়! সেই যে শিবমন্দির, সেই গাঙ্গের ঘাট, সেই এ পাড়া, ও বাড়ী, সে সব যে কত আপনার, কত প্রাণের জিনিস, যাহার জন্মভূমি, সেই তা জানে। এমনই

করিয়া শৈশবে জন্মভূমি-প্রীতির যে ক্ষুদ্র উৎস বালিকা-হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, সে উৎস বিনা বাধায় প্রবাহিত হইলে, কালে নদী হইয়া সমস্ত দেশকে করুণা-ধারায় অভিষিক্ত করিতে পারে।

রমণীজাতির প্রসঙ্গে এই করুণার কথাই প্রথমে মনে হয়। রমণী করুণাময়ী, রমণী মমতাময়ী, এ কথা সকলেই প্রায় স্বীকার করেন। কিন্তু রমণী যে শক্তিময়ী, অনেকে তাহা মানেন না। কোমল প্রেমের সঙ্গে কঠিন শক্তি যে মিলিত হইতে পারে, এ ধারণা তাঁহারা করিতে পারেন না; সেই জন্যই আজ দেশের পুরুষগণ যে দেশপ্রীতি অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহাদের পৌরুষহীনা দুর্ব্বলা মাতা, ভগিনী ও পত্নীদিগকে সে অমৃতের অনধিকারিণী বলিয়া নিতান্ত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু প্রেমহীন শক্তি, কেবল আসুরিক শক্তি। আর প্রেমের মত দুর্জ্জয় শক্তিশালীই বা কে আছে? প্রেমের বলে বলী হইলে নিতান্ত দুর্ব্বলেরও জগতে কিছুই অসাধ্য কর্ম্ম থাকে না। কথাগুলি হয় ত নিতান্ত কবিকল্পনার মত শুনাইবে। কিন্তু ইহার অপেক্ষা অধিক সত্য আর কিছু নাই। রমণী-গণকে যদি জাতীয় জীবনের একটি অঙ্গ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে, এ কথা নিশ্চয়ই সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কেবলমাত্র পুরুষের আত্মত্যাগে, জ্ঞানে ও শক্তিতেই যে দেশের উন্নতি হইবে, ইহা কখনও সম্ভব নহে। রমণীগণকে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের সহবর্ত্তিনী ও সহকারিণী হইতে হইবে; নহিলে দেশের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে না। আর রমণীগণ যদি দেশের পক্ষে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল বলিয়াই বিবেচিত হন, তাহা হইলেও, সেই রমণীগণের ক্রোড়েই যে দেশের ভবিষ্যৎ ভরসা বালকগণ প্রতিপালিত হইবে, এ কথাও স্মরণ করা উচিত।

প্রেমের অর্থ মনের বিকাশ, মনের প্রসারতা-বৃদ্ধি। নির্ম্মল জলও যদি অল্পস্থানে অনেক দিন বদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে ক্রমেই মলিন, অবিশুদ্ধ ও ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া উঠে। গৃহকর্ম্ম রমণীর প্রধান ধর্ম্ম, কিন্তু গৃহকর্ম্মের সীমা যে কেবল গৃহেরই ভিতর, তাহা নয়। আপনার স্বামী, আপনার পুত্রকে কে না ভালবাসে? কিন্তু পরের অনাথ ছেলে পথে কাঁদিয়া যাইতেছে দেখিয়া যে জননীর মনে করুণার সঞ্চার হয় না, তিনি আপনার ছেলেকেও ভালবাসিতে পারেন না; তাঁহার ভালবাসা অনেকদিন অল্পপরিসর স্থানে বদ্ধ থাকিয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি যে নিজের

সন্তানকে ভালবাসেন, সে কেবল নিজের সুখের জন্যই ভালবাসেন; এই জন্য তিনি পরের সন্তানকে ভালবাসিতে পারেন না। যাঁহার স্নেহটুকু কেবল আপনার ও আপনার স্বামী পুত্রের জন্য ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে,—আরও ভাল করিয়া বলিতে গেলে,—নিজের সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও সুবিধার জন্য ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে, তিনি স্বদেশপ্রীতির আস্বাদ গ্রহণ করিবেন কি করিয়া?

এই জন্য, রমণীগণের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ বিকশিত করিয়া তুলিতে হইলে, বালিকাকাল হইতেই তাঁহাদের মনের সঙ্কীর্ণতা দূর হইয়া যাহাতে উদারতা বর্দ্ধিত হয়, অভিভাবকগণের সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এমন এক দিন ছিল, যে দিন মেয়েরা লেখাপড়া শিখিতে পাইত না, কিন্তু বালিকাকাল হইতেই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহকর্ম্ম, পরের সেবা, গোমেষ প্রভৃতি জীবের সেবা ও দেবতার অর্চ্চনা শিক্ষা করিত। দাসদাসীগণকে তখন কেবল বেতনভোগী দাস দাসী বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন না। দাস দাসীরা কেহ ছেলে মেয়েদের "ক্ষান্তমাসী", কেহ "ক্ষুদেকাকা", কেহ "কেদারদাদা"; তারা সকলেই আপনার লোক। এইরূপে, অক্ষরপরিচয় না হইলেও, নিরক্ষর কোমল প্রাণে প্রথমে হইতেই স্নেহবিকাশের শিক্ষা হইত। আবার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনদিগের অধীনে থাকিয়া তাহাদের সংযম-শিক্ষাও হইত। ইচ্ছা করিলেই কেহ বেলা আটটা পর্য্যন্ত শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পাইতেন না; ইচ্ছা করিলেই দ্বিপ্রহরে উপন্যাস হাতে করিয়া শয্যাশায়িনী হইতে পারিতেন না; ইচ্ছা: করিলেই রাত্রি নয়টার সময় শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। বিশ্রাম ও নিদ্রার ন্যায় আহারের বিষয়েও যথেষ্ট সংযমশিক্ষা ও সেই সঙ্গে আত্মত্যাগশিক্ষার অবকাশ ঘটিত। দ্বিপ্রহরে পরিজন, দাস দাসী ও অতিথি অভ্যাগত সকলের আহারশেষে গৃহিণী আহারে বসিতেন। যদি সেই সময় কোনও অতিথি উপস্থিত হইত, তবে মুখের অন্ন প্রসন্নমনে তাহাকে ধরিয়া দিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এখন সে অসভ্যতার দিন গিয়াছে! এখন সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রমণীদের বিদ্যাশিক্ষা (অর্থাৎ কথামালা শেষ করিয়া নভেল-পাঠ-শিক্ষা) আরম্ভ হইয়াছে! যথার্থ কথা বলিতে গেলে, এই যে স্ত্রীশিক্ষার ধুয়া উঠিয়াছে, তাহা কি সার্থক হইয়াছে? কয় জন রমণী প্রকৃত শিক্ষিতা হইয়াছেন? কোটী কোটী রমণীর ভিতর বোধ হয়

আঙ্গুল গণিয়া তাঁহাদের সংখ্যা গণনা করা যায়। বিদ্যাশিক্ষা হউক, বা না হউক, বিলাসিতা-শিক্ষা যথেষ্টই হইতেছে। যিনি কিছু অবস্থাপন্ন, তাঁহার সন্তানের পীড়া হইলে, সন্তানের জননী নিজে পীড়িত সন্তানের সেবা করিলে তাঁহার মর্য্যাদার হানি হইবে বলিয়া মনে করেন! বেতনভোগী 'নর্স' অথবা দাস দাসী সেই কাজ করিয়া থাকে। স্বামি-সেবা ও পিতামাতার সেবা বিষয়েও রুচি সেই পথেই গিয়াছে। পাড়া প্রতিবাসী অথবা দীন দুঃখীর সেবার ত কথাই নাই। সে পাট বহুকাল উঠিয়া গিয়াছে। এখন গৃহিণী আর সকলের শেষে আহার করেন না; সকলের পূর্ব্বেই পাচিকা তাঁহার আহারীয় তাঁহার গৃহে পৌঁছাইয়া দেয়; বেলা হইলে কর্ত্রীর অসুখ হইতে পারে! অতিথি গৃহে আসিলে মুখের ভাত তাহাকে ধরিয়া দেওয়া দূরে থাক, দ্বারবানের অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়াই অতিথিকে ফিরিতে হয়। ধনীর গৃহেই এইরূপ ব্যবস্থা; মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রগণ ত অক্লেশেই বলিতে পারেন—"আমরা নিজেরাই খাইতে পাই না, পরের অন্ন কোথা হইতে যোগাইব ?"

সময়ানুসারেই লোকের রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হয়। আগে যাহা ছিল, এখন ঠিক সেইরূপ নিয়মই থাকিতে পারে না, থাকাও উচিত নয়। তবে, পুরাণবাড়ী ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বাসোপযোগী একটা নূতন বাড়ী গড়িয়া না তুলিলে শেষে পথে দাঁড়াইতে হয়। আমাদের দেশের মেয়েদের এখন সেই অবস্থা হইয়াছে। 'ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট' হইয়া ত্রিশঙ্কু রাজার মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সভ্যতা ও শিক্ষার পরিবর্ত্তে অসার বিলাসিতার চরণে সকলই জলাঞ্জলি দিয়া কেবল "আপনি ভিন্ন আর সংসারে কেহই আপন নয়"—এই জ্ঞানটুকু অবশিষ্ট আছে। প্রতিবাসীর বিপদে আপদে আর কেহই তেমন প্রাণ দিয়া করিতে পারে না। কেন? না, "আপনার নিয়েই বাঁচিনে, তা পরের দেখিব কি?" আপনার নিয়ে বাঁচিনে, কথাটি যথার্থই বটে; আত্মত্যাগ ভুলিয়া ক্রমাগত আপনাকে বোঝা করিয়া তুলিলে, শেষে "আপনার" ভার বহন করা বড়ই কঠিন হইয়া উঠে।

ভালবাসার কথা অনেক বেশী করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়া কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া দাঁড়াইতেছে। কিন্তু স্বদেশসেবার মূলমন্ত্রই ভালবাসা। ভাল না বাসিয়া কাহারও সেবা করা যায় না। দেশকে যথার্থ ভাল না বাসিলে

দেশের সেবা করা যায় না। প্রেমহীন সেবা একেবারেই নিরর্থক। "দেশ-প্রীতি" এই কথাটির অর্থ অভিধানে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যতক্ষণ না মনের ভিতর কথাটির অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়. ততক্ষণ কথাটি কেবল কথাই থাকিয়া যায়। সম্প্রতি আমাদের দেশে অনেকগুলি বালক স্বদেশী অপরাধে ধৃত হইয়াছে, এবং এইরূপ অভিযুক্তের সংখ্যা নিত্যই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাদের বিষয়ে কথাপ্রসঙ্গে নিমন্ত্রণ-সভায় উপস্থিত কোনও সুশিক্ষিতা মহিলা বলিয়াছিলেন,—"ন্যায়পথ ছাড়িয়া অন্যায় পথে পদার্পণ করিলে এইরূপ ভাবেই শাস্তি পাইতে হয়। তাহারা এরূপ কাজ করিয়া কি ভাল করিয়াছিল?" এই উক্তিটি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, আমাদের দেশের উপর আমাদের আন্তরিক ভালবাসা কিছুমাত্র নাই। আমাদের নিজের ছেলে যদি এইরূপ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে যাইত, তাহা হইলে কি এমন নিশ্চিন্তভাবে উদাসীনভাবে তাহাদের সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতাম? পরের ছেলে বলিয়াই ত কিছুই গায়ে লাগিল না। কিন্তু যাঁহারা দেশকে যথার্থই আপনার দেশ বলিয়া মনে করেন, সেই জননীগণের নিকট এই কারারুদ্ধ দেশের ছেলেগুলি ঠিক আপনার সন্তানের মতই স্নেহের ধন নয়? ভগিনীগণের নিকট ইহারা আপনার ভাই অপেক্ষা কম স্নেহের পাত্র নয়। ঐ যে অবোধ যুবকগুলি না বুঝিয়া কি করিতে কি করিয়াছে, তাই বলিয়া কি উহারা যথার্থই দুষ্ক্রিয়াকারী? হয় ত জীবনে তাহারা একটি ক্ষুদ্রজীবও হত্যা করে নাই, একটি মিথ্যা কথাও কখনও তাহাদের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে দেশব্যাপী গঞ্জনা ও কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, সে কি কোনও নীচ স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশ্যে? তাহা নহে। স্বদেশের প্রতি প্রবল অনুরাগে তাহাদের কোমল মস্তিষ্ক এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, আত্মসংবরণ করিতে পারে নাই। আর আমরা—? আমরা ঘরে বসিয়া স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে করিতে নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে এই বিষয়ের সমালোচনা করিতেছি। আমাদের উদারতার মধ্যে এইটুকু! যদি বিদেশী দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কোনও কোনও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা হইলে সেটা দেশের উপর অনুগ্রহ করিতেছি মনে করিয়া গর্ব্বিত হই! অনেক দেশানুরাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যদি বা স্বদেশী কাপড়ে জ্যাকেট প্রস্তুত করাই, তাহাতে বিদেশী দীর্ঘ 'লেস'

না দিলে কিছুতেই মনোনীত হয় না! যেখানে বিশেষ কোনও অসুবিধা না হয়, সেইখানেই স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া দেশকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করি, কিন্তু সামান্য অসুবিধা, ক্ষতি, অথবা বিলাসিতার ব্যাঘাত ঘটিলে, সেটুকু সহ্য করিতেও প্রস্তুত নই! সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের মহিলাগণের নিকটেও যখন ইহার অধিক প্রত্যাশা করা যায় না, তখন সাধারণ রমণী-সমাজের স্বদেশীর চর্চ্চায় যে "সাহেবদের জিনিস কিনবে না, তবে কলের জল খাচ্ছ কেন বাবু, সাহেবের রাস্তা দিয়ে চল্‌ছো কেন?" "সাহেবের চাকরী করছেন, তার আবার কথা! যার নুন খাই, তার গুণ গাই", "স্বদেশী ক'রেই তো সর্ব্বনাশ হোল",—এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়।

তবে, প্রায়ই দেখা যায়, স্বামী যেখানে অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশী, স্ত্রী সেখানে "স্বদেশ" এই কথার অর্থও হয় ত জানেন না। স্বামী বিদেশী পণ্যবর্জ্জনের সঙ্কল্পে দেশ বিদেশে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা দিতেছেন, স্ত্রী ঘরে বসিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় যাহা কিছু সকলই বিদেশী দ্রব্য কিনিতেছেন! ইহাই একটু আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। ইহার একমাত্র কারণ এই, স্ত্রীরা যে আবার স্বামীদিগের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞানের অংশভাগিনী হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারে, এ কথাটা সেই স্বদেশসেবীরা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবার যোগ্য বলিয়াই মনে করেন। কাজেই বাহিরের চিকিৎসা করিতে গিয়া চিকিৎসকের গৃহের রোগ দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। আজ বঙ্গবাসীর গৃহে মাতৃপূজার মহোৎসব, কিন্তু গৃহলক্ষ্মী বঙ্গরমণীগণ তাঁহাদের গৃহেরই এই বৃহৎ যজ্ঞব্যাপারে যেন নিতান্ত অপরিচিতার মত দূরে রহিয়াছেন। এখনও কি তাঁহাদের এরূপ ভাব শোভা পায়? যখন তাঁহাদের কোলের শিশুরা পর্য্যন্ত "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রে দীক্ষা লইয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন জননীরা কি করিয়া নির্লিপ্তভাবে রহিয়াছেন? এখনও যদি তাঁহারা বিদেশী বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া অঙ্গে দাহযন্ত্রণা অনুভব না করেন, তাহা হইলে বুঝিব,—তাঁহাদের অনুভবশক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। সৌন্দর্য্যচর্চ্চার কথা এখন ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। "সৌন্দর্য্যচর্চ্চা" উপেক্ষার বিষয় নয়, কিন্তু এখন যদি আমাদের দেশে মোটা ছালার অপেক্ষা সূক্ষ্ম কাপড় না পাওয়া যায়, তবে আমাদের সেই ছালাই পরিতে হইবে; সৌন্দর্য্যচর্চ্চার দোহাই দিয়া কিছুতেই

আর আমরা সূক্ষ্ম বস্ত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিব না। সৌন্দর্য্যচর্চ্চারও একটা সময় অসময় আছে। যখন লোকের অন্নাভাবে ও পিপাসায় মুমূর্ষু দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহার আর সৌন্দর্য্যবোধের ক্ষমতা থাকে না; জীবন-রক্ষাই তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হয়। যদি সৌন্দর্য্যের কথাই ধরিতে হয়, তবে এ কথাও ভাবিয়া দেখিতে হয় যে, বেশভূষা অঙ্গরাগেই কি কেবল সৌন্দর্য্য? তপস্যাতে কি কোনও সৌন্দর্য্যই নাই! রুগ্নশিশুর শয্যাপ্রান্তে উপবিষ্টা সেবানিরতা অনাহার অনিদ্রায় ম্লানমুখী রুক্ষকেশা মলিনবেশা জননীর সৌন্দর্য্যের সহিত কোন্ সুবেশার সৌন্দর্য্য তুলনায় জয়ী হইতে পারে?

বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে গেলে কলা-শিল্প সম্বন্ধেও কিছু ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। পশম বোনা, রেশমের ফুল তোলা, সল্মা চুম্‌কীর কাজ, এ সমস্ত আপাততঃ তুলিয়া দিতে হয়। কেন না, ইহার উপকরণগুলি সকলই বিদেশী। এই শিল্পচর্চ্চা উঠিয়া যাইবে, এমন নয়; ইচ্ছা করিলে মেয়েরা কাপড়ে সুতার ফুল তোলা, কাঁথা শেলাই, পিঁড়ি আল্‌পনা, ছবি আঁকা ইত্যাদি কায করিতে পারেন। কিন্তু আজকালকার দিনে অবসর-সময় এই সমস্ত কাজে ব্যয় না করিয়া চরকা কাটা অভ্যাস করিলে সময়ের সদ্ব্যবহার হয়।

পুরুষেরা বাহিরে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই বলিয়া অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের কার্য্যক্ষেত্র যে অল্পপরিসর, তাহা নহে। উন্নতির প্রধান ও প্রথম সোপান—সন্তানপালন ও সন্তানকে সুশিক্ষা-প্রদান। এই দুইটি গুরুতর কার্য্যের ভারই প্রধানতঃ জননীগণের উপর। সকল "মা" যদি তাঁহাদের সন্তানগুলিকে যথার্থ "মানুষ" করিয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের উন্নতির পথ কেহ রুদ্ধ করিতে পারিবে না। শিখাইতে গেলে নিজে শিখিয়া তবে শিখাইতে হয়। সন্তানের কুশলকামনায় জননীকে সাধনা করিয়া দেবী হইতে হইবে; তাঁহার ক্রোড়ের শিশু তাঁহারই পুণ্যদীপ্ত ললাটে দেবত্বের প্রথম পাঠ চিনিয়া লইবে। স্বার্থের বোঝা বহিয়া মরা অপেক্ষা আত্মত্যাগে কত সুখ, তাহা যিনি আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন, তিনিই জানেন। মা যখন প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণকামনায় প্রাণের মমতা তুচ্ছ জ্ঞান করেন; পতিব্রতা যখন পতির সুখ সচ্ছন্দের বিনিময়ে আপনার সুখ অক্লেশে বিসর্জ্জন দেন; আত্মত্যাগে কি অপরিসীম আনন্দ, তখন তাঁহারাই

তাহা বুঝিতে পারেন। দয়ার্দ্রচিত্ত মহাত্মগণ যখন পরোপকার ব্রতে আপনার ধনপ্রাণ সম্মান সকলই উৎসর্গ করেন, মাতৃভূমির প্রিয় সেবক যখন মাতৃভূমির জন্য, ভগবানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেন, তখন তাঁহাদের সেই আত্মত্যাগে যে সুখ, যে অনির্ব্বচনীয় বিমল আনন্দ থাকে, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে, ভোগে, সম্মানে, কিছুতেই তাহা পাওয়া যায় না। এই আত্মত্যাগই প্রকৃত কল্যাণের পথ, নিত্য-সুখের পথ। জননী যদি সন্তানের প্রকৃত কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তবে শিশুকাল হইতে তাহার কোমল হৃদয়ে ত্যাগের বীজ বপন করিয়া প্রতিনিয়ত স্নেহবারিনিষেকে অঙ্কুরটিকে বাড়াইয়া তুলিবেন। মা হইয়া যদি তিনি সন্তানকে প্রকৃত-কল্যাণের পথ দেখাইয়া না দেন, তবে আর তিনি মা কিসের? ——গৃহিণীর গৃহস্থালীর আবশ্যক দ্রব্যাদির ক্রয়ে অনেক স্থলেই স্বাধীনতা আছে। সেই দ্রব্যগুলি যাহাতে যত দূর সম্ভব স্বদেশজাত হয়, সে বিষয়ে তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা উচিত। সামান্য আলস্যের জন্য হয় ত অনেক সময় বিদেশী দ্রব্য কেনা হয়। দেশী দিয়াশলাই কিনিতে হইলে খোঁজ করিতে হইবে, কাজেই সে পরিশ্রমটুকু স্বীকার করিবার কষ্ট হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বিলাতী দিয়াশলাই কেনা হইল! আবার কোন্ দিয়াশলাই যে কেনা হইয়াছে, গৃহিণী তাহার খোঁজও লইলেন না। দেশী সাবান নিকটে সুবিধা মত পাওয়া গেল না, এ জন্য বিলাতী সাবানই কেনা হইল। কোনও কাজেই এরূপ ভাবে চলিলে ফল হয় না। শুভকর্ম্মমাত্রকেই দেবার্চ্চনার কাজ বলিয়া মনে করিতে হয়। শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা বিহীন হইয়া দেবার্চ্চনা করা যায় না। কাজের আরম্ভে দৃঢ়নিষ্ঠা আবশ্যক। সে নিষ্ঠা কিছু অতিরিক্ত, অর্থাৎ "গোঁড়ামী" হইয়া পড়ে, তাহাও ভাল, কিন্তু শিথিল যেন না হয়। যদি "দেশী দিয়াশলাই ছাড়া অন্য দিয়াশলাই ব্যবহার করিব না, :অন্ধকারে থাকি, অথবা চকমকী ঠুকিয়া আগুণ করি, তাহাও ভাল"—প্রত্যেক গৃহের গৃহিণীরা এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইলে, এত দিনে দেশীয় দিয়াশলাই কারবারের অনেক উন্নতি হইত। "দেশী সাবান ভিন্ন অন্য সাবান স্পর্শ করিব না" এই প্রতিজ্ঞা যথার্থই প্রতিপালিত হইলে, এতদ্দিন আর দোকান-গুলিতে বিদেশী সাবান দেখা যাইত না। অন্যান্য অনেক দ্রব্য সম্বন্ধেও এ কথা বলা যায়।

দরিদ্র, শ্রমজীবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমরা যে আর তেমন

করিয়া মিশিতে পারি না, ইহাতে আমাদের মনের নীচতাই প্রকাশ পায়। এই সকল নিরক্ষর শ্রমজীবী, বেতভোগী দাসদাসী, পথের ভিখারী, সকলেই যে আমাদের দেশের লোক, সকলেই এক মাতৃভূমির সন্তান বলিয়া রক্ত-সম্পর্কে নিতান্ত নিকট আত্মীয়, এ ভাব মনে জাগাইয়া না তুলিলে "একতা" কথাটি আকাশকুসুমের ন্যায় নিরর্থক হইবে। সেদিন এক জন ভদ্রলোক আম্রবিক্রেতার নিকট আমের দর করিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার সঙ্গী উপহাস করিয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোমার স্বদেশী?—তোমার গরীব ভাই দুটো আম বেচে অন্ন করছে, তার উপর এত জুলুম, আর বিদেশী সওদাগরের কাছে যখন জিনিস কেন, তখন কি কর? বিলখানি হাতে নিয়ে অমনি কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে দিতে হয়, তখন কথাটি কইবার যো নাই! এর মানে কি? ওরা সত্যবাদী যুধিষ্ঠির, আর তোমার দেশের লোক সব জুয়াচোর?"

পণ্ডিত মূর্খ,—ধনী, অথবা দরিদ্র, স্ত্রীপুরুষ, যাহাই হউক না কেন, সকল শ্রেণী, সকল সমাজ, সকল সম্প্রদায়ের ভিতরই স্বদেশপ্রীতির প্রবাহ সমভাবে প্রবাহিত না হইলে, দেশের সকল অঙ্গে নবজীবনের সঞ্চার হইবে না। এই জন্য পাচিকা, দাসী, বাসনওয়ালী, মেছুনী, সকলের সঙ্গেই, তাহারা যেরূপ ভাবে বুঝিতে পারে, সেই ভাবে স্বদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করা উচিত। দেশের লোক বলিয়া রমণীগণের তাহাদের উপর আন্তরিক আকর্ষণ থাকিলে, তাহারাও সহজেই সে আকর্ষণের বশীভূত হইয়া পড়িবে। তখন তাহাদের আপনা হইতেই "দেশ" বলিয়া একটা আগ্রহের সঞ্চার হইবে। বাসনওয়ালীরা প্রায়ই কলাই-করা বাসন, বিলাতী চিরুণী প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ আনিয়া থাকে। তাহাদের সে সকল দ্রব্য কেহই ক্রয় না করিলে, ভবিষ্যতে তাহারা দেশী দ্রব্যই বিক্রয় করিতে আসিবে।

সম্প্রতি সম্ভ্রান্ত ধনিগণের গৃহে কতকগুলি ইহুদী রমণী যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বিদেশী সৌখীন রেশমী কাপড় ও 'লেসে'র পাড় প্রভৃতি বিক্রয় করে। সহরের অনেক ধনীর গৃহেই তাহাদের অত্যন্ত পসার। মেয়েরা স্বইচ্ছায় তিন চারি শত টাকার বস্ত্র ক্রয় করিতেছেন, পুরুষেরা সে বিষয়ের খবর রাখেন না! মেয়েরা তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করেন না। যদি আমাদের সমাজে নিমন্ত্রণসভায় বিদেশী পরিচ্ছদ পরিয়া যাওয়া নিতান্ত লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করেন, যদি বিবাহ

প্রভৃতি শুভব্যাপারে রমণীরা বিদেশী দ্রব্যকে অকল্যাণের দ্রব্য মনে করেন, তাহা হইলে এইরূপ ক্রয় বিক্রয় বন্ধ হইতে পারে। নহিলে উপায় নাই। কলিকাতার ধনী ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের গৃহগুলিই এইরূপ অকল্যাণকর বিদেশীয় বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল। এই বিলাসিতাব্যাধির চিকিৎসা প্রথম সেই স্থান হইতেই আরম্ভ করা আবশ্যক। কিন্তু সকলেই দারুণ ব্যাধিতে বিকলাঙ্গ, জানি না, চিকিৎসক কে হইবেন?

তবে এস তুমি মা, সুজলা সুফলা স্নেহময়ী জননী জন্মভূমি! আমার,—তোমার সন্তানের হৃদয়মন্দিরে তোমার আপনার আসন তুমি আপনি পাতিয়া লও। স্বামী বিবেকানন্দের সেই মহতী উক্তি "এখন হইতে পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত জীবধাত্রী জননী জন্মভূমিই তোমাদের একমাত্র ঈশ্বর হউন" এই অমরবাণী সকলের প্রাণে প্রাণে ধ্বনিত হউক। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা লইয়া মায়ের সকল সন্তানই তপস্যায় রত হউক। এত দিন যাঁহারা কেবল দুঃখের উপাসনা করিয়াছেন, যাঁহাদের জীবন দুর্ব্বহ ছিল, সেই এক উজ্জ্বল ধ্রুব নক্ষত্রের জ্যোতিতে তাঁহাদের সমস্ত জীবন উজ্জ্বল ও আনন্দময় হইয়া উঠুক। কুকুরকে রত্নহার পরাইয়া বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত করিলেও, সে কুকুরই থাকিবে, এ কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। ধর্ম্মের উন্নতি, জ্ঞানের উন্নতি, মনুষ্যত্বের উন্নতি, সমস্তই পৌরুষের উপর স্থাপিত, এ কথা যেন আমরা স্মরণ রাখি। পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদী অনেক দান করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের নিকট তাঁহার কোনও দানই দান বলিয়া গ্রাহ্য হয় নাই; কেবল আপনার পরিধেয় বস্ত্রের ছিন্ন অর্দ্ধাংশ-দানই দান বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল! মাতৃভূমিও আজ বৃথা ষোড়শোপচার পূজায় তৃপ্ত হইবেন না, হৃদয়-শতদলটি তুলিয়া তাঁহার চরণে দিলে তবে তিনি সন্তানের পূজা গ্রহণ করিবেন। সে পূজা কেবল নিভৃতে পূজা-গৃহে বসিয়া নয়,

শুধু আপনার মনে নয়,
কেবল ঘরের কোণে নয়,
শুধু নির্জ্জনে ধ্যানের আসনে নহে;
তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্ম্মে সেথায় তোমায় স্বীকার করিব হে,
প্রিয় অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে!

আজ সমস্ত দেশের ভিতরে সেই এক, ধ্রুব ও সত্যের পূজা করিতে হইবে। ক্ষুধিত পীড়িত আর্ত্ত, অসংখ্য লোকের সেবায় সেই লোকনাথের সেবা করিতে হইবে। তবেই আমরা মৃণ্ময়ীর ভিতর চিন্ময়ীর আনন্দময়ী মাতৃমূর্ত্তির দর্শন পাইব।

শ্রীমতী সরলাবালা সরকার।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

১৫ই অগ্রহায়ণ।—Sir Thomas Browne এক স্থলে বলিয়াছেন,—"He that endureth no faults in men's writings must only read his wherein for the most part all appeareth white- Quotation mistakes, inadvertency expadition, and human lapses may make not only moles but warts in learned authors, who notwithstanding being judged by the capital matter admit not of disparagement.

যাঁহারা কোনও পুস্তকপাঠে মন দিয়া কেবল তাহার দূষণীয় স্থলগুলি অন্বেষণ করিয়া বেড়ান, তাঁহারা প্রায়শঃ পুস্তকের গুণাবলীর প্রতি কতকটা অন্ধ হইয়া পড়েন। সুতরাং পুস্তক পাঠ করিয়া কোনও উপকারের আশা যাঁহারা করেন, এরূপ ভাবে অধ্যয়ন করা তাঁহাদের আদৌ কর্ত্তব্য নহে। পাঠকের মন প্রধানতঃ গুণভাগের প্রতিই সমর্পিত হওয়া উচিত। গ্রন্থের দুই চারিটা দোষ যদি আমাদের অলক্ষিত থাকিয়া যায়, তাহাতে কাহারও কোনও ক্ষতি নাই, কিন্তু উহার ভিতর যে সকল অপূর্ব্ব কথা বা নূতন সৌন্দর্য্য বা শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে, তাহার একটিমাত্রও আমাদের হৃদয় মনের অগোচর থাকিলে আমাদেরই ক্ষতি। আমি সেই বিশেষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারিলাম না, অথবা সেই অপূর্ব্ব শিক্ষা আমার হৃদয়ঙ্গম হইল না। হয় ত তাহাতে আমার জীবনের একটা নূতনতর অধ্যায় সমারব্ধ হইতে পারিত। আমারই বুদ্ধির দোষে কিংবা অনবধানতাবশতঃ তাহা হইল না। তবে যাঁহারা সমালোচকের আসন গ্রহণ করেন, দোষ গুণের প্রতি সমদৃষ্টি তাঁহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়, এ কথা বোধ হয়, সকলেই স্বীকার করিবেন।

১৬ই অগ্রহায়ণ।—পঙ্কুরামকে দেখিলাম। সে পূর্ব্বাবস্থ হেই রহিয়াছে। বাহিরে আর বিশেষ কোনও অসুখের পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্রমশঃ একটু একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেছে, এবং তাহার প্রফুল্লতাও কিছু কিছু বাড়িতেছে, ইহাই আমার মনে হয়। আগে কোনও খাবার সামগ্রী দেখিলে খাইবার জন্য তেমন ব্যগ্রতা দেখাইত না; কিন্তু, এখন তাহার নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী সাবধানে লুকায়িত করিয়া রাখিতে হয়।

* * * * * *

রবীন্দ্রনাথের সম্পাদিত প্রথম সংখ্যা "সাধনা" দেখিলাম। প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই তাঁহার নিজের। তাঁহার লেখনী বোধ হয় এক দিনের জন্যও বিশ্রামসুখ ভোগ করিতে পায় না। 'পায় না' কেন বলি, তিনি বিশ্রাম দেন না, বলাই সঙ্গত! ইহাতে লিখিত বিষয়ের উৎকর্ষ যত হউক না হউক, রচনার অভ্যাসটা খুব পাকিয়া যায়, তাহা নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রথমেই রবীন্দ্রের "সাধনা" নামক কবিতাটি মন্দ হয় নাই। "কেরাণী" শীর্ষক একটি রহস্য-কবিতা বাহির হইয়াছে। হাস্যরস ইহার উদ্দেশ্য হইলেও, ইহার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে যে গভীর রোদনের স্রোত বহিতেছে, ভাবুকের মন তাহাতেই প্রধানতঃ আকৃষ্ট হইয়া যায়।

১৭ই অগ্রহায়ণ।—বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহার নূতন প্রবন্ধ অগ্রহায়ণ মাসের "জন্মভূমি" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে। তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সমালোচনা হইল। বাঙ্গালীর অভাববিমোচন বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধে কোনরূপ প্রসঙ্গই করা হয় নাই, এই আপত্তি কেহ কেহ করিতেছেন। তিনি তদুত্তরে বলেন, প্রবন্ধটিতে আমার নিজের মনের যে ভাব, তাহাই প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; সমাজের শিক্ষক হইবার প্রত্যাশা আদৌ নাই। সে ভার তিনি অপরের উপর দিতেছেন। তিনি বলেন,—কিছু দিন পূর্ব্বে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তাঁহার মন দারুণ বিষাদসাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। তিনি সকল দারিদ্র্য ও দীনতার পরিপূরক ভগবানের করুণার উপর নির্ভর করিতে শিখিয়া সেই বিষাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। সুতরাং তাঁহার হৃদয়ের এই অবস্থাই তিনি তাঁহার প্রবন্ধে প্রকটিত করিয়াছেন; আর তাঁহার প্রবন্ধ মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে, অভাবমোচনের কোনও উপায় যে একেবারে দেখিতে পাওয়া যায় না, এমন নহে। তিনি ব্যাধির কারণ সমুদায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সেই কারণগুলির বিলোপসাধন করিতে পারিলে ব্যাধিরও উপশমের আশা করা যাইতে পারে। তিনি আন্দোলনের বিরোধী নহেন, কিন্তু যে ভাবে ও যে উদ্দেশ্যে আন্দোলন হওয়া আবশ্যক, বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। কংগ্রেসের আন্দোলনের কথা উঠিল। তিনি বলেন, উহার সভ্যগণ অনেকেই কেবল আত্মোন্নতি ও যশোলাভের উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হন; প্রকৃত নিষ্কাম দেশহিতৈষণা অতি অল্প সভ্যেরই আছে।

১৮ই অগ্রহায়ণ।—শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত" কয়েক দিবস পাঠ করিয়া আজ শেষ করিলাম। মিল এক জন অসাধারণ মনস্বী পুরুষ ছিলেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার সকল মতের উপর আমাদের আস্থা না থাকিলেও, তিনি যে অতি উজ্জ্বল প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু মিল নিজে আপনাকে অসাধারণ বুদ্ধিবৈভবশালী বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তিনি বলিয়াছেন,—তাঁহার মত অবস্থা ও শিক্ষায় অনুকূল সহায়তা পাইলে, অনেকেই তাঁহার ন্যায় উন্নতিসাধনে সক্ষম হইতে পারেন। অনুশীলনে ও উপদেশে বুদ্ধির প্রাখর্য্য জন্মে, এ কথা ঠিক। কিন্তু যাহার স্বাভাবিক শক্তি অতি সামান্য, অনুশীলনের দ্বারা সে যে আপনাকে একটা অসাধারণ লোকে পরিণত করিতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। মিলের উক্তি যতটা তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক, ততটা সত্যের আধার নহে। যোগেন্দ্র বাবু মিল ও কোম্‌ট্‌কে জগতের শ্রেষ্ঠ উপকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইংরাজীতে কৃতবিদ্য আরও দুই এক জন লোকের মুখে আমরা এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি কখনও কখনও শুনিতে পাই। আমার মনে হয়, যাঁহারা কেবল দার্শনিক বা সামাজিক কয়েকটা মতামতের সৃষ্টি করিয়া যান, তাঁহাদের সেই সকল মতামত সত্য হইলেও, শুদ্ধ সেই কারণে তাঁহাদিগকে জগতের উপকর্ত্তার গৌরব প্রদান করিতে পারা যায় না। মানুষের মত অভ্রান্ত নহে; আজিকার যাহা স্বীকৃত কথা, কাল তাহা উল্টাইয়া যাইতে পারে! আর, আমাদের স্বদেশীয় প্রাচীন ঋষিদিগের সহিত তুলনা করিলে, এ বিষয়েও মিল কোম্‌টের ন্যায় লোক নিষ্প্রভ হইয়া যান। আমার বিশ্বাস, যে সকল মহাত্মা মানুষের ধর্ম্মজীবনকে উন্নত করিয়া স্বর্গের পথে, আদর্শের পথে তাহাদিগকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত উপকর্ত্তা নামের উপযুক্ত। এই কারণে আমি বাঙ্গালার কৃত্তিবাস ও কাশীরামকেও মিল কোম্‌টের উপরে স্থান দিতে চাহি।

১৯শে অগ্রহায়ণ।—অন্ধ ধর্ম্মসংস্কারবশতঃ কত কুপ্রথাই যে এই ভারতবর্ষের নানা স্থানের নানা জাতির মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সম্প্রতি "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে ইহার এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত পাঠ করিতেছিলাম। মান্দ্রাজের মালাবার প্রদেশে নায়ার জাতির বাস। এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে নাম্বুদিরি বলে। এই নাম্বুদিরি-নামধারী ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, তাঁহারা ভগবানের অবতার পরশুরামের বংশধর। এই পরশুরাম সমুদ্রগর্ভ হইতে মালাবার প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া উহাকে মানুষের বাসভূমিতে পরিণত করেন। এবং সম্পত্তির বিভাগ-নিবারণার্থ এই নিয়ম সংস্থাপিত করেন যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ভিন্ন আর কেহ ব্রাহ্মণপত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে না! পরিবারভুক্ত অপরাপর ব্যক্তিগণ নিম্নতরজাতীয়া স্ত্রীদিগের মধ্যে পশুবৎ যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া আপনাদের কামলালসা পরিতৃপ্ত করিতে পাইবে। সে বিষয়ে উহাদের স্বামী বা অভিভাবকগণ কোনও আপত্তি উত্থাপন করিলে, তাহা বাতিল বা নামঞ্জুর বলিয়া গণ্য হইবে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ যথা,—"আমার আবিষ্কৃত এই দেশে ব্রাহ্মণেতর-জাতীয়া রমণীদিগের মধ্যে কাহারও সতীত্ব থাকিবে না। উক্ত ধর্ম্ম কেবল ব্রাহ্মণরমণীরই প্রতিপাল্য। সতীত্ব ইতর নারীর ধর্ম্ম নহে। আমি এই সত্য স্থাপিত করিলাম।" এই শাস্ত্রীয় প্রমাণের দোহাই দিয়া অনেকে এই কুৎসিত প্রথার সমর্থন করিয়া আসিতেছে। মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মানুষ যে আদৌ পশুমাত্র ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। নীতি, পবিত্রতা, ধর্ম্ম, আদর্শ সভ্যতার জ্ঞান লাভ করিতে তাহার যে কত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কে বলিতে পারে? হায়! আজিও আমরা অপবিত্রতার পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া রহিয়াছি। কবে আমাদের উদ্ধার হইবে, স্বয়ং ভগবানই বলিতে পারেন!

২০শে অগ্রহায়ণ।—আজ আড়াইটার গাড়ীতে কলিকাতায় আসিয়া পঞ্চুকে দেখিলাম। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করিতেছিলাম, শিশুটি তখন রেকাবে করিয়া খৈ খাইতেছিল। খৈগুলি অনেক কাঁদিয়া তবে সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু আমাকে দেখিবামাত্র দুই হাতে করিয়া সেই প্রিয়খাদ্য-পরিপূর্ণ রেকাব ছুঁড়িয়া, ছড়াইয়া ফেলিয়া দিল। সম্মুখে একটি মুণ্ডহীন মৃত্তিকার গাভী পড়িয়াছিল, তাহার দুর্দ্দশাও রেকাবের অনুরূপ হইল! আমি দুই হাত বাড়াইলাম। শিশুটি সোল্লাসে আমার কোলে উঠিয়া আরও নানা-

বিধ উপায়ে তাহার অকথিত আনন্দের পরিচয় দিতে লাগিল। আমি তাহার আজিকার এই নূতন অভিনয় দর্শন করিয়া হর্ষবিহ্বল হইয়া পড়িলাম। হায়! আমাকে দেখিয়া শিশু-হৃদয়ের এই উল্লাস কেন! আমার সহিত তাহার কিসের সম্বন্ধ, কে তাহাকে বলিয়াছিল! ইহার ভিতর যে গভীর রহস্য নিহিত রহিয়াছে, কে তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করিবে? এই অপরিস্ফুটবাক্ অজাতচলচ্ছক্তি সুকুমার শিশুর অন্তর প্রদেশে অবগাহন করিয়া কে তাহার অজ্ঞাত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিবে? আমরা সংসারের সঙ্কীর্ণবুদ্ধি মানবশিশু। আমরা কেবল সুখের সময়ে বাক্যহীন শুভ্রহাস্য, আর দুঃখকালে মর্ম্মান্তস্পর্শী অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে পারি। বুঝাইতে বা বুঝিতে ত কিছুই পারি না। আনন্দের প্রকৃত কথা কোথায়? বিষাদের সহজ সরল ভাষাই বা কই? সুখ বা দুঃখ যখন প্রকৃত সুখ দুঃখে গিয়া সমুপস্থিত হয়, তখন ত আর মর্ত্ত্যের অভিধানে কুলায় না। তাই আশা করিয়া বসিয়া থাকি, কবে সেই পূর্ণতার দেশে সর্ব্ববিধ অপূর্ণতার সহিত মানুষের ভাষার অপূর্ণতাও ঘুচিয়া যাইবে।

২১শে অগ্রহায়ণ।— * * * "বর্ষার বোধন" অগ্রহায়ণের "নব্যভারতে" প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ষা থাকিতে থাকিতে বাহির করাই আমার অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় তত্তটা অনুগ্রহ করেন নাই। এবারে বোধ হয় কবিতাটির দ্বারা "চ, বৈ, তু, হি" র কাজটা সারিয়া লইয়াছেন! কবিতার নির্ব্বাচন বিষয়ে সম্পাদক মহাশয়-দিগের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অনেক সময়ে সাময়িক পত্রে লেখা বন্ধ করিয়া দিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু কেমন মানুষের মন, কেমন প্রশংসার মোহ, ইচ্ছাটা কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা পারা যায় না। আমার কবিতায় আজকাল কেহ কেহ বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন দেখিয়া বড়ই প্রীত হইয়াছি।

২২শে অগ্রহায়ণ।—ধর্ম্মবক্তা ও দার্শনিক মহাশয় বলিতেছেন,—জীবন যদি এতই দুঃখময়, তবে এই জীবনের যখন অবসান হয়, তখন তোমরা এত ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দাও কেন? যাহা দুঃখময়, তাহার বিলোপই ত বাঞ্ছনীয়; কারণ, তাহাতেই মানুষের সুখ। আমি এ সকল দার্শনিক তত্ত্ব, বাক্‌বিতণ্ডা ভাল বুঝিতে পারি না। কিন্তু আমি মৃত্যুর সহিত কখনও আত্মীয়তাস্থাপন করিতে পারিলাম না। জীবন প্রধানতঃ দুঃখের, অন্ততঃ

আমার পক্ষে তাহাতে আপত্তি করিবার যো নাই। তথাপি এই দুঃখময় জীবনের প্রতি এত অনুরাগ কেন, তাহার কারণ অনুধাবন করিয়া দেখিলে কতকাংশে হৃদয়ঙ্গম হয়। জীবন দুঃখময়, স্বীকার করিলাম; কিন্তু মৃত্যু যে ইহা অপেক্ষাও দুঃখময় নহে, তাহার নিশ্চয়তা কি? অবশ্য যাঁহারা ধার্ম্মিক, ঈশ্বরের মঙ্গলময় অস্তিত্বে একান্ত বিশ্বাসবান, তাঁহাদের মনে এ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, এমন কথা বলি না। আমি ধার্ম্মিক নাই; আর যতই আত্মপ্রতারণা করি না কেন, সেই পরমপুরুষের পাদপদ্মে এখনও রীতিমত বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই। আমি যাহা পাইয়াছিলাম, বা পাইতেছি, তদপেক্ষা নিশ্চিত আর কোনও পদার্থের কথায় প্রকৃত প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার এই হৃদয়-ভরা স্মৃতি, আমার নয়নান্তরবর্ত্তী বর্ত্তমানের এই জীবন-প্রবাহ, ইহারা আমার নিকট সুখেরই হউক, আর দুঃখেরই হউক, অতিশয় প্রিয়। আমি ইহাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইব? যে সুখ অতীতের হস্তে সমর্পণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার স্মৃতি ত আজিও বর্ত্তমান। আমি ত তাহাকে প্রত্যহ এই পবিত্র অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতে পারিতেছি। ইহাই আমার সুখ। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝি, তাহা ত পরিপালন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে পাইতেছি। ইহাই আমার সুখ।

২৩শে অগ্রহায়ণ।— * * * শিশুটিকে লইয়া বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। সে যে ভিতরে ভিতরে কত ক্লেশই ভোগ করিতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? বাক্যহীন শিশু কিছুই প্রকাশ করিতে পারে না। আজকাল তাহার প্রফুল্লতা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু কমিয়া গিয়াছে। মধ্যে দিন কতক যেরূপ হাসি খেলা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাতে আমার মন অনেকাংশে সুস্থির ছিল। সম্প্রতি আবার তাহার অপ্রফুল্ল ভাব দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িতেছি। অসহায় শিশুটির জন্যে অর্থব্যয়ের ত্রুটী করিতেছি না। কিন্তু ভগবান সদয় না হইলে মানুষের কোনও চেষ্টাই ফলবতী হয় না। তিনি যে কি মঙ্গল উদ্দেশ্যে আমাকে এইরূপ নানাবিধ বিষাদ-চিন্তায় জড়ীভূত করিয়া রাখিতেছেন, তাহা তিনিই জানেন। আমি মধ্যে মধ্যে তাহাই ভাবি। ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনার অন্ত খুঁজিয়া পাই না। এই দুর্ব্বল মানব-হৃদয়ের বল পরীক্ষা করাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য? হায়! যে প্রতি মুহূর্ত্তেই শক্তিহীনের একমাত্র শক্তি অশ্রুবর্ষণের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহার আবার বলের পরীক্ষা? কিসের

পরীক্ষা করিবে প্রভু! যখন পাঠাইয়াছিলে, তখন ত মানুষকে রোদন ভিন্ন আর কোনও বল প্রদান কর নাই। তবে তুমি যে সংসারে পাঠাইয়াছ, তুমি ডাকিয়া ফিরাইয়া লইবার পূর্ব্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া কাপুরুষত্বের পরিচয় দিব না। এ প্রতিজ্ঞা তোমার নিকট করিতেছি। "যুঝিয়াছি বীরবেশে", আর সেই বীরবেশে যুঝিবার জন্য এখনও প্রস্তুত রহিয়াছি।

২৪শে অগ্রহায়ণ।— * * শিশুটির নিমিত্ত চিন্তা আবার বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিয়াছে।

বৈকালে সু—চন্দ্রের আলয়ে, "নব্য-ভারতের" প্রিয় কবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস মহাশয়কে দেখিলাম। লোকটিকে বেশ মিষ্ট ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়া মনে হইল। ইনি কিরূপে "সাহিত্য"-সম্পাদক মহাশয়কে কুকুর, বিড়াল, ধোবা বলিয়া গালাগালি করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমি গোবিন্দ বাবুর কবিতার তাদৃশ অনুরাগী নহি; ইঁহার বেশী কিছু ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। কিন্তু লোকটিকে দেখিয়া চেহারায় আকৃষ্ট না হইলেও কথায় সন্তুষ্ট হইলাম। কবি সম্প্রতি অর্থাভাবে কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এ বিষয়ে কবির একটা উপায় করিয়া দিউন।

২৫শে অগ্রহায়ণ।—পাঠ্যাবস্থায় যখন স্পেন্সারের "First Principles" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন করি, তখন ইহার সর্ব্বস্থল ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই। কত কালের পর আজ আবার ইহা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। Spencer জগতের আদি কারণ সম্বন্ধে সকল প্রকার ভাবের বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতেছেন যে, ঈশ্বরে আরোপিত কোনও গুণই আমারা প্রকৃতপক্ষে মনের ভিতর আয়ত্ত করিতে পারি না! আর তাহা পারিলেও একটি ভাবের সহিত আর একটির সামঞ্জস্য হয় না। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের কথা সত্য, স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহার একটা বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। মানুষ ভগবানকে জানিতে চায়। কিন্তু জানিতে পারে না। তিনি নিজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত নূতন নহে। সকল ধর্ম্মের অভ্যন্তরেই ইহা বিদ্যমান; সকল ধর্ম্মবাদী মনুষ্য কর্ত্তৃক ইহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা না হইলে ধর্ম্মের ভিত্তিই থাকিত। না মানুষ বিশ্বের কারণ ভগবানকে বুঝিতে পারে না বলিয়াই ত তাঁহার প্রতি ঐ সকল আয়ত্তাতীত বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছেন। অজ্ঞ মানুষ যখন সাধনা বা তপস্যার ফলে সেই পরমপুরুষকে আয়ত্ত করিতে

সমর্থ হয়, তখন ত সে আর মানুষ থাকে না। তিনি তখন ঈশ্বরত্বে লীন হইয়া যান। যত দিন তাহা না পারি, তত দিনই ধর্ম্মের প্রয়োজন। তাই আমরা গৃহে গৃহে তাঁহার পবিত্র সুন্দর মূর্ত্তি কল্পিত করিয়া, সেই দেবপ্রতিমার চরণযুগল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিতেছি। কবে করুণাময় করুণা করিয়া আমাদের অজ্ঞানের অবসান করিয়া দিবেন। আমরা জ্যোতির্ম্মধ্যে বিলীন হইয়া যাইব।

২৬শে অগ্রহায়ণ।—আজিকার দিনটা স্কুলের নির্ব্বাচন-পরীক্ষার গোলমালে কাটিয়া গেল। প্রাণের ভিতর কেমন এক রকম চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা অনুভব করিতেছি। প্রকৃতিটা এইরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রাত্যহিক জীবন সচরাচর যেই ভাবে কাটিয়া যায়, তাহার অতিরিক্ত কিছু হইলেই যেন সব বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। মনের স্বাভাবিক সেই শান্ত, নিষ্কম্প ভাব আর থাকে না। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা নিত্য নিত্য নূতন কোনও একটা কিছুতে মত্ত হইতে না পারিলে হৃদয়ের স্থিরতা হারাইয়া ফেলেন। একই ভাবে, অবিরামগতি নদীস্রোতের ন্যায় একই পথে তাঁহাদের জীবনকে পরিচালিত করিতে হইলে, তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। আমার বন্ধুদিগের মধ্যেই কাহারও কাহারও এরূপ প্রকৃতি দেখিতে পাই। কিন্তু, আমি আপনার হৃদয় নিজে যত দূর বুঝিতে পারি, উহা নিত্য নূতন উত্তেজনার একান্ত বিরোধী। এই প্রকৃতিটা কত দূর স্বোপার্জ্জিত, এবং কত দূরই বা অবস্থা ও ঘটনার ফল, তাহা বুঝিতে পারি না। আজিকার এই অশান্তির আর একটা কারণ রহিয়াছে। পঞ্চুরামের * * * ঔষধের কোনও রূপ ব্যবস্থা করিয়া আসি নাই। তাড়াতাড়ি ভুলিয়া গিয়াছি। কেবল আজ সকালে একবার ডাক্তার বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলাম। তাহার কত দূর কি হইল, শিশুটি কেমন আছে, নূতন ঔষধের প্রয়োজন হইল কি না, এই সকল চিন্তাও আজিকার উদ্বেগের কতকটা কারণ। চাঞ্চল্য, অস্থিরতা, অশান্তি, তরঙ্গবিক্ষোভ প্রভৃতির হস্ত হইতে একেবারে উদ্ধার হইয়া, যদি শান্ত সুস্থির ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় এ জীবন যাপন করিতে পারিতাম, না জানি তাহা কত সুখেরই হইত।

২৭শে অগ্রহায়ণ।—কলিকাতায় আসিয়া পঞ্চুকে দেখিলাম। শিশুটি ঘুমাইয়া ছিল। কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া আমার সাড়া পাইয়া কোলে আসিল। শুনিলাম, এ কয় দিবস সে অত্যন্ত অস্থিরতা প্রকাশ করিয়াছে।

যেন তাহার মনে একটুও স্বচ্ছন্দতা ছিল না। গত কল্য সকালে বহুক্ষণ ধরিয়া কেবল কাঁদিয়াছে। কোনও উপায়েই সহজে নিবৃত্ত ও শান্ত করিতে পারা যায় নাই। আমার মনে হইল, শিশুটি নিশ্চয়ই ভিতরে ভিতরে কোনও অসুখ অনুভব করিতেছে। নহিলে আর কি কারণ হইতে পারে? * * *

বন্ধুবর হীরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল। "চৈতন্যের দেহত্যাগ" কবিতার প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন, চৈতন্য দেবের মৃত্যু সম্বন্ধে আর একটা যে কাহিনী আছে, তাহাই অবলম্বন করিলে ভাল হইত। তিনি বলেন,—চৈতন্য বাস্তবিক জগন্নাথের দেহে মিশাইয়া যান। আমি এই অদ্ভুত কাহিনীতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না। আর কবিতাটি যখন লিখিত হয়, তখন চৈতন্য দেবের মৃত্যু সম্বন্ধে সকল প্রবাদগুলির আলোচনা করিবারও অবকাশ ছিল না। আমি যে দৃশ্য বর্ণনা করিয়াছি, তাহারই সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উহা যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২৮শে অগ্রহায়ণ।— * * * আমার স্বর্গীয়া প্রিয়তমে! অনেক দিন তোমার কথা স্মরণ করিয়া আমার নয়নযুগলে অশ্রুবিন্দুর আবির্ভাব হয় নাই। তাই বলিয়া এমন মনে করিও না যে, আমি তোমাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার স্মৃতি এই প্রাণের ভিতর এরূপ সুস্পষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহাকে তোমার সহিত সংযুক্ত পার্থিব কোনও পদার্থের সাহায্যে জাগাইয়া তুলিতে এখনও সাহস হয় না। তুমি এখানে, আমার এই দাসত্বের স্থলে আসিয়া কয়েক দিবস যে গৃহে বাস করিয়াছিলে, আমি তাহার পার্শ্ব দিয়া যাতায়াত করিতেও ভীত হই। তুমি সেই জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া, আমার স্কুলে আসিবার কালে, আমাকে যতক্ষণ দেখা যায়, দেখিবার নিমিত্ত নির্নিমেষে চাহিয়া থাকিতে; আমার কেবল তাহাই মনে পড়ে। এখন আমি আবার সেই পথে সেই জানালার পাশ দিয়া যাইব; অথচ তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে না, ইহা কোন্ প্রাণে সহ্য হইবে? এই কারণে আমি আর তোমার মাতৃভবনেও যাই না; তাঁহারা আমাকে কত অনুরোধ করিয়া পাঠাইতেছেন, হয় ত আমাকে নিষ্ঠুর নির্ম্মম মনে করিয়া কত দুঃখ করিতেছেন। কিন্তু আমি আর কেমন করিয়া সেখানে যাইব? তুমি ত সেখানে নাই; চারি দিক হইতে সহস্র স্মৃতি উচ্ছ্বসিত হইয়া যখন আমাকে ঘেরিয়া ফেলিবে, তখন কে এই হতভাগ্যের হৃদয়কে সান্ত্বনা করিবে।

২৯শে অগ্রহায়ণ।—হায়! শত তপস্যার ফলস্বরূপ এই মানব-জীবন লাভ করিয়া ইহার কি সদ্ব্যবহার করিলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিলে প্রাণ মন নৈরাশ্য-সাগরে মগ্ন হইয়া যায়। মাঝে মাঝে এই চিন্তা মনের মধ্যে উদিত হইয়া আমাকে অস্থির ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। দুঃখ কষ্ট যথেষ্ট ভোগ করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের যে শিক্ষা, তাহা তেমন হইল কৈ? লোকে বলে, বিপদে পড়িলে মানুষের মন ধর্ম্ম ও পবিত্রতার দিকে স্বভাবতই ধাবিত হয়। আমার ত তাদৃশ কিছুই হইল না। আমি যে অস্থিরমতি, কর্ত্তব্য-বোধবিহীন, প্রেমভক্তিপরিশূন্য পাষাণ ছিলাম, তাহাই রহিয়াছি। দুঃখের অনল অতি অল্প বয়সেই হৃদয়ের ভিতর জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার আত্মার পরিশুদ্ধি ত ঘটিল না। এখনও পাপচিন্তা ও পাপপ্রবৃত্তির ক্লেদরাশি ইহাকে আয়ত্ত করিয়া রহিয়াছে! হায়! আমি চাই আমার অন্তর বাহির, দেহ মন, সমস্তই যেন শুভ্র, নিষ্কলঙ্ক, সদ্যঃপরিস্ফুট পুষ্পরাশির ন্যায় প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তজ্জন্য চেষ্টা যে করি না, এমন নহে। তবে সে চেষ্টায় তেমন একাগ্রতা নাই। একাগ্রতা আমি কোনও বিষয়েই লাভ করিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ দেহ ও মন উভয়েরই শক্তি সামর্থ্য ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কোন্ মুহূর্ত্তে সংসার ত্যজিয়া যাইতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। মনে হয়, জীবন যদি আবার নূতন আরব্ধ হয়, তবে এবার প্রথমাবধি ইহাকে সাধুতার পথে নিয়মিত করিতে যত্নবান হইব। সে আশা দুরাশামাত্র; এখন কেবল বিশ্বশরণের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায় নাই।

১লা পৌষ।— * * * শিশুটি সম্বন্ধে কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। কয়েক সপ্তাহ হইতে "বঙ্গবাসী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় "কবি কাননবালা" ইতিশীর্ষক একটা ব্যঙ্গাত্মক জীবনী প্রকাশিত হইতেছে। লেখকের রুচির আদৌ প্রশংসা করা যায় না? রহস্যাত্মক রচনায় কতকটা অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় বটে, কিন্তু ভদ্র রুচির অতিক্রম কিছুতেই সহ্য করিতে পারা যায় না। তাহার উপর লেখক যদি বাস্তবিকই আমাদের কোনও মহিলা-কবির উপর আক্রমণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনার অতীত। আমার বন্ধুদের ন্যায় আমি লেখককে হঠাৎ ব্যক্তিগত বিদ্রূপের দোষে দোষী করিতে চাহি না; তাঁহার রুচি ও বর্ণনার ভঙ্গী যে একটু বিশুদ্ধ করা উচিত ছিল, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি। শুনিলাম, লেখক মহাশয় আমাদের পরিচিত এক জন এম্. এ. ইনি দুই একটা কবিতাও

লিখিয়া থাকেন, কবিতার অপেক্ষা ইঁহার গদ্যে হাত ভাল। উপস্থিত রচনার ভাষায় বাহাদুরী আছে।

২রা পৌষ।—সু—চন্দ্র আমার কবিতাবলী হইতে একখানা সংগ্রহ-পুস্তক বাহির করিবার প্রস্তাব করিতেছিলেন। সম্প্রতি ইহাতে আমার তেমন আগ্রহ নাই; কারণ, বাঙ্গালা দেশ এখনও প্রকৃতপক্ষে কবিতার আদর করিতে শিখে নাই। অপরাপর কবিগণের প্রকাশিত পুস্তকের দুর্দ্দশা দেখিয়া এই বিশ্বাসই মনে উদয় হয়। রবীন্দ্র বাবুর কবিতা-গ্রন্থ কতকটা বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু তাহাও আশানুরূপ নহে। আমার গ্রন্থ-প্রকাশে ইহার অপেক্ষা গুরুতর আপত্তি আছে। আমার রচিত কবিতার সংখ্যা এখনও এমন হয় নাই যে, উহা হইতে একখানা পুস্তকের উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে। আজকাল কাব্য সম্বন্ধে আমাকে মৃত বলিলেও চলে। প্রথম বয়সে, প্রথম উচ্ছ্বাসে যাহা কিছু লিখিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলাম, কয়েক বৎসর ধরিয়া কেবল তাহাদের লইয়াই নাড়াচাড়া করিতেছি। এখন সংবৎসরে দুই তিনটার অতিরিক্ত কবিতা এই মৃতপ্রায় লেখনী হইতে বহির্গত হয় কি না, সন্দেহ। দুর্দ্দশা বড় সামান্য নহে। যাহাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া তুলিয়াছি, তাহারই এই অবস্থা। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় এই ডায়েরীর নূতন নূতন এক একটা পৃষ্ঠা ছাই ভস্ম দিয়া পুরাইবার সময়েই বুঝিতে পারি যে, এক একটা দিন চলিয়া যাইতেছে। নহিলে দিনগুলা যে কোথা দিয়া কিরূপে চলিয়া যাইতেছে, এ জগতে অথবা এ জীবনে তাহার চিহ্নমাত্রও থাকিত না। থাকিত কেবল একটি মর্ম্মভেদী ক্রন্দন—"নিতান্ত কি হে দেবতা! এ দুরন্ত রণে পরাজয় হবে মোর?"

৩রা পৌষ।—ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এতটা বিবাদ কেন, আমি কোনও মতে বুঝিতে পারি না। উভয়ই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহ নাই। তবে বিজ্ঞানের সত্য ধর্ম্মের বিশালতর সত্যের অন্তর্নিহিত; কারণ, ধর্ম্মই ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার সত্যের সমষ্টি। সুতরাং এই হিসাবে দিন দিন বিজ্ঞানের যেমন উন্নতি হইতেছে, এই জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে যত নূতন নূতন তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, ধর্ম্মের প্রসার ও আধিপত্য ততই বিস্তৃত হইতেছে। ধর্ম্ম একমাত্র মানুষের হৃদয়ের উপর নির্ভর করিয়া যে সকল তত্ত্বের উপলব্ধি করিয়াছে, বিজ্ঞান বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে এ পর্য্যন্ত কেবল তাহারই সমর্থন করিয়া আসিতেছে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বিষয়ে বিজ্ঞানবাদী কয়েকটি মত প্রচার

করিয়াছেন। কিন্তু যে মতই অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাতে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা সেই মহান পুরুষের মহিমার বৃদ্ধি বই হ্রাস হইতেছে না। Herbert Spencer এই বিষয়ে বেশ কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। তিনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের যে সাধারণ সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমার বোধ হয়, সেরূপ কোনও পার্থক্যের আদৌ কোনও প্রয়োজন নাই। তবে য়ুরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী যে অর্থে ধর্ম্ম শব্দের ব্যবহার করেন, তাহাতে তাহার উপরি-উক্ত সীমা সংস্থাপন নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। পাশ্চাত্য Religion শব্দ আমাদের ধর্ম্মের সহিত একার্থবাচক নহে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যাহা বিজ্ঞান নহে, কেবল বিশ্বাস, তাহাই Religion। আমাদের ধর্ম্ম সমগ্র বিশ্বের ধারয়িতা; বিজ্ঞান উহার চরণের রেণুমাত্র।

৪ঠা পৌষ।—হায়! কত দিনে জগতের এই মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদের অবসান হইবে? সমগ্র বিশ্ব আকুলহৃদয়ে সজলনয়নে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে; কিন্তু প্রতীক্ষা করিয়া জগৎ ক্রমশঃ শ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে; এই দারুণ বিষাদবেদনা, দুঃখ দুর্ব্বলতা তাহার হৃদয় মনকে দিন দিন অবসন্ন করিয়া ফেলিতেছে। তবে ভগবান মানুষের একটা উপায় করিয়া দিয়াছেন বটে। সংসারের সুখরাশি ক্ষণিক ও অপ্রকৃত হইলেও, মানুষ তাহার স্রোতে এরূপে ভাসিয়া যায় যে, অনেক সময় সে তাহার প্রকৃত কঠোর দুঃখগুলির কথাও বিস্মৃত হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ কোনও দুঃখই মানবের মনকে অধিক দিন অভিভূত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহা[illegible] সুখলালসা এত দূর প্রবল যে, কদাচিৎ কোনও উপায়ে বিন্দুমাত্র সুখের প্রত্যাশা থাকিলে, সে সূর্য্যালোকপিপাসু পাদপের ন্যায় বাহু প্রসারিত করিয়া তাহারই অভিমুখী হইয়া পড়ে, দুঃখ দারিদ্র্যের অন্ধকার হইতে তাহার সমস্ত চিন্তারাশি সঙ্কুচিত করিয়া লয়। মানব-পশুর প্রকৃতিই এইরূপ। তাহার হৃদয়ে দুঃখাপেক্ষা সুখেরই প্রভাব বেশী। সেই কারণেই সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে এ কাল পর্য্যন্ত এত যন্ত্রণা সহ্য করিয়া বসুন্ধরা আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন। কত কাঙাল সন্তান জীবন ব্যাপী রোদনের পর তাঁহার কোলে অন্তিম বিশ্রাম লাভ করিয়াছে; কিন্তু তিনি তাঁহার সুখী সন্তানদিগের সৌভাগ্যে বিহ্বল হইয়া হয় ত তাহাদের কথা একবারও ভাবিবার সময় পাইতেছেন না।

মস্তকের মূল্য।

—:*:—

১

প্রাচীললাটে উষার হিরণ্ময় মুকুট উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুপ্ত সুন্দরীর জাগরণের ন্যায় বনরাণীর ললিত, পেলব দেহে প্রাণস্পন্দন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। সমরসিংহ সাজি-ভরা, শিশির-স্নাত ফুলের গুচ্ছ সহ কুটীরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দেখিল, গৃহে কেহ নাই। গুরু-দেব স্নান সারিয়া এখনও ফিরেন নাই? আজ এত বিলম্ব হইয়াছে কেন?

গৃহের এক পার্শ্বে সাজি রাখিয়া সমর ডাকিল, "অজয়!"

কেহ উত্তর দিল না। তখন সমরসিংহ বাহিরে আসিয়া একখানি বড় পাথরের উপর বসিল। তার পর অনুচ্চকণ্ঠে স্বরচিত একটি ভজন গাহিতে লাগিল।

অদূরে গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের বিরাট দেহ প্রথম সূর্য্যরশ্মির অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত, কুহেলিকামুক্ত নীল অরণ্য, কুসুমচিত্রিত লতাকুঞ্জ স্বপ্নদৃষ্ট পরীরাজ্যের ন্যায় জাগিয়া উঠিতেছিল। নীল শূন্য কি উদার, কি মহান্, কিপবিত্র! বিশ্বলক্ষ্মী কি মুক্তহস্তে সমস্ত সৌন্দর্য্য এই তপোবনে ঢালিয়া দিয়াছেন?

সমরসিংহ গান ছাড়িয়া মুগ্ধের ন্যায় বনলক্ষ্মীর বিচিত্র শোভা দর্শন করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় একান্ত আগ্রহভরে যেন প্রকৃতির এই অমৃত-সুষমা পান করিতেছিল। এ সৌন্দর্য্য তাহার পক্ষে নূতন নহে। আজ দশ বৎসর সে এই পুণ্য তপোবনের স্নেহক্রোড়ে লালিত; তথাপি এখনও সমরের মনে হয়, প্রকৃতি রাণী প্রতি উষায় নূতন সৌন্দর্য্য, নবীন সুষমার অর্ঘ্য লইয়া বিশ্বদেবতার অর্চ্চনা করিতে আসেন! এই পবিত্র কাননে, ঐ বিহগ-কাকলীমুখর বনচ্ছায়ায় বসিয়া সে কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন অভ্যাস করিয়াছে! ঐ প্রশস্ত তৃণমণ্ডিত ভূমির উপর তাহার অস্ত্রবিদ্যা ও মল্লযুদ্ধের সহিত প্রথম পরিচয়! এই প্রস্তরাসনেই তাহার সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রথম অনুশীলন। শরতের

স্নিগ্ধ মধুর প্রভাতে গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া সে যখন ঋষি কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের অপূর্ব্ব কাব্যসুধা পান করিত, কালিদাস, ভবভূতি ও মাঘের বিচিত্র শ্লোকরাজির ব্যাখ্যায় ও বিশ্লেষণে রত থাকিত, তখন পুষ্পগন্ধব্যাকুল পবন উষার কিরণ মাখিয়া তাহার গ্রন্থের পাতায় পাতায় খেলা করিত, তাহার কল্পনাকে মুখর করিয়া তুলিত। অতীতের বিশ্বপ্লাবী গৌরবভাতি বর্ত্তমানের নিবিড় তমোজাল বিদীর্ণ করিয়া ভবিষ্যতের প্রসন্ন আকাশে কখনও কি বিপুল উচ্ছ্বাসে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে না?

সমরসিংহ কল্পনার স্বপ্নে, সৌন্দর্য্যের ধ্যানে এত নিবিষ্ট হইয়াছিল যে, গুরুদেব শঙ্কর স্বামী কখন তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহা সে অনুভব করিতে পারে নাই।

"সমর!"

গুরুর আহ্বানে শিষ্য চমকিতভাবে পশ্চাতে চাহিল। আত্মবিস্মৃতির জন্য লজ্জায় তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল।

স্নিগ্ধ, প্রশান্ত স্বরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বৎস, তোমার পিতা তোমাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত লোক পাঠাইয়াছেন। তোমার শিক্ষাও সমাপ্ত হইয়াছে। আমার যাহা কিছু বিদ্যা ছিল, সমস্তই তোমাকে দান করিয়াছি। এখন গৃহে যাও। তোমার পিতার এইরূপ অভিপ্রায়, আমারও আদেশ। অজয় কোথায় গেল? আহারাদির পর যাত্রার আয়োজন কর।"

শিক্ষা সমাপ্ত? মনুষ্য-জীবনে যে শিক্ষার অন্ত নাই, আজন্ম-তপস্যায়ও যে জ্ঞানসমুদ্রের রত্নরাজির আহরণ অসম্ভব, বাইশ বৎসর বয়সে সমরসিংহ সেই অনন্ত জ্ঞান রাজ্যের অধিকারী?—শিক্ষার সমাপ্তি? কিন্তু গুরুদেবের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, অবশ্যই তাহা পালন করিতে হইবে; পিতারও তাহাই অভিপ্রেত;—প্রতিবাদ অশোভন।

তুষারকিরীটী হিমালয়! প্রিয়তম শৈলরাজি! আজ এই শেষ দেখা! কলনাদিনী, জাহ্নবীর স্ফটিকস্বচ্ছ পুণ্যসলিলে আজ শেষ স্নান! ফলপুষ্পিতা বনরাণী, তোমার স্নেহক্রোড়ে সমরসিংহ আর কি বিশ্রামশয্যা পাতিবে না?

যুবক ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে নীল শূন্যে চাহিল। তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ও কি? নয়নপল্লবে মুক্তা দুলিতেছে?

"বৎস, কাতর হইও না। গীতার উপদেশ স্মরণ কর। শুধু শাস্ত্র আলোচনাই মানবের একমাত্র ধর্ম্ম নহে। কর্ম্ম দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে না

পারিলে শিক্ষা ব্যর্থ। তোমার সম্মুখে বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। এত দিন যাহা শিখাইয়াছি, কর্ম্মে তাহার ফল দেখিতে চাই।"

সমর আত্মসংবরণ করিয়া যুক্তকরে বলিল, "আপনিও আমাদের সঙ্গে যাইবেন ত? গুরুদক্ষিণা না দিলে আমার সমস্ত শিক্ষা ব্যর্থ হইবে।"

স্বামীজী হাসিলেন। সে হাস্য কি মধুর, কি আনন্দদীপ্ত! শিষ্যের মস্তকে হস্ত রাখিয়া প্রীতিভরে ব্রহ্মচারী বলিলেন, "না সমর, আমি এখন যাইব না। প্রয়োজন বুঝিলে তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। আর দক্ষিণার কথা? তুমি ত জান বৎস, সন্ন্যাসীর কোনও বস্তুতে অধিকার নাই। ধনরত্নাদির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে উদিত হইলেই সন্ন্যাস ব্যর্থ হয়। আমার যাহা কিছু, সমস্তই ভগবানে অর্পিত। তবে আমিও মানুষ, সুতরাং কামনাকে সম্পূর্ণ জয় করিতে পারি নাই। একটা বাসনা আমার হৃদয়কে এখনও আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। সে কামনা বাল্যে অঙ্কুরিত, এবং যৌবন ও বার্দ্ধক্যে ক্রমে পল্লবিত হইয়াছে। তোমার, আমার ও আমাদের সকলেরই জননী—মাতৃভূমি আমার কামনার ধন। জননীকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু মাতৃভূমিকে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে দেখিয়াছি। যে দিন হইতে জননীর সত্তা অনুভব করিতে পারিয়াছি, সেই দিন, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারের সুখভোগ বিসর্জ্জন করিয়াছি। সেই জননী, দেবীরূপা মাতৃভূমিকে আমি বড় ভালবাসি।"

সন্ন্যাসীর নয়নে কি পবিত্র আলোকদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বুঝি কণ্ঠস্বরও একটু কম্পিত হইতেছিল। স্বামীজী বলিলেন, "বৎস, ভগবানের রূপ কল্পনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি, মাতার বিষাদকাতর করুণ মূর্ত্তি আমার নয়নে প্রতিভাসিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার গৌরব কীর্ত্তন করিতে গিয়া রসনায় ভারতমাতার বন্দনাগীতি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। ঋষিবন্দিতা মাতা, সুজলা সুফলা জননী, বেদমন্ত্রপূজিতা দেশলক্ষ্মী আমার অন্তরে ও বাহিরে। বৎস, সেই গরীয়সী, লোকপালিনী জননীর পূজায়, তাঁহার কল্যাণকল্পে তোমার সমস্ত সাধনা, সমগ্র শিক্ষা প্রয়োগ করিও। ইহাই তোমার গুরুদক্ষিণা। দশ বৎসর ধরিয়া এই শিক্ষা, এই ভাব তোমার হৃদয়ে সঞ্চারিত ও বদ্ধমূল করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সমাজে ফিরিয়া যাও, মানুষের সংস্রবে জন্মভূমির প্রকৃত চিত্র, যথার্থ অবস্থা দেখিতে পাইবে। তখন, বৎস, অধীর হইও না, সে দৃশ্য দেখিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষা ও

সংযমের বলে হৃদয় দৃঢ় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের সহস্র বিপদ ও বাধাকে বরণ করিয়া লইও। আশীর্ব্বাদ করি, আমার আশৈশব সাধনা, যৌবনের স্বপ্ন তোমার দ্বারা সার্থক ও সফল হইবে।"

"আশীর্ব্বাদের ঝুলির মুখটা কি কেবল আমার বেলাই বন্ধ, গুরুজী! দাদার মত গীতা, দর্শন, কাব্য কি আমিও পড়ি নাই ঠাকুর?"

অজয় সিংহকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া শঙ্করস্বামী কিছু বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি কোথায় ছিলে, অজয়?"

"ঐ গাছের ডালে। আপনি দাদাকে আশীর্ব্বাদ করিতে যে ব্যস্ত, আমায় দেখিতে পাইবেন কিরূপে?"

স্বামীজী হাসিয়া বলিলেন, "অজয় চিরকাল ছেলেমানুষটির মত থাকিবে! সব সময়ে কি গাছে চড়া ভাল?"

"তা কি করিব, গুরুজী! দিনরাত গীতার শ্লোক, পাতঞ্জলের সূত্র, পাণিনির তদ্ধিত—ও সব আমার ভাল লাগে না। গাছ, পালা, পাহাড়, নদী, পাখী, ফুল,—এর কাছে কি পুঁথির লেখা? গুরুদেব, বাবা যে লোক পাঠাইয়াছেন, সে কোথায়?"

"চল, তার কাছে তোমাদের লইয়া যাই।"

২

অপরাহ্নের ছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে। বিলাস ও লালসার লীলাক্ষেত্র, ব্যভিচার, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার রঙ্গভূমি মোগলরাজধানী দিল্লীকে পশ্চাতে ফেলিয়া সমর ও অজয় পল্লীপথ ধরিল। আর বেশী দূর নহে। ঐ ত তাহাদের বৃহৎপুরীর শিখরদেশ সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে দেখা যাইতেছে। যান ও বাহকদিগকে বিদায় করিয়া দিয়া ভৃত্যের সহিত দুই ভাই পদব্রজে চলিল। শ্যামা সন্ধ্যায় জনহীন পল্লীপথ, পথের উভয়পার্শ্বস্থ ভুট্টা, যব, গম ও ইক্ষু প্রভৃতির বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র উভয়ের হৃদয়ে বহুদিনের বিস্মৃত-প্রায় শৈশবস্মৃতি ফিরাইয়া আনিল। আজ দশ বৎসর পরে তাহারা সুখস্বপ্নময় বাল্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে, গ্রামের সুখদুঃখের আবর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেছে। সরলহৃদয়, শৈশবসহচর, প্রিয়দর্শন স্নেহভীরু বৃদ্ধগণ এত দিন পরে তাহা-দিগকে দেখিয়া চিনিতে পারিবে কি?

পিতার স্নেহপ্রফুল্ল সৌম্যমূর্ত্তি, দীপ্ত নয়ন, ভাবদৃঢ় মুখমণ্ডল তাহারা কত কাল দেখে নাই! মধ্যে একবার গুরুর আশ্রমে তিনি তাহাদিগকে

দেখিতে গিয়াছিলেন। সেও অনেক দিনের কথা। তার পর আর দেখা হয় নাই। আজ তাহারা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া ধন্য হইবে, তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবে! কি আনন্দ, কি উল্লাস! ভাবাবেশে সমরের হৃদয় দ্রুতবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। শৈশবে তাহারা মাতৃহীন। মনে পড়ে না। তখন সমরের বয়স তিন বৎসর; অজয় এক বৎসরের শিশু। পিতার স্নেহক্রোড়েই তাহারা লালিত হইয়াছিল। দাস দাসীর বাহুল্য সত্ত্বেও পিতা স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন, সঙ্গে করিয়া বেড়াইতেন। এক শয্যায় তিন জনে শয়ন করিতেন। কতকাল পরে আজ তাহারা আবার স্নেহময় পিতার অনির্ব্বচনীয় সঙ্গসুখ উপভোগ করিবে!

যখন তাহারা পুরদ্বারে পঁহুছিল, সন্ধ্যার তিমির-অঞ্চল তখন নগ্ন প্রকৃতিকে অবগুণ্ঠনে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু এত বড় অট্টালিকা এমন জনহীন কেন? একটিমাত্র দীপশিখাও ত দেখা যাইতেছে না। এত দাস দাসী, প্রহরী, কর্ম্মচারী, তবুও হিন্দুর গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই?

"ভিখারী, বাবার কি কোন অসুখ হইয়াছিল?"

"না হুজুর! বিশ বছরের মধ্যে তাঁর কোনও অসুখই ত দেখি নাই।"

তবে ইহার অর্থ কি? এত বড় পুরী, এত লোক জন, তথাপি গৃহ শশ্মানের মত জনহীন! সমরসিংহ দ্রুতপদে সিংহদ্বার অতিক্রম করিল, কোথাও জনমানবের সাড়া নাই। উদ্বেগাকুলকণ্ঠে সে একে একে সমস্ত পুরাতন ভৃত্যের নাম ধরিয়া ডাকিল। প্রতিধ্বনি শূন্য অট্টালিকায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার নীরব হইল।

অতর্কিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিন জনেরই হৃদয় অভিভূত হইল। বহুক্ষণ ডাকাডাকির পর দূরে একটা কম্পিত আলোকরেখা দেখা গেল। শঙ্কা-কম্পিতচরণে এক ব্যক্তি সাবধানে তাহাদের অভিমুখে আসিতেছে।

মূর্ত্তি নিকটে আসিলে প্রদীপালোকে সমরসিংহ তাহাকে চিনিতে পারিল। বৃদ্ধ তাহাদের পুরাতন ভৃত্য গোকুল দাস। কিন্তু তাহার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ, দেহ এত জীর্ণ কেন? দশ বৎসরে এত পরিবর্ত্তন! সমর তাহার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "কি গোকুল! চিনিতে পার? বাবা কোথায়?"

বৃদ্ধ প্রদীপ তুলিয়া ধরিল। বার বৎসরের বালক এখন যুবা হইয়াছে। কিন্তু সে মূর্ত্তি কি ভুলিবার! সে যে তাহাদিগকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে!

বৃদ্ধ তখন ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "তোরা এসেছিস্? এ দিকে সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।"

উভয়ে চমকিয়া উঠিল। সমস্বরে বলিল, "কি হয়েছে গোকুল? বাবা কোথায়?"

"জিজিয়া, জিজিয়া!"

"জিজিয়া কি গোকুল? হেঁয়ালি রাখ, শীঘ্র বল, বাবা কোথায়?"

"জিজিয়ার নাম শুন নাই? আওরঙ্গজেবের নূতন কীর্ত্তি। হিন্দু-মাত্রকেই মাথা পিছু এই কর দিতে হইবে। দুর্ভিক্ষে মরিয়া যাও, গৃহে অন্ন থাক বা না থাক্, সম্রাটের কোষাগার পূর্ণ করিতেই হইবে।"

"জিজিয়া উৎসন্ন যাক্। বাবা কোথায়?"

বৃদ্ধ দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া বলিল, "আওরঙ্গজেবের বন্দী। তাঁহাকে সম্রাট ধরে নিয়ে গেছেন।"

অজয়সিংহ নিকটে সরিয়া আসিল। সমরের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। দৃঢ়মুষ্টিতে বৃদ্ধের হস্ত ধরিয়া অধৈর্য্যভাবে সে বলিল, "বাবাকে ধরে' নিয়ে গেছে? কেন? সম্রাটের তিনি কি অনিষ্ট করেছেন?"

"তিনি জিজিয়া কর দিতে চান নি।"

"নিশ্চয়ই! কেন তিনি কর দিবেন? আমরা রাণা রাজসিংহের প্রজা; তাঁহাকে কর দিব কেন?"

"সম্রাট সে আপত্তি শুনেন নাই। মোগল অধিকারে যে হিন্দু বাস করিবে! ছেলে বুড়া মেয়ে প্রত্যেককেই জিজিয়া কর দিতে হইবে। আওরঙ্গজেবের এই আদেশ। যে এই আদেশ অমান্য করিবে, তার সর্ব্বনাশ ঘটিবে। তোমার বাবা বলেছিলেন যে, ব্যবসায় উপলক্ষে সম্প্রতি সম্রাটের অধিকারে বাস করিলেও তিনি উদয়পুরের রাণার প্রজা. তিনি এই অন্যায় কর কখনও দিবেন না। সম্রাটের অনুচর বলিল, সহজে না দিলে কেমন করিয়া প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করিতে হয়, আওরঙ্গজেব তাহা জানেন। তার পর সেনাদল আসিল; গ্রাম লুট করিল; অত্যাচারে গ্রামবাসীরা পলাইল। তোমাদের বাড়ীর দরজা ভাঙ্গিয়া মোগল সৈন্য যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইল। আমার তেজস্বী মনিব এই পৈশাচিক অত্যাচারে বাধা দিতে গিয়াছিলেন, তাই সম্রাটের সেনা তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে!

পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া সমরসিংহ অত্যাচারী সম্রাটের কীর্ত্তিকাহিনী

শ্রবণ করিল। ক্ষোভে, ক্রোধে, দুঃখে অজয়ের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল।

"এস, দেখিবে চল" বলিয়া বৃদ্ধ সমরসিংহকে ভিতরে লইয়া চলিল। অজয় তাহাদের অনুগমন করিল।

সমস্ত কক্ষ অন্ধকার! সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা। গৃহের আসবাবপত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন! যেন একটা প্রলয়-ঝটিকার ভীষণ আঘাতে সমগ্র অরণ্যানী বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে।

তাহাদের শয়নকক্ষের প্রাচীরে জননীর একখানি চিত্রপট বিলম্বিত ছিল; ছিন্ন দীর্ণ অবস্থায় তাহা ভূমিতলে লুটাইতেছে!

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোনও কথা কহিল না। শঙ্কর স্বামীর প্রদত্ত গ্রন্থরাশি এক স্থলে রক্ষা করিয়া পরিচারক ভিখারী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল। সমর নির্নিমেষলোচনে পুস্তকাধারটি দেখিতে লাগিল। বর্ত্তমান দুর্দ্দিনের, নির্ম্মম অত্যাচারের প্রতিবিধানের উপায় কি মেঘদূত, কাদম্বরী, বা উত্তররাম-চরিতের শ্লোকরাজির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন আছে? গীতা, পূর্ব্বমীমাংসা, বা উত্তরমীমাংসায় এ জটিল প্রশ্নের মীমাংসা সম্ভব কি না, সমর কি তাহাই চিন্তা করিতেছিল?

উষার প্রথম আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র সমর ডাকিল, "অজয়!" মানসিক দুশ্চিন্তাভারে ক্লান্ত হইয়া অজয়ের সবে তন্দ্রা আসিয়াছিল। ভ্রাতার আহ্বানে সে উঠিয়া বসিল।

দাদার আরক্ত মুখমণ্ডল, নয়নের অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখিয়া অজয় শঙ্কিত হইল। সমর বলিল, "ভাই, বৃথা শোকের সময় নাই। আমি এখনই এখান হইতে যাত্রা করিব। বাবার অনুসন্ধান করিব; আর যদি পারি, এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করিব। ভিখারী ও গোকুল এখন নিরাশ্রয়। আজীবন তাহারা আমাদের সেবা করিয়াছে; এ বৃদ্ধবয়সে তাহারা কোথায় যাইবে? উহাদের রক্ষার ভার তোমার উপর। কিন্তু এখানে থাকিও না। উদয়পুরে, রাণার রাজ্যে ফিরিয়া যাও। সেখানে আমাদের যে সম্পত্তি আছে, তাহাতে তোমাদের সংসার বেশ চলিবে। ইতিমধ্যে যদি গুরুদেব আসেন, সব তাঁহাকে বলিও।"

সমর উঠিয়া দাঁড়াইল।

"দাদা, দাদা!"

"ছি! অজয়, তুমি কাতর হইও না। কত বড় গুরুতর কাজ, বুঝিতেছ না?"

"দাদা! তবে আমিও যাইব।"

"পাগল আর কি! তুমি গৃহে থাক; যদি আমার চেষ্টা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে তুমি পিতার উদ্ধারের চেষ্টা করিও। এখন যাহা বলিলাম, তাহা পালন কর।"

অজয় নীরবে নতদৃষ্টি হইয়া রহিল।

সমর সিংহ তখন জানু পাড়িয়া মাতার ছিন্ন চিত্রপটের সম্মুখে উপবেশন করিল; তার পর প্রগাঢ়ভক্তিভরে উদ্দেশে কাহাকে প্রণাম করিল।

ভ্রাতার মূর্ত্তি দূরে অন্তর্হিত হইলে অজয় ভাবিল, গৃহসুখ কি কেবল আমারই জন্য? অন্য কোনও কর্ম্মে কি আমার অধিকার নাই?

৩

পুণ্যসলিলা, কল্লোলমুখরা যমুনার তীরে স্নানার্থী হিন্দুরা দলে দলে সমবেত হইতেছিল। বহুকাল পরে কুম্ভ যোগ আসিয়াছে। দুর্ভিক্ষে শীর্ণ, অত্যাচার উৎপীড়নে জীর্ণ হইলেও হিন্দু এখনও ধর্ম্ম ভুলে নাই। তাই যমুনার পবিত্র নীরে পুণ্যস্নানের আশায় বহু দূর হইতে যাত্রী আসিয়া বিশাল প্রান্তর ছাইয়া ফেলিয়াছিল। মোগল রাজধানীর উপকণ্ঠে হিন্দুর উৎসব! বিস্ময়ের বিষয় বটে; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মদ্বেষী আরওঙ্গজেব এই পুণ্য অনুষ্ঠানে বাধা দেন নাই।

নদীতীরে, বৃক্ষচ্ছায়ায়, রাজপথের উভয় পার্শ্বে দোকান হাট বসিয়াছে। যুবক ও বালকের জনতা হইয়াছে। হিন্দুর উৎসব দেখিবার প্রলোভনে বহুসংখ্যক মুসলমানও নদীতীরে সমবেত।

স্নানার্থীরা অবগাহনে ব্যস্ত; কেহ গায়ত্রী জপ করিতেছে, কেহ বা যমুনার স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছে। অনেকে হাস্য পরিহাস ও দোকানের মিঠাই কিনিয়া অর্থ ও সময়ের সৎব্যয় করিতেছে। ভিখারীর দল বীণা বাজাইয়া ও সারেঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া ফিরিতেছে।

অদূরে এক ভগ্ন দেবালয়ের স্তূপশিখরে দাঁড়াইয়া ও কে? মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কিরণমালা তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত কমনীয় বিশাল ললাটে নৃত্য করিতেছিল। মুগ্ধ জনতা শুভ্রবসন, উন্নতদেহ যুবকের চারি পার্শ্বে সমবেত হইল। তাহার আকৃতি কি প্রশান্ত, দৃষ্টি কি গভীর, কি উজ্জ্বল! সমস্ত

কোলাহল সহসা যেন কোন মন্ত্রবলে স্তব্ধ হইয়া গেল। যুবক দৃঢ়গম্ভীরকণ্ঠে কি বলিতেছে?

ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকাহিনী? তাহা বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে চিরসমাধি লাভ করিয়াছে! গরীয়সী মহীয়সী মাতৃভূমির ইতিবৃত্ত? সে সব ত বিকৃতমস্তিষ্ক, মূর্খের রচিত উপকথা! ভারতবর্ষ, হিন্দুর জননী, মোগল-পাদুকা-লাঞ্ছিতা; বীরপ্রসূ মাতৃভূর সর্ব্বাঙ্গে লৌহবন্ধন!

কিন্তু বক্তার অগ্নিময়ী বাণী, জ্বালাময়ী ভাষা—জ্ঞানগরিমাদৃপ্তা ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, লোকপালিনী জন্মভূমির এ কোন উজ্জ্বল চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেছে? হিন্দুর উত্থান—আদিম মানব-সভ্যতার প্রথমবিকাশ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জ্ঞান ও বিদ্যার পরিপুষ্টি; সংযম ও শিক্ষায় শক্তিশালী হিন্দু কেমন করিয়া সমগ্র বিশ্বকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিয়াছিল, নবীন বক্তার বর্ণনাকৌশলে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। জনসঙ্ঘ মাতৃভূমির এই অপূর্ব্ব ইতিহাস, বিচিত্র কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হইল।

যুবকের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিল। সমুদ্রগর্জ্জনবৎ গম্ভীর বাণী দর্শকদিকের হৃদয়ে এক অব্যক্ত শঙ্কা ও আনন্দের সঞ্চার করিল। তাহাদের মানস-নয়নে মাতৃভূমির রাজরাজেশ্বরী মণিমুকুটমণ্ডিতা মূর্ত্তি বিচিত্র বর্ণরাগে রঞ্জিত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বিস্ময়ে হর্ষে গর্ব্বে তাহারা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

তার পর?—বক্তার স্বর আবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তার পর হিন্দুস্থানের অনাবিল, রৌদ্রকরোজ্জ্বল নীলগগনে সহসা দিগন্তব্যাপী অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। মুহুর্মুহু বজ্রনাদ, দীপ্তদামিনীর অট্টহাস, প্রলয়-ঝটিকার ক্ষুব্ধ শ্বাস, দেব-দানবের জীবন-সংগ্রাম, ধ্বংস ও স্থিতির ভৈরব কোলাহল! আসমুদ্র হিমাচল সেই ঘোর তাণ্ডবে শিহরিয়া উঠিল।

যুবকের নয়ন জ্বলিতে লাগিল। তাহার কণ্ঠস্বরে কখনও আগ্নেয়গিরি-নিঃসৃত উত্তপ্ত গৈরিকধারা উৎসারিত হইতেছিল; কখনও করুণ রাগিণী বাজিতেছিল; কখনও বা দূরাগত বংশীধ্বনির ন্যায় অস্পষ্ট কোমল মধুর সঙ্গীতস্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

"হিন্দু! পবিত্র যমুনাতীরে আজ এ কিসের উৎসব? পুণ্যস্নানে দেহ পবিত্র করিবে? হা হতভাগ্য, হিন্দুর দেবমন্দির—চিরপূজ্য বিগ্রহ প্রতিমা আজ ধূলিলুণ্ঠিত; বিধর্ম্মীর অত্যাচারে সনাতন ধর্ম্ম নিগৃহীত, ক্লিষ্ট। প্রতি

পদক্ষেপে দেবতার ভগ্ন, চূর্ণ প্রতিমা পদদলিত করিয়া পুণ্যসঞ্চয়, দেব-আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে চলিয়াছ? হায় ভ্রান্ত, হা হতভাগ্য ভারতবাসী!"

জনসঙ্ঘ বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহাদের হৃদয়ে রক্তস্রোত চঞ্চল, দেহের শিরাসমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল। কি মর্ম্মস্পর্শিনী জ্বালাময়ী ভাষা!

"দুর্ভিক্ষপীড়িত, নিঃসম্বল, বুভুক্ষু হিন্দু! হৃদয়ের রক্ত, শরীরের অস্থিমজ্জা দিয়া যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছ, মানসম্ভ্রম, অর্থ, যথাসর্ব্বস্ব বিকাইয়া মোগলের গৌরব, সম্রাটের রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছ, প্রাণের বিনিময়ে ভ্রাতৃহন্তা আওরঙ্গজেবকে ভারতবর্ষের স্বর্ণসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, সেই আজ সম্রাট হিন্দুকে এইরূপে পুরস্কৃত করিতেছে? প্রজার গৃহে অন্ন নাই, শরীরে শক্তি নাই, ক্ষেত্রে শস্যাভাব, সম্রাট তাহার প্রতিবিধানে বিমুখ। দেশে অরাজকতা; উৎপীড়নে, অত্যাচারে হিন্দু উৎসন্ন হইয়াছে; আওরঙ্গজেব প্রতীকারে উদাসীন। তাহার উপর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হিন্দুকে আবার জিজিয়া কর দিতে হইবে! না খাইয়া মর, স্ত্রী পুত্র কন্যা উপবাসী থাকুক, দুর্ভিক্ষের করাল আলিঙ্গনে পিষ্ট হইক, সম্রাটের তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তুমি হিন্দু—বালক, যুবা, বৃদ্ধ, বা স্ত্রী যাই হও, তোমাকে জিজিয়া কর দিতে হইবে। সম্রাটের রাজকোষ পূর্ণ হওয়া চাই।"

"ভাই সব, এমন নির্লজ্জ অত্যাচার, অন্যায় পক্ষপাতিতা কোন্ রাজধর্ম্মের অনুমোদিত? হিন্দু না খাইয়া মরিবে, সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিবে, অত্যাচার অবিচার সহ্য করিয়া রাজভক্তির পুষ্পমাল্য সম্রাটের চরণতলে উপহার দিবে, এবং সেই সঙ্গে জিজিয়া কর নিজের মাথায় বহন করিবে? আর যে ব্যক্তি মুসলমান, তাহার গায়ে আগুনের আঁচও লাগিবে না! কি চমৎকার রাজধর্ম্ম! কিন্তু ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই?"

যুবকের স্থির উজ্জ্বল দৃষ্টি জনতার উপর নিক্ষিপ্ত হইল।

"আছে। আজ যদি সমগ্র হিন্দু দৃঢ়স্বরে প্রতিজ্ঞা করে, আমরা এ অন্যায় কর দিব না, তাহা হইলে সম্রাটের সাধ্য নাই, এই কর আদায় করিতে পারেন। তোমরা কি সে প্রতিজ্ঞা করিবে না? আজ তোমাদের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী না খাইয়া মরিতেছে, করভারে দেশের লোক পিষ্ট হইতেছে, আর তোমরা নীরবে তাহা দেখিবে?"

লক্ষ কণ্ঠ গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—"আমরা এ কর দিব না।"

মুসলমান দর্শকেরা চমকিয়া উঠিল। গুপ্তচর আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করিয়া দ্রুতবেগে দিল্লীর অভিমুখে ছুটিল।

ললাটের স্বেদবারি মুছিয়া ফেলিয়া বক্তা কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

দীপ্ত মধ্যাহ্নে তাহাকে যেন কোনও অপরিচিত রাজ্যের দেবদূতের মত বোধ হইতেছিল।

কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে তুলিয়া যুবক বলিল, "তবে এস, আজ এই পুণ্যক্ষণে, তীর্থতীরে দাঁড়াইয়া আমরা সকলে শপথ করিয়া বলি, জীবন থাকিতে কেহ জিজিয়া কর দিব না। শত অত্যাচার, সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিব, তথাপি সম্রাটের অন্যায় আব্দার কখনই রক্ষা করিব না। শুন, ভাই সব, এই জিজিয়া করের জন্য আমার পিতা, আওরঙ্গজেবের কারাগারে, আমাদের—"

জনতা সবিস্ময়ে দেখিল, দূরে এক দল অশ্বারোহী সৈন্য উল্কার ন্যায় বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের কোষমুক্ত তরবারি, মার্জ্জিত আগ্নেয়াস্ত্র সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছে।

মুহূর্ত্তমধ্যে সংবাদ রাষ্ট্র হইল,—সম্রাটের সৈন্য সকলকে ধরিবার জন্য আসিতেছে। তখন শান্তিপ্রিয়, সাবধান ও সতর্ক বুদ্ধিমানেরা চাণক্যনীতি অবলম্বন করিল!

যুবক নিশ্চল প্রতিমার মত ভগ্ন স্তূপশিখরে তখনও দাঁড়াইয়া ছিল। পলায়নপর এক ব্যক্তি বলিল, "তুমিও পালাও। ধরিতে পারিলে আওরঙ্গজেব তোমাকে হত্যা করিবে।"

কিন্তু যুবক নড়িল না। কতিপয় বলিষ্ঠ যুবক তখন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সেনাদল ঝড়ের ন্যায় বেগে আসিতেছে। জনতা ক্রমশঃ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সকলেই পলায়নে ব্যস্ত। এমন সময় গম্ভীরকণ্ঠে পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিল, "সমরসিংহ, বৎস, এখনও সময় হয় নাই। অকারণ ধরা দিয়া অনুষ্ঠিত কর্ম্মযজ্ঞ পণ্ড করিও না।"

সমর চকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিল। কণ্ঠস্বর চিরপরিচিত, কিন্তু জনতার মধ্যে বক্তাকে দেখা গেল না। সমর তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে স্তূপশিখর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। সে আদেশ

উপেক্ষা করিবার নহে। জনতা যুবকের জন্য পথ করিয়া দিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমরসিংহের উন্নত দেহ লোকারণ্যে মিশিয়া গেল।

৪

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশবাণী নগরে নগরে প্রচারিত হইল,—যে কেহ বিদ্রোহী যুবাকে জীবিত বা মৃত তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে, পাঁচ হাজার আসরফি তাহার পুরস্কার! সহস্র অশ্বারোহী দ্রুত-গামী অশ্বে দিকে দিকে প্রেরিত হইয়াছে। দিল্লীর সমগ্র তোরণ রুদ্ধ। সন্তোষজনক প্রমাণ না পাইলে রাজসৈন্য কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিতেছে না। দিল্লীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই গুপ্তচর ও সেনাদল সতর্কভাবে বিদ্রোহীর সন্ধানে ফিরিতেছে।

সমগ্র হিন্দুস্থানের শক্তিশালী সম্রাট আজ এক জন অজাতশ্মশ্রু বালকের দুই চারিটি অগ্নিময়ী বাণীর আঘাতে এত চঞ্চল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন কেন? হিন্দুপ্রজা অত্যাচার ও উৎপীড়নে যে দিন দিন অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, এ সংবাদ আওরঙ্গজেবের অবিদিত ছিল না। জিজিয়া করের পীড়নে সমগ্র হিন্দুস্থানে বিরক্তি ও অসন্তোষ দিন দিন যে সন্ধুক্ষিত বহ্নির ন্যায় ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহাও তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়া-ছিলেন। তার পর এই অপরিণামদর্শী যুবকের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা! আসন্ন বিদ্রোহের আশঙ্কায় সম্রাট বিচলিত হইলেন। শত্রু ক্ষুদ্র হউক, আর প্রবলই হউক, আওরঙ্গজেবের নীতিশাস্ত্রে তাহাকে উপেক্ষা করিবার উপদেশ ছিল না।

অনুসন্ধান চলিতে লাগিল। গুপ্তচর ও সেনাদলের তাড়নায় হিন্দুপ্রজা বিব্রত ও ভীত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক পল্লী, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহ মোগল সৈন্যের ক্রীড়াক্ষেত্র হইল। সাধু সন্ন্যাসী, কেহই বাদ গেল না। সিপাহীরা তাঁহাদের পক্বশ্মশ্রু টানিয়া দেখিত, ছদ্মবেশ কি না।

সপ্তাহ অতীত হইল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়িল না। সিপাহীদিগের অত্যাচারে হিন্দুর অসন্তোষ উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। কিন্তু যাহাকে ধরিবার জন্য এত আয়োজন, সে লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল আওরঙ্গজেব অত্যন্ত বিচলিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার কঠোর আদেশ পুনরায় প্রচারিত হইল। বিদ্রোহী নগরমধ্যেই লুকাইয়া আছে। হিন্দুর অন্তঃপুরে অনুসন্ধান কর, ছলে বলে কৌশলে, যেমন করিয়া হউক,

বিদ্রোহীকে হাজির করা চাই। প্রজাশক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তি অবনত হইবে? ভারতসম্রাট আওরঙ্গজেবের বাসনা অপূর্ণ থাকিবে? অসম্ভব! যেমন করিয়াই হউক, বিদ্রোহীকে চাই!

রাত্রি দ্বিপ্রহর। আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কা দিল্লীর প্রমোদভবন বহুপূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। বিলাসলালসামুগ্ধা, আলোকমালাময়ী নগরী তন্দ্রামগ্না।

আকাশে ছিদ্রশূন্য মেঘজাল। উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় ক্ষুব্ধ ঝটিকা প্রাসাদের রুদ্ধ দ্বারে ও বাতায়নে বলপরীক্ষা করিতেছিল। দীপ্ত দামিনীর চঞ্চল নৃত্যে, বজ্রের গুরুগর্জ্জনে সুপ্তনগরী শিহরিয়া উঠিতেছিল। ঝটিকার অঞ্চল ধরিয়া বারিধারা নামিয়া আসিল।

রাজপথ জনশূন্য; গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই ভীষণ দুর্য্যোগে গৃহের বাহির হয় কাহার সাধ্য?

এমন সময় একটি মনুষ্যমূর্ত্তি চোরের মত অতি সন্তর্পণে এক বৃহৎ অট্টালিকার পশ্চাতের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দিকে লোকজন বড় চলাফেরা করিত না। দ্বারের সমীপবর্ত্তী হইবামাত্র উহার অর্গল মুক্ত হইল। অতি সতর্কভাবে নবাগত ব্যক্তি সাগ্রহে বলিল, "দাদা কেমন আছেন?"

"এইমাত্র জ্বরত্যাগ হইয়াছে। এ যাত্রা যে রক্ষা পাইবে, এমন আশা ছিল না। সাত দিন, সাত রাত্রি অচৈতন্য, মৃত্যুর সহিত অবিরাম যুদ্ধ!"

"গুরুজী! শেষ রক্ষা হইবে কি?"

দ্বিতীয় ব্যক্তি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "সে আশা কই? চারি দিকে যেরূপ পাহারা, সতর্ক গুপ্তচর যেরূপ আগ্রহে অনুসন্ধান করিতেছে, তাহাতে উদ্ধারের আশা কোথায়? ও! সেই রাত্রে যদি সমর পীড়িত হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে এত দিন কোথায় চলিয়া যাইতাম। সমগ্র মোগল সেনা তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না।"

"এখন কি কোনও উপায় নাই গুরুদেব? আজিকার এই দুর্য্যোগের অবসরে প্রহরীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া কি পলায়ন করা যায় না?"

"অসম্ভব, বৎস! এই ঝড় বৃষ্টিতে বাহির হইলে সমরের মৃত্যু অনিবার্য্য। বিশেষতঃ সমর উত্থানশক্তিরহিত। ধ্রুব মৃত্যুর মুখে তাহাকে কেমন করিয়া নিক্ষেপ করিব?"

"তবে উপায়?"

"তাহাই ভাবিতেছি। মহারাজ জয়সিংহ আশ্রয় না দিলে এত দিনও সমরকে লুকাইয়া রাখিতে পারিতাম না। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভক্তি করেন, তাই তাঁহার গৃহের এই অংশ ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনিও জানেন না যে, আমি সমরকে এখানে লুকাইয়া রাখিয়াছি। এ স্থলও আর নিরাপদ নহে। জয়সিংহ আগামী কল্য রাজকার্য্যোপলক্ষে দিল্লী ত্যাগ করিবেন। তখন সম্রাটের গুপ্তচর কি এখানেও সন্ধান করিবে না? জয়সিংহ আওরঙ্গজেবের দক্ষিণ হস্ত, সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্রাট তাঁহাকেও বিশ্বাস করেন না।"

"তাহা হইলে উদ্ধারের আর কোনও উপায়ই নাই?"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শঙ্কর স্বামী বলিলেন, "যদি ইতিমধ্যে গৃহে গৃহে অনুসন্ধান থামিয়া যায়, দিল্লীর তোরণদ্বার পূর্ব্বের মত সাধারণের জন্য উদ্ঘাটিত হয়, তাহা হইলে মুক্তি সম্ভব; কিন্তু বৎস, তাহা অসম্ভব। সমরসিংহ ধরা না পড়িলে অনুসন্ধান থামিবে না। সুতরাং তাহার মুক্তির আশা কোথায়?"

দিগন্ত আলোকিত করিয়া দামিনী হাসিয়া উঠিল। অজয়সিংহ মেঘমেদুর আকাশে চাহিয়া বলিল, "নিষ্ঠুর সম্রাট হিন্দুর প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতেছেন, দাদা কি তাহা শুনিয়াছেন?"

"না, অজয়। এ কয় দিন তাহার চৈতন্যই ছিল না। এ সব কথা শুনিলে সে কখনই নিশ্চিন্ত থাকিবে না। তাহার জন্য নিরীহ হিন্দু উৎপীড়িত হইতেছে জানিতে পারিলে, সে এই দণ্ডেই আত্মসমর্পণ করিবে।"

"গুরুজী! তবে তাঁহাকে ইহার বিন্দুবিসর্গও জানাইয়া কাজ নাই। দাদাকে যে কোনও রূপে বাঁচাইতে হইবে। তিনি বাঁচিলে মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল হইবে, এ কথা একদিন আপনি নিজেই বলিয়াছিলেন। আপনি উপায় স্থির করুন, গুরুদেব!"

"উপায় ভগবান; মনুষ্যের এ ক্ষেত্রে কোনও হাত নাই।"

অজয়সিংহ নীরবে দাঁড়াইয়া কি ভাবিল, তার পর বলিল, "চলুন, দাদাকে একবার দেখিয়া আসি।"

উভয়ে ধীরে ধীরে পার্শ্বস্থ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একটি সামান্য শয্যার উপর পীড়িত সমরসিংহ নিদ্রামগ্ন। তাঁহার মুখ মলিন পাণ্ডুরবর্ণ। অদূরে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অজয় সে দৃশ্যে বিচলিত হইল। তাহার সহোদর আজন্মের ক্রীড়াসহচর, ভ্রাতার এই দশা! আওরঙ্গজেব

এই কোমলমতি, সরল, তেজস্বী বীরের মস্তকের জন্য লালায়িত? দেশের জন্য, দশের নিমিত্ত যাহার হৃদয় উন্মত্ত, পরের দুঃখে যাহার হৃদয় পীড়িত, সেই মনস্বী মহাত্মার জীবন আওরঙ্গজেব গ্রহণ করিবে? সমরসিংহকে উদ্ধার করিবার কোনও উপায় কি নাই?

ভূমিতলে, ভ্রাতার শিয়রে অজয়সিংহ জানু পাতিয়া উপবেশন করিল। অতৃপ্তনয়নে বহুক্ষণ জ্যেষ্ঠের প্রতিভাদীপ্ত পাণ্ডুর মুখে চাহিয়া রহিল। নিদ্রার কোমল স্পর্শে ললাটে চিন্তার রেখা মুছিয়া গিয়াছিল। বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া অজয় ঊর্দ্ধনেত্রে যুক্তকরে বিশ্বেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

বাহিরে মত্তঝটিকা তখনও বেগে বহিতেছিল; বৃষ্টিধারা রুদ্ধ বাতায়নে প্রতিহত হইতেছিল।

দৃঢ়পদে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে অজয় বলিল, "তবে এখন আসি, গুরুদেব। দাদাকে জাগাইয়া কাজ নাই।"

"তুমি নগরে প্রবেশ করিলে কিরূপে? কেহ দেখিতে পায় নাই?"

"না গুরুজী! রমণীবেশে যমুনার তীরপথে আসিয়াছি। সে দুর্য্যোগে প্রহরীরা দেখিতে পায় নাই।"

"কাল সকালে নগরের বাহিরে যাইব। আসিবার সময় তোমার সহিত দেখা করিয়া আসিব।"

অজয় আর একবার ভ্রাতার নিদ্রিত মূর্ত্তির পানে ফিরিয়া চাহিল। তার পর বাহিরের বারিবিদ্যুৎব্যাকুল অন্ধকারে সে অন্তর্হিত হইল।

৫

দুর্য্যোগ থামিয়া গিয়াছে। প্রভাতের নবীন আলোকপ্লাবনে বর্ষাধারাসিক্ত প্রকৃতি হাসিতেছিল। দিল্লীর দেওয়ান-ই-খাসে, মণিমুক্তামণ্ডিত বিচিত্র সিংহাসনে মোগল সাম্রাজ্যের ধূমকেতু আওরঙ্গজেব উপবিষ্ট। দরবারমণ্ডপ আমীর, ওমরাহ ও অন্যান্য সভাসদে পরিপূর্ণ।

সম্রাটের মুখমণ্ডল চিন্তাক্লিষ্ট, আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর। সাম্রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হইতেছিল। রাজসভায় ষড়যন্ত্রের অভাব ছিল না। বিদ্রোহী যুবক এখনও ধরা পড়ে নাই, তজ্জন্য তিনি এইমাত্র ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর প্রতি অতি পরুষ ব্যবহার করিয়াছেন।

নানা দুশ্চিন্তায় আওরঙ্গজেবের হৃদয় অবসন্ন ও ক্ষুব্ধ হইলেও, তিনি অতি সহজ ভাবে রাজকার্য্য পরিচালন করিতেছিলেন। মুখ দেখিয়া তাঁহার মনোভাব অবগত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।

দরবারের কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় বহির্ভাগে একটা গোল উঠিল। সভাস্থ সকলেই এই আকস্মিক গোলযোগের কারণ জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল। সম্রাটের ইঙ্গিতে সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ বাহিরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন, একটি যুবক কোনও বিশেষ কার্য্যে উপলক্ষে সম্রাটের সাক্ষাৎপ্রার্থী, কিন্তু প্রহরীরা তাহাকে আসিতে দিতে চাহিতেছে না।

সম্রাটের আদেশে সেনাপতি পুনরায় বাহিরে গেলেন। সাক্ষাৎপ্রার্থী যুবক তাঁহার সহিত দরবারগৃহে প্রবেশ করিল। আগন্তুক প্রশান্তদৃষ্টিতে একবার চারি দিক দেখিয়া লইল। তার পর উন্নতমস্তকে আওরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইল। তাহার এই অশিষ্ট ও উদ্ধত ব্যবহারে সভাস্থ সকলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল।

মহবৎ খাঁ অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "যুবক, ভারতসম্রাটকে অভিবাদন করিতেছ না?"

মৃদু হাসিয়া যুবক বলিল, "এ মস্তক যেখানে সেখানে, বিশেষতঃ অত্যাচারীর সম্মুখে অবনত হয় না।"

কথাটা উচ্চৈঃস্বরে না বলিলেও আওরঙ্গজেবের কাণে গেল। সম্রাটের রেখাঙ্কিত ললাটের শিরাসমূহ সহসা স্ফীত হইয়া উঠিল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সম্রাট গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বালক, তুমি সৌজন্য শিক্ষা কর নাই। এখানে কি জন্য আসিয়াছ?"

যুবক আর একবার বিরাট দরবারগৃহের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। তার পর সমুন্নত মস্তক ঈষৎ হেলাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "সম্রাট, তোমার এত বড় দরবারগৃহে এমন কেহ নাই যে, আমাকে চিনিতে পারে? পাঁচ হাজার আসরফি যাহার মস্তকের মূল্য, আওরঙ্গজেবের দেওয়ান-ই-খাসে আজ তাহাকে আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে?"

সভাস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিল! এই তরুণ সুন্দর যুবা বিদ্রোহী! এই বালকের বক্তৃতায় লক্ষ লক্ষ লোক উন্মত্ত হইয়াছিল? সভাস্থ সকলেই চমকিয়া উঠিল।

"কি ভাবিতেছ, আওরঙ্গজেব? বিশ্বাস হইতেছে না? সত্যের অনুরোধে হিন্দু মৃত্যুকে বন্ধুর ন্যায় আলিঙ্গন করিতে পারে; এত কাল ভারতবর্ষ শাসন করিয়া তোমার কি সে অভিজ্ঞতা হয় নাই? আমি ধরা দিতাম না। তোমার লক্ষ সৈন্য আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিত না। কিন্তু তোমার নৃশংস অত্যাচারে হিন্দু জর্জ্জরিত হইতেছে। আমাকে ধরিবার জন্য যে পৈশাচিক ব্যাপার চলিতেছে, তাহাতে নিরীহ হিন্দু, আমার স্বজাতি অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাই আর সহ্য হইল না। আমি ধরা দিতেছি; এখন তোমার অত্যাচারের অবসান হউক।"

আওরঙ্গজেবের আদেশে প্রহরীরা বিদ্রোহী যুবাকে বেষ্টন করিল। যুবক হাসিয়া বলিল, "যে স্বয়ং ধরা দিতে আসে, তাহাকে বন্ধন করায় বড় বীরত্ব! আওরঙ্গজেবের সাহসকে ধন্যবাদ!"

এই শ্লেষে তীব্র সম্রাটের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সক্রোধে বলিলেন, "উদ্ধত যুবক, সাবধান! তুমি রাজদ্রোহী, তোমার রাজদ্রোহের শাস্তি, প্রাণদণ্ড তাহা জান?"

উচ্চহাস্যে সভাতল মুখরিত করিয়া নির্ভীক যুবক বলিল, "জীবনের মমতা থাকিলে মোগলের দরবারে আসিতাম না। ভ্রাতৃহন্তা মোগলের নিকট আমি দয়ার প্রত্যাশা করিয়া আসি নাই।"

রূঢ়, নির্ম্মম সত্যবাক্যে সম্রাটের মুখমণ্ডল ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বিদ্রোহী সমরসিংহ, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম।"

সভাস্থ সকলেই এই নিষ্ঠুর আদেশে বিচলিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ মন্ত্রী বলিলেন, "জাঁহাপানা! বালকের প্রতি এরূপ গুরু দণ্ড—"

গর্জ্জন করিয়া আওরঙ্গজেব বলিলেন, "তুমি চুপ্ কর, বৃদ্ধ। আওরঙ্গজেব কাহারও পরামর্শ শুনিয়া কাজ করেন না।"

নির্ভীক যুবক স্মিতমুখে বলিল, "শুধু প্রাণদণ্ড? আমার কি অপরাধ? তুমি ভারতবর্ষের সম্রাট, প্রজার সুখ দুঃখের নিয়ন্তা, তাহাদের শুভাশুভ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। কিন্তু পবিত্র রাজধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া, ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, অবিচারে তুমি প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছ, অন্যায় করভারে দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ করিতেছ। মূর্খ প্রজার পক্ষ লইয়া তাই আমি তোমার ঘোরতর অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম! হায়! ভ্রান্ত,

অত্যাচারে কি রাজ্য রক্ষা হয়, প্রজাদলনে কি শান্তি ফিরিয়া আইসে?"

আওরঙ্গজেবের দেহ ক্রোধে কাঁপিতেছিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহব্বৎ খাঁ, দুর্ব্বৃত্তকে এখনই এখান হইতে লইয়া যাও। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে উহার মৃত্যুসংবাদ আমি শুনিতে চাই। নগরে ঘোষণা করিয়া দাও, যেখানে দাঁড়াইয়া শয়তান প্রথম বিদ্রোহবাণী প্রচার করিয়াছিল, সেই-খানেই উহার প্রাণদণ্ড হইবে। মৃতদেহের কেহ সৎকার করিতে পারিবে না। শৃগাল কুক্কুর উহার শব ভক্ষণ করিবে।"

যুবকের নয়ন জ্বলিয়া উঠিল। সে উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আওরঙ্গজেব! তুমি ভারতবর্ষের বিধাতা হইতে পার, কিন্তু দুনিয়ারও এক জন মালিক আছেন। তাঁহার দরবারে একদিন তোমাকে এই সকল অত্যাচারের জবাব দিতে হইবে। ভাবিও না তুমি রাজা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবে। মূর্খ, বলের দ্বারা দেহের শাসন করা যায় বটে, কিন্তু বিদ্রোহী হৃদয়কে দমন করিবে কিরূপে? পাশব-শক্তি বলে এত বড় একটা জাতিকে কখনও বাঁধিয়া রাখিতে পারিবে না। তোমার ধ্বংসের জন্য ভগবানের বজ্র উদ্যত। মারাঠার অস্ত্রপ্রহারে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে; প্রজার উপর অত্যাচারে একদিন তাহা ধূলিসাৎ হইবে।"

৬

সন্ধ্যার আকাশে সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখা মিলাইয়া গেল। শোকমুগ্ধ দিল্লীবাসী ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিল। পুরাতন যায়, নূতন আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। জীর্ণ, পুরাতন দিবস চলিয়া গেল, নূতন রজনী আসিতেছে, কিন্তু অন্ধ-কারের মধ্য দিয়া।

বিদ্রোহীর প্রাণশূন্য দেহের উপর দিয়া তরুণ সন্ধ্যার বাতাস বহিয়া গেল।

ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের উপর একটি বৃক্ষকাণ্ডে মৃতদেহ দুলিতেছিল। আকাশ, কানন, নদীতীরস্থ গাছপালার অন্তরাল হইতে তিমির-যবনিকা ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইতেছিল। সহসা গাঢ় অন্ধকারে দিগন্তরেখা মুছিয়া গেল। আর কিছু দেখা যায় না। প্রান্তর, অরণ্য ও নদী সব এক হইয়া গিয়াছে।

ও কি? মনুষ্য-পদশব্দ! ভীষণ নীরব শ্মশানে এ সময়ে কে আসে? দ্রুত, কম্পিত, অধীর পদধ্বনি! বিস্তীর্ণ, অন্ধকারময় প্রান্তর! সম্মুখে দোদুল্যমান মৃতদেহ! পিশাচের রঙ্গভূমি! এখানে মনুষ্যের নিশ্বাস, উষ্ণরক্তের খরপ্রবাহ?

"কৈ, কোথায় ?"

কণ্ঠস্বরে কি যন্ত্রণা, কি ব্যাকুলতা! এ বিরাট শ্মশানে কে তুমি ?

এক ব্যক্তি ইষ্টকস্তূপের উপর উঠিল। ব্যাকুলভাবে যেন কি অন্বেষণ করিতে লাগিল। এ কি! তরবারীর সাহায্যে শবের বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে ?

আগন্তুক দুই বাহু দ্বারা ছিন্নবন্ধন শবদেহ আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল; তার পর ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বরে বলিল, "প্রাণাধিক, ভাই আমার, তোমার এই দশা! আওরঙ্গজেবের মৃত্যুবাণ বুক পাতিয়া লইয়াছ! ভ্রাতার জীবনরক্ষার জন্য আত্মত্যাগ করিয়াছ? গুরুদেব! কেন আপনি আমাকে আগে সব বলেন নাই ?"

সে মর্ম্মভেদী বিলাপে মোহবর্জ্জিত সন্ন্যাসীর হৃদয়ও বিচলিত হইল। তাঁহার নয়নপ্রান্তে দুই বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; তিনি বলিলেন,, "আমি জানিতাম না। প্রত্যূষে নগরের বাহিরে গিয়াছিলাম। "অপরাহ্ণে অজয়ের সহিত দেখা করিবার কথা ছিল। সেখানে গিয়া তাহার দেখা পাইলাম না; আমার জন্য সে একখানি পত্র রাখিয়া গিয়াছিল। পাঠ করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। দ্রুতপদে নগরে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, বিদ্রোহী সমর সিংহের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। আমি জানিতাম না, এই চপলমতি বালকের হৃদয় এত মহান্, এত গভীর! সে জানিত, সমর সিংহ বাঁচিয়া থাকিলে দেশের অনেক কাজ হইবে; কিন্তু সমর ধরা না পড়িলে সমর সিংহের মুক্তি নাই! তাই সে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছে। ধন্য অজয়, সার্থক তোমার জন্ম! তোমার মত শিষ্য পাইয়া আমিও আজ ধন্য।"

গুরুর কম্পিত কণ্ঠস্বরে শোকমুগ্ধ যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখে ভ্রাতার মৃতদেহ। যাহার জন্য আজ সে ভ্রাতৃহীন, সে ত এখনও জীবিত। তাহার মত আরও কত হতভাগ্য এই হৃদয়হীন সম্রাটের অনুগ্রহে ভ্রাতৃহীন হইবে। ইহার কি কোনও প্রতীকার নাই ?

উত্তেজনার আতিশয্যে সমর সিংহের দুর্ব্বল দেহ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

যথেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর সম্রাট তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছে, অবিচারে পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, তার পর ভ্রাতার জীবনও গ্রহণ করিল। প্রতিদিন অসংখ্য হিন্দু মৃত্যুরও অধিক নির্য্যাতন সহ্য করিতেছে। দেশের

সর্ব্বত্র পুঞ্জীভূত অত্যাচার! বিধাতার বিধানে কি এই যথেচ্ছাচারের কোনও শাস্তি নাই? আকাশের বজ্র, দেবতার অভিশাপ কি কেবল দুর্ব্বলের মাথার উপরই উদ্যত থাকিবে?

তাহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইল। দন্তে দন্ত নিষ্পিষ্ট করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, "সমগ্র হিন্দুস্থানে আগুন জ্বালাইব। গুরুদেব! এতকালের শিক্ষা শুধু নিষ্ফল বিলাপের জন্য নহে। আর নিষ্ক্রিয় থাকিব না। অগ্নিময়ী কবিতায় দেশের জীবন-বহ্নি প্রজ্বলিত করিব। দিন নাই, রাত্রি নাই, মোগলের অত্যাচারকাহিনী প্রত্যেক হিন্দুর কর্ণে ভৈরব রাগে ধ্বনিত করিব। পর্ব্বত প্রান্তর, কানন নগর, গ্রাম ও পল্লী কি সমরসিংহের জ্বালাময়ী ভাষায় জাগিয়া উঠিবে না? কখনও যদি এই দাম্ভিক, আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য সিন্ধুর জলে নিক্ষেপ করিতে পারি, অজয় সিংহ, তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর কিছু প্রতিশোধ হইবে। আওরঙ্গজেব! সুখে নিদ্রা যাও; কিন্তু নিশ্চয় জানিও, বিধাতার ন্যায়ের রাজ্যে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। গুরুদেব, আপনার শপথ, হিন্দুকে জাগাইব, দেশে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিব; যদি না পারি, পিতা ও ভ্রাতার হত্যার পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে। জননী, জন্মভূমি! তোমার মলিন মুখে উষার স্নিগ্ধ হাসি আবার ফুটিবে কি?"

* * * * *

বর্ষব্যাপী আয়োজনের পর রাজবারায় মোগল ও রাজপুত শক্তির বলপরীক্ষা শেষ হইয়া গেল। রাণা রাজসিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আওরঙ্গজেব যে সন্ধি করিলেন, তাহাতে জিজিয়া করের মূলে কুঠারাঘাত হইল।

সম্রাট বাধ্য হইয়া বন্দীদিগকে মুক্তি দিলেন।

সে দিন পূর্ণিমা। উদয় সাগরের তীরে বস্ত্রাবাসের বাহিরে পিতা পুত্রের মিলন হইল। রাণা রাজসিংহ সমর সিংহের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "যুবক, আজ এই আনন্দের দিনে তোমার সেই গানটি একবার গাও। রাজপুতের হৃদয়ে তুমিই নূতন প্রাণের সঞ্চার করিয়াছ।"

গান শেষ হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। রাজ সিংহ প্রীতমনে গায়ককে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিশ্রাম করিতে গেলেন।

পুত্রের মুখপানে চাহিয়া পিতা বলিলেন, "অজয় কোথায়, সমর? তাহাকে দেখিতেছি না কেন?"

সময়ের মুখ মলিন হইয়া গেল। অশ্রুসিক্তনেত্রে সে ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া কি দেখাইল।

"ভ্রাতার জন্য অজয় প্রাণ দিয়াছে; কিন্তু তাহার মস্তকের মূল্য যে এত অধিক, আওরঙ্গজেব তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই।"

অশ্রুবিন্দু মুছিয়া ফেলিয়া পিতা পুত্রকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, "অজয় নাই; কিন্তু তোমার হৃদয়ে আজ আমি উভয়ের প্রাণ-স্পন্দন অনুভব করিতেছি। সত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য অজয় প্রাণ দিয়াছে, এই পবিত্র দিনে তাহার জন্য শোক করিব না।"

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

মান্দ্রাজের সন্ধি।

সূচনা।

Hyder Ali has discovered that we are not invincible.—*History of Hindusthan by Alex. Dow, vol ii.*

মহীশূরের পরাক্রান্ত হায়দর আলির সহিত শত্রুতা-সংঘটন বিলাতের ডিরেক্টর-সভার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তাই তাঁহারা মান্দ্রাজের ইংরাজ কর্ত্তা-দিগকে লিখিয়াছিলেন,—"হায়দরের সহিত আপনাদের শান্ত ব্যবহারই করা উচিত ছিল। রাজ্যবিস্তৃতি বিষয়ে আমাদের মনের ভাব জানিয়াও আপনারা হায়দরের সহিত মৈত্রী না করিয়া আমাদিগকে এমন গোলযোগেই ফেলিয়াছেন যে, এখন আর উদ্ধারের পথ দেখিতেছি না।"*

ইংরাজ ঐতিহাসিক হায়দরের কাহিনী লিখিতে গিয়া তাঁহাকে যাহাই কেন বলুন না, তিনি সত্বর ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার জন্য মহীশূর-সিংহাসন অধিকার করেন নাই। হায়দ্রাবাদের নিজাম যত দিন তাঁহার বন্ধু ছিলেন, হায়দর তত দিন আপন মনোমত পথ ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই;—এখন হায়দর অন্তরায়শূন্য; কারণ, নিজাম তাঁহার মিত্র নহেন, শত্রু। নিজাম এখন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরাজের আশ্রিত বন্ধু। হায়দর দেখিলেন, কপট বন্ধু অপেক্ষা সরল শত্রুও ভাল। অন্তরায়শূন্য হায়দর আলি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

---

* History of India—M. Taylor. p 471.

হইতে লাগিলেন। নিজাম ও ইংরাজের বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হইতে তিনি তিলমাত্র ভীত হইলেন না। বরং নবীন উদ্যমে—নূতন সাহসে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

হায়দর যতদিন কর্ণাটিক প্রদেশে যুদ্ধাদি ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সুযোগে ভারতের পশ্চিম কূলে হায়দরের অধিকৃত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিদ্রোহ ধূমায়িত হইতেছিল। ইংরাজ বাহাদুর দেখিলেন, এই সুযোগে বিপর্য্যস্ত হায়দরকে বিধ্বস্ত করিতে হইবে; তাই সৈন্য দিয়া পরামর্শ দিয়া তাঁহারা এই সকল বিদ্রোহী নেয়ারদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

হায়দর আলিও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ১৭৬৮ সালের মে মাসে সহসা তিনি বিপুলবিক্রমে বাঙ্গালোর আক্রমণ করিলেন; ইংরাজ সিংহ হায়দরের আঘাতে জর্জ্জরিতদেহে পলায়নের পথান্বেষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সেনাধ্যক্ষ মহাশয় আত্মরক্ষার বীরনীতি অবলম্বন করিয়া সত্বর যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া জাহাজে উঠিলেন;—কে থাকিল, কি থাকিল,—কে গেল, কি গেল, সে সব দেখিবার অবসর ও সময় তাঁহার ছিল না। তাঁহার সমুদায় অর্থ ও রসদ ও কতিপয় রুগ্ন ও ১৮০ জন আহত সিপাহী সৈন্য পর্য্যন্ত বাঙ্গালোরে শত্রুর ছায়ায় পড়িয়া রহিল। ইংরাজ কাপ্তেন তাঁহার স্বদেশীয় ৮০ জন আহত ইংরাজ সৈনিককেও সঙ্গে লইয়া যাইবার অবসর পাইলেন না! *

এ দিকে হায়দরের গুপ্তচরগণ সর্ব্বদাই রটনা করিতে লাগিল যে, তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেছেন। এই সংবাদে মান্দ্রাজ সরকার বড়ই চিন্তান্বিত হইলেন। বিচক্ষণ কর্ণেল স্মিথ মনে করিলেন, এমন অবস্থায় রসদ-সংগ্রহে নিবৃত্ত হওয়া বাতুলের কার্য্য;—মান্দ্রাজ সরকার সিদ্ধান্ত করিলেন, মহীশূর আক্রমণের ইহাই সুযোগ ও সুসময়।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড-যুদ্ধে ও দুই একটি সামান্য গিরিদুর্গ অধিকারেই গ্রীষ্মকাল কাটিয়া গেল। এ দিকে প্রভূত ধন রত্ন ও শক্তি সঞ্চয় করিয়া বীর হায়দর আলি মালাবার হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। †

---

* India—*T. Keightly. p 97.*
c. f. History of India—*Marshman vol ii, p 330.*

† British Empire in India—*Glei vol ii.*

কর্ণাটিক হইতে হায়দরের এই সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ মান্দ্রাজ কর্তৃপক্ষের দৌর্ব্বল্য ও কর্ম্মহীনতার জন্যই বৃথা কাটিয়া গেল।*

যাহা হউক, মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন, অনায়াসেই হায়দরকে পরাজিত করা যাইবে; সুতরাং যুদ্ধই শ্রেয়ঃ। ভীরু নবাব মহম্মদ আলি ইংরাজকে আরও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বাহাদুর অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়াই ডাকিলেন,—যুদ্ধং দেহি!

যুদ্ধ বাধিল। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংরাজে ও হায়দরে ভীষণ সমর উপস্থিত হইল। হায়দরের স্বদেশীয় কর্তৃক রচিত ইতিহাসে সে সমরকাহিনী সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। যুদ্ধ বাধিল। মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট মহীশূর রাজ্য জয় না করিয়াই মনে করিয়াছিলেন,—মহীশূর ত আমাদের করায়ত্তই হইয়াছে; তাই তাঁহারা নির্বিঘ্নে কর্ণাটিকের নবাব মহম্মদ আলিকে মহীশূর দান করিয়া ফেলিলেন! অপরের অধিকৃত রাজত্ব নিজের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বেই তাহা খয়রাৎ করিবার ব্যবস্থা অভিনব বটে! কিন্তু অভিনব হইলেও, ইংরাজ বাহাদুর তাহা অম্লানবদনে করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি এইরূপে রাজ্য লাভ করিয়া তাহা অধিকার করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন! †

মান্দ্রাজ সভা শুধু কর্ণেল স্মিথের উপর নির্ভর করিতে পারিলেন না। তাঁহার সহিত সভার দুই জন সদস্যও সাহায্যার্থ প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা অনেক সময়েই কর্ণেল স্মিথকে বাধা দিতে লাগিলেন। স্মিথের অশ্বারোহী সেনা ছিল না; হায়দর অশ্বারোহী সেনার সাহায্যেই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া মান্দ্রাজ সরকার মহারাষ্ট্র সেনাপতি মুরারি রাওয়ের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন।

ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রের সম্মিলন চূর্ণ করিবার জন্য হায়দর আলি একদিন নিশাযোগে মহারাষ্ট্র-শিবির আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে

---

* But the great opportunity which his (Hyder's) long absence afforded to the British Army in the Carnatic had been completely sacrificed by the *imbecility* of the Madras authorities.—*History of India—Marshman vol ii, p 330.*

† As if the kingdom of Mysore were already in their possession, they had *given it away to their Nabob,* Mahomed ali, and he accompanied the army *to take charge of the districts, as they were occupied.*

পারিলেন না। যুদ্ধ পরাস্ত হইয়া পুত্র পরিজন নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া হায়দর আলি গুরমকন্দায় গমন করিয়া শ্যালক রেজা খাঁর সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, সকলের পূর্ব্বে বাঙ্গালোর-রক্ষাই তাঁহার কর্ত্তব্য, তখন তিনি মান্দ্রাজ সভার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইলে হায়দর আলি যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ দশ লক্ষ মুদ্রা ও বাংমহাল প্রদেশ ইংরাজকে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নবাব মহম্মদ আলিকে তিনি চিরদিনই অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; তাই সন্ধির প্রস্তাবে তাঁহার সম্বন্ধে কোনও কথাই থাকিল না।

মান্দ্রাজ সভা হায়দরের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা হয় ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, হায়দর নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং তাঁহার নিকট যাহা চাহিব, তাঁহাকে তাহাই দিতে হইবে! মান্দ্রাজ সভা তাই হায়দরের নিকট একটি অসম্ভব প্রস্তাব করিলেন।* যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ তাঁহারা যে কেবল বহু অর্থ চাহিলেন, তাহা নহে; কহিলেন, —নিজামকে কর দিতে হইবে, মুরারি রাওকে মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্যের কতক অংশ এবং ইংরাজকে সীমান্ত প্রদেশ, এমন কি, মালাবার কূলেরও কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে। ইংরাজ হয় ত মনে করিয়াছিলেন, এই সুযোগে তাঁহাদের নবাব মহম্মদ আলিকেও মহীশূর সিংহাসনে স্থাপিত করিবেন।† হায়দর আলি ইংরাজের এই সকল গর্ব্বিত প্রস্তাব অবিলম্বে প্রত্যাখ্যান করিলেন।‡

পুনরায় যুদ্ধ আরব্ধ হইল। কর্ণেল স্মিথ মান্দ্রাজ সভার সহিত অনেক বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কোনও ফল হইল না; বরং আদেশ হইল যে, স্মিথ রণাঙ্গন ত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করুন। কর্ণেল স্মিথ সভার আদেশ প্রতিপালন করিলেন। কর্ণেল উডের সহিত হায়দরের যুদ্ধ হইতে লাগিল।

ইংরাজ সৈন্য যদিও খণ্ডযুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিল, যদিও হায়দরের দুর্গ অধিকার করিতেছিল, কিন্তু কিছুতেই বাঙ্গালোর অধিকার করিতে পারিল না।

---

* But the President and council, inflated with recent success, *made the more extravagant demands.—History of India—Marshman. vol ii, p33*

† The Presidential Armies.—p 300.

‡ The *inflated propositions* were in turn refused by Hyder Aly.—*History of India by M. Taylor. p 72.*

ইংরাজ বুঝিলেন যে, তাঁহারা হায়দরের সমকক্ষ নহেন! ইংরাজ সৈন্য বড় বিপদে পড়িল। হায়দর আজ এখানে, আগামী কল্য সেখানে, তৃতীয় দিবস অন্য স্থানে—সর্ব্বদাই অশ্বারোহী সেনার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন; ইংরাজ সৈন্য তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিল না।

এক দিন বাগপুরের পথে হায়দরের সহিত উডের সাক্ষাৎ হইল। হায়দরের কামান গর্জ্জিয়া উঠিল, ইংরাজ তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন। ক্রমে ক্রমে ইংরাজের গুলি বারুদ প্রভৃতি নিঃশেষ হইয়া আসিতে লাগিল। সমরক্ষেত্র ইংরাজ সৈন্যের শোণিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সৈন্যগণ কর্ণেল উডের উপর আস্থাশূন্য হইয়া পড়িল। উড তখন প্রমাদ গণিলেন। পরাজয় নিশ্চিত জানিয়া তিনি যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময় মেজর ফিট্জেরাল্ড্ আসিয়া উপনীত হইলেন কর্ণেল উড্ সসৈন্যে বিনষ্ট হইলেন না বটে, কিন্তু হায়দরের নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় কখনও বিস্মৃত হন নাই।

যখন উডের পরাজয়-সংবাদ মান্দ্রাজে পঁহুছিল, তখন মান্দ্রাজ সভা উডের অক্ষমতার জন্য রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে রণভূমি পরিত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। কর্ণেল ল্যাং উডের স্থান অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। * তখনও ইংরাজ মনে করিতেছিলেন, হায়দর একটি ক্ষুদ্র কীট; তাহাকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনাশ করিতে পারিবেন।

মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা সহজে দেখিতে পায় না;—মান্দ্রাজ সভাও তাই অন্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যদি সময় থাকিতে সকল অবস্থা বুঝিতেন, তাহা হইলে ইংরাজ ঐতিহাসিককে লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিত হইত না,—

A current of many victories will not be able to wash away the stain which this treaty (of Madras) has affixed to the British character in India.

সে কাহিনী পরে বলিব।

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।

* The result of this unfortunate enterprise was that Wood was recalled, Colonel Long being sent to supersede him.

—Haider Aly by Bowring.

মৃণ্ময়ীর পুরস্কার।

দুয়ারে থামিল গাড়ী; মীনু নামে তাড়াতাড়ি,
ছুটিয়া অঙ্গন দিয়া চলে।
চলিতে উছট খায়, অঞ্চল লুটায়ে যায়,
ললাটে মুকুতা-বিন্দু ফলে,
নয়নে উছলে হাসি; মায়ের নিকটে আসি,
"মাগো, দেখ, 'প্রাইজ' কেমন!
'প্রথম' হয়েছি বলি' 'দিদি' দিয়েছেন 'ডলি'—
ঠিক্ যেন খুকীর মতন!
'কালো কালো চোখ দিয়ে, জ্ব'ল্ জ্বল্ আছে চেয়ে,
চুলগুলি ওড়ে ফর্ ফর্,
'ঘাগ্‌রাটী পরা গায়, ছোট-জুতা দুটি পায়,
"মা গো, দেখ কেমন সুন্দর!"
গৃহ-কর্ম্মে ব্যস্ত মাতা, শুনিয়া মেয়ের কথা,
হাসি' চাহিলেন তার পানে,—
"মীনুরাণী, মা আমার! ও 'ডলি' ছুঁয়ো না আর,
তুলে রেখে দাও ওইখানে।
বিদেশী, নাই ও নিতে।—" মেয়ে চাহে চারি ভিতে,
ছল ছল প্রফুল্ল নয়ন!
মা দেখিয়া কোলে নিয়া, কহে মুখে চুমো দিয়া,
"ডলি নিয়ে খেলা কর ধন!"
কোন কথা নাহি বলি' ধীরে মীনু গেল চলি;
লুকাইল কে জানে কোথায়!
ছোট ভাই 'বেণু' তার খুঁজি ফিরে চারিধার,
দিদি কোথা দেখা নাহি পায়।
সেদিন সাঁঝের বেলা, আর তো হ'ল না খেলা,
বাবার সাথেতে লুকাচুরী;—
মেনী শুধু ঘরে আসে, খুঁজে দেখে চারি পাশে—
'মিউ মিউ' করি' ঘুরি' ঘুরি'।

পর দিন বিদ্যাবাসে, ছাত্রীগণ চারি পাশে,
শিক্ষয়িত্রী শিক্ষাদানে রতা;
আজিকার পাঠ "শিখ"; 'কি তেজস্বী, কি নির্ভীক,
বুঝাইয়ে বলেন সে কথা।
মৃণ্ময়ী দুয়ারে আসে, দেখিয়া মেয়েরা হাসে,—
"দেখ, মীনু 'প্রাইজ' তাহার—
"কোলেতে করিয়া 'ডলি' স্কুলে এসেছে চলি',
ছাড়িতে পারে না বুঝি আর!
মীনু কিছু নাহি কহে, শুধু নতমুখে রহে,
মুখে উড়ে পড়ে কালো চুল,
শিক্ষয়িত্রী পাশে গিয়া, বলে তাঁর হাতে দিয়া—
"ফিরে নাও বিদেশী পুতুল।"

* * * * *

মায়ের নিকটে আসি', মৃণ্ময়ী দাঁড়াল হাসি,
চোখে আর নাহি জল তার।
মা তাহারে কোলে করি', কচি ঠোঁট দুটি ভরি',
'চুম্বন' দিলেন পুরস্কার!
দেখিয়া ঈর্ষ্যায় জ্বলি', বেণু দিল বাঁশী ফেলি',
লাটিম পুকুরে ফেলি দিয়া,
কত রাজ্য জয় করে' যেন আসিয়াছে ঘরে!
মায়ের আঁচল ধরে গিয়া!

সহযোগী সাহিত্য।

দীন-ই-ইলাহি।

সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জগতের সকল অংশে মানুষের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইয়া সম[স্ত] মানবজাতিকে একতাসূত্রে বদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে এই চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে। ভাষা ও ধর্ম্মও এই চেষ্টার বিরাট—ব্যাপক—বিশাল কর্ম্মক্ষে[ত্র] হইতে বিতাড়িত হয় নাই। 'এস্‌পেরেণ্টো' নামক এক ভাষায় সমগ্র মানবজাতিকে অভি[ন্ন] করিবার চেষ্টা চলিতেছে। আর রেলপথ, বাষ্পীয় জলযান, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন,—এ[ই]

সকলের বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মমতের স্থলে মানুষকে উন্নত উদারতাপূর্ণ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার কল্পনাও কাহারও কাহারও মনে সমুদিত হইতেছে। বৈচিত্র্যকে নির্ব্বাসিত করিয়া একতাকে তাহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার এই চেষ্টা,—দেশগত ও জাতিগত বিভিন্নতা বিসর্জ্জন করিয়া তাহার স্থানে সব একাকার করিবার এই প্রয়াস, কখনও সুসিদ্ধ হইবে কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু এই চেষ্টার ফল দেখিবার জন্য সভ্যজাতি-মাত্রই উদ্‌গ্রীব।

এ সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি সার্ব্বজনীন ধর্ম্মসংস্থাপনকল্পে সম্রাট আকবরের চেষ্টার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জগতে প্রধানতঃ ছয়টি ধর্ম্মমত প্রচলিত;—ইহুদী, পার্শি, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয় ও ইসলাম। প্রথমোক্ত তিনটি প্রাচীন; অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের পক্ষে ইহাদিগের প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ; শেষোক্ত তিনটির ব্যবস্থা বিপরীত;—ইহারা আগন্তুককে সাগ্রহে গ্রহণ করিতে সম্মত—উদ্যত—ব্যগ্র। এক্ষণে আমেরিকায় ও জাপানে ধর্ম্মমহামণ্ডল-সংস্থাপন—সভ্য মানব সম্প্রদায়ের এক-ধর্ম্ম-সংস্থাপন-চেষ্টার ফল। সমগ্র মানবজাতি শ্রান্ত পান্থের মত এক বিশাল ধর্ম্মের ছায়ায় সমাসীন হইয়া সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিবে—ভ্রাতৃভাবে কালযাপন করিবে, এ স্বপ্ন সুখের! তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ফতেপুর শিক্‌রীর প্রাসাদে আকবর এই সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বকথিত ছয়টি ধর্ম্মমতের সারসংগ্রহ করিয়া যে ধর্ম্ম-সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার নাম,—দীন-ই-ইলাহি। 'আইন-ই-আকবরী,' 'মুন্তাকওয়াব-উৎ-তারিখ', 'দবিস্তান-ই-মাজিব' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে ইহার স্বরূপ জানিতে পারা যায়।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিমূলে দাঁড়াইয়া লর্ড নর্থব্রুক বলিয়াছিলেন,—আকবরের পরবর্ত্তিগণ তাঁহার প্রবর্ত্তিত নীতি হইতে ভ্রষ্ট না হইলে, ইংরাজ ভারতে সাম্রাজ্যসংস্থাপন করিতে পারিতেন না। সত্যই আকবরের পরবর্ত্তী মোগলসম্রাটগণ যদি তাঁহার মত সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমতের সম্পূর্ণ স্বাধীনতাদানে উৎসুক হইতেন, এবং জাতিভেদে বিচার-বিভেদের বিরোধী হইতেন, তবে মোগলের বিশাল সাম্রাজ্য অল্প দিনে বিধ্বস্ত হইয়া যাইত না। আকবর বুঝিয়াছিলেন,—সকল ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট অংশ লইয়া একটি ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারিবেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা-বিজয়ের পর অবকাশ পাইয়া তিনি ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। এই সময় এক এক দিন সমস্ত রাত্রি তিনি ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতেন। আগ্রায় ও ফতেপুর শিক্‌রীতে তিনি কয়টি ইমাদতখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে এই ইমাদতখানায় ধর্ম্মবিচার চলিত। আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে চারি মণ্ডলীতে বিভক্ত করিয়া ধর্ম্মের জটিল প্রশ্ন সম্বন্ধে তর্ক করিতে বলিতেন। তর্ক যখন ক্রমে ব্যক্তিগত কলহে পরিণত হইত, তখন সম্রাট মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। 'দর্ব্বিস্তান-ই-মাজিব' গ্রন্থে এই সকল তর্কের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। 'আকবরনামা'তেও ইহার উল্লেখ আছে। কথিত আছে,—তর্কের ফলে আকবর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, বিচারবুদ্ধির ব্যবহার করিয়া ঈশ্বরের পূজা করাই শ্রেয়ঃ।

এই সকল আলোচনায় আবুল ফজল আকবরের সহায় ছিলেন। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবরের সহিত প্রথম পরিচয়কালে আবুল ফজলের বয়স পঁচিশ বৎসর মাত্র! তিনি তখন পাণ্ডিত্য-গৌরবে গরীয়ান, এবং লিপিকুশল। তিনি স্বয়ং সংশয় ও বিচারের ফলে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, ধর্ম্মালোচনাব্যপদেশে জ্ঞান সম্বন্ধে ধনী, কিন্তু পার্থিব সম্পদে দরিদ্র ধর্ম্মালম্বীদিগের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদিগের স্বার্থপরতা ও লোভের বিষয় জানিতে পারি।

আবুল ফজলের পিতা শেখ মোবারক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নানা গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে মাধবী সম্প্রদায়ে যোগ দেওয়ায় বিপন্ন হইয়া আকবরের সভায় আসিয়া প্রাণরক্ষা করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফৈজী ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবরের সভায় আসিয়া ক্রমে সম্রাটের প্রিয়-পাত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য, চরিত্র ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া সম্রাট তাঁহাকে সভা-কবির পদ প্রদান করেন। তিনি সংস্কৃতাভিজ্ঞ ছিলেন;—স্বয়ং পারসীতে 'নলদময়ন্তী'র অনুবাদ করেন, এবং 'বীজগণিত', 'লীলাবতী', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'রাজতরঙ্গিণী' প্রভৃতি পুস্তকের অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মরণাহত কবির শয্যাপ্রান্তে আকবর উষ্ণীব ফেলিয়া বালকের মত রোদন করিয়াছিলেন! আকবর গুণগ্রাহী ছিলেন; তাই তাঁহার সভায় গুণবানের সমাগম হইত।

আবুল ফজলের সহিত সাক্ষাতের পাঁচ বৎসর পরেই আকবর ধর্ম্ম বিষয়ে প্রভুত্ববিস্তারে সচেষ্ট হয়েন। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মোকদম উলমুল্ক প্রভৃতি কয় জন মোল্লাকে দিয়া এ বিষয়ে তাঁহার স্বপক্ষে এক ব্যবস্থা লিখাইয়া লয়েন। ইহাই দীন-ই-ইলাহির সূচনা।

আবুল ফজল বলেন,—চিন্তার ফলে মানুষ যখন শিক্ষাসম্প্রাপ্ত কুসংস্কার পরিহার করে, তখন ধর্ম্মের অন্ধবিশ্বাসের লূতাতন্তুজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; তখন মানুষ সমতার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে। কিন্তু এ জ্ঞানের আলোকরশ্মি সকল গৃহ উদ্ভাসিত করে না; সকলের হৃদয় সে আলোকপাত সহ্য করিতে পারে না। অনেকে বিজ্ঞ হইয়াও ভীত। যাঁহারা সাহসে ভর করিয়া বিশ্বাস করেন, সঙ্কীর্ণচিত্ত ধর্ম্মভ্রগণ তাঁহাকে সংহার করিতে উদ্যত হয়।

আকবর এইবার সভায় সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সমাবেশে যত্নবান হইলেন। সকল ধর্ম্মের সার সত্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কোনও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হইল। বদৌনী এই নূতন ধর্ম্মমতের পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, আকবর বাল্যকাল হইতেই নানা বিশ্বাস ও সংসারের পথে সত্যের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ক্রমে নানা ধর্ম্মের আলোচনার ফলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে যে, সকল ধর্ম্মেই যখন সত্য আছে, তখন কোনও এক ধর্ম্মমতকে প্রাধান্য প্রদান করা অনুচিত। সর্ব্বত্র যাহা হয়, এখানেও তাহাই হইল। লোকে আকবরকে দেবতা জ্ঞান করিতে লাগিল। কেহ কেহ রোগমুক্তির আশায় ঔষধরূপে ব্যবহার করিবে বলিয়া আকবরের নিশ্বাসপূত করিবার জন্য পাত্র ভরিয়া জল আনিত। আকবর তাহা রৌদ্রে রাখিয়া ফিরাইয়া দিতেন। বিশ্বাস এমনই জিনিস যে, সেই জলপানে অনেকের রোগ দূর হইত!

মাধবী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল, শেষ দশায় ইসলাম ধর্ম্ম দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে; তখন ইমাম মাধী আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধি সাধন করিবেন। কেহ কেহ তোষামোদ করিয়া আকবরকে সেই মাধী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে লাগিল। আকবর তাহাতে বিশ্বাস করিলেন, এবং সেই বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবজ্ঞাপক নূতন অব্দ প্রচলিত করিলেন। তিনি জোরো-অ্যাস্ট্রিয়ান ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অবগত হইলেন। তিনি সপ্তবর্ণের সাতটি পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়া সপ্তাহের এক এক দিন এক একটি পরিধান করিতে লাগিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি প্রকাশ্য ভাবে সূর্য্যের পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি সূর্য্যপূজার সময় সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইতেন। তাঁহার শুদ্ধান্তে যোধা বাইর মহলে নিত্য হোম হইত। পুরুষোত্তম নামক এক জন ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ নিশীথে খট্টাঙ্গে অন্তঃপুরের বাতায়নতলে আনিয়া তিনি তাঁহার সহিত হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন।

আকবর গোমাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ করেন। তদ্ভিন্ন নানা তিথিতে আমিষভক্ষণও নিষিদ্ধ হয়। প্রতি দিন চারিবার সূর্য্যপূজার ব্যবস্থা হয়। সম্রাট স্বয়ং পূজার সময় সূর্য্যের বহু সংস্কৃত নাম উচ্চারণ করিতেন। রাখীপূর্ণিমার দিন তিনি ললাটে টীকা দিয়া দরবারে আসিতেন, এবং ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মণিবন্ধে রাখী বাঁধিয়া দিতেন; ওমরাহগণ তাঁহাকে নজর দিতেন। এই রাখীবন্ধনপ্রথা এখনও মোগল রাজবংশীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত আছে।

ক্রমে অনেকে আকবরকে অবতার বিবেচনা করিতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে বহু হিন্দু তাঁহার দর্শনলাভাশায় বাতায়নতলে সমবেত হইত, এবং তাঁহাকে দেখিতে পাইলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিত,—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

খৃষ্টীয় ধর্ম্মেও আকবরের শ্রদ্ধা ছিল। তিনি পুত্র মুরাদকে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্রোহী মোল্লাদিগকে কান্দাহারে নির্ব্বাসিত করেন। এই সময় মুসলমানগণ সাক্ষাতে পরস্পরকে আল্লাহো আকবর (জগদীশ্বর মহান্) বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। আকবর সম্রাটের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণামের হিন্দু প্রথা প্রবর্ত্তিত করায় মুসলমানগণ বিরক্ত হয়েন, এবং কোনও কোনও সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণাও করেন। হিন্দুদিগের মধ্যে কেবল রাজা বীরবল সম্রাটের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রবর্ত্তিত দীন-ই-ইলাহির অবনতির সূচনা হয়। জাহাঙ্গীর এ মতের উপর বিরক্ত ছিলেন। তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার একান্ত বিরাগভাজন আবুল ফজল ইহার প্রধান পুরোহিত ছিলেন। শাহজাহান গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র দারা এই মতের অনুবর্ত্তী ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিতে পারেন নাই।

তাহার পর আকবর যে উদার ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন,—আওরঙ্গজেব তাহার উচ্ছেদ সংসাধন করেন; সঙ্গে সঙ্গে মোগল রাজত্বেরও শেষ হইয়া আইসে।

দাসী।

১

অভ্রভেদী সে পর্ব্বতমালা,
আঁধার মেঘের মত ;
শৈল ভীষণ, সিন্ধু-শরীরে
তরঙ্গ সমান, কত !
শৃঙ্গ উপরে শৃঙ্গ, অশেষ ;
স্তব্ধা প্রকৃতি, নির্জ্জন দেশ—
গম্ভীর যোগ-নিদ্রা-সাধনে
ব্যোম-পুরুষ রত !

পল্লব-শাখা বিস্তারি' কিবা
দারু ও শেগুন, শাল ;
দীর্ঘাবয়ব বৃক্ষে উজ্জ্বল
পলাশ-প্রসূন লাল !
শষ্প শ্যামলে সজ্জিত তল,
পুষ্পিত তরু-বল্লরী-দল,
পীত হরিত বর্ণ-ছটার
রম্য ইন্দ্রজাল !

আর্য্য সে গিরি অঙ্কেনিহিত
কুঞ্জ-কুটীর রাজে—
পুষ্প-পত্র-গ্রন্থনে চাল,
প্রাচীর বিটপ-ভাঁজে।
ঊর্দ্ধে বিটপী, শৈলশিখর,
স্নিগ্ধ ছায়ায় রক্ষিছে ঘর—
চুম্বি তাহার প্রাঙ্গন-পথ
নির্ঝর চলিয়াছে !

পুণ্য প্রদেশ; তপ্ত পাপের
প্রশ্বাস নাহি তথা;
মুক্ত সুখের গুঞ্জনালয়,
স্বর্গের শুধু কথা!
স্বর্গে সে—পাপ-দৃষ্টি-বাহিরে—
কান্ত কুসুম-কুঞ্জ-কুটীরে—
যৌবনালসা নারী রহে এক,
কান্তা কনকলতা!

সঙ্গী তাহার সূর্য্য দিবসে,
চন্দ্র তারকা রাতে;
বন্ধু তাহার নির্ঝর সেই,—
বড় ভাব দু'জনাতে।
কান্তিতে তার পড়িলে নয়ান
পর্ব্বত হয় স্পন্দনবান,
কণ্ঠে ফুটিলে সঙ্গীত তার
নির্ঝর গাহে সাথে।

পর্ব্বতপুরে পদ্ম সে একা
আপনি ফুটিয়া থাকে—
গন্ধে মাদক মত্ত পবন
হুহু শবদে হাঁকে!
হাস্যে তাহার ঝরে মণিমালা,
দৃষ্টি তাহার পীযূষ-পেয়ালা;—
শুভ্র ললাটে কুন্তল-লেখা
দেব-বীরে ফেলে পাকে!

২

পর্ব্বতপুরে পদ্ম সে একা
আপনি ফুটিয়া থাকে;—
শুদ্ধ উষায় রুদ্ধার দ্বারে
দেবী এক আসি' ডাকে।—

"মর্ত্ত্য ভ্রমিয়া আর্ত্ত শরীর,
আশ্রয়ে তব আশ্রিতা স্থির,
বৎসে! আমার অর্চ্চনা কর—"
কহিলা দেবতা তাকে।

পাদ্য-অর্ঘ্যে পূজ্যারে পূজি',
ফুল ফল মূল আনি,—
মন্দার-বন-বাসিনী-চরণে
অর্পে পার্ব্বতী রাণী।
তুষ্টা তাহার শ্রেষ্ঠ পূজায়,
ফুল্ল মানসী, তুল্য কথায়,
হর্ষে বালারে বর্ষে আশীষ—
অমৃত-মধুর বাণী;—

"তৃপ্ত তোমার দৃপ্ত চরিতে,
দিতেছি তোমারে বর,—
দিব্য জ্ঞান ও দর্শন, শুভে!
ভূষা তব অতঃপর।
স্পর্শ ও দেহ,—কুৎসিত জরা,
কুৎসিত ব্যাধি,—কুৎসিত-করা
ভ্রান্তি শ্রান্তি,—সাধ্য কি করে?
সাধ্য কি করে ভর?

"বিশ্বের মনোরাজ্য তোমার
নেত্র-গোচর রবে;
শক্তি-ধারিণি! শক্তিরে তব
কেহ না আঁটিবে ভবে।
গুপ্ত মানব-অন্তর-লেখা,
সূক্ষ্ম তোমার দৃষ্টিতে দেখা
নিশ্চিত যাবে;—অন্যথা মম
বাক্যে ঘটেছে কবে?

"মৃত্যু ও প্রেম—মৃত্যু ও প্রেম—
কথা কর অবধান,—
বৎসে! এদের স্পর্শে তোমার
শক্তির তিরোধান!
মৃত্যু ও প্রেম শত্রু তোমার—
মৃত্যু ও প্রেম সংহার-কার
দত্ত এ মম দৈব বলের ;—
সাবধান! সাবধান!"

অন্তর্ধান জ্যোতির্ম্ময়ীর
ঘটিল তাহার পরে ;—
সুন্দরী গিরি-কন্দর-বাসে
মানসী দেবীর বরে!
দীপ্ত সে রূপে দীপ্তি জ্ঞানের,—
স্বর্ণে উজ্জ্বল কষ্টি-টানের
মূর্ত্তি ধরিল ;—স্ফূর্ত্তি বালার
বর্ণনা কে গো করে!

৩

সুন্দরী গিরি-কন্দর-বাসে
মানসী দেবীর বরে—
হর্ষে ও সুখে সাহঙ্কারে
কুঞ্জে বসতি করে।
সূক্ষ্মাণু হ'তে রুক্ষ বিশাল
পুঞ্জ শিলার পর্ব্বতমাল
দিব্য দিঠিতে বিন্ধি' দেখে সে—
বিন্ধে সে চরাচরে।

দিব্য জ্ঞানে দক্ষা বিচারে,—
সৃষ্টি স্থিতি লয়
ভিত্তিতে কোন্ নিত্য,—তাহাতে
সংশয় নাহি রয়।

নাহিক ভ্রান্তি, নাহিক শ্রান্তি,
পূর্ণা বিবেকে ;—কড়া কি ক্রান্তি
শূন্যতা নাহি—চিত্ত সদাই
জ্ঞান-যোগে নিরাময়।

স্তব্ধ নিশীথে আঙ্গিনে বসি'
নিম্নে ধরণী পানে
চাহিলে চক্ষে—সে মানচিত্রে
বুঝিত কে কোন স্থানে ;
সুপ্ত প্রাণের গুপ্ত বেদন—
গুপ্ত অনল সুপ্ত চেতন—
ভগ্ন-হৃদয়-উচ্ছ্বাস-লীলা
ভুঞ্জিত ক্রীড়াভানে !

ইচ্ছাতে তার সিংহী আসিয়া
চুম্বিয়া রেণু, পায়—
মস্তক রাখি' নিদ্রা যাইত,—
স্বপ্নে কাঁপিত কায়।
শৈশবে সুখী চঞ্চল অতি
মুগ্ধ মৃগের শিশুসন্ততি,
স্কন্ধে উঠিয়া কুন্তল ঘ্রাণি,'
লম্ফে কে কোথা ধায় !

তৃষ্ণা-পীড়িত দগ্ধ চাতক—
বিহঙ্গ কবি-রাজ ;—
প্রত্যেক নিশি হেমাঙ্গী-সমীপে
ক্রন্দন তার কায !
বসন্ত-সখা নিতি আনন্দে
কোকিল-কণ্ঠে চরণ বন্দে,—
উঠে যে কণ্ঠে প্রেম-তরঙ্গে
বন্যা ভীষণ সাজ !

সূর্য্য সখা যে,—অনল বর্ষি'
ভস্ম কি করে তারে ?
চন্দ্র-কিরণে মগ্না, থাকিত
স্বপ্ন-বালিকাকারে !
সঞ্চালি' পাখা স্নিগ্ধ পবন
যত্নে তাহারে করিত ব্যজন
সজ্জিত গিরি-কন্দরে সে যে
দেবীর আশীষ-হারে !

৪

শ্রান্ত একদা অতি মুমূর্ষু
পান্থ আসিয়া কহে,—
(কণ্ঠ সে ক্ষীণ) "মরণ-পূর্ব্বে
তৃষ্ণাতে তালু দহে ;—
কুঞ্জ-শোভিনী ! কাঞ্চনময়ী
অয়ি বরাঙ্গি ! কাম্যদে অয়ি !
সঞ্জীবন সুসলিল দেহ গো !
পানে যদি প্রাণ রহে !"

লুণ্ঠি' ভূতলে পড়িল পান্থ—
বন্ধ কি শ্বাস বুকে ?
মস্তক তার অঙ্কে রাখিয়া
রামা দিল জল মুখে।
রুগ্ন পথিক বাঁচে কি মরে ;—
যত্নে প্রমদা শুশ্রূষা করে,
রুদ্ধ মমতা-প্রস্রবণ গো
খুলে গেল তার দুখে !

কিন্তু ও কি ও ! দৈব যাদু সে
কোথায় হারা'ল তার !
দৃষ্টি ও জ্ঞান দিব্য,—নহে সে
আজ্ঞাকারী ত আর !

পাষ্থ-বদন-চন্দ্র ছাড়িয়া
দৃষ্টি না চলে সৃষ্টি বেড়িয়া ;
বক্ষের মাঝে অন্ধ তামসী,
জ্ঞানালোক কোথা ছার !

দৈব হা ক্রূর ! দুর্ব্বল দেহে
শক্তি করিতে দান
ভগ্ন জীবন বৃন্তে জুড়িতে,
নিষ্প্রাণে দিতে প্রাণ,—
পুণ্য না পাপ ? অঙ্কে কোমল
শয্যা না হ'লে—আহা দুর্ব্বল—
নির্ম্মম কে যে প্রস্তর 'পরে
করিবে তাহার স্থান !

স্পর্শে এমন গরল যদি গো !
কোথায় সুধার ঠাঁই ?
নিশ্চেতনা সে রম্যা এখন,
ক্ষতি লাভ মনে নাই !
অঙ্কে সতত আর্ত্ত সে জন ;—
বাক্যে তাহার তৃপ্ত শ্রবণ,—
দাস্থপণে সে মুগ্ধা মোহিনী
রাজত্বে দিল ছাই !

ক্রুদ্ধ তা' দেখি' বহ্নি ঢালিল
সূর্য্য তাহার শিরে ;—
শৈত্য কিরণে সৃজিল চন্দ্র,
নারী না চাহিল ফিরে।
তুচ্ছ তারকা অম্বরবাসী
বিদ্রূপে কহে, 'দাসী রে ! ও দাসী !'
দাসী তা শুনিয়া—কাঁদিয়া হাসিয়া !
চুম্বিল প্রবাসীরে।

৫

সম্প্রীতি সেবা যত্নে দাসীর,
দাসীর রত্নহার—
প্রাপ্ত-জীবন সুস্থ পথিক ;—
স্বাস্থ্য ফিরিল তার।
ভোজ্য পেয়—তা ভোগ্য দেবের—
(ভাগ্যে ছিল গো ব্যাধি পথিকের !)
কণ্টক তার বিন্ধিলে পায়
দাসী ছুটি' করে ব'ার !

চিত্তে দাসীর—হিল্লোল ছোটে
সমুদ্র-প্রমাণ সুখে ;
নির্বোধ ও রে ! স্বপ্ন ভাঙ্গিলে
বজ্র পড়িবে বুকে !
ক্ষণিক নেশার ভঙ্গে পিপাসা,
ভঙ্গে আঁধার আকুল নিরাশা,
শূন্যে ভাসিবে দীর্ঘনিশাস,
বাক্ না সরিবে মুখে !

আলস্যে সুখে, স্নেহ যতনের
পরিপূর্ণতার ভারে—
অল্পে দু' দিনে পান্থ কাতর,
শ্বাস না ফেলিতে পারে !
বিশ্রামে গুরু শ্রান্তি আনে যে—
নিত্য অমৃতে রুচি কমে তেজে—
বক্ষে তাহার রুদ্ধ বায়ু, তা
বল না বলে সে কারে ?

প্রত্যূষ-কালে উঠি' অভাগ্যা
এক দিন দেখে ত্রাসে—
আত্ম হইতে আত্মীয় তার
অদৃশ্য ! নাহি বাসে।

শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গ অন্যে,
ত্রস্ত করিয়া গিরি-অরণ্যে,
চঞ্চলপদে উন্মাদিনী সে
ভ্রমে ঊর্দ্ধশ্বাসে!

প্রবাসী! কান্ত! শ্রান্ত পথিক!
প্রিয়! প্রভু! প্রাণময়!
বিবিধ শব্দে সম্বোধে বামা
শূন্য কাননময়।
ব্যঙ্গ করিয়া প্রতিধ্বনি, সে
উচ্চারে কথা,—বিষ ঢালি' বিষে;—
কুন্তল ছিঁড়ি' বক্ষ প্রহারে,
ও গো কত তার সয়!

৬

হেলিলে সূর্য্য মধ্যগগনে
কাতরা কুটীরে আসে;—
দৃষ্টি-বিবেক-বর্জ্জিতা,—ঘোর
উন্মাদে শুধু হাসে;
"কুঞ্জে আসিবে কান্ত আমার—
নিদ্রিতা হ'লে শুশ্রূষা তার
করিবে কে?—হায় মুমূর্ষু সে যে!
জেগে থাকি তার আশে!"

নিদ্রা-পরশ উন্মাদে নাহি;
জেগে ব'সে আছে দাসী;
কান্ত কখন কুঞ্জে ফিরিবে—
দর্শন-অভিলাষী!
পশু কি পক্ষী আসে না আর
যাতনা-অশ্রু মুছা'তে তার;
পর্ব্বত-পুরে অন্ধ একা সে—
কভু কাঁদি,—কভু হাসি'—
(আজও)! জেগে ব'সে আছে দাসী!

শ্রীরামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালার ইতিহাস।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালার অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির ও ঘটনার সহিত পরিচিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসিবিদ্রোহ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রকাশের পূর্ব্বে কয় জন বাঙ্গালী এ সকলের কথা জানিতেন? পরিণত বয়সে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। "চন্দ্রশেখরে"র বিজ্ঞাপনে তিনি বাঙ্গালী পাঠককে দুর্ল্লভ মুতাক্ষরীণ গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছিলেন। "রাজসিংহে"র শেষ কথা,—য়ুরোপে যিনি রাজসিংহের সহিত তুলনীয়, তিনি "দেশহিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন—এ দেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বড় দুঃখ, এ দেশের ইতিহাস নাই। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষীয়দিগের যে ইতিহাস নাই, তাহার বিশেষ কারণ আছে। কতকটা ভারতবর্ষীয় জড় প্রকৃতির বলে প্রপীড়িত হইয়া, কতকটা আদৌ দস্যুজাতীয়দিগের ভয়ে ভীত হইয়া, ভারতবর্ষীয়েরা ঘোরতর দেবভক্ত। বিপদে পড়িলেই দেবতার প্রতি ভয় বা ভক্তি জন্মে। যে কারণেই হউক, জগতের যাবতীয় কর্ম্ম দৈবানুকম্পায় সাধিত হয়, ইহা তাঁহাদিগের বিশ্বাস। ইহলোকের যাবতীয় অমঙ্গল দেবতার অপ্রসন্নতায় ঘটে, ইহাও তাঁহাদিগের বিশ্বাস। এ জন্য শুভের নাম 'দৈব,' অশুভের নাম 'দুর্দ্দৈব'। এরূপ মানসিক গতির ফল এই যে, ভারতবর্ষীয়েরা অত্যন্ত বিনীত; সাংসারিক ঘটনাবলীর কর্ত্তা আপনাদিগকে মনে করেন না; দেবতাই সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ কর্ত্তা, বিবেচনা করেন। এ জন্য তাঁহারা দেবতাদিগেরই ইতিহাস-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত; পুরাণে ইতিহাসে কেবল দেবকীর্ত্তিই বিবৃত করিয়াছেন। যেখানে মনুষ্যকীর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেখানে সে মনুষ্যগণ, হয়, দেবতার আংশিক অবতার, নয়, দেবানুগৃহীত; সেখানে দৈবের সংকীর্ত্তনই উদ্দেশ্য। মনুষ্য কেহ নহে, মনুষ্য কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা নহে, অতএব মনুষ্যের প্রকৃত কীর্ত্তিবর্ণনে প্রয়োজন নাই। এ বিনীত মানসিক ভাব অস্মজ্জাতির ইতিহাস না থাকার কারণ। * * * * * অহঙ্কার অনেক স্থলে মনুষ্যের উপকারী,

এখানেও তাই। জাতীয় গর্ব্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি, ইতিহাস সামাজিক বিজ্ঞানের এবং সামাজিক উচ্চাশয়ের একটী মূল। ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। এমন দুই এক জন হতভাগ্য আছে যে, পিতৃপিতামহের নাম জানে না; এবং এমন দুই এক হতভাগ্য জাতি আছে যে, কীর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি অবগত নহে। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙ্গালী। উড়িয়াদিগের ইতিহাস আছে।”

বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ইতিহাস না থাকার যে কারণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকে একমাত্র কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলেও, আমরা একটি প্রধান কারণ বলিয়া স্বীকার করি। জগতে কোন্ প্রাচীন জাতি ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জন্য আপনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে? সকল প্রাচীন জাতিই শিল্পে ও সাহিত্যে ইতিহাসের উপকরণমাত্র রাখিয়া গিয়াছে। ভারতে সেরূপ উপাদানের অভাব নাই; বরং তাহার প্রাচুর্য্যই লক্ষিত হয়। যখন কোনও বহুকালব্যাপিনী সভ্যতা বিলুপ্ত হয়, তাহার সকল চিহ্ন পবন-হিল্লোলের মত শেষ হইয়া যায় না; পরন্তু শিল্পে ও সাহিত্যে, এমন কি, নিত্যব্যবহার্য্য গার্হস্থ্যদ্রব্যাদিতেও তাহার বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে। আবার প্রতীচ্য কোবিদগণ যে ভাবে মিশরের, গ্রীসের ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার বিলোপের কথা বলেন, সে ভাবে দেখিলে, ভারতের প্রাচীন সভ্যতা আজও সজীব। ভারতের ধূলি শত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষসমষ্টি; ভারতে সর্ব্বত্র ইতিহাসের উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ভারতের সাহিত্য বিরাট—বিপুল; কত পুঁথি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কত পুঁথি এখনও অনাবিষ্কৃত; কিন্তু যে সকল গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহাদেরই সংখ্যা কত! আর কোনও দেশে এরূপ বিপুল প্রাচীন সাহিত্য ছিল না। আবার ভারতের স্তূপের ও মন্দিরের সংখ্যানির্ণয় অসম্ভব। ইতিহাসের রচনা বিষয়ে স্থপতি-শিল্পের সাক্ষ্য সাহিত্যের সাক্ষ্য অপেক্ষা অধিক আদরণীয়, অধিক প্রামাণ্য। প্রক্ষেপে ও সংশোধনের ফলে বহু গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। সাহিত্যে প্রক্ষেপ ও সংশোধন সহজে বোধগম্য হয় না; কিন্তু সুশিক্ষিত দর্শকের দৃষ্টি স্থপতির কৃত কার্য্যে প্রক্ষেপ বা সংশোধন অতি সহজে বুঝিতে সমর্থ হয়। পুরাতত্ত্ব-বিৎ সার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম সত্যই বলিয়াছেন যে,—লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাবে পুরাবস্তুরাজিই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের

সোমাণা উপকরণ। এ কথাও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, যে সকল জাতি আপনাদের বিবরণ ক্ষণবিধ্বংসী গ্রন্থপত্রে রক্ষা না করিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী প্রস্তরে বা প্রাসাদে রক্ষা করে, ইতিহাসের হিসাবে, সে সকল জাতি সৌভাগ্যবান। পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ অনুশাসনসমূহ অক্ষয় অক্ষরে ভারতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। উড়িষ্যার গুহামন্দিরের কথায় হাণ্টার বলিয়াছেন,—"ইতিহাসের এই সকল উপকরণ পর্ব্বতেরই মত অক্ষয়।" ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ উপাদান বিদ্যমান। ভারতের কোথায় মন্দির, স্তূপ, গুহামন্দির, বা অনুশাসন নাই? বর্ষার বারিধারা, শীতের শিশির, নিদাঘের তপনতাপ সে সকল নষ্ট করিতে পারে নাই; ঝঞ্চাবাত, করকাপাত, বিজাতীয়ের বা বিধর্ম্মীর অত্যাচার সে সকল লুপ্ত করিতে পারে নাই। তাহারা কালজয়ী।

এই সকল উপাদান হইতে আমাদের ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে। সে কার্য্য সহজসাধ্য নহে,—কিন্তু বাঙ্গালীর অবশ্যকর্ত্তব্য; কেন না, কোনও জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য তাহার অতীত ইতিহাসের মত পথ-নির্দ্দেশক আর নাই। তাই রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাঙ্গালার ইতিহাসে"র সমালোচনা করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখে বলিয়াছিলেন,—"এক্ষণে 'বাঙ্গালার ইতিহাস' উদ্ধার কি অসম্ভব? নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান বাঙ্গালী অতি অল্প। কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি যে, তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণ বাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন; তাহা না লিখিয়া তিনি বালকশিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে ভিক্ষামুষ্টি দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় করিয়াছে।" কিন্তু এই বাঙ্গালী কর্ত্তৃক বাঙ্গালার ইতিহাস-রচনার আরম্ভ

বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন,—"ভিক্ষামুষ্টি হউক, কিন্তু স্বর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাসে বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বঙ্গভাষায় দুর্ল্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্যজ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস।"

তিনি বলিয়াছেন,—"গ্রীন্‌লণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই। মার্শমান, ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতি প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি; সে কেবল সাধপূরণ মাত্র।"

বাঙ্গালী যে গৌরবশূন্য নহে—বাঙ্গালার ইতিহাস যে জাতীয় গৌরবস্মৃতিসুরভিত, এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র পুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছেন।—"বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম; রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশের ন্যায়; জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের বাক্য কোথা হইতে আসিল? দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য আরও ত জাতি পৃথিবীতে অনেক আছে। কোন্ দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য জাতি কথিতরূপ অবিনশ্বর কীর্ত্তি জগতে স্থাপন করিয়াছে? বোধ হয় না কি যে, বাঙ্গালার ইতিহাসে কিছু সারকথা আছে?"

বাঙ্গালার ইতিহাসে সার কথার অভাব নাই। বাহুবলে ও মানসিক ক্ষমতায় বাঙ্গালী এক সময় জয়ী হইয়াছিল। যবদ্বীপে ও বালিদ্বীপে বাঙ্গালীর উপনিবেশ-সংস্থাপনের কথা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। যবদ্বীপে প্রচলিত হিন্দু অব্দ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে আরব্ধ; কাযেই তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী যবদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিল। কালিদাসের গ্রন্থে দেখা যায়,—বাঙ্গালীর কাপুরুষ অখ্যাতি ছিল না; কালিদাস নদীবহুল বঙ্গদেশে দিগ্বিজয়ী রঘুর সেনাদিগের সহিত জলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বাঙ্গালী সিংহল জয় করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকরূপে বাঙ্গালী প্রচারকগণ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে শিল্প ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিল। শিল্প বাণিজ্য ব্যাপারে সে দিনও বাঙ্গালী

নিপুণ ছিল। গৌড়ের চিত্রিত ইষ্টক আজও অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। ইংরাজাধিকারের প্রথম অবস্থায় গৌড়ের গৃহাদি ভাঙ্গিয়া এই চিত্রিত ইষ্টক ও প্রস্তর লইবার জন্য দুই জন স্থানীয় জমীদার নিজামত দপ্তরে বার্ষিক ৮,০০০৲ টাকা খাজনা দিতেন। ঢাকার কার্পাসবস্ত্র য়ুরোপের রাজন্যবর্গের অঙ্গাবরণ হইত। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে শেখ ভিক পারস্য উপসাগরের পথে রুসিয়ায় তিন জাহাজ মালদহের কাপড় পাঠাইয়াছিলেন। কান্তনগরের মন্দিরের কারুকার্য্য ও রচনানৈপুণ্য বিস্ময়কর। বার্ণিয়ার প্রভৃতি লেখকের বর্ণনায় দেখা যায়,—বঙ্গদেশে ধান্য ও অন্য বহুবিধ শস্য—রেশম, কার্পাস, নীল প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। বাঙ্গালায় যে ধান্য উৎপন্ন হইত, তাহার উদ্বৃত্ত অংশ নৌকাযোগে গঙ্গাতীরে পাটনা পর্য্যন্ত ও সাগরকূলে মছলীপট্টমে রপ্তানী হইত। এমন কি, সিংহলে ও মালদ্বীপেও বাঙ্গালা হইতে চাউল যাইত। বাঙ্গালা হইতে কর্ণাটে, মোকা ও বসোরার পথে আরবে, মেসোপোটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্যে চিনি যাইত। রেশম ও কার্পাসরচিত বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। এই সকল দ্রব্য কাবুলে, জাপানে ও য়ুরোপে প্রেরিত হইত। জলপথবহুল বঙ্গে নানা প্রয়োজনানুরূপ নানাবিধ নৌকা নির্ম্মিত হইত। ঢাকা হইতে প্রতি বৎসর দিল্লীতে নৌকা পাঠাইতে হইত। বাঙ্গালা সাহিত্যও প্রাচীন ও পরিপুষ্ট। বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে বৈষ্ণবধর্ম্ম পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় বঙ্গদেশে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বাঙ্গালীর ও অন্যান্য জাতির ইতিহাসে স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালীর ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস—কীর্ত্তির কাহিনী। সে ইতিহাস শিখিলে বাঙ্গালী আপনার পূর্ব্বগৌরবের কথা জানিতে পারিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেশী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্ ও ওয়াটার্লু—ইতালী অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়, —হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙ্গালীর ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ববৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে,

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখন গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা-প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।”

যখন বাঙ্গালী বিদেশীর লিখিত স্বজাতির হীনতার কহিনীই ইতিহাস বলিয়া পাঠ করিত, তখন বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বলিলেন,—সে সকল গ্রন্থ “আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি,—সে কেবল সাধপূরণমাত্র।” এ কথা বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে আর কেহ বলেন নাই। বিজ্ঞবর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কীর্ত্তি তখন সমুজ্জ্বল হইয়াছে; কিন্তু তিনিও তাঁহার দেশবাসীদিগকে এমন করিয়া ডাকিয়া বলেন নাই—বাঙ্গালার ইতিহাস আবশ্যক। বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস না হইলে হইবে না। সে ইতিহাসের আলোচনা করিলে বাঙ্গালী আপনার গৌরবকাহিনী জানিতে পারিবে, আপনার উন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হইবে না, আপনার হৃতসম্পদ পুনরায় অর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। বাঙ্গালীর জড়ত্বশাপাভিশপ্ত জাতীয় জীবনের ইতিহাসহীন তমিস্রায় বঙ্কিমচন্দ্রের তূর্য্যনিনাদে প্রথমে এই কথা ঘোষিত হইল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন আপনার শিক্ষাতীক্ষ্ণ প্রতিভা লইয়া বঙ্গভাষার সেবায়—বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসংসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা ভাষাকে ও বাঙ্গালা সাহিত্যকে নিতান্ত অসার বলিয়াই বিবেচনা করিত। বঙ্কিমচন্দ্র সেই বাঙ্গালা ভাষার—সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করি-লেন। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধারণা তিনি “বাঙ্গালা সাহিত্যের আদরে” চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন,—“কি জান—বাঙ্গলা ফাঙ্গলা ও সব ছোটলোকে পড়ে, ও সবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই। ও সব কি আমাদের শোভা পায়?” বঙ্কিমচন্দ্র সেই ধারণা ঘুচাইয়া বাঙ্গালীকে আপনার মাতৃভাষায় অনুরাগী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে গর্ব্বিত করিয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হইলেন! কাযেই তাঁহাকে সাহিত্যের সকল বিভাগের দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইল। বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল। তিনি বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীদের জন্য সে পথও মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কেবল আগ্রহ জানাইয়া—কেবল উৎসাহিত করিয়াই তিনি নিরস্ত হয়েন নাই; পরন্ত কিরূপে অত্যুক্তির ফেন-পুঞ্জের নিম্নে প্রকৃত ঘটনার স্বচ্ছপ্রবাহ

আবিষ্কার করিতে হয়, কিরূপে সত্যাসত্যের মধ্য হইতে সত্য বাছিয়া বাহির করিতে হয়, কিরূপে বিশ্লেষণ ও সংগঠনের সহায়তায় ইতিহাসের উদ্ধার করিতে হয়—তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। যখন "বঙ্গদর্শন" প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে "মঙ্গলাচরণ স্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল।" "প্রচারে"র প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। প্রারম্ভে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালার সেই কলঙ্ক। এ কলঙ্ক আরও গাঢ়। এখানে আরও দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কদাচিৎ অন্যান্য ভারতবাসীর বাহুবলের প্রশংসা শুনা যায়, কিন্তু বাঙ্গালীর বাহুবলের প্রশংসা কেহ কখন শুনে নাই। সকলেরই বিশ্বাস, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, চিরকাল স্ত্রীস্বভাব, চিরকাল ঘুসি দেখিলেই পলাইয়া যায়। মেকলে বাঙ্গালীর চরিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, এরূপ জাতীয় নিন্দা কখন কোন লেখক কোন জাতি সম্বন্ধে কলমবন্দ করে নাই। ভিন্নদেশীয়-মাত্রেরই বিশ্বাস যে, সে সকল কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভিন্ন-জাতীয়ের কথা দূরে থাকুক, অধিকাংশ বাঙ্গালীরও এইরূপ বিশ্বাস। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে, কথাটি কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এমন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, চির-কাল দুর্ব্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক। এ নিন্দার কোন মূল ইতিহাসে কোথাও পাই না। * * * * বাঙ্গালীর চিরদুর্ব্বলতা ও চিরভীরুতার আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্ব্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"

"বঙ্গদর্শনে" ও "প্রচারে" বঙ্কিমচন্দ্র কয়টি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিয়া ঐতিহাসিক রচনায় রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়াছিলেন। "বিবিধ প্রবন্ধে" সেই-গুলি পুনর্মুদ্রিত করিবার সময় তিনি লিখিয়াছিলেন,—"বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল; তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময় ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং

অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য 'বঙ্গদর্শনে' বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। 'বঙ্গদর্শনে'র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য-সৃষ্টির চেষ্টায় সচরাচর আমি এই প্রথা অবলম্বন করিতাম। যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দরবেশী হউক, বা না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালীতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন,—সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। কিন্তু কৈ,—আমি ত কুলিমজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোন সেনাপতির আগমনবার্ত্তা ত শুনিলাম না!" এরূপ প্রগাঢ় বিনয় ও গভীর আক্ষেপ বঙ্গসাহিত্যে বিরল।

বঙ্কিমচন্দ্র এক স্থানে বলিয়াছেন,—"কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না।" বাঙ্গালা-সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় নাই। তাঁহার উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস ব্যতীত বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না—এ কথা বুঝিয়া বাঙ্গালী আপনার ইতিহাস-উদ্ধারের চেষ্টায় চেষ্টিত হইয়াছে।

একান্ত পরিতাপের বিষয়,—বাঙ্গালায় ইতিহাস-চর্চ্চার দুর্ব্বল প্রারম্ভ মৃত-মহাত্মাদিগের—বিশেষতঃ পথপ্রদর্শক বঙ্কিমচন্দ্রের নিন্দাবাদে কলঙ্কিত হইয়াছে। নদীর স্রোত যদি কোন বাধাহেতু বহুদিন বদ্ধগতি হইয়া থাকে, তবে সে যে দিন বাধা অতিক্রম করিয়া বাহির হয়, সে দিন প্রমত্ত-বেগে দিগ্বিদিকজ্ঞানহারা হইয়াই প্রবাহিত হয়। আশা করি, বাঙ্গালার রুদ্ধ-গতি ইতিহাস-রচনার চেষ্টার সম্বন্ধেও সেই কথা বলিতে পারিব। সে অবস্থায় স্রোতের আবিলতা, বেগের আধিক্য ও বীচিবিভঙ্গের চঞ্চলতা অতিরিক্ত অধিক হওয়া বিস্ময়কর নহে। কারণ, সেই আধিক্যের মধ্যে ভবিষ্যৎ

স্থায়িত্বের সম্ভাবনা থাকে। নহিলে বাঙ্গালার নূতন ইতিহাস-আলোচনার প্রারম্ভ মৃত মহাজনদিগের প্রতি অসম্মানের যে প্রগাঢ় কলঙ্ককালিমায় কলুষিত, তাহা একান্তই অসহনীয় ব্যথার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আশা করি, যখন বাঙ্গালার ইতিহাস-আলোচনার স্রোত আপনার প্রকৃত পথ নির্ণয় করিয়া সেই পথে প্রবাহিত হইবে, তখন আরম্ভের এ চাঞ্চল্য—এ আতিশয্য থাকিবে না; তখন সে প্রবাহ সর্ব্ববিধ আবিলতাশূন্য ও আবর্জ্জনামুক্ত ও ক্ষুদ্র দ্বেষ-হিংসাবার্জ্জিত হইয়া প্রবাহিত হইবে;—বাঙ্গালীর উপকারমাত্র সাধন করিবে।

চন্দ্রোদয়।

ডুবিল ধরণী ধীরে সুগভীর আঁধার অতলে,
মিশাইল বিশ্বপটে বর্ণে বর্ণে চারু চিত্ররেখা!
পড়ে' আছি পৃথিবীর সুকোমল শ্যাম দুর্ব্বাদলে,
অলস শিথিল তনু, শূন্যমনে গৃহহীন একা।
অকস্মাৎ রাশি রাশি অন্ধকার ছিন্ন দীর্ণ করি'
কি আলো উঠিল হাসি!—মরি মরি, এ কি চন্দ্রোদয়!
প্রলয়-পয়োধি হ'তে ধরণীরে তুলিলেন হরি,
জল স্থল উদ্ভাষিত কি লাবণ্যে,—কি মহিমাময়!
জীবন-সন্ধ্যায় হায়! যবে মোর নয়ন অন্তর
আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করি' দেখা দিবে মৃত্যু-অন্ধকার,
সে আঁধারে এমনি উঠিও ফুটি,' হে মোর সুন্দর!
সকল বেদনা-বন্ধ হ'তে মোরে নাথ, করিও উদ্ধার!
শশীর কিরণ-কোলে হাসে মহী;—তুমিও অমনি,
আমারে লইও কোলে,—দিও প্রিয় চরণ-তরণী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা]

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুরের বাগানে উপরের সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরে বসিয়া আছেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে শ্রীযুক্ত রাম চাটুয্যে তাঁহার কুশলসংবাদ লইতে আসিয়াছিলেন। মণির সহিত সেই সকল কথা কহিতেছেন। বলিলেন, ওখানে (দক্ষিণেশ্বরের) কি এখন এত ঠাণ্ডা ?

আজ ২১ শে পৌষ, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ। অপরাহ্ণ বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র আসিয়া বসিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে মাঝে মাঝে দেখিতেছেন ও তাঁহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিতেছেন,—যেন তাঁহার স্নেহ উথলিয়া পড়িতেছে। মণিকে সঙ্কেতে বলিতেছেন,—কেঁদেছিল।

ঠাকুর কিঞ্চিৎ চুপ করিলেন। আবার মণিকে সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন,—"কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী থেকে এসেছিল।"

সকলে চুপ করিয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কহিতেছেন,—

নরেন্দ্র। ওখানে আজ যাবো মনে করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কোথায় ?

নরেন্দ্র। দক্ষিণেশ্বরে—বেলতলায় ওখানে রাত্রে ধুনি জ্বালাবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ। না, ওরা (ম্যাগাজিনের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা) দেবে না। পঞ্চবটী বেশ জায়গা, অনেক সাধু ধ্যান জপ ক'রেছে। কিন্তু বড় শীত, আর অন্ধকার।

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। (নরেন্দ্রের প্রতি)—পড়্‌বি না ?

নরেন্দ্র। (ঠাকুর ও মণির দিকে চাহিয়া *) একটা ঔষধ পেলে বাঁচি, যাতে পড়াটড়া যা হয়েচে, সব ভুলে যাই।

শ্রীযুক্ত বুড়ো গোপালও বসিয়া আছেন। তিনি বলিলেন,—আমিও ঐ

---

* শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র তখন বি এল. পরীক্ষা দিবার জন্য আইন পড়িতেছিলেন।

সঙ্গে যাব। শ্রীযুক্ত কালীপদ ঘোষ ঠাকুরের জন্য আঙ্গুর অনিয়াছিলেন। আঙ্গুরের বাক্স ঠাকুরের পার্শ্বে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ করিতেছেন। প্রথমেই নরেন্দ্রকে দিলেন।—তাহার পর হরির লুটের মত ছড়াইয়া দিলেন, ভক্তরা যে যেমনে পাইলেন, কুড়াইয়া লইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

[শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য।]

সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নীচে বসিয়া আছেন। তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মণির কাছে নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছে, গল্প করিতেছেন।

নরেন্দ্র (মণির প্রতি)। গত শনিবারে, এখানে ধ্যান কচ্ছিলাম। হঠাৎ বুকের ভিতর কি রকম ক'রে এলো।

মণি। কুণ্ডলনী-জাগরণ।

নরেন্দ্র। তাই হবে; বেশ বোধ হ'লো ইড়া, পিঙ্গলা। হাজরাকে বল্লাম বুকে হাত দিয়ে দেখ্‌তে।

"কাল রবিবার, এঁর সঙ্গে উপরে গিয়ে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বল্লাম।

"আমি বল্লাম সব্বার হ'লো, আমায় কিছু দিন। সব্বাএর হলো, আমার হবে না?

মণি। তিনি তোমায় কি বল্লেন?

নরেন্দ্র। তিনি বল্লেন,—'তুই বাড়ীর একটা ঠিক্‌ করে আয় না,—সব হ'বে। তুই কি চাস্‌?'

"আমি বল্লাম,—'আমার ইচ্ছা, অম্‌নি তিন চার দিন সমাধিস্থ হ'য়ে থাক্‌বো! কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্‌বো!'

মণি। তিনি কি বল্লেন?

নরেন্দ্র। তিনি বল্লেন,—তুই ত' বড় হীনবুদ্ধি! ও অবস্থার উঁচু অবস্থা আছে। তুই ত' গান গাস্‌,

"যো কুচ্‌ হ্যায় সো—তুঁহি হ্যায়।"

মণি। হাঁ, উনি সর্ব্বদাই বলেন যে, সমাধি থেকে নেমে এসে দ্যাখে, তিনি জীব জগৎ এই সমস্ত হ'য়েছেন। ঈশ্বর কোটির এই অবস্থা হ'তে পারে। উনি বলেন, জীন কোটি সমাধি অবস্থা যদিও লাভ করে, আর নামতে পারে না। তার পর কি হ'লো?

নরেন্দ্র। উনি বল্লেন,—তু'ই বাড়ীর একটা ঠিক্ ক'রে আয়, সমাধি-লাভের অবস্থার চেয়েও উঁচু অবস্থা হ'তে পারবে।

আজ সকালে বাড়ী গেলাম। বাড়ীর সকলে বকৃতে লাগলো আর বল্লে, 'কি হো হো ক'রে বেড়াচ্চিস্? আইন একজামিন্ এত নিকটে, আর পড়া নাই শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্চ।'

মণি। তোমার মা কিছু বল্লেন?

নরেন্দ্র। না; তিনি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত। হরিণের মাংস ছিল, খেলুম; কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না।

মণি। তার পর?

নরেন্দ্র। দিদিমার বাড়ীতে, সেই পড়্‌বার ঘরে পড়্‌তে গেলাম্। পড়তে গিয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এ'লো;—পড়াটা যেন কি ভয়ের জিনিস। বুক আটু পাটু ক'রতে লাগল! অমন কান্না কখন কাঁদি নাই।

মণি। তার পর?

নরেন্দ্র। তার পর বই টই ফেলে দৌড়! রাস্তা দিয়ে ছুট। জুতো টুতো রাস্তার কোথায় এক দিকে পড়ে রইল। খড়ের গাদার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গায়ে মায়ে খড়, আমি দৌড়ুচ্ছি, কাশীপুরের রাস্তায়।

নরেন্দ্র একটু চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র। বিবেকচূড়ামণি শুনে আরও মন খারাপ হ'য়েছে। শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, এই তিনটি জিনিস অনেক তপস্যায় অনেক ভাগ্যে মেলে,—

মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ।

"ভাবলাম, আমার ত তিনটিই হয়েচে। অনেক তপস্যার ফলে মানুষ-জন্ম হয়েছে; অনেক তপস্যার ফলে মুক্তির ইচ্ছা হয়েছে; আর অনেক তপস্যার ফলে এরূপ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ হয়েছে।

মণি। আহা, চমৎকার কথা!

"সংসার আর ভাল লাগে না; সংসারে যারা আছে, তাদেরো ভাল লাগে না। দুই এক জন ভক্ত ছাড়া।

নরেন্দ্র ও মণি আবার চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তীব্র বৈরাগ্য। এখনও প্রাণ আটু পাটু করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কহিতেছেন। নরেন্দ্র (মণির প্রতি)। আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ অস্থির হ'চ্ছে! আপনারাই ধন্য।

মণি কিছু উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঈশ্বরের জন্য এইরূপ ব্যাকুল হ'তে হয়, তবেই ঈশ্বর-দর্শন হয়।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরেই মণি উপরের ঘরে গেলেন। দেখিলেন, ঠাকুর নিদ্রিত।

রাত্রি প্রায় ৯টা হয় হয়। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী আছেন। ঠাকুর জাগিয়াছেন। থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্রের কথাই বলিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রের অবস্থা কি আশ্চর্য্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে সাকার মান্‌তো না। এর প্রাণ কিরূপ আটু পাটু হয়েছে, দেখছিস। সেই যে আছে,—এক জন জিজ্ঞাসা করেছিলো, ঈশ্বরকে কেমন ক'রে পাওয়া যায়? গুরু বল্লেন যে, এসো আমার সঙ্গে, তোমায় দেখিয়ে দিই, কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এই ব'লে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধর্‌লে। খানিকক্ষণ পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর শিষ্যকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তোমার প্রাণটা কি রকম হচ্ছিলো? সে বল্লে, প্রাণ যায় যায় হচ্ছিলো।

"ঈশ্বরের জন্য প্রাণ অটু পাটু ক'রলে জান্‌বে যে তাঁর দর্শনের আর দেরী নাই,—যেমন অরুণ উদয় হ'লো, পূর্ব্ব দিক লাল হ'লো,—বুঝা যায় যে এইবার সূর্য্য উঠ্‌বে।

ঠাকুরের আজ অসুখ বাড়িয়াছে। শরীরের এত কষ্ট! তবুও নরেন্দ্র সম্বন্ধে এই সকল কথা সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন।

নরেন্দ্র এই রাত্রেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া গিয়াছেন। গভীর অন্ধকার, অমাবস্যা পড়িয়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু' একটি ভক্ত।

মণি রাত্রে বাগানেই আছেন। স্বপ্নে দেখিতেছেন, সন্ন্যাসিমণ্ডলের ভিতর বসিয়া আছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের তীব্র বৈরাগ্য।]

আজ মঙ্গলবার, ৫ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। বেলা ৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বসিয়া আছেন, মণির সহিত নিভৃতে কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগরে যায়; তা হ'লে তুমি কম্বল একখানা কিনে দিও।

মণি। যে আজ্ঞা।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—আচ্ছা, ছোকরাদের এ কি হচ্চে বল' দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্চে, কেউ গঙ্গাসাগরে; "সব বাড়ী ত্যাগ করে' করে' আসছে। দেখ না, নরেন্দ্রের। তীব্র বৈরাগ্য হ'লে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কাল সাপ বোধ হয়।

মণি। আজ্ঞা, সংসার ভারি যন্ত্রণা।

শ্রীরামকৃষ্ণ। নরক-যন্ত্রণা!—জন্ম থেকে। দেখছ না—মাগ ছেলে নিয়ে কি যন্ত্রণা!

মণি। আজ্ঞে হাঁ। আর আপনি বলেছিলেন—ওদের (যারা সংসারে ঢুকে নাই, তাহাদের) লেনা দেনা নাই; লেনা দেনার জন্য আটকে থাকৃতে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ। দেখছ না,—নিরঞ্জনকে "তোর এই নে, আমার এই দে"—বাস্, আর কোন সম্পর্ক নাই। পেছু টান নাই।

"কামিনী কাঞ্চনই সংসার। দেখ না, টাকা থাকৃলেই বাঁচতে ইচ্ছা ক'রে।

মণি হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরও হাসিলেন।

মণি। টাকা বার করৃতে অনেক হিসাব আসে। তবে দক্ষিণেশ্বরে যা ব'লেছিলেন—যদি কেউ ত্রিগুণাতীত হ'য়ে থাকৃতে পারে, তা হ'লে এক হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বালকের মত।

মণি। আজ্ঞা; কিন্তু বড় কঠিন, বড় শক্তি চাই।

ঠাকুর একটু চুপ করিয়া আছেন।

মণি। কাল রাত্রে ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আমি স্বপ্নে দেখলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কি দেখ্লে?

মণি। দেখলাম, যেন নরেন্দ্র প্রভৃতি সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, ধুনি জ্বেলে ব'সে আছেন। আমিও তার মধ্যে ব'সে আছি, ওরা তামাক খেয়ে ধোঁয়া মুখ দে' বার ক'চ্চে—আমি বল্লাম, গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণ। মনে ত্যাগ হ'লেই হোলো; তা হ'লেই সন্ন্যাসী।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে হয়, তবে ত!

মণি। বড়বাজারে মাড়োয়ারীদিগের পণ্ডিতজীকে আপনি বলেছিলেন, ভক্তিকামনা আমার আছে।

"ভক্তিকামনা বুঝি কামনার মধ্যে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যেমন হিঞ্চে-শাক শাকের মধ্যে নয়।

মণি। আজ্ঞা হাঁ, অন্য শাক খেলে অসুখ হ'তে পারে, হিঞ্চে শাকে পিত্ত দমন হয়।

[ঠাকুরের পীড়া ও বালকের অবস্থা।]

শ্রীরামকৃষ্ণ। (মণির প্রতি) আচ্ছা, এত আনন্দ, ভয়,—এ সব কোথায় গেল?

মণি। বোধ হয়, গীতায় যে ত্রিগুণাতীতের কথা আছে, সেই অবস্থা হ'য়েছে। সত্ব রজঃ তমো গুণ নিজে নিজে কায করেছে, আপনি স্বয়ং নির্লিপ্ত;—সত্বগুণেতেও নির্লিপ্ত।

শ্রীরামকৃষ্ণ। হাঁ, বালকের ন্যায় রেখেছে।

"আচ্ছা, দেহ কি এবার থাকবে না?

ঠাকুর ও মণি চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচে হইতে আসিলেন। নরেন্দ্র একবার কলিকাতার বাড়ীতে যাইবেন। বাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া আসিবেন। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা অতিকষ্টে আছেন,—মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট হইতেছে। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা। তিনি যোগাড় করিয়া তাঁহাদের খাওয়াইতেছেন। কিন্তু নরেন্দ্রের আইন পরীক্ষা দেওয়া হইল না। এখন তীব্র বৈরাগ্য। তাই আজ বাড়ীর কিছু বন্দোবস্ত করিতে যাইতেছেন। এক জন বন্ধু তাঁহাকে এক শ' টাকা ধার দিবেন বলিয়াছেন। সেই টাকায় বাড়ীর তিন মাসের খাওয়ায় যোগাড় করিয়া দিয়া আসিবেন।

নরেন্দ্র। যাই বাড়ী একবার। (মণির প্রতি) মহিম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ী হ'য়ে যাচ্চি, আপনি যাবেন?

মণির যাবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কেন?

নরেন্দ্র। এই রাস্তা দিয়ে যাচ্চি; তাঁর সঙ্গে বসে' একটু গল্প টল্প ক'রবো।

ঠাকুর একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেছেন।

নরেন্দ্র। এখানকার এক জন বন্ধু বলেছেন, আমায় এক শ' টাকা ধার দিবেন। সেই টাকাতে বাড়ীর তিন মাসের বন্দোবস্ত করে আসবো।

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন।

মণি (নরেন্দ্রের প্রতি)। না, তোমরা এগোও; আমি পরে যাব।

সুরধুনী।

[একটি গঙ্গাসমা নিরুপমা কন্যাকে দেখিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল। কন্যাটির নামও সুরধুনী।]

মাতঃ সুরধুনী! তুই মা, তুই মা
অপূর্ব্ব প্রতিমা! ও রূপের সীমা
নাই মা, নাই মা! গঙ্গাদেবী সমা,
পবিত্র, নির্ম্মল, তুই নিরুপমা!
কি শোভা, কি আভা উথলি' পড়িছে!
জাহ্নবীর জলে আসিয়া মিশেছে
যেন ঢল ঢল-জ্যোৎস্না তরল!
গঙ্গাজল সম শ্রীঅঙ্গ বিমল,
গঙ্গাজল সম শুভ্র ও শীতল
হাসি-রাশি তোর! লীলাময় অঙ্গে,
চঞ্চল চপল তরল তরঙ্গে,
কোন্ শৈল হ'তে আসিয়াছ গঙ্গে?
পরেছিস্ মা গো! সুন্দর দুকূল,
তাহে আছে কাটা নানাবর্ণ ফুল,
তাহে শোভে মরি বিচিত্র কিনারা,
ব'হে যায় যেন জাহ্নবীর ধারা।
নানা বরণের বিচিত্র বিহঙ্গে
রাজহংসদলে নাচায় তরঙ্গে।

শত শুভ্র চিন্তা ও বদনে ভাসে,
মাতা ভাগীরথী যেন রে উল্লাসে
ধরেছেন বক্ষে অযুত তারকা।
প্রীতি-ভরা দেহ স্নেহে যেন মাখা।
মাতঃ সুরধুনী! ইন্দুমুখে ঝরে
বচন অমিয়; কুল কুল স্বরে
গাইছেন যেন দেবী মন্দাকিনী,
আনন্দে মগনা সাগর-গামিনী!
বীণাস্বর সম আলাপ মধুর,
মূর্ত্তিমান রাগ, মূর্ত্তিমতী সুর,
কভু অতি মৃদু শিশিরপতন,
কভু ধীর উচ্চ নীরদ-বর্ষণ;
পড়িছেন গঙ্গা আনন্দের ধারে,
হর-শিরে যেন ললিত ঝঙ্কারে!
পবিত্র উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যের জলে
আত্মা-বধূ মোর অতি কুতূহলে
স্নান করি' আজি, মুদিয়া নয়ন,
মহাধ্যানে হের হইল মগন!
ঘুচেছে ঘুচেছে বিলাস-কামনা,
ঘুচেছে ঘুচেছে বিশ্বের ভাবনা;
গঙ্গাজলস্পর্শে এই কর্ম্মনাশা
আত্মা-নদী মোর, লো কলুষনাশা!
হ'য়ে গেল গঙ্গা! জয় সুরধুনী!
জয় জয় জয় বিশ্বের জননী!
এ অনিত্য রূপে, ছলনা করিয়া,
নিত্য রূপ তোর দেখালি হাসিয়া!
মকরবাহিনী! খুলিয়া গুণ্ঠন,
সন্তানে দেখালি করিয়া যতন,
স্নেহে ঢল-ঢল চারু মুখখানি!
মায়ের আমার ঐ দুটি পাণি,

গঠিত আ মরি ধবল মৃণালে!
কুমুদে কহ্লারে জলপুষ্পজালে
গ্রথিত আ মরি মায়ের কুন্তল;
হস্তে শোভে এক ফুল্ল শত দল!
হংস-কলরব ছলেতে কেমন;
হইছে চরণে নূপুর-বাদন;
ললিত-ভ্রূভঙ্গি, লীলাময়-অঙ্গা,
চঞ্চল-চপল-তরল-তরঙ্গা,
তর-তর-শব্দে চলিয়াছে গঙ্গা;
বিষ্ণুপদ হ'তে আসিয়াছে নামি',
ভেটিবারে পুনঃ নিখিলের স্বামী;
পড়িছে আনন্দে অনন্ত সাগরে;
লীলাময়ী! তোর বদনে অন্তরে
কি উচ্ছ্বাস মরি! শত গিরি ঠেলি,
আছাড়ি' তাদের বহু দূরে ফেলি',
মুক্তিময়ী, তোর এ কি নৃত্যকেলি!

অয়ি শিক্ষাদাত্রী, গো গুরুরূপিণী!
এই লীলা মোরে শিখাও জননী!
কোথা সে, কোথা সে আনন্দের হ্রদ,
বিষ্ণুর চরণ, মহা মোক্ষপদ!
সে জলে মিশাতে লীলাময় অঙ্গে,
চঞ্চল-চপল-তরল তরঙ্গে
আমারও সাধ হইয়াছে গঙ্গে!
শত বিঘ্ন বাধা, শত গিরি ঠেলি',
আছাড়ি' তাদের বহু দূরে ফেলি',
উদ্দাম উচ্ছ্বাস বদনে অন্তরে,
পড়িব আনন্দে অনন্ত সাগরে!

* * * *

যারে সবে হায় ক'রে থাকে ঘৃণা,
পিতা মাতা ভাই পুত্র ও অঙ্গনা,
সেই সব দেহে ক্রোড়ে ধর তুমি
মাতঃ সুরধুনী! তব বেলাভূমি
চিতানল-ছলে মহা হোমানল—
সর্ব্ব-দুখ-হরা, পবিত্র, উজ্জ্বল;
আমিও জননী শবদেহ পারা,
হেয় আর ঘৃণ্য, অয়ি হরদারা,
ক্রোড়ে ধর এই অধম সন্তানে;
সুশীতল তোর উর্ম্মি-উপাধানে
রাখি' মাথা যেন অন্তিমে জুড়াই!
অয়ি স্নেহময়ী! পুত্রের বালাই
লও লও হরি'; লো হর-বাসনা,
শেষদিনে যেন, বলি মা মা মা মা,—
ডুবে যাই আহা আনন্দের হ্রদে!
অসীম সাগরে, মহা-বিষ্ণুপদে!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

সাহিত্য-সেবকের ডায়েরী।

—:*:—

৫ই পৌষ।—আজ পঙ্কুকে অপেক্ষাকৃত একটু প্রফুল্ল দেখিলাম। আমি যখন গৃহে প্রবেশ করি, তখন শিশুটি তক্তপোষের উপর বসিয়া খেলা করিতেছিল; আমাকে দেখিয়া কোলে উঠিবার নিমিত্ত হাত বাড়াইয়া দিল। আমি তাহাকে লইয়া একটু বাহিরে বেড়াইলাম। শিশুটি ক্রমশঃ অনেক কথা শিখিতেছে। তাহাকে আজ অপর দিবসের অপেক্ষা হৃষ্ট ও সুস্থ দেখিয়া আমার মনের নিরানন্দ অনেকাংশে কমিয়া গেল।

এ দেশীয় প্রবাসী সাহেবদিগের অনেকেরই কথায় এবং কার্য্যে বিলক্ষণ বৈসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সম্প্রতি ইহার একটা বিশেষ দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর হইল, যুবকদিগের উচ্চনীতি-শিক্ষা-বিধানার্থ কলিকাতা সহরে রাজপুরুষদিগের সাহায্যে একটা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভায় এতদ্দেশীয় অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তিও যোগদান করিয়াছেন। সভ্য মহোদয়েরা মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন করিয়া যুবকদিগের চরিত্র গঠিত করিয়া থাকেন। এই সভার বর্ত্তমান সেক্রেটারী উইলসন সাহেব প্রেসিডেন্সী কালেজের এক জন প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রফেসার। বিগত ৮ই ডিসেম্বর এই সভার এক অধিবেশন হয়। সভাস্থলে নিমন্ত্রিত হইয়া আমাদের বন্ধু, ফ্রিচর্চ্চ-কলেজের অন্যতম অধ্যাপক বাবু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যথাসময়ে উপস্থিত হন, এবং সম্মুখস্থ একখানি নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করেন। সম্মুখের আসন-গুলি নাকি মহিলাদিগের নিমিত্তই বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। যাহা হউক, জ্ঞানবাবু বসিলে পর সেক্রেটারী মহাশয় তাঁহাকে উঠিয়া যাইতে বলেন। তখন কোনও স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন না, এই বলিয়া আপত্তি করাতে সাহেব ক্রোধে একেবারে অন্ধ হইয়া তাঁহার ঘাড়ে পড়িয়া সজোরে এমন এক ধাক্কা দিলেন যে, বাবু চেয়ার-বিচ্যুত হইয়া হঠাৎ পপাত ধরণীতলে। বাবুজী চলিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু হাইকোর্টের বিচার-পতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন নিরীহ ভদ্রলোকের অনুরোধে কিলটা পকেটস্থ করিয়া সেদিনকার বৈজ্ঞানিক বক্তৃতার সাহায্যে আপনার চরিত্রটার সদ্গতির উপায় করিতে বাধ্য হইলেন। জ্ঞান বাবুর যেরূপ জ্ঞান-লাভ হইল, তাহাতে সে সভায় বোধ হয় দ্বিতীয়বার যাইবার প্রয়োজন হইবে না। আমরা সাহেব মহোদয়ের কার্য্যে কিছুমাত্র দুঃখিত বা বিস্মিত নহি। তাঁহার জাতীয় জন্তুদিগের স্বভাবই এইরূপ। জ্ঞান বাবুর জন্যও কাতর নহি, তিনি ত তবু সজ্ঞানে ঘরে ফিরিতে পারিয়াছিলেন, দেশীয় অনেক হতভাগ্যের কপালে সে সৌভাগ্যও ঘটে না। অনেকেরই প্লীহা ফাটিয়া জ্ঞানলোপ হইয়া যায়। আমার দুঃখের প্রধান কারণ, সভাস্থ বাঙ্গালী মহোদয়দিগের ব্যবহার। বাঙ্গালী বড় পদ লাভ করিলেও যে সেই আত্মসম্মানবোধবিহীন, জাতীয়তাবিবর্জ্জিত বাঙ্গালী বাবুই থাকেন, ইহা বিস্ময়কর না হইলেও, গভীর মর্ম্মপীড়ার কারণ, সন্দেহ নাই। যাঁহারা স্বজাতীয় কোনও ভ্রাতার অপমানে আপনাদিগকেও অবমানিত মনে না করেন, হীনতার অবতার সাজিয়া "Forgive and Forget" এই নীতি-বাক্যে কাপুরুষতার একশেষ প্রদর্শন করেন, তাঁহাদিগকে দেশের লোক

দেশের বড়লোক বলিয়া সম্মান করিতে কুণ্ঠিত নহে, ইহাও সাধারণ মনস্তাপের বিষয় নহে। নেশন-সম্পাদক যথার্থই বলিয়াছেন, বাঙ্গালীর ঘরে স্পার্টান মহিলাদিগের ন্যায় মা থাকিলে কোনও মায়ের ছেলে সে দিন ঘরে প্রবেশ করিতে পারিত না।

৬ই পৌষ।—শিক্ষকতার কার্য্য প্রাচীন কালে কত গৌরব ও সম্মানের বিষয় ছিল। অধুনা কালের পরিবর্ত্তনে কত দূর হীন হইয়া পড়িয়াছে! প্রাচীন কালে গুরু শিষ্যের যে পবিত্র সম্পর্ক ছিল, এখন তাহার অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনকার শিক্ষকদিগকে অনেক সময়েই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়; শুধু তাহাই নহে; আধ্যাত্মিক-রূক্ষতা-সঞ্চারী ইংরাজী বিদ্যার কল্যাণে ছাত্রদিগের মেজাজটা এরূপ কড়া হইয়া উঠে যে, শিক্ষক বা মাষ্টার মহাশয়দিগের শরীরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলা বজায় রাখাও দায় হইয়া পড়ে। কিছু দিন হইল, সংবাদপত্রসমূহে কোনও নিরীহ মাষ্টার মহাশয়ের সুশীল ছাত্র কর্ত্তৃক তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়-কর্ত্তনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়াছি। কিন্তু সে পরের কথায় কাজ নাই। সম্প্রতি এইরূপ একটা বিপদের আশঙ্কা নিতান্ত ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। আমার ন্যায় এই অধম শিক্ষকেরও একটি অতি শান্ত, সহিষ্ণু ও সুবোধ ছাত্র জুটিয়াছে। শ্রীমানের উন্মাদ লক্ষণটা ইংরাজী-বিদ্যা-সঞ্জাত কি না, ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, কার্য্যের ফলটা বড় শুভকর নহে। অধম শিক্ষকের অপরাধ, শ্রীমান নিতান্ত অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাকে প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থ প্রেরণ করিতে পারে নাই! এই অপরাধে অধমের প্রাণটা লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে। শ্রীমান ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূজনীয় মাষ্টার মহাশয়কে assassinate করিবেন! মাষ্টার বেচারী কি করে, প্রাণের দায়ে কনেষ্টবল-পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছে। প্রাণটা হারাইয়া উপরিলাভ না করিতে হয়!—হায় মা ভারতী! তোমার উপাসনা করিয়া এই মাষ্টার-রূপী নিরীহ ভদ্রসন্তান জগতের অনন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আর কি কোনও কর্ম্মেরই যোগ্য হইতে পারিল না? তাই তাহাকে এই গোচারণে জুড়িয়া দিয়াছ!

৮ই পৌষ।—প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রেরণোপযোগী ছাত্রদিগের দরখাস্ত ও টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, এবং খৃষ্টের জন্মোপলক্ষে কয়েক দিবস গোয়াল বন্ধ করিয়া কলিকাতার স্থায়ী আশ্রমে আসিয়া উপনীত

হইয়াছি। মাঝে মাঝে এরূপ অবকাশ না পাইলে জীবনটা নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ, খৃষ্টমাসের এই অবকাশটা বড়ই প্রার্থনীয়; এবার-কার ঘটনাবিশেষ স্মরণ করিয়া জীবনরক্ষার্থ একান্ত প্রয়োজনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না হইলে, প্রাণটা যে এই নশ্বর দেহে বাস করিবে, তাহা একপ্রকার সাহসের সহিত বলিতে পারা যায়। পঞ্চুরাম পূর্ব্ববৎ। * * *

৯ই পৌষ।—* * * শীতকালে রাত্রি বাড়িয়াছে। সুতরাং আজ কাল আর কেবল দুইবারমাত্র দুধ খাওয়াইয়া শিশুটিকে রাখিতে পারা যায় না। ভোরের বেলা উঠিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে আরম্ভ করে। কিছুতেই ক্ষান্ত হইবার নহে। তাই আর একবার করিয়া দুধ দেওয়া প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার বাবুকে এ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিব। তিনি বোধ হয় দুধ দিতে বারণ করিবেন। শুদ্ধ যবের ব্যবস্থা দিবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার নির্ব্বাচনের হাঙ্গামা এখানেও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে। দুইটি ভদ্রলোক এক মূর্ত্তিমান বালককে লইয়া উপস্থিত। বলা বাহুল্য, আমি তাঁহাদের মানরক্ষা করিতে পারি নাই।

১০ই পৌষ।—"জন্মভূমি" পত্রিকায় "তমস্বিনী" লেখক শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত শীলতা ও পবিত্রতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অন্ধ হইয়া পড়িতেছেন। বর্ত্তমান পৌষ মাসের সংখ্যায় তিনি উক্ত উপন্যাসের এক পরিচ্ছেদে এক মাতাল-সভার অধিবেশন করাইয়া তাহাতে বাইজীর নৃত্য বর্ণনা করিয়াছেন। সাহিত্যে এরূপ জঘন্য দৃশ্যের স্থান কোনও মতে বাঞ্ছনীয় নহে। তিনি যেরূপে দৃশ্যটির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের মনে তাহার প্রতি আদৌ কোনও ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয় না। উহা পাপের ও কদাচারের প্রণোদক হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যা "জন্মভূমি"খানা আমার ঘরে রাখিতেও আমার আশঙ্কা হইতেছে। বালকেরা সর্ব্বদাই এই সকল কাগজ পড়িয়া থাকে। এখন হইতে এই সকল বর্ণনা-পাঠের ফল বড় শুভকর হইবে না। আমি নগেন্দ্র বাবুর জন্য বিশেষ দুঃখিত। * * *
এ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ওপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র কেমন সাবধানে ছিলেন। তিনি ২।৪ কথায় পাপের চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিতেন, অথচ তাহার প্রতি আমাদের ঘৃণার উদ্রেককরিয়া দিতেন।

১১ই পৌষ।—আমাদের বন্ধুস্থানীয় শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ গুপ্ত মহাশয়

সেদিন তাঁহার শ্বশুরবাটীর নিকটস্থ গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে করিতে হঠাৎ গভীর জলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি সাঁতার জানিতেন না। এ জন্য জলের প্রতি তাঁহার চিরদিনই একটা ভয় ছিল। তিনি যাহার ভয় করিতেন, অবশেষে তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইল। আমাদের বন্ধুটি অতীব সদাশয় ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। প্রফুল্লতা তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার পবিত্র স্বভাবে কোনও গর্ব্বের লেশমাত্র দৃষ্ট হইত না। তাঁহার অকপট সাহিত্যানুরাগ, তাঁহার সরল আত্মীয়তা ও বন্ধুজন-প্রীতি তাঁহাকে সকলেরই বিশেষ আদরণীয় করিয়া তুলিয়াছিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি এই প্রতিষ্ঠালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার রচনায় সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশীলতা, সুকুমার আন্তরিকতা গুণে বিশেষরূপে মুগ্ধ হইতেছিলাম। ভবিষ্যতে তিনি হয় ত এক জন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বলিয়া সাহিত্য-সংসারে প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু ভগবানের সে উদ্দেশ্য নহে। তিনি ক্ষেত্রনাথকে কাড়িয়া লইয়া এক পরিবারের চিরদিনের সুখ ভাঙ্গিয়া দিলেন, বন্ধুবর্গের অন্তরে বিষাদ ঘনীভূত করিয়া দিলেন, এবং হয় ত আমাদের আশ্রয়হীনা বাঙ্গালা ভাষারও বিশেষ অপকারসাধন করিলেন। আমার সহিত ক্ষেত্রনাথের আলাপ অতি অল্প দিনের। তথাপি তাঁহার জন্য মাঝে মাঝে মনটা বড়ই আকুল হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার পরিবারে আমরা পরিচিত নহি। ভরসা করি, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে শান্তি প্রদান করিবেন।

১২ই পৌষ।—জীবনের অনিশ্চয়তা স্মরণ করিয়া প্রাণের ভিতর যে একটা প্রিয় বাসনা জ্বলিতেছে, তাহাদিগকে অতি সত্বরে কার্য্যে পরিণত করিয়া ফেলিতে চাই। ক্ষমতা বড়ই সামান্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশ্বপদ্ধতির ভিতর ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র তুচ্ছ একটি তৃণেরও উপযোগিতা আছে। আমি সামান্য ক্ষুদ্রশক্তি হইলেও সেই উপযোগিতার পরিচয় দিয়া যাইতে চাই। প্রকৃতিটা এত দূর আলস্যপ্রবণ, ঔদাসীন্যময় হইয়া পড়িয়াছে যে, হৃদয়ের সেই ক্ষুদ্র বাসনা কয়েকটিও সুসিদ্ধ হইয়া উঠিতেছে না। কর্ম্মস্থল অপেক্ষা কলিকাতায় থাকিতে আমার বেশী ভাল লাগে বটে, কিন্তু কলিকাতায় থাকিয়া একটু তুচ্ছ কাজও করিতে পারি না। এখানকার সময়টা কেবল গোলমাল ও চাঞ্চল্যে কাটিয়া যায়। প্রবাসে নির্জ্জন গৃহে বসিয়া প্রাণের ভিতর যে রহস্যময় বিষাদের ছায়া মেঘচ্ছায়াবৎ ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, এখন বুঝিতেছি,

তাহা তত দূর কর্ম্মনাশা নহে। কলিকাতায় আসিয়া প্রমোদ প্রফুল্লতার বিক্ষিপ্ত আলোকে সেই ছায়াটুকু কোথায় অপসৃত হইয়া যায়; হৃদয়ের ভাবরাশিও যেন সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া আইসে। বিষাদটা যেন জীবনের আধার হইয়া উঠিয়াছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে উহারও ক্রিয়া না হইলে প্রাণধারণ একেবারে অসম্ভব।

১৩ই পৌষ।—বাবু ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয় "বসুন্ধরা" নাম দিয়া একখানি বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করিতেছেন। "নব্য-ভারত"-সম্পাদকের সহিত মিশিয়া প্রথমতঃ "বসুমতী" বাহির করিবার পরামর্শ করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। সে কল্পনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন কিছু মূলধন সংগ্রহ করিবার মানসে "সাহিত্য"-সম্পাদক ও তাঁহার পৃষ্ঠ-পোষক প—বাবুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। প—চন্দ্রের সাহায্যে টাকা সংগ্রহের কোনও আটক হইবে না বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু উভয় পক্ষের মনোভাব যেরূপ বুঝিতেছি, তাহাতে পরস্পরের সকল বিষয়ে মিল হওয়া নিতান্ত সন্দেহের বিষয়। ঠাকুরদাস বাবু আপনার সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতার কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিতে চাহেন না। প—বাবু প্রভৃতি কয়েক জন যখন স্বত্বাধিকারী দাঁড়াইতেছেন, তখন পত্রিকায় গবর্মেণ্টের প্রতি কোনও প্রকার বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের পরিচায়ক কোনও প্রবন্ধ বাহির হইলে, সকলকেই সমভাবে দায়ী হইতে হইবে। এই জন্য তাঁহারা বলেন যে, যে স্থলে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, অন্ততঃ সেইগুলি মুদ্রিত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সামান্য প্রতিজ্ঞাতেও ঘাড় পাতিতে চাহেন না। আর প—বাবু প্রভৃতি বুদ্ধিশক্তি-বিশিষ্ট মনুষ্য হইয়া যে পরের দোষে আপনাদের জেল খাটিবার সম্ভাবনা রাখিয়া বর্ত্তমান কার্য্যে অগ্রসর হইবেন, এরূপ মনে হয় না। সুতরাং পত্রিকার প্রকাশের প্রস্তাবটা কত দূর গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না।

১৪ই পৌষ।—মধ্যাহ্নভোজনান্তে সুখোপবিষ্ট হইয়া বহু-পূর্ব্ব-বিরচিত গোটাকতক কবিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলাম। কবিতা কয়টি আমার রচনা-শিক্ষার প্রথম অবস্থায় লিখিত। কবিতা কয়টির মধ্যে একটি গল্প ছিল; উহা ছাড়া অপরগুলি সনেট-শ্রেণীভুক্ত। সনেট কয়টির উপাদান নিতান্ত মর্ম্মের কথা হইলেও, উহাদের ভাষা তাদৃশ হৃদয়স্পর্শী ছিল না। এখনকার

বিচারশক্তি অনুসারে উহাদের অস্তিত্ব লুপ্ত করাই উচিত বলিয়া বিবেচনা করিলাম। ইহাতে আমার অতীত জীবনের দুই চারিটা স্মৃতির নিদর্শন বিনষ্ট হইল বটে, কিন্তু উহাদের পাঠ-রূপ বিপদ হইতে জগৎকে উদ্ধার করিলাম, এই ভাবিয়া আমি বরং আনন্দলাভ করিয়াছি।

আজ কাল, অর্থাৎ গত শনিবার এখানে আগমনাবধি পঞ্চুরামকে বেশ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিতেছি। তাহার জন্য এখন আর সেরূপ চিন্তিত নহি। দিবসের অধিকাংশ সময়ই তাহাকে লইয়া একরূপ কাটিয়া যাইতেছে। ভগবান করুন, যেন শিশুটিকে লইয়া জীবনের শেষ সময়টা এইরূপ আনন্দে কাটাইতে পারি; তাহার বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার হৃদয়ের বিষাদরাশি দিন দিন অপসারিত হইয়া যায়।

১৫ই পৌষ।—হেলেনা কাব্যের কবি বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় বঙ্গদর্শনের চাবুক খাইয়া এত দিন নিরীহ ভদ্রসন্তানের ন্যায় স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছিলেন। উচ্চ সাহিত্যের উচ্চ আশা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। এত কালের পর সে বিশ্বাসটা ছাড়িয়া দিতে হইবে, দেখিতেছি। পূর্ব্ববঙ্গীয় কবি নবীনচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ব্ববঙ্গীয় কবি আনন্দচন্দ্র নবীনচন্দ্রের তিন তিনখানি মহাকাব্যের সরঞ্জাম দেখিয়া আর নিরস্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনিও বোধ হয় তিনখানা না পারেন, অন্ততঃ দুইখানার যোগাড় করিয়া পূর্ব্বখণ্ডরূপে, "ভারতমঙ্গল" নামক মহাকাব্যের এক হইতে চারি শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাহির করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়াছেন। মহাকাব্যের বিষয়-নির্ব্বাচনেই কবির অমানুষ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কাব্যের নায়ক রাজা রামমোহন রায়। কাব্যের প্রতিপাদ্য তাঁহারই জীবন-গত কার্য্যপরম্পরা। কবি বলিতেছেন, এ হেন মহাপুরুষ ও এ হেন মহাবিপ্লব লইয়া কাব্য লিখিতে উদ্যত হওয়া অতি কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। আমরা কবির সমর্থন করিতে পারিলাম না। এ হেন বিষয় লইয়া যখন তিনি এক বৎসরের মধ্যে অপর নানাপ্রকার ব্যস্ততা সত্বেও চারি শত পৃষ্ঠা পরিমিত একখানা মহাকাব্যের পূর্ব্বখণ্ড লিখিয়া ফেলিয়াছেন, এবং আবার উত্তর খণ্ড লিখিবার ভয় দেখাইয়াছেন, তখন কাজটা তাঁহার পক্ষে বড়ই সহজ; অন্ততঃ তাঁহার স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ রচনার অপেক্ষা সহজ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

১৬ই পৌষ।—পৌষ মাসের "সাধনা" দেখিলাম। সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত "বিচারক" নামক গল্পটি পাঠ করিয়া তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলাম না। রচনাটিতে শিল্প-কৌশলের কতকটা অভাব পরিলক্ষিত হয়। গল্পের উপসংহার আদৌ মনোহারী হয় নাই। নায়িকার পরিণাম বিবৃত করিয়া তার পরে বিচারক বাবুর সমক্ষে তাঁহার পূর্ব্ব চরিত্রের অভিজ্ঞানটুকু বাহির করিলে শেষটি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইতে পারিত। "সঞ্জীবচন্দ্র" প্রস্তাবে "পালামৌ" ভ্রমণবৃত্তান্তের সমালোচনা বেশ উপাদেয়। একটা উক্তি সম্বন্ধে লেখকের সহিত আমার কিঞ্চিৎ বিবাদ আছে। সঞ্জীবচন্দ্র লিখিয়াছেন, "কোনও যুবতীর যুগ্ম ভ্রূ দেখিয়া আমার মনে হইল, যেন অতি উর্দ্ধে নীল আকাশে কোন বৃহৎ পক্ষী পক্ষ বিস্তার করিয়া ভাসিতেছে।" সমালোচক বলিতেছেন "এই উপমাটি পড়িবামাত্র মনে বড় একটি আনন্দের উদয় হয়।" সমালোচকের কথায় অবিশ্বাস করিবার আমার অধিকার নাই। কিন্তু আমার মনে হয়, এই উপমাটি পড়িবামাত্র কাহারও আনন্দের উদয় হওয়া সম্ভব নহে। উপমাটির সৌন্দর্য্য তত সহজে উপলব্ধ হয় না উহা পড়িবামাত্র প্রথমে হাস্য-রসের উদয় হওয়ারই অধিকতর সম্ভাবনা। যুবতীর যুগ্ম ভ্রূর সহিত বিস্তারিত-পক্ষ বিহঙ্গের সাদৃশ্য একটুকু ভাবিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। তুলনাটায় যেন এই জবরদস্তীর পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং সমালোচক মহাশয় উহার সেরূপ প্রশংসা করিয়াছেন, আমি সেরূপ করিতে পারিলাম না। "কৌতুক-হাস্য" সম্বন্ধে সম্পাদকের কথাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করা কর্ত্তব্য। উহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৭ই পৌষ।—দেখিতে দেখিতে একটা সুদীর্ঘ বৎসর কাটাইয়া দিলাম। জীবনে এ বৎসর তেমন বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। দিনগুলা কখনও বিষাদে, কখনও বা কথঞ্চিৎ প্রফুল্লতায় কাটিয়া গিয়াছে। বিষাদের প্রধান কারণ, হৃদয়ের সহজাত প্রকৃতির কথা ছাড়িয়া দিলে, অসহায় শিশুটির পীড়া। পীড়ার প্রথমাবস্থায় শিশুটির জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি আশঙ্কার অনেকাংশে নিবৃত্তি হইয়াছে। পঞ্চুরাম এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই বটে, তবে বর্ত্তমানের অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। প্রায় দুই তিন মাস ধরিয়া যেরূপ অবসন্ন হৃদয় মনে কালযাপন করিতে হইয়াছিল, আর কিছুকাল সেরূপ হইলে বোধ হয় সংসার হইতে বিদায় লইতে হইত। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে, তিনি এই অধমকে সেই অবসাদ হইতে

রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু যে উৎসাহ-সাহসের প্রার্থনা সংবৎসর ধরিয়া করিয়া আসিতেছি, সে প্রার্থনা ত পূর্ণ হইল না। এরূপ জীবন্মৃতপ্রায় প্রাণে বাঁচিয়া কি লাভ? জীবনের কোনও সদ্ব্যবহারই ত করিতে পারিলাম না। একটা তিন শত পঁয়ষট্টি দিবস পরিমিত সুদীর্ঘ বৎসর কাটিয়া গেল; কি কাজে কাটিল, তাহা ত বুঝিতেছি না। এতটা সময়, এতগুলা দিন চলিয়া গেল, তথাপি জীবনের পথে অগ্রসর হইতে পরিলাম কই? এই ডায়েরীখানার শেষ পৃষ্ঠায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতেই বুঝিতেছি যে, একটা বর্ষ ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু ইহার প্রথম পৃষ্ঠায় যে সুর আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই শেষ পৃষ্ঠাতেও কেবল তাহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

বিবিধ।

প্রতিভা-বিকাশ-রহস্য।—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক বোকাসিও সমৃদ্ধ বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। তরুণ বয়সে তাঁহার সাহিত্য-প্রীতির কোন-পরিচয় পাওয়া যায় নাই। একদিন তিনি নেপল্‌স্‌ নগরীর উপকণ্ঠে বিচরণ করিতে করিতে মাণ্টুয়ানে কবিবর ভার্জিলের সমাধিমন্দিরে উপনীত হইলেন। সমাধিমন্দিরে ক্ষোদিত সেই বিশ্বপূজিত নামের মহিমায় তিনি অভিভূত হইয়া পড়িলেন। সহসা তাঁহার অন্তর্লীন প্রতিভা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার জীবনবাহিনীকে ভিন্নপথে প্রবাহিত করিল। সেই দিন হইতে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অনিশ্চিত যশোলাভের আকাঙ্ক্ষায়, কমলার অর্চনা পরিত্যাগ করিয়া, কলালক্ষ্মীর পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিলেন।

* * *

প্রতিভার প্রত্যাদেশ।—ইটালীর বিখ্যাত কবি পেট্রার্কের পিতা ব্যবহারা-জীবী ছিলেন। পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্রও তাঁহার ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু শৈশবেই পুত্রের অন্তরে কবিতা-রচনায় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; যৌবনে সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করিয়া তুলিল। আইনের নীরস অস্থি চর্ব্বণ করিয়া তাঁহার অন্তরের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইত না। আইন-অধ্যয়নের ছলে পিতার অগোচরে তিনি কবিতা-রচনায় নিবিষ্ট থাকিতেন। পিতা তাহা দেখিয়া অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং পুত্রকে

যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তথাপি পেট্রার্কের কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। অবশেষে পিতা রুষ্ট হইয়া পেট্রার্কের প্রিয় কাব্য গ্রন্থসমূহ ও রচনাবলী অগ্নিসংযোগে বিনষ্ট করিলেন। লাঞ্ছিত, বিক্ষুব্ধ, মর্ম্মাহত পেট্রার্ক পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। একদিন তিনি একটি পর্ব্বতের পাদদেশে বসিয়া অস্তগামী সূর্য্যের অন্তিম কিরণে অনুরঞ্জিত দিগ্বলয়ে মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া আছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, কে যেন বলিল, "অধীর হইও না—অধ্যবসায় হারাইও না।" সেই আশ্বাসবাণী পেট্রার্কের হতাশ হৃদয়ে নব বলের, নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দিল। তিনি পিতৃব্যের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্য-রচনায় অবহিত হইলেন।

* * *

প্রমোদলুব্ধ কবি।—ফরাসী কবি ক্যাণ্টেনাক নৈমিত্তিক কবি ছিলেন। প্রতিভার প্ররোচনায় তিনি কাব্যকলার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি তাঁহার স্বরচিত চরিতাখ্যানে লিখিয়া গিয়াছেন—"লোকে বলে, আমার অন্তঃকরণ অতীব স্বচ্ছ ও সুন্দর; এবং আমার কথাবার্ত্তা, হাব ভাব চিত্তহারী। কিন্তু তাহার প্রধান কারণ, আমি সর্ব্বদাই আপনাকে প্রতিভাবান বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতাম। অসত্য বাক্যে আমি অতিশয় অভ্যস্ত ছিলাম, এবং প্রমদা-প্রসঙ্গে সেই অসত্য অবাধ ও অপ্রতিহত ছিল। বহু শপথের দ্বারা আমি আমার মিথ্যাকে সন্নদ্ধ করিয়া রাখিতাম। অনেকে আমার গদ্যরচনা অপেক্ষা পদ্যের অধিক প্রশংসা করিতেন, এবং নারীসমাজে আমার কবিতার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাদের পরিতোষসাধনই আমার কবিতা-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আমার বিশ্বাস, নারীচিত্তহরণের পক্ষে কবিতার শক্তি উপেক্ষণীয় নহে। এই কাব্যানুশীলন অনেক সময় আমার সাংসারিক সাফল্যের অন্তরায় হইত, কিন্তু তাহার জন্য আমি অণুমাত্র কাতর হই নাই। আমি একটি দিনের প্রমোদপিপাসা-পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কখনও কখনও সহিষ্ণু-চিত্তে সংবৎসর প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, এবং শারীরিক, নৈতিক ও আর্থিক, সর্ব্ববিধ ক্লেশ অকাতরে আলিঙ্গন করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না।"

* * *

কলা-শিল্পীর ঈর্ষ্যা।—শিল্পসমৃদ্ধশালিনী ফ্লোরেন্সের শিল্প-সমিতি হইতে প্রতিবৎসর চিত্রের একটি করিয়া বিষয় নির্দ্ধারিত হইত, এবং উৎকৃষ্ট চিত্রের

জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইত। একবার চিত্রের বিষয় ছিল,—"রাজাদেশে পিতার সমক্ষে পুত্রের প্রাণদণ্ড হইতেছে।" বিভিন্ন প্রদেশের বহু চিত্রকর স্ব স্ব চিত্র প্রেরণ করিলেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী চিত্রশিল্পী রাফেলের শিক্ষাগুরু পিট্রো পিরুগিনোও একখানি চিত্র প্রেরণ করিলেন। রাফেল তখন শিক্ষার্থী। প্রতিভার বরপুত্র রাফেলের হৃদয়ে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পশালায় আপনার চিত্র-প্রদর্শনের বাসনা জাগিয়া উঠিল। তিনি গুরুর অজ্ঞাতসারে চিত্র অঙ্কিত করিয়া প্রেরণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে চিত্রসমূহ পরীক্ষিত হইল। অন্যান্য সকলেই বধ্য পুত্রের পিতার মুখমণ্ডলে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ করিয়াছিলেন। রাফেল তাঁহার চিত্রে পিতার নয়নদ্বয় রুমালে আবৃত করিয়া দিয়াছিলেন। পরীক্ষকগণ একবাক্যে এই নবীন চিত্রকরের উদ্ভাবনী শক্তির ও অভিনব কৌশলের প্রশংসা করিলেন, এবং তাহাকেই পারিতোষিক প্রদান করিলেন। অনাগত ভবিষ্যতের আবছায়ায় তাঁহার জন্য যে প্রতিষ্ঠার সিংহাসন রচিত হইতেছে, এই ঘটনায় তাহার পূর্ব্বাভাস সূচিত হইল। এই ঘটনার পর পিট্রো পিরুগিনোর অন্তরে রাফেলের প্রতি এমন বিদ্বেষ জন্মিল যে, তিনি রাফেলকে তাঁহার শিল্পশালা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার যশঃসূর্য্যের এই নবীন রাহুকে গোপনে সংহার করিবার সঙ্কল্পও করিয়াছিলেন।

* * *

শিল্পানুরাগ।—প্রসিদ্ধ ভাস্কর শিল্পী ডেভিড্ যখন সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের মর্ম্মরমূর্ত্তিনির্ম্মাণে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তাঁহার কোনও চিকিৎসক বন্ধু তাঁহাকে কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শারীরিক শ্রম ও মানসিক উত্তেজনার বাহুল্যে ব্যাধি তাঁহার শরীরে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছে। অনুরাগান্ধ শিল্পী উপহাসচ্ছলে সুহৃদের সে উপদেশ উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, মানুষ তাহার নাম লুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সন্তান কামনা করে। আমার রচিত মূর্ত্তিসমূহই আমার সন্ততিবর্গ। আমি আমার সন্তানের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভের কামনায় এই মূর্ত্তির পদতলে প্রাণত্যাগ করিব, তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি আরব্ধ কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া জনসমাজের বিরাগ ও উপহাসের পাত্র হইব না। তাহাই হইল। রয়েল এক্স্চেঞ্জের মধ্যস্থলে মহাসমারোহে সেই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা অবলোকন করিয়া হর্ষদীপ্তহৃদয়ে শিল্পী ফিরিয়া গেলেন।

ব্যাধি তাঁহার শরীরে পূর্ব্বেই স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল; এক্ষণে তাহা সাংঘাতিক হইল। উল্লাস-হাস্য অধরপ্রান্তে বিলীন না হইতেই ডেভিডের অমর আত্মা তাঁহার নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া গেল।

* * *

অভিনয়-সাধনা।—অভিনয় আরব্ধ হইলে সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী সিডন্সের অন্যান্য সহযোগী ও সহযোগিনীবর্গ হাস্যপরিহাসে অবসরকাল যাপন করিতেন। সিডন্স্ তাঁহার প্রসাধন-প্রকোষ্ঠের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া নির্নিমেষনয়নে অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেন। তার পর যখন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইতেন, তখন বিস্ময়াবিষ্ট দর্শকগণ সানন্দে দেখিত যে, অভিনেয় ভূমিকায় অভিনেত্রীর ব্যক্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

একদিন তিনি জুলিয়েটের বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া প্রসাধন-কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী একটি সম্ভ্রান্ত যুবক ডাকিল, 'লিলি!' (সিডন্সকে তাঁহার কুমারী অবস্থায় আদর করিয়া এই যুবক লিলি বলিয়া সম্বোধন করিতেন।) অকস্মাৎ ধ্যানভঙ্গে তাপসের আননে যেরূপ বিরক্তি ও বিষাদ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, অভিনেত্রীর মুখেও সেই ভাব পরিলক্ষিত হইল। যুবক অপ্রতিভ হইলেন। পরুষকণ্ঠে অভিনেত্রী বলিলেন, "তোমার প্রেমসম্ভাষণ শুনিবার অভিপ্রায়ে আমি এখানে আসি নাই। তুমি কেন ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমি এখন আমার প্রাণাধিক রোমিওর প্রেমে পাগলিনী?"

* * *

শিল্পীর মানস-সুন্দরী।—অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ভাস্কর-শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো শিল্পসাধনাকালে তাঁহার স্বজন সুহৃদ কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না। এমন কি, তাঁহার আনন্দপ্রতিমা প্রিয়তমা সহোদরাও তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অবকাশ পাইতেন না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "কলাসুন্দরী বড় অভিমানিনী। তিনি তাঁহার অনুরক্তের অনন্যচিত্ত অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অখণ্ড মনোযোগ ব্যতীত প্রসন্না হন না।"

একবার কোনও ধনকুবের তাঁহার উদ্যান-বাটিকা ভাস্কর-শিল্পে খচিত করিবার অভিপ্রায়ে মাইকেলকে নিমন্ত্রণ করেন। শিল্পী আসিলেন; একটি প্রশস্ত কক্ষে আপনার শিল্পাগার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার সমস্ত দিবসের

আহার্য্য ও পানীয় তথায় রক্ষিত হইল, তিনি ভৃত্যদিগকে আদেশ দিলেন, যেন কোনও চিঠিপত্র, এমন কি, তাঁহার স্বগৃহের কোনও পত্রাদিও তাঁহার অনুমতি ব্যতীত তাঁহাকে না দেওয়া হয়। তার পর কক্ষদ্বার অর্গলবদ্ধ করিয়া শিল্পচর্য্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। প্রদোষতিমিরে শিল্পাগার ম্লান না হইলে তিনি অর্গল মোচন করিতেন না। একদিন কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া দেখেন, এক অসামান্যা সুন্দরী যৌবনের সমগ্র সম্পদে মণ্ডিতা হইয়া তাঁহার কক্ষসম্মুখে সোপানোপরি উপবিষ্টা! যুবতী একবার করুণ-কটাক্ষে মাইকেলের প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে সোপান অবতরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন হইতে প্রত্যহ মাইকেল যুবতীকে তথায় উপবিষ্টা দেখিতেন, কিন্তু এক দিনও তিনি যুবতীকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেন না। যুবতীও কিছু বলিতেন না।

এক দিন তিনি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রতি-দিন আমার কক্ষদ্বারে বসিয়া থাকেন? প্রতিকৃতি-নির্ম্মাণের অভিপ্রায়ে কি?"

"না।" যুবতীর অলক্তলোহিত অধরযুগল কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতলে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া যুবতী বলিলেন, "আমি আপনার অনুরাগিণী— আপনার কণ্ঠে বরমাল্য দান করিয়া নারী-জন্ম চরিতার্থ করিবার অভিলাষিণী।" বিনম্রকণ্ঠে বিস্ময়াবিষ্ট শিল্পী বলিলেন, "আপনি সুন্দরী ও রমণীর সর্ব্বরমণীয়তায় মণ্ডিতা, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি; কিন্তু আমার হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে সৌন্দর্য্যের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার তুলনায় আপনি—" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মন্থরপদে যুবতী শিল্পীর দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করিলেন।

মাইকেল এঞ্জেলো চিরকুমার ছিলেন।

* * *

শিল্পসাধনা।—সাহিত্য ও চিত্র-শিল্পে অভিজ্ঞ জেন্‌সার বলেন,—অপরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগের ন্যায় শিল্পীর শিল্পানুরাগ যদি দুর্দ্দমনীয় না হয়, কলাশিল্পের অনুশীলনকাল যদি প্রণয়িনীর সহিত আলাপন-অবসরের মত সুখে অতিবাহিত বলিয়া প্রতীতি না জন্মে, শিল্পচর্চ্চা যদি জীবনের একমাত্র অবলম্বন ও শ্রেষ্ঠ ব্রত বলিয়া গৃহীত না হয়, সতীর্থগণের সাহচর্য্য যদি সর্ব্বাপেক্ষা সুখাবহ বলিয়া ধারণা না জন্মে, শিল্প-কল্পনা যদি স্মৃতি ও স্বপ্নের সঙ্গিনী হইয়া না থাকে, তাহা হইলে, শিল্পের স্থায়িত্ববিধান ও শিল্পীর ভাগ্যে যশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ সুদূরপরাহত।

উদ্ভট গল্প।

খাজা বনমালী খাঁর জীবনচরিত।

——:*:——

১

খাজা বনমালী খাঁ বাঙ্গালী। খাঁটী বাঙ্গালী, অমিশ্র বাঙ্গালী। পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালী। এই শ্রেণীর বাঙ্গালী পুরাতন পাঠান-বংশের অধঃপতনের সহিত ভারতবর্ষ হইতে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও, কমিসেরিয়েটের গাল আলুর ন্যায় কোনও ক্রমে গোধূমের বস্তায় স্থানপ্রাপ্ত হইয়া সেকালে যানে ওখানে দুই চারিটি ছট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। এইরূপে স্বদেশ হইতে চ্ছিন্ন হইয়া বনমালীর পিতা আগ্রা অঞ্চলে সস্ত্রীক বাস করিয়াছিলেন। বনমালী আগ্রায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

ব্যবসায় বাণিজ্যে বনমালীর পিতা প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিয়া যান। বনমালী যুবা ও সুন্দর। কেবল তাহাই নহে। বনমালীর কথা আপামর সাধারণের এত মিষ্ট লাগিত যে, স্বয়ং সুবাদার সরফরাজ খাঁ সাহেব তাহাকে "খাজা" উপাধি দিয়াছিলেন।

বনমালী "খাঁ" বলিলেই যে মুসলমান বুঝিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বনমালী বরেন্দ্রভূমের ব্রাহ্মণ। এখনও বঙ্গদেশে নবাবী আমলের "খাঁ"-খেতাবধারী অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ সমাজের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন। কিন্তু, "খাঁ"র মুখে "খাজা" সংযোগ করিলে, অনেকের জাতি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, এবং ফলে তাহাই হইয়াছিল। পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে বনমালী স্বদেশে আসিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। জন্মভূমি বর্দ্ধমানে কেহ তাহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিল না।

সকলের মতে "খাজা" উপাধি ঘোর সন্দেহজনক বলিয়া বোধ হইল। সভাস্থলে তর্কবাগীশ তারস্বরে বলিলেন, "সমবেত ভদ্রমণ্ডলী! আমার বক্তব্য এই,—'খাঁ' উপাধি একটা পদবীমাত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু 'খাজা'টা যেন কেমন কেমন! ইহাতে বোধ হয়, নবীন ভাদুড়ীর পুত্র বনমালীর জাতি—আগ্রার মুসলমানগণ কাড়িয়া লইয়াছে। এরূপ স্থলে সাহস করিয়া নবীনের ভিটায় আহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।" সূক্ষ্মদর্শী

তর্কবাগীশ আরও বলিলেন, "অপিচ তোমরা আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়া দেখ নাই। বনমালীর কথাগুলা একটু মুসলমানী ধরণের। 'দেল জমায়েত', 'মুখতসির' প্রভৃতি কথা স্বয়ং কবিবর ভারতচন্দ্র ব্যবহার করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু বনমালীর মুখে এবম্প্রকার কথার ছয়লাপ দেখিয়া স্থির বোধ হইতেছে যে, সে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।"

কাজেই বনমালাকে আগ্রায় ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। বনমালীর বিবাহ অতি শৈশবকালে ঘটিয়াছিল। কালনা অঞ্চলে বনমালীর শ্বশুরালয়। রোষে ও অভিমানে বনমালী শ্বশুরালয়েও গেল না।

বনমালীকে সমাজচ্যুত করিয়া নিরস্ত না হইয়া দলপতিগণ বনমালীর শ্বশুর গুরুদাস স্মৃতিরত্নকে একঘরে করিল। ভট্টাচার্য্যের যজমান-বৃত্তি বন্ধ হইয়া গেল।

গৃহিণীর কাল হওয়া অবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয় বৃন্দাবন-বাসের কল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র কন্যা সুকুমারীকে স্বামিহস্তে সমর্পণ করিতে পারিয়া এতদিন সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

সন্ধ্যার সময় গুরুদাস কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন,

"মা, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।"

অর্দ্ধফুটন্ত যৌবনের সুন্দর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সুকুমারী চতুর্দ্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিল। অনেক বৎসর ধরিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় সোহাগিনী কন্যাকে স্মৃতি, ছন্দ, ব্যাকরণ ও ভগবদর্চ্চনা প্রভৃতি একমনে শিখাইয়াছিলেন। মাতৃমুখের ক্ষীণ স্মৃতি, পিতার অসামান্য যত্ন ও স্নেহ, এবং জীবনের একমাত্র আরাধ্য, দূরদেশস্থিত স্বামীর সহিত মিলনের আশা, বালিকার পবিত্র দেহ ও মনকে একাধারে জড়াইয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যময় করিয়া তুলিয়াছিল।

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে" শুনিয়া বালিকার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। সে চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কোনও অবলম্বন না পাইয়া সুকুমারী পিতৃপদতলে বসিয়া পড়িল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মা, ভয় নাই; বনমালী ভাল আছে। কিন্তু বনমালী থাকিয়াও নাই। সে জাতিকুলের মুখে জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান

ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃদ। মরিলে ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু সঙ্গে যায় না। এখন তোমার গতি কি হইবে?"

সুকুমারী চক্ষু মুছিয়া বলিল, "বাবা! ধর্ম্ম কাহার?"

পিতা। ঈশ্বরের।

কন্যা। স্বামীই ত ঈশ্বর ও গুরু। ঈশ্বরের জগতে অনেক ধর্ম্ম আছে, এবং তিনিই সকল ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। স্বামী এক ধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্ম্মে গেলে স্ত্রীর কি তাহা অনুসরণ করা কর্ত্তব্য নহে?

সুকুমারীর একমাত্র দারুণ ভয় তিরোহিত হইয়াছিল। স্বামী জীবিত আছেন শুনিয়া তাহার নির্ব্বাণোন্মুখ আশাদীপ পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া সাধারণ অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।

ভট্টাচার্য্য কন্যার মুখে ধর্ম্মের অভিনব ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইলেন, এবং কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"ধর্ম্মের পরিবর্ত্তনের মূলে কখনও কখনও নষ্টা প্রকৃতি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে; বনমালীর বিধর্ম্ম-অবলম্বনের মূলে কোনও মুসলমানী আছে কি না, তাহা এখনও জানা জায় নাই।"

এইরূপে কন্যার উপর কঠিন শাস্তিবিধান করিয়া বৃদ্ধ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য সন্ধ্যা প্রক্রিয়ায় মনোযোগী হইলেন। সুকুমারী ছিন্নলতাবৎ ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইয়া রহিল।

তৎপরদিন সকলে শুনিল যে, গুরুদাস ভট্টাচার্য্য তৈজসপত্র ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন।

৩

সুবাদার সরফরাজ খাঁ সচ্চরিত্র, সাহিত্যানুরাগী, ঈশ্বরপরায়ণ মুসলমান। আগ্রা হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার গুণে বাধ্য। যদিও ব্রিটিশ-রাজত্বে সুবাদার-বংশের খেতাব ও পদমর্য্যাদার প্রভুত্ব বহুপরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল, তথাপি সরফরাজ খাঁর বিস্তীর্ণ জায়গীরে প্রায় লক্ষাধিক মুসলমান তাঁহার অনুগত ছিল।

সরফরাজ খাঁ মুসলমান হইলেও বহুস্ত্রী পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র প্রেম পত্নী মেহেরজানের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। মেহেরজান ইরাণী; সুন্দরী, তেজস্বিনী ও বিদুষী।

সরফরাজ খাঁর পুত্রসন্তান না হওয়াতে অনেকের মুখ গম্ভীর হইত।

কিন্তু খাঁ সাহেব সহাস্যবদনে বলিতেন, "দুনিয়ার দৌলত তাঁহারই চরণে অর্পণ করিলে যেমন খুস্‌নুমা হয়, এমন অন্য কিছুতেই হয় না। খোদার মায়া খোদাকেই পুনরর্পণ করা কৌশলের কার্য্য। আমার ধন দৌলতের অধিকাংশ মক্কায় ঈশ্বর সেবায়-অর্পিত হইবে।"

সেই অবধি সুন্দরী মেহেরজান স্বামীর চরণে বাঁদী হইয়া তাঁহার পূজা করিত।

মাঘ মাসের দারুণ শীতে খাঁ সাহেব অনুচরবর্গ লইয়া যমুনার তটবর্ত্তী কোনও জায়গীর পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। বালুকাসৈকত ভাঙ্গিয়া আসিতে আসিতে সূর্য্য অস্ত গেল। খাঁ সাহেব কিয়ৎকালের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিয়া অনুচরবর্গকে তাঁহার অশ্ব লইয়া আসিতে বলিলেন, এবং স্বয়ং পশ্চিমাভিমুখে জানু পাতিয়া নেমাজ পড়িতে বসিলেন।

সেই সময় অতিদূর হইতে সন্ধ্যা-সমীর বাহিয়া রমণীর করুণ হৃদয়ভেদী আর্ত্তস্বর তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। খাঁ সাহেব তৎক্ষণাৎ এক জন পারিষদকে বলিলেন,

"করিমবক্স! তুমি কোনও রমণীর কাতর স্বর শুনিতে পাইতেছ?"

সকলে সেই দিকে গেল, এবং দেখিল যে, বৃদ্ধ পিতার শব ক্রোড়ে ধারণ করিয়া একটি অনাথা বালিকা তরণীবক্ষে আর্ত্তস্বরে কাঁদিতেছে।

সরফরাজ খাঁ সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, ইনি তোমার কে?"

বালিকা। পিতা। আজ আমাকে অনাথা করিয়া ঈশ্বরের চরণপ্রান্তে চলিয়া গিয়াছেন।

সরফরাজ। মা, সুখে দুঃখে যে ঈশ্বরের নাম বিস্মৃত হয় না, আমি তাহার দাস। আমার ব্রাহ্মণ অনুচরবর্গ আছে; তোমার পিতার যথাযথ সৎকার হইবে।

তাহাই হইল। সেই সন্ধ্যাকালে বহুব্রাহ্মণে পরিবেষ্টিত হইয়া চন্দন কাষ্ঠের সুগন্ধি চিতায় গুরুদাস ভট্টাচার্য্যের পার্থিব দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। কেবল জীবনের ভীতি ও ভার লইয়া অনাথা বালিকা সুকুমারী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

৪

দুই সপ্তাহ পরে সরফরাজ খাঁ বলিলেন, "মা, তোমার শরীর শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অজানিত স্থানে দীনার ন্যায় থাকা তোমার পক্ষে উচিত নহে। স্বদেশে তোমার অন্য কোনও আত্মীয় স্বজন নাই?"

সুকুমারী। আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনাকে সকলই বলিয়াছি; কেবল একটি কথা বলি নাই। আমার স্বামী জীবিত আছেন, এবং তিনি এই আগ্রা সহরেই থাকেন, শুনিয়াছি।

সরফরাজ। কি তাজ্জবের কথা? তাঁহার নাম কি?

সুকুমারী। তিনি আমার পক্ষে থাকিয়াও নাই। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার নাম এই পত্রে পাইবেন।

সুকুমারী তাহার স্বামীর স্বহস্তলিখিত একখণ্ড পত্র খাঁ সাহেবকে দেখাইল।

পত্র পাঠ করিয়া খাঁ সাহেবের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল; পুনরায় গম্ভীর হইল; এবং শেষে প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

খাঁ সাহেব বলিলেন, "আমি তোমার স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া দিব। কিন্তু আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

বালিকা। বলুন।

সরফরাজ। তুমি মুসলমানী হইতে চাও?

বালিকা। পিতৃদেবের মৃত্যুর সহিত আমার হিন্দুধর্ম্মের শেষ বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি স্বামীর ধর্ম্মানুরাগী।

সরফরাজ। কিন্তু স্বামীকে গ্রহণ করিতে হইলে তোমাকে তাঁহার সহিত মুসলমান ধর্ম্মানুসারে আবার পরিণীত হইতে হইবে, তাহা তুমি জান?

বালিকা। তাহা জানিতাম না। কিন্তু তিনি গ্রহণ করিবেন কি?
তিনি যদি অন্য বিবাহ করিয়া থাকেন?

সরফরাজ। তাহা আমি বুঝিব। এমন রত্ন যে গ্রহণ না করে, সে আমার মতে মুসলমান নয়। আপাততঃ তোমাকে আমার গরিবখানায় পদার্পণ করিতে হইবে। মা, ইহাতে তোমার আপত্তি আছে?

বালিকা। আমি অনাথা, আমার আপত্তি কিসের?

সরফরাজ। তুমি অনাথা নও, রাজরাণী হইবার উপযুক্তা। এখন দাসীগণ তোমাকে আমার অন্দরমহলে লইয়া যাউক। আমার স্ত্রী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে।

অতঃপর খাঁ সাহেব মেহেরজান্‌কে একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন, "প্রিয়ে,

ভস্ম হইতে এই অমূল্য রত্ন বাহির হইয়াছে। ঈশ্বরের সমক্ষে বালিকা আমার ধর্ম্মপুত্রী।”

৫

মছলন্দ-জড়িত তাকিয়ার উপর পূর্ণযৌবনের ঈষৎ রক্তিম পদতল বিন্যস্ত করিয়া ভুবনমোহিনী মেহেরজান অর্দ্ধশয়ানাবস্থায় “লয়লা-মজনু” পাঠ করিতেছিল।

দুই জন দাসী পদনখরে ইন্দ্রধনু রঞ্জিত করিতেছিল। মেহেরজান্ আলতা ভালবাসিতেন না। যে পদতল মর্ত্ত্যের কণ্টক স্পর্শ করে নাই, তাহাতে ইন্দ্রধনুর বর্ণই শোভা পায়।

এমন সময় ধীরে ধীরে মলিন নয়নযুগল নত করিয়া কম্পিতহস্তে সুকুমারী সরফরাজ খাঁর পত্র মেহেরজানের হস্তে দিল।

ইরাণী শয্যা হইতে উঠিয়া পত্র পাঠ করিল, এবং তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সুকুমারীর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল। মেহেরজান্ জহুরীর কন্যা। রত্ন চিনিল; মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার মুখমণ্ডল স্নেহে পূর্ণ হইল। দুই হস্তে বালিকার কৃশ দেহ কোলে তুলিয়া লইয়া মেহের তাহার নেত্রদ্বয় চুম্বন করিল।

মেহের কহিল, “আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে রত্ন সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু রত্নের পরিবর্ত্তে ভস্ম লইয়া গিয়াছে। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে ?”

সুকুমারী। পিত্রালয়ে। তাহা আর নাই।

মেহের। তাহা বুঝিয়াছি। এখন বোধ হয় স্বামীর অনুসন্ধানে ?

সুকুমারী। আমার স্বামী মুসলমান।

মেহের। বোধ হয়, না। মুসমান রত্ন বাছিয়া গলায় পরে, হিন্দু তাহাকে পদদলিত করে। হিন্দুরমণী কারাগারে থাকিয়া শীর্ণা, মুসলমানী কারাগারে সোহাগিনী।

বোধ হয় মেহেরজান, তখন কেবল স্বীয় অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়াছিল। মেহেরজান্ আবার বলিল, “তুমি তোমাদিগের শাস্ত্র জান ?”

সুকুমারী। পিতার নিকট কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছিলাম।

মেহেরজান্। তাহারই বলে বোধ হয় এখনও জীবন ধারণ করিয়া আছ। বেশ, এখন তোমাকে স্নান করাইয়া দিই। পরে তোমাদিগের ব্যাকরণটার আলোচনা করিব।

৬

সুকৌশলা ইরাণী মেহেরজানের হস্তে সুকুমারী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিল। মেহের কহিল, "তোমার নাম আমরা 'কমরুন্নিসা' রাখিয়াছি। তোমার স্বামী 'খাজা'। তিনি নূতন বিবাহ করেন নাই, অতএব তোমার বিষাদের রেখাটা মুছিয়া ফেল। শীঘ্রই তোমার স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে।"

সুকুমারী লজ্জিতা হইয়া রহিল

মেহের আবার কহিল, "তোমাদিগের ব্যাকরণ যত দূর বুঝিতে পারিলাম, তাহা কেবল আতপ চাউল ও কাঁচকলার গন্ধে পরিপূর্ণ। উহারই মধ্যে জাফ্রাণ ও মশলা প্রভৃতি দিলে সুন্দর পোলাও হয়। তোমাদের কিছুতে 'রৌশণ' নাই। তোমাদিগের শকুন্তলা কাঁদিয়া কাঁদিয়া জন্মটা কাটাইয়াছে। ইরাণী হইলে সে তরবারিহস্তে প্রেমের পথে জীবন বিসর্জ্জন দিত। জীবন উদ্দীপ্ত, তেজোময়। আশায় নিরাশায়, সুখে দুঃখে, তেজ হারাইতে নাই। এই তেজ রাজপুত জাতিতে ছিল, কিন্তু তাহারাও সৌন্দর্য্য বুঝিত না, এবং ভোগ করিতে জানিত না। স্বামীর সহিত দেখা হইলে কি করিবে?"

সুকুমারী। পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

মেহের। সেই বিদ্যাপতির প্রেম আবার! না, তাহা হইতে পারে না। তোমার কোনও অপরাধ নাই। যাহার অপরাধ, সেই ক্ষমা প্রার্থনা করে। কৃষ্ণ রাধিকার মানভঞ্জন করিতেন, কিন্তু রাধিকা মুগ্ধার ন্যায় বসিয়া থাকিত। এরূপ বোবার ন্যায় বসিয়া থাকায় কোনও লাভ নাই। একটা কিছু করা চাই।

সুকুমারী। তবে কি করিব?

মেহের। তুমি কখনও পরিচয় দিবে না। তোমাদের শাস্ত্রে বলে, জীবের পুনর্জ্জন্ম হয়। পুনর্জ্জন্ম হইলে কি কেহ আবার পরিচয় দিয়া থাকে? জহুরী চিনিয়া লয়। জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে, বিশেষতঃ প্রেমের রাজ্যে, প্রেমিক প্রেমিকা মুহুর্মুহ ভাবের হিল্লোলে জন্মিতেছে, মরিতেছে। প্রত্যেক পুনরুত্থান, প্রত্যেক অবসান, নূতন ও রহস্যময়। তাহার মধ্যে ব্যাকরণের বন্ধন নাই। আত্মপরিচয়, পুরাতন স্মৃতি, পুরাণো ছন্দ ও শ্লোক প্রভৃতির আবৃত্তি কেবল টোলেই হইয়া থাকে। টোলের রঙ্গস্থলে প্রেমের কথা ষোড়শীর মুণ্ডিত মস্তকে আর্কফলার ন্যায় হাস্যস্পদ হয়।

এইরূপে বক্তৃতা সাঙ্গ হইল। মেহেরজান্ সুকুমারীর নখে আল্‌তার

অর্দ্ধচন্দ্র আঁকিয়া দিল, এবং বিলম্বিত বেণীর সহিত কুঁদফুলের মালা জড়াইয়া দিল।

মেহের বলিল, "তোমাদের সকলের বেণী "ক্ষ"র মত একটা কিম্ভূত-কিমাকার ভববন্ধন। ঈশ্বর মাথার চুল কুণ্ডলী পাকাইয়া রাখিতে দেন নাই। তবে তোমাদের "কানের অলঙ্কারের গড়নটা ভাল।"

সুকুমারী। কেন?

মেহের। কীট পতঙ্গ চ'খে নাকে গেলে, চক্ষু ও নাসিকাই তাহাদিগকে ঝাড়িয়া বাহির করে। কিন্তু কর্ণের আত্মাবলম্বন নাই। অতএব একটা কিছু দিয়া কান্‌টা ঢাকিয়া রাখা মন্দ নয়। উভয়ে হাসিল।

মেহেরজান একখানা সুন্দর জরির ওড়নায় সুকুমারীর আপাদমস্তক ঢাকিয়া তাহাকে তাজমহলের সুন্দর উদ্যানে বেড়াইতে লইয়া গেল। তখন যমুনার তীরে বসিয়া মেহেরজান বীণানিন্দিত স্বরে একটা গজল গাহিয়া ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিল। মেহের বলিল,

"তোমাদের এমন সুন্দর রাগ রাগিণীর কর্ত্তা শ্মশানবাসী এবং গায়ক ষাঁড়! কি ক্ষোভের বিষয়।"

৭

মেহেরজানের গজল্ শুনিতে শুনিতে সুকুমারী নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ণ-চন্দ্রকিরণ "তাজে"র শুভ্র প্রতিবিম্ব লইয়া যমুনার বক্ষে নৃত্য করিতেছিল।

খাজা বনমালী খাঁ প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে যমুনাতীরে বেড়াইত। যমুনার জলে অন্য কোনও গুণ না থাকুক, কেমন একটা প্রেমের মহিমা ও গৌরব আছে, যাহা প্রায় সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নতশিরে স্বীকার করিয়া গিয়াছে।

বনমালী ইদানীং মূল্যবান্ বেশভূষা ছাড়িয়া একটা গেরুয়া বসনের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিল। উহাতে তাহাকে হিন্দু কি মুসলমান্ বলিয়া চেনা যাইত না।

একখণ্ড প্রস্তর-আসনে মস্তক রাখিয়া সুকুমারী বিভোরে নিদ্রা যাইতেছিল। বনমালী বিস্মিত হইয়া অনিমেষনয়নে সেই অপূর্ব্ব সুন্দর মুখখানি দেখিতে লাগিল।

নিদ্রিতা যুবতী মুসলমানী, তাহা বনমালী স্থির করিল। বনমালী মনে করিল, এরূপ স্থলে তাহার দূরে যাওয়া উচিত।

কিন্তু বনমালীর পা সরিল না।

কতক্ষণ বনমালী সেখানে বসিয়াছিল, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারে নাই।

এমন সময় নিকটস্থ মিনার হইতে সন্ধ্যাবন্দনার উচ্চ-রব উদ্যানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

সুকুমারী চক্ষু মেলিয়া দেখিল, মেহেরজান্ চলিয়া গিয়াছে। গাত্রের ওড়না অদৃশ্য হইয়াছে। অদূরে একটি যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে।

সুকুমারী সভয়ে ডাকিল, "মা কোথায় ?" সুকুমারী মেহেরজান্কে মাতৃ-সম্বোধন করিত। অদূরস্থ তাজমহল হইতে প্রতিধ্বনি হইল, "মা কোথায় ?"

বনমালী আশ্বাসপ্রদান করিয়া কহিল, "আপনার ভয় নাই। আমি এক জন হিন্দু ফকীর।"

সুকুমারী। মেহেরজান কোথায় ?

বনমালী। আমি জানি না।

সুকুমারী। আপনি কে।

বনমালী। আমি পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গালী। নাম বনমালী।

সুকুমারী তাহা জানিত। কিন্তু পুরুষের স্মরণশক্তি কাচের ন্যায় ভঙ্গ-প্রবণ! বনমালীর স্মৃতিপথে অভাগিনীর মুখখানি কি এক মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হয় নাই ?

সুকুমারী লজ্জা দূরে রাখিয়া তীব্র ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল,

"পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গালীর ফকীর বেশ কেন ?"

বনমালী। আমি সংসারত্যক্ত, সমাজচ্যুত।

সুকুমারী। তবে যুবতীর প্রতি দৃষ্টি কেন ?

বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়িতা মেহেরজান্ মনে মনে সুকুমারীকে ধন্যবাদ দিল।

বনমালী। মোহ হইয়াছিল।

সুকুমারী। এইরূপ কতবার হইয়াছে ?

বনমালী। বোধ হয় আর হয় নাই।

সুকুমারী। ফকীরের বেশে মোহের পরিচয় দেওয়া কাপুরুষতা।

বনমালী। মার্জ্জনা করিবেন। আপনি কে ?

সুকুমারী। আমি সরফরাজ খাঁর ধর্ম্মপুত্রী 'কমরুন্নিসা'। আমি পরস্ত্রী। আপনি আমার মর্য্যাদার অবমাননা করিয়াছেন।

খাজা বনমালী খাঁ তখন দুই হস্তে যুবতীর মর্য্যাদা-রক্ষার্থ একটা লম্বা চৌড়া সেলাম করিলেন।

সেই সময় অন্তরাল হইতে সস্মিতমুখে মেহেরজান্ বাহির হইয়া বলিল,

"খাজা সাহেব! গোস্তাকি মার্জ্জনা করিবেন।"

৮

মেহেরজান বলিল, "খাজা সাহেব! আপনি আমার স্বামীর প্রধান অমাত্য; আপনি আমাকে অনেকবার দেখিয়াছেন, কিন্তু কমরুন্ বিবিকে কখনও দেখেন নাই। কমরুণ অভাগিনী।"

সুকুমারী পুনঃপ্রাপ্ত ওড়না মস্তকে দিয়া দূরে চলিয়া গেল।

মেহের। কমরুন্নিসা স্বামি-পরিত্যক্তা।

বনমালী। কি দোষে?

মেহের। সতীত্বের দোষে। আপনাদিগের হিন্দুধর্ম্মের প্রধান গৌরব এই যে, সতীনারী চিরকালই পথের ভিখারি ও বনবাসিনী। কেমন, ঠিক নয়?

বনমালী। আমার সহিত হিন্দুধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই।

মেহের। তবে আপনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুন না কেন?

বনমালী। কেন?

মেহের। মুসলমান ধর্ম্মে প্রেম আছে।

বনমালী। তবে আপনাদের নারী স্বামী ছাড়িয়া নিকা করে কেন?

মেহের। নিকা করিলে কি হয়?

বনমালী। দেহ একবার কলুষিত হইলে পুনরায় পবিত্র হইতে পারে না।

মেহের সতেজে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল, "তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ দেহ-টাকে মায়া বলিয়াছিল, এবং মনটাকে মানুষ বলিয়াছিল। মনটা কলুষিত হয় না; মায়াবী দেহ কলুষিত হয়।

বনমালী। আমি অত শাস্ত্র জানি না।

মেহের। কিন্তু তোমার স্ত্রী জানে। তোমাদিগের রমণী শ্রেষ্ঠা, পুরুষ হীন। পুরুষ দেহ খুঁজিয়া বেড়ায়; রমণী মন খুঁজিয়া বেড়ায়। মনের উজ্জ্বল-তম দীপশিখা প্রেম। তোমাদিগের হৃদয়ে প্রেম নাই, অতএব তোমরা মানুষ নও। মেহের পুনরায় বলিল,

"খাজা সাহেব, মার্জ্জনা করিবেন। আত্মবিস্মৃত হইয়াছি। ঈশ্বরের সমক্ষে সুকুমারী আমার ধর্ম্মপুত্রী। আপনি তাহাকে অনাথা করিয়া আজ

যমুনাতীরে ফকীরবেশে চন্দ্রালোক সেবন করিতেছেন, ইহা বোধ হয় হিন্দু-ধর্ম্মের পক্ষে গৌরবজনক নহে।"

বনমালী খাঁর স্মৃতিপথ উদ্‌ঘাটিত হইল। একের উপর অন্য ঘটনা রুদ্ধ দ্বার দিয়া তীব্রবেগে মানসপটে ছুটিতে লাগিল। বনমালী ভাবিল, "এই ভুবনমোহিনী কমরুন্নিসা আমারই অভাগিনী পত্নী?"

শৈশবকালের সেই এক দিনের দেখা, তখন কে দেখিয়াছিল? কিন্তু যৌবনের প্রবলবাত্যায় স্বামীর একমাত্র কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিস্মৃত! কি ঘৃণাকর!

বনমালীর চক্ষে জল আসিল।

মেহের ডাকিল, "কমরু! এ দিকে আয়!"

সুকুমারী আসিলে মেহের তাহাকে বনমালীর করে সঁপিয়া দিল।

মেহের বলিল, "বনমালী, তুমি হিন্দু; কিন্তু সুকুমারী জানিত, তুমি মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ। সুকুমারীর জাতি যায় নাই। সে আমার অন্তঃপুরে থাকিলেও শুদ্ধাচারিণী, এবং হিন্দু ব্রাহ্মণীর হাতে খায়। কিন্তু তুমি তাহাকে মুসলমানী বলিয়া জানিয়াছ, এবং সেই মুসলমানীর রূপ অনিমেষনয়নে এক প্রহর পূর্ণিমানিশীথিনী ধরিয়া দেখিয়াছ। সুকুমারী তোমার জন্য মুসলমানী হইতে চাহিয়াছিল, তুমি সুকুমারীর জন্য মুসলমান হইতে পার?

৯

মেহেরজান্ আবার বলিল, "আমার স্বামীর আদেশ, তোমরা মুসলমান হইলে এই বিস্তীর্ণ জায়গীরের অর্দ্ধাংশ তোমাদিগের বিবাহে—যৌতুকস্বরূপ প্রদত্ত হইবে।"

বনমালী। আমি ধন দৌলত চাহি না।

মেহের। জানি, তুমি নিজে কিঞ্চিৎ ধনী এবং মৌখিক ফকীর। তোমাদের খাদ্য অতি হীন, কিন্তু ব্যাকরণটা অতি কঠোর। আমি তোমাদের দেব-ভাষার কথা বলিতেছি। লঘু আহারে গুরু ভাষা উচ্চারণ করিয়া তোমরা শরীর শীর্ণ করিয়া ফেল।

বনমালী। আচ্ছা, ব্যাকরণটা বাদ দিলে হইতে পারে।

মেহের। আর একটি কথা; সুকুমারীকে ইরাণের পোলাও রন্ধন করিতে শিখাইয়াছি। তুমি মধ্যে মধ্যে পরীক্ষা করিও। আমাদিগের দেশে সৌন্দর্য্যবিকাশ করিবার সহস্র প্রথা আছে। আমাদিগের ধর্ম্মের মূলে প্রেম,

কিন্তু হস্তে তরবারি। তোমরা স্বার্থপর; প্রেমটাকে উড়াইয়া অদৃষ্টের মাথায় স্থাপন করিয়াছ। দাসত্বই তোমাদিগের সোজা পথ। বনমালী! প্রেমের দাস হওয়া ভাল, না স্বার্থের দাস হওয়া ভাল?

বনমালী। আমরা বাঙ্গালী। আমাদিগের ভাষা, খাদ্য ও পরিচ্ছদ ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। হয় ত কোন কালে ধর্ম্মেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। আমরা চিরকালই স্বার্থের দাস।

মেহের। তোমাদিগের শাস্ত্রে প্রেমের দাসকে "স্বামী" কহে না?

বনমালী। বোধ হয়।

মেহের। আজ আমার অনুরোধ, তুমি কমরুন্নিসার যথার্থ স্বামী হও। তোমরা মুসলমান হইলে একটা বিবাহের ঘটা দেখিতাম; কিন্তু বোধ হয় এখন তোমরা কেহই মুসলমান হইতে চাহিবে না।

বনমালী। না।

মেহেরজান্ উভয়ের দিকে সকরুণদৃষ্টে ক্ষণকাল চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। যমুনাসৈকত নিস্তব্ধ। শৈশবের বিবাহবাসরবদ্ধ বালক-বালিকা যৌবনের যুগলমিলনে চন্দ্রাতপতলে দাঁড়াইয়া ছিল। সুকুমারী ঈষৎকম্পিত স্বরে বলিল,

"আমার একটি অনুরোধ আছে; বল, রাখিবে।

বনমালী। কি?

সুকুমারী। আমরা মুসলমান হইয়া যাই।

বনমালী। অর্থের লোভে?

সুকুমারী। না; কৃতজ্ঞতার পাশে বদ্ধ হইয়া। নাথ! স্নেহমমতাই জীবনের ধর্ম্ম। যাহারা আমাদিগকে ভালবাসিয়াছে, তাহাদেরই অন্তরে ভগবান্‌কে দেখিতে পাইব—সেই স্বর্গের স্থির পথ।

সহযোগী সাহিত্য।

জাপানের জনসাধারণ।

রুস জাপান যুদ্ধের পর হইতে জাপানের জনসাধারণের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য জানিবার জন্য সমস্ত ইউরোপীয় জাতির কৌতূহল অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এত দিন ইউরোপীয়েরা জাপানকে অর্দ্ধসভ্য জাতি বলিয়াই জানিতেন। চীন-জাপান সমরের পর জাপানের প্রতি অনেক ইউরোপীয় জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল বটে,—কিন্তু তখনও ইউরোপীয়েরা জাপানকে অর্দ্ধ-সভ্য বলিয়া ঘৃণা ও উপহাস করিতেন। তখন ইউরোপীয়েরা অবশ্য বুঝিয়াছিলেন যে, চীন প্রভৃতি প্রাচ্য রাজ্য লইয়া ইউরোপীয় রাজনীতিবিশারদগণ বিষম সমস্যায় পতিত হইবেন। কিন্তু তাঁহারা কখনই মনে করেন নাই যে, জাপান, ক্ষুদ্র সাগরবেলায় বেষ্টিত জাপান—রুসের ন্যায় কোনও ইউরোপীয় জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ধরাবক্ষে আপনাদের বিজয়কেতন উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবে। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে হেরল্ড ই. গষ্ট নামধেয় জনৈক ইংরেজ মহাচীন সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন, ঐ পুস্তকখানি তদানীন্তন ইউরোপীয় সমাজে সবিশেষ আদৃত হইয়াছিল। শ্রীযুত গষ্ট এই পুস্তকের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ;—'জাপানের অসাধারণ দ্রুত উন্নতি দর্শনে কেহ কেহ একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা বলেন যে, অচিরকালমধ্যে জাপান প্রাচ্য খণ্ডে গ্রেট বৃটেনের ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিবে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপান যে কেবল ইংরেজ জাতির ব্যবসায় বাণিজ্যের হন্তা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা নহে; কালে জাপান উক্ত মহাসাগরে ইংরেজকে শক্তিধর জাতিরূপে তিষ্টিতেই দিবে না। আমাদের নিকট এই মতটা অমঙ্গল-বাদীদিগের মত বলিয়া উপেক্ষাযোগ্য মনে হয়। জাপানীদিগের এই নবার্জ্জিত সভ্যতা সামান্য বহিরাবরণমাত্র। চীন-জাপান সমরে জাপানী সেনার সমর-শিক্ষার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি জাপানী সেনানীগণের যুদ্ধ-বিদ্যারও সম্যক পরীক্ষা হয় নাই। কতকগুলি অর্ব্বাচীন অশিক্ষিত চীন সেনার সহিত যুদ্ধ না করিয়া জাপান যদি কোনও সুশিক্ষিত ইউরোপীয় সেনার সহিত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে জাপানী সেনা এক মুহূর্ত্তের জন্যও যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্টিতে পারিত না। জাপানের নিকট ইহা ভিন্ন আর কিছুর আশা করা যায় না। এক দিনেই রোম নগরী গঠিতা হয় নাই। ইউরোপ বহু শতাব্দীর চেষ্টা ও পরিশ্রমে যে উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে, জাপানীদের জাতীয় প্রতিভা কোনও মতেই এক পুরুষে সে উন্নতিলাভে সমর্থ হইতে পারে না।' বলা বাহুল্য, পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতে দেখা গিয়াছে যে, প্রাচ্যজাতিগণ যুগযুগান্তর ধরিয়া যে সভ্যতালাভ করিয়াছে, প্রতীচ্য জাপান,—এক পুরুষেও নয়—কয়েক বৎসরেই সেই সভ্যতা অনায়াসেই শিখিয়া লইয়াছে। এই ব্যাপারে সমগ্র ইউ-রোপ অবশ্য বিস্ময়ে অভিভূত। জাপান সম্বন্ধে সকল তথ্য জানিবার জন্য সমগ্র ইউরোপীয় জাতি

উৎসুক। জাপানের তথ্য লইয়া সর্ব্বদেশের সহযোগী সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিতেছে। সম্প্রতি এচ. ডি. মণ্টগোমরী নামক জনৈক ইংরেজ সাহিত্যিক The Empire in the East নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে জাপানী জনসাধারণের কথা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। T. P. স্বাক্ষর করিয়া এক জন ইংরেজ লেখক T. P. O. Weekly নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে জাপানী জনসাধারণ সম্বন্ধে অনেক তথ্যের আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও নিম্নে জাপানী জনসাধারণ সম্বন্ধে কয়েকটি কথার আলোচনা করিলাম।

জাপানীদের খাদ্য।

জাপানে সাধারণ লোকের খাদ্য অতি সামান্য। বাৎসরিক দেড় শত টাকা আয়ে এক জন জাপানী অনায়াসেই তাহারা পরিবার-প্রতিপালনে সমর্থ হয়। সাধারণ জাপানীরা ভাত, মাছ ও সামান্য তরকারী ও চা খাইয়া জীবনধারণ করে। দিনের মধ্যে উহারা অনেকবার চা পান করে। ইহা ভিন্ন জাপানীরা ঘন ঘন তামাক খাইয়া থাকে। এই সামান্য আহারেই জাপানীরা সুস্থকায় ও বলবান হইয়া থাকে। অনেকে মনে করেন যে, মাংস না খাইলে বুঝি দেহের বল ও মনের সাহস বৃদ্ধি পায় না। এ কথাটা সাধারণতঃ সত্য নহে। নিরামিষ ভোজনে মানুষকে ধীর, কোমলপ্রকৃতি ও অল্পে তুষ্ট করে। জাপানের জনসাধারণ সেই জন্য ধীর, শান্ত, কোমলস্বভাব ও স্বল্পে সন্তুষ্ট! আমাদের দেশের লোকেরাও অনেকটা ঐরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট। কার্য্য অনুসারে মানুষের আহার্য্য পরিবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, এ কথা জাপানীরা বিলক্ষণ বুঝে। যুদ্ধের সময় জাপানী সেনাদিগকে যথেষ্টপরিমাণে মাংস খাইতে দেওয়া হইত। শুনা যায়, যুদ্ধের সময় জাপানী সেনাদলে 'বেরী বেরী' রোগ দেখা দিয়াছিল। কাজেই জাপানী সমর-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া সেনাদলে মাংস দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সাধারণ জাপানীরা বাঙ্গালীর মত মাছ-ভাত খাইয়াই জীবনধারণ করে। অত্যন্ত দারিদ্র্য নিবন্ধন তাহারা প্রায়ই আর কিছু খাইতে পায় না।

বাসভবন।

জাপানীদের বাসগৃহ অতি সুন্দর। সামান্য কুটীর অপেক্ষা সাধারণ লোকের বাসভবন একটু উন্নত। ইহাদের ঘরে প্রাচীর নাই। গ্রীষ্মকালে তেলা কাগজের পরদাই দেওয়ালের কাজ করে। ঐ পরদাগুলি ইচ্ছামত উঠাইতে ও নামাইতে পারা যায়। হাওয়া খাইতে ইচ্ছা হইলে জাপানীরা ইচ্ছামত ঐ পরদাগুলি উঠাইয়া দেয়। ঘরের কামরাগুলিও দেওয়ালের দ্বারা বিভক্ত নহে। শোজি বা তৈলাক্ত কাগজের পরদা দ্বারা কামরাগুলি প্রয়োজনমত বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। ঐ কাগজগুলি একটু শক্ত। সুতরাং সহজে ভিন্ন হয় না। পরদাগুলি প্রয়োজনানুসারে সরাইয়া বা গুটাইয়া রাখা যাইতে পারে। শীত-কালে বাহিরে কাঠের পরদা করিয়া লওয়া হয়। সেগুলিও ইচ্ছামত গুটাইয়া বা সরাইয়া লওয়া যাইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা আছে। জাপানীরা মুক্ত বায়ু বড় ভালবাসে। তাই তাহারা ইচ্ছানুসারে ঘরের সমস্ত দেওয়াল সরাইয়া ফেলিয়া স্বাধীনভাবে স্বাধীন বায়ু সেবন করে। কাগজের বা কাঠের প্রাচীর সরাইয়া লইলে ঘরখানির কেবল কাঠের সাজটুকু দাঁড়াইয়া

থাকে। অর্থাৎ, উপরের আচ্ছাদন, নীচের মেঝে ও কয়েকটি খুঁটী ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। উপরের আচ্ছাদনও কাঠের, মেজেও কাঠের। সাধারণতঃ কর্পূর কাঠের খুঁটী প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। ঐ সকল কাঠের উপর কোনও রকম রং দেওয়া হয় না। সেগুলি দেখিতে কিন্তু বড়ই সুন্দর। মণ্টগোমরী তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড বা আয়র্লণ্ডের গরীব লোক যেরূপ কুটীরে বাস করে, তাহার তুলনায় জাপানের সেই কাগজের ঘর সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট। অতি পূর্ব্বকালে জাপানে 'আইনো' নামক এক জাতীয় অসভ্য লোক বাস করিত। অনেকে মনে করেন, উহারাই জাপানের আদিম অধিবাসী। এখন যেসো দ্বীপে অনেক আইনো দৃষ্ট হয়। কোনও কোনও ইউরোপীয় মনে করেন, অসভ্য আইনোদিগের নিকট উটজ-নির্ম্মাণ-কৌশল শিক্ষা করিয়া জাপানীরা এখন তাহার কথঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিয়াছে। এ কথা কত দূর সত্য, তাহা বলা কঠিন। ইউরোপীয়গণ স্বভাবতঃই অন্য জাতিকে অসভ্য বলিয়া ধরিয়া লইয়া থাকেন। পরে সেই কুসংস্কারকলুষিত নয়নে তাহাদের যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহাই তাঁহাদের নিকট অসভ্যতাদ্যোতক বলিয়া মনে হয়। জাপানীরা অত্যন্ত দরিদ্র। কেবলমাত্র ভারতবাসী ভিন্ন জাপানীদিগের অপেক্ষা অধিকতর দরিদ্র জাতি সভ্য-জগতে আর নাই। এরূপ স্থলে সামান্য অর্থব্যয়ে তাহারা যে ভাবে বাসভবন প্রস্তুত করে, তাহা স্বাস্থ্যরক্ষার হিসাবে অনেক সভ্যতাভিমানী জাতির দরিদ্র-পরিবারের গৃহ অপেক্ষা বহুগুণে উৎকৃষ্ট,—এ কথা অনেক ইউরোপীয়ই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। জাপানীদিগের পক্ষে একটা কথা বলিবার আছে। উষ্ণপ্রধান দেশেই এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর বাসভবন নির্ম্মাণ সম্ভবে। বিশেষতঃ জাপানে ভূমিকম্পের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। সেই হেতু জাপানীরা দৃঢ় বহুদিনস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহে না। স্কটলণ্ড, জর্ম্মনী প্রভৃতি দেশের ন্যায় জাপান হিমানীপ্রধান দেশ নহে বটে, কিন্তু জাপানের স্থানে স্থানে শীতের আধিক্য নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু সেই হিমানীপ্রধান, করকাপাতবহুল অঞ্চলেও জাপানীরা অল্প অর্থব্যয়েই এইরূপ সামান্য কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। প্রকৃত কথা,—অভাবই উদ্ভাবনার মূল। জাপানের জনসাধারণ নিতান্ত অভাবগ্রস্ত। অর্থাভাবে তাহারা দৃঢ় ও স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণে অশক্ত। ভূকম্পে একবার যদি গৃহ ভগ্ন হয়, তাহা হইলে সে ক্ষতির পূরণ তাহাদের পক্ষে সহজসাধ্য নহে। অগত্যা তাহারা এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হয়।

আসবাব।

দরিদ্র জাপানীদের গৃহের আসবাবের কথা বলিতে হইলে, দরিদ্র ভারতবাসীর কথাই মনে পড়ে। রন্ধনের ও ভোজনের জন্য নিতান্ত আবশ্যক কয়েকটি পাত্র ভিন্ন সাধারণ জাপানীদের অন্য কোনও তৈজসপত্র নাই বলিলেও চলে। জাপানীরা মেজের উপরই নিদ্রা যায়। মেজে অবশ্য 'ম্যাটিং'করা। তাহার উপর সামান্য লেপ বিছাইয়াই তাহারা শয়ন করে। ঐ লেপ অনেকটা এ দেশী কাঁথা বা কম্বারই মত। কোনও কোনও গৃহস্থের ঘরের প্রাচীরে এক একখানি ছবি আছে। জাপানীরা উহাকে 'কাকিমেনো' বলে। আলোকের জন্য চীনে-লণ্ঠনের মত এক প্রকার লণ্ঠন ব্যবহৃত হয়। উহার ভিতর একপ্রকার 'বেণা'-নির্ম্মিত বাতি জ্বলে। দুর্ভাগ্যক্রমে ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে আসিয়া এখন অনেক জাপানী কেরোসিনের আলো ব্যবহার

করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে খরচ অনেক অধিক। ইহা ভিন্ন কাগজ ও কাঠের ঘরে কেরোসিন হইতে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু ইউরোপীয় সভ্যতার এমনই মায়া যে, উদ্ভ্রান্ত জাপানীরা যে বর্ত্তমান ব্যয়াধিক্যই তাহাদের দারিদ্র্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ, তাহা বিস্মৃত হইতেছে। এখন যুবক জাপানীদের মধ্যে আসবাবের ব্যবহার কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, তবে তাহারা চক্ষুষ্মান জাতি, সেই জন্য তাহারা আমাদের মত একবারে উৎসন্নে যাইতে বসে নাই।

বাগান ও বাগিচা।

জাপানীরা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একান্ত অনুরাগী। স্বভাবে যাহা কিছু সুন্দর, তাহাই তাহাদের চিত্ত হরণ করে। বালভানুর স্বর্ণরশ্মি, অস্তগমনোন্মুখ তপনের ম্লান কিরণ, মেঘশূন্য নীল নভোমণ্ডল, নীলাম্বরে পূর্ণ শশধরের প্রাণোন্মাদী হাসি, প্রান্তর কান্তার অটবীর স্বাভাবিক শোভা দেখিলে তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যায়। ফুল জাপানীদিগের অতি প্রিয় বস্তু। সেই জন্য প্রত্যেক জাপানী তাহার গৃহের চারি দিকে ফুল ফলের উদ্যান করিয়া রাখে। অতি সামান্য দুঃস্থ পরিবারের গৃহের চারি পার্শ্বেও তাহারা সামান্য একটু প্রমোদ-উদ্যান রাখিবেই রাখিবে। এই উদ্যানে সামান্য একটি কৃত্রিম সরোবর, ছোট ছোট ফুলগাছ সারি সারি সজ্জিত। অনেক গাছ কাটিয়া ছাঁটিয়া পশু পক্ষীর আকারে গঠিত; ইউরোপীয়গণের দৃষ্টিতে এইরূপ উদ্যান ভাল বলিয়া বোধ না হইতে পারে,—কিন্তু নিসর্গশোভা-উপভোগে সমর্থ জাপানীদিগের ক্লান্তি-অপনোদনের ইহাই প্রধান সহায়।

স্বভাব ও চরিত্র।

জাপানীরা শান্ত, শিষ্ট ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। অতি সামান্য লোকের শিষ্টাচার দেখিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও জাতির মধ্যে শিষ্টাচারের এরূপ পরাকাষ্ঠা দেখা যায় না। এই গুণটি যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জাপানীদের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি জগতে অতুলনীয়। সন্তান সকল অবস্থাতেই পিতা মাতার ছায়ানুবর্ত্তী। জাপানীরা বিলাসী নহে। বিলাসের দিকে তাহাদের হৃদয় আদৌ আকৃষ্ট হয় না। সুখাদ্য খাইব,—সুপেয় পান করিব, উৎকৃষ্ট বাসভবনে বাস করিব—এরূপ ইচ্ছা জাপানীদের মনে আদৌ উদিত হয় না। আমাদের মনে হয়, জাপানীরা কর্ম্মফল ও অদৃষ্টে বিশ্বাস করে। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব। ইহাদের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, স্বদেশভক্ত জাতি জগতে অতি বিরল। ইহারা প্রকৃতই জীবনের সুখ উপভোগ করিতে জানে। সামান্য অবস্থায় মুক্ত আকাশে,—মুক্ত বাতাসে ইহারা আনন্দে গদ-গদ হয়। একান্ত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অকৃত্রিম স্বদেশভক্তিই এই জাতির উন্নতির কারণ। জাপানীদের সহিত ভারতবাসীর অনেক বিষয়ে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান। তবে যে দুইটি গুণের জন্য জাপান এত উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে,—বর্ত্তমান ভারতে সেই দুইটি গুণেরই অত্যন্ত অভাব। সেই জন্যই এই দুই জাতির পার্থক্য এত অধিক।

সাহিত্য, ১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পান্থ।

১

১

তখনো উঠেনি বঙ্গে তীব্র হাহাকার ;
নহে শূন্য স্বর্ণপ্রসূ বঙ্গের ভাণ্ডার,—
তখনো বঙ্গের শোভা পল্লী রাজে মনোলোভা ;
ক্বচিৎ বহিছে বঙ্গ নগরের ভার,
ধূলি-ধূম-জনারণ্য—জঞ্জাল ধরার।

২

তখনো বঙ্গের মুখ নহে অন্ধকার,
উর্ব্বর ভূমিতে ফলে স্বর্ণশস্যভার ;
লৌহবর্ত্ম ব্যাপ্ত জালে বদ্ধবারি বিল খালে
করিয়া তুলেনি দেশ রোগের আগার,—
পল্লীবাসী নহে শীর্ণ কঙ্কাল-আকার।

৩

তখনো তুলেনি ধনী পল্লীর আবাস ;
পল্লীভরা, সুখ, শান্তি, আনন্দ, উল্লাস ;
ত্যক্ত হর্ম্ম্য-বক্ষ 'পর স্বেচ্ছাসুপ্ত বিষধর
রহে না ; নীরব নহে মানবের ভাষ ;
জন্মে না প্রাসাদশিরে বৃক্ষ, লতা, কাশ।

৪

সমৃদ্ধ গ্রামের প্রান্তে দরিদ্র ব্রাহ্মণ
পথিপার্শ্বে পান্থশালা করিল স্থাপন ;
অদূরে তটিনী ; তা'র স্নিগ্ধ-স্বচ্ছ জলধার
সুনীল গগন তরে রচিছে দর্পণ ;—
নদীকূলে বৃক্ষদলে বিহগ-কূজন।

৫

মিষ্টভাষী ব্রাহ্মণের শিষ্ট ব্যবহার,
তুষ্ট পান্থ আসে সদা আগারে তাহার ;
মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডপ্রায় সৌভাগ্য উজ্জলভায়,—
সঞ্চয়ে সঞ্চয় বাড়ে—দশ বর্ষে তা'র।
বিবাহ করিল দ্বিজ, পাতিল সংসার।

৬

মধুরভাষিণী পত্নী—সৌভাগ্য যেমন,—
গৃহে লক্ষ্মীস্বরূপিণী—দ্বিতীয় জীবন ;
জীবিকার শ্রম-শ্রান্তি প্রণয়ে সকল শান্তি ;
দেখিতে দেখিতে—যেন সুখের স্বপন
পঞ্চ বর্ষ গেল কাটি'—আনন্দে মগন।

৭

সমুদিত সৌভাগ্যের তরুণ তপন—
পঞ্চ বর্ষ পরে তা'র জন্মিল নন্দন,
অধরে মধুর হাস, অস্ফুট অমিয় ভাষ—
বাড়িতে লাগিল শিশু—নয়ন-রঞ্জন—
জনকের জননীর সাধনার ধন।

৮

গত আর পঞ্চবর্ষ ; সৌভাগ্য-তপন
তখনো করেনি তা'র তেজ-সংহরণ ;
সহসা অদৃষ্টাকাশে অকাল-জলদ আসে ;
বিদারে বিদ্যুৎবহ্নি মসীর বরণ,—
লুপ্তস্মৃপ্তি প্রতিধ্বনি—গভীর গর্জ্জন।

২

১

ব্রাহ্মণী দারুণ জ্বরে শীর্ণ কলেবর
প্রসবিলা মৃত পুত্র পঞ্চবর্ষ পর ;—

চিকিৎসায়—শুশ্রূষায় জ্বর আর নাহি যায়,
ব্রাহ্মণ চিন্তিত সদা—শঙ্কিত অন্তর।
ত্যজিল রামার প্রাণ নশ্বর পিঞ্জর।

২

আসিল আত্মীয়গণ—বিরসবদন—
শ্মশানে লইল শব, করিল রচন
চিতা শুষ্ক কাষ্ঠে সবে, স্থাপিত করিল শবে
ধৌত করি', পরাইয়া নূতন বসন—
সীমন্তে সিন্দূর শোভে—প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ।

৩

বিনামেঘে বজ্রাঘাতে স্তম্ভিত ব্রাহ্মণ
দিবানিশি অশ্রুধারা করে বিমোচন;
কাঁদে পুত্র মাতৃহারা, বহে তপ্ত অশ্রুধারা,
পিতার হৃদয়ে তাহে দ্বিগুণ যাতনা—
বক্ষে চাপে বারবার—আর্দ্র দু' নয়ন।

৪

কাঁদি' কাটে দীর্ঘ দিন—বিনিদ্র শয্যায়
দীর্ঘতর নিশা। বর্ষচক্র ঘুরি' যায়।
শোকবহ্নি হৃদি দহে, লোকে কত কথা কহে,
নূতনে সে পুরাতনে পা'বে দুরাশায়
কুক্ষণে বিবাহ করে দ্বিজ পুনরায়।

৫

কি দুরাশা! যে যায়, সে নাহি ফিরে আর—
শুধু স্মৃতি রাখি' যায় হৃদয়-মাঝার।
সে ছিল জীবনে সুখ, সন্তোষ-প্রফুল্ল মুখ;
এ অশান্তি—অসন্তোষ; কথা ক্ষুরধার,
জ্বালার উপর জ্বালা জ্বালে অনিবার।

৬

প্রাণপ্রিয় নন্দনের নিত্য অযতন,
নিয়ত কলহ, সদা নিষ্ঠুর বচন;

সে যে ছিল পৌর্ণমাসী, বিমল রজত হাসি,
এ যে চির অমানিশি—আঁধারে মগন!
গৃহ সুখশান্তিহীন—নরক যাতন।

৭

দুর্ঘটন আসে যবে পুঞ্জ পুঞ্জ আসে
সজল জলদ সম বরষা-আকাশে;—
ক্রোশমাত্র ব্যবধানে বিদেশী বণিক আনে
লৌহবর্ত্ম—আপনার বাণিজ্যের আশে;
ক্বচিৎ পথিক আসে পূর্ব্ব পান্থবাসে।

৮

নবপথে গতায়াত করে যাত্রি দল;
সঙ্কীর্ণ আয়ের পথ—ব্রাহ্মণ বিকল!
ছিদ্র কুম্ভে বারিপ্রায় সঞ্চয় ফুরায়ে যায়,
দারিদ্র্যে সংসারে বাড়ে অশান্তি কেবল;
কমলার কৃপা, হায়, নিয়ত চঞ্চল!

৩

১

আরো পঞ্চবর্ষ গত; স্বচ্ছন্দ সংসারে
দারিদ্র্যের দুঃখ-স্রোত পশে শতধারে;—
ধনীর বিলাস-আশ ব্রাহ্মণীর অভিলাষ,
দুরাশার স্বপ্ন তা'র হৃদয়-মাঝারে,
ব্রাহ্মণ পড়িল যেন অকূল পাথারে।

২

শত দুঃখে শান্তি তবু লভিত ব্রাহ্মণ—
হেরি' মাতৃপ্রতিচ্ছবি সুশীল নন্দন;
হা অদৃষ্ট! দেবতার সহে না সহে না আর
সে ক্ষুদ্র সৌভাগ্য তা'র, সহে না যেমন
জলদ কমল-দলে তপন-কিরণ।

৩

বিমাতার অত্যাচার—নিষ্ঠুর বচন
বালক নীরবে সহে—প্রফুল্ল-আনন ;
নিকটে যে বিদ্যালয় সেথা পাঠ শেষ হয়,
বালক পিতারে কহে, করিবে গমন
নগরে—করিতে বিদ্যা অর্থ উপার্জ্জন।

৩

ব্রাহ্মণ পুত্রের কথা শুনিল সকল ;—
বিচ্ছেদের কথা ভাবি' আঁখি ছল-ছল ;—
বিচারিল বহুবার, শেষে স্থির হ'ল তা'র—
পিতৃস্নেহ হ'তে বড় পুত্রের মঙ্গল ;
ব্রাহ্মণ করিল শান্ত হৃদয় চঞ্চল।

৫

ব্রাহ্মণী প্রস্তাব যবে করিল শ্রবণ
অন্ধকার হ'ল তা'র আঁধার আনন,—
চিররাহুগ্রস্ত শশী আবো যেন হ'ল মসী ;
পশুসম কে করিবে কার্য্য অনুক্ষণ,—
নীরবে সহিবে তা'র দুষ্ট আচরণ ?

৬

প্রণমিয়া বিমাতার—পিতার চরণে
বালক বিদেশে একা যায় শুভক্ষণে ;
পিতার নয়ন 'পরে অশ্রু ছলছল করে,
যত দূর দৃষ্টি যায় তৃষিত নয়নে
হেরে পুত্রে ; অরুন্তুদ জ্বালা জ্বলে মনে।

৭

দিন যায়, মাস যায়, বর্ষ চলি' যায় ;—
চারি বর্ষ গেল কাটি' জলস্রোত প্রায় ;—
দারিদ্র্য যাতনা ভার যেন নাহি সহে আর,
ব্রাহ্মণ ব্যাকুল ভাবি', কি হ'বে উপায় ?
চাহে পুত্রপথপানে আকুল আশায়।

৮

ব্রাহ্মণী কঠোর-হৃদি, নানা গঞ্জনায়
ক্রমে তা'র পূত চিত্তে কল্মষ মিশায়;
অতিথি আসিলে তা'রে ভুলাইয়া ব্যবহারে,
ধন তা'র আত্মসাৎ করিবারে চায়;
পাপ পুণ্য ভুলে দ্বিজ জঠর-জ্বালায়।

৪

১

পশ্চিম গগনে রবি, সন্ধ্যা হয় হয়;
প্রবেশিল গ্রাম মাঝে ব্রাহ্মণতনয়;
বিস্মিত চৌদিক দেখি', মনে মনে ভাবে,—এ কি?
দেখেছে যে গ্রামখানি সমৃদ্ধি-সময়,
এবে পরিত্যক্ত পল্লী হেন মনে লয়!

২

যেথায় ধনীর গৃহে সরোবরতীরে
সন্ধ্যায় মৃদঙ্গধ্বনি উঠিত গম্ভীরে,
গলিত-গবাক্ষ-পথে প্রবেশিছে কোনমতে
লূতাতন্তুজাল ভেদি' রবিকর ধীরে,
শত ছিদ্র শুদ্ধান্তের বেষ্টন-প্রাচীরে!

৩

যেথায় প্রমদাকুল—কমলের প্রায়
আসিতা স্নানের ত'রে প্রভাতে—সন্ধ্যায়,
সে সরে শৈবালদল, জলে ভ্রম হয় স্থল,
সোপান পড়িছে ভাঙ্গি', চাঁদনী লুটায়,—
উপবনে কাশতৃণ—শৃগাল বেড়ায়;

৪

নাহি চারু অলঙ্কারে মধুর শিঞ্জন;
চঞ্চল অঞ্চল মাঝে না খেলে পবন;

অলকে-সুরভি-ভার,　　নাহি ছায় চারিধার ;
আছে শুধু তরুশাখে বিহগ-কূজন—
হত পূর্ব্বগৌরবের কেতন যেমন।

ভূস্বামীর গৃহে—যেথা দিবা বিভাবরী
ছিল নিত্য কলরব গৃহ পূর্ণ করি',—
কত লোক যায়, আসে, কথা কহে, ডাকে হাসে ;
নীরব সে গৃহ : শুধু দুর্ব্বল প্রহরী
রক্ষা করে রুদ্ধদ্বার দস্যুভয়ে ডরি'।

গৃহের সংলগ্ন যেথা ছিল উপবন,
নানাবর্ণ পত্রপুষ্পে নয়ন রঞ্জন,
সেথা শোভা নাহি আর,　　শুষ্ক কুঞ্জ—ভগ্ন দ্বার,
অযত্নে বাড়িছে শুধু ছার গুল্মবন,
সন্ধ্যা না হইতে সেথা শ্বাপদ-গর্জ্জন।

রাজপথে জন্মিয়াছে শ্যাম তৃণদল,
বিরল-পথিক পথে পথিক দুর্ব্বল,
রোগজীর্ণ শীর্ণকায়　　প্রেতলোকবাসী প্রায়
শ্রান্তকায় গৃহে যায় চরণ চঞ্চল,
সন্ধ্যা না হইতে টানে কপাটে অর্গল।

গোপাল ফিরিছে ঘরে অস্থিচর্ম্মসার,
দিনান্তেও নাহি জুটে অপূর্ণ আহার।
ছিল যেথা স্বাস্থ্য, সুখ,　　উল্লাস-প্রফুল্ল মুখ,
সে দেশ ধরেছে এবে শ্মশান-আকার ;—
বহিছে শ্রীহীন পল্লী বিষাদের ভার।

১

ক্রমে যুবা উপনীত পান্থশালাদ্বারে ;
বিস্মিতনয়নে তা'র দুর্দ্দশা নেহারে ;—
নাহি গোলা, ভিত্তি'পর তৃণগুল্ম, জীর্ণ ঘর ;
শৈবালব্যথিতগতি শীর্ণ জলধারে
বহে ও কি সেই নদী ?—হৃদয়ে বিচারে।

২

ধীরে ধীরে রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে,
উত্তরিল বামাকণ্ঠ কিছুক্ষণ পরে ;
দেখে যুবা আঁখি তুলি', ধীরে রুদ্ধ দ্বার খুলি'
আসিয়া বিমাতা তা'র দীপ লয়ে করে,—
জিজ্ঞাসিলা পরিচয় পরিচিত স্বরে !

৩

বিমাতা চিনিতে নারে ! কৌতুক অন্তরে,
যুবক ভাবিল, দেখি—জনক কি করে ?
দিল নিজ পরিচয়,— দ্বিজের আত্মীয় হয় ;
আসন যোগান রামা বিশ্রামের তরে,
কহিলা, বিলম্বে দ্বিজ ফিরিবেন ঘরে।

৪

ব্রাহ্মণী রন্ধনগৃহে করিল গমন ;
কিছুক্ষণ পরে আসি' করিল দর্শন—
উপবাসে শ্রমে শ্রান্ত ঘুমায়ে পড়েছে পান্থ ;—
নিঃশব্দে কুঞ্চিকা-গুচ্ছ করিয়া হরণ
অভ্যস্ত নৈপুণ্যে করে পেটিকা মোচন।

৫

রৌপ্যমুদ্রারাশি হেরি' জ্বলে দু' নয়ন—
সে অর্থ যেরূপে হ'ক করিবে গ্রহণ ;

মুদ্রা-থলি লয়ে' করে পেটিকায় রুদ্ধ করে'
ত্যজে কক্ষ সাবধানে, নিঃশব্দ চরণ,
তীব্র বিষ লয়ে' করে আহার্য্যে মিশ্রণ।

৬

আহার্য্য সজ্জিত করি' ডাকিল যুবায় ;
ক্ষুধিত আননে অন্ন নিমেষে মিলায়,—
আসন ত্যজিয়ে উঠি', ভূমিতে পড়িল লুটি',
শরবিদ্ধ পক্ষী প্রায় পড়িয়া ধরায়
ছট্‌ফট্‌ করে যুবা মৃত্যু-যন্ত্রণায়।

৭

চাঞ্চল্য ফুরায় ক্রমে,—মুদে দু' নয়ন,—
সর্ব্ব যাতনার শান্তি আসিল মরণ ;—
ব্রাহ্মণী দাঁড়ায়ে পাশে পিশাচীর হাসি হাসে,
ধরায় পতিত হেরি' তরুণ তপন ;—
বস্ত্র আনি' করে সেই শব আচ্ছাদন।

৮

একা নারী শূন্য গৃহে শব রক্ষা করে,
নরকের অগ্নি তার হৃদয়-ভিতরে,
নিকটে অশ্বত্থ-শাখে পেচক গভীরে ডাকে,
ঝিল্লীমন্দ্র রজনীর নিস্তব্ধতা হরে ;
ক্রমে রাত্রি বাড়ে, চাঁদ মাথার উপরে।

৯

গভীর নিশিতে ফেরে আলয়ে ব্রাহ্মণ ;
ব্রাহ্মণী কহিল সব, করিল শ্রবণ,—
মুহূর্ত্ত হৃদয়তলে বিবেক-দংশন জলে,
মুহূর্ত্তে মিলায়ে গেল দংশন-যাতন ;
করে পরামর্শ দোঁহে—কি করে এখন ?

২

শেষে স্থির হ'ল—দোঁহে শব বহি' লয়ে
কিছু দূর, বিসর্জ্জিবে তটিনী-হৃদয়ে :—
নিস্তব্ধ গভীর রাত্রি, পথে নাহি চলে যাত্রী,
পশ্চাতে গ্রামের লোক শ্বাপদের ভয়ে
অর্গল করেছে রুদ্ধ যে যা'র আলয়ে।

৩

কোথা অর্থ? জিজ্ঞাসিল ব্রাহ্মণ বামারে ;
ব্রাহ্মণী আনিল থলি—পূর্ণ অর্থভারে ;—
হেরে দ্বিজ অর্থরাশি, মুখে ফুটে উঠে হাসি ;
এত অর্থ! ফিরি' ফিরি' চাহে বারে বারে—
এ যেন সুখের স্বপ্ন দুঃখের সংসারে!

৪

শব লয়ে বাহিরিল ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।
বিমল জ্যোছনা-রাতি,—রজত কিরণ।
নিশার অঞ্চল হেন ভূমিতে লুটায় যেন,
গগনে পলকহীন তারার নয়ন
স্তম্ভিত,—এ পাপ বুঝি করিছে দর্শন।

৫

হেরে দ্বিজ চারি দিক, কেহ নাহি আর ;
তবুও কম্পিত হৃদি শঙ্কায় তাহার,—
চমকিয়া চাহে শুধু— শূন্য পথ করে ধূ ধূ,
সে যেন পশ্চাতে শুনে পদধ্বনি কা'র,—
পত্র মরমর যেন কণ্ঠস্বর তা'র!

৬

কোথাও পথের ধারে তরুর শাখায়
ঘনীভূত অন্ধকার বিকট দেখায়,—
কোথা অনাহতগতি চন্দ্রকর শুভ্র অতি ;
ক্রমে দোঁহে উপনীত ফেলিবে যেথায়
নদীজলে দেহ ; শব ভূমিতে নামায়।

৭

আবার ধরিল শব,—তুলিল দু' জন,
দুলায়ে ফেলিল—যেথা তটিনী-জীবন
বিমুক্তশৈবালদল বহি' চলে কলকল ;
ক্ষিপ্রহস্তে নিল টানি শব-আবরণ ;—
পড়ে মৃত্যুসুপ্ত মুখে রজত-কিরণ।

৮

ব্রাহ্মণ শবের মুখ করিল দর্শন,—
রুদ্ধপ্রায়কণ্ঠ কহে,—উন্মাদ যেমন,—
"হায়! নারী, পাপভার কত দিন সহে আর?
এ যে সেই, এ যে পুত্র,—হৃদয়ের ধন?"
শবের পশ্চাতে ডুবে সলিলে ব্রাহ্মণ।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

কাঠের পুতুল।

১

বৃক্ষের মূলশিকড়টি যতদিন সবল ও সতেজ থাকে, ততদিন মৃত্তিকা সরসই হউক আর নীরসই হউক, সে তাহার মধ্য হইতে রস সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষটিকে পত্রপুষ্পে সুশোভিত করিয়া রাখে। তাহার সেই রসাকর্ষণকৌশল বা রসাকর্ষণের শ্রম আর কেহ জানিতে পারে না—কেবল তরুর পত্রপুষ্প-সম্পদে প্রীত হয়। তেমনই দক্ষিণারঞ্জন যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহার সংসারে অনাটন বা অভাব কেহই জানিতে পারে নাই; বরং লোকে বলিত,—তাঁহার বেশ সুখের স্বচ্ছল সংসার। কিন্তু যখন অতর্কিত কাল-ব্যাধি সহসা তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেল, তখন তাঁহার পত্নী জ্ঞানদা দেখিলেন, এক মাস সংসার চালাইবার মত সঞ্চয়ও নাই; সম্বলের মধ্যে কেবল তাঁহার সামান্য কয়খানি অলঙ্কার। একবার তাঁহার মনে হইল, তাঁহাকে দক্ষিণারঞ্জন কতবার বলিয়াছেন, দুর্দ্দিনের আশঙ্কায় কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখা ভাল—তখন যদি সে কথা শুনিতেন! কিন্তু সে কথা মনে করিয়া আর কি হইবে?

প্রতিবেশীরা বলাবলি করিতে লাগিল, দক্ষিণারঞ্জনের পত্নী যাহাই বলুন, তাঁহার হাতে বিলক্ষণ দু' পয়সা আছে। এই যে সে দিন নূতন রাস্তায় বাড়ী পড়িলে পাঁচ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন, অন্ততঃ সে টাকাটা ত আছে! খুব চালাক স্ত্রীলোক, সেটা চাপিয়া গেলেন।

দক্ষিণারঞ্জন যে ব্যবসায়ের লোকসানে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিলেন, সে কথা লোকে কেমন করিয়া জানিবে? আর জানিলেই বা কি? লোকের জানাজানিতেই বা কি আসে যায়? তাহাতে তাঁহার বিধবা পত্নীর ও পিতৃহীন পুত্রের কোনও উপকারের সম্ভাবনা ছিল না।

জ্ঞানদা বিপদ হইতে উদ্ধারের কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার পিতৃগৃহে আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। পিতা, মাতা বহুদিন মৃত। এক ভ্রাতা;—এ বিপদে সে ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, আশ্রয় না দিয়া পারিত না। আজ তাহার কথা মনে করিয়া জ্ঞানদা চক্ষুর জল ফেলিলেন;—দুই বৎসর হইল, কয়টি শিশুসন্তান রাখিয়া সেও ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। শ্বশুরকুলে তাঁহার এক দেবর আছেন; আছেন কি না, কে বলিবে? পাঁচ বৎসর তাঁহার উদ্দেশ নাই। কোনও কায কর্ম্ম করিতেন না, অথচ বিলাসী, তাই দক্ষিণারঞ্জন একদিন তাঁহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিয়াছিলেন,—"যে অন্ততঃ আপনার উদারের উপায় করিতে না পারে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।" সেই তিরস্কারের ফলে অভিমানী ভ্রাতা গৃহত্যাগ করেন। তিনি জ্যেষ্ঠকে একখানি পত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন—"উদরান্নের সংস্থান করিতে পারি, ফিরিব; নহিলে এই আমার শেষ সন্ধান পাইলেন।" সে আজ পাঁচ বৎসরের কথা। দক্ষিণারঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়াও ভ্রাতার সন্ধান পান নাই।

এই ত অবস্থা! জ্ঞানদা দেখিলেন, 'যে দিকে চাহেন, সবই অন্ধকার। কোনও স্থানে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই।

শেষে অনন্যোপায় হইয়া তিনি প্রতিবেশী ধনী শিবদাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় লইলেন। শিবদাচরণ বড় 'হৌসে'র 'বড়বাবু'—ধনী। তাঁহার গৃহিণীর শরীর ভাল নহে—গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে—দাসদাসী-দিগের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে এক জন লোক আবশ্যক। জ্ঞানদা শেষে সেই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। স্বামী থাকিতে তিনি বহুবার নিমন্ত্রিতারূপে যে গৃহে যাইয়া আদর আপ্যায়ন পাইয়াছেন,—স্বামীর মৃত্যুর

পর এক মাস যাইতে না যাইতে পুত্র শশিভূষণকে লইয়া তিনি সেই গৃহে আশ্রিতা-রূপে প্রবেশ করিলেন। অদৃষ্ট কাহার ভাগ্যে কখন কি সুখ দুঃখ আনে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

২

শিবদাচরণের গৃহে জ্ঞানদাকে কি কি করিতে হইত, তাহার সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করা সহজসাধ্য নহে। তাঁহাকে কি না করিতে হইত, তাহা বলিতে হইলে বরং অল্প কথায় বলা যায়। শিবদাচরণের গৃহিণী একে ধনীর পত্নী, তাহাতে বহুসন্তানের জননী;—একে তাঁহার দেহ কিছু বিপুল, তাহাতে অম্লরোগে জীর্ণ; একে পত্নীর ভাগ্যে ধনলাভ হইয়াছে, এই বিশ্বাসে শিবদাচরণ সর্ব্বপ্রযত্নে গৃহিণীর সুখসন্তোষসাধনে ব্যস্ত, তাহাতে গৃহিণী সামান্য কষ্টে শয্যাশায়িনী হইয়া পড়েন; কাযেই বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই সংসারের অধিকাংশ কার্য্যভার দাসীদিগের উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। এখন সে সকল ভার জ্ঞানদার উপর পড়িল। ইহাতে দাসীরা দুই কারণে জ্বলিয়া গেল—প্রথমতঃ, বহুদিন উপভোগের পর ক্ষমতার বিলোপ হইল; দ্বিতীয়তঃ, চুরীর পথ বন্ধ হইল। ইহার উপর যখন জ্ঞানদা অল্পদিনেই স্বভাবগুণে সংসারের ব্যয় কমাইয়া গৃহিণীর প্রিয়পাত্র হইলেন, তখন তাহারা দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার অসুবিধা ও অপমান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

জ্বালার উপর জ্বালা,—ছেলেটাও গৃহিণীর সুনজরে পড়িল। তাহার প্রধান কারণ, গৃহিণীর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা চারিবর্ষবয়স্কা সুশীলা—ওরফে সুশী—তাহার বড় 'নেওটো' হইয়া দাঁড়াইল। যখন আর কেহই তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না গৃহিণী স্বয়ং তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেন না—গৃহিণীর স্বয়ং তাহাকে লওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকিত না, তখন কেবল শশী তাহাকে রাখিতে পারিত; গৃহিণী অব্যাহতি পাইতেন। গৃহিণীর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তিনি সংসারের ভার অপরের স্কন্ধে দিয়া নিশ্চিন্ত। কাযেই দাসদাসীরা অনায়াসে জ্ঞানদার অপমান ও শশিভূষণের নির্য্যাতন করিত। বিদ্যালয়ে যাইবার সময় শশিভূষণের ভাগ্যে প্রায়ই অন্ন জুটিত না; তাহাকে প্রায় মুড়ী খাইয়া কাটাইতে হইত।—"ঝি রাঁধুনীর পুতের জন্য" পাচক বা দাসদাসী কেহই ব্যস্ত হইত না।

সমস্ত জীবন আপনার সংসারে কর্তৃত্ব করিয়া শেষে পরের আশ্রয়ে এইরূপে কালযাপন করাই যথেষ্ট কষ্টের কারণ। তাহার উপর আপনার

অপমান ও পুত্রের নির্য্যাতন,—জ্ঞানদার যাতনার অন্ত ছিল না। তিনি কেবল শশিভূষণের মুখ চাহিয়া সব সহ্য করিতেন। শশী মানুষ হইলে সব দুঃখ যাইবে। জননী-হৃদয় সেই আশায় কিছু সান্ত্বনা পাইত। নহিলে তাঁহার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া উঠিত। এক এক দিন এ আশাও তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিত না। সে দিন নিশীথে তিনি কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিতেন।

শশিভূষণও যে তাহার ও জননীর অপমান বুঝিত না, তাহা নহে। তাহার বয়স একাদশ। এ বয়সে ছেলেদের সে সকল বুঝিবার ক্ষমতা হয়। বিশেষতঃ দুঃখী বালক অল্প বয়সে সেই সে সব বুঝিতে শেখে। এক এক দিন রাত্রিতে সে সহসা জাগিয়া জননীকে কাঁদিতে দেখিত। তখন মাতা পুত্র উভয়েই কাঁদিতেন—কেহ কোনও কথা বলিতেন না। শশিভূষণ সঙ্কল্প করিয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক, মার দুঃখ ঘুচাইবে। মা বলিয়াছিলেন, সে লেখা-পড়া শিখিলে সব দুঃখ ঘুচাইতে পারিবে। তাই সে অসীম আগ্রহে লেখাপড়া করিত।

আর যখনই সে অবসর পাইত, সুশীলাকে লইয়া খেলা করিত। সুশীলা তাহাকে যেমন ভালবাসিত, সেও সুশীলাকে তেমনই ভালবাসিত। তাহার স্নেহের অন্য অবলম্বন—ভ্রাতা বা ভগিনী কিছুই ছিল না। বিশেষতঃ এ গৃহ যেন তাহার পক্ষে শত্রুপুরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখানে কেবল সুশীলা তাহাকে ভালবাসিত। কাযেই তাহার সুশীলাকে বড় ভাল লাগিত।

এই ভাবে ছয় মাস কাটিয়া গেল।

এই সময় একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল।

৩

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দক্ষিণারঞ্জনের গৃহ নূতন রাস্তায় পড়িয়াছিল। যে স্থানে তাঁহার গৃহ ছিল, তাঁহার মৃত্যুর ছয় মাস পরে একদিন প্রাতে এক জন আগন্তুক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সব নূতন গলি দ্বিধাবিভক্ত করিয়া নূতন রাস্তা বাহির হইয়াছে। কিছুক্ষণ সন্ধানের পর আগন্তুক গলির এক দিকে একটি পরিচিত গৃহ পাইলেন। গৃহস্বামীর নিকট দক্ষিণারঞ্জনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন;—সবিশেষ অবগত হইলেন। আগন্তুক উঠিলেন; তাঁহার মন আষাঢ়ের জলভরা মেঘের মত। তিনি আসিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী শিবদাচরণের গৃহে উপস্থিত হইল। আগন্তুক গৃহস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দক্ষিণারঞ্জনের নিরুদ্দিষ্ট ভ্রাতা করুণারঞ্জন।

করুণারঞ্জনের বেশভূষা ও আনীত দ্রব্যাদি সম্পদের পরিচায়ক। শিবদারঞ্জনের মত লোকের নিকট সম্পদের আদর অনিবার্য্য। কাজেই তিনি করুণারঞ্জনকে বিশেষ আদর করিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে দাসদাসী-মহলে জ্ঞানদার ও শশিভূষণের আদরও বাড়িয়া গেল। যাহারা পূর্ব্বে "কি রাঁধুনীর পুতে"র জন্য নড়িয়া বসিতে অপমান বোধ করিত, তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, "আহা!—তাই ত বলি; এমন ভদ্রঘরের বৌ—ভগবান কি সত্য সত্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন না।" তাহারা জ্ঞানদাকে বলিল,—"মা, আমরা বরাবরই বলি, তোমার মত সতী লক্ষ্মীর এ দুঃখ থাকিবে না। এখন বেটার বিয়ে দাও, মনুষ্যজন্মের সাধ আহ্লাদ পূর্ণ কর।"

করুণারঞ্জন ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে লইয়া যাইতে চাহিলে শিবদাচরণ বলিলেন,—"তাও কি হয়? আহারাদি করিয়া তবে যাওয়া হইবে।"

করুণারঞ্জন স্বীকৃত হইলেন,—"আপনার অনুরোধ আমার শিরোধার্য্য। আপনি দুঃসময়ে আমার ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে আশ্রয় দিয়াছেন।"

শিবদাচরণ গর্ব্বমিশ্রিত বিনয়ের ভাবে বলিলেন, "অমন কথা বলিবেন না। আপদ বিপদ সকলেরই আছে। ভদ্রলোকেই—ভদ্রলোকের স্বজাতিই স্বজাতির আপদে বিপদে করে। সে আর বেশী কি?"

জ্ঞানদার সহিত করুণারঞ্জনের সাক্ষাৎ হইল। জ্ঞানদা কোনও কথা কহিতে পারিলেন না। এত দিনের দুঃখ যখন সহানুভূতিতে উছলিয়া উঠে, তখন তাহার প্রকাশের ভাষা যোগায় না। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন।

করুণারঞ্জনও কাঁদিতে লাগিলেন; বলিলেন,—"বৌ ঠাকরুণ, উদরান্নের সংস্থান করিয়া ফিরিব বলিয়াছিলাম। উদরান্নের সংস্থান অনেক দিন হইয়াছিল। তখন যদি ফিরিয়া আসিতাম, যদি সংবাদ দিতাম। ভাবিয়াছিলাম, যাহাতে আর কখনও উদরান্নের জন্য চিন্তা করিতে না হয়, এমন সংস্থানের উপায় করিয়া আসিব। কিন্তু দাদাকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি আমার জন্য কত কষ্ট পাইয়াছেন। ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাকে সুখী করিব। তাহা হইল না। আমার এ দুঃখ মরিলে যাইবে না।"

জ্ঞানদা কাঁদিতে লাগিলেন।

৪

সেই দিন অপরাহ্ণে করুণারঞ্জন ভ্রাতৃজায়া ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে কর্ম্মস্থান পঞ্জাবে লইয়া যাইবার আয়োজন করিলেন। গাড়ী আসিল। করুণারঞ্জন আবার শিবদাচরণকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় লইলেন।

এ দিকে জ্ঞানদা ও শশিভূষণ গৃহিণীর নিকট বিদায় লইলেন। গৃহিণী উভয়কে যথাযোগ্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুশীলা শশিভূষণের নিকট ছিল। শশিভূষণ তাহাকে গৃহিণীর নিকট দিল। সুশীলা মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "কাকার সঙ্গে।"

সুশীলা জিজ্ঞাসা করিল, "খেলা কর্‌বে না?"

গৃহিণী বলিলেন, "হাঁ, যখন আসিবে, তখন আবার খেলা করিবে।"

সুশীলার হস্তে একটা কাঠের পুতুল ছিল; সে শশিভূষণকে পুতুলটা দিয়া বলিল, "খেলা কর্‌বে।" শশিভূষণ সেটি পুনরায় সুশীলাকে দিল; বলিল, "তুমি খেলা করিও।"

শশিভূষণ লইল না দেখিয়া সুশীলা ক্রন্দনের উদ্যোগ করিল। গৃহিণী শশিভূষণকে বলিলেন, "নে, বাছা, নে। সুশী তোর বড় 'নেওটো' হইয়াছিল। এখন মেয়ে রাখাই দুঃসাধ্য হইবে। বড় 'হেদাইবে'।"

অগত্যা শশিভূষণ পুতুলটি লইল। গাড়ীতে উঠিয়া শশিভূষণ সুশীলার ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া জ্ঞানদাকে বলিল, "মা! সুশীলা কাঁদিতেছে।"

জ্ঞানদা কি ভাবিতেছিলেন। উত্তর দিলেন না।

গাড়ী চলিতে লাগিল।

৫

দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। সহসা অবস্থা-পরিবর্ত্তনে—দুশ্চিন্তায়—মনঃকষ্টে জ্ঞানদার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। দেবরের গৃহে আসিয়া দুই বৎসর অসুস্থ শরীরের ভার বহিয়া তিনি মৃত্যু-সুপ্তিতে জীবনের যাতনা ভুলিয়াছিলেন।

করুণারঞ্জন সস্নেহে জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভ্রাতুষ্পুত্রকে পালন করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর হইল, তিনিও লোকান্তরিত হইয়াছেন।

শশিভূষণ দুই বৎসর ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায়ী হইয়াছে। বিদ্যালয়ে তাহার অসাধারণ সাফল্যই তাহার সৌভাগ্যের সোপান

হইয়াছিল। এই দুই বৎসরের মধ্যে তাহার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—পশারের অসাধারণ বিস্তার হইয়াছে। সে পিতৃব্যের কর্ম্মস্থানে স্থায়ী হইয়া চিকিৎসাব্যবসায়ে রত হইয়াছিল।

পীড়িতা কন্যা সুশীলাকে লইয়া শীতের আরম্ভে শিবদাচরণ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে মাতুলালয়ে যাইয়া সুশীলা ম্যালেরিয়া বাধাইয়া আসিয়াছিল। তাহার পর অনেক চিকিৎসা হইয়াছে;—ডাক্তারী, কবিরাজী, সবই হার মানিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়—শরীর কঙ্কালসার; দৌর্ব্বল্য ভীতিজনক। স্বাস্থ্যলাভের আশায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করা হইয়াছে, কোন ফল হয় নাই।

এবারও বর্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে শিবদাচরণ কন্যাকে লইয়া বাঙ্গালার বাহিরে আসিয়াছিলেন। পাঁচ মাস স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া কোনও সুফল ফলে নাই। তিনি গৃহে ফিরিতেছিলেন। সঙ্গে সুশীলা ও বিধবা জ্যেষ্ঠা কন্যা; গৃহিণী আসিতে পারেন নাই; কারণ, তৃতীয়া কন্যা প্রসবের জন্য পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনপথে শিবদাচরণ শশিভূষণের কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে আসিয়া সুশীলার প্রবল জ্বর প্রকাশ পাইল। ডাক্তার ডাকা আবশ্যক হইল। শশিভূষণকে ডাকা হইল।

রোগিণীকে দেখিয়া শশিভূষণ বলিল, "এ জ্বর তিন চারি দিনে সারিয়া যাইবে। ইহা পথশ্রমের ফল। কিন্তু মূল ব্যাধির চিকিৎসা আবশ্যক।"

শিবদাচরণ বলিলেন, "সে ত আর দেখাইতে ত্রুটী করি নাই।" তিনি কলিকাতার বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের ফর্দ্দ দাখিল করিয়া বলিলেন, সকলকেই দেখান হইয়াছে।

শশিভূষণ বলিল, "কিন্তু আমার বোধ হয়, আরোগ্য করা অসম্ভব নহে।"

শিবদাচরণ তরুণ যুবকের কথায় অবিশ্বাসের হাসি হাসিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা জিদ করিতে লাগিলেন, দেখান হউক।

অগত্যা শিবদাচরণ সম্মত হইলেন।

শশিভূষণ সুশীলার চিকিৎসার ভার লইলেন। তখন পরিচয়ে শশিভূষণ শিবদাচরণকে চিনিয়াছেন। শিবদাচরণ তাহাকে চিনিতে পারেন নাই।

৬

শশিভূষণের চিকিৎসায় চারি দিনে সুশীলার জ্বরত্যাগ হইল। তাহার পর এক পক্ষের মধ্যেই সুশীলা দুর্ব্বল দেহে স্বাস্থ্যের সঞ্চার বুঝিতে পারিল। তখন শিবদাচরণের অবিশ্বাস দূর হইয়া গেল; তিনি শশিভূষণকে জিজ্ঞাসা করিয়া আরও দুই মাস সেই স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন।

শশিভূষণ যেন ক্রমে সে গৃহে আত্মীয়ের মত হইয়া দাঁড়াইল। সে প্রতি দিন দুই তিন বার রোগিণীকে দেখিতে আসিত—সযত্নে রোগের নিদান অনুশীলন করিত—তাহার নিবারণের চেষ্টা করিত। তাহার স্বভাবের শান্ত প্রকৃতি ও নম্রব্যবহারগুণে সে সকলেরই শ্রদ্ধা ও স্নেহ লাভ করিত।

তৃতীয় মাসের প্রথমে সুশীলা সম্পূর্ণ সুস্থ হইল। নিদারুণ নিদাঘ-তাপে যে লতা ম্লান শীর্ণ হইয়া থাকে, যেমন বর্ষার প্রথম বারিপাতেই তাহার সমস্ত তেজ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া তাহাকে লাবণ্যশ্রীসুন্দর করিয়া তুলে, তেমনই শরীরে স্বাস্থ্যসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সুশীলার দেহে যৌবনের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া তাহাকে ললিত লাবণ্যে চারুশোভাময়ী করিয়া তুলিল। নয়নে অবসাদব্যঞ্জক দৃষ্টির পরিবর্ত্তে উজ্জ্বল চাঞ্চল্য দেখা দিল—মুখে নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া অপসৃত হইয়া আনন্দালোক প্রকাশিত হইল। তাহার দেহ ও মন সহসা বয়সোচিত পূর্ণতায় পুষ্ট হইয়া উঠিল।

শশিভূষণ শিবদাচরণকে জানাইল, তিনি সুশীলাকে লইয়া দেশে ফিরিতে পারেন।

এই সময় শিবদাচরণের মনে একটি বাসনা সমুদিত হইল। বিধবা কন্যার সহিত সে বিষয়ে পরমার্শ করিয়া তিনি কন্যার নিকট স্বীয় মতের অনুকূল মত পাইলেন।

তখন এক দিন রাত্রিতে শিবদাচরণের গৃহে শশিভূষণের আহারের নিমন্ত্রণ হইল। আহার শেষ হইয়া গেল। শিবদাচরণ ধূমপান করিতে করিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—যেন কি বলিবেন। কিন্তু কেমন করিয়া বলিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে শশিভূষণ যখন বিদায় লইলেন, তখন তিনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী পর্য্যন্ত চলিলেন।

পথে শিবদাচরণ বলিলেন, তাঁহার ইচ্ছা সুশীলাকে শশিভূষণের করে অর্পণ করেন। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে শশিভূষণের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। সে বিস্ময়ে, কি আশায়,—তাহা আমি বলিতে পারি না,—

নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইল। তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া শিবদাচরণ বলিলেন, সে যেন বিবেচনা করিয়া উত্তর দেয়।

শশিভূষণ ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল।

৭

সে রাত্রিতে শশিভূষণ ঘুমাইতে পারিল না। সে কেবল অস্থির ভাবে কক্ষমধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল। কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। আর অতীত স্মৃতির মধ্যে আজ এক জনের স্মৃতি বড় সমুজ্জ্বল—স্নেহময়ী মা, আজ তুমি কোথায়? তুমি কি আজ তোমার পুত্রের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করিতেছ?

শশিভূষণ সমস্ত রাত্রি আপনার বসিবার ঘরে পাদচারণ করিয়া কাটাইল। আর ঘুরিয়া ফিরিয়া বহুবার একটি সেল্‌ফে রক্ষিত একটি কাঠের পুতুল নাড়িতে লাগিল। পুতুলটি পুরাতন—বোধ হয় বহুদিন পূর্ব্বে কোনও শিশুর সস্নেহ লেহনে তাহার বর্ণসম্পদ শেষ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। যাহা অবশিষ্ট ছিল,—কাল তাহাকে মুছিবার চেষ্টা করিয়াছে। একবার যেন শশিভূষণের ওষ্ঠাধর সেই কাষ্ঠখণ্ড স্পর্শ করিল।

নিশাশেষে শশিভূষণ গৃহসংলগ্ন উদ্যানে আসিল;—আবার ভাবিতে লাগিল।

শিবদাচরণের গর্ব্বিতা পত্নীর কথা শশিভূষণের মনে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর সে আপনা-আপনি বলিল,—"না। আত্মসুখ যদি জীবনের চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে মনুষ্যত্ব কোথায়?"

পর দিন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে কয় দিনের জন্য শশিভূষণ কলিকাতায় গেল। কলিকাতায় আসিয়া শশিভূষণ শিবদাচরণের গৃহে গেল। গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ছেলেরা তাঁহাকে চিনে না; পুরাতন চাকর কেহ নাই। শেষে তাহার পরিচয় পাইয়া এক জন পুরাতন পরিচারিকা তাহাকে চিনিল। তখন গৃহিণীর নিকট সংবাদ গেল। ফলে—অল্পক্ষণ পরেই তাহার অন্তঃপুরে ডাক পড়িল।

শশিভূষণ গৃহিণীকে প্রণাম করিল। এক জন দাসী একখানা আসন পাতিয়া দিল—গৃহিণীর নির্দ্দেশমত শশিভূষণ তাহাতে উপবিষ্ট হইল। গৃহিণী তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার জননীর মৃত্যুসংবাদে দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিলেন, "আহা! দুঃখ সহিয়া মরিল—সুখের সময়

দেখিতে পাইল না?" তাহার পর তিনি আপনার সংসারের নানা কথা,—ব্যয়বাহুল্যের কথা,—ছেলে মেয়েদের কথা বলিতে লাগিলেন।

শশিভূষণ দেখিল, এত দিনে গৃহিণীর উল্লেখযোগ্য কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। তাঁহার দেহ তেমনই বিপুল; মুখে তেমনই আপনার পীড়ার কথা; কথাবার্ত্তা তেমনই গর্ব্বসিক্ত।

গৃহিণী বলিলেন, "সুশীকে তুমি বড় ভালবাসিতে। আজ তিন বৎসর তাহার জ্বর—এ যে—ম্যালেরিয়া, না কি? সব ডাক্তার কবিরাজ হার মানিয়াছিল। কত গোরা ডাক্তার দেখিল—জলের মত টাকা খরচ হইল; কত দেশ ঘুরিলাম—কিছুতেই কিছু হইল না। তা এবার পশ্চিমে এক জন ডাক্তার—তাহার বয়স অল্প, কিন্তু বড় বিচক্ষণ—চিকিৎসা করিয়া তাহার পুনর্জ্জন্ম দিয়াছে। মনে করিতেছি, তার সঙ্গে এই ফাল্গুন মাসে সুশীর বিবাহ দিব।"

শশিভূষণ বলিল, "আমি আপনাকে জানাইতে আসিয়াছি, আমিই সেই ডাক্তার। শেষে জানিলে হয় ত আপনি দুঃখিত হইবেন। কথাটা আপনার জানা থাকা—"

গৃহিণীর বাক্যস্রোতঃ রুদ্ধ হইয়া গেল; উৎফুল্লতার উৎস সহসা শুকাইয়া গেল। শশিভূষণ বুঝিল, তাহার অনুমান সত্য।

বজ্রাগ্নি যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে স্পৃষ্ট বস্তুকে দগ্ধ করিয়া যায়—গৃহিণীর এই ভাবান্তর তেমনই মুহূর্ত্তমধ্যে শশিভূষণের হৃদয় দগ্ধ করিয়া গেল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া লইল;—বলিল, "আমি তাহাই বলিতে আসিয়াছিলাম।—নিঃসহায় অবস্থায় যাঁহার গৃহে আশ্রিত-রূপে ছিলাম, তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিব, এমন দুরাশা আমার নাই।"

শশিভূষণ গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। গৃহিণী আহার করিয়া যাইতে বলিলেন; সে অপেক্ষা করিল না।

* * * * * * * *

কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া শশিভূষণ শিবদাচরণকে জানাইল, সে বিবাহ করিবে না।

৯

শিবদাচরণ গৃহে ফিরিলেন। গাড়ী আসিয়াছে শুনিয়া গৃহিণী বিপুল বপুর ভার লইয়া অন্তঃপুরের প্রবেশদ্বারে উপনীত হইলেন। সুশীলাকে

দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন; বলিলেন, "এ তিন বৎসর তোর ভাবনায়—আমার চক্ষুতে নিদ্রা ছিল না; তাই কি ছাই পোড়া ভাবনার শেষ হইল। এখন তোকে পাত্রস্থ করিতে পারিলে তবে নিশ্চিন্ত হই।"

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে তিনি শিবদাচরণকে বলিলেন, "আমি ঘটক ঘটকীদের বলিয়া রাখিয়াছি। এই ফাল্গুনেই সুশীর বিবাহ দিব।"

তাহার পর তিনি বলিলেন, "দক্ষিণা মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শশী আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

শিবদাচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে?"

গৃহিণী বলিলেন, "সেই যে গো! তাহার মা তাহাকে লইয়া কত দিন আমাদের বাড়ীতে ছিল। তোমার ছাই কিছুই মনে থাকে না। আমাকে বলিতে আসিয়াছিল, সেই সুশীর চিকিৎসা করিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে সুশীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছে।"

শিবদাচরণ সবিস্ময়ে বলিলেন,—"অ্যাঁ!"

গৃহিণী বলিলেন, "স্পর্দ্ধা দেখ! কিন্তু ছেলেটি খুব চতুর। আমাকে কিছু বলিতে হইল না। আমার ভাব দেখিয়াই সে বলিল, আমার কন্যাকে বিবাহ করিবে, এমন দুরাশা তাহার নাই।"

সহসা সুশীলার মুখ যেন রক্তশূন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। সে সিঁড়ির রেল ধরিয়া দাঁড়াইল। তাহার ছোট দিদি চঞ্চলা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি সুশী, তোর অসুখ করিতেছে।"

"না"—বলিয়া সুশীলা সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিল।

গৃহিণী বলিলেন, "নূতন শরীর। পথশ্রমে অমন হইয়াছে।"

১০

ইহার পর নানা স্থান হইতে সুশীলার বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। কিন্তু সুশীলা বিবাহের কথা হইলেই কাঁদে। শিবদাচরণ ও শিবদাচরণের পত্নী বিপদে পড়িলেন; কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

কিন্তু অঞ্চলে কে অগ্নি ঢাকিয়া রাখিতে পারে? চঞ্চলা প্রথম দিন শশিভূষণের কথায় সুশীলার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল। সে কথায় কথায় প্রকৃত কথা জানিয়া লইল—উন্মেষিতযৌবনা সুশীলার হৃদয়ে শশিভূষণের সৌম্য মূর্ত্তি—স্নিগ্ধ ব্যবহার মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল।

গৃহিণী এ কথা জানিলেন, জানিয়া কর্ত্তাকে জানাইলেন। শিবদাচরণ বলিলেন, "তুমিই ত যত গোল পাকাইলে! চিরদিন কাহারও সমান যায় না। কবে তাহার অবস্থা মন্দ ছিল, তুমি সেই কথাই মনে গ্রন্থি দিয়া রাখিলে। কিন্তু সে যে দুহিতার জীবন দিল, তাহা মনেও করিলে না! আমি কি করিব?"

গৃহিণী আর কি বলিবেন?

গৃহিণী সেই দিনই একটি পৌত্রকে ধরিয়া শশিভূষণকে পত্র লিখিলেন,—"তুমি আমার পুত্রের মত। তোমাকে আমার একবার বিশেষ আবশ্যক আছে। তুমি অতি অবশ্য আসিবে।"

যথাকালে এই পত্র শশিভূষণের হস্তগত হইল। পত্র পড়িয়া শশিভূষণ বিস্মিত হইল—আর বুঝি হৃদয়ব্যাপী বিস্ময়ের মধ্যে এক প্রান্তে আশার ক্ষীণ আলোক আলেয়ার মত জ্বলিতে নিবিতে লাগিল।

শশিভূষণ কলিকাতায় চলিল।

১১

এবার শিবদাচরণের গৃহে আসিয়াই শশিভূষণ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। গৃহস্বামী হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলেই তাহার অভ্যর্থনার উদ্যোগী।

আহারের সময় গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া সযত্নে তাহার আহারের তত্ত্বাবধান করিলেন; তাহার আহারের অল্পতা দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলেন, বলিলেন, বোধ হয়, সে লজ্জাবশতঃ পর্য্যাপ্ত আহার করিতেছে না, কিন্তু সে 'ঘরের ছেলে', তাহার লজ্জা অনাবশ্যক।

অপরাহ্ণে অন্তঃপুরে শশিভূষণের ডাক পড়িল।

গৃহিণী শশিভূষণের দুইখানি হস্ত ধরিয়া বলিলেন, "বাবা, সে দিন তুমি তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইলে। আমার যাহা বলিবার ছিল, বলিতে পারিলাম না। আমার একটি কথা তোমায় রাখিতে হইবে;—তোমায় সুশীকে গ্রহণ করিতে হইবে।"

শশিভূষণ লজ্জায় মুখ নত করিল।

দ্বারান্তরালে চঞ্চলা জ্যেষ্ঠাকে বলিল, "বাঁচা গেল। আমার ভয় ছিল, পাছে আবার পাত্র বাঁকিয়া বসে।"

১১

ফাল্গুনের শেষ। সুশীলা স্বামিগৃহে আসিয়াছে।

শশিভূষণের গৃহ সুন্দর,—গৃহসজ্জা সুন্দর,—গৃহ সুসজ্জিত। কিন্তু গৃহের সজ্জায় রমণীর স্বাভাবিক সুরুচিসঞ্জাত নিপুণ স্পর্শের অভাব ছিল। এবার সে অভাব দূর হইল। গৃহে সঙ্গিনী নাই—অবসরের অভাব নাই। সুশীলা আপনি ঘরগুলি সাজাইত—দ্রব্যাদি নাড়িত, গুছাইত, সাজাইত।

শশিভূষণের বসিবার ঘরে একটি দ্রব্য দেখিয়া সে বিস্মিত হইত। সে ঘরে একটি হোয়াটনটে একটি অতি সামান্য কাঠের পুতুল সাজান ছিল। মূল্যবান ও সুন্দর গৃহসজ্জার মধ্যে সেই বিবর্ণ তুচ্ছ পুতুলটি বড়ই বেমানান বোধ হইত। তাহার সে স্থানে অবস্থিতির কারণ সুশীলা কিছুতেই অনুমান করিতে পারিত না।

শেষে এক দিন সুশীলা স্থির করিল, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিবে।

সে দিন রাত্রিতে আহারের পর শশিভূষণ বারান্দায় একখানি সোফায় বসিয়া দূরে বৃক্ষান্তরাল হইতে চন্দ্রোদয় দেখিতেছিল। সুশীলা আসিয়া পার্শ্বে বসিল।

সুশীলা কেমন করিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে, ভাবিতে লাগিল।

সুশীলা বলিল, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

শশিভূষণ হাসিয়া বলিল, "কি এমন কথা?"

সুশীলা বলিল, "তোমার বসিবার ঘরে—ও একটা কাঠের পুতুল কেন?"

শশিভূষণ বলিল, "উহা আমার দুঃখের সময়ের সুখস্মৃতিচিহ্ন। একটি বালিকার দান।"

সুশীলার রমণীহৃদয় বিস্ময়ে পূর্ণ হইল; আর যুবতীহৃদয়ের এক প্রান্তে একটু সন্দেহের বেদনা বোধ হইল। সে সবিস্ময়ে স্বামীর দিকে চাহিল।

শশিভূষণ বলিল, "যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন আমরা একান্ত আশ্রয়হীন—সম্বলহীন হইয়া পড়িলাম। মা আমাকে লইয়া এক প্রতিবেশীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। সে গৃহে আমরা সামান্য আশ্রিতমাত্র; কাযেই আমরা অনেকের ঘৃণার পাত্র ছিলাম; যাহারা ঘৃণা না করিত, তাহারা আমাদের কৃপার পাত্র বিবেচনা করিত।"

সুশীলার দৃষ্টি ভূতলে সম্বদ্ধ হইল।

শশিভূষণ বলিল, "সেই গৃহে কেবল একটি বালিকা আমাকে ভালবাসিত। যখন আর কেহ তাহাকে রাখিতে পারিত না, তখন সে আমাকে পাইলে হাসিত। সেই গৃহমরুমধ্যে আমার তাহাকে প্রফুল্ল পুষ্প বলিয়া মনে হইত। বলা বাহুল্য, আমি তাহাকে বড় ভালবাসিতাম। যে দিন আমরা কাকার সঙ্গে চলিয়া আসি, সে দিন সে আমাকে ঐ পুতুলটি দিয়াছিল; আমি লইতে চাই নাই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। তাই ঐ পুতুলটি আমার বিশেষ আদরের।"

ততক্ষণে সুশীলার মুখ লজ্জায় নত হইয়াছে।

শশিভূষণ সেই লজ্জানত মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া চুম্বন করিল; তাহার পর বলিল, এত দিন যাহার এই স্মৃতিচিহ্ন সাদরে রক্ষা করিয়াছি, আজ আমি তাহাকে পাইয়াছি। এখন তুমি যদি ইচ্ছা কর, পুতুলটি লইতে পার।"

সুশীলার মস্তক তখন স্বামীর বক্ষে সে কোনও উত্তর দিল না; প্রেমের সেই নন্দনে সে কেবল সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

স্নেহের জয়।

এল্. এম্. এস্ পাশ করিবার পর কলিকাতায় দুই তিন বৎসর 'প্র্যাকটিসের' ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আশা ও উৎসাহ যখন একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন হাঁসপাতালের এই এক শত টাকা বেতনের চাকরীটিকে তিনি দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ বরণ করিয়া লইলেন।

কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না। তাহারা বলিত, "লোকটা অল্পবয়স্ক, বড় অহঙ্কারী।"

ডাক্তার বাবুর ইহাতে বিশেষ ক্ষতি বৃদ্ধি ছিল না। যাঁহার প্রসন্ন দৃষ্টির উপর তাঁহার বেতনবৃদ্ধির ভবিষ্যৎ নির্ভর করিত, তিনি, ডাক্তারের অবয়ব ও কথাবার্ত্তার মধ্যে বিকাশোন্মুখ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ও সমাদর করিতেন।

একদিন—তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা—ডাক্তার বাবু হাঁসপাতাল হইতে বাসায় ফিরিতেছিলেন; ফটকের ধারে, ছেলে কোলে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া তাঁহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল। মিনতির স্বরে বলিল, "বাবা, আমার খোকাকে একটু দেখ না বাবা!"

ডাক্তার সন্তানব্যাধিশঙ্কিতা জননীর সে কাতর নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। অবজ্ঞাভরে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন; স্ত্রীলোকটি পুনরায় বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, একবারটি দেখ।"

ডাক্তার অত্যন্ত রূক্ষস্বরে বলিলেন, "এখন হবে না। যা।"

স্ত্রীলোকটি ডাক্তার বাবুর পা জড়াইয়া ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। বুঝি, তেমন কাতর মিনতিতে পাষাণ দেবতাও বিচলিত হইতেন, কিন্তু মনুষ্য-নামে পরিচিত ডাক্তার একটু টলিলেন না—গলিলেন না। অধিকন্তু সজোরে পা ছাড়াইয়া লইয়া নিতান্ত অভদ্রের মত বলিলেন, "রাস্তা কি রোগী দেখিবার জায়গা রে মাগী?"

স্ত্রীলোকটির দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। রুগ্ন শিশু জননীর মুখের দিকে চাহিয়া ছল ছল চক্ষে, ক্ষীণ আধ আধ কণ্ঠে বলিল, "মা তুই কাঁদিস কেন? আমার অসুখ ত সেরে গেছে।"

অর্জ্জুনশরবিদ্ধ ধরণীবক্ষ হইতে উৎসারিত ভোগবতীর ন্যায় জননীর বিদীর্ণ মর্ম্মস্থল হইতে অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল। অবরুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল, "মধুসূদন—"

সে তখন মধুসূদনের দর্পহারী মূর্ত্তির কল্পনা করিল, কি তাঁহাকে বিপত্তারণ-রূপে দর্শন দিবার জন্য ব্যথিত অন্তরের কাতর নিবেদন প্রেরণ করিল, তাহা কে বলিবে?

তার পর, শিশুটিকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া, লাঞ্ছিতা ব্যাকুলা ব্যথিতা জননী অতীত জীবনের সুখ সম্পদের কথা ভাবিতে ভাবিতে অবসন্নচিত্তে চলিয়া গেল।

* * * * * * *

পরদিন প্রাতে, ধনীর গৃহে ভিখারী বিদায়ের ন্যায়, ডাক্তার বাবু যখন দরিদ্র রোগীদিগকে ব্যবস্থা বিতরণ করিতেছিলেন, তখন সে স্ত্রীলোকটিও তাহার পূর্ব্বদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা অবমাননা ভুলিয়া পীড়িত শিশুটিকে বুকে করিয়া গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল।

ডাক্তার বাবু একবার তাহার অবগুণ্ঠনসন্নদ্ধ মুখের প্রতি তাকাইয়া তাহাকে অপেক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

এইখানে ব্রাকেটের মধ্যে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হাঁসপাতালে কোনও সুন্দরী স্ত্রীরোগিণী আসিলে ডাক্তার বাবু তাহাকে বিশেষ যত্নের সহিত দেখিতেন।

অন্যান্য রোগীরা চলিয়া গেলে সেই স্ত্রীলোকটির ডাক পড়িল।

এমন সময় ডাক্তার বাবুর ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাসায় কলিকাতা হইতে তাঁহার একটি বন্ধু আসিয়াছেন।

ডাক্তার বাবু স্ত্রীলোকটিকে আরও একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাসায় চলিয়া গেলেন।

উপায়ান্তরহীনা অভাগিনী জননী সজলনয়নে ক্রোড়স্থিত শিশুর রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখ পানে নীরবে চাহিয়া রহিল।

শিশু বলিল,—"মা চল্ যাই। তুই নাইবি না?"

"নাইব! তুমি ভাল হইয়া উঠ।"

"আমি ভাল হয়ে গেছি। তুই নাইবি চল্।"

জননী মুখ ফিরাইয়া অঞ্চলে নয়ন মার্জ্জন করিল, এবং পীযূষাধারটি শিশুর মুখে তুলিয়া দিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে ডাক্তারের প্রত্যাবর্ত্তন-প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল।

মার কোলে শিশু ছট্‌ফট্ করিতেছিল।

জননী ডাকিল,—"কি বাবা?"

শিশু কাতরদৃষ্টিতে মার মুখ পানে চাহিয়া বলিল, "মা, জল।"

জননী শিশুটিকে জলপান করাইয়া আনিল।

বেলা বাড়িতে লাগিল। তখনও ডাক্তারের দেখা নাই। সন্তান-স্নেহাতুরা জননীর নিকট প্রত্যেক মুহূর্ত্ত যেন প্রহর বলিয়া বোধ হইতেছিল।

রোগযন্ত্রণায় শিশুটি ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। দেখিয়া, মা বলিল, "ঘুম পেয়েছে বাবা? ঘুমাও।" বলিয়া, ধীরে ধীরে শিশুর কেশরাশি মধ্যে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিল।

পার্শ্বে আর একটি পীড়িতা বৃদ্ধা বসিয়াছিল। সে বলিল, "এখন আর ঘুম পাড়িও না।"

"না; মা; সমস্ত রাত্তির ঘুমায়নি, কেবল ছট্‌ফট্ করেছে।"

অবশেষে ডাক্তার বাবু আসিলেন।

জননী শিশুটিকে বুকের উপর তুলিয়া ডাক্তার বাবুর নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিল, "আমার খোকাকে আগে দেখ না, বাবা! কাল সারা রাত্তির—"

"আহা, সবুর কর না। বস্‌তেই দাও।"

মাতৃহৃদয় সবুর সহিতে চাহিল না। কাতরকণ্ঠে বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, তুমি একবারটি দেখ।"

ডাক্তার বিরক্তির সহিত শিশুটির হাত ধরিলেন, এবং কিছুক্ষণ নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, বাড়ী নিয়ে যাও।"

"একটু ভাল করে দেখ না বাবা!"

"দেখিছ।" বলিয়া, ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

জননী বলিল—"ওষুধ দেবে না।"

"না, আজ না। কাল নিয়ে এসো।" ডাক্তার মুখ বিকৃত করিলেন।

বাত্যাবিতাড়িত বেতসের ন্যায় জননীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। শঙ্কিত-চিত্তে কাঁধের উপর হইতে শিশুর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া বাষ্পাকুলকণ্ঠে ডাকিল,—"বাবা!" তার পর একবার শিশুটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার নাকের কাছে হাত দিয়া, "বাপ আমার—দুখিনীর ধন আমার—কোথায় গেলি!"—বলিয়া চীৎকার করিয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় আছাড়িয়া পড়িল।

অভাগিনী পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে নাই যে, তাহার বুকের ধন তাহার বুকের উপর চিরনিদ্রায় নিমগ্ন!

পতনের আঘাতে জননীর ললাটদেশ কাটিয়া গেল, শোণিত স্রুত হইয়া আলিঙ্গনবদ্ধ মৃত শিশুটিকে পরিপ্লুত করিয়া দিল।

হায়, এতদিন অভাগিনী যে স্নেহসর্ব্বস্বকে হৃদয়শোণিতে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার জীবনাবসানেও সেই শোণিতে তাহার অন্তিম অভিষেক সম্পন্ন করিল।

হাঁসপাতালে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। যে যেখানে ছিল, ছুটিয়া আসিল। পরিচারকগণ মাতৃবক্ষ হইতে মৃত শিশুটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল। কেহ কেহ সেই হৃদয়বিদারক শোকাবহ দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে ফিরিয়া গেল।

ডাক্তার বাবুর আদেশে পরিচারকগণ বিলুপ্তচেতনা, বিমুক্তাবগুণ্ঠন রমণীকে ধীরে ধীরে তুলিয়া ধরিয়া মস্তকে মুখে জলসেক করিতে লাগিল।

ডাক্তার বাবু স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নিমীলিতনয়না রমণীর পাংশুমুখে চাহিয়া রহিলেন।

তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন রমণী তাঁহার পরিচিতা। সে মুখ যেন তিনি কোথায় দেখিয়াছেন। সহসা স্মৃতি আসিয়া তাঁহার মানসপটে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অঙ্কিত একখানি আলেখ্যের আবরণ উন্মোচন করিয়া দিল।

ডাক্তার বাবু রমণীকে তাঁহার নিজের বিশ্রামপ্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া চেতনা-সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সেদিন আর তাঁহার নিয়মিত সময়ে স্নানাহারের কথা স্মরণ হইল না। বাসায় অতিথি বন্ধু অনাহারে তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন, তাহাও তিনি ভুলিয়া গেলেন।

রমণীর সংজ্ঞা-সম্পাদনের নিমিত্ত বহুক্ষণ নিষ্ফল প্রয়াসের পর তাঁহার সেবা শুশ্রূষার যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া অপরাহ্নে ডাক্তার বাবু বাসায় ফিরিলেন।

অতিথি বন্ধু তাঁহার বিষন্ন আনন ও উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া, চমকিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?"

ডাক্তার বাবু বন্ধুবরের নিকট এই শোচনীয় ঘটনার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইলেন, এবং দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে দিয়া অবিলম্বে হাঁসপাতালে ফিরিয়া আসিলেন। বন্ধুকেও আসিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন।

রমণী তখনও সংজ্ঞাশূন্যা। তাহার চৈতন্যসঞ্চারের জন্য ডাক্তার বাবু যত্ন কৌশলের ত্রুটী করিলেন না।

ক্রমশঃ রাত্রি হইল। ডাক্তার বন্ধুকে বাসায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন, এবং স্বয়ং অনাহারে অনিদ্রায় রমণীর শুশ্রূষায় নিরত রহিলেন।

শেষরাত্রে রমণীর বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কোলের কাছে যেন কাহার অন্বেষণ করিতে লাগিল। পরক্ষণেই শয্যার উপর মৃদু মৃদু করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল,—"ঘুম পেয়েছে বাবা—ঘুমাও"। এক একবার উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতে লাগিল, "গরীব বলে' ডাক্তার তোকে তাচ্ছীল্য কল্লে! কই, ডাক্তার কই ?" বলিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিল। আবার তখনই পাশ ফিরিয়া পীযূষাধারটি হাতে করিয়া তুলিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "খাও—বাবা খাও।"

ক্ষোভে, দুঃখে, অনুতাপে, অনুশোচনায় ডাক্তারের মর্ম্মস্থল বিদ্ধ হইতেছিল।

দুই দিন দুই রাত্রি এমনই ভাবে কাটিল।

ডাক্তার একবারমাত্র বাসায় যাইতেন, এবং যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রাত্যহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময় অক্লান্ত অনবসন্ন ভাবে রমণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন।

তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিতেন,—"এমন আর দুই একটি রোগী জুটিলে তুমি স্নানাহারের সময়টুকুও পাবে না, এবং অন্যান্য রোগীরা বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে।"

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে—প্রাচীর ললাট বালসূর্য্যের রক্তরাগে রঞ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রমণীর চেতনার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই পুত্রহারা জননী সর্ব্বপ্রকার পার্থিব ক্লেশ যাতনা হইতে বিমুক্ত হইয়া যে মহাপথে তাহার হৃদয়সর্ব্বস্ব চলিয়া গিয়াছে, সেই পথে প্রয়াণ করিল।

স্ত্রীলোকটির স্বজন সুহৃদের কোনও সন্ধান না পাইয়া হাঁসপাতালের লোকে তাহার সৎকার করিল। ডাক্তার সঙ্গে গিয়াছিলেন।

এই ঘটনার পর ডাক্তার যেন কেমন হইয়া গেলেন। মুখে কথা নাই, হাসি নাই, কাজ কর্ম্মে মনোযোগ নাই। সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, বিষণ্ণ।

বন্ধু পরিহাস করিয়া বলিতেন, রোগীর মৃত্যুতে চিকিৎসকের এমন ভাবান্তর বিস্ময়াবহ বটে।

একদিন ডাক্তার তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "তোমাকে একখানি চিঠি দেখাইতেছি। তাহা হইলে সব বুঝিতে পারিবে।" ডাক্তার বাক্স হইতে সযত্নরক্ষিত একখানি পত্র আনিয়া বন্ধুর হাতে দিলেন। বলিলেন, "পড়।"

বন্ধু আবরণমধ্য হইতে পত্রখানি বাহির করিয়া পড়িতে যাইতেছেন, এমন সময়ে ডাক্তার কি ভাবিয়া বন্ধুর হস্ত হইতে পত্রখানি টানিয়া লইলেন।" বলিলেন, "আমি পড়িতেছি—শোন।"

"ডাক্তার বাবু,

"রোগী দেখিতে আসিয়া দেখিতেছি আপনি নিজেই রোগে পড়িয়াছেন।

"আমার বোধ হয় এখন আমি বেশ সুস্থ হইয়াছি। অল্প দুর্ব্বলতা আছে। কিন্তু আপনার অনুগ্রহের বিরাম নাই। আপনি প্রত্যহই আসেন। ভিজিটের টাকা আপনি বিছানার উপর ফেলে চলে যান। পরে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, ভুলে ফেলে গেছেন। এ ভুলের কারণ আমি বুঝিতে পারি। আপনার মুখের উপর বলিতে পারি না, তাই আজ লিখিয়া জানাইতেছি। ক্ষমা করিবেন।

"আমার এই পত্র পড়িয়া আপনি আমাকে নিতান্ত নির্ম্মম মনে করিবেন। আমার নির্ম্মমতার জন্য বাবা আমাকে শৈশবে 'মাছের মা' বলিয়া ডাকিতেন।

আপনি আমার জীবনদাতা; তাই আজ অসঙ্কোচে আপনাকে জানাইতেছি, আপনি যা চান, আমাদের শ্রেণীর স্ত্রীলোকের নিকট তাহা অতি বিরল। আপনি—"

পত্রপাঠে বাধা দিয়া বন্ধু বলিলেন—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে এই পত্র লেখার পর আর কখনও তোমার সঙ্গে ইহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

ডাক্তার বলিলেন—"হাঁ, আর একবার হইয়াছিল। কলিকাতায় এ যে বাড়ীতে থাকিত, সেই বাড়ীতে একটি ছেলের কলেরা হইয়াছিল। আমি দেখিতে গিয়াছিলাম।"

বন্ধু বলিলেন, "তার পর?"

"আমি গিয়া দেখি—ছেলেটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তার মা মাটীতে আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। কান্নার শব্দ শুনিয়া আরও দুই তিনটি স্ত্রীলোক আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল। এও বোধ হয় সেই সঙ্গে আসিয়াছিল। আমি ঘরে আছি, তাহা সে লক্ষ্য করে নাই। দরজার পাশে দাঁড়াইয়া পীড়িত শিশুর মার উদ্দেশে উপস্থিত অপর সকলকে বলিল, 'ওগো, ওর হাত থেকে তাগা দু'গাছা খুলে নাও না; নূতন তাগা দুগাছা গুঁড়ো হয়ে গেল যে'!"

বন্ধু ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন, "দেখিতেছি, ততদিনের প্রত্যেক কথাটি পর্য্যন্ত তুমি মনে করে রেখেছ। আমরা জানিতাম, কবিরাই 'রোম্যানটিক্' হয়। ডাক্তারের এত 'রোম্যান্স্!' যাক্, তার পর?"

"কণ্ঠস্বর শুনিয়া আমি দরজার নিকট আসিলাম।"

"বংশীরবমুগ্ধ হরিণের মত ? তার পর শুনি।"

তার পর আর কিছুই নয়। আমাকে দেখিয়াই সে সরিয়া গেল।"

"আর, তুমি পিছু পিছু ছুটিলে ?"

"আমি রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলাম।"

"এখন চিঠিখানা পড়, শুনি।"

ডাক্তার পত্রের অবশিষ্টাংশ বন্ধুকে পড়িয়া শুনাইলেন।

সমস্ত শুনিয়া বন্ধু বলিলেন, "এইবার একটি বিবাহ কর।"

পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

১

বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কারসাধন করিতে হইলে, উহাতে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইলে, বাঙ্গালা গান বদলাইতে হইবে, নূতন করিয়া গান রচনা করিতে হইবে। সেই মাছ ধরিবার আমোদ ও আঁব কুড়াইবার আমোদের ঝটকা এত বেশী ছিল যে, সহ্য করিয়া উঠা যাইত না। ঐ দুইটা আমোদ আমোদের কালবৈশাখী ছিল। বড় প্রচণ্ড আমোদ। আর একদিন একটা পবিত্র ও প্রশান্ত আমোদের কথা মনে উঠিয়াছিল। সেই পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে মাঠে লক্ষ্মীপূজার আমোদের কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভঙ্গিলে গণ্ডা চারেক গুড়পিঠা বা নূতন গুড়ের পরমান্ন দিয়া কুড়িখানাক সরুচাকলি না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম না। সে দিন কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আমরা ৪।৫ জনে ধানের শীষের এক একটা মোটা আঁটী বা গোছা হাতে লইয়া মনসাপোঁতায় যাইতাম। গিয়া দেখিতাম, রাইপিসী এবং কুড়ুনী দিদি আসন নৈবেদ্য ফুল তুলসী, শাঁক ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি সব আনিয়াছেন। একটু বেলা হইলে ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মী পূজা করিতেন। আমরা আহ্লাদে এত জোরে কাঁসর বাজাইতাম যে, ২।১ বার কাঁসর ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমাদের খাওয়া আরম্ভ হইত। এক জন ময়রা একটা ধামায় করিয়া নূতন গুড়ের মুড়কী, মোয়া প্রভৃতি বেচিতে আসিত। ধানের শীষের গোছা বা আঁটি তাহাকে দিয়া আমবা খাবার কিনিয়া খাইতাম,

এবং যে সব গরীব বাগ্দীর ছেলে মেয়ে পূজা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। খানিক পরে কুড়ুনী দিদি আমাদিগকে চড়ুইভাতি রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। যে বালক চড়ুইভাতির আমোদ উপভোগ না করিয়াছে, তাঁহার জন্মই বৃথা হইয়াছে। সেই জন্যই ত নিম্ন-পাঠে চড়ুইভাতির কথা লিখিয়াছি। এক এক দিন সেইরূপ আর একটা আমোদে মন ভরিয়া উঠে। শীতকালের প্রত্যূষে খেজুর রস খাইবার আমোদ। কালকেতুসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ ষণ্ডা পরাণ মাল খেজুর গাছ কাটিয়া রস সংগ্রহ করিত। ভোরে কামারদের বাড়ীর সম্মুখের খোলা জায়গায় পরাণ সমস্ত রাত্রের রস জ্বাল দিত। সেই অনির্ব্বচনীয় সৌরভে দশখানা গ্রাম মাতিয়া উঠিত। আমাদেরও ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা মুড়ি এবং দুই একটা করিয়া ঘটি ও বাটি লইয়া সেইখানে গিয়া আগুন পোহাইতাম, এবং তাতরসিতে মুড়ি ভিজাইয়া মহা আনন্দে খাইতাম। গ্রামের বিস্তর লোককে সেখানে দেখিতাম। তাহারা তামাক খাইত, আর নানা কথা কহিত। এখন বোধ হয় যে, তাহারা সেইখানে আগুন পোহাইতে পোহাইতে মনের সুখে village politics আলোচনা করিত। পরাণ বড় ভাল লোক ছিল। আমাদিগকে বিস্তর রস দিত; আমরা ঘটি বাটি করিয়া তাহা বাড়ীতে আনিতাম। এই ব্যাপার মনে করিয়া আমার নিম্নপাঠে একটি পাঠ দিয়াছি। তাহা তৃতীয় ক্রোড়পত্রে উদ্ধৃত হইল। পরাণ মালের কথায় আর একটা আনন্দের কথা এক দিন মনে উঠিয়াছিল। আমি যখন শিশু, তখন কর্ত্তারা বাগবাজারের ৺রাজীব-লোচন দত্তের বাড়ীতে থাকিতেন। কি সূত্রে থাকিতেন, জানি না; তাঁহাদিগকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসা করা বালকের বেয়াদবি মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করি নাই। দত্ত মহাশয়দের বাড়ীর অতি নিকটে এক কলুর বাড়ী ছিল। সেখান হইতে আমি প্রতিদিন তেল নুন কিনিয়া আনিতাম। এই কারণে কলুর সহিত ভাব হইয়াছিল। বেশ মানুষ, আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। সেটা ভারি একটা আমোদ ছিল। আমাদের কৈকালার পাশেই চৌতাড়া গ্রাম। সেখানে আমাদের কটা কলুর ঘর ছিল। তখনকার খাঁটী সরিষার তেলের রং যেমন ছিল, কটা কলুর গায়ের রংও তেমনি ছিল। তাই তাহাকে কটা কলু বলা হইত। তেল আনিবার জন্য তাহার বাড়ীতে সর্ব্বদা যাইতাম। সেও আমাকে তাহার ঘানি-গাছে বসিয়া ঘুরিতে দিত। ভারি আনন্দ! এইরূপে অনেক নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আমার

ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। তাহাতে বড় সুখ; আমার মনে সেই সুখের স্মৃতি বড় প্রবল বলিয়া সিমলার বাজারে এখনও বাজার করিবার সময় চাষীদের সহিত মিষ্টালাপ করিয়া থাকি। দেখি, তাহারা সুন্দর লোক, আলাপ করিলে কত কথাই কয়, কত সদ্ব্যবহারই করে। তাহাদের জন কয়েকের নাম না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না,—যুধিষ্ঠির, গয়ারাম, ভুলু, অধর, অঘোর, নিবাস বক্সী, তিনকড়ি, ঈশান। গয়ারাম বড়ই ভালমানুষ, কিন্তু বুড়া হইয়া বাজারে আসিতে অসমর্থ হইয়াছে। তাহার পুত্র নগেনটি বড় ভাল ছেলে—বাপের বেটা বটে, কিন্তু তাহাকেও ৫।৬ মাস বাজারে আসিতে না দেখিয়া বড় ভাবিত হইয়াছি। নিবাস গয়ারামেরই ন্যায় ভালমানুষ। ভুলু কখনও মন্দ জিনিস ভাল বলিয়া বেচে না। ভাল জিনিস না থাকিলে আমাকে স্পষ্টই বলে,—আপনাকে দিবার মতন জিনিস আজ নাই। তাহারা আমাকে নমস্কার করে। আমিও তাহাদিগকে নমস্কার করি। যুধিষ্ঠিরকে নমস্কার করিলে সে একদিন একটু অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল—বলিয়াছিল,—সে কি? আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, নমস্কার করিতেছেন কেন? আমি বলিলাম,—দেখ যুধিষ্ঠির! সকলেরই ভিতর ভগবান আছেন। অতএব সকলেই সকলকে নমস্কার করিতে পারে। পাঁচ বছরের ছেলেকেও নমস্কার করিতে পারা যায়। বোধ হয়, যুধিষ্ঠির কথাটা বুঝিয়াছিল। সেই অবধি নমস্কার করিলে আর কিছু বলে না। হাসিতে হাসিতে আমাকেও নমস্কার করে। আর ভাল জিনিস যাহা থাকে, তাহা আমাকে দেখায়। এই সকল মূর্খ সাদা সরল লোকের সহিত সদালাপে বড়ই সুখ হয়।

আর পরীক্ষান্তের সেই আমোদ কি বিশুদ্ধ, কি মর্ম্মস্পর্শী! পরীক্ষার বহু পূর্ব্ব হইতে কেবলই পড়িতেছি, পড়িয়া পড়িয়া ক্লান্ত, তবু একটু বিশ্রাম নাই—কাহারও সঙ্গে দুইটা কথা কহি; অথবা দিবসে দুই পা বেড়াইব, এমন অবসর নাই। না খাইলে নয়, তাই মৌনীর ন্যায় খাই; না শুইলে নয়, তাই শুই; শুইয়াও কেবল সেই পড়া কথা ভাবি। আমি প্রতিদিনই সমস্ত পঠিত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতাম। তাই ঘরে পড়ার সুব্যবস্থার জন্য আমার একখানি রুটিন থাকিত; যথা,—প্রাতে ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ইতিহাস। ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভূগোল। ৮টা হইতে ৯৷৷৹টা পর্য্যন্ত ইংরাজী। তাহার পর স্নানাহার ও কলেজ গমন। বৈকালেরও ঐরূপ নিয়ম ছিল। ইহার এক চুল এদিক্ ওদিক্ করিতাম না।

সন্ধ্যার পর মহা ধূমধাম করিয়া একটা বর গেলেও, তাহা দেখিবার জন্য এক মিনিটের জন্যও বই ছাড়িতাম না। এই প্রণালীতে পড়িতাম এই জন্য যে আমার একটা সঙ্কল্প ছিল যে, যখনই পরীক্ষা দিতে বলিবে, তখনই পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব, দু' ঘণ্টা পরে পরীক্ষা দিতে হইলেও পশ্চাৎপদ হইব না। প্রতি দিনই এইরূপে পড়িবার কয়েকটি সুবিধা দেখিতাম। আমাকে কখনও রাত্রি জাগিয়া বা midnight oil পোড়াইয়া পড়িতে হইত না। তখন সন্ধ্যার পর ৯টার সময় তোপ পড়িত। তোপ পড়িলেই আমি শুইতে পারিতাম। অল্প সময়ের মধ্যে অধিক পাঠ করিলে পাঠে যে স্বল্পাধিকার অবশ্যম্ভাবী, আমার বোধ হয়, তাহা ঘটিত না। পরীক্ষার্থ পাঠ্য নয়, এমন অনেক পুস্তক পড়িবার সময়ও পাইতাম। পরীক্ষার কয়দিন সন্ধ্যার পর ৮টার সময় শুইতে পারিতাম। আর সংবৎসর রাত্রি ৩টার সময় উঠিয়া ২ ক্রোশ ২॥ ক্রোশ বেড়াইয়া সূর্য্যোদয়ের সময় বাড়ীতে ফিরিতাম। Leave not for tomorrow what can be done today—আজ যে কাজ করিতে পারা যায়, কাল করিব বলিয়া তাহা রাখিয়া দিও না—পঠদ্দশাতেও এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিতাম, চাকুরী করিবার সময়ও করিতাম। করিয়া দেখিয়াছি, কি পড়ায়, কি কর্ম্মকাজে, কৃতকার্য্য হইবার এমন অব্যর্থ উপায় আর নাই। মাসের পর মাস এই ভাবে চলিতেছে, আর যেন পারা যায় না,—মনে হয়, আর না, পরীক্ষা দিব না,—এত কষ্ট আর সহ্য হয় না, কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে। পরীক্ষার কয় দিন কি কষ্টে, কি ভয়ে গেল, বলা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, আর বুঝা গেল, পরীক্ষা মন্দ দেওয়া হয় নাই, সেদিনের সেই আনন্দ কত গাঢ়, কত গভীর, কত নির্ম্মল, কত ব্যাপক,—তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী যেন আমারই ন্যায় বন্ধনমুক্ত, আহার নিদ্রা যেন নূতন জিনিস, কত মিষ্ট, কেমন স্বেচ্ছাধীন! যে সে আনন্দ অনুভব করিয়াছে, কেবল সেই তাহার ধ্যান ধারণা করিতে পারে। ১৮৬৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের পুস্তকাগার যে ঘরে ছিল, সেই ঘরে আমাদের এম্, এ, পরীক্ষা হয়। পরীক্ষক ছিলেন Lobb সাহেব, এবং McCrindle সাহেব। পরীক্ষার শেষ দিনে প্রবন্ধ লিখিতে হইয়াছিল। প্রবন্ধের বিষয় ছিল,—On the causes of the comparative moderation with which the English Revolution of 1688 was on the whole

effected. বুঝিয়াছিলাম, প্রবন্ধ মন্দ লেখা হয় নাই। পূর্ব্বের কয় দিনের লেখাও মন্দ হয় নাই। তাই শেষদিন কাগজ দিয়া চলিয়া আসিবার সময় ঘরের ভিতরেই চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিলাম—"হরিবোল দাও।" কি আনন্দ বল দেখি! বুড়া বয়সে আবার ঠিক সেই যৌবনের আনন্দ! কম সৌভাগ্য কি? বিধাতার কি কম কৃপা! আর একদিন চোখ্ বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে আর একটা সুন্দর কথা মনে উঠায় আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিলাম। ইস্কুল কলেজের ছুটীতে যখন দেশে থাকিতাম, তখন মধ্যাহ্নভোজনের পর খানিক ঘুমাইতাম। ঘুম ভাঙ্গিলে দেখিতাম, অনেকগুলি প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা স্ত্রী আমার ঘরে বসিয়া আছেন। আমার কাছে কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি শুনিবার জন্ত তাঁহারা প্রতিদিন আসিতেন। আমাকে সুর করিয়া পড়িতে হইত। চোখে মুখে জল দিয়া কাঠাখানেক মুড়ি এবং একতাল মোহনভোগ খাইয়া আমি পড়িতে আরম্ভ করিতাম, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পড়িতাম। তাঁহারা আমার পড়ার খুব তারিপ করিতেন, আমিও যে একটু ফুলিয়া উঠিতাম না, এমন নয়। জটিলা কুটিলার দর্পনাশের কথা শুনিয়া তাঁহাদের ভারি উল্লাস হইত। বলিতেন,—বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, সতীত্বের আবার নাড়া কি না! জানিস না মরবে মেয়ে, উড়বে ছাই, তবে মেয়ের কলঙ্ক নাই। বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে। আমাদের রোজ রোজ শুনাইও ত চাঁদ। আমিও রোজ রোজ শুনাইতাম। তাহাতে আমার বড়ই আনন্দ হইত। চোখ বুজিয়া এখনও সেই আনন্দ দেখিবার ও ভোগ করিবার কোনও বাধাই দেখি না। সর্ব্বাপেক্ষা বেশী আনন্দ হয়, আমার জননীকে সকাল সন্ধ্যায় সেই সেকালের গঙ্গার বন্দনা সুর করিয়া পড়িয়া শুনাইবার কথা মনে করিয়া। ঐ বন্দনার ন্যায় সুন্দর জিনিস বাঙ্গালায় আর দেখি নাই। উহা যথার্থই বাঙ্গালীর লেখা বাঙ্গালা কবিতা। কোটী কোটী বাঙ্গালী নর নারীর অন্তিম আন্তরিক চিরপোষিত আশা আকাঙ্ক্ষা উহাতে অতি সহজ, অতি সাদা, অতি সরল, অলঙ্কারশূন্ত, আস্ফালনবর্জ্জিত ঘরের ভাষায় ব্যক্ত। ঐরূপ কবিতাই বঙ্গের জাতীয় (National) বা স্বদেশী কবিতা। এখনকার রচনা হইলে উহা অসীম, অনন্ত, উত্তাল, অভ্রভেদী, কূলপ্লাবী, ঊর্ম্মি প্রভৃতি লোকসাধারণের—বিশেষতঃ বঙ্গমহিলার অচেনা শব্দের দাপটে একটা কিম্ভূতকিমাকার জিনিস হইত। এইরূপ কবিতা—অর্থাৎ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, গঙ্গার বন্দনা প্রভৃতি পড়িতে

পড়িতে মনে হয়, এ সকল আমাদের ঘরের কথা, ঘরের লোকের দ্বারা ঘরের ভাষায় লিখিত। মাইকেল, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কবিতা, নানাগুণ সত্ত্বেও, যেন আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা নয়। সুতরাং মাইকেলের, হেমচন্দ্রের, নবীনচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের কবিততে বাঙ্গালী নর.নারার অন্তরের কথা নাই, যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত আশা আকাঙ্ক্ষা দেখি না। তাই ব'লি, তাঁহাদের কবিতা বাঙ্গালীর জাতীয় (National) কবিতাও নয়, স্বদেশী কবিতাও নয়। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ের কথা, বাঙ্গালী ভক্তের কবিতাও নয়। বঙ্গে এখন আর ভক্ত জন্মিতেছে না, রামপ্রসাদের পর ভক্ত হয় নাই বলিলেই হয়। সুতরাং মর্ম্মস্পর্শী কবিতা বা গান আর রচিত হইতেছে না। একটা গল্প মনে পড়িল। বলি শুন, বঙ্কিম দাদা হুগলীর ডিপুটী। যোড়াঘাটের উপর তাঁহার বৈঠকখানা। এক দিন সেইখানে বসিয়া বলিয়াছিলেন—মাইকেল পড়িলাম, ভাল লাগিল না। হেম পড়িলাম, ভাল লাগিল না। তখন শুনিলাম, এক ডিঙ্গী-ওয়ালা ডিঙ্গী বাহিয়া যাইতেছে, আর গাহিতেছে,—"সাধ আছে মা মনে, দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবীজীবনে।" গান বড় ভাল লাগিল। তাই বলিতেছি, বঙ্গে নব্য বাঙ্গালায় এখনও জাতীয় এবং স্বদেশী কবিতা লিখিত হয় নাই। এখনও কেবল বিজাতীয় বিদেশী কাব্য ও কবিতা লিখিত হইতেছে। যখন দেখিব, বঙ্গের নূতন কাব্য বা কবিতায় সুপরিচিত ঘরের কথা দেখিয়া দোকানী পশারী পর্য্যন্ত গাছতলায় বসিয়া কাশীদাস্ কৃত্তিবাস যেমন মুগ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি মুগ্ধ হইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন বুঝিব, বঙ্গে বাঙ্গালীর জাতীয় ও স্বদেশী কাব্য বা কবিতা লিখিত হইতেছে। সাহিত্য যখন মূর্খের মন পর্য্যন্ত অধিকার করে, সাহিত্য তখনই শক্তিস্বরূপ হইয়া জাতির মনে শক্তি সঞ্চারিত করে, তাহার আগে করে না। আমাদের কাশীদাস ও কৃত্তিবাস বহুকাল শক্তিরূপ ধারণ করিয়াছে। পণ্ডিত মূর্খ, স্ত্রী পুরুষ, সকলকেই অধিকার করিয়াছে। মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার এবং কুরুক্ষেত্র, এখনও শক্তিশালী হয় নাই। কখনও হইবে কি না সন্দেহ। আর যাঁহারা "জানালার ধারে", "কপাটের ফাঁকে", "পর্দ্দার আড়ালে", "আকাশ পানে", "আর বলিব না" প্রভৃতি উদ্ভুট্ট নাম দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা লেখেন, তাঁহাদের কূল কিনারাই খুঁজিয়া পাই না। এইরূপ কবিতা, এমন কি, মাইকেল প্রভৃতি পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতে মনে হয়,—এ সব বাহিরের

লোকের লিখিত বাহিরের কথা, কৃত্তিবাসাদির ন্যায় এবং সেই গঙ্গার বন্দনাদির ন্যায় ঘরের লোকের লিখিত ঘরের কথা নয়। বাহিরের কথা লিখিলে যে মহাপাতক হয়, তা নয়; কিন্তু বাহিরের কথা ঘরের কথার মত করিয়া না লিখিলে মহাপাতক হয় বৈ কি। বাঙ্গালা সাহিত্য যখন এখনও বৈদেশিকতায় পরিপূর্ণ, তখন কেমন করিয়া বলি যে, বাঙ্গালী স্বদেশভক্ত ও স্বদেশপ্রিয় হইয়াছে? কাজেই বলিতে হয়, এই যে স্বদেশী সুর শুনা যাইতেছে, ইহা জোর করিয়া গাওয়া সুর। বাঙ্গালা সাহিত্যে এখনও বৈদেশিকতার বিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছি। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, স্বদেশী আন্দোলনের সময় বঙ্গে এখনও হয় নাই। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমি বিবাহ করিয়াছিলাম। কাজেই যে সকল মহিলাকে কৃত্তিবাসাদি পড়িয়া শুনাইতাম, তাঁহাদের মধ্যে আমার সহধর্ম্মিণী থাকিতেন না। এখন তিনি নিজে একটু একটু পড়েন। রামায়ণ মহাভারতই বেশী পড়েন। বলেন, রামায়ণ মহাভারত যতবারই পড়ি, ভাল লাগে। অন্য বই একবার পড়িলে আর ভাল লাগে না। এই জন্য আমার অন্দরমহলে, অর্থাৎ যেখানে আমার পত্নীর প্রভুত্ব, সেখানে নবেলের বড় একটা দৌরাত্ম্য নাই! অমিত্রাক্ষর ছন্দের উপর তিনি বিরক্ত। বোধ হয় ইস্কুল কলেজে পড়া স্ত্রীলোক ছাড়া সকল স্ত্রীলোকই বিরক্ত। আমারও উহা মিষ্ট লাগে না। আমার মনে হয়, ঐ ছন্দে কবিতা লিখিয়া মাইকেল একটা জঞ্জাল ঘটাইয়া গিয়াছেন। সেই সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী আমার বড়ই ভাল লাগে। কিন্তু এখন ঐ সকল সোজা সরল ছন্দ বড়ই ঘৃণত, এক রকম মূর্খের ছন্দ বলিয়া পরিত্যক্ত। হেমচন্দ্র মিষ্ট পয়ার লিখিতে পারিতেন। মাইকেলের হেঁপায় না পড়িলে বোধ হয় সমস্ত বৃত্রসংহারখানা পয়ারে লিখিয়া বঙ্গে যথার্থই বাঙ্গালীর প্রিয় একখানা বাঙ্গালা কাব্য রাখিয়া যাইতেন। আর সেই কাব্যখানাকে বাঙ্গালী জাতীয় (National) এবং স্বদেশী কাব্য জ্ঞানে পুলকিত হইত। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান এবং দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য পুরাতন ছন্দে লেখা। পড়িতে পড়িতে সকলেই আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত ঘরের কথা বলিয়া অনুভব করে। রঙ্গলালের কাব্যে হিন্দু রমণীর সতীত্বরক্ষার্থ আপন প্রাণবিসর্জ্জনের কথা আমাদের সেকালের ধরণে লিখিত হইয়াছে। আর সুরধুনী কাব্যের ত কথাই নাই। আমাদের গঙ্গামায়ের উৎপত্তিস্থান হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত মায়ের যে কূলে যত স্থানে আমাদের

ধন ধান্য বিদ্যালয় অতিথিশালা পণ্ডিতসমাজ দেবালয় রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ প্রভৃতি বিশাল হিন্দু সভ্যতার অগণ্য নিদর্শন আছে, আমাদের ঘরের কথায় তাহার অপূর্ব্ব বিবরণ দেখিতে পাই। যথা,—

(১)

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরী বাণিজ্যবাহন,
সরিষা, মসিনা, মুগ, কলাই, মুসুরি,
চাল, ছোলা বিরাজিত দেখি ভূরি ভূরি।

(২)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধামতি অতি চমৎকার।

(৩)

অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী,
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্যধামে,
সেবা হেতু জমীদারি লেখা তাঁর নামে,
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর
অতিথির বাস জন্য বহুবিধ ঘর।"

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিদ্যালয়, অতিথিশালা, দেবালয়, দেবমন্দির প্রভৃতি আমাদের সভ্যতার সমস্ত ইতিহাস এই সুরধুনী কাব্যে দেখিয়া মোহিত ও উল্লাসিত হইতে হয়। একটা নদীর ধারে একটা বিরাট জাতির বিরাট ইতিহাস চিত্রিত—এ কি সামান্য জিনিস! মনে হয়, যেন আমাদের ঐশ্বর্য্যরূপিণী, ঐশ্বর্য্যশালিনী, ঐশ্বর্য্যদায়িনী মায়ের দুই কূল আমাদের বিপুল সভ্যতা দ্বারা বাঁধানো। আর মা আমাদের উচ্ছ্বাসিতপ্রাণে যখন সেই বাঁধ ছাপাইয়া যান, তখন মাঠকে মাঠ, গ্রামকে গ্রাম, জেলাকে জেলা মায়ের সোনার জলে ডুবিয়া যায়, আর যথাসময়ে সেই জল সুবর্ণের শস্য-রাশিতে পরিণত হয়। এমন মা কি আর কাহারও আছে! যেরূপ মায়ের দুইটি কূলমাত্র দেখিয়া সকলেই একটা বৃহৎ জাতির বৃহৎ সভ্যতার প্রকৃতি বুঝিতে পারে, সেরূপ মা কি আর কাহারও আছে! ঘরের কথায় পুণ্যতোয়া সুরধুনীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া দীনবন্ধু অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। ধিক্ আমাদের, আমরা: তাঁহার নাটক লইয়া উন্মত্ত, কিন্তু

সুরধুনী কাব্য পড়ি না। সুরধুনী কাব্য কেবল কাব্য নয়, ভারতবর্ষের অমন সজীব, সুন্দর পবিত্র ইতিহাস আমি ত আর দেখিতে পাই না।

সুরধুনী কাব্যের কথায় আমার স্বর্গীয়া মাতৃরূপিণী জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কথা মনে হইল। তাঁহারও নাম ছিল সুরধুনী। মায়ের আদর, মায়ের স্নেহ, মায়ের যত্ন, মায়ের সোহাগ তাঁহার কাছে পাইতাম। মনে মনে এখনও পাই। আমার সৌভাগ্যবলে দিদি আমার শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার মেজ ভগ্নী মন্দাকিনীর অতি নিরীহ সরল প্রকৃতি ছিল, সাত কাহাকে বলে, তাহাও সে জানিত না, পাঁচ কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না। আমার সৌভাগ্যক্রমে সেও শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিল। এখন কেবল আমার কোলের বোন বরদাসুন্দরী আছেন। তিনি কোন্নগর-নিবাসী ডাক্তার অমৃতলাল দেবের পত্নী। তিনি বড় বুদ্ধিমতী। আমার পূজ্যপাদ বন্ধু ডাক্তার প্রাণধন বসু তাঁহার বাড়ীতে চিকিৎসা করিয়া আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার ভগ্নীর মতন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি দেখি নাই।" কিন্তু অমৃতভায়া বহুমূত্র রোগে আমারই ন্যায় ভগ্নস্বাস্থ্য। কখন আছেন, কখন নাই, বলা যায় না। তাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার বরদাসুন্দরীও যেন আমার অপর দুই ভগিনীর ন্যায় শাঁখা সিঁদুর পরিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

আমাদের শেষ পয়ার-প্রিয় ছিলেন অক্ষয় ভায়ার সর্ব্বজনসম্মানিত স্বর্গীয় পিতা গঙ্গাচরণ সরকার। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে মনে হয়, আমাদের ঘরের লোকের দ্বারা লিখিত আমাদের ঘরের ও মরমের কথা পড়িতেছি। আর মনে করিলে সেই রকম কবিতা লিখিতে পারেন অক্ষয় ভায়া নিজে। বিশেষ, বঙ্গ ও বাঙ্গালী তিনি যেমন জানেন ও বোঝেন ও ভাল-বাসেন, তেমন আর কেহ নহে। সুতরাং মনে করিলে তিনি বঙ্গের কথা অতুলনীয় কবিতায় লিখিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তিনি মনে করিবেন বলিয়া আমার আশা নাই। এ জন্মটা তিনি ঘটি ঘটি জল খাইয়া এবং লম্বা লম্বা ঢেঁকুর তুলিয়াই কাটাইয়া দিলেন। পদ্যপাড়ায় রবীন্দ্রনাথের অসাধ্য কিছুই নাই। কি জানি কেন, আমার এখনও কিন্তু মনে হয় যে, তিনি বাঙ্গালীর ঘরের কথা এবং মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন না। তিনি বাঙ্গালা কবিতাকে জাতীয় ও স্বদেশী করিয়া তুলিবেন বলিয়া আশা হয় না। এক অক্ষয়চন্দ্র বাঙ্গালীর ঘরের কথা ও মনের কথা ভক্তের ন্যায় ভালবাসেন,

এবং পাঁতি পাঁতি করিয়া দেখেনও বটে। কিন্তু তাঁহার বিরাট আলস্যের কথা মনে হইলে তাঁহার কাছে যাইতে সাহস হয় না। তাঁহার বঙ্গপ্রিয়তার কথা একদিন কহিবার ইচ্ছা আছে। কহিতে পারিব কি না, জানি না। অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয় যে অতলস্পর্শ।

আমার বড়াই করিবার কথা একটা আছে। কথাটা সর্ব্বদাই মনে হয়, আর মনে হইলেই আনন্দ ও একটু অহঙ্কার হইয়া থাকে। আমার বয়স যখন ১২ কি ১৩ বৎসর, তখন আমাকে একক কৈকালা হইতে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছিল। অগ্রহায়ণ মাস, অল্প শীত পড়িয়াছে। প্রাতে বেলা ৯টার সময় ভাত খাইয়া রওনা হইলাম। মাকে ছাড়িয়া আসিতেছি, এবং সঙ্গে কেহ নাই, নিতান্ত একলাটি আসিতেছি, এই জন্য মন বড় বিষণ্ণ। কিন্তু ইস্কুলের ছুটী অনেক দিন ফুরাইয়াছে, বাবা বার বার কলিকাতায় আসিতে লিখিতেছেন, সুতরাং বুক বাঁধিয়া আসিতেছি। আসিব বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে ;—কৈকালা হইতে পাকা ৮ ক্রোশ। বেলা ২॥০ টার সময় বৈদ্যবাটী ষ্টেশনে গাড়ী আসে। তাহাতেই কলিকাতায় আসিব। বৈদ্যবাটীতে বেলা ১টার পরেই আসিলাম। দোকানে বসিয়া রহিলাম এক ঘণ্টার কম নয়। তাহার পর গাড়ী আসিলে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। চারি ঘণ্টায় ৮ ক্রোশ পথ হাঁটিয়াছিলাম। ১২ বছরের বালকের পক্ষে এটা একটা বিক্রম বলিয়া মনে করিয়া একটু অহঙ্কার অনুভব করি। অন্যায় করি কি? এখনকার বড়রা চারি ঘণ্টায় ৮ ক্রোশ হাঁটিতে পারেন কি ?

আর একটি কথা মনে হইলে বড়ই বিমল আনন্দ অনুভব করি। Oriental Seminaryর Branch Schoolএ পড়ি। বয়স ১৪ বৎসর। আমাদের শ্রেণীতে একটি নূতন মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। Main ইস্কুলের হেডমাষ্টার স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় অর্থাৎ Star থিয়েটরের অমৃত-লালের পিতা শিক্ষকটিকে আনিয়াছিলেন। তাঁহার সব ভাল, কিন্তু বয়স বড় কম। তাঁহার অপেক্ষা বয়সে বড় এমন অনেক দুর্দ্দান্ত ছেলে আমাদের শ্রেণীতে পড়িত। তাহারা নূতন শিক্ষকের শত্রুতা করিতে লাগিল। ইচ্ছা নয় যে, তাহাদের অপেক্ষা কম বয়সের লোক তাহাদের শিক্ষকতা করে। তাহারা তাঁহাকে নানারূপে জ্বালাতন করিতে লাগিল। আহিরীটোলার ছেলেদের দুষ্ট বলিয়া অখ্যাতি ছিল। শিক্ষকটির নাম মনে নাই—বোধ হয়, সারদা। তিনি পড়াইতে আসিলেই বিদ্রোহী বালকগুলি গোল করিয়া

তাঁহাকে পড়াইতে দিত না। তিনি এণ্ট্রান্স পাস করিয়াছিলেন। আহা, বেচারা একদিন এণ্ট্রান্সের সার্টিফিকেটখানি আনিয়া সকলকে দেখাইয়াছিলেন;—বোধ হয়, আশা করিয়াছিলেন যে, উহা দেখিলে সকল ছেলেই তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিবে। কিন্তু তাহা হইল না। বিদ্রোহীরা তেমনই বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিতাম। তাঁহার জন্য আমার বড় দুঃখ হইল। আমি অনেককে বুঝাইলাম। কিন্তু কিছুই হইল না। তিনি কৈলাস বাবুকে জানাইলেন। কৈলাস বাবু আমাদের কেলাসে আসিলেন। কে বিরুদ্ধাচরণ করে, আমাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। দেখিলাম, আমার উপর বড় বড় কটাক্ষ পড়িতে লাগিল। আমি কিন্তু নির্ভয়ে তাহাদের নাম বলিয়া দিলাম। কৈলাস বাবু গোঁপের বাম প্রান্ত কামড়াইতে কামড়াইতে চলিয়া গেলেন। দণ্ডের কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, জানি না। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে গরীব শিক্ষকটিকে আর কেহ বিরক্ত করিল না। বুঝিলাম, একটি অতি সুশিক্ষিত কর্ত্তব্যপরায়ণ অন্নহীনের অন্ন বজায় রহিল। এরূপ না হইলে তাঁহাকে ছেলেগুলার জ্বালায় চাকরী ছাড়িয়া পলাইতে হইত। আহা! তাঁহাকে সেই বিপদে রক্ষা করিবার জন্য কিঞ্চিৎ করিতে পারিয়াছিলাম মনে হইলে এখনও কি একটা আনন্দ জন্মে, তাহা বর্ণনা করিতে পারি না। আমার মনই জানে, সে কি আনন্দ! আর জানেন সর্ব্বসুখদাতা বিধাতা। তাই মনে হয় যে, ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়া যখন পরলোকের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইব, তখন বোধ হয় সেখান হইতে আমাকে বিতাড়িত হইতে হইবে না। হইলেই বা কি করিতে পারিব। যাহা ঘটিবে, তাহাই কর্ম্মফল বলিয়া হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু এই যে আত্মপ্রসাদটুকু, এটুকু বোধ হয় মারা যাইবে না। না গেলেই আমার যথেষ্ট হইবে। তাহার বেশী পাইবার অধিকার বা প্রয়োজন আমার আছে, এরূপ বিশ্বাস বা ধারণা আমার এ পর্য্যন্ত নাই।

আর একদিন চক্ষু বুজিয়া ভাবিতে ভাবিতে মাধব কাকার সেই খাওয়ার কথা মনে হইল। আমাদের পাড়ায় মাধবচন্দ্র বসু এবং ঈশানচন্দ্র বসু নামে আমার দুই কাকা ছিলেন। কাকারা এবং কাকীরা আমাদিগকে বড়ই ভালবাসিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম, গল্প করিতাম, মুড়ি চা'লভাজা খাইতাম, ইত্যাদি। একদিন সন্ধ্যার

সময় গিয়া শুনিলাম যে, আজ মাধব কাকা দিগম্বর দাদার সঙ্গে বাজি রাখিয়া নাকি ১ সের ময়দার রুটী খাইবেন। পাকি ১ সের ময়দার রুটী হইল। প্রতি সেরে ৪১॥ খানা করিয়া মাঝারি রুটী হইল। মাধব কাকা ৵১ সের ময়দার রুটী খাইতে বসিলেন। বাকী ৵১ সের ময়দার রুটীতে আমাদের ৫।৭ জনের জলযোগ হইল। রুটীর সঙ্গে মাধব কাকা পোয়া তিনেক দুধ, খানিকটা গুড়, আর আধ সের আড়াই পোয়া তরকারি লইলেন। দুধে খান আষ্টেক রুটী ফেলিলেন। তার পর খাইতে আরম্ভ করিলেন। যখন অর্দ্ধেকেরও বেশী খাওয়া হইল, তখন বোধ হইল, যেন মাধব কাকার কিছু কষ্ট হইতেছে। তাঁহার বড় মেয়ে তাই দেখিয়া আমাদিগকে বলিলেন,—বাবাকে ভোরে ভাত খাইয়া কলিকাতায় যাইতে হইবে, উঁহাকে আর খাইতে বারণ কর, আমি পাঁচ টাকা দিব। মাধব কাকা শুনিয়া বলিলেন,—তোদের ভাবিতে হইবে না, তোরা ভোরে আমার জন্য ভাত রাঁধিস, আমি খাইয়া কলিকাতায় যাইব। খানিক পরে মাধব কাকা সেই রুটীর কাঁড়ি, দুধ, গুড় ও তরকারি শেষ করিলেন। আমরা মহোল্লাসে শাঁক ঘণ্টা কাঁসর বাজাইলাম। খুব প্রত্যূষে উঠিয়া মাধব কাকার বাড়ীতে ছুটিয়া গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তিনি অনেক আগে যেমন ভাত খাইয়া থাকেন, তেমনি ভাত খাইয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছেন। আমাদের আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই কথা মনে হইলে কেবল ভয় ভাবনা হয়। আমাদের সেই খাওয়া কোথায় গেল, ভাবিয়া বিষাদে মগ্ন হই। আমাদের ভোজনশক্তি যে কমিয়াছে, হীরেন্দ্রনাথ নাকি তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। তাঁহাকে জানাইবার জন্য মাধব কাকার খাওয়ার কথা লিখিলাম।

(ক্রমশঃ।)

সোনার ল্যাজ।

১

প্রভাতী চা পান শেষ হইলে দারোগা নটবর দত্ত আলবোলার নলটি মুখে তুলিয়া লইলেন। পূবের খোলা জানালা দিয়া আর্দ্র বাতাস ছুটিয়া আসিতেছিল। আকাশ বর্ষণক্লান্ত মেঘে আচ্ছন্ন। 'বাদলা'র' দিনে গরম চা ও তাম্রকূটধূম নটবরের হৃদয়ে বহুদিনের বিস্মৃতপ্রায় একটা সুখের চিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিল।

তাওয়াটা সবে ধরিয়াছে, এমন সময় জেলার পুলিস সাহেবের চাপরাসী আসিয়া সংবাদ দিল, হুজুর তাঁহাকে সেলাম দিয়াছেন। বিশেষ জরুরী কাজ।

নটবর মনে মনে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু মনিবের হুকুম অমান্য করিবার উপায় নাই।

চাপরাসীকে বিদায় দিয়া দারোগা বাবু ধড়া চূড়া অঙ্গে ধারণ করিলেন। একবার গড়গড়ার দিকে হতাশভাবে চাহিয়া তিনি বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেছেন, সহসা পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া গেল। ত্রয়োদশবর্ষীয়া কুমারী কন্যা সুরমা পিতাকে অসময়ে বাহিরে যাইতে দেখিয়া বলিল, "বাবা, এত সকালে কোথায় যাচ্ছেন?"

দত্ত মহাশয় সস্নেহে বলিলেন, "যে পরের চাকর, তার আর সময় অসময় নেই মা; সাহেব ডেকেছেন।"

এই কন্যারত্নটি ছাড়া নটবরের সংসারে অন্য কোনও বন্ধন ছিল না। তাঁহার স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির আধারগুলি বহুদিন হইল সংসার-আবর্ত্তে পড়িয়া কোথায় ডুবিয়া গিয়াছে! সর্ব্বদা চোর ডাকাত ঠেঙ্গাইয়া, সাধু বা অসাধু উপায়ে দোষী অথবা নির্দ্দোষকে ফাঁসীকাঠে ঝুলাইয়া দারোগার হৃদয় শুষ্ক ও কঠোর হইয়া গিয়াছিল। পুলিস-সংসর্গের মহান্‌ ও বিচিত্র গুণ এই যে, মানুষ অতি সহজে সন্ন্যাসীর ন্যায় দয়া মায়া প্রভৃতির মোহ-বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইতে পারে; তজ্জন্য সংযম বা তপস্যার কোনও প্রয়োজন হয় না। নটবরের হৃদয় মরুভূমির ন্যায় শুষ্ক ও কঠোর হইলেও কন্যার প্রতি তাঁহার অসাধারণ স্নেহ ও মমতা ছিল। বিধাতার আশীর্ব্বাদে মরুভূমিতেও ওয়েসিস্‌ পরিদৃষ্ট হয়।

পুলিস সাহেবের কুঠীতে পৌঁছিবামাত্র চাপরাসী নটবরকে সাহেবের খাসকামরায় লইয়া গেল। স্বাগতসম্ভাষণের পর সাহেব বলিলেন, "দত্ত, তোমার উপর একটা কাজের ভার দিতে চাই। তোমার কার্য্যতৎপরতায় গবর্মেণ্ট তোমার উপর সন্তুষ্ট, তাই এই অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজটা তোমার হাতে দিতেছি।"

নটবর গলিয়া গেলেন। স্বয়ং গবর্মেণ্ট তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট! রাজার কার্য্যে তিনি জীবন দিতে পারেন। আনন্দবেগ কিয়ৎপরিমাণে সংযত করিয়া দারোগা বিনীতভাবে বলিলেন, "হুজুরের দয়াতেই বাঁচিয়া আছি। যে কাজ করিতে বলিবেন, অধীন তখনই তাহা সম্পন্ন করিবে।"

ঈষৎ হাসিয়া হুজুর বলিলেন, "তুমি বিশ্বাসী, এবং রাজভক্ত কর্ম্মচারী বলিয়াই তোমাকে ডাকিয়াছি। এবং আমার বিশ্বাস, এ কার্য্য তোমার দ্বারাই সিদ্ধ হইবে।"

গদ্‌গদভাবে নটবর বলিলেন, "হুজুরের কোন্ আদেশ পালন করিতে হইবে, জানিতে পারি কি?"

অর্দ্ধহস্তপরিমিত তাম্রবর্ণ গুম্ফে 'চাড়া' দিয়া গম্ভীরভাবে সাহেব বলিলেন, "কাজটা গুরুতর। শুনিতেছি, বরমগঞ্জে স্বদেশীর বড় প্রাদুর্ভাব। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ও কয়েক জন নিষ্কর্ম্মা যুবকের অত্যাচারে গ্রামের ব্যবসায়ীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা বৃটিশ শাসনের কলঙ্ক। সেখানে যে সবইন্‌স্পেক্টর আছে, সে কোনও কাজের লোক নহে। তাই তোমাকে তথায় পাঠাইতেছি। এই সব অত্যাচার দমন করা চাই। কয়েক জন দুর্ব্বৃত্ত নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়া গুরুতর দণ্ড দিতে পারিলেই গ্রামে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। বুঝিয়াছ, দত্ত?"

দারোগা নটবর সোৎসাহে বলিলেন, "এ আর এমন কি কঠিন কাজ, হুজুর? আমি এক মাসের মধ্যেই সব ঠাণ্ডা করিয়া দিব।"

শ্বেত দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া পুলিশ সাহেব বলিলেন, "বয়কটটা যাহাতে উঠিয়া যায়, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিতে হইবে। যদি ভালরকম একটা 'কেস্' গড়িয়া তুলিতে পার, দত্ত, তাহা হইলে এবার স্পেশ্যাল ইন্‌স্পেক্টরের পদ তোমাকে দিব। কমিশনার সাহেব স্বয়ং গবর্মেণ্টের কাছে তোমার সুখ্যাতি করিয়া লিখিয়াছেন। এ কাজ সন্তোষজনক রূপে সমাপ্ত করিতে পারিলে তুমি রায় বাহাদুর হইতে পারিবে।"

নটবর আজ প্রভাতে কি শুভক্ষণে কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলেন! চারি দিক হইতে কেবল সুসংবাদই আসিতেছে। রায় বাহাদুর! রায় বাহাদুর খেতাব সত্যই কি তাঁহার অদৃষ্টে নৃত্য করিতেছে? এমন শুভ দিন কি আসিবে?

অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার পর দত্ত মহাশয় ডবল সেলাম ঠুকিয়া প্রফুল্লমুখে কক্ষত্যাগ করিলেন।

২

বরমগঞ্জের মসনদে উপবিষ্ট হইবামাত্র প্রবীণ দারোগা নটবর দত্তের নাম গ্রামমধ্যে প্রচারিত হইল। নিজ মুখে প্রকাশ না করিলেও তিনি যে স্বদেশী দলনে আসিয়াছেন, গ্রামের ইতর ভদ্র, বালক যুবক, বৃদ্ধ সকলেই

তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে কেহ বিচলিত হইল না। তাহারা পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে, একান্তমনে মাতৃভূমির সেবায়—দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে মন দিল।

দত্ত মহাশয় দেখিলেন. গ্রামের ইতর ভদ্র, বালক যুবা, ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই মাতৃসেবার মহামন্ত্রে দীক্ষিত। ব্যবসায়ীকে কেহ বলেন না,—'তুমি বিলাতী পণ্য আমদানী করিও না।' ক্রেতাকে অনুরোধ করিতে হয় না; সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বদেশজাত পণ্যদ্রব্য কিনিয়া লয়। কেহ কাহারও উপর জোর জুলুম করে না। 'পিকেটিং' অথবা বিলাতী দ্রব্যকে 'বয়কট' করিবার বিরাট সভা সমিতিরও কোনও অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা বুঝিতে না পারিয়া বহুপূর্ব্বে বিলাতী বস্ত্র, লবণ. চিনি প্রভৃতি দ্রব্যের আমদানী করিয়াছিল, ক্রেতার অভাবে সেগুলি দোকানে পচিতেছে; কিন্তু মহাজনেরা সেজন্য কোনও প্রকার আক্ষেপ করিতেছে না।

দত্তমহাশয় গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে একনিষ্ঠ মাতৃপূজার এরূপ আগ্রহদর্শনে শঙ্কিত ও বিস্মিত হইলেন। কার্য্যোদ্ধারের কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা কোন সূত্র না পাইলে পুলিস গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে কিরূপে? কাহাকেও বাদিরূপে খাড়া করিতে না পারিলেত কোনও ব্যক্তিকে আসামী করা যায় না। সুতরাং পুলিসের শক্তি, নটবরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিল।

দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলিয়া গেল। দত্তমহাশয় কোনও উপায়ের আবিষ্কার করিতে না পারিয়া গ্রামবাসীর ও পরিশেষে নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। সঙ্কল্প ব্যর্থ হইলে মানুষের ক্রোধ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। নটবর সকল গ্রামবাসীর উপর হাড়ে চটিয়া গেলেন। হায়! রায়বাহাদুর-রূপ সোনার ল্যাজটির আশা কি শেষে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে?

বিশেষ অনুসন্ধানে দারোগা অবগত হইলেন, রমেশচন্দ্র বসু নামক যুবকটিকে যদি কোনরূপে মোকদ্দমায় জড়ান যায়, তাহা হইলে বরমগঞ্জের স্বদেশী আন্দোলনকে অনেকটা কায়দা করিতে পারা যায়। রমেশচন্দ্র এম্. এ. পাশ করিয়া কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন। সম্প্রতি পূজার বন্ধে দেশে আসিয়াছেন। গ্রামের সকলেই তাঁহাকে ভালবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে। বাজারের ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরা তাঁহার কথা

বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া চলে। ছেলের দলের তিনি নেতা। ইতর ভদ্র সকলেরই বিপদ আপদে তিনি পরম বন্ধু। রমেশ সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া গ্রামবাসীদিগের অভাব অভিযোগ জানায়। মামলা মোকদ্দমা হইলে পরামর্শ দেয়। এক কথায় রমেশচন্দ্র গ্রামের মেরুদণ্ড।

দারোগা এই মিতভাষী সর্ব্বজনপ্রিয় যুবকটির কার্য্যের উপর লক্ষ্য রাখিলেন।

কিন্তু যুবকটি বড় ধূর্ত্ত! এক মাসের মধ্যে শতচেষ্টা করিয়াও দত্ত তাঁহাকে কায়দা করিতে পারিলেন না। তাঁহার সমস্ত 'চাল' তিনি ব্যর্থ করিয়া দিলেন। 'পড়তা' যখন মন্দ হয়, 'দান' তখন কিছুতেই পড়িতে চায় না।

পুলিস সাহেব লিখিলেন, "দত্ত কত দূর? অক্টোবর মাসের শেষেই যে 'রায়বাহাদুর' টাইটেল গবর্মেণ্ট মঞ্জুর করিবেন।"

সে রাত্রি দারোগার সুনিদ্রা হইল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, দুই চারি দিনের মধ্যেই সৎ অসৎ, সত্য মিথ্যা, যে কোনও উপায়েই হউক না কেন, স্বদেশীর শ্রাদ্ধ করিতেই হইবে।

৩

৩০শে আশ্বিন। বঙ্গের নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে রাখীবন্ধন উৎসবের অনুষ্ঠান হইতেছিল। বরমগঞ্জের পল্লীশ্রী পুণ্য প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রত্যুষে নদীর পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া গ্রামের উৎসাহী যুবক ও বালকের দল মন্ত্রপূত রাখী হস্তে পল্লীতে পল্লীতে ফিরিতেছিল। তাহাদের আননে কি অপূর্ব্ব আনন্দজ্যোতিঃ, নয়নে কি স্নিগ্ধ-শান্তি ও আলোকদীপ্তি! 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে আকাশ, প্রান্তর ও কানন প্লাবিত হইয়া গেল। মাতার বন্দনা-গীতি সুপ্তিমগ্ন গ্রামবাসীর কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিল।

বাজার ও হাটের সমগ্র দোকানের দ্বার রুদ্ধ। ক্রয় বিক্রয় একেবারে বন্ধ; হিন্দু ও মুসলমান সকলেই এই পুণ্য দিনের স্মৃতি উপলক্ষে অরন্ধন-ব্রত-পালনে দৃঢ়সংকল্প। কোনও গৃহস্থের গৃহে আজ অগ্নি প্রজ্বলিত হইবে না।

নটবর দেখিলেন, আজিকার মত শুভ অবসর শীঘ্র আর আসিবে না। অভিযোগ কেহ করুক আর নাই করুক, দোষ থাক আর নাই থাক,

উৎপীড়ন ও দাঙ্গা হাঙ্গামার অজুহাতে আজ এক দলকে গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। "দুরাত্মার ছলের অসদ্ভাব নাই"—তাঁহারই বা থাকিবে কেন? কিন্তু প্রমাণ?—সে পরের কথা। আগে এক দলকে এখন হাজতে রাখা ত যাক্! তার পর অপরাধের একটা 'চার্জ্জ' খাড়া করা যাইবে। ভবিষ্যতে যদি মোকদ্দমা নাই টেকে? তাতেই বা এমন ক্ষতি কি? স্বদেশী দলনের উদ্দেশ্যটা ত অনেকটা সফল হইবে।

চারি জন কনষ্টেবল সহ দারোগা বাবু শিকারের সন্ধানে বাহির হইলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবার পর তিনি দেখিলেন, এক দল যুবক মাতৃ নামগানে পল্লীপথ মুখরিত করিতে করিতে তাঁহাদেরই অভিমুখে আসিতেছে। দলের অগ্রে স্বয়ং রমেশচন্দ্র।

নটবর অনুচরবর্গকে প্রস্তুত থাকিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। রমেশচন্দ্র সদলবলে তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দারোগা বাবুকে দেখিয়া তিনি সহাস্যে বলিলেন, "কি দত্ত মহাশয়, আজ রাখীবন্ধনের দিনে এত পুলিস নিয়ে কোথায় চলেছেন?"

গম্ভীরমুখে দারোগা বলিলেন, "মাপ করিবেন, রমেশ বাবু, আজ আপনাদের বিরুদ্ধে একটা গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত। তাই আমি আপনাকে দলবল সহ গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছি।"

রমেশ বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি অভিযোগ দারগা বাবু?"

"সে সব পরে জানিতে পারিবেন। এখন আপনারা আমার বন্দী।"

রমেশ বলিলেন, "অপরাধ কি, না জানিতে পারিলে, আমি যাইব কেন? বিশেষতঃ, গ্রেপ্তারী পরোয়ানাখানা ত দেখান? বেআইনী কাজ করিলে লোকে আপনার কথা শুনিতে চাহিবে না। কেহ আপনার কাছে নালিশ করিয়াছে?"

নটবর বলিলেন, "আইন কানুনের কথা বিচারের সময় তুলিবেন। এখন আমি আপনাদের নিশ্চয়ই থানায় লইয়া যাইব। কোনও কৈফিয়ৎ এখন চাহিবেন না। আমরা পুলিসের লোক, সকলের সব কথার জবাব দিতে গেলে আমাদের চলে না। এখন গোলযোগ না করিয়া থানায় চলুন।"

রমেশ মুহূর্ত্তমাত্র কি চিন্তা করিলেন। তার পর প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "তা আমি যাইতেছি। কিন্তু আমিও যে আপনাকে আজ বন্দী করিতে আসিয়াছিলাম। আগে আমরা আপনাকে বাঁধি।"

দারোগা চমকিয়া উঠিলেন। ব্যাকুলভাবে কনেষ্টবলগণের পানে চাহিলেন। তার পর দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তামাসা রাখুন, থানায় যাবেন কি না বলুন ?"

বিনীতভাবে রমেশ বলিলেন, "আমি তামাসা করিতেছি না, সত্যই আপনার সঙ্গে থানায় যাইব। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদেরও কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই।"

রমেশ পীতবর্ণের একগাছি রেশমের রাখী বাহির করিলেন; প্রশান্ত-স্বরে বলিলেন, "ভারতবর্ষের স্মরণীয় দিনে এই পবিত্র রাখী আপনাকে বাঁধিতেই হইবে।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই রমেশ দারোগা বাবুর দক্ষিণ হস্তের প্রকোষ্ঠে মন্ত্রপূত রাখী বাঁধিয়া দিলেন। সমবেত যুবকগণ পূর্ণকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করিল। সেই প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গে দত্ত মহাশয়ের আপত্তির ক্ষীণ শব্দ ডুবিয়া গেল।

সঙ্গী চারি জন কনষ্টেবলের হস্তেও যুবকেরা রাখী বাঁধিয়া দিল। তাহারা কোনও আপত্তি করিল না। গ্রামের সকলকেই তাহারা চিনিত।

যুবকদিগের এই অত্যাচারে দারোগা মহাশয় বিলক্ষণ চটিয়াছিলেন! কিন্তু নিষ্ফল আক্রোশে কোনও লাভ নাই, সুতরাং তিনি বার কয়েক গর্জ্জন করিয়াই থামিয়া গেলেন।

রমেশ বলিলেন, "এখন চলুন, দারোগা বাবু, কোথায় যাইতে হইবে বলুন। এই দলের মধ্যে কে কে আপনার মতে অপরাধী ?"

দারোগা সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখন সকলকেই থানায় যাইতে হইবে। আমি কাহাকেও ছাড়িব না।"

যুবকগণ একবার রমেশের মুখপানে চাহিল। সে কি ইঙ্গিত করিল। তখন সকলে থানায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

বিজয়গর্ব্বে দারোগা অপরাধীদিগকে লইয়া থানায় ফিরিলেন।

৪

অমঙ্গল-সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে গ্রামমধ্যে রাষ্ট্র হইল। যুবকদিগের অভি-ভাবকেরা ও গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ থানায় আসিয়া জামীনে সকলকে মুক্ত করিতে চাহিলেন। দারোগা কোনও কথায় কান দিলেন না। কি অপরাধে

তাহারা অভিযুক্ত, তাহাও বলিতে চাহিলেন না। বহু সাধ্য সাধনা ও প্রলোভনেও দারোগার হৃদয় বিচলিত হইল না। তিনি বিনীতভাবে বলিলেন, "কি করিব মহাশয়, বড়ই দুঃখিত হইলাম, কিন্তু উপায় নাই। আমাকে চাকরী বজায় রাখিতে হইবে ত। সদরে এ বিষয়ে এত্তেলা দিয়াছি, এখন আমার কোন হাত নাই।"

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। নটবর তখনও কোন ডায়েরী করেন নাই।

হতাশ হইয়া সকলে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। যুবকদিগকে হাজতে রাখিয়া দত্ত মহাশয় পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এত কষ্টের শিকার যেন হাতছাড়া না হয়!

পাচক আসিয়া বলিল, "বাবু আজ ত অরন্ধন।"

দারোগা গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমার বাড়ীতে অরন্ধন? আমি কি গ্রামের লোকগুলার মত মূর্খ নাকি? আজ আরও ভাল করিয়া খাইবার যোগাড় করা চাই। একটা ইলিশ মাছ নিয়ে আয়।"

স্নানান্তে নটবর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। আজ তিনি এতক্ষণ কন্যা সুরমার সংবাদ লইতে পারেন নাই। দত্ত মহাশয় দেখিলেন, শয্যার উপর শুইয়া সুরমা রামায়ণ পড়িতেছে। পিতাকে আসিতে দেখিয়া বালিকা উঠিয়া বসিল। আজ তাহার মুখ এত মলিন কেন? সুরমার নয়নপল্লবে তখনও দুই বিন্দু অশ্রু দুলিতেছিল। দুঃখিনী সীতার বনবাসদুঃখ স্মরণ করিয়া বালিকার কোমল হৃদয় কি ব্যথিত হইয়াছিল?

পিতা সস্নেহে বলিলেন, "মা, তোমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। এখনও ভাত খাও নাই মা?"

করুণ মুখখানি নত করিয়া বালিকা বলিল, "আজ ভাত খাইব না। শরীরটা বড় অসুস্থ হয়েছে, বাবা।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিয়া উঠিল। কন্যার এইরূপ ভাবান্তর পিতা বহুদিন দেখেন নাই। তিনি ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কি অসুখ মা? ডাক্তার ডাকিব?"

"না, বাবা, সে রকম কিছু নয়। আজ আর ভাত খাইব না। তোমার হাতে ও কি বাবা?"

সুরমার নয়নে আলোক জ্বলিয়া উঠিল।

দত্ত মহাশয় রাখীসূত্র ছিন্ন করিয়া বলিলেন, "পাজি ছেলেগুলার জ্বালায়

লোকে অস্থির। আমার হাতেও রাখী বাঁধিতে সাহস করে? এবার জব্দ করিয়া ছাড়িয়া দিব। দিন কতক জেলের ঘানি না টানিলে বেটাদের তেজ কমিবে না।”

৫

রাত্রি নয়টার সময় স্থানবিশেষ হইতে বেড়াইয়া নটবর গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার বৈঠকখানা আজ নিতান্ত নির্জ্জন। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা বৃদ্ধেরাও আজ তাস পাশা খেলিবার জন্য তাঁহার গৃহে সমবেত হয় নাই।

ক্ষুন্নমনে দারোগা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন! সুরমা কি এত রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া আছে? কন্যার শরীর তিনি অসুস্থ দেখিয়া গিয়াছেন। সমস্ত দিন সে জলস্পর্শও করে নাই। বৃদ্ধের হৃদয় কন্যাস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, বালিকা ঘুমাইতেছে। কক্ষমধ্যস্থ উজ্জ্বল দীপশিখা তাহার ম্লান মুখের উপর নৃত্য করিতেছিল। স্বপ্নঘোরে বালিকার ওষ্ঠাধর একবার কাঁপিয়া উঠিল। পিতা স্নেহব্যাকুলদৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যার নিদ্রিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেন।

বালিকার বাম হস্ত শিথিলভাবে উপাধানে সংন্যস্ত। তাহার মণিবন্ধে ও কি? দারোগা বিস্মিত হইলেন। এ যে রাখীসূত্র! বালিকা উহা কোথায় পাইল? কে তাহার হস্তে রাখী বাঁধিয়া দিল?

নটবর দেখিলেন, একখানি রঙ্গিন ছাপান কাগজ সুরমার একপাশে পড়িয়া আছে। তুলিয়া লইয়া দত্ত মহাশয় উহা পাঠ করিলেন,—“ভাই, ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই, ভেদ নাই।”

কি সর্ব্বনাশ! তাঁহার গৃহে ‘স্বদেশী’!

দারোগার ইচ্ছা হইল, কন্যার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া তাহাকে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু সুরমার শ্রান্ত মুখপানে চাহিয়া তিনি সে ইচ্ছা আপাততঃ দমন করিলেন। চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে নিঃশব্দচরণে দত্ত মহাশয় বহির্বাটীতে ফিরিয়া গেলেন।

আহারের তখনও কিছু বিলম্ব আছে। মাংস এখনও নামে নাই। অরন্ধন ব্রতের প্রতিশোধকামনায় আজ তিনি ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন; কিন্তু উৎসবটা আজ তাঁহাকে একাই সম্পন্ন করিতে] হইতেছে! কারণ, নিমন্ত্রিতগণ অনুপস্থিত!

নটবর শ্রান্তভাবে আরাম-কেদারায় শয়ন করিলেন। নির্জ্জনতাটা আজ এত ভীষণ ভাবে তাঁহার বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে কেন? হৃদয়ের অত্যন্ত নিভৃত প্রদেশে তিনি একটা ক্ষীণ আঘাত-যন্ত্রণার মৃদু দাহ অনুভব করিলেন। দত্ত মহাশয়ের আজ কি হইল?

হাজত-গৃহের মধ্য হইতে মাতৃমন্ত্র-উপাসকদিগের উচ্চকণ্ঠধ্বনি শোনা-গেল। সমস্বরে তাহারা গাহিতেছিল'—"আসিবে সে দিন আসিবে!"

নিস্তব্ধ রজনীর অন্ধকারে গাছপালা যেন এক একটা দৈত্যের মত দাঁড়াইয়া আছে। বন্দনা-সঙ্গীতের প্রত্যেক চরণ গাঢ় নৈশ নীরবতা ভেদ করিয়া যেন এক একটি মূর্ত্তিমতী দেবকন্যার ন্যায় শূন্যপথে ছুটিয়া চলিল। অত্যন্ত চঞ্চল ভাবে নটবর উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

তাঁহার ইচ্ছা হইল, বন্দীদিগকে গান করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু পা উঠিল না। আরাম-কেদারায় তিনি সমভাবেই শুইয়া রহিলেন। থাক্, আজিকার মত যত পারে আনন্দ করিয়া লউক। কাল উহাদিগকে সদরে চালান দিতে হইবে।

৬

সহসা একটা বিকট চীৎকারে নটবর শিহরিয়া উঠিলেন।

"আগুন! আগুন! সর্ব্বনাশ হ'ল, সব পুড়ে গেল!"

দত্ত মহাশয় একলম্ফে বাহিরে আসিলেন। তখনই রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া পাচক জানাইল,—"অন্দরে আগুন লাগিয়াছে।"

নটবর আর দাঁড়াইলেন না। উঠিতে উঠিতে, পড়িতে পড়িতে তিনি অন্তঃপুরে ছুটিয়া গেলেন। কি সর্ব্বনাশ! পাকশালা ও শয়নগৃহের চাল দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে!

কয়েক মুহূর্ত্ত দারোগা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শয়নকক্ষে তাঁহার জীবনের একমাত্র স্নেহাধার বালিকা সুরমা ঘুমাইতেছে! উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে দত্তমহাশয় দ্বারাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

চৌকীদার ও কনেষ্টবলেরা কলসী লইয়া চালের উপর জল ঢালিতেছিল। জল পড়িয়া পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়াছিল। তাল সামলাইতে না পারিয়া বৃদ্ধ সশব্দে মাটীর উপর পড়িয়া গেলেন। নিদারুণ আঘাতে শরীর অবসন্ন হইলেও বৃদ্ধ অতি কষ্টে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ

থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া দারোগা নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে পুনরায় ভূমিশয্যা গ্রহণ করিলেন।

হায়! কি সর্ব্বনাশ হইল! কে তাঁহার কন্যাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করিবে? চৌকীদারেরা প্রাণপণে আগুন নিভাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু কোনও ফল হইল না। বাতাস প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। উন্মত্ত দৈত্যের ন্যায় অগ্নি লোলরসনা বিস্তৃত করিয়া দিকে দিকে ধাবিত হইল।

কেহই সাহস করিয়া দারোগা বাবুর কন্যার উদ্ধার-সাধনের জন্য প্রজ্বলিত অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিতে সাহসী হইল না। বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হে ভগবান! হে অনাথনাথ!—আজ বিশ-বৎসরের মধ্যে নটবর ভগবানের নাম মুখে আনেন নাই!—রক্ষা কর, প্রভু! বৃদ্ধের নয়নমণি, জীবনের একমাত্র অবলম্বনকে বাঁচাও!

সহসা প্রচণ্ড অগ্নির শব্দ, চৌকিদার ও কনষ্টেবল প্রভৃতির কোলাহল মথিত করিয়া পশ্চাতে একটা ভীষণ ঝন্ঝন্ রব উত্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিস্ময়মুগ্ধ চৌকিদারেরা দেখিল, অদ্যকার অভিযুক্ত যুবকগণ কারাকক্ষের বাতায়ন ভগ্ন করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! রামজীবন পাঁড়ে, গোবর্দ্ধন মিছির প্রভৃতি কনষ্টেবলেরা তাহাদের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইল।

রমেশ বলিলেন, "বাপু! থামো। আমরা পলাইতেছি না। সে ইচ্ছা থাকিলে তোমরা এই কয় জনে কি আমাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে? দেখ্‌ছ না, তোমাদের সাম্‌নে তোমাদেরই দারোগাবাবুর মেয়েটি পুড়িয়া মরিতেছে? আমরা কাজ সারিয়া আবার ধরা দিব; পলাইব না।"

দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া রমেশ সর্ব্বাগ্রে একখানি সতরঞ্চি তুলিয়া লইলেন; এক কলসী জলে ক্ষিপ্রহস্তে উহা ভিজাইয়া লইয়া তিনি তাহার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিলেন; তার পর অবলীলাক্রমে প্রজ্বলিত দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

অন্যান্য যুবকগণ তখন অগ্নিনির্ব্বাণকার্য্যে পরম উৎসাহে যোগদান করিল। তাহাদের প্রফুল্ল মুখে ঘন ঘন মাতৃনাম উচ্চারিত হইতেছিল। এক এক জনের হস্তে অসুরের ন্যায় শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। তাহারা ঘরের চাল ও বেড়া কাটিয়া ফেলিতে লাগিল। যুবকদিগের উৎসাহ ও উত্তেজনায় সমবেত সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে আগুণ নিভাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র বালিকা সুরমার সংজ্ঞাশূন্য দেহ সযত্নে ও সাবধানে সিক্ত সতরঞ্চি দ্বারা আবৃত করিয়া দ্রুতপদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। দত্ত-মহাশয়ের অচৈতন্য দেহের পার্শ্বে তাহাকে স্থাপিত করিয়া তিনি দারোগার চৈতন্য সম্পাদনে ব্যস্ত হইলেন।

সমবেত ব্যক্তিবর্গের আন্তরিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অগ্নি অল্পক্ষণ-মধ্যে নির্ব্বাপিত হইল। তখন বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া সেবক-সম্প্রদায় দারোগার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

নটবর তখন প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন। রমেশ জমাদারকে ডাকিয়া বলিলেন, "রামদীন, এখন আমাদিগকে কোথায় বন্ধ করিয়া রাখিবে, চল।"

দারোগা ও তাঁহার কন্যা উভয়েই রমেশচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। সুরমা ভাবিল, এই যুবকের অনুগ্রহেই আজ তাহার প্রাণ-রক্ষা হইয়াছে!

রমেশের হাতের রাখীটা অগ্নিস্পর্শে ঈষৎ দগ্ধ হইয়াছিল; তিনি পুনরায় ভাল করিয়া বাঁধিতেছিলেন। সুতরাং বালিকার সজল নয়নের কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তাঁহার চক্ষে পড়িল না।

দারোগা বলিলেন, "জমাদার, তুমি এ দিকের ব্যবস্থা কর। বাবুদের থাকিবার ব্যবস্থা আমি স্বয়ং করিতেছি।"

* * * * *

দুই দিন পরে নটবর দত্তের পালকী পুলিস সাহেবের কুঠীর সম্মুখে থামিল।

সাহেব দারগা বাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তেমন সুন্দর আকৃতি একেবার মলিন হইয়া গিয়াছে?

"দত্ত, কি মনে করে'? তোমার কাজ কত দূর অগ্রসর হইল?"

নটবর কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, "হুজুর, এখন আমায় অবসর দিন। ত্রিশ বৎসর আপনাদের সেবা করিয়াছি; এ হাড়ে আর অধিক ভার ।হিতেছে না। শরীর নিতান্ত অপটু। তাই আপনার কাছে বিদায়ের দরখাস্ত দিতে আসিয়াছি।"

সাহেব অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিলেন, "সে কি দত্ত? গবমেণ্ট তোমাকে রায়বাহাদুর উপাধি দিতেছেন। তিন শত টাকা বেতনের উচ্চ পদও শীঘ্রই তুমি লাভ করিবে। এমন সময় কর্ম্ম হইতে অবসর লইতে চাও কেন? তোমার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারী সহসা পাওয়া যায় না।"

নটবর নিতান্ত দীনভাবে বলিলেন, "মাপ করিবেন, হুজুর; আমার রায়বাহাদুর হইয়া কাজ নাই। গরীব মানুষ অত বড় খেতাব লইয়া কি করিব সাহেব? যে গুরুতর কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন, আমি তার উপযুক্ত নই। এখন আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই হুজুর, দয়া করিয়া আমার পেন্‌সনের দরখাস্তখানা মঞ্জুর করিবেন, তাহা হইলেই দাস কৃতার্থ হইবে।"

"নটবর! তোমার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে; রায়বাহাদুর খেতাব চাও না?"

"আজ্ঞে, হুজুর, আমি অতি গরীব। সোনার ল্যাজ আমাদের শোভা পায় না।"

ধ্রুবতারা।*

—:•:—

বহুকাল পূর্ব্বে বঙ্গে সামাজিক উপন্যাসের আবির্ভাব হইয়াছে। বোধ করি, ৫৫ বৎসর পূর্ব্বে "মাসিক পত্রিকা" নামক মাসিকপত্রিকায়, "আলালের ঘরের দুলালের" সূত্রপাত হয়। ইহাতে প্রচলিত সমাজের ঘটনাবলি উপন্যাস আকারে সাজান গোছান থাকে। ইংরাজীতে এমন গ্রন্থ বিস্তর। আবার ইংরাজিতে Historical Romance বা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলিয়া একখানি গ্রন্থ আছে; ঐ গ্রন্থ অবলম্বনে রামকমলের "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা-ভ্রমণ" লিখিত হয়; ভূদেব বাবুর "সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয়ক-বিনিময়" লিখিত হয়। এখনও শ্রীমান হারাণচন্দ্র এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন। কিন্তু 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' কথাটা প্রথমে "দুর্গেশ-নন্দিনীর" মলাটে বড় জল্ জ্বল্ করিয়াছিল। আমরা এমন বহুতর লোক দেখিয়াছি, যাঁহারা দুর্গেশ-নন্দিনীর ঘটনা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিতেন।

কিন্তু শেষ জীবনে বঙ্কিম বাবু ভুর ভাঙ্গিয়া দিলেন। "রাজসিংহে"র চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লিখিলেন, "আমি পূর্ব্বে কখন ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।

---

* সামাজিক উপন্যাস;—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত।

এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক উপন্যাস-প্রণয়নে কোন লেখকই সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমি যে পারি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।"

সুতরাং বঙ্কিম বাবুর ফতোয়া ও স্বীকারোক্তিমতে, 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অতলে গেল; যাউক;—কিন্তু সামাজিক উপন্যাস মাথা তুলিয়া উঠিতেছে! এইগুলিকেই আমি 'ঔপন্যাসিক ইতিহাস' নাম দিয়াছিলাম; বলিয়াছিলাম, যাহা হইতেছে, তাহাই উপন্যাসের অবয়বে এইগুলিতে বিন্যস্ত হয়। শ্রীযুত বাবু চন্দ্রশেখর করের পরিচয়প্রদানের অবসরে এই সকল কথা বলি। সেই সময় শ্রীযুত যতীমোহন সিংহের উল্লেখমাত্র করিয়াছিলাম। যতীন্দ্র বাবু "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচারে" এবং "উড়িষ্যার চিত্রে" প্রভৃত যশঃ সঞ্চয় করিয়াছেন। আর তিনি সে যশের যোগ্য পাত্র, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাহাই সুবিধার কথা—তিনি সমালোচকের উৎসাহের ভিখারী নহেন।

"উড়িষ্যা-চিত্রে" গ্রন্থকারের ফটো তুলিবার ক্ষমতার আমরা প্রথম পরিচয় পাই। বড় আহ্লাদের বিষয়, সেই ক্ষমতা এবার বাড়িয়াছে বই কমে নাই। এই গ্রন্থে যতীন্দ্র বাবু, গণেশ-বন্দনার মত, প্রথমেই কলিকাতার একটি মেসের ফটো তুলিয়া দেখাইয়াছেন। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যবশে কলিকাতার মেস প্রায় সকলেরই পরিচিত সামগ্রী; এবার কেহ দুঃখ করিতে পারিবেন না যে, উড়িষ্যার চিত্র ঠিক হইল না হইল, আমরা কেমন করিয়া বলিব? কলিকাতার মেসে যাহার পদার্পণ হয় নাই, তাহার জন্মই বৃথা। আর সেই পাকা উঠানের এক কোণে ঠোঙ্গাতে ও ভাতেতে গাদা করিয়া রাখা; নীচে তোলায় অন্ধকার ঘরে ঠাকুর ও চাকরের তেলকুচকুচে অঙ্গে মসীময়, বসনবিলাস; আর উপর তলার ঘরে আা পায়া টেপায়ের উপর Ganotর বিজ্ঞান গ্রন্থের উপর ভাঙ্গা বুরুষ ও ত্রিকোণ মুকুর—এ সকল কি ভুলিবার জিনিস গা? এ হেন সুপরিচিত মেসের চিত্র সর্ব্বাগ্রে ধরিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, দেখুন দেখি,—ঠিক হইয়াছে কি না? সকলকেই বলিতে হইবে, হঁা ঠিক বটে। কলিকাতার সম্প্রদায়বিশেষের বৈঠকখানা, ড্রংয়িরু প্রভৃতি সকল চিত্রেই, এবং পল্লীগ্রামের শান্তি-চিত্রে গ্রন্থকার সিদ্ধহস্ত। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের অন্তঃপুরে, যখন বধূরা পরস্পর গোপনে আলাপ করেন, তখন সেই দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনেও গ্রন্থকারের যেমন দক্ষতা, আবার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা যখন মাথামুণ্ড লইয়া তর্ক বিতর্ক করেন, তখনও গ্রন্থকারের সেইরূপ নিপুণতা। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই গ্রন্থকারের সতর্ক চক্ষু,

সহৃদয় প্রাণ, লিপিপটু লেখনী, এবং যাহার মুখে যেমন সাজে, সেইরূপ ভাব ও ভাষা—দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি জীবনে একবার মাত্র আড়ি পাতিয়াছিলেন; এ অতিরিক্ত বিনয় আমাদের ভাল লাগিল না; আমরা দেখিতেছি, আড়ি পাতাই তাঁহার কাজ; সকল ঘটেই তিনি ঘটক। আমরা আশীর্ব্বাদ করি, তিনি চিরজীবনই যেন এইরূপ আড়ি পাতিয়া স্বভাবের ও সমাজের রহস্য দেখিয়া, আস্তে আস্তে টিপি টিপি হাসিয়া, আমাদিগের নিকট সেই আড়িপাতার ফল জাহির করেন।

এখন, অগ্রে "ধ্রুবতারা"র গল্পটি অতি সংক্ষেপে বলিব; নহিলে পাঠকের ফাঁকা লাগিবে।

ফরীদপুর সদরের দেড় ক্রোশ মধ্যে কাজলপুর গ্রাম। সেই গ্রামের কায়স্থ-বংশীয় দত্ত বাড়ীর উপেন্দ্রনাথের ভিন্ন গ্রামের বনলতা নামে একটি বালিকার সহিত বিবাহ হইল। বনলতা বনলতাই বটে। মনে করিবেন, দুষ্মন্ত কি বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—"বুঝিলাম, আজি বনলতার কাছে উদ্যানলতা পরাজিতা হইল।" এ সেকালের কথা; তখন নায়ক চাহিত নায়িকার স্বচ্ছ নির্ম্মল হৃদয়; তাহাতে নায়ক আপনার ফটো প্রতিফলিত করিত। মুকুরে একটি ছবি পড়িলেই আর কাহারও চিত্র তাহাতে ধরিত না। এখন তরুণ নায়ক চান্ তরুণীর accomplishments, হাবভাব বিভ্রম, বিলাসকলা ও কায়দা। চান্—খেলোয়াড়; নায়িকার হস্তে নায়ক খেলানা হইতে পারিলেই আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন। সুতরাং এবার উদ্যান-লতার আওতায় বনলতাকে কাজেই ম্রিয়মাণা হইতে হইয়াছে।

বিবাহের সময় বনলতার বয়স বার বৎসর। উপেনের তখন ফার্ষ্ট ইয়ার—কাজেই ১৬।১৭। ক্রমে দুই এক বৎসর গেল। উপেনের পিতার মৃত্যু হইল। সংসারের অবস্থা এরূপ হইল যে, উপেন যদিও ২৫৲ টাকার বৃত্তি পাইল, তথাপি tuition করিয়া কিছু না আনিলে উপেনের ও তাহার ভ্রাতা জ্ঞানের কলিকাতায় থাকিয়া পড়া শুনা চলে না।

একটি, দুটির পর, তিনেরটি এক রকম জুটিল। এক জন ব্রাহ্মের দুইটি ছেলে পড়াইতে হইবে; আর তাঁহার ভগিনীর বয়স ১৫।১৬; চারুলতা নাম; সে হইল উপেনের 'ফাও' শিষ্যা। চারুলতা গায়, বাজায়, ইংরাজি পড়ে, আর কি করে, না করে, আমি ঠিক বলিতে পারিব না। তবে গোড়ায় যা বলিয়াছিলাম, তাই বটে; চারুলতা—উদ্যানলতা; কাটা ছাঁটা, ফিটফাট,

লোহার ফ্রেমে তাহার দেহ ঝুঁকিয়া আছে; তাহার নীচে দিয়া লাল কাঁকরের ইট সাজান পথ। এই একেলের উদ্যানলতার আওতায়, দূর পল্লীগ্রামের বনলতা ম্রিয়মাণা হইতে লাগিল। বিবাহের পূর্ব্ব হইতেই বুঝা গিয়াছিল, উপেন ছোকরা এখনকার দশ জন, শত জন, সহস্র জন ছাত্রের মত শিক্ষাবায়ুগ্রস্ত। সে দুই জন বৈষ্ণবীর সঙ্গে এক জন বুড়া বৈরাগীকে দেখিয়া চটিয়া লাল। সে বলে, ইহাদের ভিক্ষা দিলেই পাপের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। (যে দেশে ভিক্ষা দেয় না, সে দেশে পাপ কি আমাদের দেশের চেয়ে কম?) সে নব বধূকে বোর্ডিং-এ রাখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাহার বন্ধু বীরেন তাহাকে বলিয়াছিল,—"তোমার মাতা যে গৃহের কর্ত্রী—তোমার বড় মা যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সেই গৃহের কাছে বোর্ডিং স্কুল কোন্ ছার।" কিন্তু এমন করিয়া উপেনকে আগে কেহ শিখায় নাই। যে উচ্চশিক্ষা বিষে বাঙ্গালার ছাত্রবৃন্দ জর্জ্জরিত, উপেনও তাহাতেই অভিভূত!

এই ত এখনকার দিনের উপেন; সেই উপেন একেবারে কেয়ারী-কুঞ্জ-সুশোভিতা, ভ্রমর-ভর-স্পন্দিতা উদ্যানলতার সম্মুখে স্থাপিত হইল। তাহার মোহ লাগিল। যাহার মোহ হয়, সে কি তাহা বুঝে? বুঝে না। সে মনে করিল আমি বুদ্ধিমান্ লোক; বুদ্ধি বিবেকে ইহাকে appreciate করিতে পারিতেছি। সে বন্ধু বান্ধবদের কাছে বলিল, এটা আমার intellectual Love—বুদ্ধির ভালবাসা।

মূল ঘটনার সংস্থানে কিছু বিশেষত্ব নাই; স্ত্রীস্বাধীনতার মহলে, কত যুবক যে ছেলে পড়াইতে গিয়া, আপনার মাথা খাইয়াছে, তাহার সীমা নাই। সুতরাং ঘটনা-সংস্থানে কোনও বিশেষত্ব নাই; তবে যেরূপ নিপুণতার সহিত, যেরূপ দক্ষ হস্তে উপেন্দ্রের অধঃপতন গ্রন্থকার চিত্রিত করিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া যায় না; কেবল প্রশংসা করাই চলে।

উপেনের মানসিক অধঃপতন যখন পূর্ণ হইয়াছে, তখন অরুণের উদয় হইল। মিঃ অরুণ ব্যানার্জি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতায় দেখা দিলেন। চারুলতার ভ্রাতা পরেশ বাবুর বাড়ী অরুণ আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। খেলওয়াড় আবার নূতন খেলানা পাইল। খেলিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের Intellectual loverএর আর তাহা ভাল লাগিল না। অরুণকে তাড়াইতে পারিলে, উপেন এখন বাঁচে। হায় রে Intelletual! তোর দশাই এই।

অরুণের সঙ্গে চারুলতার খেল্ কিছু বেশী বেশী দেখিয়া—উপেন একেবারে উন্মত্ত হইল। সে কলিকাতায় সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া, রোমিওর মত কেবল বাতায়ননিরীক্ষণ করে, আর মনে মনে আওড়ায়,—It is the east and Juliet is the sun ; arise fair sun—পাহারাওয়ালা ত কবিত্ব বুঝিল না ; সে চোর বলিয়া সন্দেহ করিল ; উপেনকে অরুণ বাবুর সম্মুখে লইয়া গেল। জান পচান আছে দেখিয়া পাহারাওয়ালা চলিয়া গেল। উপেনের সেই লাঞ্ছনায় মাথা ঘুরিয়া গেল ; সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া গেল। * * * এততেও কিন্তু ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে পারিল না। চারুলতাকে মন হইতে তাড়াইতে পাড়িল না।

একটু আরোগ্যলাভ করিয়া জানিল, সে বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে, তিন বিষয়ে ফার্ষ্ট ক্লাসে অনর পাশ করিয়াছে ;—আর বিলাত যাইবার জন্য বৃত্তি পাইবে।

উপেন ও তাঁহার বন্ধু বীরেন প্রভৃতি পূর্ব্বেই জানিত, অরুণ বানর্জির নামে বিলাতে বিবাহের চুক্তিভঙ্গের নালিশ হইয়াছিল। বীরেনের কাছে উপেন প্রতিজ্ঞা করিল, সে বিলাত গিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অরুণকে নিশ্চয়ই ধরাইয়া দিবে, আর অরুণের পূর্ব্বচরিত্র প্রকাশ করিয়া চারুলতাকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিবে।

একে ত সেই উপেন্দ্রনাথ, তাহার পর তাহার শিক্ষা-বিভ্রাটের গরমি, আবার তাহার পর অসহায়া অবলাকে বঞ্চকের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার মোহ—এই ত্র্যহস্পর্শে সমস্ত পণ্ড হইয়া গেল। বৈষ্ণব বৈরাগীকে সমাজের নর্দ্দমা বলিয়া উপেন্দ্রচন্দ্র সেই নর্দ্দমা পরিষ্কার করিবার আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন ; কোথায় রহিল এখন সে সমাজ, কোথায় রহিল কাজলপুরের প্রত্যাশা, কোথায় রহিল দত্ত-পরিবারের সেই শান্তি, সে দয়া, সে আতিথ্য, আর কোথায় রহিল সেই বিধাতার বনলতা ? সকল ফেলিয়া, সকল পদদলিত করিয়া, দত্ত-পরিবারের সকলকে কাঁদাইয়া, বনলতাকে মুস্ড়াইয়া দিয়া, উপেন্দ্র অসহায়ার উদ্ধারসাধনঃজন্য এখন বিলাতযাত্রী ! হায় কলিকাল ! তুমিই অধর্ম্মকে ধর্ম্মচ্ছদে সজ্জিত করিতে পার।

উপেনকে এই অধর্ম্মের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য উপেনের দাদা মহেন্দ্র সকলকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। উপেন কাহারও কথা রক্ষা করিল না —এখনকার ছেলেরা কথা রক্ষা করাকে স্বাধীনতার ব্যতিক্রম বলিয়া বুঝে।

যখন উপেনের বিলাত যাওয়াই স্থির হইল, তখন বনলতা বিদায়কালে বলিল,—"যদি বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া চারুকে বিবাহ করিতে পার, তবে তাহাই করিও। আমি আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমাকে আসিয়া আর দেখিতে পাইবে না। আমি আজ তোমার চরণে চিরদিনের জন্য বিদায় লইতেছি। পরমেশ্বর করুন, আমি যেন আর জন্মে তোমাকেই স্বামী পাই, আর যেন তোমাকে সুখী করিতে পারি।"

এতক্ষণ কান্না চাপিয়া রাখিয়া, এখনকার ছেলেদের হক না হক নিন্দা করিয়া, শিষ্ট শান্ত হইয়া বেশ সমালোচনা করিতেছিলাম; আর ত এ ভাব রক্ষা করিতে পারি না; এখন কান্না চাপিয়া কলহের ভাব মনে উঠিতেছে, কলহের ভাব চাপিতে যাইয়া, কান্না পাইতেছে। কলহ গ্রন্থকারের সঙ্গেও বটে, তাঁহার বনলতার কথাতেও বটে।

বাছা বনলতা! তুমি যখন পরজন্মে স্বামীকে সুখী করিবার বাঞ্ছাপূরণের জন্য বাঞ্ছাময়ের কাছে জানাইতেছ, তখন ইহজন্মের আশা ত্যাগ করিতেছ কেন? পরজন্ম পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পার, আর তিন বৎসর তিষ্ঠিতে পার না! কেন বাছা তুমি হিন্দুর মেয়ে হইয়া, এমন আশুফলপ্রত্যাশিনী হইবে? সে যেখানে যাউক, যাই করুক, তুমি যখন তাহাকে ধরিয়াছ, তখন সে তোমারই; সে বাঁকুক আর চুরুক, তার আর কোথাও যাইবার উপায় নাই; এ যদি না হয়, তাহা হইলে প্রেম মিথ্যা, সতীত্ব মিথ্যা, হিন্দুর হিন্দুত্ব মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তুমি হিন্দুর মেয়ে তাড়াতাড়ি কেন করিবে বাছা? তোমার সিঁথের সিন্দূরের শোভাই—সহিষ্ণুতায়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। এখনকার দিনের মেয়ে কি না! এখন ছেলে-গুলাও যেমন গোঁয়ার-গোবিন্দ, মেয়েগুলাও তেমনই একগুঁয়ে। তুমি সূর্য্যমুখী—স্বামীকে বাগাইতে পারিলে না; অমনই কুলের বাহির হইয়া পড়িলে; কেন গা? "না, আমি তাঁহার সুখের পথে কণ্টক হইব না।" বটে, দেখো অভিমান কর নাই ত? বেশ করিয়া আপনার হৃদয় বুঝিয়া দেখ দেখি, অভিমান কোও নাই ত? তুমি কুন্দনন্দিনী বিষ খাইয়াছ অভিমান, কর নাই ত? তুমি কি বলিতেছ, "ভগবতি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরং" এ ত অভিমানেরই ভাষা। আবার ও কাহাকে কি বলিতেছ? "অথ কথং আর্য্যপুত্রেন স্মৃতোঽয়ং দুঃখভাগিজনঃ?" একটু অভিমান এখনও রহিয়াছে নয়? আছে বৈ কি; থাকে বৈ কি; অভিমান যে প্রণয়ের মানরজ্জু।

তবে অভিমান বৃন্দাবনে যতটা থাকে, প্রভাসে ততটা থাকে না, সময়ে কমাইয়া দেয়; সেই জন্য আশুফল-প্রয়াসী হইতে নাই, তাড়াতাড়ি করিতে নাই; সময়ের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করিতে হয়।

আসল কথা কি জান, বাছারা! সতীত্ব একটি বিন্দু নহে, একটি রেখা নহে; সতীত্ব একটি বিশ্ব-গোলক। বিন্দু উহার কেন্দ্র বটে, কিন্তু বিন্দুকে পরিধি করিও না। বিন্দু তোমার হৃদয় বটে, হৃদয় তোমার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সতীত্বের অধিকার বিশ্বব্যাপী। সময়ে উহা ব্যাপিয়া পড়ে, ফুটিয়া উঠে, সৌরভ বিস্তার করে; সতীত্বের কুঁড়ি লইয়া তুমি মরিবে কেন? সময় দাও, ফুটিতে দাও। সতীত্ব অমর। ও ত মরে না, তবে তুমি সতী লক্ষ্মী, সেই সতীত্বের আধার, তুমি মরিতে যাইবে কেন? দক্ষালয় হইতে যাইতে চাও, যাও, কিন্তু শিবহৃদয় হইতে সরিতে পাইবে না। আবার বলি, তুমি যখন উপেনকে ধরিয়াছ, তখন তাহার সাধ্য কি যে, সে তোমাছাড়া চিরদিন থাকিতে পারে? ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়।

বেটী কিন্তু বুঝিল না। যে মরিবে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় কি? পারা গেল না। রোগ করিয়া, ঔষধ না খাইয়া, সেবা না লইয়া, বনলতা শুকাইতে লাগিল। শেষে উপেনের ফটোখানি ধ্যান করিতে করিতে ক্ষুদ্র সতীলোকে চলিয়া গেল।

কাহাকে কি বলি বল? ক্ষুদ্র নর নারীর প্রাণপাত করিলে অপরাধ হয়; আর হিন্দুনারীর ব্রতপাত করিলে, কাহারও কিছু হয় না? তোমার ব্রত কি? তুমি আজীবন স্বামীর সেবা করিবে, তুমি যদি অভিমানে সে সেবা ভঙ্গ কর, তোমার ব্রতপাত হইল। ঘোর অধর্ম্ম হইল। তাই বলিতেছি কাহাকে কি বলি বল?

কাহিনীর অনুসরণ আর করিব না। কেন না, ক্ষীণা পবিত্রা স্বচ্ছ স্রোতস্বতীর বিচরণক্ষেত্র দেখাইতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক ঝোড় ঝঙ্কার বন জঙ্গল দিয়া আমাদিগকে লইয়া গিয়াছেন। এরূপ না করিলে, শুনিতে পাই বই লেখা নাকি ভাল হয় না। তাই হ'বে।

চারুলতা,—তা বলিয়া ঝোড় ঝঙ্কার নহে। চারুলতা গল্পের প্রয়োজনীয় পদার্থ। উদ্যানলতায় অতৃপ্ত হইয়াই বনলতার স্বভাবসৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি। চোরা সিঙ্গি দিয়া দশভুজা প্রতিমার প্রতিভা উজ্জ্বল করিয়াছ; ভালই ত; দুইখানি নৈবেদ্য উহাদের দিবে, তাও দাও, জগন্মাতার প্রতি-

দ্বন্দ্বীদের গৌরব করা চাই বৈ কি? কিন্তু গ্রন্থকারের টান যেন, উহা অপেক্ষাও কিছু বেশী। সে সকলই মার্জ্জনা করিতাম, যদি যে দিন উপেন উন্মত্ত ভাবে পোলিস্ কর্ত্তৃক চারুর সম্মুখে নীত হইল, সে দিন যদি চারুতে আর একটু মনুষ্যত্ব দেখিতে পাইতাম। পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, "আপলোক এনকো পছনত্যা হ্যায়? এই কথাতে চারুর মুখ গম্ভীর হইল। সে কোন কথা বলিল না।" এমন মনুষ্যত্বহীনার আবার ধ্রুবতারা কি? স্বচ্ছ-সলিলা স্রোতাস্বনী দেখার খাতিরে আমরা বন জঙ্গল বেড়াইতে স্বীকৃত, কিন্তু মিঃ চকরাভর্ত্তির ঝোড়, নূতন সংস্করণে যেন একেবারে কাটিয়া ছাঁটিয়া পোড়াইয়া দেওয়া হয়, ইহাই আমাদের একান্ত অনুরোধ। চকারভর্ত্তি একটা কিম্ভূতকিমাকার বীভৎস পাপিষ্ঠ, কাব্যজগতের পয়ো-নালীতেও উহার স্থান হইতে পারে না। সমাজে যাহা আছে, তাহার সমস্ত কি তবে লিখিতে হইবে না? নিশ্চয়ই না। শ্মশানের চিত্র দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু পুরীষের চিত্র হয় হয় কি? তা হয় না।

বাস্তবিক চকরাভর্ত্তি এই পুস্তকের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক যতীন বাবু এবার যেন মুছিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রভাবতী যায় যাউক, তাহাতেও গ্রন্থের ক্ষতি হইবে না।

শান্তির চিত্র অপেক্ষা গ্রন্থে অশান্তির চিত্র—অধিক জায়গা জুড়িয়া রহিয়াছে—এটি গ্রন্থের দোষ। শেষের একটা আল্‌গা কথায় এই দোষটা আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"বিষাদময় সংসারে মানব-জীবনের সান্ত্বনা কি?" বাস্তবিক কি সংসার বিষাদময়? যতীন বাবুর প্রশস্ত হৃদয়ের ধারণা যে এইরূপ, তাহা কখনই হইতে পারে না। কেন না, ইহার একটু পূর্ব্বে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "দত্তদিগের পুণ্যের সংসার, ক্রমে তাহার অবস্থা আবার ফিরিল।" অর্থাৎ, পুণ্য থাকিলেই পরিণামে ভাল হয়। তবে আবার বিষাদময় কেন? যাহাই হউক, আমরা ওটা একটা আল্‌গা কথার মত ধরিলাম।

গ্রন্থকার গুণী, তাঁহার রচনায় সহস্র গুণপনা আছে; তবে কেন কতকগুলা আবর্জ্জনায়, এ হেন অপূর্ব্ব গ্রন্থ মলিন হইয়া থাকিবে? সেই জন্য আবার বলি, পাপের চিত্র কমাইয়া দাও, পুণ্যের চিত্র জলন্ত হইয়া উঠুক; পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীর কলগান আমরা সুস্পষ্ট শুনিতে পাইয়া, মনঃপ্রাণ আরও জুড়াইতে থাকি।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।
কদমতলা, চুঁচুড়া।

আবাহন।

হীরক হিরণে ছেয়ে উদয়-অচল,
ঝরিয়া পড়িছে মার মঙ্গল-মাধুরী,
শেফালির ফুলশেজে ঢাকা তরুদল,
বিহগ বন্দনা গায় দশ দিক পূরি'!
শ্যামছত্র ধরিয়াছে নীল তালীবন,
শুভ্র কাশ শ্বেতহাস্যে ঢুলায় চামর।
পাদপদ্ম ভাবি ফুল্ল কমল কানন,
ফুলবাস ধূপগন্ধে মত্ত চরাচর!
আয় মা, আয় মা, তবে ভক্ত-প্রহ্লাদিনী—
বজ্রদৃপ্তা মহাশক্তি, চাণ্ডিকার বেশে,
রুদ্ররূপে দেখা দে মা রণ-উন্মাদিনী!
জাগুক অযুত শব এ শশ্মান দেশে।
শূন্য গৃহ, কি দিব মা?—নাহি রত্নধন;
হৃদি-রক্ত-অলক্তকে সাজাব চরণ।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

অর্ঘ্যদান

সেজেছে সুন্দর মা গো সেজেছে সুন্দর!
অলক্ত-লাঞ্ছিত পদে রক্ত-শতদল!
পাদপদ্মে হৃদ্‌পদ্ম শোভার আকর—
দলে দলে কি লাবণ্য অম্লান উজ্জ্বল!
শত শতাব্দীর পরে মা! তোর চরণে
শোভিল ভক্তের অর্ঘ্য পুণ্যপূত দান!
কি সুধা সৌরভ ভাসে ধীর সমীরণে,
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে পূর্ণ এ মহাশ্মশান!
বাজাও মঙ্গলশঙ্খ মন্দিরে মন্দিরে,
ধূপধূমে পরিব্যাপ্ত কর দশ-দিশি!
মুক্তকণ্ঠে যুক্তকরে ভক্তিনম্রশিরে
কর মন্ত্র উদ্দীপন! হের কালনিশি
প্রদীপ্ত অমৃতালোকে,—মৃত্যুঞ্জয় হর
ও পুণ্য নির্ম্মাল্য লাগি' পেতেছেন কর!

শ্রাবণী পূর্ণিমা; ১৩১৫। — শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ

সমুদ্র।

—— ঃ০ঃ ——

আবার সে গম্ভীর গর্জ্জন ; চারি ধার
সেই নীল জলরাশি ; দিগন্তপ্রসার
বারি-বক্ষ ; সেই অন্ধ মত্ত আস্ফালন ;
সেই ক্রীড়া ; সেই উচ্চ হাস্য ; সে ক্রন্দন ;
উত্তাল তরঙ্গ সেই ; উদ্দাম উচ্ছ্বাস ;
সেই বীর্য্য ; সেই দর্প ; সেই দীর্ঘশ্বাস !

হে সমুদ্র ! সপ্ত বর্ষ পরে এ সাক্ষাৎ
তোমার আমার সঙ্গে। ঘাত প্রতিঘাত
গিয়াছে বহিয়া কত আমার হৃদয়ে ;
বহে গেছে ঝঞ্ঝা কত, শোকে, দুঃখে, ভয়ে,
নৈরাশ্যে ;— এ সপ্ত বর্ষে জীবনে আমার।
নুইয়া দিয়াছে সেই সপ্ত-বর্ষ-ভার
জীবনের মেরুদণ্ড ; করি' খর্ব্ব তা'র
উদ্দাম উল্লাস, তেজ, গর্ব্ব প্রতিভার।

কিন্তু তুমি চলিয়াছ দর্পে সেই মত
কল্লোলিয়া। কাল করে নাই প্রতিহত
তোমার প্রভাব ; রেখা আনে নাই দেহে ;
শুষে নেয় নাই মজ্জা।—সেইরূপ ধেয়ে
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গে, মেঘমন্দ্রে বারি-
বক্ষ, বীরদর্পে দিকদিগন্ত প্রসারি',
তুমি চলিয়াছ। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশ ;
নিম্নে চলিয়াছে তব একই ইতিহাস।
এত তুচ্ছ করেছিলে মানব-জীবন
পরমেশ ! এই ক্ষুদ্র ক্ষীণ আয়োজন ;

তাও এত বিবর্ত্তনশীল! যেই মত
সন্ধ্যার প্রাক্কালে, বর্ণ ভিন্ন হয় যত—
রক্ত, পীত, পিঙ্গল, ধূসর, পরিণত
শেষে কৃষ্ণে; মানব-জীবনে সেই মত,
আসে বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য; পরে হায়,
সব শেষে সেই কৃষ্ণ মরণে মিশায়!

—সেই সে সাক্ষাৎ হ'তে আজি, হে সমুদ্র,
সপ্ত বর্ষ কেটে গেছে, আমার এ ক্ষুদ্র
পরমায়ু। ছিলাম সেদিন শ্লেষস্মিত,
উচ্চ-কণ্ঠ, ধর্ম্মে অবিশ্বাসী, গর্ব্বস্ফীত,
উচ্ছৃঙ্খল। আজি হইয়াছি চিন্তা-নত,
জীবনের গূঢ়-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নিয়ত।
গান গাই নিম্নতর ঠাটে;—কম্প্র, ধীর,
ম্লান, ব্যথাপ্লুত, অশ্রুগদ্গদ, গম্ভীর।

সপ্ত বর্ষ পরে আজি, সমুদ্র, আবার
দেখিতেছি আন্দোলিত সে মহাপ্রসার;
শুনিতেছি সে কল্লোল; করিতেছি স্পর্শ
তোমার শীকর-স্পৃক্ত বায়ু।—এ কি হর্ষ!
কি উল্লাস! মুদ্রালুব্ধ স্বার্থপূর্ণ হৃদি,
ছাড়ি' নীচ ক্রয় ও বিক্রয়,—জলনিধি,
মিশিয়াছে নিখিলের সঙ্গে যেন আসি',
হেরি' তব অসীমবিতত জলরাশি।

আমি দেখিতেছি শুক্লপক্ষ প্রথমার
নিশীথে, নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে, পারাবার!
তোমার এ মত্ত ক্রীড়া। যখন অবনী
ঘুমায়, উঠিছে ঐ হাহাকারধ্বনি;
চলেছে ও আস্ফালন। হৃদয়ে তোমার
বহিছে ঝটিকা যেন;—প্রবল ঝঙ্কার

নিষ্পেষণে মুহুর্ম্মুহু মেঘমন্দ্র সম
উঠে মহা আর্ত্তনাদ ; বিদ্যুদ্দামোপম
জ্বলে' উঠে রেখান্বিত ফেনা সমুচ্ছাসি',
পিঙ্গল আলোকে দীপ্ত করি' জলরাশি।

কি প্রকাণ্ড অপচয় এ বিশ্ব-সৃষ্টির—
এই নীল বারিরাশি ; এ নিত্য অস্থির
সমুচ্ছ্বাস—শক্তির কি নিরর্থক ব্যয় ;
এ গর্জ্জন, আস্ফালন, ব্যর্থ সমুদয়।
কিংবা চলিয়াছ সিন্ধু! গর্জ্জি', আর্ত্তনাদি',
সেই চিরন্তন প্রশ্ন—"কোথা ? কোথা আদি ?
কোথা অন্ত ? কোথা হ'তে চলেছি কোথায় ?"
উৎক্ষেপিয়া ঊর্ম্মিরাশি আঁকাড়িতে চায়
অনন্তেরে ; নিজ ভারে পরে নেমে আসে।
আবার ছড়ায়ে পড়ে, গভীর নিশ্বাসে,
প্রকাণ্ড আক্ষেপে,—বক্ষ' পরি আপনার,
ব্যর্থ বিক্রমের ক্ষুব্ধ অবসাদ-ভার।

উপরে নির্ম্মল ঘন নীলাকাশ স্থির,
কোটী কোটী নক্ষত্রে চাহিয়া জলধির
নিষ্ফল চীৎকার, ক্ষুদ্র আস্ফালন 'পরে ;
রহে সে গভীর গাঢ় অনুকম্পাভরে।
দেখে পিতা যেমতি পুত্রের উপদ্রব ;
ঈশ্বর দেখেন যথা করুণা-নীরব
গাঢ় স্নেহে,—মানুষের দম্ভ অভিমানে ;
—আছে সে চাহিয়া ক্ষুব্ধ জলধির পানে।

কি গাঢ় ও নীলাকাশ ! কি উজ্জ্বল, স্থির !
নক্ষত্রে বেষ্টিয়া চতুষ্প্রান্ত জলধির।
যাহা ধ্রুব, সত্য ; যাহা নিত্য ও অমর ;
তাহা বুঝি এরূপই স্থির ও ভাস্বর।

তবু ভাবি—ঐখানে আলোকের নয়
শেষ ; ঐ ঘননীল, ঐ জ্যোতির্ম্ময়-
যবনিকা-অন্তরালে আছে লুক্কায়িত
এক মহালোক ; ঐ যবনিকাঙ্কিত
কোটী কোটী মহাদীপ্ত উদ্ভাসিত রবি,
শুদ্ধমাত্র যার ছায়া, যার প্রতিচ্ছবি।
—ফেলে দাও যবনিকা যাদুকর ! তবে ;
কি আছে পশ্চাতে তা'র, দেখাও মানবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম পুস্তক 'দুর্গেশ-নন্দিনী' উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র অনাদৃতা বঙ্গভাষার প্রতি বঙ্গবাসীর মনোযোগ, স্নেহ ও শ্রদ্ধার উদ্রেকরূপ যে দুষ্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার সাফল্যের জন্যই তিনি প্রথমে উপন্যাস উপহার লইয়া বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যে যে সকল গল্পের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকলের অধিকাংশই "বালকভুলানো কথা"। সে সকল রচনায় কোনরূপ বিশেষত্ব বা বৈচিত্র্য ছিল না। যে সকল চরিত্র গ্রন্থকারের রচনায় আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিত, তাহারাই লোকের চিত্ত আকৃষ্ট করিত ; সে সকল রচনায় রচনা-নৈপুণ্যে কোনও চরিত্রকে উজ্জ্বল ও প্রস্ফুট করিয়া তুলিবার চেষ্টা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। পাশ্চাত্য দেশে কথা-সাহিত্য বহুদিন হইতে বহুচেষ্টায় সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য আদর্শে বাঙ্গালায় উপন্যাসের রচনা করিলেন। বিদেশী আদর্শকে স্বদেশের উপযোগী করিয়া তুলা যে বিশেষ ক্ষমতার পরিচায়ক, তাহা বলাই বাহুল্য। সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। গল্প আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সহজে পাঠ করে, এবং পাঠ করিয়া আনন্দ অনুভব করে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকে বাঙ্গালী পাঠকের প্রিয় করিবার চেষ্টায় প্রথম উপন্যাস রচনা করিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম-প্রকাশিত উপন্যাসে অধিকাংশ বাঙ্গালী অপূর্ব্ব রসের আস্বাদ পাইয়া পুলকিত ও প্রীত হইলেন। কিন্তু যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বঙ্গভাষাকে গ্রাম্য বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা সকলেই যে প্রীত হইলেন, এমন নহে। পরন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দোষান্বেষণে সচেষ্ট হইলেন। এমন কি, স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্নের মত বোদ্ধা সমালোচকও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার নানা ত্রুটী-সঙ্কলনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল, 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র "রচনায় যে একটি নূতনবিধ ভঙ্গী আছে. ইহার পূর্ব্বকালীন কোন বাঙ্গালা পুস্তকে সে ভঙ্গীটি দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সেটি ইঙ্গরেজির অনুকরণ হইলেও বিলক্ষণ মধুর।" এই সকল সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ভাষাগত ত্রুটীর উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইতে পারেন নাই; পরন্তু তাহাতে সমাজে প্রচলিত ব্যবহারের বিরুদ্ধ কথার উল্লেখ দেখিয়া তাঁহাকে দোষী সপ্রমাণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। যাঁহার প্রচুর সৃষ্টিশক্তি থাকে, তাঁহার পক্ষে সমালোচনার প্রকৃত মূল্য-নির্দ্ধারণে বিলম্ব হয় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার সমালোচনার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এক দল লোকের নিকট যাহা নূতন, তাহাই অপবিত্র; তাই জগতে মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রে সকল নূতন মতের প্রবর্ত্তক ও সকল নূতন আদর্শের স্রষ্টাকেই বিষম বিরুদ্ধ মত পদদলিত করিয়া গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে হয়। সে সকল বিরুদ্ধ মত কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। তাই তিনি সমালোচকদিগের আক্রমণে কখনও আত্মসমর্থনের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু তিনি আপনার ত্রুটীসংশোধনে ও রচনার প্রসাধনে সর্ব্বদাই অবহিত ছিলেন। রচনা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার মত "বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে" বিশদরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য, কেবল তাহাদিগের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দবিধানের জন্য উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও মহান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। আমাদিগের চিত্তবৃত্তির বিকাশ ও জ্ঞানের গভীরতা-সাধনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। সংসারে আমরা অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বিচরণ করি; বহুবিধ চিত্রের ও চরিত্রের সহিত আমাদের অনেকেরই পরিচয় ঘটে না। উপন্যাস সেই পরিচয়ের প্রবর্ত্তক। উপন্যাস পাঠ করিয়া আমরা বহুবিধ চরিত্রের পরিচয় পাই, এবং

সহানুভূতির সহায়তায় নানা ঘটনার ও চরিত্রের সহিত অন্তরঙ্গরূপে পরিচয়ের ফলে হৃদয়ে মহত্বের বিকাশ করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক হই। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে এই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। প্রথম যতদিন বাঙ্গালী পাঠককে নূতন রচনার আস্বাদে অভ্যস্ত করিতে হইয়াছিল, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কৌশলে শিক্ষাকে অপেক্ষাকৃত পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পল্লবের স্নিগ্ধশ্যাম আবরণের অন্তরালবর্ত্তী কুসুমের সৌরভ যেমন আপনই প্রকাশিত হইয়া পড়ে, সে শিক্ষা তেমনই আপনই প্রকাশিত হইয়াছে। জগতে প্রলোভনের অন্ত নাই। মানুষ প্রবৃত্তিকে সংযত না করিলে সে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারে না; আর প্রলোভনের পিচ্ছিল বেলাভূমিতে পদস্খলন হইলে পাপের পঙ্কিল প্রবাহে পতন অনিবার্য্য। পাপের ফল যাতনা। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম-রচিত উপন্যাসগুলিতে ইহাই বুঝাইয়াছেন। সংযমশিক্ষাই যে পরম শিক্ষা, বঙ্কিমের রচনায় তাহাই পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। তিনি মানুষকে নানারূপ ঘটনার প্রবাহে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রলোভনের আবর্ত্তের নিকট আনিয়াছেন; দেখাইয়াছেন,—যে সত্য সত্যই উদ্ধারলাভের চেষ্টা করিয়াছে, সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে; যে সে চেষ্টা করে নাই, সে ডুবিয়াছে। তিনি বুঝাইয়াছেন,—সংযম-সাধনাই ধর্ম্ম। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় পাপের যাতনা ও প্রায়শ্চিত্ত দেখাইয়াছেন; ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। জগতে যাঁহারা মানবজাতির মঙ্গলকামনায় উচ্চ আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ চিত্রই চিত্রিত করিয়াছেন। জগতে ভাল মন্দ উভয়ই বিদ্যমান। কিন্তু যিনি লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি লোককে মন্দ পরিহার করিয়া ভাল গ্রহণ করিতে শিক্ষিত করেন; লোকের হৃদয় যাহাতে মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া ভালতে আকৃষ্ট হয়, চিত্র সেইরূপে চিত্রিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনায় তাহাই করিয়াছেন।

ক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বুঝিলেন, বাঙ্গালী পাঠক কেবল চিত্তরঞ্জনের জন্য নহে, পরন্তু শিক্ষালাভের জন্যও উপন্যাস পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাঙ্গালী পাঠক উপন্যাস হইতে মনোবৃত্তির পরিপোষক আবশ্যক রস সংগ্রহ করিতে শিখিয়াছে, তখন তিনি শিক্ষাদানই উপন্যাস-রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া শিক্ষাকেই প্রাধান্য দান করিলেন। তাই

'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র সুমধুর বীণাঝঙ্কার 'আনন্দমঠে'র গভীর তূর্য্যধ্বনিতে পরিণত হইল। যে লোকশিক্ষা এতদিন পশ্চাতে ছিল, আজ সে সদর্পে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বঙ্গদেশ বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর হস্তচ্যুত, বিদেশী কর্ত্তৃক অধিকৃত। বাঙ্গালী বহুদিন হইতে "যে দেশে জনম, যে দেশে বাস", সে দেশকে "আমার দেশ" বলিতে ভুলিয়াছে। সে "নিজবাসভূমে পরবাসী"। সে দেশ যে পুণ্যভূমি, কবিকুল যে সেই দেশের গৌরবগীত গাহিয়াছেন, বীরদল যে সেই দেশের জন্য প্রাণপাত করিয়াছেন, বাঙ্গালী সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র তাহাকে সেই কথা বুঝাইবার, নূতন করিয়া শিখাইবার জন্য 'আনন্দমঠে'র রচনা করিলেন। রাজা যিনিই হউন, দেশ আমাদের প্রাণের জিনিস; কেন না, দেশ আমাদের জননী। বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাব 'আনন্দমঠে' ফুটাইয়া তুলিলেন। 'সন্তান-সম্প্রদায়' দেশের জন্য সর্ব্বত্যাগী;—"আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল এই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা, শস্যশ্যামলা" মাতৃভূমি। এই কথা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে শুনাইলেন। কিন্তু মাকে 'মা' বলিতে শিখিতে, মার দুঃখবিমোচন করিতে কঠোর সাধনা আবশ্যক। গুণ "অভ্যাস করিতে হয়।" 'সন্তান-সম্প্রদায়ে'র সন্ন্যাস "অভ্যাসের জন্য।" "কার্য্য উদ্ধার হইলে—অভ্যাস সম্পূর্ণ হইলে আমরা আবার গৃহী হইব।" দেশচর্য্যা ধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিবার কথা নবীন যুগের বাঙ্গালীকে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম বলিলেন,—বাঙ্গালীকে তিনি নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। তিনি বাঙ্গালীকে নবীন ধর্ম্মের মন্ত্র দান করিলেন।

'আনন্দমঠে' যে কঠোর সাধনার প্রথম ব্যাখ্যা, 'দেবী চৌধুরাণী'তে সে সাধনা আরও উচ্চ স্তরে উন্নীত। 'আনন্দমঠে'র সাধনা সকাম; 'দেবী চৌধুরাণী'তে সাধনা নিষ্কাম। কর্ত্তব্যবোধে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অকর্ম্ম অপেক্ষা কর্ম্ম শ্রেয়ঃ, কর্ম্ম ব্যতীত মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না; কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে;—তাহাতে কামনা থাকিবে না। এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষাদানই 'দেবী চৌধুরাণী'র উদ্দেশ্য। যে রমণী স্বভাবতঃ স্নেহপ্রেমাদিকোমলপ্রবৃত্তিপ্রবণা—সেই রমণীকে বঙ্কিমচন্দ্র এই দুষ্কর সাধনা-

ব্রতে ব্রতী করিয়াছেন। রমণী এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলে সংসার স্বর্গ হয়। অবস্থাবিপর্য্যয় অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীকেও কিরূপ সর্ব্বংসহা করিয়া তুলে,—বিপদের মধ্য দিয়া সম্পদ কিরূপে অজ্ঞাতে আসিয়া উপনীত হয়,—'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন; আর সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়াছেন,—ধর্ম্মবলের নিকট পশুবল দাসবৎ কার্য্য করে,—সংসারে তাহারও উপযোগিতা আছে; কিন্তু তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য ধর্ম্মবল আবশ্যক। ধর্ম্মবল কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইলে, প্রকৃত পথে পরিচালিত হইলে, পশুবল জগতে অনিষ্টের কারণ না হইয়া কল্যাণকর হইয়া উঠে।

'সীতারামে'ও এই নিষ্কাম কর্ম্মের শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে। প্রবৃত্তির বেগ প্রশমিত, সংযত ও সংহত না করিলে, সবই ব্যর্থ হইয়া যায়; অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল জনবল, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সবই বাত্যাবিতাড়িত শুষ্ক পত্রের গতি প্রাপ্ত হয়, নষ্ট হইয়া যায়। এই 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীকে আর এক শিক্ষা দিয়াছেন। মানুষ যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন, অন্যের সম্বন্ধে তাহার কর্ত্তব্য আছে। যে সংসারী—গৃহী, সে গৃহস্থদিগের সম্বন্ধে আপনার কর্ত্তব্য পালন না করিলে ধর্ম্মে পতিত হয়; যে সমাজে থাকে, সে সমাজস্থ-দিগের সম্বন্ধে আপনার কর্ত্তব্য পালন না করিলে ধর্ম্মে পতিত হয়। তাই 'সীতারামে'র শিক্ষা,—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?" মানুষ সামাজিক জীব; সে সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে; সে যদি সমাজ ভুলিয়া কেবল স্বার্থের সন্ধান করে, তবে তাহারও অমঙ্গল, সমাজেরও অনিষ্ট। সত্য সত্যই হিন্দুকে "হিন্দু না রাখিলে, কে রাখিবে?"

এই উক্তিতে কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহারা ভ্রান্ত। যিনি মাতৃমন্ত্রের ঋষি, তিনি ভেদ-নীতির প্রবর্ত্তক হইতে পারেন না; ঐক্যই তাঁহার লক্ষ্য; বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রচারক। 'আনন্দমঠে' তিনি বুঝাইয়াছেন,—"সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই।" 'আনন্দমঠে'র এই কথা ও 'সীতারামে'র উদ্ধৃত উক্তি একত্র পাঠ করিলে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের মত সমুজ্জ্বল ও সুপ্রকাশ হইয়া উঠে। কর্ত্তব্যের ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়,—ভেদও তত বিলুপ্ত হইয়া যায়। গৃহী গৃহস্থদিগের সুখের ও স্বার্থের জন্য অপরের আক্রমণ হইতে গৃহস্থদিগকে রক্ষা করিবে। সমাজভুক্ত মানব

আপনার সমাজস্থদিগের সুখের ও স্বার্থের জন্য, অপর সমাজস্থদিগের আক্রমণ হইতে স্বীয় সমাজস্থদিগকে রক্ষা করিবে। ক্রমে যখন কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত হইয়া গৃহ ও সমাজ ছাড়াইয়া দেশে ছড়াইয়া পড়ে, তখন সকল গৃহী ও সকল সমাজস্থ একত্রিত হইয়া বৃহৎ কর্ত্তব্যের জন্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ ও সেই স্বার্থসঞ্জাত ভেদ ভুলিয়া, একই উদ্দেশ্যে—একই সাধনায়—সমবেত চেষ্টায় এক লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইবে। এই কথা 'দেবী চৌধুরাণী'তে অন্ত ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে,—"ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পূরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর হিন্দুর হৃৎ-পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ।" আদর্শ যত উচ্চ হয়, ততই ভাল; কিন্তু সে আদর্শে উপনীত হইবার জন্ম সোপানপরম্পরা আবশ্যক। আলোচ্য পুস্তকত্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সেই সোপান দেখাইয়াছেন। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্রজেশ্বর যখন বিপন্না পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইল,—বলিল, "আমি তোমার স্বামী,—বিপদে আমিই ধর্ম্মতঃ তোমার রক্ষাকর্ত্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপৎকালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?" তখন গৃহী ব্রজেশ্বর গৃহীর কর্ত্তব্য পালন করিল—পত্নীর রক্ষার ভার লইল। 'সীতারামে' সীতারাম যখন দিল্লীর বাদশাহের সঙ্গে বিরোধের বিষম ফল বুঝিয়াও শ্রীকে বলিলেন,—"তুমি সত্যই বলিয়াছ, হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে? আমি তোমার কাছে স্বীকার করিলাম, গঙ্গারামের জন্ম আমি যথাসাধ্য করিব।" তখন সে সমাজভুক্ত লোকর কর্ত্তব্য পালন করিতে উদ্যত হইল। তাহার পর 'আনন্দমঠে' মহেন্দ্র যখন দেশের জন্য "মাতা পিতা," "ভ্রাতা ভগিনী', "দারা সুত", "ধন সম্পদ ভোগ", এমন কি, জাতি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে সম্মত হইল, তখন সে বাঙ্গালী, জননী জন্মভূমির জন্য আপনার কর্ত্তব্যপালনে বদ্ধপরিকর হইল,—সর্ব্বস্ব পণ করিল। তখন আদর্শে উপনীত হইবার সোপানশ্রেণী সম্পূর্ণ হইল।

এই পুস্তকত্রয়ের আর এক শিক্ষা,—বলচর্চ্চার উপযোগিতা ও আবশ্য-কতা; 'রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে।" দুর্ব্বলতা দুঃখের কারণ। যে সবল, সে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে

আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম। 'দেবী চৌধুরাণী'তে বঙ্কিমচন্দ্র ভবানী ঠাকুরকে দিয়া বলাইয়াছেন,—"দুর্ব্বল শরীর ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারে না। ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।" এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বাহুবলের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 'রাজসিংহে' হিন্দুদিগের বাহুবলই গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য।

এই 'রাজসিংহ' বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।" ছিদ্রান্বেষী সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসকে আপনাদিগের অভিপ্রায়সিদ্ধির জন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস ধরিয়া লইয়া তাঁহার ক্রটীপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অথচ 'দেবী চৌধুরাণী'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার স্পষ্ট বলিয়াছেন,—"'আনন্দমঠ' রচনাকালে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই। * * * পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক 'আনন্দমঠ'কে বা 'দেবী চৌধুরাণী'কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।" 'সীতারামে'র বিজ্ঞাপনে তিনি লিখিয়াছেন,—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা যায় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।" তাহার পর 'রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপনে তিনি বলিয়াছেন,—"'দুর্গেশ-নন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।" এই 'কবুল জবাব' সত্ত্বেও যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ব্যতীত অন্যান্য উপন্যাসে ইতিহাসবিরুদ্ধ কথা দেখিয়া তাঁহাকে দোষী প্রমাণ করিবেন,—যুক্তিতর্কে তাঁহাদিগকে পরাস্ত বা মতান্তরগ্রাহী করিবার আশা একান্তই সুদূরপরাহত।

'রাজসিংহে'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—"মোগলের প্রতিদ্বন্দী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে। রাজপুতগণের বীর্য্য অধিকতর হইলেও এ দেশে তেমন সুপরিচিত নহে। তাহা সুপরিচিত করিবার যথার্থ উপায়, ইতিহাস। কিন্তু ইতিহাস লিখিবার পক্ষে অনেক বিঘ্ন। * * * অন্ততঃ এ কার্য্য বিশেষ পরিশ্রমসাপেক্ষ। ইতিহাসের উদ্দেশ্য কখন কখন উপন্যাসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। উপন্যাসলেখক সর্ব্বত্র সত্যের শৃঙ্খলে বদ্ধ নহেন। ইচ্ছামত

অভীষ্টসিদ্ধি জন্য কল্পনার আশ্রয় লইতে পারেন। তবে, সকল স্থানে উপন্যাস, ইতিহাসের আসনে বসিতে পারে না। * * * * যখন বাহু-বলমাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। * * * উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।"

পরিণত বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সাহায্যে ইতিহাসের শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের সাফল্যের কতকগুলি অন্তরায় আছে। যে সকল উপাদানে তাঁহাদিগের রচনা রচিত, অনেক সময় রচনার মধ্যে সেই সকল উপাদান বড় সুস্পষ্ট দেখা যায়; তাঁহারা যে কৌশলে রচনাপটে অতীতের চিত্র প্রতিফলিত করেন, অনেক সময় সে কৌশল পাঠক বুঝিতে পারেন; তাঁহারা বর্ত্তমান কালের মতামত অনুসারে অতীত কালের ঘটনাবলী ও চরিত্রগুলির বিচার করেন। এই সকল জলমগ্ন শৈলে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনাতরী অনেক সময় আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয়, নিপুণ কর্ণধার বঙ্কিমচন্দ্রের সাবধান পরিচালনায় তাঁহার তরণী সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গন্তব্য স্থানে উপনীত হইয়াছিল। বঙ্গ-সাহিত্যে সাহিত্য-সম্রাটের এই শেষ কীর্ত্তি উপন্যাসে এক নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। মাতৃভাষার চরণকমলে ইহাই তাঁহার শেষ পুষ্পাঞ্জলি।

এই 'রাজসিংহ' এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। আপনার অসাধারণ ক্ষমতা যখন পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়াছিল, তখনই বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। যে রবীন্দ্রনাথ এক দিন 'মেঘনাদ-বধ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হে বঙ্গমহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভাল আসিবে না।"—তিনিই যুদ্ধবর্ণনাবহুল 'রাজসিংহ' পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

'রাজসিংহে' ঘটনাবলি যুদ্ধেরই মত দ্রুত। কোথাও বাধা নাই, কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্যের চিহ্নমাত্র নাই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, —"পর্ব্বত হইতে প্রথম বাহির হইয়া যখন নির্ঝরগুলা পাগলের মত ছুটিতে আরম্ভ করে তখন মনে হয় তাহারা খেলা করিতে বাহির হইয়াছে মনে হয় না তাহারা কোন কাজের। পৃথিবীতেও তাহারা গভীর চিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারে না। কিছু দূর তাহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিলে

দেখা যায় নির্ঝরগুলা নদী হইতেছে—ক্রমেই গভীরতর হইয়া ক্রমেই প্রশস্ততর হইয়া পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া পথ কাটিয়া জয়ধ্বনি করিয়া মহাবলে অগ্রসর হইতেছে—সমুদ্রের মধ্যে মহাপরিণাম প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার আর বিশ্রাম নাই। 'রাজসিংহে'ও তাই। তাহার এক একটি খণ্ড এক একটি নির্ঝরের মত দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি তাহার পর ষষ্ঠখণ্ডে দেখি ধ্বনি গম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি, কতক বা নদীর স্রোত কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জ্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষলিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক বা ব্যক্তি-বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারতইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

রবীন্দ্রবাবুর শেষ কথা,—"এই ইতিহাস ও উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়-বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্ত্তী না হয় এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখদুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তারিত করিয়া দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুই একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অংশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। চিত্রকর যদি নৌকার ভিতরের ব্যাপারটাই বেশি করিয়া দেখাইতে চাহিতেন তবে নদীর অধিকাংশই তাঁহার চিত্রপট হইতে বাদ পড়িত। হইতে পারে কোন কোন অতি কৌতূহলী পাঠক ঐ নৌকার অভ্যন্তরভাগ দেখিবার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র, এবং সেই জন্যই মনঃক্ষোভে লেখককে তাঁহারা নিন্দা করিবেন। কিন্তু সেরূপ বৃথা চপলতা পরিহার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য লেখক গ্রন্থবিশেষে কি করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রে যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে হিন্দুদিগের বাহুবলই তাঁহার প্রতিপাদ্য ছিল। বঙ্কিমের অঙ্কিত সে বাহুবলের চিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থে বাহুবল অতীত অন্য প্রতিপাদ্য বিষয়ের কথা গ্রন্থকার স্বয়ং উপসংহারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,- "অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক,—সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিলেও যাহার ধর্ম্ম নাই—হিন্দু হোক, মুসলমান হোক—সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্ম্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্ম্মিক, এ জন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত এবং পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন।"

এইরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে নানা প্রকারে নানা শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। তাই বলিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য, কেবল তাহাদিগের ক্ষণিক আনন্দবিধানের জন্য উপন্যাস-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন নাই। তিনি উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও মহান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন।

পদ্মবন।

মিলাইল বিশ্ব যবে অর্জ্জুন-নয়নে,
দেখা দিলা নারায়ণ বিশ্ব-রূপ ধরি',
পার্থের আনন্দ-দীপ্ত প্রেমপূত মনে
উঠিল কি ভক্তি-ভয়-বিস্ময়-লহরী!
নীল শূন্যে কি লাবণ্য—শোভার উদয়!
দলমল ঢলঢল পাদ-পদ্ম-বন!
কোটী কোটী কোকনদে—নিত্য মধুময়—
আমোদিত দশ:দিশি—অনন্ত গগন।
সে পুণ্য কাহিনী স্মরি' সাধ হয় মনে,
তুলি' চির শ্রান্তিহীন গুঞ্জ গুঞ্জ রব,
ভৃঙ্গরূপে পশি পুণ্য-পাদপদ্মবনে
পদ্মে পদ্মে করি পান অমৃত-আসব।
পূরিবে কি সাধ মম—নাথ বিশ্বরূপ!
জুড়াবে কি চিরতৃষ্ণা এ চিত্ত মধুপ?

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ডায়েরির ক' পাতা।

—:০:—

১৭ই ফাল্গুন। বিয়ের জন্য সকলে ভারি অস্থির ক'রে তুলেছে। এত দিন ত পড়া-শুনা ব'লে সকলকে থামিয়ে রাখা গেছল; এখন মা ধ'রে বসেছেন,—এম্. এ. পাশ কর্‌লি, এখনো তোর আপত্তি? এ কথা মন্দ নয়! এম. এ. পাশ করেছি, অতএব আমাকে বিবাহ কর্‌তেই হবে! সুন্দর বিধি!

বিয়ে কর্‌ব কি? বাঙ্গালীর মেয়েগুলোকে আমি ত বিবাহের যোগ্যই মনে করি না। তারা নেহাৎ অপদার্থ! নোলকপরা একটা বার বছরের মেয়ে—দুটো কথা কইতে গেলে ঠোঁট জড়িয়ে যায়, তাকে বিয়ে কর্‌তে হবে! কেন? না, তিনি আমার ভাত খাবার সময় নুন-জল দিয়ে আসন পেতে দেবেন, দুটো পান সেজে দেবেন, আর তিন হাত ঘোমটা দিয়ে ঝম্ ঝম্ ক'রে মল বাজিয়ে চ'লে বেড়াবেন! বাজনা-বাদ্য ক'রে বর যাওয়া দেখা, আল্‌সের আড়াল থেকে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেখা, আর বাপের বাড়ী যাবার জন্যে গাড়ীতে চড়াই যার শ্রেষ্ঠতম আনন্দ, সেই রকম একটা হৃদয়হীন ছোট মেয়েকে বিয়ে কর্‌ব আমি?—যে 'ফিলজফি'তে এম্. এ. পাশ করেছে! আমার উন্নত হৃদয়ের সাধ আশার সঙ্গে সুর মিলিয়ে সে চল্‌বে কোথা থেকে, তার তেমন শিক্ষা কোথা!

মেয়েদের বিয়ের বয়সটা কিছু বাড়িয়ে দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। অন্ততঃ ১৫।১৬ বছর বয়স না হ'লে বিয়ে দেওয়া ঠিক নয়! না হ'লে কি ক'রে তারা শিক্ষা পায়, আর কি ক'রেই বা তাদের শিক্ষিত স্বামীদের সঙ্গে তারা মানিয়ে বনিয়ে চল্‌বে, এ আমার ধারণাই হয় না! যাক্, এ সব বড় কথা নিয়ে সমাজতত্ত্ববিদ্‌রা মাথা ঘামান্! তবে আমার নিজের সম্বন্ধে এইটুকু ঠিক ক'রে রেখেছি—নিজে না দেখে বিয়ে কচ্ছি না!

মাকে ত সাফ ব'লে দিয়েছি,—"তোমরা যে কোথা থেকে এক কালিন্দীর তিলফুলনাক পটলচেরা চোখ দেখ্‌বে, কি কোথায় এক গো-বেচারী 'পিরতিমে' দেখ্‌বে, আর আমাকে অমনি টোপর মাথায় দিয়ে একটি সং সেজে বিয়ে ক'রে আস্‌তে হবে, তা হবে না;—নিজে না দেখে বিয়ে কচ্ছি না।'—মা ত হেসে চ'লে গেলেন, বল্‌লেন, 'তা বেশ বাবু, আমাদেরি চোখ নেই, তোর ত আছে—আমাদের সঙ্গে তুইও দেখিস্!'

আঃ! বাঁচা গেল! এখন দু দিন ত হাঁফ ছাড়ি, ওঁরা ঘটকের সঙ্গে বোঝাপড়া করুন্!

২০শে ফাল্গুন। আজ দুপুর বেলা ব'সে একটা কবিতা লিখে ফেল্লুম। আমাদের দেশে কবিতা আর হচ্ছে না! বড়ই দুঃখের কথা! বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, এঁরা এক একটা কথা ব্যবহার ক'রে গেছেন, প্রত্যেকটি কি সুন্দর অর্থপূর্ণ—কি গভীরতা তার মধ্যে! এখনকার কবিরা কেবল কথার ঝঙ্কার তোলেন মাত্র—যেন জলের বুদ্বুদ, ভিতরে কিছু নাই! টেনিসন, বায়রণ, ব্রাউনিং, এ সব যাঁরা না পড়েছেন, কবিতা যে কি, তা তাঁদের বোধগম্য হওয়া দুষ্কর!

মা খুব শাসিয়ে গেলেন—'চাটুয্যেরা নাকি ভারী ধরেছে—তাঁদের পুঁটী বলে' মেয়েটি নাকি দেখ্‌তে বেশ!' হায়, পুঁটী ফুঁটী শেষে আমার হৃদয়-সাগরে সাঁতার দিয়ে বেড়াবে? কখনো নয়! দিন কতক গা-ঢাকা না দিলে দেখ্‌ছি পরিত্রাণ নেই! এই ফাল্গুন মাস থেকে শ্রাবণ মাস অবধি একটানা সময়টুকু প্রজাপতি দেবতার পক্ষে ভারী অনুকূল। এ ক'টা মাসকে কোনও মতে ডিঙ্গিয়ে যেতে পার্‌লে আবার একটুকু রক্ষা পাওয়া যায়!

২২শে ফাল্গুন। পুরাণো ডেস্ক গুছাতে গিয়ে সুধীরের কতকগুলো চিঠি পাওয়া গেল। আহা, বেচারী সুধীর! বরাবর আমরা এক সঙ্গে প'ড়ে এসেছি। সুধীরের বাপ মারা যেতে সুধীর ফার্ষ্ট আর্টসটা দিতে পারে নি; তার বাপ বেশ একটু সৌখীন ছিলেন—বিস্তর দেনাপত্র করে-ছিলেন। কাজেই তিনি মারা যেতে কল্‌কাতার বাড়ী বেচে সুধীরকে দেশে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে দেখা-শুনা হয়েছে আমাদের, তবে পত্রব্যবহারটা বরাবরই চ'লে আস্‌ছে। কেবল এই পূজার সময় থেকে চিঠিপত্র আমি লিখ্‌তে পারি নি, একজামিনের জন্য। আর, গোপন করাই বা কেন? চিঠি লেখার সে আগ্রহ, সে মিলনব্যাকুলতা ক্রমেই ক'মে আস্‌ছে! আগে সব কাজ ফেলে এই চিঠিলেখা ব্যাপারটা বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌ত, কোনও কাজেরও ক্ষতি হ'ত না। আর এখন সহস্র বাজে কাজে কত অবসর নষ্ট ক'রে ফেলছি, অথচ চিঠি লেখবার আর সময় পাওয়া যায় না ব'লে আমরা যে একটা ওজর ক'রে থাকি, সেটা কত অর্থহীন আত্মছলনা! সুধীরেরও চিঠি ত পাইনি!

আজ সুধীরের অনেক কথা মনে হচ্ছে। সুধীর আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দু' জনের এক সঙ্গে বেড়ানো, এক সঙ্গে টেনিস খেলা, এক সঙ্গে সাহিত্যচর্চ্চা—আঃ, সে কি সুখের দিনই না ছিল! লোকে বলে, যত জ্ঞান বাড়ে, মানুষ তত সুখী হয়। কিন্তু ছেলেবেলার সেই সরল সুন্দর অনাড়ম্বর দিনগুলিতে ছেলেমানুষী ক'রে বাজে গল্পে বাজে কাজে যে আমোদ—যে সুখ পেয়েছি, তার কাছে কাণ্ট হেগেলের জ্ঞানের আনন্দ কত তুচ্ছ মনে হচ্ছে! তার পর সুধীররা যে দিন দেশে চ'লে গেল, সেই সন্ধ্যার ম্লান আলোর মধ্যে দু জনের ছাড়াছাড়ি হ'ল—আমার হৃদয় যেন ভেঙ্গে পড়্‌ছিল---ভেবেছিলুম, এ কষ্ট এ বিচ্ছেদ বুঝি সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না! কিন্তু এমনি আশ্চর্য্য, আজ তা দিব্য স'য়ে গেছে—এতটুকু অভাব বোধ হচ্ছে না! পৃথিবীটা ভারি বিচিত্র জায়গা, সন্দেহ নাই; আজ যেটাকে নিতান্ত গর্ব্বের, আদরের, সাধের সামগ্রী ব'লে বুকে চেপে ধর্‌ছি, কাল সেটাকে অতি তুচ্ছ ব'লে দূরে ধূলায় ফেলে দিচ্ছি!

ভাব্‌ছি, একদিন সুধীরের দেশে বেড়াতে গেলে হয়। একটানা জীবনে একটু তবু বৈচিত্র্য পাব—আর সে-ও ত কতদিন ধ'রে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেছে! আর সব চেয়ে আরাম হবে, এই ঘটকগুলোর 'বচনামৃত' তিক্ত কুইনিনের মত গলাধঃকরণ কর্‌তে হবে না!

২৩শে ফাল্গুন। * * * * মাকে কাল রাত্রে বাঘাটি (সুধীরদের দেশ) যাবার কথা বলেছি। মা বল্লেন,—'বিয়েটা কাটাবার এ একটা ফন্দী!' মাকে অনেক ক'রে বোঝালুম, ফিরে এসে নিশ্চয় বিয়ে কর্‌ব। তখন মা আশ্বস্ত হলেন! আহা, মার তুল্য বন্ধু এ পৃথিবীতে আর কে আছে? এমন নিঃস্বার্থ স্নেহ মাতৃহৃদয় ছাড়া আর কোথায় সম্ভব? আজকালের বাবুরা এই মা'কে অম্লানবদনে অবহেলা করেন, তুচ্ছ একটা স্ত্রীর জন্য! বিলাস-লালসাটা বড়ই বেড়ে চলেছে, ভক্তি জিনিসটা নাই বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না! হা ভগবান্, বাঙ্গালীর হৃদয়টাকে কি একেবারে উপ্‌ড়ে বা'র করে দেছ? 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' ব'লে গগনভেদী চীৎকার-ধ্বনি ক'রে বেড়ালেই হয় না! ঘরে নিজের মার উপর তর্জ্জন-গর্জ্জন আর সভার মধ্যে ভারতমাতার নাম করতে গিয়ে চোখ দিয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে জল বাহির করা দেখে আমার অস্থি-মজ্জা জ্বলে যায়! এই সব পাষণ্ড নরাধমগুলোকে জুতোর ঠোক্কর মেরে দেশছাড়া

কর্‌লেও গায়ের জ্বালা মেটে না! হায়, শত অত্যাচারে নিপীড়ীতা বাঙ্গলার মাতৃগণ, তোমরা দারুণ বেদনার ক্ষোভে চোখের জলটুকু অবধি পড়্‌তে দাও না, পাছে তোমাদের দুর্ম্মুখ সন্তানগুলোর অকল্যাণ হয়! হায় মা, তোমরা অভিশাপ দাও, মায়া করিও না, এ সব কুলাঙ্গার সন্তান তোমাদের যন্ত্রণার তপ্ত নিশ্বাসে দগ্ধ হইয়া যাক্!

২৭শে ফাল্গুন।—সুধীরকে খুব চম্‌কে দেওয়া গেছে! ষ্টেশনে এক-খানাও গাড়ী মেলেনি, তাই সারা পথটা জিজ্ঞাসা কর্‌তে কর্‌তে সুধীরদের, বাড়ী পৌঁছাতে সন্ধ্যা হয়ে গেছল! সুধীর বাড়ীতেই ছিল। সুধীরের চেহারা কি বিশ্রী হয়ে গেছে! দারিদ্র্যরাহুর গ্রাসে তার চোখের প্রভাটুকু অন্তর্হিত! সুধীরের মাকে দেখ্‌লে যথার্থই ভক্তি হয়! দারিদ্র্য তাঁর লক্ষ্মীশ্রীটুকুকে যেন মোটেই স্পর্শ কর্‌তে পারেনি! কি যেন একটা পবিত্র দীপ্তি তাঁর চোখে! এই দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি যেন অবিচলিতা, সে দিকে যেন তাঁর ভ্রূক্ষেপও নাই! দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর মর্য্যাদা, তাঁর তেজস্বিতা যেন অক্ষুন্ন রয়েছে!

পরিবারের মধ্যে, সুধীরের মা, সুধীর, সুধীরের ছোট একটি বোন্, আর সুধীরের এক বছরের ছেলেটি। সুধীরের স্ত্রী এই পুত্রটি প্রসব ক'রেই ইহলোক ত্যাগ করেছে! হতভাগ্য সুধীর! এত দৈবদুর্বিপাকে যে তার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে, তার আর আশ্চর্য্য কি? হায়, দুঃখ কি, তা আমরা ক' জন বুঝি? কিন্তু যাকে ভুগ্‌তে হয়, সে দুঃখের নির্ম্মম কশাঘাতটা মর্ম্মে মর্ম্মে বোঝে!

সুধীরের মা বল্‌ছিলেন, তাঁর মেয়েটির জন্য একটি ভালো পাত্র দেখে দেবার জন্য। মেয়েটি তের বছরে পড়েছে, কেবল পয়সার অভাবে মনের মত পাত্র মিল্‌ছে না! হা, বাঙ্গালীর সমাজ! রাখী-বন্ধনের দিন 'ভাই ভাই' বলিয়া পরস্পরের হাতে রাখী বাঁধিবার ঘটাতে তোমার বুক ফুলিয়া উঠে, মাতৃভূমিকে আপ্যায়িত করিয়া দিতেছ ভাবিয়া গর্ব্বে নাচিতে থাক, আর এ কি তোমার ব্যবহার!

মেয়েটিকে দেখ্‌লে বড় দুঃখ হয়! গায়ে গহনা নাই, হাতে দু'গাছি রুলি, কানে দুটি মাকড়ি, আর নাকে একটি ছোট নোলক। ছেলেমানুষ, রান্না-বান্না করে, বাসন মাজে! এই বয়সে কোথায় সে পুতুল খেলিবে, মায়ের সহস্র আদরে ডুবিয়া থাকিবে, না তাকে এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়! একটু আহা বলিবার কেহ নাই। আর বড়লোকের শক্তিসামর্থ্যযুক্তা স্ত্রারা

জলের গ্লাস তুলিতে গিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেই বাড়ীতে আক্ষেপকারী ও ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যায়! তাঁদের সেই অলস হস্তের মণিমাণিক্যখচিত-বলয়-ঝঙ্কার আমার আজ অত্যন্ত অসহ্য মনে হচ্ছে! দারিদ্র্যের মধ্যে যে ত্যাগের মহত্ব আছে, তা এই ছোট মেয়েটিকে দেখে বুঝ্‌তে পার্‌লুম!

মা ত বিয়ের জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি কর্‌ছেন। এঁদেরও মেয়েটির বিয়ে হচ্ছে না। সুধীর আমার বাল্যবন্ধু, এখন অর্থাভাবে বিপন্ন। চিরদিন তার এমন অবস্থা ছিল না। আমি যদি হিমানীকে বিবাহ করি তো ইঁহারা স্বর্গ হাতে পান; কিন্তু আমি হিমানীকে বিবাহ করিতে পারি না! হায়, এমনি আমার বন্ধুত্ব! ডায়েরির কাছে স্পষ্টই স্বীকার করিতেছি, আমি বিবাহ করিতে পারি না; কারণ লোকের সম্মুখে এই স্ত্রীকে দাঁড় করাইব কি করিয়া? এই পাড়াগেঁয়ে মেয়েটাকে বিবাহ করিলে আমার মানসী কল্পনা লজ্জায় সঙ্কুচিতা হইবে না? ইহা আমার দুর্ব্বলতা, বুঝিতেছি, কিন্তু এই দুর্ব্বলতা আমাদের মধ্যে রীতিমত সংক্রামক হইয়া পড়িয়াছে! আমরা কবিতায় ইহার জন্য দুঃখ করিতে পারি, গল্পে এ ঘটনার নিষ্ঠুরতা বেশ ফুটাইয়া সকলের সহানুভূতির উদ্রেক করিতে পারি, থিয়েটারের ষ্টেজে অভিনয় দেখিয়া Pathetic বলিয়া চীৎকার করিতে পারি, 'ভাই ভাই ভেদ নাই' বলিয়া তারস্বরে গাইতে পারি, এমন কি, 'বিলাতী আমড়া'র নাম শুনিলে পঁচিশ ফুট জিব্‌ বাহির করিতে পারি, কিন্তু পারি না শুধু মনুষ্যত্বের চর্চ্চা করিতে— স্বদেশবাসীর দুঃখে এতটুকু স্বার্থত্যাগ করিয়া যথার্থ আন্তরিক সহানুভূতি দেখাইতে!

২৯শে ফাল্গুন।—আজ সকালে উঠে সুধীরের সঙ্গে খুব খানিক ঘুরে আসা গেছে। পাড়াগাঁটা আমার বড় ভালো লাগে। ফ্যাশানের জন্য নয়, ডায়েরি লিখ্‌ছি ব'লে নয়—জায়গাটা আমার কাছে যেন একটা স্বপ্ন-ঘেরা মায়ারাজ্য ব'লে মনে হয়। আরো এখানে হৃদয় ব'লে জিনিসটা এখনো দুর্ল্লভ হয়ে ওঠে নি! এখনো এখানে দু-চারটে খাঁটী প্রাণ মেলে।

ঘুরে বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলুম, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, সকালে তাড়াতাড়িতে আজ চা-টা খাওয়া হয় নি, তাই কষ্টটা এত বেশী হচ্ছিল। হায়, কতকগুলো বদ অভ্যাসের খেয়ালে বাজে সখে আমরা দিন দিন এত অপদার্থ হয়ে পড়্‌ছি! দু' একটা ডোবায় জল ছিল, কিন্তু তা এত ঘোলা যে, অত তৃষ্ণা সত্ত্বেও আমার পান কর্‌তে প্রবৃত্তি হ'ল না। সুধীর আমাকে নিয়ে এক

সদ্‌গোপের বাড়ী গেল। সদ্‌গোপ বাড়ী ছিল না; তার বুড়ী মা গরুদের জাব দিচ্ছিল। ব্রাহ্মণ জল চাচ্ছে জেনে, তাড়াতাড়ি দুটি পরিষ্কার ঘটীতে ক'রে জল এনে বল্‌লে, "বাবা, শুধু জল্‌টা খাবে, ভদ্দর লোক আপনারা, তা গরীব মানুষ, আপনাদের যুগ্যি আর কি পাই, এই চারখানি বাতাসা ঘরে ছি- এইটুকু মুখে দিয়ে জল খাও।" আমরাও খাব না, সেও ছাড়্‌বে না! শে- তার কোটই বজায় রাখ্‌তে হ'ল। আঃ, কি যে আরাম হ'ল, বল্‌তে পারি না। বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে ইলেক্‌ট্রিক ফ্যানের তলায় পরিমিত আদর আপ্যায়নের মধ্যে বরফ দেওয়া পাঁচ গেলাস আইসক্রীম সোডা খাওয়ার চেয়ে লক্ষগুণে তৃপ্তিপ্রদ! আমার মনে হ'ল, স্বর্গের অমৃতের আস্বাদ বুঝি এমনি! তার পর বুড়ী বল্‌লে, "জলের যা কষ্ট বাবা—এ সব কাদা-ঘোলা জল ছেলেপিলেদের ত দিতে পারি না, সেই রায়বাবুদের দীঘি থেকে জল নিয়ে আসি; পাঁচ ক্রোশ মাঠ ভেঙ্গে জল আন্‌তে হয়।" শুনে আমার মনে ভারী কষ্ট হ'ল। এই যে দেশের জরদ্গবগুলো গোরাদের ফণ্ডে, দরবারের আমোদে, বাগানবাড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ কচ্ছে, গবর্মেণ্ট চাঁদার খাতা ধর্‌লেই হুড়হুড় করে চাঁদার টাকা ঝ'রে পড়ে, তাঁরা যদি সবাই মিলে কটা পয়সা খরচ ক'রে এই সব জলহীন দেশে একটা ক'রে দীঘি খুঁড়িয়ে দেন, তা হ'লে সরকারে উপাধি মেলে না বটে, তবে এতগুলো আধমরা দেশের লোককে বাঁচিয়ে তাদের যে আশীর্ব্বাদ পান, সেটা কি এতই তুচ্ছ?

বুড়ীকে আমি একটা টাকা দিতে গেছলুম; সে কিছুতেই নিলে না। আমি বল্‌লুম্, "তোমার ছেলেদের খাবার কিনে দিও।" সে পায়ের ধূলো নিয়ে বল্‌লে, "আশীর্ব্বাদ কর বাবা, ওরা যেন গতর খাটিয়ে চিরদিন নিজের খাবারের জোগাড় করতে পারে।" হায়, কত শিক্ষিত লোক এই গতর খাটানোর মর্য্যাদা না বুঝে জুয়াচুরি বাটপাড়ি মোসাহেবী ক'রে উদরান্নের সংস্থান ক'রে বেড়ায়। তারা এই সব পাড়াগেঁয়ে চাষাদের পায়ের তলায় স্থান পাবারও যোগ্য নয়! হে আমার ডায়েরি, আজ এই পবিত্রহৃদয়া তেজস্বিনী বাঙ্গালী কৃষক-রমণীর কাহিনীতে তোমার দীন অঙ্গ শ্রীসম্পন্ন হ'ল, এ তোমার অল্প সৌভাগ্য নয়।

* * *

রাত্রে সুধীরের সঙ্গে এই সব কথা নিয়ে নানা তর্ক হচ্ছিল, হিমানীও ব'সে শুন্‌ছিল। সে আমার আলপাকার কোটটা দেখিয়ে বল্‌লে, "আপনা

এটা কি স্বদেশী ?" আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বল্‌লুম, "না"। "আপনি বুঝি স্বদেশী নন ?" আমি বল্‌লুম, "স্বদেশী বৈ কি !" "তবে ?" আমি অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লুম, "এ রকম স্বদেশী মেলে কই ? জিনিসটা ভালো নয় কি ?" সে বল্‌লে, "বিদেশীটা নাই বা ব্যবহার কর্‌লেন—দেশী গরদের কোট কি এর চেয়ে খারাপ হ'ত ?" আমি লজ্জিত হয়ে বল্‌লুম, "ঠিক বলেছ হিমু—" এই ব'লে পকেট থেকে দেশলাই বাহির ক'রে সেটাতে ধরালুম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার আদরের আলপাকার কোট পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

হিমুর বুদ্ধিশুদ্ধি দেখে একটু আনন্দ হ'ল। নিতান্ত সে অবজ্ঞার পাত্রী নয়। হায় ! পয়সার সঙ্গে ওজন ক'রে তবে এই সব মেয়ের বিয়ে হবে, হৃদয়টা কেউ দেখ্‌বে না ! আমি কলিকাতায় গিয়ে নিশ্চয় হিমুর জন্য একটি সুপাত্রের সন্ধান করব ! আজ হিমু আমাকে ভারী শিক্ষা দিয়েছে !

* * *

৩০শে ফাল্গুন।—সুধীরের ব্যবহারে একটা বিসদৃশ ভাব লক্ষ্য কচ্ছি ! সে যেন আমার সঙ্গে তেমন প্রাণ খুলে কথা কচ্ছে না, মিশ্‌ছে না—একটা সঙ্কোচের ব্যবধান রাখ্‌ছে ; বোধ হয়, দারিদ্রের জন্য ! এ তার অন্যায়। দারিদ্র্য ত পাপ নয় ; তার জন্য লজ্জা কি ? মানুষের অবস্থা কখন্ কি হয়, কিছু বলা যায় না। দারিদ্র্যকে যে ঘৃণা করে, সে মানুষ নয়। সিন্দুকভরা কোম্পানীর কাগজ নিয়ে যে হতভাগ্য তার সদ্ব্যয় জানে না, সমস্ত অবসরটুকু মদ আর বদখেয়ালিতে নষ্ট কচ্ছে, সে ত পশু ! তার তুলনায় যে দরিদ্র কেরাণী মাসে পঁচিশটি টাকা মাইনে পেয়ে কষ্টে স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ কচ্ছে, সে ত দেবতা ! আমি বরং সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ধূলিলাঞ্ছিত দরিদ্র কেরাণীর পায়ের ধূলো মাথায় নিতে পারি, তবু অমন বড়লোকের ছায়া মাড়াতে ঘৃণা বোধ করি !

সুধীর ভুল বুঝেছে। এ দারিদ্র্য ত তার ইচ্ছাকৃত নয় ! সে ত বদখেয়ালি ক'রে এ টাকা ওড়ায় নি ! এই যে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে কত লোক ফকীর হচ্ছেন, জুয়াচোরের চক্রান্তে কত লোক সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছেন, তাঁদের প্রতি ঘৃণা হয় কি ? যে ঘৃণা করে, সে পশু।

৩রা চৈত্র।—মা বাড়ী যাবার জন্য ভারী তাগাদা দিচ্ছেন। তাঁকে আরো কিছু দিনের ছুটী দেবার জন্য দরখাস্ত পাঠালুম। জায়গাটা বেশ লাগ্‌ছে। মা লিখেছেন, আমার জন্য তাঁর মন কেমন করে ! তা ত জানি—

আমিই তাঁর এ সংসারে একমাত্র বন্ধন! আজ ষোল বৎসর বাবা মারা গেছেন, আমার লেখাপড়া প্রভৃতি সবই ত মা দেখে আস্‌ছেন! মার মত বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী নারী ক্রমশই দুর্ল্লভ হচ্ছেন—চারি ধারে দেখে আমার ধারণা ত অন্ততঃ এইরূপ। স্বার্থসঙ্কীর্ণতা নারীসমাজটাকে কি শৃঙ্খলেই না জড়িয়ে রেখেছে! অথচ সে শৃঙ্খল ছাড়াবার জন্য চেষ্টা ত কারো দেখি না!

সুধীরের মা সন্ধ্যাবেলা দুঃখ কচ্ছিলেন, সুধীর কেমন হয়ে গেছে! কতকগুলো বদ্‌সঙ্গী জুটে তাকে উৎসন্ন দিচ্ছে! তিনি সুধীরকে ফেরাতে পাচ্ছেন না। কথাটা আমাকে বল্‌তে বিধবা নারীর অন্তরটা যেন ফেটে যাচ্ছিল! 'সে বিয়ে না ক'রে কেমন বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে, ছেলেটিকে অবধি ভালো ক'রে দেখে না, আমি আসা অবধি তবু যা একটু বাড়ীতে থাকে, নইলে বাড়ীতেও রোজ থাকে না।' কি দুঃখের কথা! আমার বড় কষ্ট হ'ল! সেই সচ্চরিত্র বিনয়ী সুধীর! এখন তার সঙ্কোচের কারণ বুঝ্‌লুম। তাই সে আমার সঙ্গে তেমন ক'রে কথা কইতে পারে না। সুধীরকে আজ কতবার কথাটা বল্‌ব-বল্‌ব মনে কর্‌লুম, কিন্তু দুঃখে ক্ষোভে আমার কণ্ঠ-রোধ হয়ে আস্‌ছিল! ধর্ম্মশিক্ষাটা আমাদের আদপে নাই ব'লে আজকালের যুবকদের moralityর (নৈতিক) ভিত্তিটা অত শিথিল।

৪ঠা চৈত্র।—আজ সকালে অনেক দূর বেড়াইয়া আসিয়াছি। বনের মধ্যে একটা ভাঙ্গা বাড়ী দেখা গেল। বেশ বড় রকমের। সুধীর বল্‌লে, এটা নাকি রাজা গণেশের আমলের। চকমিলানো প্রকাণ্ড দালানের ভগ্নাবশেষ প'ড়ে রয়েছে। দেয়াল ফুঁড়ে বড় বড় বট অশ্বত্থের গুচ্ছ উঠেছে। এমন নিঃশব্দ জায়গা—একটা লোকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পাশেই একটা প্রকাণ্ড পুকুর—বাঁধানো ঘাট, এখন ইষ্টকস্তূপের মত প'ড়ে রয়েছে! ঘাটের পাশে একটা ট্যাব্লেটের মত। তাতে কি লেখা,—অক্ষরগুলো পড়্‌তে পার্‌লুম না। সাহিত্য-পরিষদের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দেখ্‌তে পারেন। চারিধারে খুব ঘন ঝোপ—পুকুরের মধ্যে একটা মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। রহস্য-আবিষ্কারে এগুচ্ছিলুম, সুধীর বল্‌লে, "যেয়ো না হে—ভূতের দৌরাত্ম্যে এ ধারে কেউ আসে না, ওখানে দু' চার জন যাবার চেষ্টা করেছিল, আর ফেরেনি।" আমি বল্‌লুম, "সহরে কত রকম ভূত দেখা গেছে, এ পাড়াগাঁর নিরীহ ভূতকে ভয় কি?" সুধীর আমি ভূত মানি কি না জিজ্ঞাসা কচ্ছিল। আমি স্পষ্টই বল্‌লেম, "ভূতকে ভয় করি, তবে মানি না।" সুধীর হাস্‌তে

হাসতে বল্‌লে, "সবাই বলে; আমাদের বাড়ীতে ভূত আছে; কিন্তু আমরা ত কখনো দেখিনি—শুনে অবধি আমার ভূত দেখ্‌বার ভারী আগ্রহ হয়েছে; কিন্তু আবার এ দিকে ভয়ও করে, তাই আগ্রহটা কারো কাছে আর প্রকাশ ক'রে বলিনি।"

ফের্‌বার সময় বড় দুঃখ হ'ল! প্রত্নতত্ত্ববিভাগে কত বড় একটা আবিষ্কার ক'রে ফেল্‌তুম, কেবল সন্দেহের ভূতের ভয়ে এ বিপুল সম্মানটা ফস্‌কে গেল!

* * * * *

৭ই চৈত্র।—কাল রাত্রে ভারী একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। তা ডায়রিতে লিখে রাখ্‌তে আমার কষ্ট হচ্ছে; কিন্তু তবু কর্ত্তব্যবোধে লিখে রাখ্‌তে হবে।

রাত্রে কেমন গরম হচ্ছিল;—ভালো ঘুম হচ্ছিল না। তন্দ্রা আস্‌ছিল, আর ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তখন রাত ঠিক কটা, বল্‌তে পারি না। রাত্রের অন্ধকারে সে দিনকার ভূতের কথাই মনে হচ্ছিল—একটু-একটু ভয়ও হচ্ছিল। হঠাৎ মনে হ'ল, যেন কার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে! আমি দরজায় খিল না লাগিয়েই শয়ন করতাম। ঘরে আলো ছিল না। জানালাও তেমন খোলা ছিল না, একটু ফাঁক করা ছিল মাত্র। পাছে পাড়াগাঁর রাতের হাওয়াটা গায়ে লেগে ম্যালেরিয়া ধরে, এই ভয়ে জানালা খুলে শুতাম না। একটু সজাগ হয়ে বিছানার মধ্যেই পাশ ফিরে দেখ্‌লুম আপাদমস্তক চাদরে মুড়ি দেওয়া একটা ছায়ামূর্ত্তি ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল! কপালে বিন্‌ বিন্‌ ক'রে ঘাম বেরুতে লাগ্‌লো; ভয় হ'ল; ভাব্‌লুম, চেঁচিয়ে সুধীরকে ডাকি। কিন্তু স্বর যেন বেধে গেল! ভাব্‌লুম, মনের ভ্রমও ত হ'তে পারে! আস্তে আস্তে চোখ বুজে শুয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, দেশলাইটাও যদি বালিশের তলায় রাখ্‌তুম! কিছুক্ষণ বাদে চোখ চেয়ে দেখি, ঘরে কেউ নাই! তখন আমার হাসি পেতে লাগ্‌ল! ঘুমোবার চেষ্টা কচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ ঝুন্‌ ক'রে একটি শব্দ স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম, চোখ চেয়ে দেখি, সেই চাদরমুড়ি ছায়ামূর্ত্তি যেন ক্ষিপ্রগতিতে ঘর থেকে বাহির হইয়া গেল! আমার গা ছম্‌ ছম্‌ কচ্ছিল, সাহস করে বিছানা থেকে উঠে দেশলাই জেলে বাতিটা খাড়া করলুম। বাতিটা নিয়ে চারি ধার দেখ্‌তে গিয়ে দেখি, আমার জামাটা আলনায়

তলায় প'ড়ে গেছে, তারি পাশে ট্রাঙ্কের উপর আমার চেনশূন্য ঘড়ি ও মণিব্যাগ; দু' টুকরা কাগজ ও নীচে চেনছড়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নিশ্চয় তবে চোর আসিয়াছিল, কিন্তু আর আর জিনিসপত্র সব ঠিক রহিয়াছে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া আমি সেই কাগজ দুটা দেখিলাম। দু'খানা চিঠি—আমার কাছে রাখিয়া দিয়াছি—একটাতে লেখা আছে,—

"বিনা পয়সায় রোজ রোজ ইয়ার্কি দেওয়া পোষাবে না। এই সাদা কথায় ব'লে দিচ্ছি। বোতলের দরুণ কতটি টাকা জ'মে আছে, তা বাবুর হুঁস আছে কি? কাল কিছু টাকা চাই-ই, নইলে এ ধামে পা বাড়িও না। যার পয়সা নাই, তার অত মদ খাবার সখ কেন?"

আর একটা সুধীরের হাতের লেখা। সেটা এই রকম,—

"মাপ কর ভাই; নানান্ রকমে পয়সার চেষ্টা কচ্ছি, পাচ্ছি না। বোনটার গায়ে একটুকুও সোনা নেই; যা ছিল, সব নিয়েছি; পিতলের মাকড়ি আর রুলি রেখে ত আর কেউ পয়সা দেবে না, আর হাতেও কিছু আছে ব'লে মনে হয় না। কল্‌কেতা থেকে আমার একটি বন্ধু এসেছে, দেখি, তার কাছ থেকে যদি কিছু যোগাড় করতে পারি।"

হায়, সুধীর আজ চোর! সে আমার ঘড়ি চুরি করতে এসেছিল, টাকার কথা আমার কাছে খুলে বল্‌লেই ত হ'ত। আমি কি দিতাম না? কষ্টে আমার চোখ দিয়ে জল আস্‌বার মত হ'ল! ঘড়ি-চেন নিয়ে গেছল, অনুতাপ হয়েছে ব'লে ফিরিয়ে রেখে গেল। দু'বার সে এ ঘরে ঢুকেছিল, আমি বেশ দেখেছি। এই ছদ্মবেশ ধর্‌বে, আগেই কি সে স্থির করেছিল? নইলে সে দিন ভূতের কথা অত ক'রে তুল্‌বে কেন? হা ভগবান্, দারিদ্র্য যে মানুষকে এত হীন ক'রে ফেল্‌তে পারে, তা উপন্যাসেই প'ড়ে এসেছি; আজ কি শোচনীয় ভাবে চক্ষে তা দেখ্‌তে হ'ল!

মনটা খুব খারাপ হওয়ায় বাহিরে এলুম। দেখি, দালানের জান্‌লায় ব'সে হিমানী! কোণের দিকে মুখ ক'রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদ্‌ছিল! আমাকে হঠাৎ সাম্‌নে দেখে সে চম্‌কে উঠ্‌ল! তাকে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিল! হায়, সে তবে সব জানে!

আমি বল্লুম, "আমি সব জানি, হিমু; তোমার দাদার চিঠি থেকে সব জান্‌তে পেরেছি। তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, আমায় বল্‌বে কি?" সে ফোঁপাতে লাগ্‌ল! আমি সান্ত্বনার স্বরে বল্‌লুম, "বল।" হিমানী ফোঁপাতে ফোঁপাতে

বল্‌লে, "আপনি যদি সব জানেন ত মাকে কিছু বল্‌বেন না। তিনি কিছু জানেন না, শুন্‌লে নিশ্চয় বিষ খাবেন! দাদার কি হবে অমরবাবু?" তার পর সে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আজ বিকালে ধোপার বাড়ী কাপড় দেবার জন্য দাদার জামা নিতে এসে পকেটে দু'খানা চিঠি পাই; ঐ যে আপনার হাতে রয়েছে, প'ড়ে বড় কষ্ট হয়, কিন্তু এ কষ্ট কিছু নূতন নয়; চিঠি দুটো দাদার ঘরে বাক্সের উপর রেখে জামাটা কাচ্‌তে দেওয়া হয়। তার পর চিঠির কথা মনেই ছিল না। রাত্তিরে কিছুক্ষণ আগে মার পায়ে মালিশ ক'রে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দালানে এসে দেখি, সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কে এক জন আপনার ঘর থেকে বেরিয়ে দাদার ঘরে ঢুক্‌ল! আমি চোর মনে ক'রে দাদাকে ডাক্‌ব মনে কচ্ছি, এমন সময় দেখি, দাদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ব্যাপার জান্‌বার জন্য আস্তে আস্তে দাদার ঘরে ঢুকে দেখি, তাঁর বাক্সের উপর ঘড়ি, চেন, আর মণিব্যাগ! ঘড়িটা দেখেই আপনার ঘড়ি ব'লে চিন্‌তে পার্‌লুম। তখন সেই বিকেলের চিঠির কথাও মনে পড়্‌ল। ব্যাপার বুঝ্‌তে আর দেরী হ'ল না; ভয়ে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমার মাথা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। দাদা শেষে টাকার জন্যে আপনার ঘড়ি, চেন, ব্যাগ চুরি করেছে। আপনি যদি জান্‌তে পারেন,—দাদা চোর, তা হ'লে কি হবে, এই ভেবে তখনি আমি বিছানার চাদরখানা মুড়ি দিয়ে আপনার ঘরে জিনিসগুলো রাখ্‌তে গেলুম, তাড়াতাড়িতে চিঠি দুটোও রেখে এসেছি, আর চেনটা হাত ঠেকে প'ড়ে গেল। আপনি যদি জেগে ওঠেন, তাই তাড়াতাড়ি পালিয়ে এসেছি। দাদা কোথায় গেল, এখনো ফেরেনি। আমার বুকটার ভিতর যে কি হচ্ছে, তা কি বল্‌ব। দাদার কি হবে অমরবাবু?" সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। আমি তার পিঠ চাপ্‌ড়ে আশ্বাস দিয়ে বল্‌লুম, "তোমার মাকে ব'লে সুধীরকে আমি কল্‌কেতায় নিয়ে যাব। তার যাতে ভালো চাকরী হয়, সে যাতে ভাল হয়, কর্‌ব।" হিমানী কাতরস্বরে বল্‌লে, "মাকে এ কথা বল্‌বেন না যেন; দাদা চোর, এ কথা শুন্‌লে মা নিশ্চয় গলায় ছুরি দেবেন।" "তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি শোও গে, আমি দেখি, সুধীর কোথায় গেল।" "না, না, দাদা তা হ'লে আরো লজ্জা পাবে।" "তবে থাক্‌" ব'লে হিমানীকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে আমি নিজের ঘরে এসে অনেকক্ষণ সুধীরের কথা ভাব্‌তে লাগলুম। সুধীরের বিয়ে হ'লে সে ভাল হতে পারে। আমার বিশ্বাস, তা' হ'লে সুধীরের দায়িত্বহীন জীবনে একটা নূতন দায়িত্ব আস্‌বে।

আজ সকালে সুধীরের সঙ্গে দেখা হ'লে হাস্‌তে হাস্‌তে যখন বল্‌লুম, "ওহে, কাল এক ভৌতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার ঘরে কাল ভূত এসেছিল। কিন্তু গলাও টেপেনি, মারধোরও করেনি। কেবল আমার পকেট থেকে ঘড়ি, চেন আর ব্যাগটা বের ক'রে ট্রাঙ্কের উপর রেখে একটু কৌতুক ক'রে গেছে!" সুধীর তখন আর কথাটি কইলে না, তার মুখ কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল!

হিমানীর সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, সে কোনও কথা বল্‌লে না, তার দৃষ্টিতে এমন একটা মৌন কাতরতা ফুটে উঠেছিল যে, তা দেখলে পাষাণও গলে যায়।

সুধীরের মার কাছে সুধীরকে ক'লকাতায় নিয়ে যাবার কথা বল্‌তে তাঁর ত তাতে খুব সম্মতি দেখা গেল; সুধীরকেও আজ বোঝানো গেল, সে-ও রাজী হয়েছে!

১১ই চৈত্র।—কল্‌কেতায় এসে মাকে সব কথা কিন্তু খুলে বলেছি—না বল্‌লে আমি যেন স্থির হতে পাচ্ছিলুম না। শুনে মার চোখ জলে ভ'রে এল। সহানুভূতির এই অশ্রু কি পবিত্র!

হিমানীর বিবাহের জন্য মা ঘটকদের ব'লে দিয়েছেন।

১২ই বৈশাখ।—আজ দু' দিন হ'ল, সুধীরের চাকরী হয়েছে। আমাদের ফারমে তাকে একটা ভালো চাকরী জুটিয়ে দেওয়া গেছে। আমাদের বাড়ীতেই সে থাকে। প্রাণটা একটু আশ্বস্ত হয়েছে। সেই পুরাণো সুধীরকে যে ফিরে পাওয়া গেছে, এ কি কম সুখের কথা!

মা বিয়ের জন্য ভারী উঠে পড়ে লেগেছেন; কিন্তু হিমানীর বিয়ে না হ'লে ত আমি বিয়ে কর্‌তে পারি না। হিমানীর বিয়ের জন্যও বিস্তর পাত্র দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আমার পছন্দমত হচ্ছে না। মা হেসে বল্‌লেন, "তোমার বাবু কি যে পছন্দ, তা ত জানি না; নিজের পাত্রীও যেমন মনে ধরে না, হিমানীর পাত্রও তেমনি পছন্দ হচ্ছে না!" তা ব'লে যারা নাকটি কানটি পর্য্যন্ত চেপে দর্ কস্‌তে থাকেন, হিমানীকে ত সেই সব ব্যবসাদার পাত্রের হাতে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌ব না। এমন হৃদয়টা কি কেউ দেখ্‌বে না?

১৫ই বৈশাখ।—মা এইমাত্র এসে বল্‌লেন, "পাত্র ঠিক হয়েছে হিমানীর! সুধীরকে তাঁদের আন্‌তে পাঠাই।" আমি বল্‌লুম, "কোথায় পাত্র?" মা বল্‌লেন, "যেখানেই হোক্, এ তোমার নিশ্চয় পছন্দ হবে; রূপে গুণে সব

বিষয়ে আমার মনের মত এমনটি আর পাব না। তোমাকে এখন বল্‌ব না, যদি আবার ভেঙ্গে দাও; ওরা এলেই জান্‌তে পারবে!" আমি বল্লুম, "তারা কত টাকা চায়?" মা বল্‌লেন, "তারা কিছু চায় না, কিছু দিতে হবে না, শুধু আশীর্ব্বাদের সঙ্গে মেয়েটি চায়!" আমি ত শুনে অবধি অবাক্ হয়ে রয়েছি! এই টানাটানি আর বুদ্ধির আধিক্যের দিনে এমন হতভাগা গাধা কে আছে যে, বিয়ে ক'রে টাকা নিতে চায় না? এমন প'ড়ে-পাওয়া চৌদ্দ গণ্ডা লাভ ছেড়ে বিয়ে কর্‌তে চায় কোন্ বেকুফ্! লোকটা এবং তার অভিভাবকেরা পাগল নয় ত?

* * * *

১৯শে বৈশাখ।—আজ সন্ধ্যাবেলা আর বেড়াতে যাওয়া হবে না; হাবুলদের ওখানে পার্টিটা ছিল। বাড়ীতে ভারী মজা হয়ে গেছে! বেরুব বলে' ত মাথায় ব্রস চালাচ্ছি, এমন সময় মা একেবারে হিমানীকে সঙ্গে ক'রে আমার ঘরে হাজির! পিছনে সুধীরের মা! হিমানী যেন আগেকার চেয়ে ফরসা হয়েছে মনে হ'ল! প্রণামাদির পর মা হঠাৎ হিমানীর হাতটা টেনে আমার হাতে রেখে বল্‌লেন, "এই আমার হিমানীর পাত্র, বুঝ্‌লে অমর? আমি ক' দিন ধরে ঠিক ক'রে রেখেছি! তোর জন্যও ঢের পাত্রী দেখেছি, কিন্তু এমন লক্ষ্মীটিকে ঘর থেকে ছাড়্‌তে প্রাণ চায় না! আমার বড় সাধ, হিমানীকে বুকে তুলে নি! তোর কোনও আপত্তি শুন্‌বো না; এখন বেয়ান্, তুমি তোমার মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদ কর!" মা যেন আস্ত একখানা উপন্যাস লিখে ফেললেন! সুধীরের মা গদ্‌গদকণ্ঠে বল্‌লেন, "আমার হিমুর এমন ভাগ্যি যে, আপনার পায়ে স্থান পাবে?" মা বল্‌লেন, "পায়ে কি ভাই, এমন মাণিকটিকে আমি মাথায় তুলে রাখ্‌ব যে!" আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন, "এই বুধবারেই বিয়ে হবে। এবার আমার কথার এতটুকু নড়চড় হবে না, তা কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি অমর!" আমি ত অবাক্! সেই হিমানী আমার স্ত্রী হ'তে চান! ভবিতব্য একেই বলে আর কি! যাক্, কি আর করব? মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলা ত যায় না। হিমানী মেয়েটি মন্দই বা কি? আমি ত অপ্সর নই যে অপ্সরী চাই। আর যাই হোক্, ঘটকগুলোকে আচ্ছা জব্দ করা গেছে!

২৬শে বৈশাখ।—কাল আমাদের ফুলশয্যা হ'য়ে গেছে। হিমানী চিরজীবনের মত আমার সঙ্গিনী হ'ল! কাল সমস্ত গায়ে ফুলের গহনা প'রে

হিমানী রাত্রে যখন প্রকাণ্ড গোড়ে মালাটি আমার গলায় পরিয়ে দিলে, তখন আবার আমার কবিতা লেখ্‌বার সাধ হচ্ছিল! কিন্তু সে নিষ্ঠুরতা আর কর্‌ব না; তের বছরের বাঙ্গালীর মেয়েগুলোকে যে রকম অপদার্থ মনে কর্‌তুম, এখন দেখ্‌ছি, ঠিক সে রকম নয়! কাল হিমানীর সঙ্গে নানান গল্পে রাত্রিটা যে কখন্ বিনিদ্রভাবে কেটে গেছে, তা কিছু বুঝ্‌তে পারি নি! এটা আমার কাছে কল্পনাতীত বটে, অথচ এমন interesting কথাবার্ত্তাও বড় একটা ত শুনতে পাই না! হিমানী একটা বড় ভয় দেখিয়েছে! সে নাকি আমার ডায়েরিখানা আগাগোড়া প'ড়ে ফেলেছে! সুধীর ও তার মা যে সেই ভূতের ব্যাপার কিছু জান্‌তে পারে নি, এতে সে ভারী আশ্বস্ত। সে বায়না নিয়েছে, আমার এ খাতাখানি সে বাক্সবন্দী কর্‌বে; অন্য খাতায় আমার ডায়েরি চলুক, এই তার ইচ্ছা। তার বিশেষ ভয়, কখন্ এখানা কার হাতে প'ড়ে যায়। তা বটে; এখন ডায়েরিখানা আমাদের কাছে ত একটু সপদার্থ ঠেক্‌ছে! জানি না, এই অনুরোধ-রক্ষাটাকে কেউ কাপুরুষতা বল্‌বেন কি না, তবে আমি ত এটা পরিণীত জীবনের একটা সুন্দর সূচনা মনে ক'রে হিমানীর প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে বলে বসেছি, 'তথাস্তু'!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সন্দেহ।

—:০:—

বিশ্বাসের উপর জগৎ স্থাপিত। বিশ্বাস না করার নাম সন্দেহ। বিশ্বাস দুই প্রকার। অন্ধ বিশ্বাস, এবং জ্বলন্ত-চক্ষু-বিশিষ্ট বিশ্বাস। ঠিক না জানিয়া বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বিশ্বাস। ঠিক জানিলে সন্দেহ হয় না। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও কথা কেহ ঠিক জানে, এমন কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। জ্বলন্ত চক্ষুতে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অনেক সময় ভ্রম হয়। অনুমান বরং ভাল। অন্যের কথায় বিশ্বাস বাস্তবিক কেহ করে না, তবে ভদ্রতার খাতিরে সেটা মধ্যে মধ্যে প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যায়।

যখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না, তখন সম্পূর্ণ বিশ্বাসও ন্যায়সঙ্গত নহে। অথচ বিশ্বাস না করিলে চলে না। কাজেই বিশ্বাস চক্ষুহীন। কলুর বলদকে বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। অমাবস্যা রজনীকে বিশ্বাস বলিতে পারেন।

মানুষ যে বিশ্বাস করে, সে যে কিছু জানিয়া শুনিয়া করে, তাহা নয়; দায়ে পড়িয়া করে। বিশ্বাস একটা চুক্তি। যদি শান্তি চাহ, তবে বিশ্বাস কর। এইরূপ পরস্পরকে বিশ্বাস করিলে জগৎ পূর্ব্বাপর চলিতে থাকে।

ইহার নাম আইনসঙ্গত বিশ্বাস, অর্থাৎ বিশ্বাস-in-law। চুক্তির উপর যাহা সংস্থাপিত, তাহাকে in law বলা যাইতে পারে। যেমন,—Brother-in-law (শ্যালা), friend-in-law (বন্ধুপ্রবর) neighbour-in-law (পাড়াপড়সী) ইত্যাদি। এইরূপ Master-in-law (গুরু), Shopkeeper-in-law (দোকানদার), publisher-in-law (প্রকাশক), preacher-in-law (ধর্ম্মপ্রচারক)।

অর্থাৎ, সকলেই জানে যে, কেহই কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারে না, অথচ আপাততঃ করিতে হইবে। ইহা সামাজিক চুক্তি,—Social Contract।

কেহই ঈশ্বরকে দেখে নাই। অথচ কেহ বিশ্বাস করে, কেহ বিশ্বাস করে না। যে বলে 'আমি বিশ্বাস করি', সে কলুর বলদ। যে বলে 'আমি করি না', সে ধোপার গাধা। উভয়েই নিরীহ, এবং বোঝা বহে। তফাতের মধ্যে, বলদ চুপ করিয়া থাকে, কিন্তু গাধা চীৎকারপূর্ব্বক শান্তিভঙ্গ করে। ইহার মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর এক প্রকার জীব আছে; তাহারা অপেক্ষাকৃত নীরব গাধা, কিন্তু বদমায়েস্। অর্থাৎ, সন্দেহ করিয়াও চুপ করিয়া থাকে।

কিন্তু লোকে সন্দেহ করে কেন? ইহা একটা স্বভাব। অনেকে জানে, গালি দিলে গালি খাইতে হয়, অথচ দিয়া বসে। এইরূপে ক্রমাগত গালি খাইতে খাইতে পরাস্ত হইয়া পড়িলে, আপনি চুপ করিয়া থাকে। ভক্ত লোকেরই হউক, কিংবা বিজ্ঞ লোকেরই হউক, সন্দেহ করাটা স্বাভাবিক। অজ্ঞ লোকের সন্দেহ সামাজিক। বিজ্ঞ লোকের সন্দেহ দার্শনিক। বন্ধু, প্রতিবাসী, দোকানদার, ভৃত্য, মাতুল, খুড়া, স্ত্রী, পুত্রাদির প্রতি সন্দেহ করা সামাজিক সন্দেহ। যদি প্রতিবাসী চোর হয়, দোকানদার প্রবঞ্চক হয়, খুড়া দাবীদার হয়, তবে তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেহ চোর হয়, কেহ হয় না। তাহার কোনও উপায় নাই। তবে তুমি বলিতে পার যে, সন্দেহের কারণ থাকিলে, যদি তাহার বিশেষ তদন্তপূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধান করিয়া, যথাসময়ে দোষের নিবারণ না করা যায়, তবে সমাজের অনেক হানি হইতে পারে। অতএব, সন্দেহ হইলে বলিয়া ফেলা ভাল। এমন কি, দোষীর

দণ্ডবিধানের চেষ্টা না করা একটা মহাপাপ। এটা গেল রাজনীতির কথা, কিংবা সামাজিক নীতির কথা। ইহার মধ্যে অনেক বখেড়া ও জঞ্জাল আছে। আত্মীয়বর্গ কিংবা আরও নিকটতমের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহঘোষণা কাহারও কাহারও মতে নীতিবিরুদ্ধ; কারণ, তাহারা মিথ্যা অপবাদের ফৌজদারী করিতে পারে না। দোকানদার প্রভৃতি পারে। আত্মীয়গণ সম্বন্ধে চালাকী খাটে, অন্য বাজে লোকের পক্ষে খাটে না। অতএব, সময়ে অসময়ে চুপ করিয়া থাকিতে হয়, কিংবা কানাঘুষা করিতে হয়। ইহা অনেকের মতে হেয়। যাহারা নিরীহ, তাহাদিগের উপর সন্দেহ করাও যেমন কাপুরুষের কাজ, যাহারা দুর্ব্বল ও অবলা, তাহাদিগের উপর সন্দেহ করাও তথৈবচ। অতএব, যদিও তর্কের স্থলে স্বীকার করা যায় যে, সন্দেহের উপকারিতা আছে, সন্দেহ করাটা যে বড় বাহাদুরীর কাজ, তাহা বোধ হয় না। সেটা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত।

সংসারে সকলেরই উপযোগিতা ও উপকারিতা আছে। ঘাতকের আছে, চোরের আছে, শঠের আছে। ইহাও একটা ধর্ম্মের কর্ম্মের মধ্যে। কিন্তু সে গুলি অনেকে পছন্দ করেন না। অনেকে হাকিম হইতে চাহে না, পুলিস হইতে চাহে না। কাজ্‌টা বেশ, কিন্তু অনেক সময় ছোট লোকের মত না হইলে চুক্তি-ভঙ্গ হয়। সেইরূপ, সন্দেহ করাটা জগতের একটা বৃহৎ স্বাভাবিক কর্ম্ম হইলেও, সেটা ভদ্রলোকের পক্ষে দমন করাই অনেকে শ্রেয়ঃ মনে করেন।

আপনি বলিতে পারেন, ইহাতে লাভ কি? সাবধান হইলে অনেক উপকার হইতে পারে। কিন্তু ম্যাড়াকান্তের ন্যায় অসন্দিগ্ধচিত্তে যে বসিয়া থাকে, সে লোকটা অপদার্থ। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে লাভ ও অলাভ, উপকার ও অপকার কাহাকে বলে, তাহা এ পর্য্যন্ত আমরা বুঝিতে পারি নাই। যদি ঠকিলে মনে কষ্ট হয়, তবে বিশ্বাস করিলেও যতখানি ঠকা সম্ভব, সন্দেহ করিলেও প্রায় সেই রকম।

দার্শনিক সন্দেহ কিছু গুরুতর। জগতে সত্য আছে কি না, স্নেহ আছে কি না, ভক্তি আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কি না, এ সব সন্দেহ স্বতঃই মনে উদিত হয়। অজ্ঞ লোকের সন্দেহের মত বিজ্ঞ লোকের সন্দেহের নিরাস হয় না। বরাবর সন্দেহ করিয়া, উত্তরোত্তর বিচার করিয়া, কোনও পদার্থেরই নিরাকরণ হয় নাই। তবে এরূপ সন্দেহের মধ্যে কোনও ফৌজদারী দেওয়ানীর

বিপদ নাই। স্নেহ, ভক্তি, প্রেম, ও ঈশ্বর প্রভৃতি দেবতাদির উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য গালি দিয়া এক হাত লওয়া কিছুই কঠিন নয়।

সন্দেহের অর্থ কি?

অমুক পদার্থ আমি যাহা ভাবি, তাহাই কি না, ইহার পরীক্ষার পূর্ব্বে মনে যে একটা আন্দোলন হয়, তাহাই অনেকটা সন্দেহের মত। রাম জানিতেন, সীতা সতী, অথচ লোকের সন্দেহ হওয়াতে একটা অগ্নির পরীক্ষা হইল। কিংবা হয় ত রামই জানিতেন না, লোকে জানিত। ফলতঃ, অগ্নি-পরীক্ষাটা সে সময় নিতান্ত দরকারী হইয়াছিল। নচেৎ হইবে কেন?

পরীক্ষা দিয়াই সীতাদেবী পাতালে প্রবেশ করিলেন। রামচন্দ্র ও প্রকৃতিবর্গ শোকসন্তপ্ত হইয়া হাহাকার করিলেন। বানরবৃন্দ বলিল, "ইহা সন্দেহের ফল।" সকলে অবশ্য বলিল, "রামচন্দ্রের ন্যায় ভগবানের অবতার, এরূপ গোমূর্খের ন্যায় কর্ম্ম কেন করিলেন?"

বশিষ্ঠ দেব বুঝাইয়া বলিলেন যে, "এরূপ ভূমণ্ডলে ঘটিয়া থাকে। আমি একবার অরুন্ধতী দেবীর উপর সন্দেহ করিয়াছিলাম।"

সকলে বলিল, "কি আশ্চর্য্য!"

বশিষ্ঠ। (লজ্জিতভাবে)—"তোমরা বুঝ নাই, আমার সন্দেহ সতীত্ব সম্বন্ধে মোটেই হয় নাই, অন্য একটা কথায়—"

সকলে। (উৎসুক হইয়া) "তবে কি জন্য? কি জন্য?"

বশিষ্ঠ। আমার এক সের তণ্ডুল গুম হইয়া যাওয়াতে সন্দেহ হয় যে, অরুন্ধতী দেবী————

সকলে।—চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ (সক্রোধে) অবশ্য তা নয়। তিনি অর্দ্ধ সেরও খাইতে পারেন না।

সকলে।—তবে, ভিখারীকে দান করিয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ।—তাহাও নহে। সেটা তাঁহার অভ্যাস নাই।

সকলে।—তবে, আর কি হইতে পারে?

বশিষ্ঠ।—সন্দেহটাই তাই। যদি কিছু হইতে পারিত, তবে সন্দেহ থাকিত না। আমি ত্রিকালজ্ঞ, অথচ কিছু জানিতে পারি নাই।

সকলে। তবে অরুন্ধতী দেবীর দোষ কি?

বশিষ্ঠ। আমারও তাহাই সন্দেহ। তোমরা যদি না বুঝিয়া থাক, তবে তোমাদিগের দোষ। সন্দেহ কোন্ বিষয়ে, এবং কেন হয়, তাহা ঠিক বুঝা

যায় না। সীতাদেবীর উপর রামচন্দ্রের কোনও বিশেষ কারণে সন্দেহ হয় নাই। তবে সন্দেহের খাতিরে অগ্নি-পরীক্ষাটা হইয়া পড়িয়াছে।

সকলে। এটা আমরা জানিতাম না।

বশিষ্ঠ। এটা সকলে জানে না। আবার একটা কথা বলি শুন। যদি সীতার সতীত্বের উপর তোমাদের সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে কি পরীক্ষায় মিটিয়াছে ?

সকলে। (ভাবিয়া) না, সকলের মিটে নাই।

বশিষ্ঠ। ইহার নাম দার্শনিক সন্দেহ। যদি সন্দেহ হয়, তবে প্রমাণের উপরও সন্দেহ থাকে। সীতার উপর যেমন সন্দেহ, অগ্নিপরীক্ষার উপর তদ্রূপ। যদি আমি বলি ভূত দেখিয়াছি, তবে ভূত সম্বন্ধে যেমন সন্দেহ ছিল, আমার দেখা সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইবে। আমি যদি সাক্ষী মানি, তাহার উপর হইবে, এবং যত সাক্ষী মানিব, ততই হইবে। যদি তুমি চক্ষু দিয়া দেখ, তবে হয় ত চক্ষুর উপর হইবে, কিংবা বলিবে,—'এ সব কোনও জুয়াচোর ব্যাটার চালাকী'। ঠিক নয় ?

সকলে। (চিন্তা করিয়া)—ঠিক কথা বলিয়াছেন প্রভু। তবে সন্দেহ মেটে কিসে ?

বশিষ্ঠ। সন্দেহ মেটে না। তবে তাহাকে তুচ্ছ করা যায়। অর্থাৎ, সন্দেহ স্বভাবতঃ হইয়া থাকে। যেমন চন্দ্র উঠে, সূর্য্য পাটে বসে, বানর লাঙ্গূল নাড়ে, বোল্‌তা কামড়ায়। তাহার উপায় নাই।

সকলে। তবে কি করা উচিত ?

বশিষ্ঠ। বর্জ্জন করা উচিত। ইহার কারণ আছে। সন্দেহপ্রবৃত্তি অনাদি। ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে একটা কল্পনা করেন, এবং ঠিক সেটা হইয়াছে কি না, তাহা তিনি ও জগতের সকলে দেখিয়া থাকে। যতক্ষণ সেটা ঠিক না হয়, ততক্ষণ সকলেরই সন্দেহ থাকিয়া যায়।

সকলে। কবে সেটা ঠিক হয় ?

বশিষ্ঠ। কোনও কালেই নয়। কারণ, কল্পনাটা সম্পূর্ণ, আর কল্পিত পদার্থ অসম্পূর্ণ। যদি ঈশ্বর নামক একটা সম্পূর্ণ মনের মত কিছু ধরিয়া লও, তবে যাহা দেখিবে, তাহাতেই তাঁহার অভাব পাইবে। হয় ত স্ত্রীলোকটা সুন্দরী, কিন্তু তাহার কটাক্ষ সন্দেহজনক। হয় ত গুরু অতি প্রবীণ, কিন্তু চোরের ন্যায় মতি গতি। হয় ত গায়ক ভাল, কিন্তু গলাটা কর্কশ। হয় ত

ব্যাধিটা জ্বরের মত, কিন্তু বিসূচিকা হইলেও হইতে পারে। ফলে ভালটুকু পাতালে প্রবেশ করে, এবং মন্দটুকু তোমার সন্দেহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। তুমি যাহা চাও, তাহা পাও না; যাহা চাও না, তাহাই দেখিতে পাও। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, কি চাহি, তাহা কেহ জানে না। তোমরা বলিতে পার, সীতাদেবী কি রকমটি হইলে তোমাদের বিশ্বাস হইত ?

সকলে।—তা ঠিক বলা যায় না।

বশিষ্ঠ। ইহারই নাম সন্দেহ।

অগ্নিপরীক্ষার ন্যায় জগতে সব পরীক্ষাই সমান। অতএব বিশ্বাস ভিন্ন গতি নাই। বিশ্বাস কর্ম্মের মূল, কর্ম্মই জ্ঞানের মূল। আবার এই জ্ঞান লুক্কায়িতভাবে বিশ্বাস সতেজ করে। অতি সুগোল প্রণালী, কিন্তু আমাদিগের নিকট ইহা একটা প্রহেলিকার ন্যায় বোধ হয়। এ বিশ্বাসটা কি বাস্তবিক অন্ধ ?

জগতের নিয়ম এই যে, সন্দেহ থাকিলেও চুক্তিমত সকলকে বিশ্বাস করিতে হইবে। অশ্লেষাতে যাত্রা করা উচিত কি না, এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ থাকিলেও, অন্য এক দলের থাকিবে না। আশ্বিন মাসে ঝড়ের সন্দেহ থাকিলেও লোকে নৌকাযাত্রা করে। বলে জয়লাভের সন্দেহ থাকিলেও যোদ্ধা বিমুখ হয় না। ঔষধে বিষের ভয় থাকিলেও বিশ্বাস করিয়া সকলে খায়, এবং বাঁচিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে ঔষধটার অন্ততঃ অর্দ্ধেকটা খাইতে হয়। ইহার নাম Social Contract. আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞ পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, এই সামাজিক চুক্তির মূলে একটি গূঢ় ধর্ম্ম আছে। তাহার নাম আত্মোৎসর্গ। ইহা শিক্ষা করিতে হয় না। আপনি হয়। বিশ্বাসের মূলে আত্মোৎসর্গ আছে। অতএব, বাস্তবিক কোনও বিশ্বাসই অন্ধ নয়। অমানিশায় চন্দ্র সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেও আমাদের ভিতর কে যেন বলিয়া দেয়, "বিশ্বাস কর; সংসারের বিরাট ঘোড়দৌড়ে বিশ্বাসই বল, বিশ্বাসই প্রমাণ, বিশ্বাসই জ্ঞান ও ঈশ্বরত্ব।"

তুমি জান,—আমি চোর, লম্পট, প্রবঞ্চক; অথচ আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে। সে বিশ্বাস এই যে, আমি চোর নহি, লম্পট নহি, প্রবঞ্চক নহি। তবে জানিয়া শুনিয়া কিরূপে বিশ্বাস করিব ?

ইহার উত্তর কথায় দেওয়া যায় না। যে ভালবাসিয়াছে, সে জানে; যে অসতীকে স্কন্ধে বহন করিয়া বিমানারোহণে দ্যুলোকে গিয়াছে, সে জানে; যে পতিত দেশ ও জাতির জন্য সকলই সহিয়াছে, সে জানে। সে জানিত, জগৎ মিথ্যা; কিন্তু সে দেখাইয়াছিল, উহার মধ্যে সত্য আছে। সে জানিত। সে সন্দেহ করে নাই। কিন্তু জানিয়াও আত্মদান করিয়াছিল। এইরূপে ঈশ্বর মায়াপুষ্প হইতে নন্দনকাননের সুবাস লইয়া ভক্তি ও বিশ্বাসের স্তম্ভ রচনা করেন। সেই সুবাস সকলের মধ্যে আছে, কেবল সন্দেহের মধ্যে নাই।

হিন্দু স্থাপত্য।

হিন্দু স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রামরাজ প্রভৃতি মনীষিগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে প্রচারিত হইয়াছে; ঐ সকল প্রবন্ধ ইউরোপে অত্যন্ত আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রবন্ধগুলি আমাদের দেশে তাদৃশ আদৃত হয় নাই। হিন্দুর সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভা-প্রসূত স্থাপত্য শিল্প ও অন্যান্য কলাবিদ্যা সম্বন্ধীয় পুস্তকগুলির কথা আমাদের এ দেশের অনেকেই অবগত নহেন। জেনারল কানিংহাম, ফার্গুসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহাদের নিজের ভাষায় হিন্দুর স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। তঁহাদের সেই আলোচনা-পাঠে সমগ্র সভ্য জগৎ বিস্মিত হইয়াছে। ভারতবাসীদিগের মধ্যে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ও এই সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ঐ গ্রন্থগুলি ইংরেজী ভাষায় লিখিত ও ইংরেজ প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত। মূল্যাধিক্য হেতু এ দেশের জনসাধারণের নিকট তাহার বহুল প্রচার হয় নাই। দুই চারি জন ইংরেজী-শিক্ষিত ধনবান ব্যক্তিই এই পুস্তক ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পুস্তক প্রণীত হইবার বহু পূর্ব্বে আর এক জন ভারতবাসী অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে, বহু প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত পুঁথি অবলম্বনে হিন্দুর স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া, এবং ঐ সম্পর্কে অনেক নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল

মিত্র অনেক স্থলে ইঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার নাম রামরাজ। রামরাজ বাঙ্গালা দেশের লোক নহেন; সুতরাং এই প্রসঙ্গে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিলে বোধ হয় বিরক্তিকর হইবে না। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোর সহরে (কর্ণাট) সুবিখ্যাত বিজয়নগর রাজবংশে রামরাজ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গালোরের বিচারপতি ও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর এক জন সদস্য ছিলেন। ইঁহার প্রবন্ধগুলি ইংরেজী ভাষায় লিখিত। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী অফ্ গ্রেট ব্রিটেন এণ্ড আয়র্লণ্ড ঐ প্রবন্ধগুলি বিলাতেই প্রকাশিত করেন। দুর্ব্বোধ্য বিদেশীয় ভাষায় সন্দর্ভগুলির প্রচার ও সন্দর্ভ-গ্রন্থের মূল্যাধিক্য হেতু এ দেশে ঐ সকল প্রবন্ধের প্রচার হয় নাই। ভারতের যে শিল্পকলা এক দিন সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছিল, ঐরূপ নানা কারণে এখন ভারতবাসীর নিকট তাহা উপেক্ষিত। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালায় ভারতের এই অতীত গৌরবকাহিনী সম্যক আলোচিত হয় নাই। হিন্দুর স্থাপত্য-শিল্প, বিজ্ঞান, দর্শন, স্মৃতি, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি দেখিবার, বুঝিবার, ভাবিবার ও শিখিবার বিষয়। কোনও জাতির জাতীয় শিল্পের অনুশীলন করিলে, সেই শিল্পে সেই জাতির জাতীয় জীবন প্রতিফলিত দৃষ্ট হয়। হিন্দু জাতি যখন স্বাধীন ছিল, যখন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীন ছিল, তখন তাহাদের জাতীয় জীবনও ছিল। সুতরাং হিন্দুর স্থাপত্য-শিল্পের আলোচনা করিলে হিন্দুর অতীত জাতীয় জীবনের কথারও আলোচনা করা হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও সেই সমুন্নত প্রাসাদাবলি, গগনস্পর্শী পিরামিদাকার তোরণে শোভিত, সুদৃশ্য কারুকার্য্যে খচিত মন্দিরগুলি, সহস্র-সমুন্নত-স্তম্ভবিশিষ্ট অলিন্দসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে। উহা দেখিয়া এখনও শত শত বিদেশী পরিব্রাজক মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকে, পথক্লান্তি ভুলিয়া যায়, এবং আপনাকে ধন্য মনে করে। একদিন বাঙ্গালার সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার উদয়গিরি ও ললিতগিরির বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার কয়েক ছত্র এখানে না তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না।—

"উদয়গিরি বৃক্ষরাজিতে পরিপূর্ণ, কিন্তু ললিতগিরি বৃক্ষশূন্য প্রস্তরময়। এককালে ইহার শিখর ও সানুদেশ অট্টালিকাস্তূপ ও বৌদ্ধ মন্দিররাজিতে শোভিত ছিল; এখন শোভার মধ্যে শিখরদেশে চন্দনবৃক্ষ আর মৃত্তিকা-প্রোথিত ভগ্ন গৃহাবশিষ্ট প্রস্তর, ইষ্টক, বা মনোমুগ্ধকর প্রস্তরগঠিত মূর্ত্তিরাশি।

তাহার দুই চারিটা কলিকাতার বড় বড় ইমারতের ভিতর থাকিলে কলিকাতার শোভা হইত। এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়! * * * * আর উড়িষ্যার প্রস্তরশিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনে পুতুল হাঁ করিয়া দেখি, আরও কি কপালে আছে বলিতে পরি না। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাই লিখিতেছি। সেই ললিতগিরি আমার চিরকাল মনে থাকিবে। * * * চারি পাশে মৃত মহাত্মাদের কীর্ত্তি। পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্ত্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্যপুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চল প্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপ-প্রেম-গর্ব্ব-সৌভাগ্য-স্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভি—এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? তখন হিন্দু মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল,—উপনিষৎ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এ সকলই হিন্দুর কীর্ত্তি—এ পুতুল কোন ছার।" কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের সেই অতীত গৌরবকাহিনী বিস্মৃতির অতল জলে বিসর্জ্জিত করিয়া বসিয়া আছি, আর ইংরেজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক একটি অদ্ভুত ও বিষম সৌধ দেখিয়া বিস্ময়সাগরে ডুবিতেছি, এবং মনে করিতেছি যে, উঁহাদের উর্ব্বর-মস্তিষ্ক-প্রসূত অপূর্ব্ব উদ্ভাবনী শক্তির নিকট বিশ্বকর্ম্মার কল্পনাও পরাজয় মানিয়াছে।

ভারতীয় স্থপতি-কার্য্য দেখিয়া পাশ্চাত্য পর্য্যাটকগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, হিন্দুদিগের এই শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় কোনও শিল্পশাস্ত্র অবশ্যই আছে। সেই শিল্পশাস্ত্র হইতেই তাহারা এই সমস্ত কারুকার্য্য নির্ম্মিত করিয়াছেন। এই ধারণার বশেই রিচার্ড ক্লার্ক প্রমুখ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর কয়েক জন সদস্য এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। রিচার্ড ভারত হইতে বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তথাকার কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিলেন। রিচার্ড ক্লার্কের এই প্রস্তাব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণের

অনুমোদিত হইল। তখন রামরাজ ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও অনুসন্ধান করিবার জন্য রিচার্ড কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলেন। এ সম্বন্ধে এসিয়াটিক সোসাইটীর কার্য্যবিবরণ যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Richard's India নামক গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

আমাদের বেদ, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, ইতিহাস, চিকিৎসা ও কোষ-গ্রন্থাদি যেরূপ সংস্কৃত পদ্যে লিখিত, সেইরূপ শিল্পশাস্ত্র সকল ও সংস্কৃত পদ্যে লিখিত। যে সময় এই সমস্ত গ্রন্থ লিখিত হয়, সে সময় যদিও প্রাকৃত ভাষা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময়ই কেবল ঐ ভাষা ব্যবহৃত হইত। তখন কি রাজ-সভায়, কি দেবমন্দিরে, কি পিতৃতর্পণে, কি বিবাহমণ্ডলে, সর্ব্বত্র ভদ্রমণ্ডলীর মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্য একমাত্র দেবভাষাই ব্যবহৃত হইত।

ঐ শিল্পপুস্তকগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত—গ্রন্থের প্রণেতা ব্রাহ্মণ (ঋষি); কিন্তু যাহাদের জন্য পুস্তক লিখিত হইয়াছিল, তাহারা সংস্কৃতচর্চ্চায় অনধিকারী হীন জাতি। সুতরং ঐ পুস্তকগুলি ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কেহ পাঠ করিতে পাইত না। ব্রাহ্মণগণ শিল্পশাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহারা শিল্প সম্বন্ধে কোনও কাজই স্বহস্তে করিতেন না। তাঁহারা শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া সময়ে সময়ে অনার্য্য ও বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হীনজাতিসমুৎপন্ন শিল্পীদিগকে উপদেশ প্রদান করিতেন। শিল্পীরাও সেই সমস্ত উপদেশ মুখস্থ করিয়া রাখিত। এবং যথাসময়ে আপন আপন পুত্রাদিকে উহা শিখাইত। কিন্তু তাহারা কদাচ ঐ উপদেশের কথা অন্য কাহাকেও শিখাইত না। এইরূপে ঐ অভ্যস্ত বিদ্যা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সংক্রমিত হইয়া বংশ-পরম্পরায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শিল্পবিদ্যা বংশগত হইয়া ক্রমে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি শিল্পী জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু মানুষ কত দিন এক বিষয় স্মরণ রাখিতে পারে? কালক্রমে ঐ সকল শিল্পী জাতি অল্পে অল্পে সেই সকল শিল্পকৌশল ও শিল্পসূত্র ভুলিতে আরম্ভ করিল। সে সময় ব্রাহ্মণ্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবার অভিযোগের ভয়ে সেই শিল্পসূত্র-গুলিকে কেহ প্রাকৃত ভাষায় অনূদিত করিতে সাহস পাইল না। ব্রাহ্মণগণ যখন দেখিলেন যে, শিল্পীরা নিজ নিজ কর্ম্ম ভালরূপ শিক্ষা করিয়াছে, তখন তাঁহারা শিল্পশাস্ত্রের চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালক্রমে শিল্পশাস্ত্র গ্রন্থ সকল তাঁহাদের

নিকট অকিঞ্চিৎকর ও মূল্যহীন বিবেচিত হইল। সুতরাং তাঁহারা ঐ সকল শাস্ত্রের সংরক্ষণকল্পে আদৌ যত্নশীল হইলেন না। অযত্নে পুস্তকগুলি কীটদষ্ট ও খণ্ডিত হইতে লাগিল। শিল্পীরাও সুযোগ পাইলেই ঐ সমস্ত অযত্নরক্ষিত খণ্ডিত গ্রন্থরাশি গোপনে পাঠ করিবার চেষ্টা করিত, এবং সেই গুপ্তবিদ্যা শিখিয়া লইবার জন্য তাহারা কোনও গ্রন্থের একটি অধ্যায়, কোনও গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায়, অথবা কোনও গ্রন্থের শেষখণ্ডমাত্র সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানের অভাবে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থ বুঝিতে পারিত না। এইরূপ কালক্রমে ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিত কলা বিদ্যা লুপ্ত হইয়া যায়।

রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে এ পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে যে সমস্ত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনখানিই সম্পূর্ণ নহে। সুতরাং প্রাচীন হিন্দুজাতির সমগ্র শিল্পশাস্ত্র কিরূপ ছিল, এখন তাহা জানিবার কোনও উপায়ই নাই। কিন্তু সেই জীর্ণ, খণ্ডিত, কীটদষ্ট পুঁথি হইতে যতটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু জাতির শিল্প-বিজ্ঞান বিশেষ উন্নত হইয়াছিল। ঐ সকল পুঁথির প্রত্যেক ছত্র, প্রত্যেক পৃষ্ঠা পাঠে জানা যায় যে, এক সময় হিন্দুজাতির সূক্ষ্ম দৃষ্টি, সৌন্দর্য্যজ্ঞান, নিপুণতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতির বিশেষ স্ফুরণ হইয়াছিল। সেই সময় ইউরোপ অজ্ঞানতার ঘোর তমসায় সমাচ্ছন্ন ছিল। তখনও যূনানীর স্থাপত্য-শিল্পের সেই প্রাচীনতম নিদর্শনস্বরূপ মেসিনার সিংহদ্বারশোভিত দুর্গ (মহাকবি হোমর আরগসের রাজা এগামেমনের সুবর্ণময় প্রাসাদাবলি বলিয়া ইলিয়াড মহাকাব্যে যাহার বর্ণনা করিয়াছেন) নির্ম্মিত হয় নাই। তখনও টাইরেন্স দুর্গের প্রস্তরময় প্রাচীরের প্রস্তররাশি আর্গলসের পর্ব্বতগাত্রেই সংলগ্ন ছিল। তখনও ফিজিয়াস, লিসিস্পাস্, পেরেক্‌াইটিস্ গ্লাইফল, প্রটোজিনিস, ফিলস্‌ট্রেটাস্ প্রভৃতি যূনানীর শিল্পাচার্য্যগণ জন্মগ্রহণই করেন নাই। কতকাল পূর্ব্বে হিন্দুর কলা-বিদ্যা ঈদৃশ উন্নতি লাভ করিয়াছিল, একটা মোটামুটি হিসাব করিলে তাহা জানা যাইতে পারে। খৃষ্টজন্মের দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে মেসিনা সভ্যতার আলোকে আলোকিত হইয়াছিল। ফদিয়স্ প্রভৃতি মনীষিগণ খৃষ্টের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যদি হিন্দুর কালনির্দ্ধারণপদ্ধতি অনুসারে গণনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যে, ৫১৫০ পাঁচ হাজার দেড় শত বৎসরের কিছু পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির রাজত্ব

করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন. যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজগণ যদি প্রত্যেকে গড়ে ষোল বৎসর রাজ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল খৃষ্টপূর্ব্ব বিংশ শতাব্দীতে পড়ে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অর্জ্জুনের পৌত্র রাজা জনমেজয়ের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, ঋগ্বেদের ঐ অংশ সঙ্কলিত হইবার বহুপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের আবির্ভাব হইয়াছিল। যদিও এই সমস্ত পৌরাণিক সময়নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতের অনেক অনৈক্য আছে, তথাপি এ কথা বলা যাইতে পারে যে, রাজা যুধিষ্ঠির খৃষ্টপূর্ব্ব ১৬০০ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং শিল্পিশ্রেষ্ঠ 'ময়' ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের বৈজয়ন্ত-প্রতিম অতুল সভাগৃহ নির্ম্মিত করিবার বহুপূর্ব্বে "ময়মত" নামক প্রসিদ্ধ ও উপাদেয় শিল্পগ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন।

মহর্ষি অগস্ত্য যখন বিন্ধ্যাচল অতিক্রম করিয়া দুর্গম দণ্ডকারণ্যে আমমাংসভোজী নরঘাতক রাক্ষসগণকে নির্ম্মূল করিয়া পাণ্ড ও চোল রাজ্য সংস্থাপিত করেন, * তখন তিনি নগর ও পুরীনির্ম্মাণার্থ "সকলাধিকার" নামক একখানি গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন।

হিন্দুদিগের মধ্যে যে সকল শিল্প প্রচলিত ছিল, কেহ কেহ সেই শিল্প সকলকে দ্বাত্রিংশ, কেহ বা চতুঃষষ্টি কলায় বিভক্ত করিয়াছেন।

শৈব তন্ত্রেও শিল্পের চতুঃষষ্টি কলার উল্লেখ আছে। আমরা প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে কেবলমাত্র চতুঃষষ্টি কলার নাম উল্লেখ করিলাম। † এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে ভারতের নানা স্থান হইতে যে সমস্ত পুঁথি, সংগৃহীত হইয়াছে, সার উইলিয়ম জোন্স বলেন যে, সেই সকল গ্রন্থে এই

---

* অধ্যাপক উইলসন তাঁহার Catalogue of M'kengie Colectionএর ভূমিকায় লিখিয়াছেন, পাণ্ড ও চোল রাজ্য ৩য় ও ৪র্থ খৃষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের আর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ১০ম শতাব্দীতে দাক্ষিণাতে আর্য্য সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল। Wilsonএর এই মত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা আমরা পরে প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিব।

† শিল্পের চতুঃষষ্টি কলা;—১ গীত, ২ বাদ্য, ৩ নৃত্য, ৪ নাট্য, ৫ আলেখ্য ও বিশেষক-চ্ছেদ, ৭ তণ্ডুলকুসুমাবলিবিকার, ৮ পুষ্পাস্তরণ, ৯ দশনবসনাঙ্গরাগ ১০ মণিভূমিকা কর্ম্ম, ১১ শয়নরচন, ১২ উদকবাদ্য, ১৩ উদকঘাত, ১৪ চিত্রযোগ, ১৫ মাল্যগ্রথনবিকল্প, ১৬ শেখরাপীড়যোজনন, ১৭ নেপথ্যযোগ, ১৮ কর্ণপত্রভঙ্গ, ১৯ গন্ধযুক্তি, ২০ ভূষণযোজন,

চতুঃষষ্টি কলার অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত আছে। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্প সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার সময় রামরাজ ঐ পুঁথিগুলি অত্যন্ত অবহিত হইয়া পাঠ করিয়াছিলেন। ইনি সার উইলিয়ম জোন্সের উপরিলিখিত মত সম্বন্ধে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—While I admire his extraordinary talents and extensive khowledge of Asiatic literature, I cannot but think that he was misinformed as to the number of subjects comprised in the Silpa Shastras. দাক্ষিণাত্যের নানা স্থানে শিল্পীদের মুখে কতকগুলি পদ্যের আবৃত্তি শুনা যায়। উহা হইতে বুঝা যায় যে, ঐ ৬৪ কলার মধ্যে বত্রিশটি মুখ্য ও বত্রিশটি উপশিল্প। ঐ সকল কারিকায় হিন্দু শিল্পবেত্তাদিগের ও তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের নামও কীর্ত্তিত আছে। শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে এই চতুঃষষ্টিকলার যেরূপ নাম ও লক্ষণ লিখিত আছে, তাহার সহিত শিবতন্ত্রোক্ত চতুঃষষ্টিকলার নাম ও লক্ষণের বিশেষ প্রভেদ নাই। পুনরুক্তিভয়ে এ স্থলে আর তাহা উল্লিখিত হইল না।

এক্ষণে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর যত্নে ও চেষ্টায় যে সমস্ত হস্তলিখিত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব। নিম্নে সেই গ্রন্থগুলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল।—

১। মানসার; ২। ময়মত; ৩। কশ্যপ; ৪। উবৈখানস; ৫। সকলাধিকার; ৬। বিশ্বকর্ম্মী; ৭। সনৎকুমার; ৮। সারস্বতম; ৯। পঞ্চরাত্রম।

শ্রীআনন্দকুমার সাহা।

---

২১ ইন্দ্রজাল, ২২ কৌচুমার যোগ, ২৩ হস্তলাঘব, ২৪ পানকরণবাগাসবযোজন, ২৫ সূচীবাপকর্ম্ম, ২৬ সূত্রক্রীড়া, ২৮ প্রহেলিকা, ২৯ প্রতিমালা, ৩০ দুর্ব্বচক যোগ, ৩১ পুস্তকবচন, ৩২ নাটিকাখ্যায়িকাদর্শন, ৩৩ কাব্যসমস্যাপূরণ, ৩৪ পট্টিকাবেত্রবিকল্প, ৩৫ তকুকর্ম্ম, ৩৬ তক্ষণ, ৩৭ বাস্তুবিদ্যা, ৩৮ রূপ্যরত্নপরীক্ষা, ৩৯ ধাতুবাদ, ৪০ মণিরাগজ্ঞান, ৪১ আকরজ্ঞান, ৪২ বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, ৪৩ মেষকুক্কুটশাবকযুদ্ধ বিধি, ৪৪ শুকসারিকাপ্রলাপন, ৪৫ উৎসজ্ঞান, ৪৬ কেশমার্জ্জনকৌশল, ৪৭ অক্ষরমুষ্টিকাযোগকথন, ৪৮ ম্লেচ্ছিতকবিকল্প, ৪৯ দেশভাষাজ্ঞান, ৫০ পুষ্পশকটিকাজ্ঞান, ৫১ যন্ত্রমাত্রিকা, ৫২ ধারণমাতৃকা, ৫৩ সংপাঠ্য, ৫৪ মানসীকাব্যক্রিয়া, ৫৫ ক্রিয়াবিকল্প, ৫৬ ছলিতকযোগ, ৫৭ অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান, ৫৮ বস্ত্রগোপনাট, ৫৯ দ্যূতবিশেষ, ৬০ আকর্ষণক্রীড়া, ৬১ বালকক্রীড়ণকালি, ৬২ বৈনচিকীবিদ্যাজ্ঞান, ৬৩ বৈজুয়িকী বিদ্যাজ্ঞান, ৬৪ বৈতালিকা বিদ্যাজ্ঞান।

সহযোগী সাহিত্য।

বিদেশী উপকথা।

শৃগাল, শশক ও কুক্কুটের উপাখ্যান।

জনৈক প্রসিদ্ধ শিকারী আফ্রিকার এই বিচিত্র কাহিনীগুলি ভাষান্তরিত করিয়াছেন। লেখক আপনার নাম প্রকাশ করেন নাই। কাহিনীগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। আফরিকার অন্তর্গত নায়াসা প্রদেশস্থ কোনও শিকারীর নিকট হইতে অনুবাদক এই সকল উপকথা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাঠকবর্গের কৌতূহলপরিতৃপ্তির নিমিত্ত আমরা একটি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিলাম।

সুন্সুরা নামক শশক জিবুই নামক কোনও শৃগালের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে এই সর্ত্ত ছিল, এক জন যাহা করিবে, অপর বন্ধুও ঠিক সেই মত কাজ করিবে।

কাননচারী পশুদিগের মধ্যে শশক সর্ব্বাপেক্ষা ধূর্ত্ত ও কপট। সে মনে মনে সংকল্প করিল, শৃগালকে প্রতারণা করিয়া প্রাণে মারিয়া ফেলিতে হইবে।

শৃগালের জননী বিদ্যমান, এ কথা শশক জানিত। সে ভাবিল, বন্ধুর মাতাকে পৃথিবী হইতে সরাইয়া দিয়া সুখের পথ নিষ্কণ্টক করা প্রয়োজন। এই চিন্তা করিয়া সে শৃগালের নিকট প্রস্তাব করিল,

'বন্ধু, মাতৃহত্যা করা যাউক। আমি আমার মাকে মারিয়া ফেলিব, তুমিও তোমার মাকে পৃথিবী হইতে জন্মের মত সরাইয়া দাও।'

প্রস্তাবিত সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে উভয়ে স্ব স্ব খড়্গ ও বল্লম লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

শশক তাহার গর্ভধারিণীকে কোনও গহ্বরে লুকাইয়া রাখিয়া বলিল, 'মা, তুমি এখানে থাক। আমার খাবার তৈয়ার করিয়া রাখিও। আমি ইচ্ছামত আসিয়া খাইয়া যাইব।'

তার পর ধূর্ত্ত শশক 'মিতুম্বতী' নামক বৃক্ষের সন্ধানে বাহির হইল। এই বৃক্ষের রস গাঢ় রক্তবর্ণ। বৃক্ষরসে শশক তাহার খড়্গ ও বল্লম রঞ্জিত করিয়া রাখিল।

এ দিকে সরলবিশ্বাসী শৃগাল মনে মনে ভাবিল, 'মাকে মারা হইবে না। কিছু দিন যাক্, তার পর মিতের সহিত দেখা করিয়া বলিলেই হইবে যে, মাকে হত্যা করিয়াছি। আমার কথা বন্ধু নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিবে। মাও এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইবে।'

যথা সময়ে শৃগাল পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট স্থলে ফিরিয়া গেল। শশক তথায় উপনীত হইলে শৃগাল বলিল 'ভাই, আমি তোমার কথামত আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছি।'

শশক বলিল, 'কই তোমার অস্ত্র দেখি?'

শৃগাল মুখ ফিরাইয়া লইল। সে কোন উত্তরই করিতে পারিল না। তখন শশক সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে সে বন্ধুকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, 'আমার

অস্ত্র দেখ, আমি আমার জননীকে হত্যা করিয়াছি কি না, তাহার প্রমাণ এই শোণিত সিক্ত অস্ত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। কিন্তু বন্ধু, তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পালন কর নাই। তোমার খড়্গো ও বল্লমে রক্তের চিহ্নমাত্র নাই। চল, তোমার বাড়ী যাই। আজ তোমাকে প্রতিজ্ঞা পালন করিতেই হইবে।"

শৃগাল অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইল; কিন্তু উপায় নাই। সে শপথ পূর্ব্বক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। এখন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে কিরূপে? সুতরাং বন্ধু সহ সে গৃহে ফিরিয়া গেল, এবং জননীকে হত্যা করিল।

কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে শশক বলিল, "মিতে, এখন জননীর জন্য শোক প্রকাশ করিতে হইবে। আজ হইতে আমরা কেহ বনের কীট পতঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার আহার্য্য গ্রহণ করিব না।"

অতঃপর উভয়ে কীট পতঙ্গের সন্ধানে বাহির হইল। অনাহারে ক্রমশঃ শৃগাল শুকাইয়া যাইতে লাগিল। এ দিকে শৃগাল নিদ্রিত হইলে শশক প্রত্যহ তাহার মাতার নিকট যাইত, এবং পরিতোষসহকারে তাহার প্রস্তুত আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিত।

কিছু দিন পরে শৃগালের কঠিন পীড়া হইল। তাহাতেই সে পঞ্চত্ব পাইল।

অন্যান্য অত্যাচারী পশু যখন শুনিল, শশক শৃগালের প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তখন তাহাদের হৃদয় ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে একটা সভা আহূত হইল।

সভায় প্রশ্ন হইল, "এই ধূর্ত্ত শশককে বুদ্ধিবলে কে পরাজিত করিতে সমর্থ?"

কেহ কোনও উত্তর করিল না। শশকের সহিত প্রতিযোগিতা করে, এমন সাহস কাহারও নাই।

কুক্কুট এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। কেহ কোনও কথা কহে না দেখিয়া সে বলিল, "আমি শশককে বুদ্ধিবলে পরাজিত করিয়া তাহার বিনাশসাধন করিতে পারি। এ কাজ আমি করিবই!"

সভাস্থ সমস্ত প্রাণী বলিল, "না ভাই, তুমি কখনই পারিবে না। তোমার বুদ্ধি এত তীক্ষ্ণ নয় যে, তুমি ধূর্ত্ত শশককে কপটতায় পরাজিত করিতে পার।"

কুক্কুট বলিল, "থাম, থাম, ঢের হয়েছে। কিরূপে তাহাকে প্রতারিত করিতে হইবে, তাহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে। শীঘ্রই তোমরা আমার কৌশলের পরিচয় পাইবে। আপাততঃ আমি শশকের সহিত বন্ধুত্ব করিব। তোমরা কাণ পাতিয়া থাকিও, যে সব ঘটনা ও কথাবার্ত্তা হয়, শুনিতে পাইবে।"

কুক্কুট অতঃপর শশকের সহিত সাক্ষাৎ করিল। স্বাগতসম্ভাষণ ও অভিবাদনের পর শশক বলিল, "কি সংবাদ? তুমি ত পূর্ব্বে কখনও আমার বাড়ীতে এস নাই। আমার গৃহে বোধ হয় তোমার এই প্রথম পদার্পণ।"

কুক্কুট উত্তর করিল, "সে কথা ঠিক। আমি আর কখনও তোমার বাড়ীতে আসি নাই। আজ যে এলুম, তার কারণ আছে।"

"কারণটা কি?"

"আমি তোমার বন্ধুত্বের প্রয়াসী। জগতে আমার কোনও বন্ধু নাই, তাই আজ তোমার কাছে এসেছি। আজ হইতে আমি তোমার মিতা। এখন আমি বাড়ী যাইতেছি। কাল আমার গৃহে তোমার নিমন্ত্রণ। তুমি যেও। দু' জনে বেশ গল্পগুজব করা যাইবে।"

শশক সানন্দে বলিল, "সে বেশ কথা। আমি আনন্দের সহিত তোমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম।"

কুক্কুট গৃহে গিয়া ভোজের আয়োজন করিল। নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইলে সে তাহার পত্নীদিগকে বলিল, "দেখ, আমার বন্ধু শশককে নিমন্ত্রণ করিয়াছি। কাল সে এখানে আসিবে। আমি সে সময় ঐ প্রাঙ্গণের একপাশে আমার ডানার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া থাকিব। সে আমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তোমরা বলিও, আপনার বন্ধু ঐখানে শুইয়া আছেন। আজ সুলতানের দরবারে একটা মকদ্দমা আছে। সেই মকদ্দমায় সাক্ষ্য দিতে হইবে বলিয়া তিনি তাঁহার মস্তককে সেখানে পাঠাইয়াছেন।"

পর দিবস নিরূপিত সময়ে শশক নব বন্ধুর গৃহে উপনীত হইল। বন্ধুর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে কুক্কুট-পত্নীগণ স্বামীর আদেশানুযায়ী তাহার নিশ্চল দেহ দেখাইয়া পূর্ব্বশিক্ষামত সমস্ত বিবৃত করিল।

তার পর তাহারা শশককে সসম্ভ্রমে বারাণ্ডার এক পার্শ্বে আসন করিয়া দিল। নানারূপ ভোজ্য তাহার সম্মুখে রক্ষা করিয়া কুক্কুট-মহিষীরা বলিল, "স্বামী মহাশয় এখনই ফিরিবেন।"

শশক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। সে ভাবিল, "বন্ধু দেখিতেছি বিশেষ ক্ষমতাশালী। এতটা পথ তাহার মুণ্ডটা দেহের সাহায্য ব্যতীত গমনাগমন করিতে পারে? এমন ত কখনও দেখা যায় না।"

ইত্যবসরে কুক্কুট বারাণ্ডার অপর পার্শ্ব দিয়া বন্ধুর সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "এই যে— আসিয়াছ! তোমাকে স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে পারি নাই বলিয়া আমি বড় দুঃখিত। কিন্তু কি করিব ভাই, তথায় যাইতে হইয়াছিল। কি খবর? সব ভাল ত?"

শশক বলিল, "প্রাঙ্গনে তোমার মুণ্ডহীন দেহ আমি দেখিয়াছি। এখন তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছ দেখিয়া আমি সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি এখন বাড়ী যাই। কাল আমার ওখানে তোমার নিমন্ত্রণ, যাইতে ভুলিও না।"

কুক্কুট বলিল, "নিশ্চয় যাইব। তোমার সহিত গল্প করিতে পাইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

শশক গৃহে পঁহুছিয়া নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিল। ভোজনের আয়োজন শেষ হইলে সে তাহার পত্নীদিগকে বলিল, "কাল আমার মিতা কুক্কুট এখানে আসিবে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে তাহার মাথা কাটিয়া উহা সুলতানের দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেখানে কোন মকদ্দমার সাক্ষ্য দিয়া তাহার মাথা দেহের সাহায্য ব্যতীত গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। আমার বন্ধু অসীমশক্তিশালী! তোমরা আগামী কল্য আমার মাথা কাটিয়া এক স্থলে লুকাইয়া রাখিবে। বন্ধু আসিলে তাহাকে বলিবে যে, আমার মাথা সুলতানের দরবারে গিয়াছে। তার পর সে যখন বারাণ্ডায় বসিয়া আহার করিতে আরম্ভ করিবে, তখন তোমরা আমার কাটামুণ্ড বাহির করিবে।'

শশক-মহিষীরা শঙ্কিতভাবে বলিল, "তুমি কি বল্‌ছ? এ কাজ আমরা করিতে পারিব না। মাথা কাটিলে কেহ বাঁচে না কি?"

শশক বলিল, "আরে না না! আমি মরব কেন? আমার বন্ধু কুক্কুটের মাথা কাটিলেও সে যদি না মরিয়া থাকে, তবে আমি মরিব কেন?"

পর দিবস প্রাতে শশক পুনরায় পত্নীদিগকে তাহার আদেশমত কার্য্য করিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিল। অল্পবুদ্ধি পত্নীগণ স্বামীর আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া অবশেষে তাহার আদেশানুযায়ী কাজ করিল। শশকের ছিন্ন মুণ্ড এক স্থলে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার দেহ প্রাঙ্গনে রক্ষা করিল।

কুক্কুট বন্ধুগৃহে সমাগত হইয়া শশকের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

শশক-মহিষীরা বলিল, "আপনার বন্ধু ঐখানে আছেন। তাঁহার ছিন্নমুণ্ড সুলতানের দরবারে গিয়াছে। আপনি বারাণ্ডায় আসুন। কর্ত্তা শীঘ্রই আসিবেন।"

কুক্কুট উঁকি মারিয়া দেখিল, সত্যসত্যই শশকের মুণ্ডহীন দেহ প্রাঙ্গনে পতিত রহিয়াছে। তখন সে শশকপত্নীদিগকে বলিল, "তোমরা ভয়ানক সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, চলিলাম।"

কুক্কুট তার পর অন্যান্য বনচর জীবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "আমি কৌশলে শশককে পরাজিত করিয়াছি। শশক মরিয়াছে। এখনই তাহার গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিবে।"

কপালের দুঃখ।

১

সুখ দুঃখ সবই কপালের। লতাগুলির মত জীবন-বৃক্ষে জ'ড়িয়ে থাকে। বাঁচিবার, মরিবার যেমন সময় অসময় আছে, বোধ হয় সুখ দুঃখেরও তেম্‌নি।

দীনু মুখুয্যে বুড়ো। বুড়ো 'বল্‌লে', সেকালের আশী বছরের বুড়ো মনে হয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঠিক তা নয়। একালে সময়ের গুণে পঞ্চাশ হইতে না হইতেই যে রকম বুড়ো হয়, সেই রকম দীনু মুখুয্যে। বুড়ো হ'লে প্রায়ই পুরাণো চটি জুতোর মত লোকটাকে সকলে ঘরের একপাশে ফেলে রাখে। সেই সময় শরীর হরিতকীর মত শুখাইয়া যায়। কোথায় যাব, কি হবে, ভাবিয়া ভয় হয়। সংসারের মায়ার বন্ধন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে কর, এতদিন এই সংসারটায় গাধার খাটুনি খেটে যদি বেমালুম স'রতে হয়, তবে প্রথম কথা মনে হয়, "আমি ক'রে গেলাম কি?"

এই প্রশ্নটা দীনু মুখুয্যে ও তাঁহার স্ত্রীর ইদানীং প্রায় প্রত্যহই মনে হইত। আবার কখনও কখনও চারিটি ভাত বেশী খেতে পারিলে, সুনিদ্রা বেশী হ'লে, এবং ঘর সংসার সম্বন্ধে ঘোর তর্ক বিতর্ক হ'লে, দু জনেই আগামী অন্ধকারের কথা ভুলে গিয়ে বর্ত্তমানের কোলাহলে মত্ত থাক্‌ত।

এইরূপে দিন যাচ্ছিল, এবং বুড়োর চক্ষুর জ্যোতি কম্‌ছিল।

আপনাদের সকলেরই মনে হ'তে পারে যে, বুড়ো নিঃসন্তান, এবং হয় ত গরীব। কিন্তু ঠিক তা নয়। তেমন হ'লে গল্পটি বলতেম না।

সংসার-ত্যক্ত হ'লেও, যমে টান্‌তে আরম্ভ কর্‌লেও, নানা রকম দুর্ভাবনা জুটলেও, মানুষের একটা ভিতরের অবলম্বন আছে। যাহার কেউ নাই, তাহার সেটা ভিতরেই থেকে যায়। যাহার কেউ আছে, তাহার সেটা খানিকটা বাহিরে থাকে। সেই খানিকটার নাম ভালবাসা।

বুড়োর জীবনের সম্মুখে মস্ত একটা আঁধার থাকলেও, সেই আঁধারের একটি মাণিক ছিল। তার নাম সুষমা। দীনু মুখুয্যের একটি কন্যাসন্তান, এবং—সুষমা সেই।

মেয়ে হ'লেও সুষমাই অবলম্বন। অত্যন্ত আঁধারে, নির্জ্জনে, ভূতুড়ে বাড়ীতে যদি কেউ ভয়ে বিকল হয়, তখন একটা কচি ছেলে কাছে থাক্‌লেও মনটা স্থির হয়। কারণ, যদি কোনও ভূতপ্রেত ঘাড়টা মট্‌কে দেয়, তবে অন্ততঃ খানিক ক্ষণের জন্য এক জন সাক্ষী থাক্‌বে ত? বুড়ো যে জগতে এসে এক জন্‌কেও ভালবাস্‌ত, সুষমাই তাহার সাক্ষী।

জীবনে যখন পাপের প্রবৃত্তি প্রবল হ'ত, বুড়ো সুষমার মুখ দেখলেই তা ভুলে যেত। যখন হিংসা প্রবল হ'ত, তখন ভয় হ'ত, পাছে সুষমার কিছু হয়। সুষমার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন থেকে এবং তার এখনকার তের বৎসর পর্য্যন্ত এই আট বৎসর, দীনু মুখুয্যে কোনও নিন্দার কার্য্য করে নাই! ক্রমে ঈশ্বরে বিশ্বাস হ'য়ে আস্‌ছিল, মরণের দুরন্ত ভয় ক'মে যাচ্ছিল, সন্তানের জীবন ও পিতামাতার জীবন যে একটা জীবনেরই সঞ্চার ও প্রসারণ, এইরূপ বোধ হচ্ছিল।

তাই ক'দিন থেকে দীনু মুখুয্যে ও তাঁর 'পরিবারে'র মধ্যে ঘোর পরামর্শ চল্‌ছিল। সেটা সুষমার বিবাহ সম্বন্ধে।

দীনু মুখুয্যের নগদ টাকা অনেক। কেউ বলে দু লক্ষ, কেউ বলে চার লক্ষ। কিন্তু সেটা কোথায়, কি রকম ভাবে রক্ষিত, তা বড় কেহই জান্‌ত না।

কিন্তু না জান্‌লেও কথাটায় কাহারও সন্দেহ ছিল না, তাই 'অমুক' বাঁড়ুয্যে তাঁর ছেলে বিপিনের সঙ্গে সুষমার বিবাহ দিতে রাজি হলেন। অমুক বাঁড়ুয্যের নাম ক'ত্তে নাই, তাতে হাঁড়ি ফাটে। বিপিন ঠিক সে রকম না হলেও বাপের ব্যাটা, গোঁয়ারগোবিন্দ, পাড়াগেঁয়ে জমীদারের ছেলে।

৩

গ্রামটা বহুকে'লে পুরাণো হ'লেও, ভাদ্র মাসের ভরা নদী, খাল, বিল বাহিয়া যৌবনে তার মধ্যে তখন টলমল্ কচ্ছিল। ঐ দূরে যে দোতালা বাড়ী, সেটা বাঁড়ুয্যেদের। সে বাড়ীতে কত কর্ত্তা, কত গিন্নী মরেছে, তার সংখ্যা নাই। অথচ ভূতের ভয় নাই, মহা কলরবে পরিপূর্ণ। কেউ কা'কে খুন ক'রে ফেল্‌লেও কেউ কাহাকেও জিজ্ঞাসা করে না। হঠাৎ ছাত থেকে ছেলে পুলে প'ড়ে গেলেও, কাহারও একটা আতঙ্ক হয় না। তেম্‌নি হঠাৎ কারও ব্যামো হ'লে ডাক্তার ডাকৃতে ডাকৃতে হয় ত রোগ সেরে যায়, নয় ত রোগী মরে যায়। এ বাড়ী সুষমাদের বাড়ী থেকে চার ক্রোশ দূরে। মধ্যে প্রকাণ্ড জলা। বর্ষার সময় নৌকা নহিলে যাওয়া যায় না। জল কমিলে কাদা খচিয়া যেতে হয়।

সুষমার বিয়ে মহাসমারোহে হয়ে' গেল। দানসামগ্রী যৌতুকাদি প্রায় দশ হাজার টাকা নিয়ে বাঁড়ুয্যে মশায় পুত্রের সহিত বাড়ী ফির্‌লেন। এ টাকা ত কিছুই নয়। আসল নজর মুখুয্যের সঞ্চিত দুই লক্ষ কিংবা চারি লক্ষে। সেটা সুষমারই সন্তানের, কিংবা বিপিনের নির্ঘাত।

সুষমার রূপে বাড়ী ভ'রে গেল। বাগানের ফুলের বাহার মলিন হ'য়ে গেল। গৃহ হইতে গৃহ, একতালা হ'তে দোতালা, নতুন বৌকে ঘোমটা দিয়ে উষার তারার মত, সন্ধ্যার গানের মত, এখানে সেখানে সকলেই দেখ্‌তে পেত। ঘর পরিষ্কার করিতে, রাঁধিতে বাড়িতে, গরু বাছুরের খাবার দিতে, আর কাকেও কষ্ট পেতে হত' না। সকলের মধ্যেই সুষমা।

কিন্তু সুষমার মধ্যে কি হয়েছিল, তা কি কেউ জানে? সুষমা দুটি হাত বাড়িয়ে থাকৃত। সবই শূন্য! সেখানে স্নেহ নাই। সকলেই নির্ম্মম, নিষ্ঠুর। বিপিন চট করিয়া ইতিমধ্যে কল্‌কেতায় টাকা উড়াইতে গেল।

৪

শীত সম্মুখে। তখন হঠাৎ নিদারুণ খবর আসিল। এই ত চারি ক্রোশ পথ, অথচ কেউ আগে বলে নাই। চিঠিপত্র আসিলে বাহিরে থাক্‌ত।

দীনু মুখুয্যে একুশ দিন জ্বরের পর অজ্ঞানাস্থায় মরিয়া গিয়াছেন।

সুষমা বাপের বাড়ী গিয়া দেখিল যে, জগতের স্নেহ আর জগতে নাই। মা ধরাশায়িনী।

অতি কঠিন দুঃখ বুকে বাঁধিয়া সুষমা মাকে শয্যায় তুলিয়া আনিল।

কি বল সন্তানের স্নেহে! কতই শান্তি সন্তানের স্পর্শে!

কিন্তু মুখুয্যে পরিবারের কপালে আরও দুঃখ ছিল। কথাটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পেয়েছিল। সেই যে দু লক্ষ কিংবা চার লক্ষ টাকা, তার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। কেহ বলিল, ব্যাঙ্কে ছিল; কেহ বলিল, মাটীর নীচে পোঁতা আছে। কিছুতেই তাহার কিনারা হইল না।

বিধবার রহিল কেবল গহনা সম্বল। এ দিকে বাঁড়ুয্যে মহাশয় মহা চটিয়া গেলেন।

"কি! দীনু মুখুয্যের আমার সঙ্গে চালাকী? বিপিনের আবার বিয়ে দেব।" বিপিন ভাবিল, মন্দ কি?

বাঁড়ুয্যের স্থির বিশ্বাস, বিধবা গুম ক'রেছে। "আচ্ছা, বেশ; যত দিন না টাকা বেরোয়, ততদিন বৌকে আর ঘরে ঢুকতে দেব না, দেখি কত দূর গড়ায়। ছ' মাসের মধ্যে টাকা না পেলে বিপিন আবার বিয়ে কর্‌বে।"

৫

কপালে দুঃখই এমনি! একটার পর আর একটা আসে, যেমন একটা সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া গেলে অনেক সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচে পড়্‌তে হয়। দুঃখিনী বিধবা! আর, অত বড় ঘরে পড়েও কত দুঃখিনী সুষমা! এদের কত দুঃখ!

আবার এক ক্রোশ দূরে একটা মস্ত দীঘির পাড়ে এমন একটা লোক ছিল, তার কত সুখের কপাল! সে লোকটির নাম সুবল মুখুয্যে। লোকটা মোটা সোটা, বেশ ঘি দুধ খায়, এবং রবিবার ছাড়া অন্য অন্য বারে রুই মাছের মুড়ো খায়। তার মেয়ের নাম খুকী। খুকী বড় আদরের মেয়ে। সে দিন মায়ে ঝিয়ে ব'সে সরস্বতী পূজার দিন খিচুড়ি ও ভাজা ইলিশ খাচ্ছিল।

সুবল মুখুয্যের সঙ্গে কোনও কালে দীনু মুখুয্যের শত্রুতা ছিল। কেন এবং কবে, তাহা কেউ বিশেষ জানে না। তবে সুবল মুখুয্যের মনে যে একটা জাতক্রোধ ছিল, তাহা নিশ্চয়। কারণ, তিনি খুকীর বিয়ের জন্য বাঁড়ুয্যে মশায়ের সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছিলেন।

এখনকার মেয়েরা যেমন সতীনের ভয় করে, তখনকার মেয়েরা তেমন কর্‌ত না। বরং সতীন হবে শুনিয়া খুকী আহ্লাদে আটখানা!

খুকীর দাদা খোকা যদিও সেটা অনুমোদন করে নাই, তথাপি খুকীর মা নিমরাজি।

সুবল মুখুয্যে নিজে ধনী। ইচ্ছে ক'ল্লে খুকীর জন্যে সৎপাত্র পেতেন। কিন্তু মৃত বৈরীর বিধবাকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ও কুলীনে মেয়ে দিয়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য, বিশ হাজার টাকা কড়ার ক'রে খুকীর সঙ্গে বিপিনের বিয়ে গোপনে স্থির করলেন।

তখন রাত্রি নাই, কিন্তু আঁধার। বৃষ্টি পড়ছিল। ব্যাং ডাক্‌ছিল। তুমি হয় ত বিছানায় শুয়ে নভেল পড়্‌তে ভালবাস, কিন্তু খুকী অত পড়িতে জানে না। সে খোকার সঙ্গে পুকুরের পাড়ে কই মাছের সন্ধানে গিয়েছিল।

সেটা তাদের পুকুর নয়। প্রায় আধ ক্রোশ দূরে। সেখান থেকে আধ ক্রোশ সুষমাদের বাড়ী। একটা পুরাণো বাগানের মধ্যে এই পুকুর। এই বাগান নিয়ে কিছু দিন আগে সুবল মুখুয্যে ও দীনু মুখুয্যের মোকদ্দমা বাধে। সুবল মুখুয্যে ডিগ্রী পেয়ে চট্‌ করে দখল করে। তাই শুনে হঠাৎ সুবল মুখুয্যের জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বরেই মৃত্যু।

জলা দিয়ে জল এসে বাগানে ঢুকেছিল, তার সঙ্গে বড় বড় কই মাছ। একটা কই মাছ একটা উঁচু ঢিপির মধ্যে ঢুকে গেল। খোকা বড় চালাক্। তার সন্ধানে ঢিপি ভেঙ্গে ফেল্‌লে।

কি আশ্চর্য্য! ঢিপির মধ্যে লোহার কপাট। শিকল দেওয়া, তালা চাবি বন্ধ!

খোকা বলিল, "টুনি! এটার মধ্যে কই মাছের বাড়ী আছে।"

খুকীর নাম টুনি। তার বুদ্ধি বেশী। সে বলিল, "তবে তালা চাবি দিলে কে?"

দুই জনে তর্ক করিল। খোকা খুকীকে একটা চড় মারিল। খুকী গিয়া বাবাকে বলিয়া দিল।

কথাটা শুনে, সুবল মুখুয্যে, জানি না কেন, বড়ই উতলা হলেন, এবং একখানা দা নিয়ে সেখানে গেলেন। তালা ভাঙ্গিয়া দেখেন, তার মধ্যে আটটা তোড়া। প্রত্যেক তোড়ার মধ্যে এক হাজার করিয়া বাদশাই মোহর!

সুবল মুখুয্যে বুড়ো হ'লেও লাফ দিতে পা'রতেন। তিনি আহ্লাদে একটা লম্ফ দিলেন। তাই দেখে খোকা ও খুকী বড় হাসিল।

সুবল। ওরে! তোরা বুঝতে পাচ্ছিস নে। খোকা বল্‌ ত, প্রত্যেক তোড়ায় যদি হাজার মোহর থাকে, আর প্রত্যেক মোহরের দাম যদি ২৪৲ টাকা হয়, তবে তোড়াটার দাম কত?

খোকা। ২৯০০০৲

সুবল বেশ, তবে আট তোড়ার দাম কত?

খোকা। কাগজ কলম নইলে কস্‌তে পারব না।

সুবল। আচ্ছা, তবে শোন্‌। দুই লক্ষ। দুই লক্ষ। এটা দীনু মুখুয্যের সঞ্চিত টাকা।

কথাটা বলে'ই সুবল মুখুয্যে একটু ভীত হ'লেন। "আমার বোধ হয় তাই—ও তালা, একটা বাদশার আমলের, দীনু মুখুয্যের কোনও সত্ত্ব নাই। তোরা দাঁড়া; আমি বাড়ী গিয়ে নিয়ে যাবার উপায় করি।"

দীনু মুখুয্যে চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে খুকীর মুখ গম্ভীর হ'ল।

খুকী বলিল, "দাদা, বাবার এটা উচিত হ'চ্ছে না। এ সুষমাদের টাকা।"

খোকা। তবে কি কর্‌ব?

খুকী। তুই দাঁড়া, আমি সুষমার মাকে খবর দিয়ে আসি।

খোকা। যদি বাবা বকে?

খুকী। আমি কোথায় গিয়েছি, তা বলিস্‌নে। পরে টের পেলে বক্‌বে না। আরও খুসী হবে। কেন, জানিসনে কি সুষমা বড় দুঃখিনী? আমি সব জানি। আমি যে তার সতীন হ'ব। সতীনের ধন আমার বাবা কেন নেবেন? ছি!

৮

সেই ভাদ্র মাসে বিয়ে হয়েছিল, আর এই মাঘ মাসের শেষ। একে শীত, তাতে ঘোর বৃষ্টি। ছয় মাস প্রায় কেটে গেল। আর দু' দিন গেলে বিপিন আবার বিয়ে করবে। দুই লক্ষ টাকায় ফাঁকি। সোজা কথা!

সুষমা বিছানায় শুয়ে। সুষমার মা আঁচল পেতে মাটীতে। কত দুঃখের কাঙ্গালিনী!

এমন সময় বৃষ্টিতে ভিজে, হাঁফাতে হাঁফাতে খুকী গিয়ে উপস্থিত।

খুকী গিয়ে বিধবাকে প্রণাম করিল।

খুকীর সঙ্গে কার শত্রুতা? কারও নয়। সুষমার মা খুকীকে কোলে করলেন।

"তুই কত বড় হয়েছিস! তোকে যে অনেক দিন দেখিনি; আর তুই যে সুষমার সতীন হবি। মা, তুই কত ভালবাসতিস, একটু দয়া করিস। যেন সুষমাকে মার ধোর না করে।" খুকী সগর্ব্বে বলিল, "কার সাধ্যি সুষমাকে মারে। আর দেখ মাসীমা, তোদের দুঃখু কিসের? তোদের যে টাকা হারিয়েছিল, তা পোঁতা আছে। সেই বাগানটার মধ্যে।"

খুকী সব কথা বুঝাইয়া বলিল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল, আর ব্যাং ডাকছিল। আকাশ আঁধার। আরও বৃষ্টি পড়িবে। আরও ব্যাং ডাকিবে।

"মাসীমা! সুষমা! তোরা কাঁদিস কেন? আকাশে যে তারা নেই, নয় ত আমি দু লক্ষ টাকা গুণে দেখাতেম।"

সে দুরন্ত আঁধারের মধ্যে, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা, পুরাণো স্মৃতি, সুখ, দুঃখ, সব খেলা করছিল। তাকি কেউ দেখতে পায়?

এমন সময় খোকা দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "ওরে! তোরা চল, বাবার পক্ষাঘাত হয়েছে।"

৯

সুবল মুখুয্যে বাড়ীতে পৌঁছিতে পারেন নাই। আহ্লাদে রাস্তার মধ্যেই পক্ষাঘাত হয়ে পড়িয়াছিলেন। খোকার ভয় হওয়াতে বাড়ীর দিকে গিয়া দেখে এই ব্যাপার। তার পর লোক, জন, ডাক্তার, মহাজনতা।

কথাটা শুনে সুষমার ও তার মার বড় দুঃখ হ'ল। তাঁরা খুকীকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে গেলেন।

আবার এ দিকে বাঁড়ুয্যে পাড়ায়ও খবর গিয়েছিল। টাকার খবর এমনি ক'রে দৌড়ায়!

তাই দেখ, একটা কত বড় জনতা! কত কথা! কত কানাঘুসো!

সেখানে একটা কোলাহল হচ্ছিল; তা খুকী আসাতে থেমে গেল। খুকী যেন দেবকন্যা! তাকে নিয়ে যেন একটা মস্ত সংসার! সকলেই তার কথা শুনে কত প্রশংসা কত্তে লাগ্‌ল। আহা! এমন মেয়ে কি আর হয়!

সতীন যদি হয়, তবে যেন এমনিই হয়। যেন গৌরীর সতীন গঙ্গা!

বাঁড়ুয্যে এসে সব শুন্‌লেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে টাকার কিনারা করে গেলেন। তখন সুষমার আদর হ'ল। খুকীরও আদর হ'ল। কিন্তু খুকীর বাঁড়ুয্যে-বাড়ীতে বিয়ে হ'ল না।

না হ'লে কি হয়? গৌরীপুরের রাজার ছেলে সেই গল্প শুনে ব'ল্লে, "আমি টুনিকে বিয়ে করব, আর যে সতীনের কথা তুল্‌বে, তার ঘাড় ভাঙ্গিব।" তাই টুনি রাজরাণী হয়েছিল।

কিছু দিন পরে মুখুয্যের পক্ষাঘাত অনেকটা সেরে গেল। আহ্লাদের পক্ষাঘাত প্রায় সারিয়া থাকে। ওটা কপালের দুঃখ!

মান্দ্রাজের সন্ধি।

শক্তের ভক্ত।

We were alarmed as if his (Hyders) horse had wings to fly over our walls.

—History of Hindustan—Dow.

ইংরাজ সৈন্য বাঙ্গালোর অধিকার করিবার নিমিত্ত যত দিন নানাবিধ নিষ্ফল আয়োজন ও ব্যর্থ চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল, হায়দারের সেনাপতি ফজল উল্লা খাঁ ততদিন শ্রীরঙ্গপত্তনে নূতন সেনা-সংগ্রহে যত্নবান ছিলেন। সমুদায় আয়োজন শেষ করিয়া সেনাপতি গজলহাটি গিরিসঙ্কটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ সৈন্য তাঁহার নিকট বার বার পরাজিত হইতে লাগিল।

হায়দার স্বয়ং কারুর পরাজয় করিয়া ইংরাজ সৈন্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ নিক্সনের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিল। রণোন্মত্ত সাহসী সুচতুর হায়দরের দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী যখন স্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ ইংরাজ কাপ্তেনের চতুর্দ্দিকে নরপ্রাকার গঠিত করিল, তখন তিনি বুঝিলেন যে, সে প্রকার দুর্ভেদ্য, অজেয়, দুরতিক্রম। নিক্সন নিমেষে সসৈন্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেন।

বিজয়ী হায়দর বিজয়োন্মত্ত সেনা-প্রবাহ লইয়া ইরোদে উপস্থিত হইলেন; ইরোদ ইঙ্গিতমাত্রেই অধিকৃত হইয়া গেল। হায়দরের রণোন্মত্ত সৈন্যগণ গ্রামের পর গ্রাম, জনপদের পর জনপদ অধিকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। যে সকল স্থান হায়দরের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, ছয় সপ্তাহের মধ্যেই সে সমুদয় তাঁহার পুনরধিকৃত হইল। মান্দ্রাজ-সভার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন, হায়দরের আক্রমণ হইতে ইংরাজের রাজ্য-রক্ষাই তখন অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিল! *

হায়দর যখন ইতিপূর্ব্বে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন মান্দ্রাজ সভা বিজয়ের সুখস্বপ্নসন্দর্শনে পুলকিত হইয়া সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা হায়দরকে বজ্রবৎ কঠিন দেখিয়া তাঁহার সহিত মৈত্রী করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন! কাপ্তেন ক্রুক সন্ধির প্রস্তাব লইয়া হায়দরের শিবিরে উপস্থিত হইলে, হায়দর দূতের যথাযোগ্য সম্মান করিয়া কহিলেন,—'আমার সন্ধির প্রস্তাব ইংরাজ কতবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ইংরাজের সহিত মৈত্রী চিরদিন আমার অভিপ্রেত;—কিন্তু ইংরাজ সরকার স্বয়ং ও তাঁহাদের অপদার্থ বন্ধু মহম্মদ আলি সে সন্ধির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছেন। আমি জানি যে, ইংরাজ ও মারাঠা, এই উভয় শক্তির মধ্যে আমিই একমাত্র বিশাল বাধা-স্বরূপ বর্ত্তমান। ইংরাজ বা মারাঠা ইঁহাদের কাহারও সহিত বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া বা না হওয়া আমার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে। তবে দুই শত্রুর সহিত একাকী যুদ্ধ করাও আমার পক্ষে কঠিন। আমি তাই ইংরাজের সহিত মৈত্রী-স্থাপনই শ্রেয়ঃ মনে করি।' † হায়দর ভুল বুঝিয়াছিলেন। যে ভ্রমে

---

* History of India—*Tailor p* 473

† I bid

চিরদিন ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়া আসিতেছে, হায়দরও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন।

মান্দ্রাজ সভা সন্ধিসংস্থাপনের সর্ত্তস্বরূপ যে সকল প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হায়দর তাহা গ্রহণ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু কোনও প্রকার ঔদ্ধত্য বা অভদ্র আচরণ না করিয়া ইংরাজ-দূতের সকল কথা শুনিয়াছিলেন। এইখানেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার পার্থক্য প্রকাশিত হয়। ইংরেজ সরকার যে ভাবে হায়দরের দূতের প্রস্তাব শুনিয়াছিলেন, ইংরাজ ঐতিহাসিকই তাহাকে উদ্ধত বিশেষণে অভিহিত আখ্যাত করিয়াছিলেন, এবং হায়দরের ব্যবহারকে 'বীরোচিত দৃঢ়তা' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন! * হায়দর আলি ইংরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না বটে, কিন্তু তখনও তিনি ইংরাজ কাপ্তেনের নিকট যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, সে সমুদায় এক জন সুদক্ষ সেনাপতির ও বহুমানাস্পদ রাজনীতিবিশারদেরই উপযুক্ত বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। † অথচ ইংরাজ ঐতিহাসিক হায়দরের জীবন চরিত-রচনায় অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে পরস্বাপহারক 'দস্যু' প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত করিতে কুণ্ঠ বোধ করেন নাই! আমাদের বালকগণ বিদ্যা-মন্দিরে সেই মিথ্যা ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে; আমাদের ধনাঢ্যগণের পুস্তকালয় সেই সকল অসংযত ও অসত্য ইতিহাসে পূর্ণ থাকে, এবং দেশে বিদ্যানুরাগ ও স্বদেশপ্রেমের নিদর্শনরূপে পরিচিত হয়!

ইংরাজ চিরদিনই কৌশলী। তাঁহারা মান্দ্রাজ সভার সদস্য আন্‌ড্রুজকে সংশোধিত প্রস্তাব লইয়া হায়দরের নিকট যাইবার আদেশ দিলেন, এবং সেই সঙ্গে সেনাপতি স্মিথকেও সৈন্য সামন্ত দিয়া চিতাপেতে প্রেরণ করিলেন! আন্‌ড্রুজের প্রস্তাবও হায়দরের অপ্রীতিকর হইল। তিনি নবাব মহম্মদ আলির প্রতি কোনও অনুগ্রহরূপপ্রদর্শনে সম্মত হইলেন না। কারণ, মহম্মদ আলিই হায়দরের প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগের ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন, এবং ত্রিচিনপল্লী মহীশূর দরবারে অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নাই। এ দিকে ইংরাজ দরবারে মহম্মদ আলির এতই প্রতিপত্তি ছিল যে, সরকার বাহাদুর

* British Empire in India—R. G. Gleig vol ii, *p* 228

নবাবকে ছাড়িতে পারিলেন না। সুতরাং সন্ধি হইল না। হায়দার তখন ইংরাজ দূতকে বলিয়াছিলেন,—'আমি নিজেই মান্দ্রাজের সিংহদ্বারে যাইতেছি। গবর্ণর ও সভার সদস্যদিগের যাহা বলিবার থাকে, আমি সেই-খানেই তাহা শুনিব।'

সন্ধি হইল না দেখিয়া মান্দ্রাজ সভা ত্রিশ দিনের বিশ্রাম প্রার্থনা করিলেন।—হায়দর দ্বাদশ দিবসের জন্য যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে সম্মত হইলেন। দ্বাদশ দিন অতিবাহিত হইবামাত্র হায়দরের বাহিনী মহোল্লাসে মান্দ্রাজের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল—কর্ণেল স্মিথ উপায়ান্তর না দেখিয়া হায়দরের পশ্চদ্ধাবন করিলেন; কিন্তু তাঁহার ছায়াও স্পর্শ করিতে পারিলেন না।

হায়দর তখন দক্ষিণ কর্ণাটিকের চতুর্দ্দিক ধ্বংস করিতে লাগিলেন; লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যসম্ভারে তাঁহার সৈন্যগণ বেশ পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এ দিকে ইংরাজ সৈন্য খাদ্যাদির অভাবে বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়িল। সেনাপতি স্মিথ অনেক আয়াস স্বীকার করিয়াও হায়দরকে সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত করিতে পারিলেন না। এইরূপে তিন মাস কাটিয়া গেল।

মান্দ্রাজ সভা এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, শুধু স্মিথের উপর নির্ভর না করিয়া মান্দ্রাজ-রক্ষার্থ কর্ণেল ল্যাংএর অধীনে আর এক দল সৈন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। সুচতুর হায়দর কঞ্জেভরম্ আক্রমণ করিবার ভাণ করিয়া এক দিন অকস্মাৎ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কর্ণেল স্মিথ তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বাধ্য হইয়া মান্দ্রাজ সভার রিজার্ভ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্ণেল ল্যাংও হায়দারকে ধৃত করিবার জন্য মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলেন। হায়দরের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। তিনি উভয় সেনাপতিকেই এইরূপে মান্দ্রাজ হইতে সত্তর ক্রোশ দূরে টানিয়া লইয়া গেলেন!

সমরকুশল হায়দর আলি দেখিলেন, আর সময় নষ্ট করা উচিত নহে। তিনি অমনই স্বীয় সেনাদল পরিত্যাগ করিলেন। মনোমত ৬০০০ সহস্র অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে হায়দার আলি বিদ্যুদ্বেগে মান্দ্রাজের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য অন্যান্য জিনিসপত্র লইয়া ঘাটপ্রদেশের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল।

হায়দর আলি সার্দ্ধ তিন দিবসে পঁয়ষট্টি ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া

২৯শে মার্চ্চ অকস্মাৎ মান্দ্রাজের নিকটে আসিয়া উপনীত হইলেন! মান্দ্রাজ সভার শিরে বজ্রপাত হইল! তাঁহারা এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, ভাবিলেন, বুঝি বা হায়দরের অশ্বগণ পক্ষলাভ করিয়া নিশাযোগে দুর্গাভ্যন্তরে আরোহী সহ উড়িয়া আসিবে! হায়দর যখন মান্দ্রাজের দ্বারদেশে আসিয়া থানা দিলেন, তখন কর্ণেল স্মিথ ও ল্যাং যে কোথায় ও কত দূরে ছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মান্দ্রাজ সভার সেই অসহায় অবস্থায় হায়দর ইচ্ছা করিলে সমস্তই লুণ্ঠন করিতে পারিতেন। এ কথা ইংরাজ ঐতিহাসিকই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু স্বজাতির গৌরবরক্ষার্থ সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন,—হায়দর মান্দ্রাজের দুর্গ ভিন্ন আর সমস্তই লইতে পারিতেন! * পাঠক এই সমস্যার মীমাংসা করিবেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।

মাসিক-সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—আশ্বিন। এবারকার প্রবাসীর প্রথমেই নব্য বঙ্গের আদিপুরুষ স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায়ের একখানি সুরঞ্জিত চিত্র আছে। এই ছবিখানি 'তাঁহার ব্রিষ্টল নগরের মিউজিয়মে রক্ষিত তৈলচিত্রের অনুলিপি। ইহাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবি বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।' ছবিখানি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' শারদীয় 'প্রবাসী'র প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব' প্রবন্ধে বহু অবান্তর ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন; রচনাটিকে পাঁচ ফুলের সাজি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ, মূল প্রতিপাদ্য যথোচিত সুবিচারে বঞ্চিত হইয়াছে। লেখক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে এত গবেষণার সমাবেশ করিয়াছেন যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তাহা একটু ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে। লেখকের সিদ্ধান্ত এই যে, (১) 'যে নূতনত্ব এবং নিরঙ্কুশতা কবিতার জীবন, একালের নব গৌড়ী প্রথায় তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল।' (২) 'বাঙ্গালা

---

* At length to the dismay of the Presidency army, Hyder dashed on by marches of *Forty miles a day*, and showed himself with a large army of horse (about 5000) so close to Madras that he could have pillaged all *without the fort* before the English army could have come up.

—The Presidential Armies, p. 300.

ভিন্ন অন্ত কোনও দেশের প্রাকৃত সাহিত্যে (হয় ত দেশনিষ্ঠ গাম্ভীর্য্যের ফলে) হাস্যরসের মাধুর্য্য দেখিতে পাই না। * * * বাঙ্গালার হাসি-বৈচিত্র্য বঙ্গের নিজস্ব।' (৩) 'বঙ্গ সাহিত্যের সে কাল ও এ কালের সন্ধিস্থলে, দাশরথি রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, যাহা অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যের বিষয় নহে বলিয়া উক্ত আছে, তাহা লইয়াও কবিতা লিখিয়াছিলেন।' (৪) 'এ কালের বঙ্গ সাহিত্যের চালক ইংরেজী-শিক্ষিতেরা।' (৫) ইংরেজী-শিক্ষিতের নায়কতায় সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে। (৬) এখন ইংরেজী-শিক্ষিতেরাও 'প্রাচীনতার মধ্যে যাহা সুন্দর এবং জীবনপ্রদ ছিল, তাহার প্রতি কতকটা অনুরাগী হইয়াছেন।' লেখক কেবল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রমাণপ্রয়োগে কোনও সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। এত সংক্ষেপে এত গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা বোধ করি সম্ভব নহে। বিশাল ভারতের বহু ভাষার বিপুল সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করিতে হইলে, ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের আলোচনা করিতে হয়। অনুমানখণ্ডের সাহায্যে 'পরের মুখে ঝাল খাইলে' তাহা কখনও সুসম্পন্ন হইতে পারে না। উপসংহারে লেখক টোলের পণ্ডিতমহাশয়দিগের শ্রাদ্ধ করিয়াছেন! তিনি বলেন,—'টোলের পণ্ডিতের সমালোচনায় যে তীক্ষ্ণতা, গভীরতা, বা সর্ব্বদর্শিতা নাই, তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না।' আশ্চর্য্য এই যে, বিজয় বাবু অকুণ্ঠিতচিত্তে এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন! আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সৃষ্টির আদিকাল হইতে টোল পর্য্যন্ত বহু প্রসঙ্গ উপস্থিত করিয়া যেরূপ 'সর্ব্বদর্শিতা'র পরিচয় দিয়াছেন, টোলের পণ্ডিতগণ এখনও সেরূপ সমদর্শিতায় বঞ্চিত, ইহা আমরাও অস্বীকার করিব না। টোলে পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠা নাই; এখনও তাহা সংস্কৃত-পরিষদে বদ্ধমূল হয় নাই, ইহা আমরা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি। বারাণসীর বাপুদেব শাস্ত্রী, উৎকলের চন্দ্রশেখর, বাঙ্গালার স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজ, শ্রীযুত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রভৃতি 'সর্ব্বদর্শিতা' নামক 'ঘোড়ার ডিমে'র অধিকারী নহেন, তাহা সত্য; কিন্তু 'ইহাঁদের সমালোচনায় তীক্ষ্ণতা বা গভীরতা নাই',—বিজয় বাবুর এই সিদ্ধান্ত শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। ইঁহারা 'কাব্যে বঙ্গদেশের বিশেষত্ব' প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের সমালোচনা করিতে পারেন নাই সত্য,—কিন্তু বাপুদেব ও চন্দ্রশেখর উচ্চ গণিতবিজ্ঞানের সমালোচনায় যে 'তীক্ষ্ণতা' ও 'গভীরতা'র পরিচয় দিয়াছেন, চন্দ্র সূর্য্য তাহার সাক্ষী;— বিশেষজ্ঞগণও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। ন্যায়রত্ন ও তর্কালঙ্কার প্রভৃতি যে দার্শনিক-প্রতিভা ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও 'আয় লো আলি! কুসুম তুলি'র তুলনায় নিতান্ত হেয় নহে! যে সমালোচনায় বঙ্গের গৌরব নব্য ন্যায় গঠিত হইয়াছে, বিজয় বাবুর মতে তাহাতে 'তীক্ষ্ণতা' বা 'গভীরতা' না থাকিতে পারে, কিন্তু অনেকের মতে, তাহা নিতান্ত 'ভোঁতা' বা ডোবার মত অগভীর নহে! আশ্চর্য্য এই যে, বিজয় বাবুর মত প্রবীণ লেখকও এইরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া, এইরূপ অদ্ভুত সঙ্কীর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, সম্প্রদায়বিশেষের প্রতি অবিচার করিয়াছেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জি-দে জাঁকোর ফরাসী নিবন্ধ হইতে 'বৈদিক-ধর্ম্ম' নামক প্রবন্ধের সঙ্কলন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন। জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর সাহিত্যসাধনা

বাঙ্গালীর আদর্শ হউক। সাহিত্যে এমন অনুরাগ এ দেশে অত্যন্ত বিরল। সাহিত্য-সেবাই তাঁহার জীবনের ব্রত, জীবনের সুখ। অজ্ঞ বাঙ্গালী তাঁহার মর্য্যাদা না বুঝুক, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার নিঃস্বার্থ সেবার কাহিনী সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যালের 'জাপানী নারীসমাজ' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যদুনাথ সরকার 'খুদাবক্স খাঁ বাহাদুর' প্রবন্ধে খুদাবক্সের কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'জীবনী' না লিখিয়া 'জীবনচরিত বা 'জীবনবৃত্ত' লিখিলে ক্ষতি কি? 'জীবনী' জীবনচরিত নহে। চিত্রে দুই ব্যক্তির ছবি আছে;—কে খুদাবক্স? 'মা' নামক ক্ষুদ্র গল্পটি চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা। চারু বাবু 'শ্রী' ও 'চন্দ্র' ত্যাগ করিয়া আদ্যোপান্তবর্জ্জিত 'চারু' হইয়াছেন। মৌলিকতা বটে। কটক-প্রবাসী শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র 'কটকী' হইয়াছেন। তাহাও সম্পূর্ণ অভিনব,—কিন্তু একটু কট্‌কটে! সে যাহা হউক, শ্রী-হীন চারুবাবুর চলনসই গল্পটিতে শ্রী আছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না। শ্রীযুত জগদানন্দ রায় 'আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের গবেষণা' প্রবন্ধে সাধারণ পাঠকের নিকট অধ্যাপক রায়ের রাসায়নিক গবেষণার যথাসম্ভব পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'হুকার জন্ম' নামক কৌতুক-রচনাটি পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। মণি বাবুর মুন্সিয়ানা প্রশংসনীয়। মণি বাবু ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—'হুকার সৃষ্টি হওয়ায় ধূম্রলোকে ধূমপান অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তামাক সাজিবার নিমিত্ত এক দল ভৃত্যের প্রয়োজন হওয়ায় ধূম্রলোক-বাসীরা মর্ত্তলোকে সিগারেট ও বিড়ি পাঠাইয়াছেন;—বালকেরা সিগারেট ও বিড়ি খাইয়া অকালে মর্ত্তদেহ ত্যাগ করিয়া ধূম্রলোকে গিয়া তামাক সাজিবে, এই উদ্দেশ্য।' এই চমৎকার ফুটনোটটির মূল্য লাখ টাকার কম নহে। 'শিল্প সমিতির প্রবন্ধাবলী—তুলা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'নির্ব্বাণ' নামক কবিতাটি উপভোগ্য।

ভারতী।—আশ্বিন। শ্রীমতী সুশীলাবালা দেবী 'পৌরাণিক ব্রতকথা'য় 'রাখ্ দুর্গা' ব্রতের 'কথা' চলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাহিত্যে এরূপ সংগ্রহের যথেষ্ট উপ-যোগিতা আছে। চলিত ভাষায় রচনা পাকা হাতেই ফুটিয়া থাকে। লেখিকার রচনায় পাকা হাতের ওস্তাদী না থাকুক, তাহা আশাপ্রদ বলিয়া মনে করি। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখো-পাধ্যায় 'নির্ব্বন্ধ' নামক অত্যন্ত ক্ষুদ্র 'লিলিপুটিয়ান' বা বালখিল্য গল্পটিতে পাঠককে অত্যন্ত ফাঁকি দিয়াছেন। শ্রীযুত দেবকুমার রায়চৌধুরী 'মিলনে বিরহ' নামক একটি সুদীর্ঘ কবিতায় নানা ছাঁদে নানা বিলাপ করিয়া অবশেষে উপসংহারে লিখিয়াছেন,—

'—কিন্তু তবু, হায়—
বড় ব্যথা, এ বেদনা বলা নাহি যায়।"

কবি যখন স্বয়ং ঘাট মানিয়াছেন, তখন আমরা নাচার। 'মিলনে বিরহ' অতৃপ্তির গান, না আধুনিক আধ্যাত্মিক টপ্পার ব্রহ্ম-বিরহ, তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক-সমালোচক শ্রীযুত অমৃতলাল গুপ্তই তাহা বলিতে পারেন। দেবকুমারের কবিতায় সেই মামুলী রবিচ্ছায়ার রহস্য-কুহেলিকা দেখিয়া একটু শঙ্কিত হইয়াছি। তাঁহার স্বচ্ছ কবিতায় সে আবিলতা ছিল না। 'বুকে' ও 'নিস্পৃহ নামক দুইটি কবিতা কাহার রচিত, বলিতে পারি না। 'বুকে' কবির বুকেই রহিল না কেন? অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের শ্যামার মত কবির বুকে তালে তালে নাচিল না কেন? 'নিস্পৃহ' কবিতাটি 'লালসা' ও মদের গান। বিসর্গটি তাই হারাইয়া গিয়াছে। এই শ্রেণীর কবিত্ব কবে বাঙ্গলা হইতে লুপ্ত হইবে?—পাঠকের হাড় জুড়াইবে? শ্রীযুত যামিনীকান্ত সেনের 'কাব্যে বর্ষাচিত্রে' নূতনত্ব নাই। ফরাসী হইতে সঙ্কলিত 'আধুনিক জাপান' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হাম্বীর' নামক ক্ষুদ্র ঐতিহাসিক গল্পটি চলনসই। 'চয়ন' সহযোগী সাহিত্যের মত। 'চয়নে'র ভারত-প্রসঙ্গগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃতি।

——:o:——

প্রকৃতি—জননী জননী !
করিয়া তোমার স্তনসুধাপান
পরাণে জাগিছে নূতন পরাণ ;
নূতন শোণিত, নূতন নয়ান,
নূতন মধুর ধরণী !

কি গভীর সুখ তোমাতে !
উদার পরাণ, নাহি পর কেহ,
উথলি' উছলি' বহিছে কি স্নেহ !
বিলায়ে ছড়ায়ে আপনারে দেহ,
কত কুড়াইব দু' হাতে !

কি মধুর গন্ধ বাতাসে !
নিশা সর-সর, বন মর-মর,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া বহিছে নির্ঝর ;
গ্রামে গ্রামে গ্রামে ওঠে কুহুস্বর,
স্বপনের স্তর আকাশে !

দেহ মন প্রাণ শিহরে !
তরল আঁধার চিরি চিরি চিরি,
উষার আলোক কাঁপে ধীরি ধীরি ;
স্থির মেঘচ্ছবি—হিমালয় গিরি,
রজতের রেখা শিখরে !

নয়ন আর যে ফিরে না !
ভুলে গেছে মন—আপনার কথা,
আপনার দুখ, আপনার ব্যথা ;

প্রাণ পায় যেন প্রাণের বারতা,
বুকে যে স্বপন ধরে না।

জলে ওঠে আঁখি ভরিয়া।
দেহে মিলে দেহ—পড়ে না নিশ্বাস,
প্রাণে মিলে প্রাণ—মিটে না পিয়াস,
প্রেমে মিলে প্রেম, সুখে দুখ-ত্রাস,
সে কি এল পুন ফিরিয়া!

মিটে না মিটে না পিয়াসা!
ম্লান শশিকলা শ্বেত মেঘে পড়ি',
তরুণ অরুণে কি রাঙ্গিমা মরি!
গিরি-শির হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
তরল অলস কুয়াসা।

দুলিছে দ্যুলোক আলোকে!
জ্বল-জ্বল জ্বলে ধবল শিখরী,
কত না স্বরগ লুকান ভিতরি!
কত না অমর—কত না অমরী
ধরা পানে চায় পুলকে।

কি মধুর ধরা, আ-মরি!
দূরে দূরে গৃহ, চিত্রে যেন লিখা,
চূড়ায় চূড়ায় উঠে ধূম-শিখা;
ফুল-ভূমে নাচে বালক বালিকা,
তৃণ-ভূমে চরে চমরী।

গগনে কি মেঘ-কাহিনী!
বনছায়-ছায় উছলায় ঝরা;
তরুলতা গুল্ম ফলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণ-শীর্ষ ক্ষেত্র।—দেছ যবে ধরা,
আর ছাড়িব না, জননী!

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

—:০:—

৩

পরীক্ষার কয় দিন কি কষ্টে কত ভয়ে গেল, বলা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা যে দিন শেষ হইল, এবং বুঝা গেল, পরীক্ষা দেওয়া হইয়াছে মন্দ নয়, ফেল হইব না, পাস হইব—সে দিনের সেই আনন্দ কত গাঢ়, কত গভীর, কত নির্ম্মল, কত ব্যাপক—তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী কেমন বন্ধনমুক্ত, আহার নিদ্রা কত নূতন জিনিস, কতই স্বেচ্ছাধীন, যে তাহা আনন্দ অনুভব করিয়াছে, কেবল সেই তাহার ধ্যান ধারণা করিতে পারে; এবং বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে, যৌবনে হউক, বৃদ্ধ বয়সে হউক, যখনই ইচ্ছা, চক্ষু বুজিয়া ঠিক সেই আনন্দ পূর্ণমাত্রায় আবার উপভোগ করিতে পারে। পৃথিবীতে আনন্দের অভাব নাই, সুখেরও সীমা নাই;—পৃথিবী আনন্দময়ী, পৃথিবী সুখদায়িনী; পৃথিবীতে সুখ নাই বলিলে ভগবানের কুৎসা করা হয়।

চক্ষু বুজিয়া ইহার অপেক্ষা উচ্চতর গাঢ়তর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি। উহা মানুষের পরার্থপরতা, পরোপকারপ্রিয়তা এবং মহত্ত্ব দেখিবার আনন্দ। যাঁহারা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য, এবং যাঁহাদের প্রাণ লইয়া আমার প্রাণ, তাঁহাদের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য আপন আপন স্বার্থ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান, এ জন্মে তাঁহাদিগকে ভুলিতে ত পারিবই না, অধিকন্তু তাঁহাদের মহত্ত্ব ভাবিয়া অতুলনীয় আনন্দ উপভোগ করিব, এবং কেমন করিয়া মনুষ্যমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়, তাহাও শিখিব। তাঁহাদের কয়েক জনের নাম না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না:—

(১) স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

(২) স্বর্গীয় ডাক্তার অমূল্যচরণ বসু।

(৩) ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

(৪) পূজ্যপাদ ডাক্তার প্রাণধন বসু।

(৫) আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত কবিরাজ অন্নদাপ্রসাদ সেন।

(৬) আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় অসাধারণ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন।

(৭) কবিরাজ ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

(৮) কবিরাজ গোপালচন্দ্র রায়।

(৯) কবিরাজ কৃতিপ্রসন্ন সেন।

(১০) ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন।

(১১) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্ত।

আর যাঁহারা আমার ভাবনায় ভাবিত, আমার কঠিন পীড়া হইলে আকুল হইয়া পড়েন, তাঁহাদের সংখ্যা করিতে পারি না, সুতরাং তাঁহাদের নাম বলিতেও পারি না। বলিতে গেলে পাঠকের বিরক্তির উদ্রেক হইতে পারে। তাঁহারা আমার আত্মীয় নহেন, কিন্তু আত্মীয় অপেক্ষাও আত্মীয়; আমি তাঁহাদের কাহারও কোনও উপকার করি নাই, তথাপি আমার প্রতি তাঁহাদের অসীম স্নেহ। তাঁহাদের ব্যবহারাদি দেখিয়া বুঝিয়াছি যে, মানব-প্রকৃতিতে এখনও মহত্ত্ব, নিঃস্বার্থতা, পরার্থপরতা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গুণ সকল আছে; মানুষ এখনও নীচ হয় নাই; মনুষ্যকুলে এখনও বহু ব্রাহ্মণ জন্মিতেছেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বড় আনন্দিত, বড় উৎসাহিত হইতে হয়। বিধাতার সৃষ্টিকৌশল এতই সুন্দর যে, উচ্চ নীচ মধ্যবিত্ত সকলেরই ভাগ্যে শ্রেষ্ঠপ্রকৃতির মানবের সংসর্গ ঘটিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ সুখ ও আনন্দ কাহারো দুষ্প্রাপ্য নয়। শুনিয়াছি, বিদ্যাসাগর মহাশয় শেষ দশায় মানুষের স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে Misanthropic হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেন হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনচরিতে লেখে না। তাঁহার একখানা জীবনচরিত আগাগোড়া পড়িয়াছি। তাহাতে ও কথা দেখি নাই। উহা চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবন চরিত। জীবনচরিতে ঐরূপ কথাই থাকা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের দুরদৃষ্টক্রমে উহা প্রায়ই বাজে কথায় পরিপূর্ণ থাকে। আমি যাঁহাদের কাছে চির-ঋণী, তাঁহাদের ২।৪ জনের কথা আমাকে বলিতেই হইবে। যাঁহাদের কথা বলিলাম না, তাঁহারা সকলেই কিন্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আমাকে জগতের আনন্দময় কোষে রাখিয়া দিবেন।

আমার আর্থিক অবস্থা যখন বড়ই শোচনীয়, এবং আমার ঋণের পরিমাণ চারি পাঁচ হাজার টাকা, তখন আমি হাইকোর্টে যাই। কিন্তু হাইকোর্ট আমার ভাল লাগিল না। সেখানকার হাওয়া প্রীতিকর নয়।

উকীলেরা সুশিক্ষিত, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব অপেক্ষা অসদ্ভাবই বেশী। তাঁহারা পরস্পরের কুৎসা করেন, এবং অনিষ্টের চেষ্টা করেন। বড় ঈর্ষ্যাপরায়ণ। সেখানে যত টাকা আপীল করিবার পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, মোক্তার মহাশয়কে তাহার অনেক অধিক টাকার রসীদ লিখিয়া দিতে হয়। এক দিন আমার কাছে আমার মুহুরী একটা খাস আপীলের কাগজপত্র আনিয়াছিল। কিরূপ অপদার্থ অজুহাতে খাস আপীল দাখিল করা হয়, আমি জানিতাম। আমার টাকার বড় দরকার। সুতরাং কাগজপত্র দেখিয়া আমি বলিলাম, আপীল দাখিল করিব, কিন্তু ২৫৲ টাকা পারিশ্রমিক লইব। মওয়াক্কেল সম্মত হইয়া ষ্ট্যাম্প কিনিতে গেল; কিন্তু আজও গেল, কালও গেল। আমার মুহুরীকে অনুসন্ধান করিতে বলিলাম। মুহুরী আসিয়া বলিল, অমুক উকীল ২০৲ টাকায় করিয়া দিব বলিয়া তাহাকে ভাঙ্গাইয়া লইয়াছে। শুনিয়া ঘৃণা হইল। এক ব্যক্তি নিজের মোকদ্দমা নিজে আমার কাছে আনিয়াছিল অর্থাৎ তাহার সঙ্গে মোক্তার ছিল না। মোক্তার থাকিলে আমি ২০৲ কি ২৫৲ টাকার বেশী পাইতাম না। কিন্তু মোক্তার নাই দেখিয়া সুবিধা বুঝিয়া কোপ করিয়াছিলাম, অর্থাৎ ২৫৲ টাকার স্থলে ১২৫৲ টাকা লইয়াছিলাম। বুঝিলাম, এ ব্যবসায়ের প্রলোভন বড়। এ ব্যবসায় দরিদ্রের পক্ষে মারাত্মক। আমি দরিদ্র। এ ব্যবসায় ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলাম। এ সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পালের কথা মনে হইল। তাঁহার একখানি চিঠির জোরে আমি ডিপুটী মেজেষ্টরী পাইলাম। পাইয়া ঢাকায় গেলাম। যখন যাই, বঙ্কিম দাদা আমাকে বলিলেন,—যাইতেছ যাও, কিন্তু টিকিতে পারিবে না। টিকিতে পারিও নাই। দেখিয়াছিলাম, হাকিম পুলিসের আজ্ঞাবহ ভৃত্য স্বরূপ। পুলিসের মনোমত জেল জরিমানা না করিলে, কর্ত্তৃপক্ষের অসন্তোষভাজন হইবার সম্ভাবনা। একটা মোকদ্দমায় পুলিস আমাকে শাসাইয়া এক ব্যক্তিকে দণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টা অন্যায় না হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু পুলিসের আচরণ যে নিতান্ত অসভ্য, অসম্মানজনক ও উদ্ধত হইয়াছিল, তাহাতে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি মেজেষ্টর সাহেবের কাছে পত্র লিখিয়া নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিলেন,—I see no reason to interfere। আমি বুঝিলাম,—পুলিসের মন যোগাইয়া চলিতে না পারিলে ডিপুটীগিরি করিতে পারা কঠিন।

ডিপুটীগিরি ছাড়িয়া দিলাম। এইবারে স্বর্গীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের কথা আমার মনে উঠিল। ঢাকা হইতে কলিকাতায় আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আমাকে জয়পুর কালেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া জয়পুরে গেলাম। পথখরচের জন্য জয়পুর হইতে এক শত টাকা আসিল। কিন্তু তাহাতে সপরিবারে অত দূর যাওয়া হয় না। পত্নীকে কলিকাতায় রাখিয়া যাইতেও পারিব না। আবার দেনা করিয়া সপরিবারে জয়পুরে গেলাম। সেখানে কান্তি বাবু আমার বড়ই আদর যত্ন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, আমাকে খুব বড় করিবেন। তা তিনি করিতে পারিতেন। তিনি তখন জয়পুরের রাজা বলিলেই হয়। ৫।৭ বৎসর থাকিলে আমি মস্ত ধনী হইয়া যাইতাম। কিন্তু জয়পুরের তাত আমার সহ্য হইল না, এবং রাজসভার হাওয়াও ভাল লাগিল না। সেখানে সাহেব ও বারবিলাসিনীদের, যাহাদিগকে সেখানে ভক্তিন বলে, তাহাদের প্রতিপত্তি কিছু বেশী। একটী ঘটনায় ইহাও বুঝিলাম যে, স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া আমার জয়পুরে থাকা সম্ভব হইবে না। আমি দু' মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখানকার মহারাজ রাম সিংহকে বড় বিনয়ী ও অমায়িক দেখিয়াছিলাম, এবং উৎকোচাদি লয়েন না বলিয়া অনেকের মুখে কান্তি বাবুর সুখ্যাতি শুনিয়া আসিয়াছিলাম। জয়পুরে কেবল পাহাড় ও বালি—আমি ভারতের উদ্যানসদৃশ বঙ্গের মানুষ, সে কঠোর দৃশ্য আমার ভাল লাগিল না। সহর দেখিতে বড় সুন্দর, কিন্তু তাহাতে একটি তৃণ বা এক কাঠা জলকর দেখিতে পাইবার যো নাই। আমি দু' মাসের ছুটী লইয়া কলিকাতায় আসিলাম। মনে মনে সঙ্কল্প, জয়পুরে আর যাইব না। না খাইয়া মরি, সেও ভাল। বিধাতার কৃপায় না খাইয়া মরিতে হইল না। সেই সময়ে বঙ্গীয় গবর্মেণ্টের লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ Lawber সাহেবের মৃত্যু ঘটিল। আমি তাহা জানিতে পারি নাই। আমার পরম হিতৈষী—কৃষ্ণদাস পাল আমাকে সে কথা জানাইলেন। আমি সেই কর্ম্মের জন্য শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ Croft সাহেবের কাছে দরখাস্ত করিলাম। দরখাস্ত লিখিয়া নিজেই লইয়া গেলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন,—Shall I guess why you have come? আমি বলিলাম,—আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। বুঝিলাম,—কর্ম্মটি তিনি আমাকে দিবেন। আমি বলিতে বলি নাই, তথাপি স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস ঐ কর্ম্মটি আমাকে দিবার জন্য অনুরোধ-করণার্থ Croft সাহেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

Croft সাহেব জানিতেন, আমি ডিপুটিগিরি ছাড়িয়াছিলাম, এবং জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষগিরিও ছাড়িয়াছিলাম। তিনি আমার হিতৈষীকে বলিলেন,—"If he again proves a rascal, the responsibility will be both yours and mine." আমার হিতৈষী উত্তর করিয়াছিলেন,—"He is not to blame. He cannot settle down to what he does not fully like." Croft সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে গেলেন। আমার শিক্ষাগুরু তাঁহার কাজে বসিলেন। লাইব্রেরীর জন্য লোকনির্ব্বাচনের ভার এখন তাঁহার হাতে। তিনি আমাকে ঐ কর্ম্ম দিলেন। বেতন ২০০৲ হইতে ২৫০৲। আমি কিন্তু চিরকালের জন্য বাঁচিয়া গেলাম। এবং বিধাতার কাছে এখনও Croft ও Tawney সাহেবের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছি।

ক্রমশঃ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

মান্দ্রাজের দ্বারে।

সসৈন্যে মান্দ্রাজের দ্বারদেশে উপনীত হইয়া হিন্দুস্থানের হায়দর, অশিক্ষিত হায়দর, ইংরাজের চক্ষুঃশূল হায়দর,—যে হায়দরকে মান্দ্রাজ সভা এক দিন "পররাজ্যাপহারক দস্যু" বলিয়া হায়দ্রাবাদের নিজামের সন্ধিপত্রে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, সেই হায়দর মান্দ্রাজের বুকের উপর বসিয়াও মান্দ্রাজ-সভার পূর্ব্বকৃত অশিষ্ট ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন। তিনি সংযত ভাষায় শিষ্টভাবে পত্র লিখিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা মান্দ্রাজের ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন। তিনি লিখিলেন,—"আমি আপনাদের রাজ্যের সম্মান করি; কর্ণেল স্মিথের সহিত যুদ্ধ আমার বাঞ্ছনীয় নহে; আমি আপনাদের সহিত বন্ধুতা করিবার প্রয়াসী; অনুরোধ করি, আপনারা মিঃ ডুপ্রেকে আপনাদের দূত স্বরূপ আমার শিবিরে প্রেরণ করুন।* ভয়কাতর মান্দ্রাজ সভা অবিলম্বে সন্ধি করিতে প্রস্তুত হইলেন।

---

* Thence he (Hyder) wrote *temperately* to the Council that he had respected their country ; that he had preferred to negotiate with them instead of fighting Colonel Smith, and requested Mr. Du Pre might be sent to him—*History of India, Taylor—p.* 473.

কর্ণেল স্মিথের সহস্র উৎসাহবাণী আর তাঁহাদিগকে আশান্বিত করিতে পারিল না। * সন্ধি সংস্থাপিত হইল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের অধিকৃত স্থানসমূহ প্রত্যর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরস্পরের রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, ইংরাজ হায়দরের সাহায্য করিবেন, হায়দর ইংরাজের সাহায্য করিবেন, ইহাও স্থির হইল। † কে প্রথমে এই সন্ধিসূত্র ছিন্ন করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস দেখাইয়া দিতেছে। সে ইতিহাস ইংরাজ-লিখিত ভারতের ইতিহাস নহে; তাহা ইংরাজ সরকারের গুপ্ত দপ্তর।

শুনিতে পাওয়া যায়, এক জন ফরাসী লেখক লিখিয়াছেন,—মান্দ্রাজের সন্ধির স্মরণার্থ হায়দর নাকি সেণ্টজর্জ দুর্গের দ্বারে একটি বিদ্রূপাত্মক চিত্র লিখিয়াছিলেন। সে চিত্রে এইরূপ লিখিত ছিল;—মান্দ্রাজ সভা ও মান্দ্রাজের গবর্ণর হায়দরের সম্মুখে নতজানু হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ডুপ্রে সেই চিত্রে হস্তিশুণ্ডের ন্যায় দীর্ঘ-নাসিকা-বিশিষ্ট হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, হায়দর আলি এক হস্তে সেই দীর্ঘ শুণ্ড অমর্ষণ করিতেছেন, আর মিঃ ডুপ্রের নাসা-বিবর হইতে অজস্র সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা হায়দরের চরণতলে পতিত হইতেছে! কর্ণেল স্মিথ একখানি সন্ধিপত্র হস্তে লইয়া তাঁহার তীক্ষ্ণ তরবারি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। ‡ গ্লিগ, ডো প্রভৃতি বিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে এরূপ চিত্রের কোন উল্লেখ নাই। সুতরাং এ চিত্র ফরাসী লেখকের কল্পনা-প্রসূত, কি প্রকৃত, তাহা নির্ণয় করিবার কোনও উপায় নাই।

যাহা হউক, মান্দ্রাজের সন্ধি নির্ব্বিঘ্নে সংঘটিত হইল বটে, কিন্তু মান্দ্রাজ সভা ইতিপূর্ব্বে যে সম্মানে সম্মানিত ছিলেন, তাহা খর্ব্ব হইয়া গেল। ডো বলেন, § ইংরাজ এই সন্ধি ব্যাপারে কালিমায় মণ্ডিত হইয়াছেন, শত রণ

* *Ibid.*

† *History of India.*—Marshman. vol ii., p. 332.

‡ Hyder Ali—Bowring, p. 58. (foot note)

§ The English......by the dominant position of Hyder at the gate of Madras had for the present *lost what prestige they had won.*

History of India. Taylor, p 474.

বিজয়গৌরবের সহস্র তরঙ্গেও সে কালিমা ধৌত হইবে না! * দুরপনেয় কলঙ্কের কৈফিয়ৎ স্বরূপ মান্দ্রাজ সভা শেষে বলিয়াছিলেন,—যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিবার উপযুক্ত অর্থের অভাবেই আমরা সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। †

ইংরাজ ও মহীশূরে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সন্ধিসংঘটনের পর তাহা কিছু কালের জন্য থামিয়া গেল। এই দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে বীর হায়দর আলি যে রাজনীতিকুশলতা ও রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসার্হ। হায়দর যে বিপুল সৈন্যদল লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ সুশিক্ষিত সুদক্ষ সুসজ্জিত সেনা লইয়া তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও ভারতীয় নৃপতি যুদ্ধে অগ্রসর হন নাই। তাই ঐতিহাসিক গ্লিগ বলিয়াছেন,—"তাঁহার সৈন্যদলকে এরূপ সুদক্ষ করিবার বাহাদুরী ও সমরক্ষেত্রে তাঁহার সৈন্য দলের নৈপুণ্য আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসার বিষয়।" গ্লিগ আরও বলিয়াছেন,—"সমরে দ্রুত গতিবিধি, সর্ব্ব বিষয়ের সংবাদ-সংগ্রহ, যখন শত্রু-সৈন্য অনাহারে মৃতপ্রায়, তখন আপন সৈন্যদিগের অনায়াসে পোষণ, এই সমস্তই যুদ্ধবিদ্যার অতি কঠিন অংশ; কিন্তু হায়দর এই সকল দুরূহ ব্যাপারেই আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ‡

মান্দ্রাজকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য হায়দর যেরূপ অসামান্য কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই প্রতিপন্ন হয়, হায়দরের রণনৈপুণ্য কত উচ্চ শ্রেণীর ছিল। § ইংরাজ সর্ব্ব বিষয়ে হায়দর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন; ইংরাজের শক্তি ও অর্থের অভাব ছিল না। অসামান্য রণচাতুর্য্যে হায়দর যেরূপে মান্দ্রাজকে সন্ধির প্রস্তাবে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসনীয়। হায়দর ও ইংরাজে সন্ধি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এই সন্ধিতে হায়দরেরই জয় হইয়াছিল। ভারতবর্ষে না হইয়া দেশান্তরে হায়দরের জন্ম হইলে, তাঁহার

---

* A current of many victories will not be able to wash away the stain which this treaty has affixed to the British character in India.—*History of Hindusthan,—Dow, vol* II. *p.* 362.

† *History of India,—Taylor, p* 474.

‡ *British Empire in India—R. G. Glgi. vol ii. p.* 231.

§ After managing the war with *uncommon abilities*, Hyder by a stroke of generalship, obtained a peace, *which our manifest superiority had no excuse to grant.—History of Hindusthan, Dow, Vol* II, *p.* 362.

রণকুশলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় কনকাক্ষরে লিখিত হইত। হায়দরের দুরদৃষ্ট যে, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার যে পরিমাণ প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশবাসী তাহার শতাংশের একাংশও করে নাই। হায়দরের দুর্ভাগ্য যে, ভারতবাসী তাঁহার কোনও সংবাদই রাখেন না! যে হায়দর আলি তাঁহার যুগে শুধু ভারতবর্ষে কেন, সমগ্র পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেনাপতি ছিলেন, * আমাদের এমনই দুরদৃষ্ট যে, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কাহিনী লিখিবার জন্য কেহ অগ্রসর হয়েন নাই!

কোনও কোনও বিষয়ে ইংরাজের তুলনায় হায়দরের অনেক সুবিধা ও সুযোগ ছিল, সন্দেহ নাই। তাঁহার বহু অশ্বারোহী সেনা ছিল। অশ্বারোহি-গণ কর্ম্মঠ, সুশিক্ষিত ও সাহসী ছিল। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায়, যে সকল উপাদানে এক দল কার্য্যক্ষম অশ্বারোহী সেনা গঠিত হইতে পারে, সে সমুদয় উভয় পক্ষেরই সমান ছিল। সুতরাং বলিতে হয় যে, ইংরাজের কার্য্যপ্রণালীর দোষে লোকে তাঁহাদের অধীনে কর্ম্ম করিতে চাহিত না; কিন্তু 'দস্যু' হায়দরের অঙ্গুলিসঙ্কেতে জীবন পণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। ইংরাজ ঐতিহাসিকও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। †

হায়দর যখন প্রথমে ইংরাজের নিকট বন্ধুতা চাহিয়াছিলেন, শান্তি চাহিয়াছিলেন, তখন তাঁহার দূত ইংরাজের দরবারে উদ্ধত ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়া ভগ্নমনে শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এক বৎসর মাত্র পরে সেই হায়দরের নিকট যখন শঙ্কিত কাপ্তেন সন্ধির প্রস্তাব লইয়া গমন করিয়াছিলেন, তখন হায়দর তাঁহার কত সমাদর করিয়াছিলেন! ইহা কি দস্যুর মত ব্যবহার?

রণবিজয়ী হায়দর মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট কেবল শান্তি ও সখ্য চাহিয়াছিলেন; এমন কিছু চাহেন নাই, যাহা এক জন বিজয়ী সেনাপতির জয়োল্লাসের প্রগল্‌ভতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। হায়দর সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবে কোনও উদ্ধত ভাব ছিল না।

---

* *The Mysorean gave proofs of those extraordinary talents for war which have ranked him among the first generals, not of India only, but of his age.—British Empire in India,—B. G. Gleig, vol 11 p 228.*

† The same material from which to create an efficient cavalry existed on both sides; it was the *faullt of the English system* that none served under it.—*British Empire In India,—R. G. Gleig, vol ii, p* 231.

ইংরেজ যে হায়দর অপেক্ষা দুর্ব্বল, এ ভাবও ছিল না। তিনি অকপটচিত্তে বলিয়াছিলেন, হয় ইংরাজ, না হয় মহারাষ্ট্র,—এক পক্ষের সহিত তাঁহাকে মিলিত হইতেই হইবে। সরলচিত্তে তিনি ইংরাজকে জানাইয়াছিলেন, যদি ইংরাজ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন, নিরুপায় হায়দর বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার্থ পেশোওয়েকে বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিবেন। ইহা কি দস্যুজনোচিত ব্যবহার ?

অধিকাংশ ইংরাজ ঐতিহাসিকই হায়দরকে দস্যু, কপট প্রভৃতি ঘৃণিত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। আমরাও তাঁহাদের রচিত কাহিনী নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিয়া হায়দরকে পিশাচেরও অধম বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছি। এই জ্ঞানাহরণের যুগে কোনও বাঙ্গালী লেখক হায়দরকে কলঙ্কমুক্ত করিবার প্রয়াসী হইবেন কি ?

শ্রীবৈকুণ্ঠ শর্ম্মা।

এ দেশের নটজীবন।

ইংরাজের অনুকরণে বঙ্গীয়-নাট্যশালার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে অভিনয় কলার সূত্রপাত হইয়াছে, অথবা যে দিন ঋষিরাজ ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন, সেই দিন হইতে নাটকাভিনয়ের সূত্রপাত হইয়াছিল ? ইংরাজ এ দেশে আসিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে এ দেশে নাট্যকলার আলোচনা ছিল। ভরত ঋষির পূর্ব্বেও নৃত্য গীত অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। ইংরাজ এ দেশে আসিলে আমাদের অভিনয়-প্রথাকে তাঁহাদের থিয়েটারের ছাঁচে ঢালিয়া বর্ত্তমান রঙ্গালয়গুলির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। আর অতি পুরাকালের নৃত্যগীত-অভিনয়াদির মধ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া ভরত যে বিধিনিষেধাদি-সংবলিত শাস্ত্রের রচনা করেন, তাহাই ভরতের নাট্যশাস্ত্র। দুর্ব্বাসার শাপে স্বর্গরাজ্য যখন লক্ষ্মীছাড়া হয়, সেই সময়ে ম্রিয়মাণ দেবতাদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য ভরত ঋষি "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের রচনা করেন, এবং অভিনয় করান। ইহাই নাটকের আদি উৎপত্তি। এই নাটকের রচনা করিয়া, ইহার অভিনয়বিধির ব্যবস্থা করিতে গিয়াই ঋষিরাজ ভরতকে নৃত্যগীত অভিনয়াদি সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধের বিধান করিতে হইয়াছিল,

তাহাই তাঁহার নাট্যশাস্ত্র। ঐ নাটকাভিনয়ে অপ্সরা উর্ব্বশী দেবী লক্ষ্মীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন, এবং গন্ধর্ব্বেরা পুরুষ-চরিত্রের অভিনয় করেন। এইরূপে দেবরাজ্যে দেবসভায় সর্ব্বাগ্রে যে নাটকাভিনয় হয়, তাহাতেই স্বর্বেশ্যা ও নৃত্যগীতকুশল অর্দ্ধ-দেব-জাতীয় পুরুষের সাহায্যে অভিনয় সম্পন্ন হইয়াছিল। নাট্যশাস্ত্রের ও নাটকের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে ও সমাজে যে কিংবদন্তী বর্ত্তমান, তাহা হইতে ইতিহাস সংগ্রহ করিতে হইলে এইটুকুমাত্র তথ্য পাওয়া যায়। কবে ও কাহা কর্ত্তৃক, কোন সময়ে, পৃথিবীতে, মনুষ্য-সমাজে নাটক প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার সন্ধান না পাইলেও, স্বীকার করিতে হইবে যে, এ দেশে নটজীবন বড় আধুনিক কালের কথা নহে। ভারতবর্ষে কালিদাসই যে আদি নাট্যকার নহেন, সাহিত্যে তাহার প্রমাণ আছে। কালিদাস খৃষ্টজন্মের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। সুতরাং যদি তাঁহাকেই আদি নাটককার ধরা যায়, তাহা হইলেও, এ দেশের নটজীবন দুই হাজার বৎসরের পূর্ব্বতন বলিতে হয়।

ইহার পরে ভারতবর্ষের নানা স্থানেই যে নাট্যাভিনয়ের বিশেষ ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সংস্কৃত ভাষার বিপুল নাট্যসাহিত্য দেখিলে বুঝা যায়। ঐ সকল নাটক যে কেবল লিখিত হইত, অভিনীত হইত না, এমন নহে। নাটকগুলির মধ্যেই অভিনয়ের ব্যবস্থার বিধান পাওয়া যায়। অনেকের সংস্কার, কোথাও কোথাও কোনও নৃপতিবিশেষের খেয়াল অনুসারে সময়ে সময়ে নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিয়া নাটক-বিশেষের অভিনয়ই সেকালের প্রথা ছিল, স্থায়ী নাট্যশালা ছিল না। ইহার এক বিষম প্রস্তরময় প্রতিবাদ সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে! মধ্যভারতে রামপুরের নিকট এক পর্ব্বতগাত্রে দুই সহস্র বর্ষের পুরাতন নাট্যশালার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে সোপানাকার দর্শকাসনের ব্যবস্থা আছে; দৃশ্যপটাদির জন্য ছাদে 'কড়া' সংলগ্ন আছে; রঙ্গমঞ্চের পশ্চাদ্দেশে সজ্জিত অভিনেতৃবৃন্দের বিশ্রাম করিবার প্রস্তরময় 'বেঞ্চি' আছে। * সে কালের রাজার অন্তঃপুরিকারাও যে নৃত্য, গীত ও অভিনয় শিক্ষা করিতেন, সে জন্য তাঁহাদের শিক্ষক নিযুক্ত হইত, শিক্ষকগণ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইতেন, ইহার

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইবে।

প্রমাণও আমরা সংস্কৃত নাটকাদিতেই পাইয়াছি। নাটক ও নাটকাভিনয়ের সংস্কৃত ভাষার যুগ ছাড়িয়া দিলেও, এই হতভাগ্য বাঙ্গলা দেশেও যে অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে মাতৃভাষায় নাট্যাভিনয় করিত, তাহারও ৫০০ শত বৎসরের সাক্ষী বর্ত্তমান আছে; আর সে সাক্ষী যে সে ব্যক্তি নহেন, স্বয়ং মহাপ্রভু নবদ্বীপচন্দ্র। চৈতন্যদেব পণ্ডিতের আঙ্গিনায় যে দিন নিজে স্ত্রীবেশে সুসজ্জিত হইয়া (শাড়ী, হার-বলয়া-নূপুরাদি অলঙ্কার ও কৃত্রিমবেণীতে সজ্জিত হইয়া) সখীভাবে নাচিয়া গাহিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেদিনকার ভাবাবেশে সমস্ত পুরজন নিঃস্পন্দ হইয়াছিল।—মহাপ্রভুর লীলা-প্রকাশক চরিতাখ্যায়কগণ এই ঘটনার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। রাত্রিতেই এ অভিনয় হইয়াছিল, এবং চতুর্দ্দিকে দর্শকের স্থান হইয়াছিল। সুতরাং অনুমান করিতে পারা যায় যে, যাত্রার ন্যায় উঠানে আসর করিয়া ইহার অনুষ্ঠান হইয়াছিল; কোনরূপ রঙ্গমঞ্চ ছিল না। মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হইতে এ দেশে যাত্রার ন্যায় অভিনয় চলিত ছিল, এবং তাহাতে পুরুষই স্ত্রীবেশে সাজিয়া স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিত, এই ব্যাপার হইতে তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তাহার পর যাত্রার অভিব্যক্তি, উন্নতি, আদর ইত্যাদির বৃদ্ধির সহিত এই যাত্রাগায়ক নটবৃত্তি পুরুষের সংখ্যা কত যে বাড়িয়াছে, এবং এখনও বাড়িতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

কিন্তু যে বৃত্তি, যে জীবন এত পুরাতন কাল হইতে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছে, তাহা সমাজে কখনও শ্রদ্ধা পায় নাই;—তা' প্রাচীন কালেও নহে, এ কালেও নহে। নটেরা চিরদিনই প্রশংসা পাইয়াছেন, রাজদ্বারে পুরস্কৃত ও সম্মানিত হইয়াছেন, নাটকের ও অভিনয়ের উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রীতি ও আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা সুশীল, সুপণ্ডিত, সুসভ্য, কলানিপুণ ও জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছেন। কিন্তু কোনও কালে কোনও যুগে সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন নাই। নটের আসন, নটের সম্মান চির-দিনই সভায় অনেক নিম্নবর্ত্তী। এই আশ্চর্য্য ভাব কেবল যে আমাদের দেশেই আছে, তাহা নহে। সার আরভিংএর নাইট-উপাধি-প্রাপ্তির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডেও ছিল। যাত্রাওয়ালা, থিয়েটারওয়ালা প্রভৃতিকে আমাদের দেশে —ঐ সকল 'ওয়ালা'দের শত সহস্র সৎগুণ থাকিলেও,—সমাজ যে একটু অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেবল

নট নহে, সঙ্গীতজীবিমাত্রই এইরূপ সামাজিক অশ্রদ্ধার পাত্র। যেমন নাচওয়ালা, বাজাওয়ালা, নহবতওয়ালা। তবে একটা কথা আছে, যাঁহারা সঙ্গীতকে জীবিকার উপায়রূপে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা নিম্নজাতীয় লোক হইলেও, সমাজে আবার 'গাহিয়ে বাজিয়ে', কালোয়াৎ' ইত্যাদি নামে অভিহিত ও সমধিক আদর ও শ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া থাকেন। তবে কি বলিব,—এ অশ্রদ্ধার মূল সর্ব্ব অনর্থের মূল অর্থ?—ইহাই কি একমাত্র কারণ?

ইতিহাস খুঁজিলে তাহা ত বোধ হয় না। প্রথম নাটকাভিনয়,—যাহা দেবরাজ্যে দেবসভায় হইয়াছিল, স্বর্গবেশ্যা ও স্বর্গীয় সঙ্গীতজীবী অর্দ্ধদেব-জাতীয় গন্ধর্ব্বেরা তাহার ভার পাইয়াছিলেন। অবশ্য নাটকাভিনয়ের কাল হইতেই তাঁহাদের নাম স্বর্গবেশ্যা বা গন্ধর্ব্ব হয় নাই। তথাপি মনে হয়, দেব-সমাজে যাঁহারা দেবতার ন্যায় সম্মানের অধিকারী নহেন, মানবের অপেক্ষা উন্নত যোনির লোক হইলেও, তাঁহাদেরও পূজার্হ নহেন,—এইরূপ লোকই এই কলা বিদ্যার প্রথম ভার পাইয়াছিলেন বলিয়াই কি এই বিড়ম্বনা!—বাইবেলে কথিত শাস্ত্রোক্ত আদি মানবদম্পতী আদম ও হবার ভুলের ফলে যেমন মানবমাত্রই পাপের অধীন, তেমনই ঋষিরাজ ভরতের ভুলেই কি ভারতীয় নটজীবন এই চিরন্তন অশ্রদ্ধার আধার হইয়াছে?

দেবরাজ্য ও দেবব্যবস্থা ছাড়িয়া মর্ত্ত্যে নামিলেও আমরা দেখিতে পাই, পৌরাণিক যুগে অর্জ্জুন যখন পুরুষত্ব হারাইয়া ক্লীবত্ব লাভ করিয়াছেন, তখন তিনি বিরাট রাজের অন্তঃপুরস্থ নাট্যশালায় শিক্ষক হইলেন। পুরুষসিংহ অর্জ্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া, পায়ে ঘুমুর বাঁধিয়া, তালে তালে পা ফেলিয়া, বিরাট-নন্দিনী উত্তরা ও তাঁহার সখীবৃন্দের সহিত নাচিতেছেন,—কল্পনায় একবার এ দৃশ্যটা ভাবুন দেখি! বলিয়া রাখি, একে ক্লীব, তায় এই নটবৃত্তি, কাজেই বৃহন্নলার রাজসভায় অর্জ্জুনের স্থান নাই! আবার এই অর্জ্জুন যখন অশ্বমেধের অশ্ব রক্ষা করিতে গিয়া স্বীয় পুত্র মণিপুর রাজ্যের বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন,—বভ্রুবাহন সবিনয়ে অশ্ব ফিরাইয়া দিতে আসিল, তখন নীতিজ্ঞ অর্জ্জুন, ক্ষাত্র-ধর্ম্মবিৎ অর্জ্জুন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,—জাতিধর্ম্মপালনে যদি তুমি এতটা অক্ষম, 'যাও তবে, মর্দ্দল বাঁধিয়া গলে, নর্ত্তক হইয়ে, রহ গিয়ে প্রতিবেশী রাজার সভায়!' বুঝিয়া দেখুন, অর্জ্জুনের মত

জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ বিচারকের নিকট নটবৃত্তি সামাজিক দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে! এরূপ পৌরাণিক উদাহরণ আরও আছে;—বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ করিলাম না।

তাহার পর লৌকিক ইতিহাসে সামাজিক ইতিহাস অংশের পুরাতন পৃষ্ঠাগুলি উদ্‌ঘাটিত করিলে দেখিতে পাই, যখন এ দেশে জাতি-ব্যবস্থা হইতেছিল, তখন সমাজবিধাতা ঋষিগণ সঙ্গীতজীবী নরনারীকে 'নট' নামক একটি স্বতন্ত্র জাতিতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। এই নটজাতি এখনও আছে। উত্তর-ভারতে ইহাদিগকে প্রায় দেখা যায় না; কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহাদের সংখ্যা অল্প নহে। ইহারা স্ত্রীপুরুষে নাচিয়া গাহিয়া বাজনা বাজাইয়া জীবিকার্জ্জন করে। ইহারা হাড়ী চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্য নহে, কিন্তু ধীবরাদির ন্যায়ও জলচল নহে। ঋষিগণ নটবৃত্তির যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—আজিও তাহা জাতিগত হইয়া অবাধে চলিয়া আসিতেছে। কখনও নৃত্যগীতের অনাদর হয় নাই, সঙ্গীতের প্রতিও অশ্রদ্ধার সঞ্চার হয় নাই, কিন্তু নটবৃত্তির এই নীচতা-বিধান হিন্দুসমাজের সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক মধ্যযুগে আমরা দেখিতে পাই, এ দেশে দেবালয়াদিতে দেবদাসী নামে এক দল নর্ত্তকীর নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। এখনও দাক্ষিণাত্যের অনেক মন্দিরে দেবদাসী আছে। এই দেবদাসীরা চিরকুমারী থাকিত; সুতরাং ইহারা সকলেই যে একজাতীয়া রমণী হইত, তাহা নহে। দেবমন্দিরে নৃত্যগীতের প্রয়োজন হইতে এই দেবদাসী শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছিল, এরূপ আমার মনে হয় না। যুগে যুগে ভারতে ঈশ্বরোপাসনার অনেক পথ উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল;—যোগমার্গ, ভক্তিমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতি বহু পথের পথিক হইয়া দলে দলে সাধকেরা ভগবৎসাক্ষাৎকারে ছুটিতে লাগিল। এই সকল পথের আবিষ্কর্ত্তার ন্যায়, জানি না, কোন সঙ্গীতপ্রিয় সাধক আর একটি সুবিস্তৃত পথ খুলিয়া দিয়া হয় ত বলিয়া দিয়াছিলেন,—"গানাৎ পরতরং নহি।" যাহারা প্রবৃত্তির নিগ্রহ না করিয়া, সাধনার কঠোরতা না সহিয়া, সহজে সাধনার পথে অগ্রসর হইতে চাহে, এবং শাস্ত্র যাহাদিগের অনধিকারিত্ব বিধান করিয়া কোনও মার্গে প্রবেশ করিতে দিতে সম্মত নহেন, সেই স্ত্রীশূদ্র এই পরতর পথ পাইয়া বিশেষ সুবিধা বোধ করিল। ইহা হইতেই সঙ্গীত দেবদাসী, কীর্ত্তনিয়া, বাউল প্রভৃতি উপাসক-সম্প্রদায়ের সাধনার প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকিবে। "গানাৎ পরতরং নহি" বলিয়া ঋষিবাক্য

থাকিলেও, সঙ্গীতজীবিনী দেবদাসীরা সমাজে কথনও শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। ইউরোপের মধ্যযুগে এক সময়ে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল। এই Nunneryতে কালে অব্যাহতভাবে যে সকল দুষ্ক্রিয়ার অভিনয় চলিত, তাহার বিস্তর প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও চিরকুমারী দেবদাসীর ব্যবস্থায় ঐরূপ দোষ সংক্রমিত হইয়াছিল। এই সকল দোষের জন্যই দেবদাসী সম্প্রদায় সমাজে গণিকার ন্যায় ঘৃণাভাজন হইয়াছে। কিন্তু এক সময়ে এ ভাব ছিল না। রাজারাও তাহাদিগকে বিবাহ করিতেন। কাশ্মীররাজ ললিতাপীড় জয়াদিত্য গৌড়নগরে কার্ত্তিকেয় মন্দিরের এক দেবদাসী কল্যাণ দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজারা রমণীমাত্রকে উপভোগ্যরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন বটে, কিন্তু গণিকাকে বিবাহ করিতে পারিতেন না।

তাহার পর আধুনিক কালে আসিলেও আমরা দেখিতে পাই, বহুদিন হইতে সমাজে যাত্রাওয়ালারা শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হন না। অনেকে বলিবেন,—অনেক যাত্রার দলে ইতর শ্রেণীর বালক নীচজাতীয় লোক, থাকে বলিয়া যাত্রার অভিনেতৃগণ অশ্রদ্ধাভাজন হইয়া পড়িয়াছে। এ কথাটা কতকাংশে সত্য হইলেও সর্ব্বথা সত্য নহে। কেবল সঙ্গীতজীবী বলিয়াই যাত্রার অভিনেতা ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলেও শ্রদ্ধা হারাইয়া থাকেন।

যাত্রার কথার পর আমাদিগকে নাট্যশালার কথা তুলিতে হইতেছে। ১২৩৮ সালে এ দেশে প্রথম বাঙ্গলা নাটকের অভিনয় হয়। দেবসভায় আদিনাটকের অভিনয়ের ন্যায় বাঙ্গালার এই আদিনাটকাভিনয় ব্যাপারেও স্ত্রী পুরুষের মিলনেই অভিনয় হইয়াছিল। সেই স্ত্রী অভিনেত্রীরাও এখনকার ন্যায় বারবনিতা। আর অভিনেয় ছিল বিদ্যাসুন্দর। স্বর্গবেশ্যা লইয়া ঋষিরাজ ভরত যে ভুল করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার আদি নাটক অভিনয়ের কর্ত্তা নবীনচন্দ্র বসুও, গণিকা অভিনেত্রী লইয়া সেই ভুল করিয়াছিলেন। কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না; বাঙ্গালীর সমাজে অবরোধপ্রথা—এখনও স্ত্রীলোকের পাল্কী বস্ত্রাবরণ দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়।—যাহাই কারণ হউক, আর সে কারণ যতই সত্য ও যতই প্রবল হউক,—এই বেশ্যা-সংস্রব হইতেই বাঙ্গালীর নটজীবনে সাধারণের একটা বিরাগ আসিয়া পড়িয়াছে। ঠিক সেই সময়েই তাহা হইয়াছিল কি না, তাহা জানা যায় না; তবে অসম্ভব নহে। তাহার পর যখন বেলগেছিয়ার পাইকপাড়ার রাজোদ্যানে নাটকাভিনয়ের

সূত্রপাত হইল, এবং সহরের অন্যত্র ও নাটকামোদের প্রচার ও প্রাবল্য হইতে লাগিল, তখন বেশ্যাসংস্রব পরিত্যক্ত হইয়াছিল। তখন কিশোর-বয়স্ক বালক দ্বারা স্ত্রীচরিত্র-অভিনয়ের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। কলিকাতায় সামাজিক সংস্কার সকলের অধিকাংশ যে প্রস্রবণ হইতে উদ্ভূত, এই প্রয়োজনীয় সংস্কারটিও সেই প্রস্রবণ—ঠাকুরগোষ্ঠী হইতে উদ্ভূত। স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১২৩৮।৩৯ সালে যখন ইংরাজীতে উত্তররামচরিত অভিনয় করান, পণ্ডিত হোরেস হেম্যান উইলসন যখন তাহার শিক্ষা দেন, তখন সেই দলে বালকের নারী-ভূমিকা গ্রহণ করিত। তাহার পর হইতে সকল নাট্যসম্প্রদায়ে বালকই অভিনেত্রীর স্থল অধিকার করে। এই সময়টি কিন্তু সেকালের ইয়ংবেঙ্গল দলের আদিযুগ। মদ্যপান তখন ভদ্রসমাজে একটা বিশেষ বিলাসের বিষয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিল; কাজেই বেশ্যাসংস্রব ছাড়িলেও, এই সকল নাট্যসম্প্রদায়ে মদের প্রবাহ বাড়িল। ধনীর লালিত সম্প্রদায়ে অবাধে মদ্যপানলালসা মিটিবে বলিয়া তখন অনেক যুবক এই সকল নাট্যসম্প্রদায়ে যোগ দিতেন। একটি অভিনয়ের অনুষ্ঠান হইত, আর তাহার প্রথম আরম্ভের দিন হইতে অভিনয়ের শেষ দিন পর্য্যন্ত মদের স্রোত বহিতে থাকিত। কোনও একখানি সেকালের প্রহসনে পাঠ করিয়াছি,—ঐ নাট্যোক্ত কোনও পাত্র আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন,—"বাবা ওদের দল চলবে কেন? মদ খরচ করতে না পারলে দল থাকে কি?" যাক্, এই নূতন উপসর্গ যখন জুটিল, তখনও সমাজ তাহার পূর্ব্ববিরাগ ত্যাগ করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাইল না। বরং মদের অত্যাচারে যুবক দল ঘরে বাহিরে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছিলেন, বলিয়া 'থিয়েটারের ছোক্‌রা' সেকালের একটা বিষম ভয়ের ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছিল, অভিজ্ঞ জনের মুখে এইরূপ শুনিয়াছি। এই সকল অভিনয়সম্প্রদায়ের একটিও স্থায়ী হয় নাই। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীর সম্প্রদায় ব্যতীত আর সকল সম্প্রদায়ই যে নাটকখানির অভিনয় করিতেন, দু' এক রাত্রি তাহার অভিনয় হইয়া গেলেই, সে সম্প্রদায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িত। বিভিন্ন পল্লীতে এরূপ আমোদের অনুষ্ঠান হওয়ায় নাট্যামোদের সম্প্রসারণ হইতেছিল বটে, কিন্তু অভিনেতৃ-জীবন গঠিত হয় নাই। আমাদের অদ্যকার প্রবন্ধের যাহা প্রতিপাদ্য, তাহা এ পর্য্যন্ত সমাজে বদ্ধমূল হয় নাই। তবে কিরূপে তাহার সূত্রপাত হইতেছিল, তাহাই বুঝাইবার জন্য আমাকে এত কথা বলিতে হইতেছে।

বাঙ্গলায় স্থায়ী নাট্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অভিনেতৃ-জীবন গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এ দেশে স্থায়ী নাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারা সকলেই নাট্যজীবী ছিলেন না, বা হন নাই। তাঁহারাও তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী নাট্য যুগের অভিনেতৃ-দলের ন্যায় কেবল নাট্যামোদী ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে দর্শকের প্রদত্ত অর্থ নাট্যশালার সাজসজ্জা ও অভিনয়ের ব্যয়নির্ব্বাহেই ব্যয়িত হইত। আজ আমরা যে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতার চিরবিয়োগে কাতর হইয়া এখানে শোক প্রকাশ করিতে সমবেত হইয়াছি, তাঁহার ও তদীয় সহযোগিগণের সময় হইতেই বঙ্গীয় নাট্যশালায় অভিনেতৃ-জীবনের প্রকৃত সূত্রপাত। তাঁহারাই বাঙ্গালী অভিনেতৃদলের প্রথম ও অগ্রণী নাট্যজীবী সম্প্রদায়। ইঁহাদের জীবনের আলোচনাই আমাদের উদ্দিষ্ট।

ইঁহারাও ইঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী দলের ন্যায় সমাজে শ্রদ্ধা বা সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। যে কলার অনুশীলনে তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে কলার উৎকর্ষবিধানে বা অপকর্ষসাধনে তাঁহাদের মধ্যে যিনি যেরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সাধারণের নিকট তিনি সেইরূপ প্রশংসা, আদর ও যশ পাইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনও নাট্যশালায় লোকচরিত্রের সর্ব্বনাশকর সুরা ও বেশ্যার সংস্রব থাকায় এ সম্প্রদায়ের প্রতি সামাজিক অশ্রদ্ধা বাড়িয়া গিয়াছিল। অবৈতনিক নাট্যশালার যুগে বেশ্যা-সংস্রব দূর হইয়াছিল। স্থায়ী নাট্যশালার যুগে তাহা আবার পুনঃপ্রবর্ত্তিত হইল। তাই নটজীবন বৃত্তিবিধানকর হইলেও সামাজিক জীবনের অনর্থকর বলিয়া প্রথম হইতেই সমাজে শ্রদ্ধালাভ করিতে পারে নাই। এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক হইতেছে; আমি যে ভাবে বিষয়ানুসরণ করিতেছি, তাহাতে লোকে যেন এমন মনে না করেন যে, এই শোক-সভায় দাঁড়াইয়া আমি নটজীবনের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া নটসম্প্রদায়কে হেয়তর করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার তাহা উদ্দেশ্য নহে। আমি ব্যক্তিগত ভাবেও তাহা পারি না। আমি নিজে অভিনেতার পুত্র; আমার পিতৃদেবই বঙ্গীয় নাট্যশালা স্থাপন যজ্ঞের প্রধান ঋত্বিক্ ও হোতা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—ঘৃণ্য বলিয়া এই ভিক্টোরিয়া যুগেও ইউরোপেও নটজীবন এইরূপই ঘৃণ্য ছিল। সেখানে কোনও সাধারণ সভায়, কোনও মানী জনের মজলিসে অভিনেতার আমন্ত্রণ হইত না; কোনও পবলিক

ডিনারে কেহ অভিনেতার সহিত একত্র পান ভোজন করিতে চাহিত না। অথচ অভিনয়ের আকর্ষণ, অভিনেতার আদর যশ সেখানে যত অধিক, এখানে এখনও তত হয় নাই। আমাদের মধ্যে নট-জীবন সমাজে যতই বিরক্তিকর হউক না, যতই অশ্রদ্ধার ভাজন হউক না, কখনও তাহা দণ্ডনীয় নহে। অভিনয় করেন বলিয়া কেহ আমাদের দেশে কখনও অপাঙ্‌ক্তেয় হন নাই, কখনও কাহারও পুত্র কন্যার বিবাহ বন্ধ হয় নাই, কখনও কাহারও বাড়ীর যজ্ঞ পণ্ড হয় নাই। কিন্তু সভ্যতার আধার, কলাবিদ্যার আদরভূমি ইংলণ্ডে অভিনেত্রী-বিবাহ লালসার দিক হইতে নিষিদ্ধ না হইলেও, অভিনেতার সহিত কুটুম্বিতা সে দেশের লোকে সহজে করিতে চাহিত না। ইংলণ্ডে যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহারা এই সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হন, কেহ তাঁহাদের লইয়া খায় না। তবে যে দিন হইতে আরভিং নাইট পদবী লাভ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে ইংলণ্ডে এই সামাজিক শাসন শিথিল হইয়াছে।

আমাদের সমাজে এখন অভিনেতৃদলের উপর যে বিরাগ আছে, তাহার কারণ অনেকটা ব্যক্তিগত চরিত্রহীনতা। সে সকল কথা সাধারণ্যে আলোচিত হইতে পারে না বলিয়াই তাহা এখনও দূর হইতেছে না। এই গেল আমাদের দেশে নটজীবনের কালিমাময় ভাগ। সপক্ষে, বিপক্ষে ও পরদেশের তুলনায় ইহার সম্বন্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষণে আমাদের দেশে নটজীবনের অন্য দিক প্রদর্শন করিব।

আমাদের দেশে সামাজিক অনুরাগ বিরাগের উপর লোকের আকর্ষণ এত তীব্র যে, সমাজের ভয়ে লোকে জানিয়া শুনিয়াও অনেক অনিষ্টকর কুপ্রথাও প্রতিপালন করেন। এইরূপ ঘৃণিত হইয়াও ব্যক্তিগত নিন্দা, কুৎসা, পারিবারিক ক্ষতি ও শান্তিনাশ সহ্য করিয়াও যাঁহারা নটবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিষ্ণুতা ধন্য! যাঁহারা বলেন, কেবল যশের জন্য তাঁহারা এত সহ্য করেন, তাঁহারা এ দেশের নট-জীবন ভাল করিয়া অনুধাবন করেন নাই। পিতৃতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত অমৃতলাল বসু মহাশয় সাধারণ নাট্যশালা-স্থাপন-দিনের বার্ষিক উৎসবের সভায় ১৩০৫ সালে বলিয়াছিলেন,—অভিনেতার জীবন মরণ দর্শকের তৃপ্তি বিরক্তির উপর নির্ভর করে। দর্শকেরা একটু হাসিলে অভিনেতা কৃতকৃতার্থ হয়, একটু বিরক্ত হইলে মরমে মরিয়া যায়,—সে চায় দুটো উৎসাহবর্দ্ধক ফাঁকা হাত-

তালি—আর কিছু না। ইহা খুব সত্য। আমি যশস্বী হইব, আমি আমার যশের পরিমাণে অর্থ উপার্জ্জন করিব, এতটা দুরাশা—এতটা ক্ষুদ্র স্বার্থ বাঙ্গালী অভিনেতার মধ্যে অল্প দেখা যায়। হয় ত দু' এক জনের ভাগ্যগুণে এ বৃত্তিতে প্রভূত অর্থ-উপার্জ্জনের সুযোগ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ অভিনেতাই যে পরের তৃপ্তিসাধনের জন্য সামান্য অর্থের বিনিময়ে নিজের সর্ব্বস্ব—সুখ, দুঃখ, স্বাস্থ্য, শান্তি, গুরুজনের স্নেহ আশীর্ব্বাদ—সবই হারাইয়া থাকেন, এবং অনেকে সঙ্গদোষে, অপরিণত বুদ্ধির দোষে চরিত্র, বল, বুদ্ধি ও অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? অভিনেতার এ স্বার্থত্যাগ আত্মবিনাশের হেতু হয় বলিয়াই সমাজে ইহার মনোহারিতা ফুটিতে পায় না। এ দেশের নট-জীবনে এইটুকুই বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পিতৃদেবের নিকট কতদিন শুনিয়াছি, উপযুক্ত অভিনেতাই নাট্যকাব্যের উপযুক্ত টীকাকার; ব্যাখ্যাকার সমস্ত শব্দভাণ্ডার ও সমগ্র ব্যাকরণ ছন্দ অলঙ্কার লইয়া নাটকের যে উপযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়া উঠিতে পারেন না, অভিনেতার একটি দৃষ্টিতে, একটি ইঙ্গিতে, একটু হাসিতে, একটি অঙ্গুলি-হেলনে সে স্থলের অর্থ দর্শকগণের বোধগম্য হইয়া থাকে। এরূপ আদর্শ অভিনেতা আমাদের দেশে এখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। * সাহিত্যের প্রতি এত দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে অভিনেতৃকুল যে বাধ্য, তাহা আমাদের দেশের নট-জীবনে এখনও প্রতিফলিত হয় নাই। আপাততঃ আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষকস্থানীয় অভিনেতা আছেন, সেই কয় জন ব্যতীত এ দেশের অভিনেতৃ-সম্প্রদায় প্রায়ই সাহিত্যচর্চ্চায় অনবসর। তাই তাঁহারা এ দিকে আদৌ দৃষ্টি দিতে পারেন না। তথাপি কোনও কোনও শিক্ষকের শিক্ষা-নৈপুণ্যে কোনও কোনও অভিনেতা কোনও কোনও নাটকের অভিনয়ে এমন গুণপনা প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, তাহা তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির তুলনায় অত্যন্ত বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। নবজীবন গঠিত করিতে হইলে সকলেরই কাব্য শাস্ত্রের আলোচনা, নাট্যসাহিত্যের অনুশীলন, সমাজের

---

* গত ১২ই আশ্বিন অর্দ্ধেন্দুশেখর-স্মৃতিসভার অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখরকে সে সম্মান দান করিয়াছেন;—তিনি বলিয়াছিলেন, মুস্তফি মহাশয় ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকার ছিলেন। পিতৃদেবের বহু অভিনয়ের উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার কথা সপ্রমাণ করিয়াছিলেন।

সকল তত্ত্বের পর্য্যবেক্ষণ ও সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মেলামেশা আবশ্যক হইয়া পড়ে। এ ভাবে নটজীবন গঠিত করিবার ব্যবস্থা বা অবকাশ এ দেশের নাট্য-সম্প্রদায়ে এখনও হয় নাই। নটজীবনের বিশেষত্ব এখনও পরিলক্ষিত হয় না।

এ দেশের নটজীবনে আমরা শিক্ষার অল্পতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়া থাকি। অনেক অভিনেতাকে সে জন্য পাখীর হরিনাম-শিক্ষার ন্যায় শিক্ষকের ভঙ্গীময় আবৃত্তির অভ্যাস ভিন্ন আর কিছু করিতে দেখিতে পাই না। শিক্ষিত-সম্প্রদায়—আমরা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবকগণকেই শিক্ষিত বলিয়া অভিহিত করিতেছি না,—যাঁহারা কাব্যরসগ্রাহী, এরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও সমাজের বিরক্তিভয়ে—আত্মনাশের ভয়ে নটবৃত্তি অবলম্বনে পশ্চাৎপদ। তাই এখনও আমাদিগকে এই বিড়ম্বনা সহিতে হইতেছে। তবে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন উদীয়মান অভিনেতৃগণের মধ্যে দুই চারি জন শিক্ষিত ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছেন। কালে সংখ্যা আরও বাড়িবে, এরূপ আশা করা যায়। বাঙ্গলার নাট্যজগতে এমন এক দিন গিয়াছে, যে দিন কেবল অমৃত বাবু ও গিরীশ বাবু ভিন্ন আর কোনও নাটক-লেখক তেমন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আজ কাল ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কৃতবিদ্যগণ নাট্যসাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন। কালে এই দল পুষ্ট হইলে নাট্য সাহিত্যের উন্নতি, নাট্যকলার উন্নতি ও নটের উন্নতি যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা বলা বাহুল্য।

আজ আমরা যাঁহার অকালবিয়োগে শোকপ্রকাশের জন্য এই সভায় সমবেত হইয়াছি, তাঁহার অভিনয়কলাকৌশলের সমালোচনা করিবার স্থান কাল ইহা নহে। তবে ইহা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, যে দিন গিরীশবাবুর হস্তে, বঙ্গীয় নাট্যশালা করামলকবৎ ঘুরিতেছিল, যে দিন গিরীশের নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য দর্শক উন্মত্ত হইয়া ছুটিত, সেই দিন হইতেই নটবর অমৃতলাল মিত্র অভিনয়কৌশলে সাধারণের মন হরণ করিয়া যশোমন্দিরে কীর্ত্তিরাশি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। নটবর অমৃতলালের এতটা সিদ্ধির একমাত্র কারণ, তিনি নাট্যৈকব্রত হইয়া নিজের বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে, গুরূপদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ বৃত্তির সাধনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে সকল ভূমিকা লইয়া যে ভাবে অভিনয় করিয়া দর্শককে মোহিত করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী

অনেক অভিনেতা এখনও তাঁহার অনুকরণ করিয়াই তাঁহার সমকক্ষতা-লাভের আশায় নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া বেড়াইতেছেন। নটবর অমৃতলালের জীবনে আমরা এ দেশের নটজীবনের সকল অবস্থাই দেখিতে পাই। পূর্ব্বে আমি সে সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। ভাবুকেরা সেগুলি মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, অমৃতলালের নটজীবনে এ দেশের অভিনেতৃ-জীবনের সকল সুবিধা ও অসুবিধারই ফল ফলিয়াছিল।

এখন যাঁহারা নটবৃত্তিতে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের ও যশ মান ধন উপার্জ্জন করিবার আশায় ফিরিতেছেন, তাঁহারা এগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বিশেষ ফল পাইবেন।

নট-জীবনের প্রতি এ দেশে আবহমান কাল হইতে যে অশ্রদ্ধা লক্ষিত হয়, এবং এখনও যাহা আছে, তাহার কারণগুলি আমি যতটা বুঝিয়াছি, তাহার আলোচনা করিলাম। সামাজিকগণের সে অশ্রদ্ধা যে একদিন বিনা আয়োজনে দূর হইতে পারে, তাহা নটজীবনের উপর আমাদের দেশে সামাজিক দণ্ডের কোনও ব্যবস্থা না থাকাতেই বুঝা যাইতেছে। অশ্রদ্ধার কারণ যেগুলি আছে, সেগুলিও আবার এত বদ্ধমূল যে, তাহা দূর হইতে দীর্ঘকাল লাগিবে। কিন্তু অভিনেতৃসম্প্রদায় চেষ্টা করিলে তাহার অধিকাংশই যে লুপ্ত হইতে না পারে, এমন নহে।

এক সময়ে অভিনয়কলার প্রতি দেশের ধনী মানী বিদ্বান্—সকলের প্রবল আকর্ষণ ছিল। আমরা এখন যাঁহাদিগকে দেশের রত্নজ্ঞানে পূজা করি, সেই কেশবচন্দ্র সেন, ডব্লিউ. সি. বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষ, মহারাজ সার্ যতীন্দ্রমোহন, সঙ্গীতাধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাপতি, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী সেন, কবি প্রিয়মাধব বসু মল্লিক, ডাক্তার উমেশচন্দ্র মিত্র, শোভাবাজার রাজবংশের বহু ব্যক্তি, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, সঙ্গীতাধ্যাপক মদনমোহন বর্ম্মা, উকীল মণিমোহন সরকার, আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ প্রভৃতি সকলেই অভিনেতা ছিলেন। ইহা ভিন্ন অভিনয়ের আয়োজন উদ্যোগে যে সমস্ত গণ্য মান্য ব্যক্তি লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া তালিকা-বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখি না। এই সকল মনীষী যে বিদ্যার আদর করিয়া গিয়াছেন, তাহা ঘৃণার সামগ্রী বা বিরক্তির সামগ্রী নহে। দোষপরিশূন্য হইয়া এ দেশের নটজীবন সফলতার পথে অগ্রসর হইলেই তাহার নিন্দা কুৎসা গ্লানি তিরোহিত হইবে; আবার নটজীবন সম্ভ্রান্ত সমাজের সমাদর লাভ করিতে পারিবে,—ইহাই আমার বিশ্বাস। *

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

---

* এই প্রবন্ধ ষ্টার থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ৺ অমৃতলাল মিত্রের স্মৃতি-সভায় মিনার্ভা থিয়েটারে গত ৬ই শ্রাবণ মঙ্গলবার পঠিত হইয়াছিল।

মালাকর।

১

সে যোগা'ত ফুল নিত্য, তরুণ যুবক,
নৃপতির অন্তঃপুর তরে।
তুলিয়া কুসুমরাজি
ভরিয়া আনিত সাজি ;—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত কুসুম, কোরক ;
সাজায়ে আনিত থরে থরে।

২

নিত্য প্রাতে সাজি লয়ে শঙ্কাকুলমনে
দাঁড়া'ত সে অন্তঃপুর-দ্বারে ;
কখন নয়ন তুলি'
চাহিয়া দেখেনি ভুলি'
লতাঘেরা মর্ম্মরের উচ্চ বাতায়নে—
ক'ার আঁখি নেহারিত তারে।

৩

প্রতিদিন দাসী আসি সাজি ল'য়ে যায়,
রুদ্ধ হয় অন্তঃপুর-দ্বার ;
রাজার শয়ন 'পরে,
কুমারীর কম করে,
তা'র সেই ফুলরাশি নিত্য শোভা পায় ;
সুখ দুখ কি তাহে তাহার ?

৪

সে যোগা'ত ফুল নিত্য, তরুণ যুবক,
নৃপতির অন্তঃপুর তরে ;
কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলগুলি
যতনে বাছিয়া তুলি'
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত কুসুম, কোরক,
সাজিতে সাজা'ত থরে থরে।

১

তা'র সেই সাজি হ'তে বাছা ফুলদলে
নিত্য মালা গাঁথে রাজবালা ;
কুসুমের মধুবাসে
কি মোহ আবেশ ভাসে !
রাজবালা ফুলহার নিত্য পরে গলে,
কবরীতে বাঁধে ফুলমালা।

২

কুসুম কি কথা কহে মনের শ্রবণে ;
সে কি করে পরশে বিহ্বল ?
কি মধু সুষমা-ভার !
কি মোহ সৌরভে তা'র—
বিকশিত যৌবনের নিকুঞ্জ-কাননে
উছলিত যেন পিক-কল !

৩

রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরে সোনালি সন্ধ্যায়
রজনীতে বিজন শয়নে ;
নিত্য শুনে রাজবালা
কি কহিছে ফুলমালা,
কি স্বপ্ন-আবেশ তার হৃদি যেন ছায়,
কি কথা পড়ে না যেন মনে !

৪

তা'র সেই সাজি হ'তে বাছা ফুলদলে
নিত্য মালা গাঁথে রাজবালা ;
শুনে যেন কা'র কথা,
হৃদি-ভাঙ্গা আকুলতা ;
রাজবালা ফুলহার নিত্য পরে গলে ;
কবরীতে বাঁধে ফুলমালা।

এক বসন্তের প্রভাতে যখন
সাজিতে সাজায় ফুলভার;
প্রহরী আসিল দ্বারে,
ডাকিয়া শুনা'ল তা'রে—
রাজার কঠোর আজ্ঞা—নিষ্ঠুর বচন।
শুধা'ল না কারণ সে তা'র।

২

সাজি হ'তে ফুল তা'র করিয়া গ্রহণ
রাণী দিলা রাজার শয্যায়;
সেই ফুলদল মাঝে
ক্ষুদ্র কীট কোথা রাজে,—
দেখেনি সে; ক্ষুদ্র-কীট-নিষ্ঠুর-দংশন
বাজিয়াছে নৃপতির গায়।

৩

শাস্তি তা'র,—তুলি' এক ক্ষুদ্র তরী 'পরে
ভাসাইবে সাগরের জলে;
থাকিবে না সঙ্গী তার—
শুধু মৃত্যু-অন্ধকার;
চারি পার্শ্বে উর্ম্মিমালা কলকল করে—
মৃত্যু সেই আঁধার অতলে।

৫

নবোদিত বসন্তের প্রভাতে তখন
সাজিতে সাজায় ফুলভার;
বিকশিত ফুলগুলি
বাছিয়া সাজায় তুলি';
শুনিল সে রাজ-আজ্ঞা—নিষ্ঠুর বচন।
শুধা'ল না কারণ সে তা'র।

১

কূলে ক্ষুদ্র তরীখানি; সাগরের তীর
বহু দূর পূর্ণ জনতায়;
উদ্‌গ্রীব জনতা চাহি'—
আসে যুবা পথ বাহি',
প্রহরি-বেষ্টিত, আঁখি নত, ধীর।
এ উহার মুখে সবে চায়।

২

দৃঢ়পদে উঠে যুবা তরণীর 'পরে;
ভাসে তরী সাগরের জলে;
তরুণ তপন-কর
খেলে সিন্ধুবারি 'পর,
নিষ্ঠুর প্রকৃতি হাসে নির্ম্মম-অন্তরে,
সিন্ধুবারি গাহে কল-কলে।

৩

তীর পূর্ণ জনতায়; মৌনতা ভীষণ;
লক্ষ দৃষ্টি তরী 'পরে হানে।
চঞ্চল তরঙ্গ 'পরি
ভাসিয়া চলিল তরী।
যুবক জীবনে সেই তুলিল নয়ন
প্রাসাদের বাতায়ন পানে।

৪

বাতায়নে মর্ম্মরের মৌন মূর্ত্তি প্রায়
দাঁড়াইয়া ছিলা রাজবালা;
সেই দৃষ্টিঘাতে যেন
বেদীচ্যুত মূর্ত্তি হেন
সংজ্ঞাহীন হর্ম্ম্যতলে পড়িয়া লুটায়—
বক্ষে—কেশে ম্লান ফুলমালা!

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

রীতনামা।

মোগলের অন্যায় অত্যাচার-স্রোত প্রতিরুদ্ধ করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিখদিগকে ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষায় শিখেরা অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদিগের অসীম মৃত্যুঞ্জয় সাহস ও অদম্য উৎসাহ জগতের ইতিহাসে বরণীয়। গুরুগোবিন্দ সেই উত্থানোন্মুখ শিখদিগের গতি সংযত ও উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য কতকগুলি বিধির প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই বিধিগুলি 'রীতনামা' (রীতি—রীত) নামে প্রসিদ্ধ। রীতনামাগুলি শিখদিগের বড়ই শ্রদ্ধার্হ। তাহাদের আচার-ব্যবহার রীতনামারই অনুযায়ী।

রীতনামাগুলি কেবল জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানমার্গেরও তত পক্ষপাতী নহে। তাহারা ভক্তির সেবক। ভক্তির আতিশয্যবশতঃই তাহারা কতকগুলি সংস্কারের বশীভূত হয়। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া ধর্ম্মকথা বলিলে তাহারা সহজেই তাহাতে শ্রদ্ধাবান হয়। এই জন্যই ওলাবিবি, শীতলা, সত্যপীর প্রভৃতির পূজা আমাদের দেশে সাধারণ্যে এত প্রবল।

মানুষের এই দুর্ব্বল বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়াই গুরুগোবিন্দ শিখদিগের জন্য রীতনামাগুলির প্রণয়ন করেন। এ জন্য তাঁহাকে তত দোষী করা যায় না। এ দোষে তিনিই প্রথম দুষ্ট নহেন। তার পর, দেশের তদানীন্তন অবস্থার কথা, এবং তৎসঙ্গে গোবিন্দের পবিত্র উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করিলে, স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সে কালে এই প্রথাই একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানমার্গ দিয়া লোকশিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতে হইলে, শিক্ষা-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই সনাতন ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইত, হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ পাইত। *

---

* ঔরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। তাঁহার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া অনেক হিন্দুই ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি কাশ্মীরে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বকালেই ঘৃণ্য। শিখ গ্রন্থ 'সূর্য্য-প্রকাশে' সে নীতির বিশদ বর্ণনা আছে। সংক্ষেপতঃ বলা যাইতে পারে যে, তিনি ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য প্রজাদিগকে কর-ভারে প্রপীড়িত করিয়াছিল; এমন কি, দেশমধ্যে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটাইয়াছিলেন।

উপায়ান্তর না থাকাতেই গোবিন্দকে বাধ্য হইয়া এই সহজ পথ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাই বলিয়া শিখধর্ম্ম কেবল কুসংস্কারের সমষ্টি নহে। উন্নত শিখদিগের জন্য গুরুরা দর্শন শাস্ত্রের যথেষ্ট ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছিলেন। শিখধর্ম্ম মূলতঃ জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গমের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পঞ্চম গুরু অর্জ্জুনমলের আমল হইতেই শিখেরা মোগল-বিদ্বেষী হইয়া উঠে। তেগ বাহাদুরের অন্যায় হত্যায় তাহাদের সে বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হয়। কার্য্যানুরোধে রাষ্ট্রনীতিক গোবিন্দ তাহাদের এই নিকৃষ্ট বৃত্তিকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'তুর্ককে বিশ্বাস করিও না।' এরূপ শিক্ষা দান করিয়াও তিনি হিন্দু-সুলভ ঔদার্য্য ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার রীতনামাগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলেই স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, তিনি সাময়িক ধর্ম্মের প্রচারক ছিলেন;—চিরন্তন ধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি আগ্রহান্বিত ছিলেন না। তাঁহার শিক্ষাদানপ্রথা শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। দেশবাসীকে ইঁহাদের ধর্ম্মমতগ্রহণের উপযোগী করিবার জন্যই যেন তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল।

গোবিন্দ-প্রচারিত বিধিগুলি একত্রিত করিয়া কোনও একখানি পুস্তক সঙ্কলিত হয় নাই। সেগুলি বিভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে প্রচারিত। গোবিন্দ সর্ব্বশেষে যাঁহাদিগের সহিত এই গুলির আলোচনা করিয়াছিলেন, বিধিগুলি তাঁহাদের নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন খণ্ডের মধ্যে প্রহ্লাদ রায়ের ও নন্দলালের রীতনামাই প্রধান। আমরা ক্রমে ক্রমে এই দুইখানি রীতনামাই বঙ্গীয় পাঠকদিগকে উপহার দিব। নিম্নে প্রহ্লাদ রায়ের রীতনামার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

দুরবৈ উদাসী সম্প্রদায়ভুক্ত যোগী। তিনি বলেন, নগরে (১) অবস্থান-কালে গুরুগোবিন্দ সিংহ একদা ব্রাহ্মণ প্রহ্লাদের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কতক-গুলি অনুজ্ঞা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সেই প্রসঙ্গে গুরু বলেন—"গুরু নানকের আশীর্ব্বাদে যে ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছি, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ, আপনাকে তৎসম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিব।—

১। যে শিখ 'টুপি' ব্যবহার করিবে, সে সাত জন্ম কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইবে।

---

(১) ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ গোদাবরীতীরস্থিত নদেড় সহরে দেহত্যাগ করেন। তদবধি নদেড় শিখদিগের নিকট 'গুরুদ্বার' ও 'অবচলনগর' নামে পরিচিত হইয়াছে।

২। যদি কোনও শিখ উপবীত ধারণ করে,

৩। চৌপড় (পাশা) খেলে, এবং

৪। বারস্ত্রী গমন করে, তবে তাহাকে স্বকৃত পাপের ফল ভুগিবার জন্য কোটীবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

৫। শিরস্ত্রাণ অন্যত্র রাখিয়া ভোজন করিলে, শিখ মৃত্যুর পর কুম্ভী-পাকে পতিত হইবে।

৬। যে শিখ (ক) পৃথ্বীর বংশধর মিঁনা সোড়ীদিগের সহিত (২), (খ) মসন্দদিগের সহিত (৩), (গ) মোনিদিগের সহিত (৪), এবং (ঘ) কন্যাহত্যাকারী কুরীমারদিগের সহিত বন্ধু-জন-সুলভ আদান-প্রদান করিবে, এবং

৭। যে শিখ গুরু-প্রচারিত ধর্ম্মমত ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্মমত মান্য করিবে, তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করা হইবে; তাহাদিগের মুক্তির সকল আশা লোপ পাইবে। তাহারা কদাপি শিখ নহে।

৮। যে শিখ আমার হুকুমনামা (আদেশপত্র) অমান্য করে, অথবা শিখদিগের সেবা করে না, সে ম্লেচ্ছসন্তান—মুসলমান।

৯। গুরুর প্রার্থনা পূর্ণ না করিলে,

১০। ধন গুপ্ত রাখিয়া তাহার কথা অস্বীকার করিলে, এবং

---

(২) পৃথ্বী চতুর্থ গুরু রামদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গুরু পিতৃভক্ত কনিষ্ঠ পুত্র অর্জ্জুনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পৃথ্বীর তাহা ভাল লাগিত না। তিনি ভ্রাতার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। একবার অর্জ্জুন পিতাকে কয়েকখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পৃথ্বী তাঁহার স্বাভাবিক বিদ্বেষবশে তাহা লুকাইয়া রাখেন। পরে সে কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িলে, গুরু পৃথ্বীকে ও তাঁহার বংশধরগণকে 'মিঁনা চোর' নামে আখ্যাত করেন। তদবধি পৃথ্বীর বংশধরেরা 'মিঁনা সোড়ী' নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা এক্ষণে 'কোটগুরু', 'সঙ্গতপুর' প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আনন্দপুর ও কর্ত্তারপুর নিবাসী সোড়ীদিগের সহিত ইহাদিগের যথেষ্ট বিভিন্নতা জন্মিয়া গিয়াছে।

(৩) গুরু অর্জ্জুনের প্রবর্ত্তিত গুরু-কর আদায়ের ভার এই মসন্দদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। কালে ইহারা ভ্রষ্টচরিত্র হইয়া পড়ে, এবং গুরু-কর আত্মসাৎ করিতে থাকে; অধিকন্তু শিখ-দিগের উপর অযথা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। গুরু গোবিন্দ সিংহ ইহাদিগের এইরূপ আচরণ জানিতে পারিয়া গুরু-কর-প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং মসন্দদিগকে শিখ-সমাজ-চ্যুত করেন।

(৪) যাহারা মস্তক মুণ্ডন করে, তাহাদিগকে শিখেরা 'মোনি' বলে।

১১। কিছু দান করিবার কল্পনা করিয়া তাহা দান না করিলে, গুরু অসন্তুষ্ট হন। (৫) যাহারা এরূপ পাপ করে, তাহারা শয়তানের কুহকে বদ্ধ হইয়াছে। তাহাদিগকে চুরাশি লক্ষ বার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ-সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করা হইবে।

১২। মৎ-নির্দ্দিষ্ট গুরুগণকে (৬) ও খালসা পন্থী নিহঙ্গ, নির্ম্মলা ও উদাসীদিগকে প্রবঞ্চনা করিলে, অথবা তাঁহাদিগের অযথা নিন্দা করিলে, অনন্ত নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এরূপ পাপীরা ম্লেচ্ছ-সমতুল্য।

১৩। যে রক্ত বস্ত্র পরিধান করে,

১৪। 'দোক্তা' খায়,

১৫। অথবা নস্য গ্রহণ করে, সে এই জগতে ভীষণ শাস্তি ভোগ করিয়া, পরকালে নরক ভোগ করিবে।

১৬। যে 'জপুজী' ও জাপুজী' (৭) পাঠ না করিয়াই আহার গ্রহণ করে, সে নরকের কীট।

১৭। যে প্রাতঃকালে গুরু-স্তোত্র গান করে না, এবং

১৮। সায়ংকালে 'রহিনাস' (৮) না পাঠ করিয়াই আহার গ্রহণ করে, সে প্রকৃত শিখ নহে; তাহার 'শিখগিরি' কেবল বাহিরেই, তাহার সমস্ত পুণ্যকর্ম্মই নিষ্ফল। গুরুর অনুজ্ঞা অমান্য করায় তাহাকে চুরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিতে হইবে। পরমেশ্বর তাহাকে শাস্তি দিবেন।

---

(৫) গুরুর অসন্তুষ্টিবিধান শিখদিগের পক্ষে মহাপাপ। তাহারা গুরুর তুষ্টির জন্য সব করিতে প্রস্তুত ছিল। তৃতীয় বর্ষের 'স্বদেশী' পত্রে মল্লিখিত 'শিখ গুরু' ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'ভাই 'হরপালে'র বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

(৬) পঞ্চ খালসা (শিখ) মিলিত শিখ-সভাই গুরুর প্রতিনিধি। এই সভা গুরুর ন্যায় মান্য। এখানে এইরূপ সভার কথাই বলা হইয়াছে।

'নিহঙ্গ' অর্থে পবিত্রাত্মা। নিহঙ্গ সম্প্রদায় শিখদিগের একটি শাখা।

'নির্ম্মলা' সম্প্রদায় গুরু গোবিন্দের ভক্ত শিষ্য ধর্ম্মসিংহের অনুচরদিগকে লইয়া গঠিত। উদাসী সম্প্রদায় নানক-পুত্র শ্রীচাঁদের অনুচর। নির্ম্মলা ও উদাসীরা শিখ-সম্প্রদায়ের এক একটি শাখা।

(৭) 'জপুজী' ও 'জাপুজী' ব্রাহ্মণের গায়িত্রীর ন্যায়। সাধারণতঃ, 'জপজী' ও 'জাপজী, নামেই এই দুই গ্রন্থ পরিচিত। কিন্তু 'জপুজী' ও 'জাপুজীই' প্রকৃত নাম।

(৮) 'রহিরাস' আদি গ্রন্থের অংশবিশেষ। ইহাতে বিভিন্ন গুরুর স্তোত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

১৯। যে সৎশ্রী অকাল পুরুষের (৯) পূজা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেব-দেবীতে বিশ্বাস করিবে, সে কোনও কালেই স্বচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

২০। যে প্রতিমা পূজা করে,

২১। যে শিখ ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে (১০) অভিবাদন করে, সে ধর্ম্মত্যাগী ও ঈশ্বরের অভিশাপ-গ্রস্ত।

২২। যাহারা মৎ-নির্দ্দিষ্ট গুরুগণের (১১) প্রতিযোগিতা করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহারা সবংশে দগ্ধ হইবে।

২৩। সোড়ীরা গুরু নানক, গুরু অঙ্গদ ও গুরু অমর দাসের বেদী (১২) সকলের উপর কর্ত্তৃত্বভার ন্যস্ত করিয়াছেন। বেদীরা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা তিন পুরুষ পরে সোড়ীদিগকে সকল কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিবেন। (১৩) আমি সোড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যে সোড়ী কিংবা বেদী বংশকে ত্যাগ করিবে, সে মুক্তি পাইবে না। প্রত্যেক শিখই মৎনিয়োজিত কর্ম্মচারিগণকে ও মৎনির্দ্দিষ্ট বিধিগুলিকে মান্য করিবে। তাহারা অন্য দেবদেবীতে বিশ্বাস করিবে না।

২৪। যে স্বীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবে, সে ইহত্র পরত্র যন্ত্রণা ভোগ করিবে, এবং গুরু ও শিখদিগের নিকট দোষী বলিয়া গণ্য হইবে। (১৪)

---

(৯) শিখেরা ঈশ্বরকে 'শ্রীঅকাল' বা 'অকাল' বলে। অকাল শব্দের অর্থ,—অনন্ত, অজ ও অমর। সৎ=নিত্য।

(১০) এখানে 'অপর ব্যক্তি' অর্থে মোগলদিগকেই বুঝাইতেছে, মনে হয়।

(১১) এখানে 'গুরুমঠ' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। পঞ্চখালসা মিলিত ধর্ম্মসভাই 'গুরুমঠ'।

(১২) 'বেদী' ও 'সোড়ী' দুইটি ক্ষত্রিয়-বংশের নাম। নানক বেদী-বংশোদ্ভূত। রামদাস হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ গুরুগণ সোড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ তিরহন এবং তৃতীয় গুরু অমর দাস ভাল্লা বংশীয় ছিলেন। কিন্তু নানক ও অপরাপর গুরুগণ কর্ত্তৃক দীক্ষিত শিখেরা 'বেদী শিখ' নামে পরিচিত; এবং গোবিন্দ কর্ত্তৃক দীক্ষিত শিখেরা 'সোড়ী শিখ' নামে পরিচিত হইতেছে। বেদী-শিখেরা 'সিংহ' উপাধি ধারণ করেন না; কেবল সোড়ী শিখেরাই 'সিংহ' উপাধি ধারণ করেন।

(১৩) এই অংশের অর্থ নিতান্ত অস্পষ্ট।

(১৪) অধুনা শিখেরা নেতৃহীন হইয়া পড়িয়াছে। পরাধীনতার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ তাহারা যথেষ্ট অবনত হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসও আর পূর্ব্বের ন্যায় এক্ষণে অটল

২৫। যে মসজিদ, মোল্লা ও তুর্কদিগের তীর্থস্থানের পূজা করে, এবং

২৬। অপরধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রশংসা করে, সে যথার্থ শিখ নহে। নরকই তাহার যোগ্য আবাস।

২৭। (ক) যাহারা তুর্ককে অভিবাদন করে, (খ) যাহারা মস্তক মুণ্ডন করে, এবং (গ) যাহারা 'টুপি' ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই সর্ব্বথা নরকে বাস করিবার যোগ্য। (১৫)

২৮। যে সপরিবারে সৎশ্রীঅকালের পূজা করে, সে সপরিবারে মুক্তি পায়।

২৯। গুরু ও খালসা সম-ক্ষমতাপন্ন। তাঁহাদিগের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। যে আমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে খালসাতেই আমার প্রকাশ দেখিবে। (১৬)

৩০। যাহাদিগের কর্ণে ছিদ্র আছে, এমন যোগীদিগকে বিশ্বাস করিও না। (১৭)

৩১। তুর্কদিগকে বিশ্বাস করিও না।

৩২। শিখদিগের বিরুদ্ধাচারীরা নরকে যাইবে।

নহে। তাহারা ক্রমে ক্রমে শিখধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের অন্যান্য সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে আস্থাবান হইতেছে। শিখ ধর্ম্মের এই নীরব বিপ্লব সংহৃত করিবার মত শক্তিশালী ব্যক্তির অভাব।

(১৫) ১, ৬গ, ২১, ২৫, ২৬, ৩১ অঙ্কযুক্ত বিধিগুলি দ্রষ্টব্য। এগুলি যে শিখদিগের মোগল-বিদ্বেষ চির-জাগরূক রাখিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। গোবিন্দের এ প্রয়াস বৃথা হয় নাই।

(১৬) শিখদিগকে নব মতে দীক্ষিত করিয়া গোবিন্দ বলিয়াছিলেন,—

'খালসা গুরু সে, ঔর গুরু খালসাসে হৈঁ।
যে এক দুসরা কা তাঁবেদার হৈঁ॥'

অর্থাৎ, 'খালসা গুরু হইতে জাত' এবং গুরুও খালসা হইতে জাত। তাঁহারা একে অপরের রক্ষাকর্ত্তা।' আরও বলিয়াছিলেন,—'যখনই পাঁচ জন খালসা একত্রিত হইবে, সেখানে তিনিও (গুরুও) উপস্থিত থাকিবেন; অর্থাৎ, 'পাঁচটি খালসাই একা গুরুর সমান মান্য।'—ঐতিহাসিক চিত্র, তৃতীয় বর্ষে মল্লিখিত 'গুরুগোবিন্দ সিংহ'—পৃঃ ৪২২ দ্রষ্টব্য।

(১৭) গোরক্ষনাথ যে যোগী সম্প্রদায়ের সংঘটন করেন, তাহারা সকলেই কর্ণে ছিদ্র করে। এ জন্য সাধারণে তাহাদিগকে 'কাণপাটী যোগী' বলে। গোবিন্দ বোধ করি, এই যোগীদিগকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

৩৩। যে গুরু-গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করিবে, সে অভিশাপগ্রস্ত হইবে, এবং ক্রমশঃ অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

৩৪। যাহারা যোগী, জঙ্গম, 'পূজী', সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ ও 'অভিয়াগথ'-দিগের (১৮) মতে কার্য্য করিবে, তাহারা শিখ-সমাজ-চ্যুত হইবে। তাহারা নরকবাসী হইবে। গুরু ও তাঁহার শিষ্যবর্গ ব্যতীত অপর কাহাকেও বিশ্বাস করিও না। খালসা অকাল পুরুষ পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। ইহা অপর গুরুদিগেরও অস্বীকৃত বাক্য নহে। গুরু অঙ্গদ ও গুরু নানকের কথা উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রমাণ দিতে পারা যায়।

৩৫। খালসার অনুশাসন মান্য করিলে ঋদ্ধিমান্ হইবে। অপর দেব-দেবীর পূজা নিষ্ফল।

৩৬। মৎ-প্রচারিত উপদেশাবলী মান্য করিবে। আমার উপদেশ সত্য, অপর সকল উপদেশ মিথ্যা। (১৯)

৩৭। শিখের পহল-(দীক্ষা)-দাতৃগণ কোটী কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাইবেন।

৩৮। যে গুরুর রচনাবলীর ব্যাখ্যা করিবে, সে মুক্তি পাইবেই। (২০)

(১৮) জঙ্গমেরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ফকীর বিশেষ। তাহাদের মস্তকে জটা ও হস্তে ঘণ্টা থাকে। 'পূজী' বোধ হয় 'পুজারি'র অপভ্রংশ। তাহা সত্য হইলে পূজী—হিন্দু পুরোহিত।

অভিয়াগথ—পরিবার ও সম্পত্তি-হীন হিন্দু ফকীর বিশেষ।

(১৯) এইরূপ অনেকগুলি কথা নিতান্তই আপত্তিজনক, সন্দেহ কি? কিন্তু এরূপ শিক্ষা-দানও তৎকালে প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। এক দিকে ধনৈশ্বর্য্যপ্রদায়ী ইস্লাম, অন্য দিকে সদা নিগৃহীত, অত্যাচরিত হিন্দুধর্ম্ম। এই সঙ্কটকালে এইরূপ কথা জোর করিয়া ভক্ত শিষ্যদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। গোবিন্দ এ কার্য্যে বিশেষ সফলও হইয়া-ছিলেন। তিনি এক নব-ক্ষত্রিয় জাতির সংগঠন করিতে গিয়া অন্যান্য হিন্দুদিগের সংস্পর্শ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং তৎপ্রচারিত ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ, তাহা শিখদিগের হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন।

(২০) ভাই মণি সিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অমৃতসরের হরমন্দিরের প্রধান পৌরোহিত্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি গুরু-গ্রন্থদ্বয়ের বিশ্লেষণ করিয়া এক অপূর্ব্ব সংস্করণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি সেই সংস্করণে প্রত্যেক গুরুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলির উদ্ধার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। শিখেরা কিন্তু মণির এ কার্য্যে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে, এবং গুরুগ্রন্থ বিশ্লেষণ করায় গুরুদেহের অবমাননা করা হইয়াছে মনে করিয়া মণির প্রতি যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দান করে। শেষে কোনও কারণে সে আদেশ প্রত্যাহৃত হয়। এই ঘটনা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, সাধারণ শিখেরা গুরুর এই বিধিটি ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই।

৩৯। ক্লান্ত শিখদিগের সর্ব্বাঙ্গ মর্দ্দন করিয়া দিলে, মৃত্যুরাজ যমের কবল হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।

৪০। যে শিখদিগকে ভোজন করাইবে, গুরু তাহার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিবেন।

১৭৫২ সংবৎ (১৬৯৭ খৃঃ) ৫ই মাঘ কৃষ্ণপক্ষ বৃহস্পতিবারে এই অনুশাসনগুলি লিখিত হইয়াছিল। সায়ংকালে রহিরাসের সহিত এইগুলি মনোযোগের সহিত অবশ্যপাঠ্য। যে ইহা সহস্রবার পাঠ করে, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব। যে যেমন বিশ্বাসী, সে সেইরূপ পুরস্কার পাইবে। গুরুর উপদেশ স্বয়ং গুরুর ন্যায় মান্য। কারণ, তাহাই মুক্তি ও পার্থিব সম্মানের জনয়িতা। যে আমার এই ধর্ম্মে অবিচল থাকে, সেই আমার শিখ (অর্থাৎ প্রকৃত শিষ্য); আমি কেবল তাহারই প্রভু। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, সে জীবন-মৃত্যুর কষ্ট হইতে মুক্তি পায়।

'সতি শ্রী অকাল বাহি গুরু পরম বীজ',—ইহাই শিখদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংক্ষিপ্ত মন্ত্র। প্রত্যেক কার্য্যের প্রারম্ভে ও শেষে ও সর্ব্বদাই এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। ইহাই গুরুর অনুজ্ঞা।

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিধিলিপি।

—:০:—

১

পাঠ্যাবস্থা হইতেই সাহেবীআনার প্রতি বামনদাসের বিলক্ষণ ঝোঁক ছিল। বিলাতে গিয়া সিবিলিয়ান অথবা ব্যারিষ্টার হইয়া আসা তাঁহার মত মেধাবী ছাত্রের পক্ষে যে বিশেষ দুরূহ ব্যাপার ছিল, তাহা নহে। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা ও সমাজের কঠোর শাসন তাঁহার বাসনাকে ফলবতী হইতে দেয় নাই। সে জন্য হিন্দুসমাজের উপর বামনদাসের প্রবল আক্রোশ ছিল।

সমাজ-বন্ধনের শেষ গ্রন্থিস্বরূপ বৃদ্ধ পিতার মৃত্যুর পর, ডেপুটীগিরি পদ লাভ করিয়া শ্রীযুক্ত বামনদাস সমাজের এই নিদারুণ ব্যবহারের বিলক্ষণ প্রতিশোধ লইয়াছিলেন;—তাহাকে হাড়ে হাড়ে জব্দ করিয়াছিলেন! অন্ন

ছাড়িয়া খানা এবং ধুতি ও চাদরের পরিবর্ত্তে প্যাণ্ট ও কোট ব্যবহারে তত বিশেষত্ব ছিল না। তিনি সদরের ন্যায় অন্দরের সংস্কার কার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন। কিন্তু অন্তঃপুর তাঁহার এই নব মত তেমন আমোলে আনিল না;—সেখানে এই ঘোরতর বিদেশী জিনিসটা সেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিল না। ক্ষুণ্ণহৃদয় মিঃ চ্যাটার্জ্জি অগত্যা সদরে ক্রমশঃ তাহা সুদে আসলে পোষাইয়া লইলেন।

মিঃ বামনদাস তাঁহার আবলুস-নিন্দিত বপুটিকে কর্পূরশুভ্র প্যাণ্ট-কোটে আবৃত করিয়া যখন ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন বাঁধান হুঁকা মনে করিয়া কোনও কোনও দুষ্ট বালক অলক্ষ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। অবশ্য মিঃ চ্যাটার্জ্জি সেটা জানিতেন না। অথবা জানিলেও মহাজনের বাক্য স্মরণ করিয়া চাপিয়া যাইতেন।

যাহা হউক, মিঃ চ্যাটার্জ্জি ভোজনে, শয়নে (স্বপনে কি না, সেটা ঠিক জানা নাই) আলাপে ও ব্যবহারে পূরা মাত্রায় যে খাঁটী 'সাহেব' হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ ছিল না।

মিঃ বামনদাসের বিচিত্র দেহকান্তি দর্শনে উপরওয়ালা সাহেবদের হৃদয়ে কোন্ রসের সঞ্চার হইত, ইতিহাসে তাহা কিছু লেখে না বটে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্মকুশলতা ও প্রভুপরায়ণতার জন্য সকলেই তাঁহার উপর বিলক্ষণ সন্তুষ্ট ছিলেন। 'জবরদস্ত' হাকিম বলিয়া তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। তাঁহার এজলাস হইতে বিনা দণ্ডে এ পর্য্যন্ত কোনও অপরাধী অব্যাহতি পায় নাই। No conviction no promotion, এই মহামূল্য মন্ত্রটি তাঁহার হৃদয়ে ও মগজে উজ্জ্বল অক্ষরে মুদ্রিত ছিল। দুস্তর রাজকার্য্য-রূপ বারিধির বক্ষে নাবিকের কম্পাস-যন্ত্রের ন্যায় এই মন্ত্রটি ঘনান্ধকারের মধ্য দিয়া তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইত। দুষ্ট লোকে যাহাই বলুক না কেন, অপরাধী ও নিরপরাধ নির্ব্বিচারে, নিতান্ত নিরপেক্ষ ভাবে তিনি যে সকলের প্রতি সমান দণ্ড বিতরণ করিতেন, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বই প্রকাশ পাইত।

মিঃ চ্যাটার্জ্জির পত্নীভাগ্যও মন্দ ছিল না। "ভাগ্যবানের পত্নী মরে, লক্ষ্মীছাড়ার ঘোড়া!" বামনদাসের ভাগ্যবলে দুইবার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। তৃতীয় বারে গোলাপ বৃক্ষের শাখা পীড়ন করিয়া পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ষোড়শী তৃতীয়া গৃহিণীকে ঘরে আনিয়াছিলেন। যে ভাগ্যবান

প্রৌঢ়ের অদৃষ্টে তৃতীয় পক্ষের নবীনা-লাভ ঘটে নাই, তিনি বামনদাসের আনন্দের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না!

জেলায় জেলায় ঘুরিবার পর মিঃ বামনদাস অবশেষে সব-ডিবিসনের ভার পাইয়া আঁধারমাণিকে আসিলেন। কিন্তু স্থানটা তাঁহার তেমন মনঃপূত হইল না। একে ত পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রান্ত; তাহাতে একটিও সাহেব নাই! কেবল বাঙ্গালী! নিরবচ্ছিন্ন ধুতি চাদরের দেশ! বিশেষতঃ, এই ঘোরতর স্বদেশী আন্দোলনের যুগে!

২

পশ্চিম গগনে দিনের আলো নিভিতেছিল! ভাদ্রের আকাশে আজ মোটেই মেঘ ছিল না। বাঙ্গলোর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে মিঃ চ্যাটার্জ্জি বায়ুসেবন করিতেছিলেন। যথাক্রমে নয় ও সাত বৎসরের পুত্রযুগল অদূরে একটা বল লইয়া খেলা করিতেছিল।

মিঃ বামনদাসের পুত্রভাগ্য কিন্তু তেমন প্রসন্ন ছিল না। তিন-বার দারপরিগ্রহের ফলে সবে দুইটিমাত্র রত্ন! এ জন্য চ্যাটার্জ্জি সাহেব যে মনে মনে বিলক্ষণ খুসী ছিলেন, তাহা বোধ হয় কলিযুগের সগর ও ধৃতরাষ্ট্ররূপী পিতারা সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারিবেন।

বাঙ্গলোর পার্শ্ব দিয়া রাজপথ বিসর্পিত; কিন্তু জনহীন! ইদানীং সে পথে কোনও রাখালও গো-পাল সহ চলিতে সাহস করিত না। গোক্ষুরোত্থিত ধূলিজাল ও মূর্খ চাষার মেঠো গানে সাহেবের নির্জ্জন সান্ধ্য ভ্রমণে ব্যাঘাত করিত বলিয়া কি না, তাহা অবশ্য প্রকাশ নাই।

পাদচারণ করিতে করিতে মিঃ চ্যাটার্জ্জি উদ্যানের ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সন্ধ্যার ছায়া গ্রাম ও প্রান্তর আচ্ছন্ন করিয়া দ্রুতপদে পশ্চিমাভিমুখে ছুটিতেছিল। মৌন সন্ধ্যার মুগ্ধ ছবি বামনদাসের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু আজ তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর দেখাইতেছিল।

ক্রীড়াশেষে এক দল পল্লীবালক গৃহে ফিরিতেছিল। এ পথে তাহারা বড় একটা চলিত না। আজ তাহাদিগকে কোলাহলসহকারে হাকিমের বাঙ্গলোর সম্মুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া চ্যাটার্জ্জি কিছু বিস্মিত ও বিরক্ত হইলেন। বালকদিগের দুর্নীতি দিন দিন বাড়িতেছে। মহকুমার কর্ত্তার বাড়ীর সম্মুখ দিয়া চীৎকার করিতে করিতে যাওয়া নিতান্ত শিষ্টাচারবিরুদ্ধ।

গেটের নিকটে আসিয়া বালকেরা পূর্ণকণ্ঠে বলিয়া চলিল, "বন্দে মাতরম্!" তাহারা অন্ধকারে হাকিম সাহেবের মসীনিন্দিত মূর্ত্তি চিনিতে পারে নাই।

পুত্রদ্বয়ও ক্রীড়াশেষে পিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারাও মধুরকণ্ঠে স্বর মিলাইয়া বলিল, "—মাতরম্!"

ছেলে দুইটি স্কুলে পড়ে। এই মন্ত্রধ্বনি তাহাদের অপরিচিত ছিল না।

বামনদাস বিলক্ষণ চটিলেন। তাঁহার বাড়ীর সম্মুখে অসভ্যের ন্যায় চীৎকার! তাহার উপর আবার নিষিদ্ধ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি!

বালকেরা তখন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জির নিষ্ফল আক্রোশ পুত্রযুগলের উপর চরিতার্থ হইল। পিতার নিকট দীর্ঘ 'লেকচার' ও তিরস্কার লাভ করিয়া প্রহৃত কুকুরের ন্যায় কুণ্ঠিতভাবে তাহারা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ঠিক সেই সময়ে দারোগা সলিমুল্লা খাঁ মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে নিয়মিত দৈনিক ভিজিট দিতে আসিলেন।

ক্রুদ্ধ হাকিম উত্তেজিতকণ্ঠে বলিলেন, "দেখ, খাঁ সাহেব, তোমাদের সহরের ছেলেগুলা বড় বেয়াড়া, নিতান্ত অসভ্য, অত্যন্ত অর্ব্বাচীন।"

প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকিয়া নিতান্ত চিন্তাকুলভাবে দারোগা বলিলেন, "তারা হুজুরের কোনরূপ অসম্মান করেছে না কি?"

"অসম্মান করা আর কাকে বলে? আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে চীৎকার, গোলযোগ, বন্দে মাতরম্ ধ্বনি। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ও অভিভাবকেরাও এই সকল বালকের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন বোধ হয়।"

সলিমুল্লা খাঁ বিনীতভাবে বলিলেন, "হুজুর যখন কথা তুল্লেন, তখন স্পষ্ট করে' বলাই ভাল। এখানেও 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' করে' কতকগুলি লোক পাগল হয়ে উঠেছে। তাঁদের অত্যাচারে, চীৎকারে, গোলযোগে গ্রামের দোকানী পশারীরা অস্থির। সব চেয়ে স্কুলের ছেলেদের স্পর্দ্ধাই বেশী। সেদিন আমার ছেলের হাতে একটা বিলাতী পেন্‌সিল ছিল। ক্লাসের ছেলেরা তাইতে তাকে এমন বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিলে যে, বোকা ছেলেটা শেষে পেন্‌সিলটা আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিল। সেই অবধি ছেলেটা সব বিলাতী জিনিস ছেড়ে দিয়েছে। হুজুর, আমরা হলেম সরকারী কর্ম্মচারী, আমাদের ঘরে এ রকম দৃষ্টান্ত ভাল নয়। লক্ষণ বড় মন্দ। প্রতিবিধান দরকার।"

ভূমিতলে সবুট-পদাঘাত করিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "নিশ্চয়ই। তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত কাজ করিলে এ সকল গোলযোগের অনেক প্রতীকার হইতে পারে।"

করে কর ঘর্ষণ করিয়া গদ্গদকণ্ঠে খাঁ সাহেব বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুরের একটু ইঙ্গিত পেলেই হয়। আপনি হলেন মহকুমার কর্ত্তা। আপনার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম। এখন থেকে দেখ্‌বেন, সলিমুল্লা কেমন কাজের লোক।"

দুই কোটের দুই পকেটে বিপুল পুষ্ট করযুগল রক্ষা করিয়া মিঃ বামনদাস বলিলেন, "আর একটা কথা মনে রেখো, আমার বাঙ্গলোর সম্মুখের পথে কেহ যেন কোনরূপ গোলযোগ করিতে না পারে।"

"তা বেশ মনে থাক্‌বে হুজুর। আপনি দেখে নেবেন।"

৩

আঁধারমাণিকের পল্লীভবন, রাজপথ প্রভৃতি আজ পত্র-পল্লব ও বিচিত্রবর্ণ পতাকায় সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। কলিকাতা হইতে কতিপয় দেশপূজ্য নেতা স্বদেশী ও বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন। নব ভাবের উপাসকগণ, গ্রামের ধনী, নির্ধন, যুবক, বৃদ্ধ, সকলে বিরাট সভার অয়োজন করিয়াছিলেন; গ্রাম মহোৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছিল।

সভার কার্য্য শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল। রাত্রির গাড়ীতেই নেতৃগণ ফিরিয়া যাইবেন। স্বেচ্ছাসেবক যুবক ও বালকেরা তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গৃহে ফিরিল।

আজিকার বক্তৃতা ও গানে বালকদিগের হৃদয় নব উৎসাহে ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। মনের আনন্দে রাজপথ বন্দে মাতরম্‌ ধ্বনিতে মুখরিত করিতে করিতে তাহারা বাড়ী ফিরিতেছিল।

হাকিমের বাঙ্গলোর সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া গেলে শীঘ্র বাড়ী পঁহুছিতে পারিবে বলিয়া বালকেরা সেই পথ ধরিল।

প্রত্যেকের হস্তে এক একটি পতাকা। কণ্ঠে মাতৃনাম-গান।

কিন্তু সহসা বালকদিগের উৎসাহে বাধা পড়িল।

এক ব্যক্তি অনুজ্জার স্বরে বলিল, "এই ছোঁড়ারা! গোল কচ্ছিস কেন? শীঘ্র চুপ কর, নইলে এ রাস্তা দিয়ে যেতে পারিবি না।"

লোকটির অঙ্গে পুলিসের পরিচ্ছদ। কিন্তু নূতন উৎসাহ লইয়া বালকবাহিনী গৃহে ফিরিতেছিল। সুতরাং এরূপ অভদ্র ব্যবহারে তাহারা উষ্ণ ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। একটি বালক বলিল, "কে হে তুমি! যেন নবাব খাঞ্জা খাঁ! এটা কি তোমার রাস্তা নাকি? সরকারী রাস্তা—আমরা আলবৎ যাব।"

কনষ্টেবল বালকদিগের মধ্যে অনেককেই চিনিত। ইহাদের অভিভাবকদিগের নিকট হইতে পূজার সময় সে বহু পার্ব্বণী আদায় করিয়াছে। কিন্তু আজ সে তাহাদিগকে চিনিয়াও চিনিতে পারিল না। রাজপথের অন্ধকারবশতঃ কি?

কনষ্টেবল বালকটির হাত ধরিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "চোপ্ বদমাস!"

বালকের দল অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বয়স্ক স্বেচ্ছাসেবকেরা তখন অনেকটা পিছাইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহাতে বালকদিগের উৎসাহ কমিল না। তাহারা গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার, গালাগালি দিও না বল্‌ছি; হাত ছেড়ে দাও।"

সহসা তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, বিপরীত দিক হইতে এক দল কালো কোর্ত্তা আঁটা পাগড়ী-ধারী লোক দ্রুতবেগে আসিতেছে!

তখন তাহারা একটু ভীত হইল, কিন্তু কেহ স্থান ত্যাগ করিল না।

দলের সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং দারোগা মহাশয়। তিনি কনষ্টেবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে মিঞা জান?"

পুলিসের সত্যবাদী ভৃত্য বলিল, "হুজুর, ছেলেরা গোল কচ্ছিল, আমি তাই বারণ করেছিলাম। তাই আমাকে লাঠী মারিতেছে।"

দলের অগ্রবর্ত্তী বালক বলিল, "মিথ্যা কথা।"

দারোগা ধমক দিয়া বলিলেন, "চোপ রও শূয়ার।"

বালকটি নগরের প্রধান উকীলের পুত্র। এরূপ অপমানজনক বাক্য কেহ তাহাকে কখনও বলিতে সাহস করে নাই। সে ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুমি আমাকে গালাগালি দেবার কে? মুখ সামলে' কথা কও।"

পুলিস-কর্ম্মচারী আদেশ করিলেন, "সব শালাকো পাকড়ো।"

এমন সময় স্বেচ্ছাসেবক যুবকগণ গোলযোগ শুনিয়া দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। পুলিসের এরূপ অবৈধ আচরণে তাহারা ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ করিল।

সলিমুল্লার বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া আরও পুলিস আসিয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইল। সংখ্যায় অধিক ও সশস্ত্র পুলিস বালকদিগকে বাঁধিয়া থানায় লইয়া গেল।

৪

সন্ধ্যার সময় বাঙ্গলোয় পঁহুছিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। গ্রামের লোকগুলা আজ তাঁহাকে কি জ্বালাতনই না করিয়াছে। গোটা কয়েক বয়াটে বদমাস ছেলের জন্য যেন সমস্ত গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোকে আদালতে হাজির! 'জামীন! জামীন!' করিয়া আজ তাঁহার কাণ 'ঝালাপালা' করিয়া দিয়াছে। প্রাণের যদি এত মায়া, তবে এমন কাজে আসা কেন? হাঙ্গামে যদি এত ভয়, তবে তেমন কাজ করাই বা কেন? পুলিস সরকারী কর্ম্মচারী; দেশের শান্তিরক্ষক। তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধাইয়া, সরকারী কার্য্যসম্পাদনে তাহাদিগকে বাধা দিলে তাহারা ছাড়িবে কেন?

মিঃ চ্যাটার্জ্জি আজ মাতব্বর গোছের কয়েকটি উকীল মোক্তারকে বেশ দু' কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাদের দোষেই এই গ্রামের বালকেরা এমন দুর্নীতিপরায়ণ হইতেছে, সে বিষয়ের আভাসও দিয়াছিলেন। 'স্বদেশী' 'স্বদেশী' করে' দেশের লোককে ক্ষেপাইয়া পুলিসের সঙ্গে গোলমাল বাধানই বা কেন? আর শেষে বেগতিক দেখিলে পায়ে ধরিয়া সাধাই বা কেন? বুকের পাটা যদি বেশ শক্ত থাকে, না হয় দুই এক রাত্রি হাজত-বাসই করিল।

যাক্, এখন জামীনে বালকদিগকে খালাস দিয়া মিঃ বামনদাস একটু বিশ্রামের সময় পাইয়াছেন! ওঃ কি ভীষণ কলরব!

ভৃত্য বসিবার ঘরে আলোক জ্বালিয়া দিল। আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া হাকিম মহোদয় চায়ের পেয়ালায় মনঃসংযোগ করিলেন। অদূরে অপর কক্ষে বালকেরা পাঠাভ্যাস করিতেছিল। স্কুলের যে শিক্ষক তাহাদিগকে বাড়ীতে পড়াইতেন, আজ হইতে তিনি আর তাহাদিগকে পড়াইতে পারিবেন না বলিয়া পত্র দ্বারা মিঃ চ্যাটার্জ্জিকে জানাইয়াছিলেন। হাকিম সমগ্র গ্রাম-খানির উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া গেলেন।

দ্বারপথে একটি মূর্ত্তি দেখা গেল। কৃশ, খর্ব্ব ও ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যটিকে দেখিবামাত্র মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিলেন।

অত্যন্ত সতর্ক ও কুণ্ঠিত ভাবে খাঁ সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। চারি দিকে চাহিয়া যখন সলিমুল্লা দেখিলেন, তথায় আর কেহ নাই, তখন তিনি সন্তর্পণে একখানি আসনে উপবেশন করিলেন।

"কি খাঁ সাহেব! খবর কি?"

দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশির মধ্যে অঙ্গুলিচালনা করিতে করিতে দারোগা বলিলেন, "আজ্ঞে, হুজুরের কৃপায় খবর সবই ভাল, তবে কি না, নষ্ট দুষ্ট লোকে নানা কথা বলিতেছে।"

সবিস্ময়ে হাকিম বলিলেন, "কি রকম?"

"সকলেই বল্‌ছে, পুলিসের এ রকম কাজটা করা ভাল হয় নি। আর হুজুরের ইহাতে ইঙ্গিত আছে, সে কথা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অনেকেই আলোচনা করিতেছে।"

মিঃ চাটার্জ্জির মুখমণ্ডল গম্ভীর হইয়া গেল। তিনি মৌনভাবে স্থির দৃষ্টিতে উজ্জ্বল দীপ শিখার পানে চাহিয়া রহিলেন।

গলাটা কাশিয়া পরিষ্কার করিয়া লইয়া সলিমুল্লা খাঁ আপক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিলেন, "বর্ত্তমান অবস্থায় হুজুরের সহিত সর্ব্বদা দেখা করিতে আসাও সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতেছে। আমি দারোগা, এবং এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন আপনি। সুতরাং দুষ্ট লোকে কত কথাই হয় ত রটাইবে। এ দিকে স্কুলের ছেলেরা আমার পুত্রটিকে এমন উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, সে আর স্কুলে যাইতে চাহে না। কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন যে, তদন্তে তাঁহারা অন্যান্য বালকদিগের বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ পান নাই; সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা কোনও প্রতীকার হওয়া অসম্ভব।"

মিঃ বামনদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারও অবস্থা প্রায় একইরূপ। হাকিম বলিলেন, "খাঁ সাহেব, আমার ছেলেদিগকে বাড়ীতে পড়াইবার জন্য একটি মাষ্টার দেখিয়া দিতে পার? হিন্দু যদি না পাওয়া যায়, মুসলমান হইলেও আপত্তি নাই।"

সলিমুল্লা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ঐটারই বড় অসুবিধা। লেখাপড়া জানা বেশী মুসলমান শিক্ষক এ গ্রামে নাই। যাঁহারা উচ্চশিক্ষিত, তাঁহারা আমাকে বয়কট করিয়াছেন। আমার অপরাধ, আমি পুলিস-কর্ম্মচারী। দ্বিতীয়তঃ আমি 'স্বদেশী'র আন্দোলনের ঘোর বিরোধী। আগে মুসলমান

বেশ ছিল। এখন লেখা পড়া শিখে তারা হিন্দুর মত একেবারে মাটী হয়ে যাচ্ছে হুজুর!"

খানসামা আসিয়া সংবাদ দিল, "খানা তৈয়ার।"

সলিমুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিলেন, "আর একটা কথা আছে। আপনি একটু সাবধানে থাক্‌বেন হুজুর। শুন্‌তে পেলেম্‌, নগরের কতকগুলি ষণ্ডা যুবক আপনাকে শিক্ষা দিতে চায়। আপনার উপর তাদের ভারী আক্রোশ। আমার উপরেও কম নয়। বিশ্বাস নেই হুজুর, যে রকম দিন কাল পড়েছে, তাতে একটু সতর্ক থাকাই ভাল। বিশেষতঃ, হুজুরের এ অঞ্চলটা একেবারে ফাঁকা। আমার মতে জন কয়েক কনষ্টেবলকে এখানে মোতায়েন রাখ্‌লে মন্দ হয় না। আমি ত হুজুর! চারি জন কনষ্টেবল ছাড়া রাত্রে কোথাও যাই না।"

বাহ্যিক সাহসে ভর করিয়া ঈষৎ উপেক্ষার সহিত হাকিম বলিলেন, "তেমন দরকার দেখি না। তবে তুমি যখন বলিতেছ, তখন যাহা ভাল বোধ হয়, করিও।"

"হুজুর, আর একটা কাজ করিলে আরও ভাল হয়। যদি কাছে সর্ব্বদা একটা অস্ত্র রাখেন, অন্ততঃ শোবার সময়।"

উচ্চহাস্যে কক্ষ মুখরিত করিয়া মিঃ চাটার্জ্জি বলিলেন, "তুমি দেখ্‌ছি বিলক্ষণ ভয় পেয়েছ?"

"আজ্ঞে, তা নয় হুজুর, তা নয়! তবে কি না—তবে কি না, সাবধানের বিনাশ নাই, তাই বল্‌ছিলাম্‌। তা হুজুরের যা অভিরুচি, আমরা গোলাম বই ত নয়!"

প্রকাণ্ড সেলাম ঠুকিয়া দারোগা বিদায় লইলেন।

৫

ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত সকাল বেলাটা বেশ বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মধ্যাহ্নের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। টিপ্‌টিপ্‌ করিয়া তখনও বারিপাত হইতেছিল। ভাদ্রমাসের আকাশ; শীঘ্র বৃষ্টি থামিবার সম্ভাবনাও ছিল না।

বাদ্‌লার দিনে পথের কাদা ও জল ভাঙ্গিয়া ধনীর ও বিলাসীর পুত্রেরা প্রায়ই বিদ্যালয়ে যাইতে চাহে না। অভিভাবকেরাও পাছে জল কাদা ঘাঁটিয়া অসুখ করে ভাবিয়া তাহাদিগকে গৃহের বাহির হইতে দেন না। সুতরাং হাকিম সাহেবের পুত্রদ্বয়ও আজ স্কুল কামাই করিয়াছিল।

পিতা কাছারীতে। কক্ষান্তরে মাতা বর্ষার দিনে ভিজা চুল এলাইয়া দিয়া একখানি উপন্যাস পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভৃত্যগণও তাহাদের বৈঠকখানায় নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছিল। বর্ষার দিনে কোন্ অভাগা চুপ করিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে?

যুবা ও বৃদ্ধের কাছে নিদ্রা যত প্রিয়, বালকদের কাছে তেমন নয়। সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা তাহাদের নিকট অপরিচিত, সুতরাং নিদ্রার মোহস্পর্শে জ্বালা জুড়াইবার প্রয়োজন তাহাদের হয় না!

আকাশের মাঝখানে যে প্রকাণ্ড মেঘখানি দুলিতেছিল, ক্রমশঃ তাহা হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইল। জোরে বৃষ্টি আসিল।

বালক দুইটি এতক্ষণ ছবি লইয়া মত্ত ছিল। কিন্তু চিত্রের ভাণ্ডার শেষ হইয়া আসিলে তাহারা নূতন খেলার আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

পড়িবার ঘরের পার্শ্বেই পিতার শয়নকক্ষ। উভয়ে তথায় প্রবেশ করিল। খেলার অন্য কোনও জিনিস না পাইয়া বড় ছেলেটি পিতার একখানি সরু ভ্রমণযষ্টি লইল। ভ্রাতার হস্তেও তদনুরূপ আর এক গাছি লাঠি দিল। তখন দুই ভাইয়ে যাত্রার অনুকরণে অভিনয়সহকারে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল। এ খেলায় আমোদ আছে। উভয়ে তালে তালে পরস্পরের যষ্টিরূপ অস্ত্রে আঘাত করিতে লাগিল, আর মুখে রণবাদ্যের অনুকরণে শব্দ করিতে লাগিল।

বাহিরে বৃষ্টির ঝম্ ঝম্; কক্ষাভ্যন্তরে লাঠীর ঠুকঠাক শব্দ। বালকদিগের অত্যন্ত উৎসাহ বোধ হইল। জ্যেষ্ঠ রাম ও কনিষ্ঠ রাবণ সাজিয়াছিল। কিন্তু যষ্টিযুদ্ধে রাম বা রাবণের কেহই পরাজিত হইল না। বালক-হৃদয় মিথ্যা অভিনয়েও কেহ কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে চাহে না। সুতরাং রামের নিকট রাবণ কোনক্রমেই পরাস্ত হইল না। তখন যষ্টি ফেলিয়া উভয়ে মল্লযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল।

ভূমিতলে পড়িয়া গেলে আঘাতের আশঙ্কা আছে। বুদ্ধিমান বালকেরা পিতার বিস্তৃত শয্যার উপর যুদ্ধক্ষেত্রে মনোনীত করিল। তার পর উভয়ে উভয়কে আক্রমণ করিল। রাম একবার রাবণের বক্ষের উপর উঠিয়া বসিল, আবার রাবণ রামচন্দ্রকে নীচে ফেলিয়া দিল। এইরূপে উভয় ভ্রাতার মধ্যে রাম রাবণের যুদ্ধাভিনয় হইতে লাগিল।

সহসা জ্যেষ্ঠের হস্তে একটা কঠিন পদার্থের আঘাত লাগিল। ক্ষিপ্র-

হস্তে সে উহা তুলিয়া লইল। বালকের চক্ষে একটা আনন্দদীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—জয়াশা আর সুদূরপরাহত নহে!

তখন সে উহা কনিষ্ঠের দিকে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "দুর্ম্মতি রাবণ, এইবার তোকে যমালয়ে পাঠাব!"

রাবণ তখন রামের কবল হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। সে ভ্রাতার হস্তস্থিত পিস্তল লক্ষ্য করে নাই।

রাম দেখিল, রাবণ এইবার তাহাকে বুঝি মাটীতে ফেলিয়া দেয়। তখন সে দৃঢ়বলে রাবণের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিল, "তবে আর রক্ষা নাই! এই দেখ—"

সহসা দুড়ুম্ করিয়া পিস্তলের শব্দ হইল। সঙ্গে সঙ্গে ধূমজালপরিপূর্ণ কক্ষের মধ্য হইতে শিশুকণ্ঠের তীব্র আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল।

৬

আদলাত-গৃহ লোকে লোকারণ্য। পুলিসকে প্রহার করিবার অপরাধে যে সকল বালক অভিযুক্ত হইয়াছিল, আজ তাহাদের বিচারের দিন। মিঃ চ্যাটার্জ্জির এজলাসেই বিচার হইতেছে। ফলাফল দেখিবার জন্য গ্রাম ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়াছে।

অভিযুক্ত বালকেরা কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই বয়ঃক্রম দ্বাদশ হইতে পঞ্চদশ। কেবল দুইটি বালকের বয়স সপ্তদশ হইবে।

সরকার পক্ষের উকীল ওজস্বিনী ভাষায় বালকদিগের অপরাধের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিতে লাগিলেন। তাহারা যে অতি ভয়ঙ্কর পাষাণ্ড, নরাধম ও সমাজের কণ্টকস্বরূপ, সরকারী উকীল হাকিমের হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল করিবার জন্য বহু বাক্য ও অলঙ্কার প্রয়োগ করিলেন।

দর্শক-সম্প্রদায় উকীলের ওজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি কিরূপ সন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না।

বাদী পক্ষের উকীলের বক্তৃতা শেষ হইলে আসামী পক্ষের উকীলগণ একে একে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। পুলিস পক্ষের সাক্ষীদিগের সাক্ষ্যের মধ্যে অনৈক্য ও নানারূপ ভ্রান্তি ও প্রমাদের উল্লেখ করিলেন। বালকদিগের নৈতিক চরিত্রের বহুল প্রশংসাপত্র দাখিল হইল। সর্ব্ব বিষয়েই যে

এই সকল সুকুমারমতি বালক প্রশংসার যোগ্য, অনেক সম্ভ্রান্ত গণ্য মান্য ব্যক্তি সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিলেন। আসামী পক্ষের উকীলগণ সেই সকল বিষয় লইয়া বক্তৃতা করিলেন।

বক্তৃতা শেষ হইলে হাকিম রায় লিখিতে বসিলেন।

দর্শকবৃন্দ নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

রায় লেখা শেষ করিয়া হাকিম বলিলেন, "আমি বিচার করিয়া দেখিলাম, বালকেরা অপরাধী। অপরাধ যেরূপ গুরুতর, আমি তদনুরূপ দণ্ড দিতে পারিতাম। কিন্তু ইহারা এখনও বালক, এবং ইহাদের প্রথম অপরাধ বলিয়া এ যাত্রা দণ্ডের পরিমাণ অল্প হইল। আমি প্রত্যেককে পনর ঘা বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।"

দর্শক দল রায় শুনিয়া স্তম্ভিত হইল।

হাকিম লেখনী রাখিতে যাইতেছেন, এমন সময় আদালত-গৃহ-মধ্যস্থ জনতা সহসা চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক ব্যক্তি রুদ্ধনিশ্বাসে ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইল। চাপরাশী তাহাকে বাধা দিতে যাইতেছিল, কিন্তু হাকিম সাহেবের প্রধান খানসামা দেখিয়া সে পথ ছাড়িয়া দিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন, "কি হয়েছে শুকুল?"

হাঁপাইতে হাঁপাইতে খানসামা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "বড় খোকাবাবু ছোট খোকাবাবুকে পিস্তলের গুলিতে—"

রায়ের খাতা ও লেখনী ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া মিঃ চ্যাটার্জ্জি একলম্ফে নীচে নামিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মরা মানুষের মুখের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ জনতা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। কিন্তু একটি সহানুভূতি-সূচক শব্দ কাহারও মুখ হইতে নির্গত হইল না।

হায়! নিষ্ঠুর বিধিলিপি!

সহযোগী সাহিত্য।

জার্ম্মাণ উপকথা।

গত জুলাই মাসের 'নভেল ম্যাগাজিনে' তিনটি জার্ম্মান উপকথা প্রকাশিত হইয়াছে। মিস্ মেরী মেসিনার এই গল্পগুলি সকল সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়া জন-সমাজে প্রচার করিয়া-

ছেন। কুমারী মেসিনার স্যাক্‌সনীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি ড্রেসডেনে বাস করিতেছেন। ড্রেসডেনের প্রবাসী ইংরাজ সমাজে জর্ম্মাণ ভাষা, সাহিত্য ও ললিত কলার নিপুণা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া তাঁহার প্রখ্যাতি আছে। কুমারী কয়েকখানি নাটক ও কতিপয় লোকপ্রিয় গীত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীপ্রসূত বিবিধ প্রবন্ধাবলী ও সমালোচনা জর্ম্মাণ সাময়িকপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছে। কথাসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্লেষণী রচনাবলী তৎপ্রণীত 'Ring of the Nibelungs' নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ড্রেসডেনের রঙ্গালয়ে কুমারী মেসিনারের গীতিনাট্যের আরম্ভ-কালে ঐ রচনাবলী মুখবন্ধরূপে পঠিত হইয়া থাকে। এই প্রবন্ধনিচয়ের রচনা করিয়া তিনি জনসমাজে যশস্বিনী হইয়াছেন। তাঁহার উপকথাগুলি আমেরিকার স্কুল কলেজে জর্ম্মাণ পাঠ্যরূপে অধীত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে একটি গল্পের অনুবাদ প্রদান করিলাম।

হিরণ্য হৃদয়।

কনরাড গরীব। তাহার সন্তান অনেকগুলি—সাতটি ছেলে, একটি মেয়ে। কনরাডের সন্তানভাগ্য প্রসন্ন হইলেও তাহার লক্ষ্মীভাগ্য ছিল না। কি করিয়া পরিবারের অন্নসংস্থান করিবে,—ভাবিয়া সে আকুল হইয়াছিল। একদিন সে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করিতেছিল। কাজ করিতে করিতে কনরাড ভাবনাক্লান্ত ম্লানমুখে স্ত্রীকে বলিল, 'বল দেখি, ছেলেদের উপায় কি হবে? আমার অর্থ নাই যে, তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিই। ছেলেরা মেয়ে হইলে এত ভাবনা হইত না। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শিখিতে হয় না।'

এমন সময় কে দ্বারে আঘাত করিল। কনরাড দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া গেল। দ্বার মুক্ত হইলে এক তুষারধবলশ্মশ্রু খর্ব্বদেহ বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তিনি পরিচ্ছদ হইতে হিমবিন্দু সকল ঝাড়িয়া ফেলিতেছিলেন।

বৃদ্ধ বলিলেন,—'শুভ সন্ধ্যা। বাপু সকল, আজি রাত্রির মত আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে? বড় দুর্য্যোগ, ভয়ানক অন্ধকার, পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।'

কাঙ্গাল কনরাড ও তাহার স্ত্রী সাদরে বৃদ্ধকে কুটীরে স্থান দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা বৃদ্ধের আহারের আয়োজন করিতে পারিল না।

কনরাড বলিল, 'আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে আহার দিতে পারিতাম, কিন্তু হায়, ঘরে কিছুই নাই। ছেলেদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল, তাহারা সব আলু খাইয়া ফেলিয়াছে।'

সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধেরও আহারের প্রয়োজন ছিল না। উভয়ে আপনাদিগের তৃণশয্যার এক পার্শ্বে বৃদ্ধের শয্যা রচনা করিয়া দিল। তাহার পর শীঘ্রই সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ গৃহস্থকে বলিলেন, 'আমাকে একবার তোমাদের ছেলেগুলিকে দেখাও। তোমরা আমাকে বড় যত্ন করিয়াছ, আমি তোমাদের প্রত্যেক পুত্রকে একটি করিয়া উপহার দিয়া যাইব।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্বামী স্ত্রী তাঁহাকে ছেলেদের নিকট লইয়া গেল। সাতটি ছেলে শয্যার উপর সারি সারি ঘুমাইতেছিল। বৃদ্ধ তখন পকেট হইতে একটা সোনার 'ড'াট' বাহির

করিয়া মৃদুস্বরে কত কি মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর, লোকে যেমন মোম দিয়া নানাবিধ জিনিস তৈয়ার করে, তিনিও তেমনি সেই সোনার ডাঁট হইতে নানা প্রকার দ্রব্য গড়িলেন।

বড় ছেলের মাথায় একটি সোনার মুকুট রাখিয়া তিনি বলিলেন,—'একদিন তুমি রাজা হইবে; দেখিও, কেহ যেন তোমার মুকুট চুরি না করে; সাবধান, তুমি যেন মুকুটটি হারাইও না।' দ্বিতীয় ছেলেকে একখানি সোনার তরবারি দিয়া বলিলেন,—'এই তরবারিহস্তে পৃথিবী জয় কর।' তার পর তৃতীয় ছেলেটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—'আমি তোমায় বর দিলাম, তুমি গায়ক হইবে।' এই বলিয়া তিনি ছেলেটিকে একটা সোনার বীণা দিলেন। চতুর্থ ছেলেটির নিকট গিয়া বলিলেন,—'তোমার বাহু দু'টি বলিষ্ঠ, ঐ বাহুযুগলের সাহায্যে পরিশ্রম করিও; তোমার প্রচুর কাঞ্চন লাভ হইবে।' এই বলিয়া তাহাকে একটা সোনার হাতুড়ী দিলেন। পঞ্চম শিশুকে বৃদ্ধ বলিলেন,—'তুমি বণিক হইবে।' এই বলিয়া তাহাকে এক তোড়া মোহর দিলেন। ষষ্ঠ শিশুকে বলিলেন, 'তুমি নাবিক হইবে।' তাহাকে একটা সোনার জাহাজ দিলেন। তার পর তিনি সপ্তম বালককে বলিলেন, 'তুমি কৃষক হইবে। নহিলে ইহারা সব খাইবে কি?' এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটা সোনার লাঙ্গল দিলেন।

তার পর বৃদ্ধ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, কনরাডের স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল, এবং কাতর স্বরে বলিল,—'আমরা ছোট জার্টির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; সে ঘরের ঐ কোণে ঘুমাইতেছে। এই অকর্ম্মণ্য ছেলেগুলো সব পাইল, সে কিছুই পাইল না। হে দয়াময় অপরিচিত! তাহাকেও দয়া করিয়া একটি উপহার দিন—একটা খুব সুন্দর জিনিস!' বৃদ্ধ গম্ভীরমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'তার কথা আগে মনে করা তোমার উচিত ছিল; এখন আর সময় নাই। সমস্ত সোনা আমি দিয়া ফেলিয়াছি। তা, তোমার ছোট খুকীকে দেখাও।' যে কোণে মেয়েটি শুইয়াছিল, কনরাডের স্ত্রী বৃদ্ধকে সেখানে লইয়া গেল। খুকীর সেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে অপরিচিতের মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটি এত সুন্দর, আর তাহার মা একটা উপহারের জন্য এমন কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল যে, কিছু নাই বলিয়া বৃদ্ধ দুঃখিত হইলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার সব পকেটে কত খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে সোনার ডাঁটের একটা অতি সরু টুকরা পাওয়া গেল। বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ সোনার টুকরার পানে চাহিতে লাগিলেন। টুকরাটি এত ছোট যে, তাহাতে একটা চামচে কি একটা অঙ্গুলিও নির্ম্মাণ করা যায় না। হঠাৎ বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—'ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে! আমি এই সোনায় একটা ছোট সোনার হৃদয় গড়িয়া খুকীকে দিব;—সে তাহার ভাইদের চেয়েও ধনবতী হইবে।'

এই বলিয়া তিনি একটা সোনার হৃৎপিণ্ড গড়িয়া মেয়েটির বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন, 'তুমি কখনও এটিকে হারাইও না।'

পতি পত্নী দুই জনে এই সব উপহারের জন্য বৃদ্ধকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি উভয়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

বড় ছেলেটি, যে রাজা হবে,—সে অনেক দূরদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা রাজ্য পাইল। নিকটে আর রাজ্য ছিল না। দ্বিতীয় বালকটি সাহসী সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেল। ঘরে বসিয়া গায়ক ছেলেটির যশোলাভ হইল না। সে রাজাদের দরবারে গিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাজদরবারে তাহার খুব আদর হইল; সেখানে তাহার সম্মান-লাভ ঘটিল। নাবিক ছেলেটি একটা জাহাজের কাপ্তেন হইয়া সমুদ্রযাত্রা করিল, এবং তাহার সহোদরের জন্য রাশি রাশি পণ্য লইয়া আসিল। তাহার ভাই একটা বড় বাণিজ্য-প্রধান নগরে বণিক হইয়াছিল। কেবল কারিকর ছেলেটি আর কৃষক ছেলেটি গ্রামের কাছে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার ছোট ভগিনীটি তাহার মাতা পিতার কাছে রহিল। তাঁহাদিগের পীড়া হইলে সেবা করিতে লাগিল। প্রথমে কনরাড মরিল; তাহার পর কনরাড-গৃহিণীও মরিয়া গেল। পিতামাতার মৃত্যুর পর বালিকা কুটীরেই রহিল। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের সাহায্য করিতে লাগিল।

এক দিন তাহার কারিকর ভাই কুটীরে আসিল। একটা ভারী হাতুড়ীর আঘাতে তাহার হাত ছেঁচিয়া গিয়াছিল। সে কাজ করিতে পারিল না,—বড় যাতনা পাইতেছিল। জার্টি তাহার হাত বাঁধিয়া দিল, আর এমন শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, সে শীঘ্রই সারিয়া উঠিল। ইহার অল্প দিন পরে তাহার কৃষক ভাই আসিয়া তাহার দুঃখকাহিনী বলিল। তাহার গোলা পুড়িয়া গিয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে বীজ-শস্য সব নষ্ট হইয়াছে। লক্ষ্মী বোন ভাইয়ের জন্য প্রতিবেশীদের নিকট শস্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। সে আপদ বিপদে সকলকে সাহায্য করিত বলিয়া সকলেই প্রসন্নচিত্তে তাহাকে শস্য দিল। গরীব কৃষক এই প্রকারে বিপদ হইতে মুক্ত হইল; আবার তাহার ভাগ্য ফিরিল।

এই ঘটনার পর অধিক দিন যাইতে না যাইতেই আর দুই ভাই তাহার নিকট দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিতে ও পরামর্শ লইতে আসিল। কাপ্তেনের জাহাজ ডুবিয়া যাওয়াতে সওদাগরের সমস্ত পণ্য নষ্ট হইয়াছিল।

জার্টি চমৎকার সূতা কাটিতে পারিত। অনেক বৎসর ধরিয়া সে শণের এমন চিকণ সূতা কাটিয়াছিল যে, সেগুলি খাঁটী রেশমের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছিল। জার্টি দুই ভাইকে সেই সূতা দিল। তাহারা নগরে গিয়া সূতা বেচিয়া এত টাকা পাইল যে, আবার পূর্ব্বের মত ব্যবসায় চালাইতে লাগিল।

অনেক দিন তিন বড় ভাইয়ের কোনও খবর নাই। একদিন রাত্রিতে এক জন দীন হীন ক্লান্ত পথিক কুটীরের দ্বারে আঘাত করিল। তাহার কাছে একটা শীর্ণ পত্রমুকুট ও একটা ভাঙ্গা বীণা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। মুকুট ও বীণা দেখিয়া জার্টি তার সেজ দাদাকে চিনিল। তাহার মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন—গান গাহিবার শক্তি তাহার আর ছিল না। জার্টি ভাঙ্গা বীণা এক জন নিপুণ কারিকরের কাছে লইয়া গেল। সে বীণাটি মেরামৎ করিয়া তাহাতে নূতন তার লাগাইয়া দিল।

আবার যখন বসন্ত আসিল, পাখীরা গান ধরিল, তখন পাখীর গানে গায়কের মনে আবার

বীণা বাজাইয়া গান করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। সে বীণার তারে ঘা দিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল। দেখিল, বীণার নিক্বণ তেমনই মনোহর, কণ্ঠ তেমনই মধুর! না, বীণার ধ্বনি ও কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোহর—স্বর-সপ্তক পূর্ব্বাপেক্ষা গাম্ভীর্য্যময় ও পূর্ণোচ্ছ্বাসে দৃপ্ত। গায়ক ভগিনীকে ধন্যবাদ দিয়া পূর্ব্বের মত তাহাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অধিক দিন তাহাকে একাকিনী থাকিতে হইল না। তাহার মেজ ভাই যুদ্ধে আহত হইয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিল। তার পর কত দিন কত রাত্রি অবিরাম সেবার পর সে আরোগ্য লাভ করিল।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা রাজার দুর্গতি অধিক হইয়াছিল। সে সোনার মুকুট হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল। প্রজারা রাজাকে তাড়াইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়াছিল। কাজেই সেও ভগিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল। জার্টি দাদার উপকার করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কি উপায়ে সে দাদার উপকার করিতে পারিবে,তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভাই আবার রাজা হইতে চায়; বোনের ত রাজ্য নাই যে দিবে? তাই সে রাজ্য খুঁজিতে বাহির হইল।

অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া সে একটা নূতন দেশে আসিয়া পঁহুছিল, এবং একটি সুন্দর বাগানের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। বাগানের দরজা খোলা ছিল। সে পথ ধরিয়া বাগানের ভিতর গেল, এবং একখানি আসনে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল, সম্মুখে এক জন পুরুষ, তাহার মাথায় সোনার মুকুট ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পুরুষটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁ গা, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? কি চাও?' জার্টি ভয়ে ভয়ে বলিল, 'রাজা! আমার এক ভাই আছে, তিনি তোমার মত এক সময় রাজা ছিলেন, এখন তাঁর রাজ্যও গিয়াছে, মুকুটও গিয়াছে। আমি একাকিনী তাঁর জন্য একটা নূতন রাজ্য খুঁজিতেছি।' রাজা সুন্দরী কোমলতাময়ী বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—বেশ, সেটা শক্ত কাজ নয়;—এই রাজ্যের পরে একটা রাজ্য আছে; সেখানকার প্রজারা এক জন রাজা খুঁজিতেছে। কিন্তু তোমার ভাইয়ের একটা মুকুট—একটা সোনার মুকুট চাই ত?'

জার্টি প্রফুল্লমনে বলিল,—'যদি কেবল তাহাই হয়, আমি তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিব। যে বুড়া তাঁহাকে সোনার মুকুট দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে একটা সোনার ছোট হৃৎপিণ্ড দিয়াছিলেন। আমি সেটি তাঁহাকে দিব। বোধ হয়, ইহাতে একটা সোনার মুকুট গড়িয়া লইতে পারিবেন।' এই কথা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন।

'তবে এত দিন ধরিয়া আমি যাহাকে খুঁজিতেছিলাম, তুমিই সেই কন্যা! তোমার কাছে স্বর্ণ-হৃদয় আছে। আমি আর কাহাকেও আমার রাণী করিব না; সেই জন্য এত দিন প্রতীক্ষা করিয়া আছি। কতকগুলি কন্যা আমাকে বলিয়াছিল, তাহাদের সোনার হৃদয় আছে। কিন্তু কাছে আসিলে চাহিয়া দেখিয়াছি, তাহাদিগের হৃদয় খাঁটী সোনার নয়। তুমি আমাকে তোমার স্বর্ণ-হৃদয় দান কর। আমি সে হৃদয়খানি এমন যত্ন করিয়া রাখিব যে, তার কোনও অমঙ্গল হইবে না। আমি তোমার ভাইকে আমার পুরাণ মুকুটখানি দিব;—এখনও সেটি ঝক্ ঝক্ করিতেছে; তবে মুকুটটি একটু নুইয়া গিয়াছে।'

এই কথা শুনিয়া বালিকা খুব আনন্দিত হইল, এবং রাজাকে আপনার সোনার হৃদয়খানি দান করিল। রাজা আজীবন সেই হিরণ্য-হৃদয়টি যত্নে রাখিয়াছিলেন। কন্যার ভাই পুরাণ মুকুট পাইয়া পাশের রাজ্যে রাজা হইল।

ভগিনীর বিবাহের সময় সাত ভাই বিবাহ দেখিতে আসিল। বোনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য রাশি রাশি বহুমূল্য উপহার আনিল। বালিকার গায়ক ভাই হিরণ্য-হৃদয়শালিনী ভগিনীর বিবাহের সময় একটি অতি চমৎকার গান গাহিয়াছিল। বিবাহের ভোজসভা হইতে আসিবার সময় তাহারই মুখে আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছি।

সাহিত্য-পরিষদ।

আজ ২১শে অগ্রহায়ণ বাঙ্গালীর স্মরণীয় দিন;—বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ইতিহাসে, জাগরণের উজ্জ্বল পরিচ্ছেদে, ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান থাকিবে। বাঙ্গালীর এই মাতৃমন্দির,—নবনির্ম্মিত সারস্বত-নিকেতন,—মার পবিত্র দেউল আমাদের জাতীয় তীর্থ, কে তাহা অস্বীকার করিবে? বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ এই মহাতীর্থে সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয় সিদ্ধি ও কাম্য ফল লাভ করিবে। আজ বাঙ্গালী যে কল্যাণ-কল্পতরুর প্রতিষ্ঠা করিলেন, ভবিষ্যতের কোনও মঙ্গলময় মুহূর্ত্তে তাহার ফল ফলিবে। নব ভাবে অনুপ্রাণিত,—নূতন আশায় উদ্দীপিত,—মনুষ্যত্বে প্রভাবিত,—নিষ্কাম-কর্ম্মের ও স্বদেশ-ধর্ম্মের পুণ্যমহিমায় সমুদ্ভাসিত ভবিষ্যতের বাঙ্গালী সেই অমৃত ফলের অধিকারী হইয়া মর-জগতে অমরতা লাভ করিবে। আজ সাধনার তপোবনে বর্ত্তমান যুগের সাহিত্য-সাধকগণ যে 'অগ্নিশরণে'র প্রতিষ্ঠা করিলেন,—এক দিন সেই পবিত্র সারস্বত আশ্রমে ভারতের ভারতী আবির্ভূত হইয়া বরাভয়ে বাঙ্গালীকে ধন্য ও কৃতার্থ করিবেন। বাঙ্গালী এই সারস্বত মন্দিরে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করুন,—সারস্বত সাধনায় ধন্য ও কৃতার্থ হউন। এই ক্ষুদ্র মন্দির নব-ভারতের ভাবকেন্দ্রে—হোমশালায় পরিণত হউক। এই পবিত্র মন্দিরে ভারতবাসীর পথপ্রদর্শক বাঙ্গালী সেই মহাভাবের সাধনা করুন;—কন্যাকুমারী হইতে তুষারকিরীটী হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত সেই মহাভাবে অনুপ্রাণিত, উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠুক।

বাঙ্গলা সাহিত্য নব-ভারতের ভাবগঙ্গার পবিত্র উৎস—গোমুখীর অমর নির্ঝর। মাতৃমন্ত্রের ঋষি অমর বঙ্কিমচন্দ্রের যে 'বন্দে মাতরম্' মহামন্ত্রে

আজ ভারতভূমি মুখরিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে, বাঙ্গালার সাহিত্য, বাঙ্গালীর 'আনন্দমঠ' তাহার মূল প্রস্রবণ; বাঙ্গালী সে জন্য আত্মপ্রসাদ, গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিতে পারে।—হে বঙ্গের সাধক! বাণীর উপাসক! সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার বিপুল দায়িত্বও তোমার। তুমি যদি এই সাধন-মন্দিরে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পার,—তাহা হইলে, বাঙ্গালীর এই গৌরব যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর জাজ্বল্যমান থাকিবে। আর্য্যাবর্ত্ত আবার নব-গৌরবে উদ্ভাসিত, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে প্রভাবিত, সত্য ও সুন্দরের মহিমায় অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা লাভ করিবে। কর্ম্মহীন, ধর্ম্মহীন, সত্যহীন ভারতবাসী জ্ঞানের, ধর্ম্মের ও সত্যের মহিমায় মণ্ডিত হইয়া আবার বিশ্বের বিরাট-সভায় আপনার স্থান অধিকার করিবে।

উনিশ বৎসর পূর্ব্বে যৌবনের প্রারম্ভে "সাহিত্যে"র সূচনায় লিখিয়াছিলাম,—"জাতীয় জীবনের উন্নতি সাহিত্য-সাপেক্ষ।" যাহা সত্য ও সুন্দর, তাহাই সাহিত্যের প্রাণ। আজ যৌবনের শেষে, নব-ভারতের স্বদেশী যুগে, প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝিয়াছি, সাহিত্য ভিন্ন অন্য ক্ষেত্রে জাতির জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।—রাজনীতির রণক্ষেত্রে জাতীয়তার স্থান নাই। স্বার্থের সংঘর্ষ ও বিজেতা ও বিজিতের বিষম দ্বন্দ্বও জাতীয়তার উৎস নহে। বিশাল ও বিপুল, উদার ও পবিত্র সাহিত্যই মানবকে উদ্বুদ্ধ, উন্নত ও জাতীয়তায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। সাহিত্যই মানবের উন্নতির সোপান, মুক্তির পথ;—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

যাহা সত্য ও সুন্দর, সাহিত্য তাহার রত্নাকর। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের উপাসক। সাহিত্য সত্য ও সুন্দরের একনিষ্ঠ সাধক। সাহিত্যের সাধনা, সৃষ্টি ও পুষ্টি জাতীয়তার, মানবতার ও মনুষ্যত্বের কামধেনু। যাহা সত্য ও সুন্দর নহে, তাহা কখনও 'শিব' হইতে পারে না। আমরা সত্য ও সুন্দরের উপাসনায় বিরত হইয়া, সত্য ও সুন্দরের মহিমা বিস্মৃত হইয়া, অধঃপাতের অন্ধকূপে পতিত হইয়াছি,—অবসাদে মুমূর্ষু হইয়াছি। যাহা সত্য নহে, তাহা সুন্দর হইতে পারে না। যাহা সুন্দর নহে, তাহাও সত্য হইতে পারে না। যাহা একাধারে সত্য ও সুন্দর,—তাহাই 'শিব'। সেই 'সত্যং শিবং সুন্দরং' ভারতের বরণ্যে দেবতা;—এবং সাহিত্যই সেই দেবতার সুবর্ণ-দেউল, আমরা যেন কখনও তাহা বিস্মৃত না হই। বাঙ্গালী! আবার সাহিত্যের তপোবনে সত্য ও সুন্দরের উপাসনায়,

সাধনায় প্রবৃত্ত হও,—সাহিত্যকে 'সত্যং শিবং সুন্দরং' বলিয়া বরণ কর, অসত্যের কুহেলিকা ভেদ করিয়া ভারতে সত্যের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হউক,—কুৎসিতের চিতাগ্নিশিখার উজ্জ্বল প্রভায় সুন্দরের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক।

এই পবিত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিবার জন্য ভিক্ষাপ্রার্থী হইয়া বাণীর বরপুত্র-গণ কমলার প্রিয়-পুত্রগণের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন।—তাঁহারা দরিদ্র সাহিত্য-সেবী ও সাহিত্যের ভক্তগণের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গলার সারস্বত সমাজের পক্ষ হইতে বাঙ্গলার প্রাচীন রাজধানী—বাঙ্গলার অতীত গৌরবের শ্মশান,—বাঙ্গলার অতীত স্মৃতির ভগ্নস্তূপ—সোনার বাঙ্গলার শেষ স্বপ্ন—মুর্শিদাবাদে স্বনামধন্য মহারাজ শ্রীলশ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের কমলালয়ে ভিক্ষাভাণ্ডহস্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম। মহারাজ বাহাদুর আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। যে ভূমিখণ্ডের উপর এই মাতৃ-মন্দির,—বাঙ্গালীর এই অগ্নিশরণ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভূমিখণ্ড দান করিয়া তিনি বাঙ্গালীকে ও বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তাহার পর বাঙ্গলার অনেক ধনকুবের তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদের ভিক্ষাভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছেন।—মন্দির-পত্তনের পর, পরিষদের চিরসহায়, বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের অকৃত্রিম বন্ধু, সহৃদয়, লোক-হিতব্রত লালগোলার রাজা শ্রীলশ্রীযুত যোগেন্দ্রনারায়ণ রাও মহোদয় এই বিশাল 'হলে'র সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।—বাঙ্গালী কখনও ইঁহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে না। তাঁহারা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের ভাজন হইয়াছেন। দীন সাহিত্যসেবীর ধন্যবাদ অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু ভবিষ্যদ্বংশের ভাবী মনুষ্যত্বের ও কল্যাণের কল্পনা সেরূপ তুচ্ছ নহে। তাঁহারা সেই কল্পনা ও মার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন,—আমাদের ধন্য করিয়াছেন।

কিন্তু এই শুভ দিনে আমাদের আর একটি প্রার্থনা আজ আপনাদের গোচর করিবার প্রলোভন ও দুঃসাহস আমরা কিছুতেই দমন করিতে পারি-তেছি না। হে কমলার প্রিয়পুত্র সম্প্রদায়! আপনারা দরিদ্র সাহিত্য-সেবীকে বসিতে দিয়াছেন,—এখন যদি আমরা শুইতে চাই,—আশা করি, তাহা হইলে, বিস্মিত বা বিরক্ত হইবেন না! আপনারা ভারতীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখন আমাদের,—আপনাদের—সমগ্র দেশের—

সমগ্র ভারতের যিনি মা,—সেই ভগবতী সরস্বতীর চিরন্তন সেবার ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমরা নিঃস্ব, দীন, নিঃসম্বল;—শুষ্ক জীর্ণ বিল্বদল ও গঙ্গোদক আমাদের পূজার সম্বল।—মার পূজার নৈবেদ্য—মার আরতির সুবর্ণ-প্রদীপ দরিদ্র সাহিত্যসেবীর কুটীরে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ভগবতী ভারতী দরিদ্র সাহিত্যসেবীর জননী,—কিন্তু তিনি ভারতের রাজরাজেশ্বরী।—আমরা গঙ্গাজলেই তাঁহার নিত্য-সেবা নির্ব্বাহ করি। কিন্তু আজ আপনারা যে সুন্দর মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন, সে মন্দিরে মার পূজায় কি শুষ্ক বিল্বদল ও গঙ্গাজলই বাঙ্গালীর চির-সম্বল থাকিবে? তাই আজ সমগ্র সাহিত্যসেবীর পক্ষ হইতে আমরা আপনাদের রাজশ্রী ও লক্ষ্মীশ্রীর নিকট প্রার্থনা করিতেছি,—আপনারা মার নিত্য-সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিন;—মার নিত্য-পূজার জন্য স্থায়ী 'সংস্থানে'র ভার গ্রহণ করুন।—অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকার চিরস্থায়ী ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা কি বাঙ্গালার ধনকুবেরগণের সাধ্যায়ত্ত নহে? হে কমলার প্রসাদ-পূত বঙ্গের অভিজাত-সম্প্রদায়! আজ আপনারা মার চরকমলে সোনার কমল ঢালিয়া দিন—সাহিত্যসেবীর শুষ্ক বিল্বদলে কমলার কাঞ্চন-রশ্মি প্রতিফলিত হউক,—লক্ষ্মী সরস্বতীর চির-বিবাদের প্রবাদ মিথ্যাবাদে পরিণত হউক।

এই সাহিত্য-মন্দিরে আপনাদের প্রসাদে আমরা অতীত ইতিহাসের জীর্ণ সমাধি হইতে জাতীয় গৌরবের কঙ্কাল সংগ্রহ করি।—ভবিষ্যতে কোনও পুণ্যবান মার প্রসাদে মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র লাভ করিয়া, মহীয়ান ও গরীয়ান হইয়া, সেই কঙ্কালে সুন্দর দেহের সৃষ্টি ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবেন।—যখন সেই নবপ্রাণ-বলে বলীয়ান, মহীয়ান ও গরীয়ান জাতীয় গৌরবের উদ্বোধনে ও আহ্বানে জাগরূক হইয়া নূতন বাঙ্গালী বাঙ্গালার কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে মুক্তির পথে পরিচালিত করিবে, তখন তাহারা কোটীকণ্ঠে এই পুণ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও কমলার বরপুত্রগণের গৌরবগাথা গান করিবে। সেই শুভদিন স্মরণ করিয়া, হে বাঙ্গালী, হে পতিত! বিদ্ধস্ত! আত্মবিস্মৃত, সুপ্তোত্থিত বাঙ্গালী! তুমি আজ জগতের আদি জ্ঞানসিন্ধু ঋগ্বেদের ভাষায় গাও,—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানি হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥" *

---

* পরিষদের গৃহ-প্রবেশ-সভায় শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক পঠিত ও "বসুমতী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।

পূজারিণী।

তারকা-হীরক-পুষ্পে, ছায়াপথ-হারে
সাজাইয়া ও বিরাট পুষ্পপাত্রখানি,
কে তুমি পূজিছ নিত্য ইষ্টদেবতারে ?
কি দুর্ল্লভ বর লাগি'—কিছুই না জানি !
বিস্রব্ধ নিস্তব্ধ রাতে বিমুগ্ধ শ্রবণে
শুনেছি বাজিছে তব মাণিক-নূপুর ;
পেয়েছি নিশীথ-স্নিগ্ধ মন্দ সমীরণে
পবিত্র অমৃত গন্ধ বিনোদ বপুর ;
তব অশ্রু-মুক্তারাজি দেখেছি প্রভাতে
পর্ণে, পুষ্পে, শ্যাম শষ্পে করে ঝলমল ;
হেম-হোমানল তব প্রদীপ্ত প্রভাতে
করেছে কনক-রাগে দিগন্ত উজ্জ্বল ;
দেখি নাই তব মূর্ত্তি ও তপস্যাশেষে,
কবে দেখা দিবে দেবী ! জ্যোতির্ম্ময়ীবেশে ?

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সৌন্দর্য্য ও দুঃখ।

শুক্তি-মুক্ত মুক্তাফল নিরখি' বিস্ময়ে
শত জনে শত মুখে সৌন্দর্য্য বাখানে ;
কিন্তু সে সৌন্দর্য্য মাঝে আছে গুপ্ত হ'য়ে
কত যাতনার স্মৃতি, কেহ কি তা জানে !
দাবানল পশে যবে চন্দনের বনে,—
সুপবিত্র গন্ধামোদে মাতে চরাচর ;
কে জানে কি তীব্র দাহ জ্বলন্ত ইন্ধনে,—
কি রস সৌরভ-রূপে ধরে রূপান্তর !
ব্যথা যবে বাজে প্রাণে, দুঃখ যবে দহে,
মর্ম্মে মর্ম্মে বিঁধে শত যাতনার ছুরী,
মনীষী নীরব ধৈর্য্যে সে যাতনা সহে,
দুঃখে পূজে দিয়া নিজ মনের মাধুরী
ক্ষত মধুচক্র সম ; তাঁর দিব্য দান
জুড়ায় অমৃত রসে বিশ্ব-জন-প্রাণ !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। কার্ত্তিক। শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' জমিতে গিয়াছে, উপন্যাসের 'স্বদেশী' খুব 'ঘোরালো' হইয়া উঠিতেছে। শ্রীযুত রামপ্রাণ গুপ্তের 'ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ' উল্লেখযোগ্য। '৬৩৬ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ইহাই মুসলমান কর্ত্তৃক প্রথম ভারত আক্রমণ। এই প্রথম আক্রমণের পাঁচ শত সাতায় বৎসর পরে পাঠানজাতীয় মুসলমানগণ উত্তর-ভারতে অধিকার স্থাপন করেন। প্রাগুক্ত সময়ের মধ্যে কতিপয় আরব্য লেখক ভারত-বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।' লেখক সেই আরবদেশীয় লেখকগণের মধ্যে প্রধানতঃ ছয় জনের গ্রন্থ হইতে তদানীন্তন ভারতের ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছেন। 'মার্কিনরা ধর্ম্মের দ্বারা স্বারাজ্য লাভ করিয়াছিল কি না', শ্রীযুত রজনীকান্ত গুহ এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন,—'মার্কিনদিগের রাজনৈতিক অধ্যবসায়ের গোড়াপত্তন করা হইয়াছিল ধর্ম্মের উপরে, তাই তাহার ফল হইল নিষ্কণ্টক স্বারাজ্যলাভ।' রজনী বাবু বহু ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—তাহা সত্য নহে। তিনি বলেন,—'পরদেশ-হরণে যে জাতীয় জীবনের আরম্ভ, মিথ্যা প্রবঞ্চনা ও নিষ্ঠুরতায় যাহার পরিপুষ্টি, নারকীয় দাসত্বপ্রথা যাহার ঐহিক সম্পদের ভিত্তি,—সেই মার্কিন জাতীয় জীবনের গোড়াপত্তন যদি নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মের উপরে করা হইয়া থাকে, তবে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পার্থক্য কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।' প্রবাসীর সম্পাদক বলিতেছেন,—'জগতে কোন কাজে নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্ম থাকে? 'ধর্ম্ম এ জন্য অবলম্বনীয় নহেন যে, তিনি স্বাধীনতা বা ঐশ্বর্য্য দেন; ধর্ম্মের জন্যই ধর্ম্ম অনুসৃতব্য;—ফল যাহাই হউক।' আমরা বলি,—'ত্বয়া হৃষীকেশ! হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' বিবেকবুদ্ধি যাহা বলে তাহাই করিয়া যাও। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র সমরে রাজনীতির সহিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ ভঞ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ধর্ম্মযুদ্ধেও অধর্ম্মের স্পর্শ অনিবার্য্য হইয়াছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞাতিবধসম্ভাবনায় মুহ্যমান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!' তাহাই এখন ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। শ্রী— স্বাক্ষরকারীর 'রাজা দেবী সিংহ' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সন্দর্ভ। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন বাঙ্গালীকে একবার এই পৈশাচিক কাহিনী শুনাইয়াছিলেন। শ্রী— ওজস্বিনী ভাষায় সেই ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় "উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ" প্রবন্ধে সামান্য উপাদান ফেনাইয়া কেমন করিয়া সুদীর্ঘ প্রবন্ধে পরিণত করিতে হয়, তাহার নমুনা দিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গের প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহযোগ্য, লেখক তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। লেখক লিখিয়াছেন,—'সেই সকল পুরাতন ইষ্টক প্রস্তর গঠিত অট্টালিকা হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াই অধিকাংশ মুসলমান মসজেদ নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ইহা কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করে না।

ইহা=অর্থাৎ এই উক্তি; কারণ, মসজেদ কখনও অনুমানের উপর নির্ভর করিতে পারে না। তাহার ভিত্তির জন্য কঠিন ভূমি আবশ্যক। তাহার পর,—'এ সকল কথা মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে গৌরবের সঙ্গেই উল্লিখিত হইয়াছে।' 'গৌরবের সঙ্গেই' বাঙ্গালা নহে। যেমন গৌরব উল্লিখিত হইয়াছে, তেমনই এই সকল কথাও উল্লিখিত হইয়াছে,—ইহা অবশ্য লেখকের অভিপ্রেত নহে। প্রচলিত রচনা-রীতির ব্যভিচার করিয়া বিশেষ কোনও লাভ নাই; তাহার ফলে অভিপ্রেত অর্থ মাঠে মারা যায়। শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'কবি' নামক কবিতাটি ইতিপূর্ব্বে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। দেখিতেছি, দেশবাসী প্রবাসী তাহা জানিতেন না! শ্রীযুত জগদানন্দ রায় 'বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহে' কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সংবাদ চয়ন করিয়াছেন। শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার 'কবি দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রবন্ধে রায় কবির 'হাসির কবিতা'র বিশ্লেষণ করিয়াছেন। লেখকের শেষ সিদ্ধান্ত এই,—'দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতায় আনন্দসম্ভোগ আছে, অপবিত্রতা নাই; সুশিক্ষা আছে, অথচ নীরস কথা নাই; উচ্চ হাস্য আছে, কিন্তু গ্রাম্যতা নাই; এমন রচনা বঙ্গ সাহিত্যের গৌরবের সামগ্রী। হাসির পবিত্রতা এবং বিচিত্রতায়, মানব-চরিত্র-বিশ্লেষণের দক্ষতায়, এবং রচনার চতুরতা ও সৌন্দর্য্যে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কবিতা ও গান সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবে।' শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী ভট্টাচার্য্যের 'বৈদিক শারদোৎসব' নামক ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি সুলিখিত। 'য়ুরোপীয় রাজার অত্যাচার' পড়িলে শিহরিয়া উঠিতে হয়।

জাগরণ।

——:•:——

তব মৌন পাঞ্চজন্য তুলি' লয়ে' হাতে
মহামন্ত্রে বাজাইলা রুদ্র মহাকাল ;—
কাঁপিল বিপুল বিশ্ব সে নাদ-সংঘাতে,
ছিন্ন হ'ল স্বপনের ইন্দ্রজাল-জাল।
তব কণ্ঠ-বিনিঃসৃত যে পরম বাণী
ছিল স্তব্ধ হয়ে সুপ্ত ভারত-আকাশে,
গর্জ্জিল অম্বুদ-নাদে বজ্রদীপ্তি হানি'
ঘনান্ধ তিমির মাঝে শক্তির উচ্ছ্বাসে ;
আসমুদ্র হিমাচল শ্মশানে শ্মশানে
জ্বলিল প্রদীপ্ত রাগে প্রাণ-বহ্নি-শিখা ;
নবীন প্রণব-ধ্বনি নব-মন্ত্র-গানে
জাগিলা চৈতন্য-শক্তি চিন্ময়ী চণ্ডিকা ;
নিষ্কাম কর্ম্মের পুষ্পে, ভক্তির চন্দনে
মাখি, অর্ঘ্য দিল ভক্ত তব শ্রীচরণে !

অধিকারী।

মায়ের মন্দির-দ্বারে আজি কে তোমরা
সাজাইছ অর্ঘ্যরাজি, নৈবেদ্যের ভার ?
পূজিবে কি জননীরে, কহ মোরে ত্বরা,
জাগিবে কি নব মন্ত্রে শূন্য যজ্ঞাগার ?
কাম-কাঞ্চনের মোহ, বাসনা-স্বপন,
ঘুচেছে কি জ্ঞান-গঙ্গা-নীরে করি' স্নান ?
পেতেছ কি হৃদি-মাঝে মার পদ্মাসন,
ত্যাগ-ব্রতে পুণ্য-পূত করেছ কি প্রাণ ?

এ নহে উৎসব-ক্ষেত্র, ভোগের ভবন ;
এ চির-ত্যাগের তীর্থ, পবিত্র মহান্ ;
ভক্ত হেথা জ্বালি' দীপ্ত হোম হুতাশন,
পরা মুক্তি লাগি' করে আত্মাহুতি-দান ;
নিষ্কাম যে, মুক্তি-মন্ত্রে চিত্ত মত্ত যার,
তারি শুধু এ মন্দিরে আছে অধিকার !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ।*

——:০:——

বঙ্গীয় ১৩০১ অব্দের ১৭ই বৈশাখে, খৃষ্টীয় ১৮৯৪ অব্দের ১৯শে এপ্রেল, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপূর্ব্বে ১৩০০ সনের ৮ই অগ্রহায়ণ লিউটার্ড নামক ফরাসী ভদ্রলোকের যত্নে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রাসাদে Bengal Academy of Literature প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সেই মূল হইতেই পরিষৎ অঙ্কুরিত হইয়াছিল। পরে ১৮৯৯ সনের ১৫ই এপ্রেল খৃষ্টীয় ১৮৬০ সনের ২১ আইন অনুসারে ইহা রেজেষ্টারী করা হয়। প্রতিষ্ঠার দিবস অবধি অদ্য পর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। পঞ্চদশ বর্ষ এক হিসাবে দীর্ঘকাল ; কিন্তু মানব-জীবনে, মানব-সমাজে ইহা দীর্ঘকাল নহে।

"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি, দশ বর্ষাণি তাড়য়েৎ।
প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ ॥"

পালিত ও শিক্ষিত হইবার কাল ১৫ বৎসর ; পনের বৎসর অতীত হইলে যৌবন দশার আরম্ভ ; পনের বৎসরের পর সমাজের ও সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মারম্ভের সময় উপস্থিত হয়। বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে অবস্থাভেদে ১৮ বৎসর ও ২১ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্তির কাল ; সে বিবেচনায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। মানব-সমাজে প্রতিভা ও গৌরব-প্রতিষ্ঠার কাল আরও বেশী। ধীরে ধীরে পরিষৎ উন্নতির সোপানে আরোহণ

---

* ১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ পরিষদের গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে পঠিত।

করিতেছে। জন্মমাত্রই প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় ইহার জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হয় নাই; কিন্তু ধূমাবস্থার পর ক্রমশঃ উজ্জ্বল অগ্নিশিখা-বিস্তারই প্রকৃতিসিদ্ধ; সহসা-প্রদীপ্ত অগ্নি অচিরেই মলিন হইয়া ধূমে পরিণত হয়! রোমের মহাকবি হরেস (Horace) যথার্থই বলিয়াছেন,—

> "Non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem
> Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat."
>
> *A. P. 143.*
>
> "One with a flash begins, and ends in smoke ;
> Another out of smoke brings glorious light,
> And (without raising expectation high)
> Surprises us with dazzling miracles."
>
> —*Roscommon.*

চৌদ্দ বৎসর আট মাসের ভিতর পরিষদের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, এই অনতি-দীর্ঘকাল মধ্যে পরিষৎ সাধারণের নিকট যেরূপ আদর, শ্রদ্ধা এবং বিবিধ প্রকার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সভ্যগণের বেশ আশা হইয়াছে যে, অচিরেই ইহা জগতের বিশিষ্ট সাহিত্যসভাসমূহের অন্যতম হইবে।

১৩০১ সালে পরিষৎ নিজের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মহারাজকুমার (বর্ত্তমান রাজা) শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কলিকাতার ২।২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদে তাঁহার বিশিষ্ট সাহায্যে ইহা সংস্থাপিত হয়। তাঁহার অসীম যত্ন ও তাঁহার অকাতর সাহায্যের জন্য পরিষৎ তাঁহার নিকট ঋণী, এবং তিনি আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন। রাজা বাহাদুরের ১০৬১ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ প্রাসাদেই পরিষদের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়, এবং তথায় ইহার প্রথম শক্তিসঞ্চার হয়। তৎপরে ইহা কলিকাতার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের ১৩৭।১ নং গৃহে নীত হয়। ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া ঘর—অতি সত্বরই উহা বর্দ্ধিষ্ণু পরিষদের অযোগ্য হইয়া উঠিল। ১৩০৭ সালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী পরিষদের নিবাসের জন্য সাত কাঠা ভূমি দান করেন, এবং ইমারতের জন্য অনেক ভদ্রলোকই সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। অবশেষে আজ যে সুপ্রশস্ত, সুদৃশ্য অট্টালিকায় আমরা সমবেত হইয়াছি, তাহার দ্বিতল-নির্ম্মাণের সমস্ত ব্যয় সাহিত্যানুরাগী লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় বহন করিয়াছেন। প্রধানতঃ তাঁহাদিগের চিরস্মরণীয় আনুকূল্যে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ অদ্য এই নিজের মন্দিরে অধিবেশন করিতে সমর্থ হইল। বর্ত্তমান বঙ্গীয় বর্ষের বর্ত্তমান মাসের শুভ শুক্লনবমী তিথিতে পরিষৎ এই মন্দিরে

প্রবেশ করিয়াছে। অদ্য ইহাতে ইহার প্রথম অধিবেশন। গৃহনির্ম্মাণে নগদ প্রায় ২৭০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে ; এখনও ইহার বহিরঙ্গ-নির্ম্মাণের জন্য ১০,০০০৲ টাকার আবশ্যক ; নিজের ছাপাখানার জন্য নিকটে ভূমিরও আবশ্যক। সভ্যগণের সম্পূর্ণ আশা আছে যে, তাঁহারা সত্বরই বদান্য লোক-হিতাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণের সাহায্যে আবশ্যক অর্থ সঙ্কলন করিতে পারিবেন, এবং কাশিমবাজারের বদান্যবর মহারাজা প্রয়োজনীয় ভূমি-প্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিবেন। ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর তাঁহার স্বাভাবিক বদান্যতার সহিত গৃহ-নির্ম্মাণ কার্য্যে বিশেষ অর্থসাহায্য করিয়া গিয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ পাল বাহাদুর প্রথম তলের ২৫০০ বর্গফুট মেজের নিমিত্ত সমস্ত মর্ম্মর প্রস্তর দিয়াছেন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ গৃহ-নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছেন, এবং পরিষদের সভ্যগণ সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।—

রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, (মুর্শিদাবাদ, লালগোলা) ... ... ১০০৫৮৲
৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুর (কলিকাতা) ... ২০০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও ভ্রাতৃগণ (দীঘাপতিয়া, রাজসাহী) ... ২০০০৲
৺মহারাজ বাহাদুর সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, (কলিকাতা) ... ১০০০৲
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, (টাকী) ১০০০৲
মহারাজ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ভঞ্জদেও বাহাদুর, (ময়ূরভঞ্জাধিপতি) ... ৫০০৲
মহারাজ সার্ শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, (কলিকাতা) ... ... ৫০০৲
শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, (কলিকাতা) ৫০০৲
" রায় প্রমথনাথ চৌধুরী, (সন্তোষ, ময়মনসিংহ) ... ... ৫০০৲
" হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, (কলিকাতা) ৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র সিংহ, (পাইকপাড়া, কলিকাতা) ... ... ৫০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত রণজিৎ সিংহ বাহাদুর, (নশীপুর, মুর্শিদাবাদ) ... ৫০০৲
শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী (বরিশাল) ৫০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ রায় চৌধুরী, (সন্তোষ, ময়মনসিংহ) ... ৩০০৲
কুমার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মৈত্র, (তালন্দা, রাজসাহী) ... ... ৩০০৲
রাজা শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ দুধোরিয়া, (আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ) ... ৩০০৲
" " প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া, (গৌরীপুর, আসাম) ... । ২০০৲
" " নরেন্দ্রলাল খাঁ (নাড়াজোল, মেদিনীপুর) ... ২০০৲
" " শ্রীনাথ রায়, (ভাগ্যকুল, ঢাকা) ... ... ১৮৭॥০
শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন মৈত্র, (তালন্দা, রাজসাহী) ... ... ১৫০৲
৺ রাজা আশুতোষ নাথ রায়, (কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ) ... ... ১০০৲
শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মল্লিক, (পাথুরিয়াঘাটা, কলিকাতা) ... ... ১০০৲
৺ লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত, (বাগবাজার, কলিকাতা) ... ... ১০০৲
মহারাজাধিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়চাঁদ মহতাপ বাহাদুর, (বর্দ্ধমান) ... ১০০৲
৺ মাণিকলাল শীল, (কলিকাতা) ... ৫০৲

২১৬৩৫॥

এই কিঞ্চিদধিক ২১ হাজার টাকা এবং খুচরা সাহায্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া প্রায় ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে ; ইহা ব্যতীত কতিপয় বদান্য ব্যক্তির প্রতিশ্রুত সাহায্য-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই তাঁহারা লোকান্তরিত হওয়ায়, ১৫৫০ টাকা পাওয়া যায় নাই। আর যে সকল সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত আছেন, তাঁহাদের নিকট এখনও প্রায় তিন হাজার টাকা পাইবার আশা আছে। ইহা ব্যতীত স্বর্গীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মর্ম্মরমূর্ত্তি রাখিবার পীঠগুলির মর্ম্মর প্রস্তর-গুলি দান করিয়াছেন। চিরস্মরণীয় সাহায্যের নিমিত্ত, এই সকল সহৃদয় বদান্য ব্যক্তির, বিশেষতঃ কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়, স্বর্গগত বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, দিঘাপতিয়ার কুমারগণ ও রায় শ্রীনাথ পাল বাহাদুরের নাম সর্ব্বদা স্মৃতিপথে থাকার জন্য পরিষৎ যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিতেছেন।

পরিষদের গঠন কার্য্যে সাহিত্যানুরাগী রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর, স্বর্গীয় ক্ষেত্রপাল চক্রবর্ত্তী, মিঃ এম্ লিওটার্ড, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস রায় বাহাদুর সি. আই. ই., শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্. এ., বি. এল্ ও স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু, উমেশচন্দ্র বটব্যাল ও রজনীকান্ত গুপ্ত বিশেষ যত্ন করেন, এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণের পরিশ্রমে সভা শনৈঃ শনৈঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান দেহ প্রাপ্ত হইয়াছে। বটব্যাল মহাশয়ই সভাকে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ' নাম দেন।

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই.।	শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু।
,, চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ ; বি. এল্.।	,, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্. এ.।
,, নবীনচন্দ্র সেন।	,, নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।
,, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	,, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।
,, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	,, ব্যোমকেশ মুস্তফী।
,, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।	,, মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।	৺ চারুচন্দ্র ঘোষ।
রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম্. এ.।	
শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্. এ ; বি.এল্.।	শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী।

রজনীকান্ত গুপ্ত মহারাজার নিকট ভূমি ও অন্যান্য মহোদয়গণের নিকট বাটীনির্ম্মাণার্থ অর্থসংগ্রহে বিশেষ যত্ন করেন। তিনি অকালেই পরলোক প্রাপ্ত হওয়ায় পরিষৎ শোক প্রকাশ করিতেছে।

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. প্রথম দুই বৎসর সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া সভার অসীম উপকার করেন। তাঁহার ন্যায়

সুলেখক, তাঁহার ন্যায় চিন্তাশীল সুপ্রসিদ্ধ লোক সভার নেতৃত্বগ্রহণ করায় সভার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তাঁহার পর সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ., বি. এল্. দেড় বৎসর, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তিন বৎসর, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর চারি বৎসর, এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত পুনরায় এক বৎসর সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন। চারি বৎসর হইল, আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তির উপর সভার নেতৃত্ব ভার পড়িয়াছে।

পরিষদের সভ্যসংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া আসিতেছে। ১৩০১ সালের শেষে সভ্য-সংখ্যা ১০৩ ছিল। ১৩১৪ সালের শেষে সভ্যসংখ্যা ৮০১ ছিল; অদ্য সভ্য-সংখ্যা ৮৫২। আর অদ্যকার এই শুভদিনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেক ব্যক্তি এই সভার প্রতি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জানাইয়া ইহার সভ্যপদগ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, এবং আমিও পরমানন্দে জানাইতেছি যে, এই সকল ব্যক্তি সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইলে পরিষদের সভ্যসংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। সহস্রাধিক সভ্য লইয়া পরিষৎ যে আজ গৃহপ্রবেশ করিতে পারিলেন,—ইহা গৌরবের কথা, সন্দেহ নাই। এত অধিকসংখ্যক সভ্য ভারতবর্ষে আর কোনও সভায় আছে বলিয়া আমার জানা নাই। কুচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি. সি. আই. ই., সি. বি. পরিষদের আজীবন সভ্য, এবং নিম্নলিখিত মহোদয়গণ বিশিষ্ট সভ্য।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,
,, চন্দ্রনাথ বসু এম্. এ., বি. এল্.।
রায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর।
শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বি. এ.।
,, সার উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ।
,, সার জর্জ্জ বার্ডউড্।
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই.।
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।
ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু এম্. এ., ডি. এস্. সি., সি. আই. ই।
ডাক্তার ,, প্রফুল্লচন্দ্র রায় ডি. এস্. সি, পি. এইচ্. ডি.।

পরিষদের কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তৃত করিয়া সমুদয় বাঙ্গালা দেশকে পরিষদের উদ্দেশ্যসাধনে অনুকূল ও উৎসাহান্বিত করিবার জন্য ও মফঃস্বলবাসী সুধীগণের ও পণ্ডিতগণের সাহায্যলাভের জন্য বাঙ্গালার জেলায় জেলায় শাখা-সভা-স্থাপনের সঙ্কল্প হইয়াছে; এবং এ পর্য্যন্ত রঙ্গপুর, ভাগলপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ ও মুর্শিদাবাদ, এই পাঁচটি স্থানে পাঁচটি শাখাপরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা মূল সভার উদ্দেশ্য প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ এই সকল শাখা-সভার অগ্রণী। সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী ও

অন্যান্য সভ্যগণের যত্নে এই শাখা উত্তর-বঙ্গে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তাঁহারা মুখপত্রস্বরূপ স্বতন্ত্র সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রকাশ করিতেছেন। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ উৎসাহে ও কর্ম্মপটুতায় অনেক বিষয়ে মূল সভারও আদর্শ হইয়াছে। এই সকল শাখা-সভার যে সকল প্রতিনিধি কষ্ট স্বীকার করিয়া মূল পরিষদের উৎসবে যোগ দিতে অদ্যকার সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি। তাঁহারা আমাদিগের শ্রদ্ধা ও প্রীতির সংবাদ বহন করিয়া শাখা সমুদয়কে জ্ঞাপন করুন।

সাহিত্যই মানব-সভ্যতার জীবন, মানব-সভ্যতার প্রধান নিদর্শন। সাহিত্যের ও কলাবিধির পরিমাণ ও গৌরব অনুসারে পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমান জাতিসমূহের সভ্যতা পরিমিত হইয়া থাকে। কালস্রোতে অনেক বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হয়; দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা রূপান্তর ধারণ করে; রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন প্রায়ই লক্ষিত হয়। ভাষার ও সামাজিক অবস্থার নিয়তই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু অতীত কালের প্রসিদ্ধ জাতিগণের সাহিত্যময়ী সভ্যতার নিদর্শনের লোপ হয় না। পুরাতন গ্রীস গিয়াছে, পারসীকগণের সহিত যুদ্ধের পর এথেন্স প্রমুখ দেশসমূহের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তির অন্যান্য নিদর্শন কেবল ইতিহাসস্থ হইয়াছে; কিন্তু হোমার, পিণ্ডার, ইস্কিলাস্, সফোক্লিস্, ইউরিপিডিস্, প্লেটো, এরিস্টটল্ প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণের কীর্ত্তি সজীব রহিয়াছে। পেরিক্লিজের নাম ইতিহাসস্থ, কিন্তু সাহিত্যসেবিগণ কেবল ইতিহাসস্থ নহেন। পুরাতন রোম গিয়াছে, অগাষ্টাস্ প্রভৃতি কীর্ত্তিমান্ সম্রাটগণের নামমাত্র আছে; কিন্তু ভার্জিল, হরেস্ প্রভৃতি এখনও আমাদের সঙ্গী। ভারতবর্ষের সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর আর অস্তিত্ব নাই; বৈদিক সময়ের আর্য্যভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা এখনকার প্রাকৃতিক অবস্থার সহিত বিলক্ষণ বিভিন্ন। সময়ের কুঠারাঘাতে, বিজয়ী সৈন্য ও বিদেশী রাজগণের অস্ত্রাঘাতে, আর্য্যসন্তানদিগের বিভিন্নতা দেদীপ্যমান। এমন কি, ধর্ম্মেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমরা সেই পুরাতন আর্য্যদিগের সন্তান, তাহা সহজে বোধগম্য হয় না; কিন্তু সে সভ্যতার লোপ হইলেও, বেদ, উপনিষদ, মন্বাদি স্মৃতি, মহাকবি কালিদাস প্রভৃতির কাব্য পূর্ব্ব সভ্যতার অনশ্বর চিহ্ন-স্বরূপ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সবই লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের লোপ হয় নাই। পঞ্চদশ খৃষ্টশতাব্দীর বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য চারি শত বৎসর হইল বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তখনকার গ্রন্থাবলী এখনও আমাদের আয়ত্তাধীন।

তবে অনেক কাব্যেরই লোপ হইয়াছে, হয় ত অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ কাল-স্রোতে নিমজ্জিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের অনৈক প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়াছেন যে,—"কালস্রোতে অনেক গৌরবান্বিত গ্রন্থ, গুরুত্ব নিবন্ধন ডুবিয়া গিয়াছে। তাহারা আর ভাসিয়া আইসে নাই। অকর্ম্মণ্য গুরুত্বহীন গ্রন্থ অনেক কাল ভাসিয়া আসিতে পারিতেছে। তাই আমরা এখনও তাহাদিগকে পাইতেছি।" উপামটি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও, কথাটি অনেক অংশে সত্য। আমরা যে অনেক গ্রন্থ পাই নাই, তাহা ঠিক ; অন্ততঃ বাঙ্গলা দেশেরই অনেক পুরাতন গ্রন্থ কালস্রোতে আমাদের নিকট ভাসিয়া আইসে নাই। গ্রন্থকারের জীবদ্দশায় অনেক গ্রন্থেরই প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটিয়া উঠে না। এমন কি, শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছিত মহাকবি ভবভূতিকেও মালতীমাধবে বলিতে হইয়াছে,—

যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং
জানন্তি তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতে মম তু কোপি সমানধর্ম্মা
কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী॥

আমাদের দেশের অনেক কবির, এমন কি, অনেক ভাল ভাল কবির গ্রন্থ লুপ্তপ্রায় হইয়া থাকিবে। অনেক গ্রন্থই যে আমরা পাই নাই, অনেকই যে শ্রীরামপুর বা বটতলার প্রকাশকদিগের হাতে আইসে নাই, অনেকই যে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, তাহার বিশিষ্ট নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান উদ্দেশ্য,—সেই সকল গ্রন্থের আবিষ্কার ও প্রকাশ। পরিষৎ এই বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে অনেক কার্য্যের আশাও আছে। লালগোলার রাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর ৮০০৲ টাকা দিতেছেন।—সম্প্রতি বরিশালবাসী শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী বার্ষিক ৫০৲ টাকা সাহায্য করিতে চাহিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কতকগুলি পুঁথির আবিষ্কার করিয়াছেন। কবি চণ্ডীদাসের অনেক নূতন পদের আবিষ্কার হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও আমি বিদ্যাপতির অনেক নূতন পদের আবিষ্কার করিয়াছি, এবং বিদ্যাপতির প্রায় এক সহস্র পদ টীকা সহ সাহিত্য-পরিষৎ তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে। নিম্নলিখিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে,—কৃত্তিবাসী রামায়ণের অযোধ্যা ও উত্তর কাণ্ড ; পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী ; বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ; বনমালী দাসের জয়দেবচরিত ;

ছুটিখানের মহাভারত; জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল; মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল; নরোত্তমের রাধিকার মানভঞ্জন; কৃষ্ণরাম দত্তের রাধিকামঙ্গল; মহারাজ জয়-নারায়ণ ঘোষালের কাশী-পরিক্রমা; ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী; বাসুদেব ঘোষের পদাবলী; নরহরি চক্রবর্ত্তীর ব্রজপরিক্রমা; রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্যচরিত; রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ; নরহরি চক্রবর্ত্তীর নবদ্বীপ-পরিক্রমা; গৌরপদ-তরঙ্গিণী। এই উদ্দেশ্যে ক্রমশঃ পুঁথি সংগৃহীত হইতেছে, এবং এখন পরিষদের গৃহে ৪৫০ খানি পুঁথি আছে। এতদ্ভিন্ন বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে প্রায় দুই সহস্র প্রাচান বাঙ্গালা পুঁথি সংগৃহীত হইয়া আছে। পরিষৎ আবশ্যকমত এই সকল পুঁথি তাঁহার নিজ গ্রন্থের মতই ব্যবহার করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত পরিষদের রঙ্গপুর শাখার পুস্তকাগারে অনেক প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। পরিষদের অনেকগুলি সাহিত্যপ্রিয় সভ্য বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে অনেকানেক প্রাচীন গ্রন্থের সন্ধান করিয়া তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন; সেই সকল বিবরণ পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। চট্টগ্রামের মুন্সী আবদুল করিম এইরূপ ব্যক্তিগণের অগ্রণী, ও সমস্ত বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন।

যে সকল গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন পুরাতন পুঁথি দেখিয়া তাহার পাঠ সংশোধন করা পরিষদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তজ্জন্য অনেক অর্থ ব্যয় হইয়াছে। অনেকগুলি সংশোধিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

পরিষৎ কেবল পুরাতন সাহিত্য লইয়া ব্যস্ত নহে; অধুনাতন সাহিত্য-সেবিগণের যথোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করা, তাঁহাদিগের সাহিত্যসেবা কার্য্যে সাধ্যমত সহৃদয়তা প্রকাশ করা, ইহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। যাহাতে কাব্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা বর্দ্ধিত হয়, এবং গ্রন্থ-সংখ্যা ক্রমশঃ অধিক হয়, যাহাতে সৎলেখকের সংখ্যা অধিক হয়, তজ্জন্য পরিষৎ বিশেষ যত্ন করিতেছে। প্রতি মাসের অধিবেশনে প্রত্নতত্ত্ব, পুরাতন কাব্য, নূতন সাহিত্য বিষয়ের আলোচনা হইতেছে। কেবল সাহিত্যসেবী কেন, যাঁহারা সাহিত্যসেবার সহায়তা করেন, যাঁহারা সাহিত্যসেবিগণকে উৎসাহিত করেন, তাঁহাদিগের যথোচিত সম্মাননাও পরিষদের উদ্দেশ্য। পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে যিনি বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টির জন্য যত্নবান্, তিনিই সাহিত্য-পরিষদের সমাদরের পাত্র। তাঁহারা অনেকেই পরিষদের সভ্য। স্বর্গীয় কবি বা বৈজ্ঞানিকগণও অনেকেই মর্ম্মরমূর্ত্তি বা চিত্রপটে নিবেশিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে সহায়তা

করিতেছেন। তাঁহাদিগের মূর্ত্তিই অনুকরণেচ্ছার উদ্রেকের মূল হইতে পারে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি সাহিত্য-বীরগণ স্বর্গস্থ হইয়াও এই মন্দিরে জীবন্তস্বরূপ বিরাজমান হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতিতে সহায়তা করিতেছেন।

"Lives of great men all remind us,
We can make our lives sublime;
And departing leave behind us,
Footprints on the sands of time."

যাঁহারা সাহিত্যসেবিগণকে সাহায্য করিয়া বঙ্গদেশকে ঋণী করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মৃতিরক্ষার্থও সাধ্যমত আয়োজন হইয়াছে, ও হইতেছে। ভারতবর্ষে Westminister Abbeyর ন্যায় গৃহ নাই, কবির স্থান (Poet's Corner) নাই। সাহিত্য-পরিষৎ ক্ষুদ্রভাবে সেই অভাব-দূরীকরণার্থ চেষ্টা করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষাও পরিষদের দৃষ্টির অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিক শব্দ স্থিরী-করণ বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় বিশেষ আবশ্যক। সমগ্র ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক শব্দের একত্ব যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। বাঙ্গালা দেশের Central Text Book Committee বৈজ্ঞানিক শব্দের একত্ব-স্থাপনার্থ যত্ন করিতেছে। কিন্তু এই গুরুতর কার্য্যে সফলতা-লাভ সময়সাপেক্ষ।

বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস এখনও বিশিষ্টরূপে সঙ্কলিত হয় নাই। ইতিহাস-ক্ষেত্র সুবিস্তীর্ণ; তাহার অনেক অংশই তমসাবৃত; কখনও যে সে সকল অংশে জ্ঞানরশ্মি প্রবেশ করিবে, এরূপ আশাও নাই। পুরাকালে বঙ্গদেশ আর্য্য-গণের ত্যজ্য ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এককালে ইহা বঙ্গোপসাগরের লবণাম্বু দ্বারা আবৃত ছিল, কিন্তু বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের বদ্বীপ মানব-নিবাসের উপযুক্ত হইয়াছে। কত কাল পরে বঙ্গভূমি সুসভ্য আর্য্য জাতির বাসস্থান হইয়াছে, তাহাই বলা যায় না। দুই সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থাও অজ্ঞাত। দ্বাপর যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ঐতিহাসিক কোনও নিদর্শন নাই। পঞ্চদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গভূমি বৌদ্ধ জগতের অন্তর্গত ছিল, এইমাত্র জানিতে পারা যায়। আদিশূর রাজার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্ম এখানে প্রবল ছিল। রাজারাও বৌদ্ধ ছিলেন। পালি যেমন

এক প্রকার প্রাকৃত ভাষা, এবং যেমন ইহা বৌদ্ধগণ সাধারণ লোকের অববোধনার্থ গ্রহণ করিয়াছিল, বঙ্গদেশেও তদ্রূপ তৎকালপ্রচলিত সাধারণের বোধগম্য ভাষা বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকিবে। হয় ত সেই ভাষাই—তৎকালের শ্রমণ ও ভিক্ষুগণের আদৃত ভাষাই—বর্ত্তমান বঙ্গভাষার মূল। তখনকার পুঁথি প্রচুরপরিমাণে সংগৃহীত হইলে আমাদের ভাষার মূলের আবিষ্কার হইতে পারে। তখনকার কতক তাম্রলিপি ও শিলালিপি পাইলেও বঙ্গভাষার ভিত্তির আবিষ্কার হইতে পারে। তবে খুব সম্ভব, বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণ বাঙ্গালার প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাহাতেই কবিতা ও গীতি রচিত হইত, এবং সাধারণ লোক উপদিষ্ট হইত। আদিশূর বঙ্গের কতক অংশে বৈদিক ও পৌরাণিক ধর্ম্মের পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান হইয়া থাকিবে। বেণীসংহার নাটক সেই সময়েই রচিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ। অন্যান্য গ্রন্থও সংস্কৃতে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুত্থান খুবই সম্ভবপর।

সেনরাজগণও সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। বল্লাল সেন দানসাগর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং লক্ষ্মণ সেনের নবরত্নসভা সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিয়া যশোরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে যে বঙ্গভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল, সেনরাজগণের রাজত্বকালে তাহা আর পরিবর্দ্ধিত হয় নাই। সেন রাজগণের সময়েই সংস্কৃত সাহিত্যের নিঃসন্দেহে পুনরুত্থান হইয়াছিল, এবং সেই সময়ে অজয় নদীর কূলে মধুরকোমলকান্তপদাবলী-রচয়িতা জয়দেব কবি গীতগোবিন্দ প্রণয়ন করিয়া সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীকে আনন্দে আপ্লুত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্য সেনরাজগণের অন্তর্দ্ধানের পর ধীরে ধীরে পুষ্টিলাভ করিয়াছে। মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভের পর তিন শত বৎসরে কত কি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় সহজ নহে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সেই সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সঙ্কলন কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইয়াছেন। কত দিনে, কত পরিশ্রমে সফলতা লাভ হইবে, বলা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় বলা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালায় অনেক পদ্য ও গীতি রচিত হইয়াছিল; পয়ার ছন্দঃ বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছিল।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কাল বঙ্গভাষার প্রকৃত পুনরুত্থানের সময়। এই সময়কেই বঙ্গসাহিত্যের "Renaissance Period" বলা যাইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের সময় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ের সাহিত্যের ইতিহাস সংগ্রহ করা কঠিন নহে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সকল প্রকার গ্রন্থই সেই সময় হইতে রচিত হইতে থাকে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত আর্য্যজাতির ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও মানসিক প্রবৃত্তির পুনর্বিকাশের সময়। এই যুগপৎ অভ্যুত্থানও আশ্চর্য্যের বিষয়। ইউরোপে লুথার, কেলভিন্ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা পোপের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া যে সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের নববিধান করিতেছিলেন, যে সময়ে ইগ্নেসিয়াস লয়লা পুরাতন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত ও তাহার সংস্কারের নিমিত্ত নূতন Jesuit শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, প্রায় সেই সময়েই ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিপ্লবের আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগেই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কবীরের নবধর্ম্ম খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, ও বল্লভাচার্য্য বিশেষ যত্নসহকারে বালগোপালসেবার প্রচার করিয়া শিলাতটে সুপ্রসিদ্ধ অশ্বত্থবৃক্ষতলে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভারতে ধর্ম্মের পুনরুজ্জীবন ও অবশ্যম্ভাবী জাতীয় বিপ্লব উপস্থিত হইলে, মেঘনির্ম্মুক্ত নভোমণ্ডলে যে জ্যোতিষ্মান্ নক্ষত্রপুঞ্জের উদয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে নবদ্বীপচন্দ্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি চৌদ্দ শত সাত শকে হিমসেকশূন্য সুনির্ম্মল পৌর্ণমাসী নিশায় ভারত-ভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া সুকোমল সুশীতল প্রেমামৃতরসে জগৎ আপ্লুত করিয়াছিলেন। তাঁহার হরিনামামৃতাস্বাদবিহ্বল শিষ্যসহচরগণ খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমেই কঠোর কর্ম্মকাণ্ডের পরিবর্ত্তে সুমধুর প্রেমভক্তিময় ধর্ম্মের বিস্তার করিয়াই তৃপ্ত হন নাই, পরন্তু শ্রুতিমধুর, রসাত্মক কৃষ্ণলীলাময় গাথার রচনা ও সেই সুধাময় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক চৈতন্যদেবের জীবনচরিত প্রভৃতি গ্রন্থসমূহের প্রণয়ন দ্বারা বঙ্গভাষায় অভিনব শক্তির সঞ্চার করেন। এই সময়েই রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গঙ্গেশোপাধ্যায়-কৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের ব্যাখ্যাদি প্রণয়ন দ্বারা নব্যন্যায়শাস্ত্রে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। এই সময়েই চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী স্মার্ত্ত-চূড়ামণি রঘুনন্দন পূর্ব্বপ্রচলিত নিবন্ধকারদিগের মতের খণ্ডন করিয়া, উন্নত সমাজের উপযোগী অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক নূতন ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এই সময়েই গুরু নানক (১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে) ইরাবতী নদীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মপ্রচার-করণানন্তর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে সেই পবিত্র ক্ষেত্রেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ এক মহাসাগরের উপকূল হইতে অপর মহাসাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমকালে ধর্ম্মবিপ্লব ও ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন সাহিত্য ও সংস্কৃত, লাটীন ও গ্রীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষার অনুশীলন-স্রোত প্রবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবং ঐ অনুশীলন হইতেই আধুনিক ভাষাসমূহের প্রচার ও প্রাদুর্ভাব হইতে লাগিল। আর্য্যজগতের এই পুনরভ্যুত্থানকালেই বিজয়নগরেও নবদ্বীপের ন্যায় বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। প্রবল তমোময় বাত্যাবর্ত্তে কাব্য-প্রদীপসমূহ নির্ব্বাপিত হইয়াছিল, সাহিত্যজগৎ মহাপ্রলয়ে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই পুনরায় জগতের সাহিত্যসম্পত্তি অভিনব কলেবর ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজল হইতে পুনরুত্থিত হইতে লাগিল, স্থানে স্থানে বিজ্ঞানের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে থাকিল, এবং মানবপ্রকৃতির নৈসর্গিক গতি অবাধে ক্রমোন্নতির অভিমুখে প্রধাবিত হইল।

দেড় শত বৎসরের মধ্যেই ভারতবর্ষে প্রকৃত আফগান ও পাঠান সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল, এবং তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মালব, গুজরাট, জোয়ানপুর, মুলতান্ ও বঙ্গদেশ স্বাধীন মুসলমান রাজগণের অধীন হইয়াছিল, এবং দক্ষিণে বামিনী রাজ্য বিলক্ষণ প্রতাপান্বিত হইয়াছিল। মানবজাতির পরম শত্রু তাতার তাইমুরলঙ্গ (১৩৯৮ অব্দ) ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাঞ্চল মানবশোণিতে রঞ্জিত করিয়া ও দিল্লী নগর লুণ্ঠন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, দিল্লীতে যে নামমাত্র সাম্রাজ্য ছিল, তাহারও লোপ হইয়াছিল। তাহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও লয় পাঠান সাম্রাজ্যের ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইলে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যরূপ যে তরঙ্গনিচয় উত্থিত হইয়াছিল, তাহা ব্রিটিশসাম্রাজ্য মহাসাগরে মিশ্রিত হইয়া লোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, এই দেড় শত বৎসর অর্থাৎ খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ভারতবর্ষের বিষম বিপৎকাল। কিন্তু এই কালে হিন্দুর হিন্দুত্ব, হিন্দুর সাহিত্য, হিন্দুর সভ্যতা অনির্ব্বচনীয় জীবনী-শক্তিপ্রভাবে সুষুপ্তাবস্থায় জীবন ধারণ করিয়াছিল। একবারে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তিই অনেক ইতিহাস-

বেন্তার মতে ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থানের কারণ। রাজ্যরক্ষায়, রাজ্যশাসনে, হিন্দুর সাহায্য আবশ্যক হওয়াতেও জাতীয় জীবনে নূতন প্রাণবায়ু সঞ্চারিত করিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বঙ্গদেশীয় অনেক জমীদারীর উৎপত্তি; অধিকাংশ রাজাই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ প্রভৃতির অনুকরণ করিয়া রত্নমণ্ডলী দ্বারা পরিবৃত থাকিতেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইংরেজ আমলেও রত্ন-পরিবৃত থাকিতেন। বর্ত্তমান জমীদারগণেরমধ্যে অনেকেই বিদ্যোৎসাহী।

আর্য্যজাতির এই পুনরুত্থানযুগের স্রোত বহুদিন প্রবাহিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণ দাস, জয়ানন্দ ও গোবিন্দ দাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায়, এবং "মুরারিমুরলীধ্বনিসদৃশ" মুরারি ও কবি কর্ণপূর প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণ, এবং গদাধরাদ্য দার্শনিকগণ সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যরত্নসমূহ বঙ্গে বিকীর্ণ করিয়া বঙ্গের সভ্যতা-জ্যোতিঃ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এ দিকে শাক্তগণেরও সাহিত্যে মনোযোগ পড়িল। অনতি-বিলম্বেই ওজস্বী স্বভাব-কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী দামুন্যার নিকটস্থ দামোদরের কূলে বসিয়া শক্তির প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া সুললিত গীত গাহিতে লাগিলেন,—"অজয় নদীর কুলে, অশোক তরুর মূলে, কামরসে কামিনী মূর্চ্ছিত।" "কীর্ত্তিবাস" কৃত্তিবাস মহাকবি বাল্মীকিকে বঙ্গাবয়ব দিলেন, এবং কায়স্থ কাশীদাস পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে অষ্টাদশ পুরাণের সার-সংগ্রহ ব্যাসদেবের শেষ কীর্ত্তি মহাভারত বঙ্গভাষায় শুনাইতে লাগিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের আদরের কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য শনৈঃ শনৈঃ সুন্দর অবয়ব ধারণ করিতে লাগিল।

ইংরাজ-শাসন-সংস্থাপনের সমকালেই আবার বঙ্গীয় সাহিত্য একটু অধিক দীপ্তিমান হইল। বিপ্লবের পর শান্তি। ঘোরতর মন্বন্তরের পর পৃথিবীর সুজলা শ্যামলা মূর্ত্তি বঙ্গের কবিচন্দ্র রায়গুণাকরকে মধুর কবিতাময় অন্নদা-মঙ্গলের রচনায় উত্তেজিত করিল। ভক্ত রামপ্রসাদ ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বঙ্গবাসিগণকে ভক্তিরসে প্লাবিত করিলেন। অনতিপরেই দাশু রায়, রাম বসু, হরুঠাকুর, আণ্টনি সাহেব, চিন্তামণি প্রভৃতি কবিগণ রসাত্মক বাক্য দ্বারা বঙ্গদেশকে মোহিত করিতে লাগিলেন।

দুরন্ত সিপাহীবিদ্রোহ ভারতভূমিকে আলোড়িত করিয়াছিল। বিদ্রোহ-শান্তির পরই মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারত-শাসন-ভার গ্রহণ

করিলেন। তৎকালীন শাসনকর্ত্তাদিগের সুব্যবস্থায় ভারতবর্ষে পুনঃ শান্তি সংস্থাপিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শান্তির অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ কবি ঈশ্বরচন্দ্র, মদনমোহন ও মধুসূদন, এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতি গদ্য-রচয়িতৃ-গণ বঙ্গসাহিত্যকে অসামান্য সৌষ্ঠব দান করিলেন। অনতিপরেই দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যসেবকগণ বঙ্গসাহিত্যকে ভারতবর্ষে সাহিত্যের আদর্শ করিয়া তুলিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সেই সাহিত্য-বীরগণের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়া তাঁহাদের গৌরব চিরস্মরণীয় করিতে যত্নবান হইয়াছে।

বর্ত্তমান সাহিত্যসেবিগণ অনেকেই পরিষদের সভ্য, অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁহারা সকলে অর্থশালী না হইলেও, বঙ্গের তাঁহারা রত্নস্বরূপ।

> বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
> বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
> বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
> বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ॥

বাল্মীকি, ব্যাস, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণের আর্থিক অবস্থা যেরূপই থাকুক না কেন, তাঁহারা সহস্র সহস্র বর্ষ কত শত লোকের যশের ও অর্থের আকর হইয়াছেন। কত শত গদ্য পদ্য লেখক, কত সহস্র গায়ক, তাঁহাদিগের অভ্র-ভেদী অনন্তরত্নপ্রভব গিরিগুহা হইতে রত্ন চয়ন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কোনও সম্রাট সেরূপ লোকপ্রতিপালক হইতে পারেন না। মধুসূদন এক বাল্মীকির সম্বন্ধেই বলিয়াছেন,—

> "তব পদচিহ্ন ধ্যান করি' দিবানিশি,
> পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
> দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
> অমর! শ্রীভর্ত্তৃহরি, সূরি ভবভূতি
> শ্রীকণ্ঠ; ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
> ভারতীর, কালিদাস সুমধুরভাষী;
> মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি
> মনোহর, কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস কবি
> এ বঙ্গের অলঙ্কার!"

মহারাজ, রাজা ও অন্যান্য বিদ্যোৎসাহিগণের নিকট প্রার্থনা এই যে,

তাঁহারা বিক্রমাদিত্য, ভোজরাজ প্রভৃতি চিরস্মরণীয়কীর্ত্তি নৃপতিগণের অনুকরণে সাহিত্য-পরিষদের পরিবর্দ্ধনার্থ যত্নবান হউন। সাহিত্য-সেবিগণের আর্থিক অবস্থা প্রায়ই ভাল নয়, কেবল তাঁহাদের উপর নির্ভর করিলে পরিষদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ সফলতা-লাভের আশা সামান্য; তাঁহারা সান্তঃকরণে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিবিধানে কৃতসংকল্প হইয়া বঙ্গদেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন। ভারতবর্ষ এখন ভিন্নদেশীয় সম্রাট কর্ত্তৃক শাসিত। তিনি ও তাঁহার প্রতিনিধিগণ ভারতবর্ষের উন্নতির নিমিত্ত সাধ্যমত যত্ন করিতেছেন। বিভিন্ন-জাতীয় হইলেও, তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ভাষা ও সাহিত্যসমূহের উন্নতির নিমিত্ত বিবিধ প্রকারেই চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যাইতে পারে না। এ দেশের ভূস্বামিগণ পুরাকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যসেবিগণের পৃষ্ঠপোষক। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের দুর্দ্দিনেও তাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য ও দেশীয় সাহিত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগের গুণেই, তাঁহাদিগের যত্নেই, হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দু-কীর্ত্তির ও দেশীয় সাহিত্যের রক্ষা ও উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। এখনও বঙ্গ-সাহিত্য তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী। সাহিত্য-পরিষদের আবাসস্থান হইয়াছে, কিন্তু রক্ষিত ধনভাণ্ডার ব্যতীত ইহার স্থায়িভাব সন্দেহজনক। বাসভূমি থাকায় অনেক উপকার হইতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত অর্থ না থাকিলে গৌরব-রক্ষা করা সহজ হইবে না। রক্ষিত ধনভাণ্ডারের জন্য পরিষদের রাজন্যগণের উপর নির্ভর করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার টাকা ন্যস্ত না থাকিলে পরিষদের মহৎ উদ্দেশ্যসমূহ কার্য্যে পরিণত করা দুরূহ হইবে। দেশের হিতসাধন, সাহিত্যসেবিগণের প্রতিপালন অনেক-পরিমাণেই ন্যস্ত ধনভাণ্ডারের উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিবে। বঙ্গবাসি-মাত্রেই এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারেন, পরিষদের বর্ত্তমান সভ্যগণ প্রয়োজনীয় ধনসঞ্চয়ের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারেন, কিন্তু বঙ্গীয়সমা-জের শীর্ষস্থ ভূস্বামী ও তাদৃশ অর্থশালিগণ স্থায়ী ভাব দিতে সমর্থ।

প্রবর্ত্ততাং প্রকৃতিহিতায় পার্থিবঃ
সরস্বতী শ্রুতমহতাং মহীয়তাম্।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

শ্রীহর্ষ।

—:০:—

"নৈষধ-চরিতে"র প্রণেতা কবি শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিতের ঔরসে, মামল্ল-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীহর্ষ কান্যকুব্জ-রাজ জয়ন্তচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। রাজশেখর সূরি ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে "প্রবন্ধকোষ" নামক গ্রন্থের রচনা করেন। তাহা পাঠে জানিতে পারি,—

বারাণসী পুরীতে গোবিন্দচন্দ্র নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিজয়-চন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র। বিজয়চন্দ্র স্বপুত্র জয়ন্তচন্দ্রকে রাজ্যদান করিয়া যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া তনুত্যাগ করেন। জয়ন্তচন্দ্রের পুত্র মেঘচন্দ্রের সিংহনাদে সিংহ পর্য্যন্ত পলায়ন করিত। জয়ন্তচন্দ্র সপ্তশতযোজনপরিমিত ভূমি জয় করিয়াছিলেন। শ্রীহর্ষের যখন বাল্যাবস্থা, তখন এক পণ্ডিত রাজসভায় শ্রীহীরকে শাস্ত্রীয় বিচারে পরাজিত করেন। শ্রীহর্ষ ইহাতে লজ্জিত হন। মৃত্যুকালে শ্রীহীর শ্রীহর্ষকে বলিয়া যান,—"পুত্র! আমি অমুক পণ্ডিত কর্ত্তৃক রাজসমক্ষে পরাজিত হইয়া দারুণ মনঃক্ষোভ পাইয়াছি; যদি সৎপুত্র হও, তবে রাজসভায় সেই পণ্ডিতকে পরাজিত করিও।"

পিতার মৃত্যুর পর, শ্রীহর্ষ বিশ্বস্ত আত্মীয়গণের প্রতি কুটুম্বভরণের ভার র্পণ করিয়া, বিদেশে গমনপূর্ব্বক, ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য-সন্নিধানে তর্ক, অলঙ্কার, গীত, গণিত, জ্যোতিষাদি বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। গঙ্গাতীরে সদ্গুরু-দত্ত চিন্তামণি-মন্ত্র এক বর্ষ সাধন করিলে, ত্রিপুরাদেবী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ত্রিপুরার বরে শ্রীহর্ষের বাক্-পটুতা জন্মিল; কিন্তু কেহ তাঁহার বাক্য বুঝিতে পারিল না। তিনি পুনর্ব্বার ভারতীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"মাতঃ, অতিবিদ্যায় আমার উপ-কার হইল না;—আমার কথা কেহ বুঝিতে পারে না; যাহাতে আমার কথা সকলে বুঝিতে পারে, তাহার উপায় করুন।" সরস্বতী বলিলেন,—"তুমি মধ্যরাত্রে সিক্তমস্তকে দধি পান কর, তাহা হইলে, কফাংশের আবির্ভাবে বোধ্যবাক্ হইবে।" শ্রীহর্ষ তাহাই করিলেন। এখন হইতে সকলে তাঁহার কথা বুঝিতে লাগিল। তিনি কৃতার্থ হইয়া কাশী নগরীতে গমন করিলেন। নগরতটে থাকিয়া জয়ন্তচন্দ্রকে জানাইলেন যে, "আমি অধ্যয়ন করিয়া আসিয়াছি।"

রাজা গুণপক্ষপাতী ছিলেন, তিনি হীর-জেতা পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত শ্রীহর্ষের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শ্রীহর্ষ রাজাকে নিম্নলিখিত শ্লোকে স্তব করিলেন,—

গোবিন্দনন্দনতয়া চ বপুঃ শ্রিয়া চ
মাস্মিন্ নৃপে কুরুত কামধিয়ং তরুণ্যঃ।
অস্ত্রীকরোতি জগতাং বিজয়ে স্মরঃ স্ত্রী-
রস্ত্রীজনঃ পুনরনেন বিধীয়তে স্ত্রী॥

শ্রীহর্ষ এই শ্লোক পাঠ করিয়া ইহার ব্যাখ্যা করিলেন; অনন্তর পিতৃবৈরী পণ্ডিতকে দেখিয়া বলিলেন,—

সাহিত্যে সুকুমারবস্তুনি দৃঢ়ন্যায়গ্রহগ্রন্থিলে
তর্কে বা ময়ি সংবিধাতরি সমং লীলায়তে ভারতী।
শয্যা বাস্তু মৃদূত্তরচ্ছদবতী দর্ভাঙ্কুরৈরাস্তৃতা
ভূমির্বা হৃদয়ঙ্গমো যদি পতিস্তুল্যা রতির্যোষিতাম্॥

ইহা শুনিয়া পিতৃবৈরী বলিলেন,—হে দেব বাদীন্দ্র! কেহ তোমার সমান নয়,—

হিংস্রাঃ সন্তি সহস্রশোঽপি বিপিনে শৌণ্ডীর্য্যবীর্য্যোদ্যতা-
স্তস্যৈকস্য পুনঃ স্তবীমহি মহঃ সিংহস্য বিশ্বোত্তরম্।
কেলিঃ কোলকুলৈর্মদো মদকলৈঃ কোলাহলং নাহলৈঃ
সংহর্ষো মহিষৈশ্চ যস্য মুমুচে সাহংকৃতে হুংকৃতে॥

ইহা শুনিয়া শ্রীহর্ষ ক্রোধত্যাগ করিলেন। রাজার যত্নে উভয়ে পরস্পর আলিঙ্গন করিলে, রাজা শ্রীহর্ষকে নিজসৌধে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে লক্ষ-সংখ্যক হেম দান করিলেন।

একদা রাজা শ্রীহর্ষকে বলিলেন,—"কবিবর! কোনও প্রবন্ধ রচনা করুন।" রাজাজ্ঞায় শ্রীহর্ষ "নৈষধ-চরিতে"র রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইলেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহর্ষকে বলিলেন, "ইহা অতি সুন্দর হইয়াছে। একবার কাশ্মীরে গমন করিয়া তত্রত্য পণ্ডিতদিগকে তোমার গ্রন্থ দেখাও। কাশ্মীরে ভারতীদেবী সাক্ষাৎ বাস করেন। তাঁহার হস্তে প্রবন্ধ দিলে, তিনি অসত্য প্রবন্ধ দূরে নিক্ষেপ করেন, সত্য প্রবন্ধ হইলে মস্তককম্পনপূর্ব্বক তাহাতে সম্মতিদান করেন।" শ্রীহর্ষ রাজার নিকট পাথেয়াদি লইয়া কাশ্মীরে গমন করিলেন। তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে স্বরচিত প্রবন্ধ দেখাইয়া ভারতী-হস্তে সমর্পণ করিলে, ভারতী তাহা দূরে নিক্ষেপ করিলেন। শ্রীহর্ষ বলিলেন, "তুমি

বৃদ্ধা হইয়া এত বিকলা হইয়াছ যে,আমার প্রবন্ধ দূরে নিক্ষেপ করিলে?" দেবী বলিলেন, "ওহে পরমমর্ম্মভাষক! তুমি 'দেবী পবিত্রিতচতুর্ভুজবামভাগা' বলিয়া আমার জগৎপ্রসিদ্ধ কন্যাভাবের লোপ করিয়াছ; তজ্জন্য আমি তোমার প্রবন্ধ নিক্ষেপ করিয়াছি।" শ্রীহর্ষ বলিলেন, "তুমি এক অবতারে নারায়ণকে পতি করিয়াছিলে, সেই জন্য বিষ্ণুপত্নী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছ; অতএব সত্য কথায় রাগ কর কেন?" তখন দেবী সভাসমক্ষে সাদরে পুস্তক ধারণ করিলেন। তখন শ্রীহর্ষ তত্রত্য পণ্ডিতদিগকে বলিলেন, "এই গ্রন্থ এই দেশের রাজা মাধবদেবকে দেখাও, এবং রাজা জয়ন্তচন্দ্রের নিকট এই গ্রন্থ যে বিশুদ্ধ, এতদ্বিষয়ে একখানা পত্র দাও।" পণ্ডিতেরা ঈর্ষ্যাবশে তাহার কিছুই করিলেন না। শ্রীহর্ষ কয়েক মাস কাশ্মীরে অবস্থান করিলেন। তাঁহার পাথেয়াদি ফুরাইল, বৃষভাদি বিক্রীত হইল, পরিচ্ছদাদি নষ্টপ্রায় হইল। একদা শ্রীহর্ষ নদ্যাসন্ন দেশে দেবালয়ে বসিয়া জপতৎপর আছেন, এমন সময়ে দুইটি দাসী জলাশয়ে জল লইতে আসল। তাহারা জলপাত্রে জল ভরিতে ভরিতে বিষম বিবাদ আরম্ভ করিয়া মাথা-ফাটাফাটি করিল। উভয়ে রাজসমীপে অভিযোগ করিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সাক্ষী কে? তাহারা বলিল, সেখানে এক বিপ্র জপ করিতেছিলেন। রাজা বিপ্র শ্রীহর্ষকে আহ্বান করিয়া বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীহর্ষ সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন,—"দেব! আমি উহাদের কথোপকথনের অর্থ বুঝিতে পারি নাই; কারণ, আমি এ দেশের ভাষা জানি না। তবে উহারা যে যাহা বলিয়াছে, তাহা অবিকল বলিতে পারি।" ইহা বলিয়া তিনি তাহাদের উক্তি প্রত্যুক্তি যথাযথ বলিলেন। রাজা শ্রীহর্ষের এই অসাধারণ স্মরণ-শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। দাসীদ্বয়ের বিবাদমীমাংসা করিয়া বলিলেন, "হে সুধীবর, তুমি কে?" শ্রীহর্ষ আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে জ্ঞাপন করিলেন। রাজা পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। পণ্ডিতেরা নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া শ্রীহর্ষকে আপন আপন গৃহে আনিয়া সৎকার করিলেন। রাজা শ্রীহর্ষকে প্রশংসাপত্র দিলেন। পণ্ডিতেরাও "নৈষধচরিতে"র শুদ্ধতা স্বীকার করিলেন। শ্রীহর্ষ জয়ন্তচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত ঘটনা জানাইলেন।

এই সময়ে জয়ন্তচন্দ্রের পদ্মাকর নামক মন্ত্রী কার্য্যানুরোধে অনহিলপুরীতে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে এক সরোবরতটে দেখিলেন, রজক-ক্ষালিত

বস্ত্রে ভ্রমরকুল বসিয়াছে; দূর হইতে দেখিলে বোধ হয়, যেন কেতকী ফুলে ভ্রমর বসিয়াছে। মন্ত্রী মনে মনে বুঝিতে পারিলেন, ইহা পদ্মিনী-জাতীয় কোনও স্ত্রীলোকের বাড়ী হইবে। তিনি রজকের সহিত সায়ংকালে সেই যুবতীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যুবতীর নাম সুহব দেবী। মন্ত্রী রাজা কুমারপালের নিকট উপরোধ করিয়া, যুবতীকে লইয়া সোমনাথ তীর্থে যাত্রা করিলেন। তথা হইতে সুহবদেবীকে জয়ন্তচন্দ্রের ভোগিনী করিয়া দিলেন। এই নারী বিদুষী ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার "কলাভারতী" উপাধি হইল। লোকে শ্রীহর্ষকে "নরভারতী" বলিত। শ্রীহর্ষের যশঃ এই নারীর সহ্য হইত না। একদা তিনি দূর হইতে শ্রীহর্ষকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "তুমি কে?" শ্রীহর্ষ বলিলেন, "আমি কলাসর্ব্বজ্ঞ।" নারী বলিলেন, "তাই যদি হও, তবে আমার চরণে জুতা পরাও।" শ্রীহর্ষ আপন অজ্ঞতাপরিহারমানসে নারীর চরণে জুতা পরাইয়া বলিলেন, "পদপ্রক্ষালন কর—আমি চর্ম্মকার।" শ্রীহর্ষ রাজাকে সুহবদেবীর এই সমস্ত কুচেষ্টা জানাইয়া খিন্নমনে গঙ্গাতীরে গমনপূর্ব্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিলেন।

রাজা জয়ন্তচন্দ্রের কুশাগ্রীয়বুদ্ধি বিদ্যাধর নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্পর্শমণির প্রসাদে ৮৮০০ বিপ্রকে ভোজন করাইতেন; তজ্জন্য তাঁহার "লঘু যুধিষ্ঠির" খ্যাতি হয়। জয়ন্তচন্দ্র মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি কাহাকে আমার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিব?" মন্ত্রী মেঘবাহনকে রাজা করিতে বলিলেন। রাজা সুহবদেবীর পুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। তজ্জন্য রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। যাহা হউক, রাজা মন্ত্রীর কথা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া মেঘবাহনকেই রাজ্য দিতে সম্মত হইলেন। সুহব-দেবী ইহাতে কুপিত হইয়া তক্ষশিলাধিপতি সুরত্রাণের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, যদি তুমি কাশীধ্বংসের জন্য সসৈন্যে আগমন কর, তাহা হইলে, আমি তোমাকে সওয়া লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিব। বিদ্যাধর গুপ্তচরমুখে সুহবদেবীর সমুদয় ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না,—প্রত্যুত মন্ত্রীকে হাঁকাইয়া দিলেন। মন্ত্রী পর দিবস রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দেব! যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আমি গঙ্গাজলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করি।" রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে আমিও বাঁচি,—আমার কর্ণজ্বালা নিবৃত্ত হয়।" মন্ত্রী গৃহে গিয়া যথাসর্ব্বস্ব ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া জাহ্নবীজলমধ্যে প্রবেশ করিয়া কুলপুরোহিতকে বলিলেন,

"দান গ্রহণ করুন।" ব্রাহ্মণ হস্ত প্রসারিত করিলে, তিনি তদীয় হস্তে স্পর্শমণি প্রদান করিলেন। "ধিক্ তোমার দান,—আমাকে একখণ্ড প্রস্তর দান করিলে!" ইহা বলিয়া সেই বিপ্র স্পর্শমণি জলে নিক্ষেপ করিলেন। বিদ্যাধর জলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এ দিকে সুরত্রাণ আসিয়া নগর আক্রমণ করিল। রাজা সম্মুখযুদ্ধে হত হইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। যবনেরা নগরলুণ্ঠন করিল।

এখন উপরি-উক্ত বর্ণনা অবলম্বনে আমরা কিছু বলিব,—

(১) জয়ন্তচন্দ্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্র। ইনি ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যভ্রষ্ট হন।

(২) জয়ন্ত কান্যকুব্জের অধীশ্বর ছিলেন। কাশী, কুশিকোত্তর ও কোশল তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেমন কৃষ্ণনগরের রাজা নবদ্বীপাধিপতি বলিয়া বর্ণিত হন, সেইরূপ কান্যকুব্জ-রাজগণ বারাণসীর অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হন।

(৩) প্রবন্ধোক্ত সুরত্রাণ কে, বুঝিতে পারা যায় না। সুরত্রাণ হয় ত সুলতান শব্দের সংস্কৃত আকার।

মুসলমানদের কান্যকুব্জ আক্রমণ সম্বন্ধে রাজশেখর যে কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোনও ইতিহাসে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। রাজশেখরের বর্ণনা কিয়দংশে উপন্যাস-জড়িত। তিনি শ্রীহর্ষের সার্দ্ধশতাধিক বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সমস্ত বর্ণনা ভ্রমশূন্য হয় নাই।

প্রবন্ধকোষে জানা যায়, নৈষধকাব্য ১১৭৪ খৃষ্টাব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীহর্ষের সময়-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বহু পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। সায়ণমাধব বলিয়াছেন,শ্রীহর্ষ, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক। সায়ণের অনেক উক্তিই ইতিহাসবিরুদ্ধ। তিনি শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী অনেক কবিকেই শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক পরাজিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চাঁদ কবির নামে প্রচলিত পৃথ্বীরাজরাসে" গ্রন্থ শ্রীহর্ষকে কালিদাসের পূর্ব্বতন বলিয়াছেন। ইহা অনৈতিহাসিক। এই গ্রন্থ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছে। শ্রীহর্ষ যে জয়চন্দ্রের সমসাময়িক, রাজশেখরের এই উক্তি ভ্রমশূন্য?

নৈষধদীপিকা নাম্নী নৈষধের এক টীকা পাওয়া গিয়াছে। উহা ১৩৫৪ সংবতে (১২৯৬ খৃষ্টাব্দে) অহমদাবাদের সমীপে ঢোলকা গ্রামে চাণ্ডু পণ্ডিত

কর্তৃক প্রণীত হয়। এই টীকায় হর্ষকে কালিদাস অপেক্ষা বহু অর্ব্বাচীন বলা হইয়াছে।

শ্রীহর্ষ নৈষধ ব্যতীত শ্রীবিজয়প্রশস্তি, গৌড়োর্ব্বীশকুলপ্রশস্তি, নবসাহসাঙ্ক-চরিত প্রভৃতির রচনা করেন।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

জাপানী গল্প।

—:০:—

ঝিনুকপুরী।

দুই রাজপুত্তুর; বড় হলেন ঝলক-কুমার, ছোট হলেন ঝিলিককুমার। বড় কুমার রোগেই আছেন, কাছে যায় কার সাধ্য? যেন আগুনের ঝলক! আর ছোট কুমারের রাগ পলকে মিশায়, যেন আকাশের ঝিলিক!

ঝলককুমার মাছ ধর্‌তে ভারি পটু; আর ঝিলিককুমার বড় শিকারী; ঝলককুমারের ছিপ জলে পড়লে সমুদ্র যেন শুকিয়ে যায়, আপনি এসে মাছ ধরা দেয়। আর ঝিলিককুমারের তীর বিদ্যুতের মত ছোটে, তাঁর তলোয়ার বজ্রের মত হানে,আকাশের পাখী,বনের বাঘ কারো নিস্তার নাই। রাজা রাণী ছোট ছেলেটিকে বেশী ভালবাসেন; সেই জন্যে ঝলককুমার ছোট ভাইয়ের উপর হাড়ে চটা।

ঝিলিককুমার দাদার কাছে রোজ বকুনী খান, মার খান, কিছু বলেন না; দাদার হাতে পায়ে ধরে বলেন,—"দাদা! রাগ কোরো না, আমায় ক্ষমা কর।"

দাদা রোজ বড় বড় মাছ ধরে আনেন দেখে ঝিলিককুমারের একদিন মাছ ধরবার ভারি ইচ্ছে হল; দাদাকে গিয়ে বল্‌লেন,—"দাদা, বনের পশু মেরে মেরে আমার অরুচি জন্মে গেছে; আজ আমার মাছ ধর্‌বার সাধ হয়েছে, তোমার ছিপটা একবার দাও না দাদা।"

ঝলককুমার এই কথা শুনে রেগে উঠে বল্‌লেন,—"যা, যা; তোর আর মাছ ধর্‌তে হবে না, আমার ছিপ খারাপ করে ফেল্‌বি।"

ঝিলিককুমারের অনেক সাধ্যসাধনার পর, কি জানি কেন, সে দিন ঝলককুমারের মনটা একটু নরম হয়ে এল। তিনি ছোট ভাইকে মাছ ধর্‌তে নিজের ছিপগাছটি দিলেন।

ঝিলিককুমার জাল দড়া টোপ বঁড়শী নিয়ে রাত থাকতে গিয়ে সমুদ্রে ছিপ ফেলেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে খটমটে রোদ উঠ্‌ল, ঝিলিককুমার এক দৃষ্টিতে ফাৎনার দিকে চেয়ে বসে আছেন, আর চার ফেলছেন; চারের গন্ধে মাছ ভুর ভুর করছে, কিন্তু সে গন্ধে একটাও টোপ গিল্‌ছে না।

এমনি করে বেলা বয়ে যায়; সকাল গিয়ে দুপুরের রোদ আগুন হয়ে উঠ্‌ল; সেই রোদ মাথায় লেগে ঝিলিককুমারের রক্তও আগুন হয়ে উঠ্‌ল। রাজবাড়ী থেকে কতবার কত লোক ছোট রাজকুমারকে খাবার জন্তে ডাক্‌তে এল, তিনি তাদের সকলকে হাঁকিয়ে দিলেন; বল্‌লেন "মাছ না ধরে আজ আমি জলস্পর্শ কর্‌ব না।"

রাজা ডেকে পাঠালেন; রাণী বলে পাঠালেন; তবুও রাজপুত্র উঠ্‌লেন না। ছিপ হাতে গোঁ হয়ে বসে রইলেন। রোদ পড়ে গেল; সন্ধ্যা হয়ে এসেছে; চেয়ে আর কিছু দেখা যায় না; তবুও রাজপুত্র ওঠেন না। এমন সময় একটা মাছ ঠক্ করে এসে একবার ঠোকরালে। রাজকুমার ছিপটা একটু শক্ত করে ধরে বসলেন, সময় বুঝে এক টান্! কিন্তু যেমন টান মারা, মাছটাও ল্যাজের এক ঝাপটায় ডোর বঁড়শী ছিঁড়ে দৌড়।

এত রাত্রে শুধু হাতে বাড়ী ফিরতে দেখে ঝলককুমার ছোট ভাইকে বিদ্রূপ করে বল্‌লে,—"দে আমার ছিপ, মাছ ধরা কি তোর কর্ম্ম? বুনো কোথাকার!"

তার পর যখন ছিপ হাতে নিয়ে ঝলককুমার দেখলেন, বঁড়শী নেই, তখন আর কোথা যায়, একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠে গালমন্দ দিয়ে বল্‌লেন,— "যেখান থেকে পারিস আমার বঁড়শী এনে দে; নয় ত আজ তোরই এক দিন কি আমারই একদিন।"

সমস্ত দিন না খেয়ে না দেয়ে একটা মাছ ও ধরতে না পেয়ে ঝিলিককুমারের মন ভারি খারাপ ছিল; তার উপর দাদার এই বকুনিতে তাঁর মনে ভারি রাগ হল। মনের ক্ষোভে নিজে সখের তরোয়ালখানা বার করে হাতুড়ীর ঘায়ে চুরমার করে ফেল্‌লেন, তার পর সেই ইস্পাতের টুকরো নিয়ে তাতে পাঁচ শ' বঁড়শী গড়িয়ে দাদাকে দিতে গেলেন। ঝলককুমারের রাগ তাতে

পড়্‌ল না; ঝিলিককুমারের গালে এক চড় বসিয়ে দিয়ে বল্‌লেন, "পাঁচ শ' বঁড়শী চাই না; আমার সেই বঁড়শীই এনে দে।"

দাদা রাগ করেচেন; ঝিলিককুমারের প্রাণে তখন আর রাগ নাই; তিনি দাদাকে ভোলাবার জন্যে পাঁচ শ' বঁড়শীর জায়গায় হাজার বঁড়শী তৈরি করে নিয়ে বল্‌লেন, "দাদা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমার উপর রাগ করে থেকো না, এই নাও, তোমার জন্যে ভাল ইস্‌পাত দিয়ে নিজের হাতে গড়ে হাজার বঁড়শী এনেছি।"

ঝলককুমার সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন,—"এ আমি চাই না—যে বঁড়শী হারিয়েছিস্‌, তাই এনে দে।"

ঝিলিককুমার কি করেন? সমুদ্রে কোন্‌ মাছ সে বঁড়শীটি নিয়ে অগাধ জলের কোন্‌খানে লুকিয়ে আছে, তিনি কেমন করে তা এনে দেবেন? রোজ দাদার কাছে বকুনী খান, মার খান,—অমন সকের শিকার ঘুচে গেছে, মনের দুঃখেই আছেন।

একদিন খুব ধমকানি খেয়ে মনে ভারি দুঃখ হয়েছে,—বুক ফেটে কান্না আস্‌ছে,—সমুদ্রের তীরে নির্জ্জন জায়গায় বসে হাপুস নয়নে কাঁদছেন, এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন; ঝিলিক-কুমারের দাড়িটি তুলে ধরে আদর করে জিজ্ঞাসা কল্লেন,—"রাজকুমার! কাঁদছ কেন? কি হয়েছে?"

ঝিলিককুমার সন্ন্যাসীকে বঁড়শী হারানর সব কথা খুলে বল্লেন,—"দাদা সেই হারান বঁড়শীটি চান, তা এখন তাঁকে কোত্থেকে এনে দি!"

সন্ন্যাসী বল্লেন—"এস আমি উপায় করে দিচ্ছি।" এই বলে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে, সমুদ্রের জলে একটা জেলেডিঙ্গি ভাসছে, সেইখানে আনলেন।

সন্ন্যাসী বল্‌লেন,—"রাজকুমার! এই ডিঙ্গিতে ওঠ—কোনও ভয় নেই, সমুদ্র এখন বেশ ঠাণ্ডা, খুব আরামে যেতে পার্‌বে। এই উত্তর মুখ করে বরাবর বেয়ে যাও,—যেতে যেতে দেখতে পাবে, ঠিক সামনেই ঝিনুকে বাঁধান এক প্রকাণ্ড বাড়ী—সে হচ্ছে শঙ্খরাজের প্রাসাদ। সেই প্রাসাদের সামনে একটা কুয়ো আছে, তারই ধারে এক বৃহৎ মুক্তলতার গাছ আছে; তুমি ডিঙ্গি থেকে নেমে সেই গাছের মাথায় চড়ে বসে থেকো;—তা হ'লেই তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে।"

ঝিলিককুমার তাই করলেন। সন্ন্যাসী যা যা বলে দিয়েছিলেন, সব ঠিক

মিলল। খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌লেন, ধবধবে ঝিনুকপুরী, ফটকের সামনে কুয়ো, তার পাশেই সেই বৃহৎ মুক্তলতার গাছ।

ডিঙ্গি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ঝিলিককুমার সেই গাছের উপর উঠে বসলেন। কতক্ষণ এমনি করে কেটে গেল।

মুক্তকেশী রাজকন্যার দাসীরা সোনার কলসী কাঁকে সেই কুয়োর জল নিতে এসেছে; দেখে, ফটিকের মত যে সাদা জল, তার উপর একটা কালো ছায়া। কিসের ছায়া? উপর দিকে চেয়ে দেখে, মুক্তলতার গাছে বসে এক অপরূপ সুন্দর পুরুষ!

রাজপুত্র দাসীদের দেখে বল্‌লেন, "আমার বড় তেষ্টা পেয়েছে, তেমারা কেউ আমাকে একটু জল দাও।"

এক দাসী সোনার কলসী থেকে ফটিকের মত জল গড়িয়ে সোনার ঘটী ঝিলিককুমারের হাতে তুলে দিলে। রাজকুমার সেই সোনার ঘটী নিয়ে ডান হাতে মুখের কাছে ধরে বাঁ হাতে গলার মুক্তোর মালা থেকে বড় দেখে একটা মুক্তো ছিঁড়ে নিয়ে সেই গেলাসে টপ করে ফেলে দিলেন। মুক্তো শুদ্ধ সোনার ঘটী দাসীরা রাজকন্যার কাছে নিয়ে গেল। মুক্তকেশী রাজকন্যা সেই মুক্তো দেখে বল্‌লেন, "এ মুক্তো কোথায় পেলি, কার গলার মালা থেকে নিয়ে এলি? এ যে মানুষ-মানুষ গন্ধ করে? সমুদ্রের মাঝে ঝিনুকপুরী, এখানে কি মানুষ এল!"

দাসীরা বল্‌লে, "আজ সকালে জল আন্‌তে গিয়েছিলুম; কুয়োর ভিতর চেয়ে দেখি, ধব্‌ধবে সাদা জলে কালো ছায়া! এ দিক দেখি, সে দিক দেখি, নীচে চাই, উপরে চাই, সাদা জল কালো হ'ল কিসে! ওমা! চেয়ে দেখি না, কুয়োর পাশে মুক্তলতার গাছে বসে এক রাজকুমার! মানুষের মত ধরণ, বিদ্যুতের প্রায় বরণ, মেঘের মত কেশ, মণিমুক্তোর বেশ, হীরের মত দাঁত, চুনির মত ঠোঁট, ঝিনুকের মত নখ! জল খেতে চাইলেন, সোনার কলসী থেকে সোনার ঘটীতে জল গড়িয়ে দিলুম; হাতে নিলেন, কিন্তু জল খেলেন না, গলার মালা থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ঘটীতে ফেলে দিলেন।"

মুক্তোকুমারী দাসীদের বল্‌লেন "চল্, আমায় নিয়ে চল; কেমন্ সে রাজকুমার, একবার দেখে আসি।"

মুক্তোকুমারী খিড়কীর দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে রাজকুমারকে দেখছেন, মুক্তোকুমারীর গা থেকে জোছনার মত আভা এসে

ঝিলিককুমারের মুখে পড়ল। রাজকুমার চমকে উঠে খিড়কীর দিকে চেয়ে দেখলেন; চার চোখে মিলন হ'ল! মুক্তোকুমারী লজ্জা পেয়ে সরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারের মুখের উপর থেকে জোছনার আভাও মিলিয়ে গেল। ঝিলিককুমারের মুখ মলিন হল।

শঙ্খরাজের কাছে খবর গেল, ঝিনুকপুরীতে মানুষের দেশ থেকে এক রাজপুত্র এসেছেন। তিনি তাড়াতাড়ি এসে ঝিলিককুমারকে প্রাসাদের মধ্যে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। মখমলের মত কোমল পদ্মপাতার আসনে বসালেন; ঝিনুকের বাসনে সমুদ্রের মাছ খাওয়ালেন; হাঁসের ডিমের মত এক ছড়া মুক্তোর মালা ভেট দিলেন।

ঝিলিককুমারকে দেখে অবধি মুক্তোকুমারীর কি হয়েছে,—খান্ না দান্ না, আনমনে সর্ব্বদা কি ভাবেন। মৎস্যরাণীর এই এক মেয়ে। তাঁর বড় ভাবনা হ'ল। কত হাকিম এল, বদ্যি এল, কত ওষুধপত্র দিয়ে গেল। কিন্তু কিছুতে কিছু হল না। মুক্তোকন্যা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগ্‌লেন।

রাজকুমার মুক্তোকন্যাকে সেই খিড়কীর আড়ালে চকিতের মত একবার দেখেছেন, আর তাঁর দেখা পান্‌নি; মুক্তোকুমারীকে দেখ্‌বার জন্য তাঁরও মন ছটফট করে, কিন্তু দেখা আর হয় না।

একদিন শঙ্খরাজ সভায় এসে বসেছেন, মুখটা ভার-ভার, মনটা আন্‌চান।

ঝিলিককুমার জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ! আজ আপনাকে এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?"

শঙ্খরাজ বল্‌লেন,—"রাজকুমার! আমার একটিমাত্র কন্যা; সে আজ ক' দিন থেকে কি এক অসুখে ভুগ্‌ছে, কেউ কিছু কর্ত্তে পাচ্ছে না; মা আমার দিনে দিনে চাঁদের মত ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে!"

মুক্তোকুমারীকে দেখ্‌বার এই একটা সুযোগ বুঝে ঝিলিককুমার বল্‌লেন, "মহারাজ! যদি অনুমতি দেন, আমি রাজকন্যাকে একবার দেখি, যদি আরাম কর্ত্তে পারি।"

ঝিলিককুমার মুক্তোকুমারীকে দেখ্‌তে গেলেন। তাঁকে দেখে মুক্তকেশী রাজকন্যার অর্দ্ধেক অসুখ তখনই সেরে গেল।

রোজ দুবেলা ঝিলিককুমার মুক্তোকন্যাকে দেখতে যান। তাঁর সঙ্গে মানুষের দেশের কত গল্প করেন; মুক্তোকন্যা অবাক হয়ে শোনেন। এমনি করে কিছু দিন যায়। মুক্তোকুমারী একেবারে সেরে উঠ্‌লেন। শঙ্খরাজ সন্তুষ্ট হয়ে নিজের মেয়ের সঙ্গে ঝিলিককুমারের বিয়ে দিতে চাইলেন।

হাঙ্গর কুমীরের জুড়ীতে ঝিনুকের গাড়ীতে বর বেরুল; কচ্ছপ আর ক্যাঁকড়ার পিঠে চড়ে বরযাত্রীরা গমন করলেন; ব্যাঙ্গ মশায় সানাইয়ে পোঁ ধরলেন; হাঁস-পক্ষীতে মাছের নাচ সঙ্গে সঙ্গে চল্‌ল। মুক্তোকন্যাকে বিয়ে করে রাজকুমার ঝিনুকপুরীতে সুখে আছেন, হঠাৎ একদিন বাড়ীর কথা মনে পড়ল। ঝিলিককুমার এক দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। কি দুঃখ স্বামীর বুকের ভিতর পোষা আছে? তা দূর করবার কি কোন উপায় নেই? এই মনে করে মুক্তোকুমারী জিজ্ঞাসা করলেন "রাজকুমার! তোমার দুঃখ কিসের, আমায় বল।"

রাজকুমার বল্‌লেন, "অনেক দিন দেশ ছাড়া, একবার দেশে যাবার ইচ্ছে হয়েছে।"

মুক্তোকুমারী বল্‌লেন, "তার আর ভাবনা কি, তুমি এখুনি যাও না।"

ঝিলিককুমার স্ত্রীকে তখন দাদার সেই বঁড়শী হারানোর কথা সব খুলে বল্‌লেন, "দাদার সে বঁড়শীটি নিয়ে যেতে না পার্‌লে তিনি আমায় আস্ত রাখ্‌বেন না।"

শঙ্খরাজের কানে এ কথা উঠল। তিনি সমুদ্রের সব মাছকে তলব করে পাঠালেন। কে সেই বঁড়শী নিয়েছে, খোঁজ পড়ে গেল।

এক দূত মাঝ-সমুদ্র থেকে খবর এনে বল্‌লে "মহারাজ! 'তাই' মাছের বুড়ী দিদিমার আজ তিন বছর থেকে গলায় কি আটকে আছে, ভাল করে খেতে পারে না, গলায় ব্যথা, খুক্ খুক করে কাশে। তার গলাটা একবার সন্ধান করুন।"

'তাই' বুড়ী একে বুড়ো বয়সে জ্বরে থর থর করে কাঁপে, তার উপর রাজা ডেকে পাঠিয়েছেন। বুড়ী আরো কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মুক্তোরাজের সামনে এসে হাজির হ'ল, বল্‌লে,—"দোহাই মহারাজ! আমি কিছু জানি না।" শঙ্খরাজ বদ্যি ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে তাই বুড়ীর গলাটা ভাল করে দেখে একটা সোন্না দিয়ে একটা রক্তমাখা বঁড়শী টেনে বার করে আনলেন। ঝিলিককুমার দেখে চিনলেন, এ সেই দাদার বঁড়শী।

রাজপুত্র এইবার দেশে যাবার জন্য উদ্যোগ কচ্ছেন। শঙ্খরাজ এসে বল্লেন, "দেখ রাজকুমার! দেশে যাচ্ছ, সাবধানে থেকো;—তোমার দাদা যখন একটা বঁড়শীর জন্য তোমাকে এত কষ্ট দিলেন, তখন তিনি সব কর্ত্তে পারেন। তুমি এই দুটো মুক্তো নাও;—এটার নাম জোয়ারী মুক্তো,এটার নাম ভাঁটাই

মুক্তো। যখন দেখ্‌বে, দাদা রাগ করে তোমাকে মারতে আস্‌ছেন; তখন এই জোয়ারী মুক্তো হাতে করে তুলে ধোরো, অমনি সমুদ্র থেকে জোয়ারের জল গিয়ে তাঁকে ডুবিয়ে দেবে; তাতে ভয় পেয়ে যদি তিনি ক্ষমা চান, তা হোলে এই ভাঁটাই মুক্তো তুলে ধোরো, অমনি সে জল ভাঁটার টানে সমুদ্রে গিয়ে পড়বে।”

সাত নৌকা ভরা সাত হাজার ঝিনুক, সেই সিন্দুকের ভিতর সাত লক্ষ মুক্তো, তাই নিয়ে ঝিলিককুমার দেশে ফিরলেন। রাজা রাণী পুত্রশোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে পড়েছিলেন, আবার ছেলের মুখ দেখে তাঁদের চোখে দৃষ্টি এল, মুখে হাসি ফুট্‌ল। রাজ্য এতদিন বিষাদময় ছিল; এখন ঘরে ঘরে আনন্দধ্বনি উঠল। রাজা দীন দুঃখীকে অর্থ বিতরণ করলেন, রাণী দেবতার পূজো দিলেন।

ঝিলিককুমার যেখানে যান, সেইখানেই আদর পান। রাজা আদর করেন, রাণী আদর করেন, বাড়ীর যে যেখানে আছে সকলে আদর করে। পথে ঘাটে সব জায়গায় ঝিলিককুমারের কথা। ঝিলিককুমার যে ঝিনুক পুরী থেকে সাত লক্ষ হাঁসের ডিমের মত মুক্তো এনেছেন,সে কথা চারি দিকে প্রচার হয়ে গেল; দেশ বিদেশ থেকে সেই মুক্তো দেখবার জন্য লোক ভেঙ্গে পড়তে লাগল।

এই সব দেখে শুনে ঝলককুমারের বুক রাগে ফেটে যেতে লাগল।

ঝলককুমার ভাবলেন, সেই বঁড়শীটা নিয়ে ঝিলিককুমারকেও দেশছাড়া করেছিলুম; আবার আপদ এসে জুটেছে। এবারও কেন সেই বঁড়শী নিয়ে তাকে জব্দ করি না। এই না ভেবে তিনি ঝিলিকুমারের কাছে বঁড়শীর দাবী করতে গেলেন। তিনি চাইবামাত্র ঝিলিককুমার বঁড়শীটা বার করে দিলেন। বড় রাজকুমার সে বঁড়শীটা সত্যই ফিরে পাবেন মনেও করেন্‌নি। হঠাৎ বঁড়শীটা দেখে থতমত খেয়ে গেলেন, কিন্তু যদি সেটা নিজের বড়ঁশী বলে স্বীকার করেন, তা হলে ভাইকে ত আর জব্দ করা হয় না। তিনি তাড়াতাড়ি থতমত ভাবটা সামলে নিয়ে খুব রাগ দেখিয়ে, খাপ থেকে তরোয়ালটা খুলে ফেলে বল্‌লেন, “আমার সঙ্গে জুচ্চুরি?”

তরোয়ালটা মাথার উপর পড়ে আর কি, এমন সময়ে ঝিলিককুমার সেই জোয়ারী মুক্তো তুলে ধরলেন; দেখতে দেখতে কোত্থেকে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ নিয়ে সমুদ্রের জল এসে হাজির হল;—ঝলককুমারকে ডুবিয়ে ফেল্লে; ঝলক-কুমার একটু সামলে নিয়ে ভেসে উঠলেন,—সাঁতার কাটতে লাগলেন। কিন্তু

তাতেই কি রক্ষা আছে? ঢেউয়ের উপর ঢেউ এসে তাঁকে একেবারে অস্থির করে তুললে; নাকানি চোবানি খেয়ে প্রাণ হাঁপাই হাঁপাই করে উঠল;—নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাচ্ছেন না,—প্রাণ যায়।—ঝিলিকুমারকে ডাক দিয়ে বল্লেন,—"ভাই রক্ষে কর, রক্ষে কর; আর এমন কাজ করব না।"

ঝিলিককুমার ভাঁটাই মুক্তো তুলে ধরলেন; হুস করে সমুদ্রের জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ল; ঝলককুমার রক্ষা পেলেন।

সেই দিন থেকে জোয়ারের জলে বড় কুমারের রাগের ঝলক চিরদিনের মত নিভে গেল। ঝিলিককুমারের সঙ্গে আর কখনও ঝগড়া হয় নি।

কাঠুরের গল্প।

এক বুড়ো কাঠুরে, তার গালে এক আব্, মস্ত যেন ডাব! একদিন সে কাঠ কাটতে এক পাহাড়ে গেছে। বাড়ী ফেরবার মুখে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি, আর তার সঙ্গে গাছের ডাল-পালা উড়িয়ে পাথরের কুচি ছড়িয়ে এলোমেলো হাওয়া উঠল। সেই দুর্যোগে ত আর বাড়ী ফেরা যায় না, পথের মাঝে অনেকদিনকার এক প্রকাণ্ড গাছ আছে, সেই গাছের গুঁড়ি ফোঁপরা হয়ে একটা কোটরের মত হয়েছে, তারি ভিতর সে আশ্রয় নিলে।

ঝড়বৃষ্টি থামে না। ক্রমে রাত অনেক হয়ে গেল; তখনও কাঠুরে সেই কোটরের মধ্যে বসে; এমন সময় শুনতে পেলে, অনেক লোক এক সঙ্গে মিলে গণ্ডগোল করতে করতে যেন অনেক দূর থেকে তার দিকে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আস্ছে। সে ভাবলে,—"তাই ত! আমি মনে করেছিলুম, এই পাহাড়ের মধ্যে আমি একলাই বুঝি ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছি, কিন্তু তা ত নয়, আরো ঢের লোক রয়েছে যে।"

তখন তার মনে একটু সাহস হল। কোটরের ভিতর থেকে উঁকি মেরে সে দেখ্লে, এক দল লোক সেই দিকে আসছে;—কিন্তু তারা ঠিক মানুষের মত নয়! তাদের চেহারা কেমন এক রকমের—কারুর মোটে একটা চোখ; কারুর হাত আছে, পা নেই; কারুর শুধু মুণ্ডটা, আছে ধড়টা নেই; কারুর মুখটা একেবারেই নেই। তারা কেউ শাদা, কেউ নীল, কেউ হলদে, কেউ বেগুণে, কেউ লাল, কেউ কালো, কেউ অন্য রঙের রং-বেরং পোষাক পরা।

একটা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করে' তারা কি এক রকম কাঠ দিয়ে আগুন তৈরি কর্‌লে। ঝমাঝম্ বৃষ্টি, তবু দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল ;—সেই আলোয় সমস্ত পাহাড়টা দিনের মত হয়ে গেল। তখন কাঠুরে দেখলে, সে একটা দৈত্যের দল!

অগ্নিকুণ্ডুর চার পাশে সার দিয়ে ঘিরে বসে তারা মদ খাচ্ছে, হাসি ঠাট্টা চল্‌ছে, গল্পগুজব জমে উঠেছে, এমন সময় তাদের মধ্যে থেকে এক জন ছোকরা লাফিয়ে উঠে ধেই-ধেই করে' নাচ সুরু করে দিলে ; তার দেখাদেখি আরো অনেকে নাচ্‌বার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সকলকার নাচের চোটে পাহাড়টা টলমল কর্‌তে লাগ্‌লো।

কাঠুরে কোটরে বসে বসে এই সব ব্যাপার দেখ্‌ছে,—নাচ্ দেখে তার মনটাও নেচে উঠল। 'যা-থাকে-কপালে' এই না বলে, কাঠুরে কুড়ুলটা ফেলে, পাগড়ীটা মাথায় এঁটে, কোটর থেকে ছুটে বেরিয়ে দৈত্যদের মাঝখানে লাফিয়ে পড়ে, তাদের সঙ্গে মিলে মহা ফুর্ত্তি করে নাচ্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তার সে নাচন দেখে কে!—ঘুরে ঘুরে, পা তুলে তুলে, হাত নেড়ে নেড়ে, কোমর বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নাচ! দৈত্যেরা তার সে নাচ দেখে ভারি খুসী হ'ল—মানুষের নাচ তারা আর কখন দেখেনি।

নাচ শেষ হয়ে গেলে তারা সকলে মিলে বাহবা দিয়ে বল্‌লে,—"কাঠুরে ভাই! তুমি নাচ বেশ! কিন্তু একদিন নাচ দেখিয়ে সরে পড়লে হবে না, রোজ এসে আমাদের সঙ্গে এমনি করে নাচতে হবে।"

কাঠুরে বল্‌লে,—"তা বেশ ত!"

এক জন দৈত্য তখন বলে উঠল,—"বিশ্বাস নেই, আমরা দৈত্য, আর ও মানুষ ; ছাড়া পেলে আমাদের ভয়ে হয় ত আর এ-মুখো হবে না। ও যে আমাদের কাছে নিশ্চয় আসবে, তার প্রমাণের জন্য একটা কিছু জিম্মে রেখে যাক।"

সকলে চেঁচিয়ে উঠল,—"ঠিক বলেছ!"

এক জন বল্‌লে,—"ও ওর কুড়ুলটা রেখে যাক।"

আর একজন বল্‌লে,—"না, না, ওর টুপিটা।"

আর এক জন বাধা দিয়ে বল্‌লে,—"দূর! টুপি কুড়ুল ত ভারি জিনিস! একটা গেলে দশটা হবে। তার চেয়ে ওর একটা পা কেটে রাখা হোক্।"

টুপিটা রাখবার কথা যে বলেছিল, সে তখন চটে উঠে বল্‌লে,—"তোর যেমন বিদ্যে! পা কেটে নিলে আমাদের কাছে ফিরে আসবে কি করে? আমাদের মত ও ত আর দত্যি নয় যে, এক পায়ে হাঁটবে!"

কি জিম্মে রাখা হবে, তা আর কিছুতে ঠিক হয় না; তখন এক কন্ধ-কাটা দৈত্য পেটের ভিতর থেকে কথা কয়ে বল্‌লে,—"ঠিক হয়েচে, ঠিক হয়েচে!"

সেই কথা শুনে সকলে এক সঙ্গে বলে উঠ্‌ল,—"কি? কি?"

কন্ধ-কাটা তখন বল্‌লে,—"ঐ যে ওর গালে একটা মাংসের ঢিবি রয়েছে, ঐটে নিয়ে রাখ না। হাত, পা, চোখ, মুখ—সব মানুষেরই আছে; ঐ মাংসর ঢিবি বড় চট্ করে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না;—ওটা নিয়ে রাখলে কাঠুরে ভায়াকে নিশ্চয়ই ফিরে আসতে হবে।"

কাঠুরের কাছ থেকে তার গালের আব্‌টি তারা জিম্মে চাইলে। কাঠুরে বল্‌লে,—"এ আর বেশি কথা কি! প্রাণ চাইলে তাও দিতে পারি।"

এক জন দৈত্য তখন কি একটা মন্তর আউড়ে কাঠুরের গালের আব্‌টা আস্তে আস্তে মুচড়ে, তাকে কোন কষ্ট না দিয়ে ছিঁড়ে নিলে। সে জিনিসটা কি, তাই দেখ্‌বার জন্যে তখন তাদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল—এ ওর হাতে ছোঁ মারে, সে তার হাতে ছোঁ মারে।

এমন সময় গাছের মাথায় মাথায় পাখী ডেকে উঠল, পূব দিক থেকে সোনার আলোয় বন ছেয়ে গেল; অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্যগুলোও কোথায় মিশিয়ে গেল।

তখন কাঠুরে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে বাড়ী ফিরছে। ফিরতে ফিরতে বেলা হ'ল। গ্রামের লোক জন সব যে যার কাজে যাচ্ছে, পথের মাঝে কাঠুরের সঙ্গে দেখা। কাঠুরের গালে আব্ নেই দেখে তারা ভারি আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কেউ বল্‌লে, "কাঠুরে মামা!" কেউ বল্‌লে, "কাঠুরে দাদা!" কেউ বল্‌লে, "কাঠুরে খুড়ো! তোমার আবটি কি হ'ল?" কাঠুরে উত্তর করলে, "সে অনেক কথা, কাজ সেরে সাঁজের বেলা আমার ঘরে আসিস্, সব কথা বলব।"

কাঠুরে পাহাড়ে কাঠ কাটতে গিয়েছিল, ঝড় বৃষ্টিতে পড়ে দৈত্যদের সঙ্গে নেচেছিল, তার পর তারা কেমন করে' তার আবটি খসিয়ে নিয়েছে, এই সব কথা দেখতে দেখতে গ্রামে রাষ্ট হয়ে পড়ল। সেই গ্রামে আর এক জন বুড়ো

ছিল, তার গালেও একটা আব। সে তখন ভাবলে, যাই না কেন, আমার আব্‌টাও খসিয়ে আসিগে।" এই না ভেবে সেও সেই রাত্রে সেই পাহাড়ে গিয়ে কাঠুরে যেখানে বসেছিল, সেই কোটরে গিয়ে বসে রইল। দৈত্যরা আগের রাত্রে যেমন এসেছিল, সে রাত্রেও তেমনি এল, তেমনি আগুন জ্বাললে, খেলে দেলে, তার পর নাচতে লাগল। বুড়োটা এই সব বীভৎস ব্যাপার আর দৈত্যদের বিকট চেহারা দেখে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে যে গিয়ে তাদের সঙ্গে নাচবে, তার আর সাহস হচ্ছে না; কিন্তু না নাচলেও নয়, গালের আবটি তা না হলে খসবে না। প্রাণে ভয়ও আছে, আব্‌টি হ'তে মুক্ত হবার ইচ্ছেও আছে! কি করে, বলিদানের পাঁঠার মত ভয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকম করে দৈত্যদের মাঝে গিয়ে হাজির হল। বুড়োকে দেখে দৈত্যরা কাঠুরে এসেছে মনে করে আনন্দে হল্লা করে উঠ্‌ল, বল্‌লে, "কাঠুরে ভায়া! আর কেন, নাচ সুরু করে দাও।"

বুড়ো তখনও কাঁপচে। সেই সব ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি চোখের সামনে দেখে তার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেছে; সে কি তখন নাচতে পারে? দেরি দেখে দৈত্যরা আবার চেঁচিয়ে বল্‌লে, "নাচ, নাচ; আমাদের ফূর্ত্তি যে সব জল হয়ে গেল! রাত যে শেষ হয়!"

বুড়োর পা তখনও থর থর করে কাঁপচে। নাচবার জন্যে যেই এক পা তুলেছে, অমনি ধুপ্‌ করে মাটীতে পড়ে গেল,—উঠে নাচবার আর শক্তি রইল না। তাই দেখে দৈত্যরা ভারি চটে বল্‌লে, "যাও, তোমার আর নাচতে হবে না। এই নাও, তোমার জিম্মের জিনিস ফিরিয়ে নাও।" এই বলে বুড়োর আর এক গালে কাঠুরের আব্‌টা চটু করে বসিয়ে দিলে। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এল। দৈত্যরাও চলে গেল। তখন বুড়ো কি করে, একটি গালে আব ছিল, এখন দু' গালে দুটি আব নিয়ে মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে গ্রামে ফিরে এল। গ্রামের ছেলেরা এই মজা দেখে হো হো করে হাত তালি দিতে লাগল।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সহযোগী সাহিত্য।

——:o:——

জার্ম্মাণ উপকথা।

তোমরা বুঝি ভাবিয়াছ, মাছেরা চিরকালই এমন বোকা ছিল? তাহাদিগের মুখ হইতে একটি শব্দ, কি একটা কথাও বাহির হইত না? তা নয়। মাছেরা কেমন করিয়া বোবা হইল, বলিতেছি, শুন।

পৃথিবীর সৃষ্টি হইবার পর, অন্যান্য প্রাণীদের মত মাছেদেরও মধুর কণ্ঠস্বর ছিল। পাখীদের চেয়েও মধুর স্বরে তাহারা গান করিতে পারিত। তাই লোকে স্বজনকে মধুকণ্ঠ পাখী উপহার না দিয়া মধুরকণ্ঠ মাছ উপহার দিত।

অনেক দিন মানুষের কাছে থাকিতে থাকিতে মাছেরা যে শুধু আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিত, তা নয়, চমৎকার কথা কহিতেও পারিত। কিন্তু এই কথা কহাই তাহাদিগের কাল হইল। কথা কহিতে হইলে খানিক বুদ্ধি থাকা চাই—কিন্তু মাছদের তত বুদ্ধি ছিল না। তাহাদিগের যেমন বুদ্ধি অল্প, কথাও তেমনই বেশী বলিত। যে সকলের চেয়ে নির্ব্বোধ, সেই সকলের চেয়ে অধিক কথা কয়।

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মাছের চীৎকারে লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং তাহাদিগের কথা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। যদি কোনও পণ্ডিত লোক নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে বাহির হইয়া পুষ্করিণীর ধারে যাইতেন, তাহা হইলে নির্ব্বোধ মাছেদের চীৎকারে তাঁহার গভীর চিন্তা কোথায় চলিয়া যাইত। শ্রান্ত শ্রমজীবী শীতল জলের ধারে শুইয়া মধ্যাহ্নে একটু আরামে ঘুমাইতে চাহিলে, মাছেরা অধিকক্ষণ তাহাকে ঘুমাইতে দিত না। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে প্রেমিকযুগল বেড়াইতে বাহির হইলে, মাছেরা জল হইতে মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিত. এবং যাচিয়া তাহাদিগের কথার উপর কথা কহিত। এক কথায় তাহাদিগের দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন মাছেদের রাজা জলদানব প্রতি মাসে একবার করিয়া তাঁহার প্রজা মাছেদের আপনার প্রাসাদে ডাকিতেন। রাজার প্রাসাদ স্ফটিকে গড়া, তাহার প্রাচীর ছিল না। কেবল সারি সারি স্তম্ভ। তাহাতে মাছেরা দরজা না খুলিয়া অনায়াসে ভিতরে সাঁতার দিয়া যাইতে আসিতে পারিত। দরজা খোলা মাছেদের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। নাগবালা ও জল-পরীরাও প্রাসাদে আসিত, আনন্দে নাচিত, গাইত। রাজা ও রাণী লাল প্রবাল ও সোনার সিংহাসনে বসিয়া তাহাদিগের নাচ দেখিতেন, গান শুনিতেন।

রাজপ্রসাদে সকল রকম উপাদেয় খাদ্য,—মিষ্টান্ন, পায়স, পিঠা ও বোতল বোতল মদ সাজান থাকিত। সেকালে মাছেরা এখনকার মত পোকা মাকড় খাইত না, জলের চেয়ে মদই তাহাদের বেশী ভাল লাগিত। নাগরবালারা ভাল নাচিতে পারিলে রাজা রাণী তাহাদিগকে মহামূল্য মুক্তা সকল উপহার দিতেন।

সব মণি মাণিক্যের মধ্যে রাজার মণিময় আঙটিটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। রাজা সব সময়ে সেটি পরিয়া থাকিতেন। রাইন নদের সোনা দিয়া বামনেরা ঐ আঙ্গটী গড়িয়াছিল। দেব-মানব আঙ্গটিটি পাইবার জন্ত লালায়িত হইয়াছিল। রাজা জলমানব যে ঐ আঙ্গটির মালিক, এ কথা কেহ জানিত না। এটি বড়ই গোপনীয় কথা। উৎসবের পর মাছেরা যখন চলিয়া যাইত। রাজা মাছেদের এই গোপনীয় কথা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেন।

'যাদুরা সব সাবধান, মানুষের কাছে আমাদিগের গোপনীয় কথা বলিও না। পাতালে এই পুরীতে কত রত্ন আছে, জানিলে মানুষ আসিয়া সব লুটিয়া লইয়া যাইবে, স্ফটিকের পুরী ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, তোমাদেরও অমঙ্গল ঘটিবে।'

মাছেরা বলিয়া যাইত, আমরা কাহাকেও কিছু বলিব না। কিন্তু কথা গোপন রাখা তাহাদিগের পক্ষে দায় হইয়া উঠিল।

একদিন আবার তাহারা রাজপ্রাসাদে ভোজ খাইয়া আসিল, এবং পর দিন প্রভাতে সকলে মিলিয়া ভোজের ধূমধাম ও জাঁকজমক সম্বন্ধে মহা গল্প জুড়িয়া দিল। মাছের দল একটা নির্ম্মল ঝরণার কাছে আসিয়া রাণীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ করিল; তাঁহার দীর্ঘ কুঞ্চিত ঘাগরা পিছনে কেমন দুলিয়া ফুলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া যাইতেছিল, তাহার তারিপ করিতে লাগিল। Carp ও Pike মাছের ব্যবহারে ভোজ-সভার সকলেই ভারি চটিয়া গিয়াছিল। ও দুটা ভারী বেআদব। মস্ত দেহ, গায়ে যথেষ্ট বল বলিয়া তাহারা সমস্ত উপাদেয় খাদ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়াছিল। এক কথায়, মাছেদের যে গল্প গুজব চলিতেছিল, সেটা ঠিক গল্পপটু আইবুড় ঠাকুরাণীর চায়ের সভার মত। যাহা কিছু অভাব চায়ের!

Pike, Carp এবং বড় মানুষ ধাতুর Salmon মাছের গল্পের আর অন্ত নাই! তাহারা এক ঠাঁই মিলিয়া মুখের অদ্ভুত ভঙ্গিমা করিয়া গল্পই করিতে লাগিল। তাহাদের গল্প রাজ-বিদ্রোহপূর্ণ রাজ্যের পক্ষে বিষম অনিষ্টকর।

মাছদের মধ্যে কতকগুলি রাজা জলমানবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা বলিল, 'রাজা বড় অত্যাচারী, তাহাকে সিংহাসন হইতে নামাইতে হইবে।' অন্যরা ইহার ঠিক বিপরীত, কথা বলিল। তাহারা ভক্তি দেখাইবার জন্য রাজাকে একখানি অভিনন্দনপত্র দিবার কথা আলোচনা করিতে লাগিল। একটা বুড়া Pike মাছের সেনাপতি হইবার ভারি সাধ হইয়াছিল। সে মাছেদের সহি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু একটা ভুঁড়িওয়ালা Carp মাছ কিছুতেই তাহার কথায় কাণ দিল না, মহা আপত্তি তুলিল। সে নিজেই রাজাকে অভিনন্দনপত্র দিবার যোগাড়ে ছিল। যদি মন্ত্রীর পদটা জুটিয়া যায়! মাছেরা মহা বক্তৃতা আরম্ভ করিল; শেষে চীৎকারে সকলের গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ঠিক যে সময় তাহারা সভা ভঙ্গ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে একটি পল্লীযুবক সেইখানে উপস্থিত হইল। সে দাঁড়াইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল; খানিক মাছেদের তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, তার পর অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিল,—'ও! তোমরা সব কি বুদ্ধিমান! কি চমৎকার বক্তৃতায় করিতে পার! বোধ করি, তোমরা আমাকে আরও অনেক কথা শুনাইতে পার?'

এই কথায় মাছেদের হৃদয় গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল।

মাছেরা এক সঙ্গে বলিল, 'হাঁ, পারি ; শুধু সুন্দর কথা নয়, অনেক দরকারী কথাও আমরা বলিতে পারি।"

একটা বুড়া Pike মাছ,—তাহার মাথায় শৈবাল গজাইয়াছে—মাছেদের ডাক দিয়া বলিল, 'বাছারা! রাজা জল-মানবের কথা যেন মনে থাকে।'

'রাজা জলমানব কে গা?'—যুবা রাজা জলমানবের কথা কখনও শুনে নাই।

মাছেরা বলিল, 'তিনি কে, তা আমরা খুব জানি, কিন্তু বলিতে নিষেধ আছে।' ঘৃণায় মুখ বাঁকাইয়া যুবা বলিল, 'তোরা কিছুই জানিস নে, লোকে যা জানে, তা বলে; কোথাকার হতভাগা!'

যুবার গালি শুনিয়া মাছেদের ভারি রাগ হইল। তাহারা ছোট বড় সকলে যুবাকে ঘিরিয়া চেঁচাইতে লাগিল।—'আমরা দুষ্ট নই, অমন কথা মুখে আনিও না। রাজা আমাদের এত ভালবাসেন যে, তিনি আমাদের সকলকে সোনা মুক্ত ও প্রবালের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, আমাদের 'মণিময়" আঙ্গটী দেখান।'

মাছেরা সকলে মিলিয়া মহা গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কিন্তু যুবা যাহা শুনিবার, তাহা শুনিয়াছিল। যুবা সবিস্ময়ে বলিল,—'বল কি, তোমাদিগের এত আদর? তবে ত তোমাদিগের খুব মান্য করা উচিত। তোমরা যদি খানিকক্ষণ এখানে থাক, তা হ'লে, আমি এই সংবাদের বদলে তোমাদিগকে একটা চমৎকার ব্যাপার দেখাইব।'

মাছেদের ত আর কাজ নাই, তাহারা সেই কথায় রাজি হইল। যুবা বাড়ী গিয়া একটা মস্ত জাল আনিল। এখনও ছেলেরা ঐ রকম জাল ব্যবহার করে। ততক্ষণ মাছেরা খুব আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলাবলি করিতে লাগিল,—'আমরা রাজার বাড়ী যাই, লোকে তাহা জানিতে পারিল, এইবার মানুষেরা আমাদের ভারি মান্য করিবে।'

যুবা আসিয়া মাথার টুপি খুলিয়া নমস্কার করিয়া তাহাদিগকে বলিল, 'এই জিনিসটার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। কেমন সুন্দর জিনিস তৈয়ার করিয়াছি।'

কুতূহলী মাছেরা তাড়াতাড়ি সাঁতার কাটিয়া জালের মধ্যে প্রবেশ করিল; আর ধরা পড়িল। তখন যুবার বন্ধুরা আসিয়া জালখানি টানিয়া তুলিল।

তাহারা বলিল,—'দুষ্ট মাছেরা!—কেমন এখন ধরিয়াছি। এখন সমুদ্রের রাজার বাড়ী দেখাইয়া দিতে হইবে। আমরা কিছু সোনা ও মুক্তা চাই।'

মাছেরা বলিল, 'তা হবে না।'

'হবে না? তা হইলে আমরা তোদের টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাজিব। এখন দুই দিক ভাবিয়া কাজ কর।'

হতভাগা মাছেরা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। টুকরা টুকরা করিয়া ভাজিবে, তাই বা কেমন করিয়া হয়? মাছেরা ঝটপট করিতে করিতে কাঁদাকাটা করিতে লাগিল। কিন্তু পালাইতে পারিল না। শেষে ভয়ে রাজার বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল।

এই সময়ে রাজা জলমানব ক্রুদ্ধ হইয়া দেখা দিলেন।

ভীত মাছেদের রাজা বলিলেন, 'বিশ্বাসঘাতক! এমনি করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হয়?" কিন্তু তোদের শাস্তি দিতেছি। তোরা যখন কথার প্রকৃত ব্যবহার জানিস না, তখন আজ অবধি তোরা বোবা হইবি।"

এই বলিয়া তিনি জালখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মাছেরা লাফাইয়া জলে পড়িল। কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! তাহারা কত কথাই বলিতে চায়, কিন্তু কাহারও মুখে একটা কথা ফুটিল না! সেই অবধি মাছেরা বোবা হইয়া রহিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই অবধি দণ্ডদাতা রাজা জলমানব সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়াছেন, নচেৎ কাহারও কাহারও মাছেদের মত দুর্দ্দশা ঘটিত।

পৃথিবীর সুখ দুঃখ।

—:০:—

(৪)

আমার চাকরী হইলেই আমার পাওনাদারেরা টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদিগকে টাকা দিই কেমন করিয়া? মাসে দুই শত করিয়া টাকা ঘরে আনিতে লাগিলাম বটে, কিন্তু আমার খরচের অবধি ছিল না। তখন তিনটি পরিবারের উদরান্নের ভার আমার উপর। তাহাদিগকে অনাহারে রাখিয়া আহার করিতে হইলে আমার শূকরের বিষ্ঠা ভোজন করা হইত, এবং হৃদয়ের যন্ত্রণায় আমাকে ছট্‌ফট্‌ করিয়া মরিতে হইত। ঐ কয়টি পরিবারকে মাসে মাসে কিছু কিছু টাকা দিতাম। অনেক স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে, স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রী ভিন্ন আর কাহারো অধিকার নাই, এবং অপরকে স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থের ভাগ পাইতে দেখিলে তাঁহারা মহা গণ্ডগোল বাধাইয়া থাকেন। স্বামীকে তাঁহাদের অর্থসাহায্য করিতে না দিয়া তাঁহাদিগকে বিষম অনশন কষ্টে ফেলিয়া দেন, এবং স্বামীর যন্ত্রণার একশেষ করিয়া থাকেন। ভগবানের অসীম কৃপায় এবং আপন স্বভাবের গুণে আমার পত্নী আমাকে কখনও ঐ সকল অনশনক্লিষ্ট পরিবারের অর্থসাহায্য করিতে নিষেধ করেন নাই। নিষেধ করা দূরে থাকুক, কোন্ পরিবারের জন্য কত টাকা দিতাম, তাহা আমাকে কখনও জিজ্ঞাসাও করেন নাই। এবং এখনও জানেন না। যাহা-দিগকে অর্থসাহায্য করিতাম, তাহাদের কাহারো কাহারো সহিত তাঁহার একটু দা-দেয়িজীর ভাব ছিল। তিনি যদি আমাকে ধরিয়া বসিতেন,

উহাদিগকে তুমি কিছুতেই টাকা দিতে পারিবে না, তাহা হইলে নিরুপায় হইয়া আমাকে অনেকের অনশন কষ্ট দেখিয়া মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু আমার পত্নীর জন্য তাহা ভোগ করিতে হয় নাই। ইহা কি সাধারণ সুখ? এ সুখের পরিমাণও হয় না, কল্পনাও হয় না। বিধাতার কৃপায় আমার পত্নীভাগ্য অতুলনীয়। তাঁহার এইরূপ মহত্ত্ব না থাকিলে এ জন্মটা আমাকে মনুষ্যমধ্যে চণ্ডাল হইয়া এবং চক্ষের জলে ডুবিয়া থাকিতে হইত। আশীর্ব্বাদ করি, এবার জন্মগ্রহণ করিয়া আমার মহালক্ষ্মীকে যেন আমার মত মহাপাতকীর সহধর্ম্মিণী হইবার ফলে চোখের জল ফেলিতে না হয়। অথবা আমি কি এমন মানুষ যে, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব? তিনিই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন জন্ম জন্ম তাঁহাকে পাইবার আশা আকাঙ্ক্ষা রাখিতে পারি। যে কয়টি পরিবারকে ভাত দিতে হইত, আমার পত্নীর পুণ্যবলে তাহাদিগকে আমার আর অর্থসাহায্য করিতে হয় না, তাহারা আপনাদের অন্ন আপনারা বিধাতার কাছে পাইতেছে; প্রার্থনা করি, চিরকাল পাউক। কিন্তু তাহাদের কাহাকে কত টাকা দিতাম, আমার পত্নী তাহা এখনও জানেন না, আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন না, আমিও বলি নাই, এবং বলিবও না। তাঁহাকে কেহ (অবশ্য একটু কুমতলবে) জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া থাকেন,—"ও সব টাকা কড়ির কথা আমি কি জানি বোন? ও সব পুরুষেরা জানেন। জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁকে জিজ্ঞাসা করিও।" বড় ভাগ্যবান্ না হইলে, এমন সহধর্ম্মিণী পাওয়া যায় না। আরো একটু বলি:—

দেনা শোধ হয় কেমন করিয়া, ভাবিতে লাগিলাম। দেনা ৪।৫ হাজারের কম নয়, এবং সুদ বাড়িতেছে। পত্নী বলিলেন,—আমার গহনা বন্ধক দিয়া যে ঋণ করা হইয়াছে, আগে সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তাহা শোধ করা হউক। আমি বলিলাম, তা আমি পারিব না, একে তোমার গহনা অতি অল্প, তাও বেচিয়া ফেলিব? আমা দ্বারা তাহা হইবে না। তিনি বলিলেন, স্ত্রীলোকের স্বামীর চেয়ে গহনা আর নাই। তুমি বিক্রয় কর। তাহা হইলে তোমার দেনা আর বড় বেশী থাকিবে না, অল্প টাকা কর্জ্জ করিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। আমি আর অমত করিতে পারিলাম না। তাঁহার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য হইল। হইয়াও কিন্তু এত দেনা রহিল যে, টাকা কর্জ্জ না করিলে

তাহার পরিশোধ হয় না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ইষ্টেটের ম্যানেজার এবং গৌরমোহন আঢ্যের ইস্কুলের সেক্রেটরী আমার চিরসুহৃৎ এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর তুল্য বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে ধরিলাম। তিনি অল্প সুদে অর্থাৎ শতকরা ৬৲ টাকা সুদে আমাকে হাজার টাকা কর্জ্জ দেওয়াইলেন। কর্জ্জ দিলেন ৺রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সাধু সুপণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ৺ অমৃতলাল মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র আমার চিরকৃতজ্ঞতাভাজন শ্রীরূপলাল মিত্র মহাশয়। প্রতি মাসে সুদ সহ পঞ্চাশ টাকা করিয়া পরিশোধ করিতাম। আমার বৃহৎ সংসার পালনের জন্য দেড় শতেরও কম টাকা থাকিত। আমার পত্নী তাহাতেই সংসার চালাইয়া প্রতি মাসে আমার হাতে কিছু কিছু দিতেন। সংসারে কাহারো কষ্ট বা অসন্তোষ ছিল না। এইরূপে চারি পাঁচ হাজার টাকার ঋণ পরিশোধ করিয়াও যে ভাবে ছিলাম, তাহাতে লোকে বুঝিত, আমার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ঋণ পরিশোধ হইলে যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহার তুলনাও জানি না, পরিমাণও করিতে পারি না। বাল্যকালের সেই সব আনন্দ অপেক্ষাও তাহা বেশী। এ আনন্দের সহিত তুলনায় সে সব আনন্দ অতি সামান্য। সাধে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন, অঋণী অপ্রবাসী চ ইত্যাদি? এখন আমার প্রবাসও ঘুচিল, ঋণও ঘুচিল। আমার আনন্দ বড় বেশী হইবার কারণ এই যে, আমার ঋণপরিশোধে আমার পত্নী আমার বড় সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার যখন ঋণ ছিল, তখন তিনি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তাঁহাকে একবার এক যোড়া নূতন কাপড় কিনিয়া দিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,—তুমি দেবতা সাক্ষী করিয়া আমার চিরকালের ভাত কাপড়ের ভার লইয়াছ;—ও দেবতার দেওয়া কাপড়, দাও, আমি মাথায় করিয়া রাখি। কিন্তু এখন পরিব না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—পরিবে না কেন? উত্তর,—তোমার দেনা থাকিতে নূতন কাপড় পরিব না। এখন আমার দেনা নাই। তথাপি কিন্তু তিনি রাত্রে মাথায় বালিশ না দিয়া নেকড়ার বোচকা মাথায় দেন, শীতকালে রাত্রে লেপ গায়ে না দিয়া ছেঁড়া মশারি এবং দিনের বেলা কেবল ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া গায়ে দেন। এমন সহধর্ম্মিণী পাইয়াছি বলিয়া অঋণী হইতে পারিয়াছি। একটু চেষ্টা করিলে অনেকে এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইয়া অঋণী থাকিতে পারেন। এইরূপ সহধর্ম্মিণী গড়িয়া লইতে পারা যাইবে বলিয়াই শাস্ত্রকারেরা বাল্যবিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আমার পত্নী সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য কথা বলিতে বাকি আছে। শিশু সন্তান অধিক কাঁদিলে বা ঘুমাইতে না দিলে প্রায় সকল স্ত্রীলোকই বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে থামাইবার নিমিত্ত—বিশেষতঃ রাত্রিকালে—টিপ্‌টিপ্ বা চটাচট্ মারেন, বা ঠোনা মারেন, বা টিপুনি দেন। তাহাতে তাহারা এমন ককাইয়া ওঠে যে, শুনিলে বড় কষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে দম্ বন্ধ হইয়া মারা যাইবে বলিয়া ভয়ও হয়। ইহাতে অশান্তির সীমা থাকে না। আমার সৌভাগ্যবলে ওরূপ অসুখ অশান্তি আমাকে একেবারেই ভোগ করিতে হয় নাই।

ছেলেতে মেয়েতে আমার ১২টী হইয়াছিল। কোনটির জন্যই আমার পত্নী আমাকে দাস বা দাসী নিযুক্ত করিতে বলেন নাই। কেবল অম্লরোগে তাঁহাকে জীর্ণ দেখিয়া আমি স্বয়ং তাঁহার দুইটি পুত্রের জন্য দুইটি দাসী নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছিলাম। বাকী সবগুলিকে তিনি স্বয়ং পালন করিয়াছিলেন। পুত্র কন্যা নাতি নাতিনী কাহাকেও তাঁহাকে কখনও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে মারিতে দেখি নাই। সকল দেশেই স্ত্রীলোকে ছেলে মারে। আমার ঘরে কোনও ছেলেই মার খায় না। ইহা আমারো যেমন সুখ ও সৌভাগ্য, আমার ঘরের ছেলে মেয়েরও তেমনি সুখ ও সৌভাগ্য। তবুও কিন্তু ইহাদের অনেকগুলি আমাদের শান্তিময় ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে। ইহা তাহাদেরই দুর্ভাগ্য, আমার কি আমার শান্তিদায়িনীর দুর্ভাগ্য নয়। আমার স্ত্রীর এই গুণের কথা তাঁহার বড়াই করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম না। স্ত্রীপ্রকৃতিতত্ত্বের একটা রহস্যময় কথা সুধী ব্যক্তিমাত্রই এবং আমার বিদুষী পাঠিকাগণ বুঝিয়া দেখিয়া বুঝাইবেন, এই আশায় বলিলাম। ইহা যথার্থই স্ত্রীপ্রকৃতিগত একটা রহস্য। এ রহস্য কেবল আমার ঘরে নাই, অনেক ঘরে আছে, শুনিলে আমার আহ্লাদের সীমা থাকিবে না, আর শিশুকুলের সৌভাগ্যবৃদ্ধিতে শিশুশিক্ষারও সুবিধা হইবে। যে রমণী শিশুকে মারিতে পারেন না, বড় রাগ বা বিরক্তি হইলে কেবল একটু বকেন, বোধ হয় দেবতাদের কাছে তাঁহার আদর ও সম্মান কিছু বেশী হয়। এই সমস্ত বিবেচনায় আমার পত্নী আমার চির-আরাধ্যা হইয়া আছেন। জামতাড়া হইতে আসিয়া একটু অসুখ হইয়াছিল। হোমিও-প্যাথিক ডাক্তার অক্ষয়কুমার দত্তের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়াছিলাম। তিনি আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিবার পর এ কথা সে

কথার মধ্যে বলিয়াছিলেনঃ—আপনাদের মতন couple (দম্পতী) আমি আর দেখি নাই, আপনাদের কথা আমি অনেকের কাছে বলি। তিনি কিন্তু আমাদের ভিতরের কথা কেমন করিয়া বুঝিলেন, তাহা জানি না—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবও না। আপন ইচ্ছায় বলেন, ত শুনিব।

উপরে লিখিয়াছি যে, বড় অনটনের সময় একবার হইকোর্টে গিয়াছিলাম। কেন গিয়াছিলাম, এইবার বলিব। এখনও যেমন তখনও তেমনি; ইংরাজী শিখিলে সকল যুবকেরই আদালতের দিকে দৃষ্টি পড়ে—তাহারা বোধ হয় মনে করে যে, আদালতে টাকা ছড়ানো আছে, গেলেই যত ইচ্ছা পাইতে পারা যাইবে। এ বিশ্বাস এখনও অছে, তাই অনেকেই এখনও ওকালতী করিতে যায়। শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অনেকে গড্ডলিকার লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া উপহাস করে। আমার বিবেচনায় এরূপ উপহাস অন্যায়। যাহাতে ২।৪ জন কৃতকার্য্য হয়, দশ জনের তাহা করিতে যাওয়া সকল দেশেই স্বাভাবিক কার্য্য, অতএব ২।৩ জনকে ওকালতী দ্বারা টাকা উপার্জ্জন করিতে দেখিয়া অনেকেই যে আদালতের দিকে ছোটে, সেটা আমাদের অন্যায় কাজ নয়। আমার কিন্তু মনে হয় যে, আমাদের আদালতে ছুটিবার একটা গুরুতর কারণ আছে। আমার বেশ মনে আছে যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য যাহা অধ্যয়ন করিতে হইত, তাহাতে কাজ কর্ম্ম কারবারের দিকে মন যায় না, এমন কি, একখানা দোকান করিয়া দু' টাকা উপার্জ্জন করিবার প্রবৃত্তিও জন্মে না। অর্থাৎ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত যে শিক্ষা লাভ করিতে হয়, তাহা সম্পূর্ণ literary শিক্ষা, তাহাতে কোনও রকম practical প্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে পারে না। প্রধানতঃ এই কারণে আমরা দলে দলে আদালতে ছুটি। National কালেজে নানাবিধ শিল্প-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। দেখা যাক্, যাঁহারা তথায় পড়িতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একটু practical tendency দেখা দেয় কি না। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ literary শিক্ষা হইয়াছিল বলিয়া আমিও টাকার জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমার টাকা হয় নাই। কেন হয় নাই, পূর্ব্বে বলিয়াছি। অপরের ন্যায় আমারও হাইকোর্টে যাইবার আর একটা কারণ ছিল। স্বাধীন থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব, চাকরীতে গিয়া পরাধীনতা স্বীকার করিয়া মনুষ্যত্ব নষ্ট করিব না, এই ইচ্ছাই সেই কারণ। এই ধারণাটা যে বিষম ভ্রান্ত ও

অনিষ্টকর ধারণা, তাহা এখন বুঝিয়াছি। চাকরীতে মনুষ্যত্ব যায়, অতএব চাকরী করিব না, Bengal Libraryর অধ্যক্ষতা গ্রহণ করাতেই আমার এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়। অথচ ঐ চাঁকরী করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। বেঙ্গল লাইব্রেরীর কাজ বেশীও নয়, কঠিনও নয়, এক রকম চোখ বুজিয়া বুজিয়া সম্পন্ন করিতাম। সুতরাং কাজের মতন 'কাজ বলিয়া বোধ করিতাম না। কাজেই চাকরীতে যে ঘৃণা ছিল, এই কাজ করাতে তাহা বাড়িয়াই গেল। কিন্তু এই কাজ করিবার পর যে কাজ উপস্থিত হইল, তাহার কঠিনতা ও পরিমাণ দেখিয়া আমার ভয় হইল। তাহা বঙ্গানুবাদকের কাজ। ঐ কাজ করিয়া অসুর Robinson সাহেব বহুমূত্র রোগে মারা গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরে আমার ভ্রাতৃসম অসুরসদৃশ বলবান রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও ঐ রোগে মারা গিয়াছিলেন। তাই ঐ কাজ লইতে আমার ভয় হইয়াছিল। তাই আমি ঐ কাজের জন্য দরখাস্তও করি নাই। Croft সাহেবের উপর ঐ কাজের জন্য লোকনির্ব্বাচনের ভার ছিল। তিনি আমাকে নানা রকমে ঐ কাজ লওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমিও অবশেষে লইয়াছিলাম। কাজের মতন কাজ বটে। পরিমাণও যেমন বেশী, প্রকৃতিও তেমনি কঠিন। ইংরাজী আইনের বাঙ্গলা অনুবাদ কি দুরূহ ব্যাপার, যিনি না করিয়াছেন, তিনি বুঝিবেনও না, বুঝাইলেও বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অনেককে বঙ্গানুবাদকের অনুবাদের ঠাট্টা করিতে দেখিয়াছি। ঠাট্টা করা যাইতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু অনুবাদককে যে সকল নিয়ম পালন করিয়া অনুবাদ করিতে হয়, সেই সকল নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া স্বয়ং বৃহস্পতি অনুবাদ করিলে তাঁহার অনুবাদেরও যে ঠাট্টা করিতে পারা যায়, ইহা আমি বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি। না জানিয়া শুনিয়া না বুঝিয়া সুঝিয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করা এখনকার রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—বড় বেয়াড়া, বড় দুশ্চিকিৎস্য রোগ। অনুবাদকের কাজ লইয়া দেখিলাম—কাজের পরিমাণের যেমন সীমা নাই, উহার প্রকৃতিও তেমনি কঠিন। আর ঐ কাজ করিয়া দিতে বড় তাড়াতাড়ি করিতে হইত; দুই দিনের কাজ দু' ঘণ্টায়, ১০ দিনের কাজ পাঁচ ঘণ্টায়, ইত্যাদি। আদেশ-মত কাজ সম্পন্ন করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। কখনও একটি কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। কোনও কাজ করিয়া দিতে একটু বিলম্ব

হইলে, যে আপিসের কাজ, সে আপিস হইতে non-official enquiry মাত্র হইত, অর্থাৎ, কাজ কত দিনে হইবে জানিয়া যাইবার জন্য এক জন কর্ম্মচারী প্রেরিত হইত। এই কাজ যখন লইয়াছিলাম, তখন গবর্মেণ্টের সহিত সর্ত্ত করিয়াছিলাম যে, ছয় মাস কাজ করিয়া দেখিব, যদি শরীর না বয়, ছয় মাসান্তে লাইব্রেরীর কাজে ফিরিয়া যাইতে পারিব। কাজ কিন্তু এত অধিক ও কঠিন যে, ৩।৪ দিন মাত্র করিয়া আমার মাথা এত ঘুরিয়াছিল যে, ভয় পাইয়া Croft সাহেবের কাছে গিয়া বলিলাম,—এ কাজ আমার দ্বারা হইবে না, আমাকে লাইব্রেরিতে ফিরিয়া যাইতে দিন। তিনি আমাকে নিরুৎসাহ করিলেন না, কিন্তু কৌশল করিয়া আমাকে এ কাজে এক মাস রাখিলেন। কৌশল এইরূপ। যে দিন সাহেবের কাছে লাইব্রেরিতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিয়া আসিলাম, তাহার পর দিন প্রাতে রাধিকা-বাবু আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন,—কাল Croft সাহেবের কাছে গিয়া দেখিলাম; তিনি বড় বিষণ্ণভাবে বসিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—অমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন,—চন্দ্রনাথের মাথা ঘুরিতেছে, সে Libraryতে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু অনুবাদকের পদের উপযুক্ত লোক আর দেখিতে পাইতেছি না, তাই ভাবিতেছি। তা ভাই, এত শীঘ্র Libraryতে ফিরিয়া গেলে, Croft সাহেবের বড় দুঃখ হইবে, এবং গবরমেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ হইতে হইবে। তিনি আমাদের হিতৈষী—গবর্মেণ্টের কাছে তাঁহাকে অপ্রতিভ করা আমাদের বড় অন্যায় হইবে। তুমি অন্ততঃ এক মাস এই কাজ কর। রাধিকা দাদার উপদেশ যে বড় সমীচীন, তাহা বুঝিলাম। বুঝিয়া বলিলাম, যতই কষ্ট হউক, এক মাস এই কাজ করিবই করিব। আমাকে এ কাজে এক মাস রাখিলেন। এক মাস এই কাজ করিতে করিতে আমার স্থৈর্য্য আসিল, ধৈর্য্য আসিল, সাহস আসিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিল, আর এই ধারণা জন্মিল যে, এ কাজ ভগবানের কাজ, গবর্মেণ্টের বা মানুষের কাজ নয়। তখন এই কাজ ভাল লাগিতে লাগিল, আর আলস্য শ্রমকাতরতা গেল, শ্রমে উৎসাহ হইতে লাগিল। সুতরাং তখন ২ দিনের কাজ ১ দিনে; ১০ দিনের কাজ ৬ ঘণ্টায় শেষ করিয়া এতই আনন্দ হইতে লাগিল যে, প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, চাকরী যদি করি, তবে এইরূপ চাকরীই করিব। এইরূপ প্রতিজ্ঞা

করিয়া এবং ভগবানের চাকরী করিতেছি ভাবিয়া এই চাকরী করিতে লাগিলাম। তথাপি বুঝিলাম, এ কাজে থাকিলে শীঘ্রই আমার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবে। Tewney সাহেব তখন Croft সাহেবের কাজ করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ইস্তফা-পত্র পাঠাইয়া দিলাম। তিনি তাহা লইলেন না। আমাকে আরো ছয় মাস থাকিতে বলিলেন। বলিলেন,—আমি লোক পাইতেছি না, তুমি আরো ছয় মাস থাক। আমি গবর্মেণ্টে লিখিয়া তোমার কাজের পরিমাণ কিছু কমাইয়া দিব। তাহাই দিলেন।

দুইবার ছুটী লইয়া হাওয়া খাইতে মধুপুরে ও বৈদ্যনাথে গিয়াছিলাম—কিন্তু সেখানেও রাশি রাশি কাজ করিতে হইয়াছিল। ইং ১৯০১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র পরেশনাথের পরলোক হয়। কলিকাতার বাড়ীতে আর কেহ থাকিতে পারে না। এই কথা শুনিয়া প্যারী দাদা (রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়) আমাদিগকে যেন কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার গঙ্গাতীরস্থ সুন্দর বাটীতে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন, এবং সপরিবারে আমাদের অশেষ আদর যত্ন করিতে লাগিলেন। আমি প্রাতে তাঁহার কাছে গিয়া কাজ করি দেখিয়া তিনি বলিলেন, এখানে আসিয়াও নিষ্কৃতি নাই ? আমি কোনও উত্তর করিলাম না, কিন্তু মনে মনে বলিলাম,—"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"

তিনি আমার শিক্ষাগুরু, আমি আর না বলিতে পারিলাম না। কাজ যাহা কমাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে আমার নিজের শ্রমের লাঘব হইল না। আমার আপিসের পণ্ডিত মহাশয়ের কিছু আসান হইল। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আমি কাজ করিতে লাগিলাম। রাত দিন কাজ। রবিবারেও কাজ। প্রতিদিন প্রাতে কাজ। পূজার ছুটীতে আপিস বন্ধ করি, কিন্তু বাড়ীতে কাজ করি। সকল ছুটীতেই তাই। অসুখ হইলেও কাজ করি, না খাইয়াও কাজ করি। দুইবার ছুটী লইয়া হাওয়া খাইতে গিয়াছিলাম। কাজ ছাড়িয়া দিব শুনিয়া আমার এক বন্ধু (আহা, তিনি আর ইহলোকে নাই।) এক জন মহামহোপাধ্যায় আমাকে বলিলেন,—সংবাদপত্রের রিপোর্ট অত বেশী করিয়া নাই লিখিলেন, কম করিয়া লিখিলে কেহ ত ধরিতে পারিবে না। এমন কাজটা ছাড়িবেন কেন ? আমি বলিলাম, তা আমি পারিব না। আর কেহ ধরিতে পারিবে না বটে—কিন্তু আমার মন যে আমাকে ধরিবে। ফলতঃ ভগবানের কাছে অপরাধী না হই, এমন করিয়া

কাজ করিয়াছিলাম বলিয়াই এত দিন এই কঠিন কাজ আমার নিজের সন্তোষজনকরূপে করিতে পারিয়াছিলাম। এবং পেন্সন লইবার পর Croft সাহেবকে লিখিতে পারিয়াছিলাম,—Looking backward, I cannot call to mind a single item of work, big or small, regarding which I could wish that given the time and the staff, I had done it better or more carefully. না, আমার মনের কোথাও কিঞ্চিন্মাত্র আত্মগ্লানি নাই। বিধাতা পুরুষ স্বয়ং অনুসন্ধান করিলেও আমার কাজে অমনোযোগ. অসাবধানতা, বা অবহেলার নিদর্শন খুঁজিয়া পাইবেন না। কেমন করিয়া পাইবেন, আমি যে তাঁহার চাকরী করিতেছি ভাবিয়া গবরমেণ্টের চাকরী করিয়াছি। সকলকেই বলি,—বিধাতার চাকরী করিতেছ ভাবিয়া যাহার ইচ্ছা তাহার চাকরী করিও, চাকরীতে হীনতা দেখিবে না, গৌরবই দেখিবে, আর নিখুঁত কাজ করিয়া ও ধার্ম্মিকের ন্যায় কাজ করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ করিবে, এবং নির্ম্মল, অক্ষয়, পবিত্র সুখ ভোগ করিবে, তাহার তুলনা নাই।—বলিতেও ভয় করে, কিন্তু না বলিয়াও থাকিতে পারি না, সচ্চিদানন্দের আনন্দ বুঝি সেই প্রকৃতির আনন্দ। অনুবাদককে বাঙ্গালা সংবাদপত্রের রিপোর্ট গবরমেণ্টকে প্রতি সপ্তাহে দিতে হয়। ৬০।৭০ খানা কাগজ স্বয়ং অনুবাদককে আদ্যোপান্ত পড়িয়া রিপোর্ট করণার্থ চিহ্নিত করিয়া দিতে হয়। সহকারীরা চিহ্নিত অংশগুলির রিপোর্ট লিখিলে অনুবাদক স্বয়ং তাহা পড়িয়া মূলের সহিত মিলাইয়া আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া দেন। কোনও কোনও কাগজে বলা হয় যে, সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনেক সময় ঠিক হয় না, এবং গবরমেণ্টের মনে সেই জন্য সংবাদপত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত বা অযথা সংস্কার জন্মিয়া থাকে। কিন্তু সংবাদপত্রের রিপোর্ট যে কত সাবধানতার সহিত প্রস্তুত করা হয়, তাহা আমি বলিয়া শেষ করিতে পারি না। উহা ভাল না হইলে অধর্ম্ম হইবে—উহাতে দোষ বা ক্রটী হইলে ইহকাল পরকাল নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সংবাদপত্রের রিপোর্ট করা হয়। আমি সতের বৎসর রিপোর্ট করিয়াছি—একটিও অযথা রিপোর্ট করিয়াছি বলিয়া আমার মনে কাঁটা বেঁধে না। বড় আদালতে আমার অনুবাদের ফাঁড়া ছেঁড়া হইয়াছে, তথাপি আমাকে আঘাত পাইতে হয় নাই। লেখকেরা দোষ করিয়া অনুবাদকের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিজেরা নিষ্কৃতি পাইবার অসাধু চেষ্টা করিয়া থাকেন। তবে অনুবাদকদের যে একটিও ভুল হয় না, এমন কথাও বলি না। হয় বই কি, বিশেষ Slang বাঙ্গালায় বা খ্যাচ্‌ড়া বাঙ্গালায় লেখা প্রবন্ধের অনুবাদে ভুল হইবার বড় সম্ভাবনা। তবে দৃঢ়তাসহকারে বলিতে পারি যে, নিরতিশয় সাবধানতাসহকারে রিপোর্ট করিলেও অমন ভুল হইয়া থাকে। সকল দেশেই হয়, সকলেরই হয়। তজ্জন্য অনুবাদককে গালি দেওয়া বা ঠাট্টা করা অতি অন্যায়, এবং অমানুষিক কাজ। এক জন সংবাদপত্রলেখক

আপন সম্পাদিত কাগজে বাঙ্গালার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ হইতেই পারে না ইহা প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা করিয়া লিখিয়াছিলেন ঃ—

চাকি ডুবু ডুবু (আর মনে নাই)

করুক দেখি কে ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারে ?

আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছিলাম ঃ—

চাকি ডুবু ডুবু—the sun's disc is about to sink.

যাহা মনে নাই, তাহারও অনুবাদ করিয়াছিলাম। অনুবাদ অসাধ্য হইয়াছিল, এরূপ মনে হয় না।

ফল কথা, ইংরাজীতে একটু অধিকার না থাকিলে বাঙ্গালার, বিশেষতঃ নীচতাদুষ্ট (slang) বাঙ্গালার ঠিক ইংরাজী অনুবাদ করিতে পারা বড়ই কঠিন। কিন্তু বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আজ কাল নীচতাদুষ্ট বা slang বাঙ্গালার প্রাদুর্ভাব বড় বেশী। ইহার এই ফল হইয়াছে যে, এখনকার বাঙ্গালী সকল দিকেই মর্য্যাদাহীন এবং অভদ্রোচিত হইয়া পড়িতেছে। এবং গবর্মেণ্টের বোধগম্য হইতেছে না বলিয়া গবর্মেণ্ট আমাদের মনের কথা বুঝিতে পারিতেছেন না, এবং সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ বাড়িতেছে। সংবাদপত্রে অভদ্র বা নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে সাধু ভাষার ব্যবহার বড়ই আবশ্যক হইয়াছে। নহিলে আমরা অভদ্র (ungentlemanly) হইয়া উঠিব। ইহারই মধ্যে ungentlemanly হইয়াছি।

স্বভাব অভদ্র বা নীচ হইলে ভাষাও ভদ্রোচিত হইতে পারে না। বাঙ্গালা ভাষায় এই যে অভদ্রোচিত ভাব এত প্রবল হইতেছে, ইহা আমাদের ভয় ভাবনার কারণ সন্দেহ নাই। নীচতাদুষ্ট রচনা অবিলম্বে পরিত্যক্ত হওয়া আবশ্যক। এখন অনেকেই চলিত বা colloquial বাঙ্গালার পক্ষপাতী হইয়াছেন। ইহা দোষের কথা নয়। ভাষা clcloquial না হইলে সাহিত্য মূর্খের আয়ত্ত হয় না, সুতরাং সমস্ত লোকের সমান হিতকর হয় না। কিন্তু colloquial বাঙ্গালা লিখিবার একটা বিষম দোষও আছে। collnoquial বাঙ্গালা লিখিতে লিখিতে slang বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ নীচতাদুষ্ট বাঙ্গালা আসিয়া পড়ে। আমাদের মধ্যে আসিয়াছেও তাই। সেই জন্য অনেক বাঙ্গালা সংবাদপত্র পড়া অনেক সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের অতিশয় বিরক্তিকর, এমন কি, ঘৃণাজনক হইয়া পড়িয়াছে, এবং সমস্ত সমাজে একটা নীচতাপ্রিয়তা জন্মিয়া গিয়াছে। ইহার সংস্কার সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। এইরূপ এবং অন্যান্য কারণে বাঙ্গালা সংবাদপত্রে আমাদের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই সাধিত হইতেছে। এই অনিষ্ট নিবারণ করা বড়ই আবশ্যক। এ বিষয়ের অধিক আলোচনা এখানে হইতে পারে না। স্থানান্তরে ও সময়ান্তরে করিবার ইচ্ছা রহিল।

এই কঠিন কাজ সতের বৎসর করিয়াছিলাম। তাহার পর পেন্সন লইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করি। এমন কঠিন চাকরী এত দীর্ঘকাল করাতেও কিন্তু আমার অন্তরাত্মা বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে

কখনও কষ্ট বা যন্ত্রণা দেন নাই। বরং অনুকূল সাক্ষ্য দিয়া আমাকে আশ্বস্তই করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে, আমার অন্তরাত্মা আমার নিজের লোক, আমার দিকে টানিয়া কথা কহিবেন, ইহা বিচিত্র নয়। তাঁহাদের বিশ্বাস হইতে পারে, এই আশায় আমার অন্তরাত্মার সাক্ষ্যের অপর অনুকূল বা পোষক সাক্ষ্য (corroborative evidence) দিতেছি। আমি ৩৫ বৎসর বয়সে চাকরীতে গিয়াছিলাম, পেন্সন আইনানুসারে আমার ১৭৫৲টি টাকা পেন্সন প্রাপ্য হইয়াছিল। তাহাতে আমার সংসার চলিবে না বলিয়া আমি special বা অতিরিক্ত পেন্সনের দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমার কাজকর্ম্ম দেখিয়াছিলেন, এমন অনেক বড় বড় কর্ম্মচারীর অভিমত ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিয়াছিলাম। অতিরিক্ত বা special pension ষ্টেট সেক্রেটারীর অনুমতি ভিন্ন হইতে পারে না। বেঙ্গল গবর্মেণ্ট ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্টকে পত্র লেখেন, এবং ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট ষ্টেট সেক্রেটারীকে পত্র লেখেন। সেই সকল পত্র এবং কর্ম্মচারীদিগের অভিমত হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম :—

The work of the Bengali Translator requires capacity of a high order, good judgment, and scrupulous fairness. All these qualities have been continuously exhibited by Babu Chandra Nath Bose. The selecting of passages for translation from the various vernacular newspapers makes large demands upon the discretion and good faith of the officer entrusted with the work; and in this important matter this officer has rendered very marked services to Government. —বেঙ্গল গবর্মেণ্টের সেক্রেটারী আরল্ সাহেবের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

We agree with the Government of Bengal in its estimate of the high qualities required for the efficient conduct of the duties of its Bengali Translator, and in its appreciation of the loyalty and ability with which Babu Chandra Nath Bose has discharged those duties. * * * In the performance of both these ordinary and these special duties, Babu Chandra Nath Bose has displyed great ability and fairness, sometimes at the cost of much obloquy from his countrymen —সুপ্রীম কৌন্সিলের সদস্য অ্যাম্পথিল, কিচেনার, ল, এলিস্, অরণ্ডেল, ইবেট্‌সন্ ও রিচার্ড সাহেবদিগের স্বাক্ষরিত পত্র হইতে উদ্ধৃত।

They were always faithfully and efficiently discharged, and his work was ever animated by a deep sense of responsibility and distingushed by conscientious accuracy.—কটন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

In the delicate and difficult duties that you have to discharge as Translator to Governmet, and especially in that branch of your work which deals with the weekly report on the vernacular newspapers, you have displayed equal judgment and fearlessness. The annual and other special reports that you have form time to time submitted on this subject have shown remarkable insight into the currents of thought and feeling which sway the writers in the vernacular press, and have elicited the warm commendations of Govenment, to whome they have afforded material help.

Your personal character for independence and probity stands so high that it is quite needless for me to do more than refer to it.—শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I was delighted to hear from your letter of the 4th August that the Government had granted you a special pension. No man has deserved it better than you,and I offer you my hearty congratulations. It is not the amount that I value, but the recognition thoroughly good and scholarly work,continued for many years.—ক্রফ্‌ট্‌ সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I know nothing but good of your work and have several times had occasion to notice that it was faithfully and conscientiously done.—ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have always had the highest opinion of your ability and trustworthiness; and I belive that Sir John Edgar held the same opinion.

Your office as official translatior is one of very considerable difficulty and delicacy. You have not escaped attacks by some newspapers fom time to time for doing your duty loyally to Government.—লুসন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

I have much pleasure in testifying, as you ask me, to the able and conscientious manner in which you always discharged your duties in the responsible post of translator to Government while I was Under Secretary to Government in the Political and Judicial Departments. * * * Your retirement will be a loss to the Government in my opinion. ওল্ডহাম সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

Your work as Bengali translator always seemed to me excellent. ক্লগষ্টন সাহেবের প্রদত্ত প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

এই সকল পড়িয়া বুঝিয়াছি যে, এত দিন এই কঠিন কাজ করিয়াছিলাম, কিন্তু অধর্ম্ম করি নাই, গবমেণ্ট এবং বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেরই ধারণা, এবং সেই জন্য সকলেই আমার উপর সন্তুষ্ট। এই জন্যই ত আজ আমার সুখ এত নির্ম্মল, এমন অবিনশ্বর। এ সুখের হ্রাস নাই। এ সুখে তরঙ্গ নাই। এ সুখের বিনাশ নাই। আমি হাসি, কাঁদি, দুঃখ পাই;—কিন্তু সবই আমার সেই নিত্য নির্ব্বিকার সুখরূপ জমীর উপর করি। যেমন একই বস্ত্ররূপ জমীর উপর নানাবিধ ফুল প্রভৃতি তোলা হয়, তেমনি আমার এই অনন্ত সুখরূপ জমীর উপর হাসি কান্না সবই ফোটে। তাই ত মনে হয়, সচ্চিদানন্দের বুঝি এই প্রকৃতির আনন্দ। ধর্ম্মজ্ঞান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং যত দূর সাধ্য প্রবল রাখিয়া কঠিন চাকরী করিয়া আমি অক্ষয় ও অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়াছি। কিন্তু দু' দিনের জন্য স্বাধীনতা ফলাইতে গিয়া যে আত্মগ্লানি সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহা এখনও যায় নাই; বোধ হয়, এ জীবন থাকিতে যাইবে না। কিন্তু চাকরীর এই সুখে উহা কতকটা চাপা পড়িয়াছে। কিন্তু কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিয়া এই যে চিরস্থায়ী আনন্দ লাভ করিয়াছি, ইহার অপেক্ষাও একটা বড় ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে। সে ফলের নাম discipline—নিয়মানুবর্ত্তিতা। এই কঠিন চাকরী করিতে করিতে যেমন স্থৈর্য্য আসিয়াছিল, ধৈর্য্য আসিয়াছিল, কষ্টসহিষ্ণুতা আসিয়াছিল, তেমনি আলস্য, অস্থিরতা, শ্রমকাতরতা, চঞ্চলতা প্রভৃতি দোষ কাটিয়া গিয়াছিল। প্রাত্যহিক সংসার-যাত্রীর ঐ সকল গুণও যেমন আবশ্যক, ঐ সকল দোষের পরিহারও তেমনি প্রয়োজনীয়। নহিলে নিত্য সংসার-যাত্রায় বিপদ বিভ্রাট অশান্তির অমঙ্গলের সীমা থাকে না। অর্থাৎ, কঠিন চাকরী কঠোর ভাবে সম্পন্ন করিলে, মনুষ্যোচিত গুণ আপনা-আপনিই জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ, অপক্ক মানুষ পরিপক্ক হয়। অপর দিকে পরিপক্ক মানুষ স্বাধীনতা ফলাইতে গেলে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কঠিন চাকরীতে মানুষ গড়ে, স্বাধীন ব্যবসায় মানুষকে নষ্ট করে।

প্রকৃত অধীনতা চাকরীতে নাই। উহাতে হীনতাও নাই। হীন কাজ না করিলে কিছুতেই হীনতা নাই। আমাকে একবার একটা হীন কাজ করিতে বলা হইয়াছিল। আমি তৎক্ষণাৎ ফোঁস করিয়া উঠিয়া একটা ছোবল মারিয়াছিলাম। আর আমাকে কেহ কোনও হীন কাজ করিতে বলিতে সাহস করে নাই। ওকালতীতে টাকার গোলামী করিতে হয় —চাকরীতে তাহা হয় না। টাকার গোলামী সকল গোলামীর অধম। ৫।৬ বৎসর হইল, কলিকাতার দুই জন সম্ভ্রান্ত আইন-ব্যবসায়ী আমাকে বলিয়াছিলেন,—আর দু' বৎসরের বেশী এ ব্যবসা চালাইব না—কিন্তু এখনও চালাইতেছেন। 'আমি পেন্সন লইবার পর ভাই রাসবিহারী আমাকে এক দিন বলিয়াছিলেন,—you acted wisely (in leaving the legal

profession) আমি এখনও chained like a galley-slave। তাই বলি, চাকরীতে সুখও যেমন, স্বাধীনতাও তেমনি, আর discipline শিক্ষা হয় বলিয়া মনুষ্যত্বের উন্নতিও তেমনি; ওকালতীতে অনেকের পক্ষে অধীনতাই বেশী, এবং মনুষ্যত্বের অপলাপ হয় ও প্রতিবন্ধক ঘটে। সকলেই বলে,—স্বাধীনবৃত্তিরূপ মাকাল ফলের অনুগামী হইয়া সুখ শান্তি মনুষ্যত্ব প্রভৃতি সমস্ত স্পৃহনীয় পদার্থে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে কঠিন দায়িত্বপূর্ণ চাকরী করিও। ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা আপনাদের অভাব আপনারা মোচন করিতে পার, অগ্রে তাহাই করিও, নচেৎ ঐ করিও। সচ্চিদানন্দের আনন্দের আস্বাদ পাইবে, সংসারযাত্রার সুচারুরূপে নির্ব্বাহ যে সকল গুণ না থাকিলে হয় না, তাহা লাভ করিবে, এবং প্রকৃত মনুষ্যেত্বর অধিকারী হইবে, প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করিবে।

এই অনুপম আনন্দে এখন আমার দিন কাটিতেছে। শোক দুঃখ আমার আছে, বিশেষতঃ আমার দুলুমায়ের বিয়োগবশতঃ। কিন্তু যখন ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়া থাকি, আর আমার সহধর্ম্মিণী নিঃশব্দে আমার অজ্ঞাতসারে আমার ঘরে আসেন, বলিতে পারি না কেমন করিয়া আমার বিষণ্নতা আমার অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যায়, অক্ষয়কুমার আমাকে আর এক দিন দেখিতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,—আপনার জোরে তিনি আছেন। তাঁর জোরে আপনি আছেন। এত গুপ্ত কথা অক্ষয় কেমন করিয়া জানিলেন, বলিতে পারি না। কিন্তু কথা বড়ই সত্য। বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি, স্ত্রীই পুরুষের শক্তি—শিবের শক্তি শিবানী, ব্রহ্মার শক্তি সাবিত্রী, বিষ্ণুর শক্তি রমা। শুনিতাম, কিন্তু বুঝিতাম না। এখন বুঝিয়াছি। বুঝিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। কৃতার্থ হইয়াছি এই জন্য যে, আমরা সকলেই ত শক্তির সৃষ্টি করিয়া লইয়া সুখশান্তির অধিকারী হইতে পারি। এখন বুঝিয়াছি, প্রেম ফ্রেম বড় কাজের কথা নয়, এক মুহূর্ত্তে হয়, এক মুহূর্ত্তে যায়। ভক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উহাতে তেমন কাজ হয় না। ভক্তির অভাবে প্রেম পবিত্র হয় না, সুতরাং সমাজের প্রকৃত মঙ্গলজনকও হয় না। শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার প্রেম ভক্তিমূলক, সীতার সহিত রামচন্দ্রের প্রেম ভক্তিমূলক ছিল, শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রেম ভক্তিমূলক ছিল, দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবদের প্রেম ভক্তিমূলক ছিল। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্ণিত প্রেম ভক্তিমূলক নয়, লালসামূলক। বাঙ্গালা কবিতা ও উপন্যাসে ভক্তিমূলক প্রেম বর্ণিত হইলে বাঙ্গালা সাহিত্য সাহিত্যের মধ্যে উচ্চতম ও অদ্বিতীয় হইবে। ক্রমশঃ।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

অর্থনীতির তাৎপর্য্য।

মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব দেখিলে আমরা স্বভাবতঃ আন্দোলনে তৎপর হই। প্রাণ নামক পদার্থবিশেষকে রক্ষা করা নীতিসঙ্গত, এবং এহেন প্রাণের অর্থ নামক একটা অবলম্বন আছে। তাহা ফুরাইয়া গেলে বিকট হাহাকারের উৎপত্তি হয়। সেটা অশান্তিজনক। এতএব অর্থনীতির আলোচনাও আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মানবজাতির পশুজাতি হইতে কিছু প্রভেদ আছে। আমরা পাতালতা খাইয়া থাকিতে পারি না। চাষ করিয়া খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়। সুবৃষ্টি ও সুবাতাস হইলে পশুগণ লাঙ্গুলান্দোলন পূর্ব্বক প্রচুরপরিমাণে আহার করে, এবং অপত্যোৎপাদন করে। ইহাই তাহাদিগের ধর্ম্ম। বৃষ্টি প্রভৃতির অভাবে তাহাদিগের কিয়দংশ মরিয়া যায়, কিয়দংশ অন্যান্য প্রদেশে চলিয়া যায়। আমাদিগের কেবল বৃষ্টি হইলেই আহার জুটে না। প্রথমতঃ, জমী চাই; দ্বিতীয়তঃ, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম সেই জমীতে ব্যয় করিতে হয়। তদ্ব্যতিরেকে মূলধন নামক একটা পদার্থ আছে। সেটাও আবশ্যক।

আদিমকালে কেবল বুদ্ধি ও কায়িক পরিশ্রমই মূলধনের মধ্যে গণ্য হইত। অর্থাৎ, বিস্তর জমী ছিল, লোকসংখ্যা কম। কিছু বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলেই বৎসর বৎসর উদরপূর্ত্তির ব্যবস্থা অক্লেশে হইতে পারিত। তখনকার একটি অসভ্য বন্যমনুষ্য ও একটি মহাতপা ঋষি দেখিতে এক প্রকারই ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস বলেন যে, অসম্পূর্ণ হইতে সম্পূর্ণ মনুষ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক যুগ বহিয়া গিয়াছে, এবং তাহার মধ্যে অনেকানেক স্তর দেখা দেখিয়া, আবার গভীরতর স্তরের সহিত অন্তর্হিত হইয়াছে। এই রকম স্তরের মধ্যে আমরাও একটি স্তরে বর্ত্তমান। এবং সেখানে সে কালের উদাহরণ চলে না।

কাজেই একালে অর্থের গতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে প্রথমতঃ জমী, দ্বিতীয়তঃ পরিশ্রম, এবং তৃতীয়তঃ মূলধনের বিষয় অবতারণা করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে লোকসংখ্যা, ব্যবসায় বাণিজ্য, শিল্প ও সপ্তকাণ্ডের আদ্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে হয়। ইহাকে উহাকে গালি দেওয়া এমন অবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ। কখনও রাজাকে, কখনও সমাজকে, কখনও পুত্র কলত্রগণ ও একান্নবর্ত্তী পরিবারকে, এইরূপে গালি দিয়া যখন পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ি, তখন ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি পড়ে। অবশেষে বলি, "ভগবান্! তোমার লীলা বুঝা ভার।"

লীলাটা বিশেষ অসামান্য কিছুই নয়, এবং বুঝাও শক্ত নয়।

আমরা বিহার প্রদেশে একটি মহকুমায় থাকি। মহকুমা অর্থে জিলার একটি অংশ। এখানে দুর্ভিক্ষের রেখা দেখা দিয়াছে। অন্য কোনও কর্ম্ম না থাকাতে কতিপয় গ্রাম্য পঞ্চায়েতবর্গের সহিত একটা হিসাব খতাইতে আরম্ভ করিলাম।

এই মহকুমার লোকসংখ্যা ... ৫,৫০০০০ (সাড়ে পাঁচ লক্ষ)
" চাষোপযোগী জমী ... ৪,০০,০০০ (স্থানীয় বিঘা)

উল্লিখিত ৫½ লক্ষ মনুষ্যসন্তানের মধ্যে চাষীর সংখ্যা মোটামুটী ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ)। যদি স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া প্রত্যেক চাষীর ঘর ভাগ করেন, তবে ৬০,০০০ প্রজার ঘর দাঁড়ায়। ইহা ব্যতিরেকে ৩০,০০০ কিংবা ৬০০০ ঘর মজুর আছে, যাহাদিগের চাষ নাই, কেবল কায়িক পরিশ্রম করিয়া গ্রামে গ্রামে দিনযাপন করে। বক্রী এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোকের সহিত চাষ বাসের কোনও মুখ্য সম্বন্ধ নাই। হয় ত তাহারা মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত, এবং বহুতর পেশা অবলম্বন করিয়া আছে।

৪,০০,০০০ বিঘা চাষোপযোগী জমীর মধ্যে তিন লক্ষ বিঘা প্রজা কর্ত্তৃক চাষ হয় মাত্র। বাকি জমীদারের কামত, কিংবা নিজজোত, খাল, জলা ও অনুর্ব্বরা ভূমি। যদি সুবৃষ্টি হয়, তবে এই জমীতে তিন রকম ফসল হয়। যথা (১) মকই (ভুট্টা) এবং ধান্য (ভাদ্রমাস), (২) অগহনি' (অগ্রহায়ণ মাস) ধান্য, এবং (৩) রবিশস্য।

মোট জমীর মধ্যে মোটামুটী ⅓ অংশে মকই প্রভৃতির চাষ হয়, ⅓ অংশে অগহনি, এবং ⅓ অংশে রবিশস্যের চাষ হয়। আপনারা বোধ হয় জানেন যে, এক জমীতে এ প্রদেশে তিনবার ফসল বড় একটা হয় না, তবে অনেক জমীতে দুইবার হয়; তাহাকে দোফসলী বলে।

যদি সুবৃষ্টির বৎসর ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখেন, তবে অনায়াসে এক বিঘায় ১৩ মণ শস্য উৎপন্ন হয়। হিসাবের প্রক্রিয়া দেখাইতে গেলে প্রবন্ধ নিতান্ত বৃহৎ হইয়া পড়িবে। অতএব এটা ধরিয়া লউন। এখানকার বিঘা বাঙ্গালা দেশের প্রায় তিন বিঘার সমান। এই ১৩ মণ শস্য ঝাড়া পরিষ্কৃত শস্য, এবং এখনকার বাজার-দরে ইহার দাম ৫২৲ টাকা।

এখন ৬০,০০০ ঘর চাষীর সংখ্যা ছাড়িয়া দিয়া এক ঘরের অবস্থা দেখুন। এক ঘরে হরে দরে ৫টি লোক। প্রত্যেক ঘরের ৩,০০,০০০ + ৬০,০০০ = ৫ বিঘা কর্ষণোপযোগী জমী। এ অঞ্চলে প্রত্যেক ঘরে তিন মাসের খাদ্য থাকে। অর্থাৎ, প্রায় ৬ মণ শস্য। যদি সুবৃষ্টি হয়, তবেঃ——

জমা,—

মূলধন	...	...	৬ মণ
বৎসরের উৎপন্ন	...	...	৬৪ মণ
		মোট	**৭০ মণ (পাঁচ বিঘায়)**

ইহা যে এমন বিশেষ কিছু, তাহা নহে। তবে, আমরা কিছু হাত কসিয়া হিসাব করিয়াছি। এই ৭০ মণ শস্য কিসে কিসে খরচ হয়, তাহার একটি তালিকা এখন লওয়া যাইতে পারে।

এ প্রদেশে এক ঘর চাষীর আড়াই সের শস্য হইলেই দিন কাটিয়া যায়।

আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, সকলেরই কি অর্দ্ধসেরে পেট ভরে? তাহা নয়, কিন্তু অনেকের এক পোয়াতেই অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ইহা ক্ষীণায়ুঃ ও অক্ষমতার লক্ষণ, কিন্তু ইহার কারণানুসন্ধানে এখন প্রবৃত্ত হইব না। এই মহকুমায় হরে দরে ২॥০ টাকা বিঘা জমীর খাজনা, এবং এক বিঘায় অর্দ্ধ মণ বীজ লাগে।

জমা		খরচ (মণের হিসাবে ধরিয়া)	
৭০/	(১)	উদর-পূর্ত্তি	২৫/
	(২)	বীজ-শস্য	২॥/
	(৩)	চাষের খরচ	২॥/
	(৪)	খাজনা ও সেলামী, সুদ ও ঘুষ প্রভৃতি	৫/
	(৫)	তৈল, তামাক, চিনি, মশলা খরিদ করিতে, বিক্রি করিতে হয়	১০/
	(৬)	লবণ, কেরাসিনতৈল, কাপড়, ছাতা, ও অন্যান্য বিদেশজাত দ্রব্য আমদানী করিতে বিক্রী করিতে হয়	১০/
	(৭)	বাসন, লাঙ্গল, বাটী নির্ম্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি ও বিবাহাদি, রেল ও নেশার খরচ	৯/
			৬৪/

বাকি ৬/

মনে করুন, যদি সুবৃষ্টি না হইয়া কোনও বৎসর ফসলের অবস্থা অর্দ্ধেক দাঁড়ায়, তবে কি হইবে?

অনাবৃষ্টির বৎসরের খরচ——

জমা		খরচ	
	(১)	উদর-পূর্ত্তি	১৫/
৩৫॥/	(২)	বীজ-শস্য	২॥/
	(৩)	চাষের খরচ কিছু কমাইয়া দিয়া	২/
	(৪)	খাজনা ২॥০ হিসাবে ৫ বিঘায় ১২॥ (শস্যের হিসাবে)	৩/
	(৫)	তৈল, তামাক প্রভৃতি	৫/
	(৬)	আমদানীর দ্রব্য	৫/
	(৭)	বাসন ও অন্যান্য ও বাজে খরচ——	

বাকি ৩/ বীজশস্যের জন্য ৩২॥/

যদি ফসল আট আনা না হইয়া সাম্না বৎসরের উপর কেবল চারি আনা হয়, অর্থাৎ যদি ১৮/ মণ হয়, তবে (১) (২) (৩) সঙ্কুলান হইতেই তাহা শেষ হইয়া যাইবে। অতএব হয় ত বাকি ১৪/ ধার করিতে হইবে, নচেৎ বীজ-শস্য ও বাসনাদি বেচিয়া, খাজনা বাকি রাখিয়া, তৈল তামাক ছাড়িয়া, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া, অনেক সময় অনশনে দিন কাটাইতে হইবে। ইহার কম হইলে ঘোর দুর্ভিক্ষ।

ইহাই বিহারাঞ্চলের আধুনিক অবস্থা। আমরা ঘরে ঘরে এক ঘর প্রজার ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অনেক প্রজার ৫ বিঘার কম, এবং অনেকের তাহার বেশী। অতএব, যাহাদিগের বেশী জমী আছে, তাহারাই অনেকটা স্বচ্ছন্দে থাকে। কিন্তু বার আনা চাষীর হিসাব ॥০ আনার তালিকার অন্তর্গত।

অতঃপর দেখিতে পারেন যে, ধন কিংবা অর্থের গতি কোন কোন দিকে প্রসারিত হয়। ২৫/ মণ শস্য উদরেই যায়, এবং তদ্দ্বারা আয়ুর্বর্দ্ধন কিংবা আয়ু রক্ষা হয়। ইহাই বংশবৃদ্ধির মূলধন। একটি চাষীর পরিশ্রমে আরও চারিটি জীব বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে যে, সকলেই চিরকাল বাঁচে না। একটা মরে, এবং তাহার স্থানে অন্যটা দাঁড়ায়। যে পরিশ্রম করিতে পারে না, সে মরে, এবং যে বাঁচে; সে শ্রমক্ষম। এইরূপে ঘরে ঘরে লোকসংখ্যা অতি সামান্যমাত্র বাড়ে। দশ বৎসরের মধ্যে এই মহকুমায় ৩৩,০০০ লোক বাড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু দশ বৎসর পূর্ব্বে যাহা খাইতে পারিত, এখন তাহা পারে না; অতএব হিসাবের কোনও তারতম্য ঘটে নাই।

চাষের খরচ ২॥/ মণ দ্বারা গ্রামের শ্রমজীবিগণ প্রতিপালিত হয়। ইহারা কেবল কোদালি লাঙ্গল পাড়ে, এবং ধান কাটে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, ইহাদিগের সংখ্যা ৩০,০০০ অর্থাৎ দুই ঘর কৃষকের একটি করিয়া মজুর। বাকি পরিশ্রম তাহারা নিজেরাই করে। একটি মজুর দুই ঘর কৃষকের নিকট ৫/ পায়। ইহাতে তাহার সংবৎসর চলে। দুর্বৎসর হইলে ইহাদিগের অধিকাংশ অন্য স্থলে চলিয়া যায়।

খাজনা, সেলামী ও ঘুস প্রভৃতিতে যাহা খরচ হয়, তাহার এক অদ্ভুত ইতিহাস আছে। ইহার মধ্যে জমীদার, নায়েব, গোমস্তা ও মহাজন প্রভৃতি প্রতিপালিত হইয়া থাকেন। শাসন, বিচার, উকীল, মোক্তার, চৌকিদার, পঞ্চায়েত, পুলিস, সকলই ইহার মধ্যে। ইহার হিসাব একটু বিশেষ করিয়া খতাইয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

এ মহকুমায় :—		কৃষকের ঘর		টাকা
খাজনা	২॥/	৬০,০০০	১,৫০,০০০/মণ	৬,০০,০০০
সুদ	॥/	৬০,০০০	৩০,০০০/ „	১,২০,০০০
সেলামী, ঘুস প্রভৃতি	॥/	৬০,০০০	৩০,০০০/ „	১,২,০০০০
মোকদ্দমা, মামলার খরচ	২/	৬০,০০০	১,২০,০০০/ „	৪,৮০,০০০
		মোট—	৩,৩,০০০০	১৩,২০,০০০

দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক ঘর চাষী মোট ফসলের উপর ২৭/১ অংশ খাজনা দেয়। অর্থাৎ, ৫ বিঘায় ৬৪/ মণ শস্য হয়; তাহার মধ্যে ২॥/ মাত্র খাজনায় যায়। ইহাতে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, শুনিতে পাওয়া যায় যে, খাজনার অংশ সমগ্র বাঙ্গলা প্রদেশে ফসলের উপর ৬/১ মাত্র। কিন্তু মনে করা উচিত, আমরা টাকার অধুনাতন মূল্য ভুলিয়া গিয়াছি। যে সময় খাজনা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, সেই সময়ের সহিত তুলনা করিলে, শস্যের দাম চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ১০/ মণ শস্য বেচিলে ১২॥০ টাকা খাজনা শোধ হইত। এখন ২॥০/ মন শস্য বেচিলেই তাহা হয়। তবে, বিহারাঞ্চলে অনেক স্থলে ভাউলী অর্থাৎ ভাগ-ফসলের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু তাহা আমরা পূর্ব্বেই কামত জমীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছি। সে স্থলে কৃষক কুলী মজুরের সমান।

কিন্তু এই কামত কিংবা ভাউলী জমীতে বিশেষ লাভ আছে। প্রায় ২৫,০০০ বিঘা জমী এই প্রকারে চাষ হয়, এবং তাহা হইতে জমীদারগণের বিঘা প্রতি ৬ মণ অর্থাৎ ২৪৲ টাকা লাভ থাকে।

ইহার মূল্য	২৫০০০	২৪	৬,০০,০০০ টাকা
জের খাজনা			৬,০০,০০০ „
মোট জমীদারের লাভ			১২,০০০,০০০ „

এই বারো লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ রাজস্ব ও শেস্ দিতে হয়। অতএব দশ লক্ষ থাকে। এই দশ লক্ষ টাকায় অর্থাৎ ২,৫০,০০০/ মণ শস্যে দশ হাজার লোক সংবৎসর প্রতিপালিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা কি প্রকারে হয়, এবং কেন হয়, তাহা পরে দেখা যাইতে পারে।

সুদের হিসাবে ১,২০,০০০, ফেলিয়াছি। সুদ কেন? কৃষক ঋণী, তাহাই সুদ। পূর্ব্বাপর দুর্বৎসর চলিয়া আসিতেছে। একবার শোধ হয়, আবার লইয়া থাকে। সুদের হার শত করা ২৫৲ টাকা। অন্য স্থানে সুলভ হইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য মহাজন ছাড়া কৃষকদিগকে অন্য কেহ জানে না। সম্পদে বিপদে তাহারাই সহায়। যদি কৃষক মরিয়া যায়, তবে মহাজনের উপায় থাকিবে না। অতএব অতিশয় দুর্বৎসরেও মহাজন ধন লইয়া প্রস্তুত থাকে।

সেলামী, ঘুস, মামলা মোকদ্দমায় প্রায় ৬,০০,০০০ লক্ষ টাকা যায়। ইহাতে উকীল, মোক্তার ও নানাবিধ শ্রেণীর লোক প্রতিপালিত হইয়া থাকে।

এখন (৫) দফায় আসিয়া দেখুন যে, তৈল তামাক চিনি মশ্লা প্রভৃতি ক্রয় করিতে প্রত্যেক চাষীর ঘর হইতে ১০/ মণ শস্য যায়। ইহার মধ্যে লাভ ও লোকসান আছে। কিন্তু ইহার লাভ লোকসানে এ দেশেরই অন্য স্থানের চাষীর ভরণ পোষণ হয়। কিন্তু (৬) দফায় লবণ, কেরোসিন তৈল, কাপড়, ছাতা ও অন্যান্য বিদেশজাত দ্রব্য আমদানী করিতে হইলে যে ১০/ শস্য

দিতে হয়, তাহার দাম সমগ্র মহকুমা ধরিলে ৬০,০০০ × ১০/ = ২৪,০০,০০০ অর্থাৎ ২৪ লক্ষ টাকা।

বেশী লোকের মতে এ সব দ্রব্য এ দেশে প্রস্তুত করিলে এ দেশের লোকই প্রতিপালিত হইতে পারে। যাঁহারা অবাধ বাণিজ্যর পরিপোষক, তাঁহারা বলেন যে, এবংবিধ স্বদেশীগিরি একটা ঘোর স্বার্থপরতা। যে দেশে শস্যের সংস্থান নাই, সে দেশের লোক এহেন বাণিজ্য বন্ধ করিলে বাঁচিবে কি করিয়া? ইহা বিশ্বজনীন আদান প্রদান। ইহা বন্ধ করিলে যে সুফল হইবে, তাহা নহে। বিশেষতঃ, সকল বস্তুই কিছু এ দেশে পাওয়া যায় না। জোর করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তার মধ্যে বদ্ধ থাকিলে কতকগুলি অনধিকারী শ্রমজীবীর বংশ বাড়িবে মাত্র, এবং শেষে এত ভিড় হইবে যে, লোকসংখ্যার উপযোগী চাষের জমী পাওয়া যাইবে না।

কিন্তু অন্যপক্ষীয় লোক বলেন যে, তোমাদের সহিত বাণিজ্য করিতে আমাদিগের কোনও বাধা নাই। কিন্তু আমরা যদি বুদ্ধি সম্মার্জ্জিত করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্য হইতেই সস্তা দরে তোমাদিগের মত মাল বাহির করিতে পারি, তবে অন্ততঃ এটুকু সত্য যে, তোমরা ঠকাইতে পারিবে না। তোমাদিগের দিকে ধনের ভাগ অযথা বেশী যাইতেছে। উভয় পক্ষের অনুপাত একরকম দাঁড়াইলে, ফলে তোমাদিগের শিল্পজীবী পূর্ব্বাপেক্ষা কম খাইবে, এবং আমাদিগের শিল্পজীবী এক বেলার স্থানে দুই বেলা খাইতে পারিবে। এরূপ দ্বন্দ্বে হয় ত তোমাদিগের দুই একটা লোক কালগ্রাসে পড়িতে পারে, এবং আমাদিগের দুই একটা লোক বাড়িতে পারে। মনে কর, সেখানকার লোক মরিয়া এখানে আসিতেছে, ইহাতে দুঃখ কি? যদি ধনের বণ্টন সৎ, সরল ও উপযুক্ত ভাবে চলে, তবে বিশ্বজনীন আদান-প্রদান কিংবা আত্মোৎসর্গের কোনও ব্যত্যয় ঘটিতে পারে না।

(৭) দফায় ৯/ মণের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক এ দেশেই থাকে, বাকি অর্দ্ধেক নেশায়, রেলে ও ষ্টীমারে যায়। নেশার আবকারী শুল্ক গভর্মেণ্টে যায়, রেল প্রভৃতির লাভ বেশী বিদেশে যায়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রত্যেক ঘর কৃষক কত লোককে প্রতিপালন করিতেছে।

				জনসংখ্যা
দেশের লোক	সুদ বাবত মহাজনকে ॥/০	অর্থাৎ	প্রায়	১/১২
	খাজনা বাবত জমীদারকে ২॥/০	,,	,,	১/২
	সেলামী ঘুস প্রভৃতিতে ॥/০	,,	,,	১/১২
	মোকদ্দমা মামলাতে ২/০	,,	,,	১/২
	চাষের খরচে কুলি ২॥/০	,,	,,	১/২
	তৈল তামাক প্রভৃতি ১০/০	,,	,,	২
	বাসন, লাঙ্গল, বাটী-নির্ম্মাণ বিবাহাদি প্রভৃতিতে ধরিয়া লউন ৫/০	,,		১
				৪ ১/২

বিদেশের	লবণ, কেরোসীন, কাপড়, ছাতা প্রভৃতি	১০/০	২
	রেল, ষ্টীমার, প্রভৃতিতে ধরিয়া লউন	৩/০	৳
			২৳
			৭

ইহা ব্যতিরেকে স্বয়ং, এবং চারিটি পরিবারস্থ জীব। সর্ব্বশুদ্ধ মোট বারোটি। জমী পাঁচ বিঘা। অতএব প্রত্যেক বিঘায় প্রায় আড়াইটি লোক বাঁচে, এবং সংসারবর্ত্মে মনুষ্য-নামে পরিচয় দিয়া থাকে।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, তবে ধনী দুঃখীর প্রভেদ কেন?

কে ধনী, তাহা ভাবিলে কথাটা শক্ত দাঁড়ায়।

ধন জমা রাখিলেই কি ধনী? না, তাহা মূর্খতা। উহা অহঙ্কার পরিবর্দ্ধিত করিতে পারে, কিন্তু না খাটাইলে উহা বৃথা। কোমল শয্যা, মুরজ, মুরলী, বীণা, গৃহিণীর অলঙ্কার, সাহিত্য, কবিতা, প্রেম,—ইহাদিগের পশ্চাতে অতি সত্য জীবন্ত ইতিহাস রহিয়াছে। সে ইতিহাস মানব-জীবনের। আমরা যাহাকে ধন বলি, সেটা ভ্রম। বাস্তবিক আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত আহারচিন্তায় ব্যস্ত। এক জন উৎসর্গ পূর্ব্বক অন্যকে আহার দিতেছে মাত্র। সকলেই এক পরিবারস্থ। কেবল বিবাদ 'আমি ও আমার' 'তুমি ও তোমার' লইয়া।

ইহার মধ্যে দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, রক্তপাত কেন? তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। মানব শান্তি চাহে, ধর্ম্ম চাহে, সার সুখ চাহে। এই শান্তি-স্থাপন মিষ্ট কথায় হয় না। এ জীবন-সংগ্রামে কেহ জিতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মবলিদান দিতে চাহে না। তাহারই নিমিত্ত রাজ্যশাসন, এবং রাজা।

আমরা তবে অনর্থক গালি দিয়া মরি কেন? নিগূঢ় চিন্তা করিয়া দেখুন, কাহারও দোষ নাই। রাজারও সুখ নাই, প্রজারও সুখ নাই। প্রজা চাহে, আমি রাজা হই; রাজা ভাবে, আমি প্রজা হইলে থাকিতাম ভাল। উভয়ে সামঞ্জস্য করিয়া, দুঃখীকে প্রতিপালন করিয়া, চোরকে দণ্ড দিয়া, যে দেশ ও জাতি শান্তিস্থাপন করিতে পারে, সেই দেশ ও সেই জাতিই ধন্য।

ধন বাড়াইতে গেলেই প্রাণের সংখ্যা বাড়ে। চাউল গোলা-জাত করিলে ইঁদুর বাড়ে, এবং জমী ফেলিয়া রাখিলে কীট পতঙ্গ বাড়ে। এই বর্দ্ধনশীল জগতের মধ্যে বেশী ভাগই কোলাহল, তাহা মিটিবে না।

যদি আমরা সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া পড়ি, তবে অর্থ নামক মায়াময় পদার্থ চট করিয়া লোকসংখ্যা অন্য দিকে বাড়াইয়া দিবে। নিজের শান্তি চাহ, সন্ন্যাসী হইতে পার। কিংবা ঋণগ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতভোজনের ন্যায় অতি স্নেহময় পদার্থ দ্বারা লুচি ভাজিয়া খাইতে পার। যাহাই কর না কেন, ব্রহ্মা দুই দিকেই প্রজাসৃষ্টি করেন। প্রথমোক্ত স্থলে, অন্যান্য নূতন জীব রঙ্গালয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়; অপর স্থলে ঘৃতভোজীর পুত্রসন্তান বর্দ্ধিত হয়। পণ্ডিতের পক্ষে উভয়েই সমান।

অর্থনীতির গতি সূক্ষ্ম।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী।—অগ্রহায়ণ। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর জি-দে-লাফেঁার ফরাসী গ্রন্থ হইতে "ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম" সঙ্কলিত করিয়াছেন। শ্রীযুত কুমুদনাথ লাহিড়ীর "মরণজয়ী প্রেম" নামক ব্রহ্মদেশের উপকথাটি উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য। শ্রীযুত ব্রজসুন্দর সান্যালের "জাপানে স্ত্রী-শিক্ষা" নামক প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্র "একডালা দুর্গ" নামক প্রবন্ধে একডালার স্থাননির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। "অশরীরীর আবির্ভাব" প্রবন্ধে শ্রীযুত কালীশঙ্কর সেন ভূতের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীযুত সুধীন্দ্র-নাথ ঠাকুর "ধর্ম্ম" নামক প্রবন্ধের এক স্থলে লিখিয়াছেন,—"আত্মার স্বাধীনতা হারাইয়া বাহি-রের অধীনতায় কি আসে যায়!—যাহার আত্মা স্বাধীন, তাহাকে বাহিরের সহস্র নিগড়ে আবদ্ধ রাখিলেও নিষ্প্রভ নিস্তেজ, হতশ্রী করিতে পারে না।" কিন্তু ইতিহাস সুধীন্দ্র বাবুর এই উক্তির বিরোধী। তাহার সাক্ষ্য অন্যরূপ,—সম্পূর্ণ বিপরীত: 'বাহিরের অধীনতায়' আত্মা সঙ্কীর্ণ হইয়া যায়। 'আত্মার স্বাধীনতা'র জন্যই বাহিরের স্বাধীনতা আবশ্যক। যাহারা বাহিরের স্বাধীনতায় বঞ্চিত, তাহাদের আত্মাও অন্তরের স্বাধীনতায় বঞ্চিত হয়। বাহিরের অধীনতায় অন্তরের বলহানি ঘটে, আত্মাও মৃতকল্প মুমূর্ষু হইতে থাকে। তাই উপনিষদ বলিয়াছেন,—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" জীবন-যুদ্ধে বলসঞ্চয় সেই জন্য মানব জাতির পক্ষে অত্যন্ত অপরিহার্য্য। 'বাহিরের অধীনতা'য় 'বলহীনতা'র সৃষ্টি হয়। অন্তরের ও বাহি-রের স্বাধীনতার সামঞ্জস্যেই আত্মা স্বাধীন হইতে পারে। নতুবা আত্মা 'নিষ্প্রভ নিস্তেজ হতশ্রী' না হইয়া থাকিতে পারে না,—পৃথিবীর অতীত ও বর্ত্তমানের ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। 'বাহিরের অধীনতা'র কারাগারে আধ্যাত্মিকতার তপোবন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যে আত্মা জড় পিঞ্জরে চিরবন্দী, তাহাকে যেমন আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় পুষ্ট করিয়া মুক্ত করিবার বিধি আছে, তেমনই বাহিরের অধীনতা হইতেও মুমুক্ষু আত্মাকে মুক্ত করিয়া দিতে হয়। 'বাহিরের অধীনতা'র মধ্যে আত্মার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা আকাশে ফুলের চাষ, বাহিরের অধীনতায় রসনা মূক হইয়া যায়, লেখনী মিথ্যার জাল বুনিতে থাকে, কাপুরুষতা অসত্যের যবনিকায় সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া মিথ্যা স্তোকে মনকে আশ্বস্ত করে। এ অবস্থায় প্রাক্তনের ফলে, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যবলে দুই একজন জীবন্মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানবের আত্মা 'বাহিরের অধীনতা'র শিকল পরিয়া, উদাসীনতার দাঁড়ে বসিয়া টেঁয়া পাখীর মত ছোলা খাইতে পারে,—'আত্মারাম' বলিতে পারে, কিন্তু স্বাধীন হইতে পারে না। কেন না, সমগ্র জগৎ এক দিনে পরমহংসের তপোবনে পরিণত হইবার আশা নাই। "ধর্ম্মের বলবত্তা" প্রবন্ধে শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সকল ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। "ধর্ম্মের বলবত্তা" অস্বীকার করিবার কোনও কারণ নাই, এবং তাহা বহু পূর্ব্বেই প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে মানব জাতি শিরোধার্য্য করিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, যাহারা 'ধর্ম্মের বলবত্তা' স্বীকার করে, তাহাদের ব্যবহারে, বিশেষতঃ রাজনীতিক দ্বন্দ্বে 'ধর্ম্মের' সেই 'বলবত্তা' দেখিতে পাওয়া যায় কি না? দুর্ভাগ্যক্রমে

শ্রদ্ধাস্পদ লেখক সে বিষয়ে কোনও মতই ব্যক্ত করেন নাই। উপসংহারে লেখক লিখিয়াছেন,—"পৃথিবীতে দানবীশক্তির পালা সাঙ্গ হইবার এবং সেই সাঙ্গ মানবীশক্তির পালা আরম্ভ হইবার উপক্রম হইয়াছে—এটা আমরা দেখিয়াও দেখিতেছি না।" কিন্তু এ জন্য চক্ষু নামক ইন্দ্রিয়টিকে অপরাধী করিবার কোনও কারণ আছে কি? 'পৃথিবীতে দানবী-শক্তির পালা সাঙ্গ হইবার' কোনও লক্ষণই ত দেখিতে পাইতেছি না। ইউরোপে, আমেরিকায়, এসিয়ায়, অষ্ট্রেলিয়ায় দানবীশক্তিই বিজয় লাভ করিতেছে; মানবীশক্তি পদদলিত হইয়াছে, ও হইতেছে। এসিয়ায় জাপান সেই দানবীশক্তির সাধনা করিয়া সেদিন আত্মরক্ষা করিয়াছে। ভবিষ্যতের কোনও সত্যযুগে মানবীশক্তি দানবী-শক্তির রক্তরঞ্জিত কুরুক্ষেত্রে আপনার বিজয়-বৈজয়িন্তী প্রোথিত করিতে পারে, সুদূর ভবিষ্যতে ধরাতলে ধর্ম্মের পবিত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কিন্তু এখন তাহার 'উপক্রম'ও সম্ভাবনার গর্ভে ভ্রূণ-রূপেই অবস্থান করিতেছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অন্ততঃ লেখক 'মানবীশক্তির পালা আরম্ভ হইবার' কোনও সাক্ষ্য প্রমাণই এ প্রবন্ধে উপস্থিত করেন নাই। এরূপ ভবিষ্যৎ-বাণী প্রমাণহীন হইলে তর্ক-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ধর্ম্মই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন; অতএব অধর্ম্মের পথে জাতিকে প্রবর্ত্তিত করিয়া কোনও লাভ নাই। কিন্তু রাজনীতিক ক্ষেত্রে কি ধর্ম্ম, কি অধর্ম্ম,—বর্ত্তমান সঙ্কট-কালে যখন তাহার আলোচনাই বিপদসঙ্কুল, তখন সে তর্কেরও অবকাশ নাই।

বঙ্গদর্শন।—অগ্রহায়ণ। শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইতিহাসের ক্ষেত্র হইতে প্রত্নতত্ত্বের গভীর গহনে প্রবেশ করিয়া যে সমিধ আহরণ করিয়াছেন,—এই সংখ্যায় "প্রাচ্যভারত" নামক প্রবন্ধে তাহা বাঙ্গালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। লেখক এই প্রবন্ধে নানা গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত বহু তথ্য একত্র সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন; এখনও কোনও নূতন সিদ্ধান্তের অবতারণা করেন নাই। শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "পরাজয়" নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। ক্ষুদ্র গল্পের রচনায় সৌরীন্দ্র বাবু যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, "পরাজয়" তাহার অনুপযুক্ত হয় নাই। শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের "প্রাণের কথা" উল্লেখযোগ্য। "কৃষ্ণকান্তের উইলে"র সমালোচনা এখনও সমাপ্ত হয় নাই। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের "শোক" নামক কবিতায় কোনও বিশেষত্ব নাই। অধিকন্তু যে সরলতার সৌন্দর্য্যে কবির কবিতা বাঙ্গলায় সমাদৃত হইয়াছিল, "শোকে" তাহার চিহ্নও নাই।

নবীনচন্দ্র ও জাতীয় অভ্যুত্থান।

—:*:—

সমাজ-দেহে জীবনীশক্তি বর্ত্তমান থাকিলে, উহাতে বাহিরের একটা নূতন বলের সঞ্চার হইলে, সে সমাজ-দেহ যতই কেন মুমূর্ষু হউক না, উহা কিছু কালের জন্য আবার সজীব হইয়া উঠে। ভাগ্য প্রসন্ন থাকিলে এই সজীবতার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হয়; নহিলে এই কিছু কালের সজীবতা পরিণামে প্রগাঢ়তর স্থবিরতায় পর্য্যবসিত হয়। সমাজ-তত্ত্বের এই সিদ্ধান্তকে মান্য করিয়া ভারতেতিহাসের দুই কালের দুইটি বিপ্লবের পর্য্যালোচনা করিলে, আমরা কবি নবীনচন্দ্রের বঙ্গসাহিত্যে স্থান ও মান, এই দুই বিষয় বুঝিতে পারিব।

প্রথম ইস্‌লাম ধর্ম্মের ও মুসলমান সভ্যতার সংঘর্ষে আসিয়া ভারতের হিন্দুসমাজের ও সাহিত্যের বিপ্লব ঘটে। সেই বিপ্লবের ফলে এক পক্ষে গোরক্ষনাথ, রামানন্দ, নানক ও শ্রীচৈতন্য ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক রূপে অবতীর্ণ হন। অন্য পক্ষে, সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস, বিহারীদাস প্রভৃতি সাহিত্যসেবিগণ আর্য্যাবর্ত্তে, আর বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, মুকুন্দরাম, গোবিন্দদাস, জয়ানন্দ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি কবিগণ মিথিলায় ও বঙ্গে আবির্ভূত হন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইঁহারাই পঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে বিষম বিপ্লব উত্থিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত হইল। হিন্দুসমাজ-দেহে যাহারা চিরকাল নীচ ও অন্ত্যজ হইয়াছিল, ইস্‌লামের কৃপায় তাহারা শ্রেষ্ঠের সমান হইয়া উঠিল। যে চণ্ডাল হিন্দু থাকিলে কখনই কোনও উচ্চ জাতির সহিত একাসনে বসিতে পাইত না, সে মুসলমান হইলেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সহিত একাসনে বসিতে পাইত। ফলে, হিন্দুসমাজের ভিত্তির স্বরূপ শিল্পকুশল শূদ্র জাতি সকল দলে দলে মুসলমান হইতে লাগিল। সমাজে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। অন্য দিকে সাদী, হাফেজ, ফর্দ্দৌসী,

ওমর খায়াম্ প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের কাব্য ও গাথা নূতন ভাব ও নূতন তত্ত্ব হিন্দুর সম্মুখে আনিয়া দিল। হিন্দুর ভাববিপ্লবও ঘটিল। এই বিপ্লব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমাজের মনীষিগণ ইস্লাম-শক্তির সহিত একটা আপোষ করিতে উদ্যত হইলেন। গোরক্ষনাথ জাতিনির্ব্বিশেষে শৈব ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন যে, মহাদেব সদাশিব নিরাকার, নির্ব্বিকার ঈশ্বর। তাঁহাতে রূপের আরোপ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতে হয় না। চিহ্ন বা প্রতীক স্বরূপ এক খণ্ড প্রস্তর লিঙ্গ বিধায়ে পূজিত হইবে। আর এই মহাদেবের মন্দিরে ও উপাসনায় উচ্চ নীচ নাই, ব্রাহ্মণ শূদ্র নাই। রামানন্দ বৈষ্ণব ধর্ম্মকে এই হিসাবে সর্ব্বজাতির সেবা করিতে চাহিলেন। তিনি ভক্তির পন্থা অবলম্বন করিয়া ম্লেচ্ছ শূদ্র হইতে ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত সকলকেই এক সূত্রে বাঁধিতে চাহিলেন। হরিভক্ত রামভক্ত ম্লেচ্ছ চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণের পূজ্য হইবে। ইহাই রামানন্দের আদেশ। কেন না, ভক্তির পথ সকলেরই গম্য ও সেব্য। গুরু নানক ব্যবহার-ধর্ম্ম বা moralityকে ভক্তিতে ডুবাইয়া, সন্ন্যাসের সহিত মিশাইয়া, ইসলাম ও হিন্দুর আপোষে শিখধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। শেষে বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্য শুদ্ধ হরিভক্তি-প্রবাহের প্রভাবে সকল বাধা অতিক্রম করিয়া এক নবীন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন। ঈশ্বরপ্রেম ও মধুর রসকে আশ্রয় করিয়া তিনি আচণ্ডালে হরিনাম বিলাইলেন।

এই ভাবে ইসলামের সহিত হিন্দুত্বের কতকটা আপোষ হইল। হিন্দু-সমাজে কতকটা সামঞ্জস্যের ভাব দেখা দিল। পক্ষান্তরে, সাহিত্যেও এইরূপ বিপ্লব ঘটিল। এই ভাবেই তাহারও সামঞ্জস্য হইয়াছিল। তবে এই সময়ে ভাবপ্রবাহ পশ্চিম হইতে বঙ্গে আসিয়াছিল। সুরদাস, শ্যামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতির হিন্দী পদাবলী গীত ও মহাকাব্য সকল পাঠ করিয়া বাঙ্গালার চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির লেখা পড়িলে মনে হয়, যেন বাঙ্গালায় হিন্দীর প্রতিধ্বনি শুনিতেছি। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে তুলসী-কৃত রামায়ণের অনেক ছত্র, অনেক শ্লোক আদত পাওয়া যায়। সুরদাসের গীত-লহরী হইতে চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের সর্ব্বস্ব পাওয়া যায়। এখন এক একটি পদ তুলিয়া আশ্চর্য্য সম্মিলনের পরিচয় দিবার সময় নহে। তবে যাঁহারা হিন্দুস্থানী কবিদের লেখা পড়িয়াছেন, সেই সঙ্গে চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম প্রভৃতিও পড়িয়াছেন, তাঁহারা এই কথ

যাথার্থ্য স্বীকার করিবেন। একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এ দেশে ইংরেজের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে বাঙ্গালী হিন্দুস্থানের সহিত সম্বন্ধচ্যুত হন নাই;—বাঙ্গালী স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন নাই। বাঙ্গালার শিক্ষিত হিন্দুকে পদমর্য্যাদা বজায় রাখিতে হইলে হিন্দী, উর্দ্দু ও ফার্সী শিখিতে হইত। তখন বাঙ্গালীমাত্রই হিন্দী বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। বাঙ্গালা ভাষাও হিন্দী হইতে এখনকার মত এতটা পৃথক হইয়া যায় নাই। এই হেতু মনে হয়, বাঙ্গালার কবি হিন্দুস্থানের কবিকে আদর্শ করিয়া কাব্য গাথা লিখিতেন।

সে যাহা হউক, এই জাতীয় নবোন্মেষের সময় যেমন ধর্ম্মে হিন্দু ও মুসলমানের বিশ্বাস-সামঞ্জস্য ঘটিয়াছিল, তেমনই সাহিত্যেও হিন্দু ও মুসলমান রুচির সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছিল। ভক্তি যেমন ধর্ম্মপক্ষে সমঞ্জসীকরণের উপাদান ছিল, তেমনই রূপজ মোহ লালসা ও ভক্তিজন্য আত্মদান সাহিত্যের ভূষণস্বরূপ হইয়াছিল। সাহিত্যে ইসলাম রুচি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে এই রুচির বিকট বিকাশ হইয়াছে। কবিকঙ্কণের কাঁচলীর বর্ণনা, আর কবি শ্যামদাসের শ্রীমতীর কাঁচলীর বর্ণনা ভাবে ও ভাষায় প্রায় একরূপ। এ বর্ণনা ইসলাম-রুচি-জাত। এমন ভাবে নারীর আভরণের বর্ণনা হিন্দুর পুরাতন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হিন্দুর সমাজ-দেহের এই যে অভ্যুত্থান, ইহাকে ইংরাজীতে Indo-Islamic Renaissance বলা যাইতে পারে।

ইংরেজের অভ্যুদয় প্রথমে বাঙ্গালা দেশেই হয়। বাঙ্গালীই প্রথমে ইংরেজের সভ্যতার ও বিদ্যার পরিচয় পান। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী একটা নূতন সামগ্রী পাইল, উহা European Individualism. উচ্চনীচ নাই। পূজ্য হেয় নাই। পুরুষকার সকলেরই আয়ত্ত। তাহার প্রভাবে সকলেই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পদ পাইতে পারে। আর্য্য শাস্ত্রের পুরাতন পুরুষকার-তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া বাঙ্গালী এই পুরুষকারের মোহে মুগ্ধ হইয়াছিল। মুগ্ধ হইবার একটু হেতুও ছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরে ইউরোপ ফরাসীর অনুশীলিত ও প্রচারিত নূতন সাম্যবাদ পাইয়াছিল। সেই সাম্যবাদের উপঢৌকন প্রথমেই ইংরেজ বাঙ্গালীকে দিয়াছিল। এই সাম্যবাদ ও এই পুরুষকারের মোহে বাঙ্গালী প্রথমে দলে দলে খৃষ্টান হইতে লাগিল। নবাবী আমলে বরং জাতিবিচার

ছিল, উচ্চনীচের পার্থক্য ছিল, সমাজে বিধিনিষেধ ছিল। ইংরেজ এ দেশে আসিয়া সে সব উড়াইয়া দিতে চাহিলেন। ফরাসীদের নিকট হইতে ধার করিয়া Liberty, Fraternity ও Erquality, এই তিন মহামন্ত্র ইংরেজ বাঙ্গলীকে শিখাইলেন। হিন্দু সমাজে এই নবীন শিক্ষার প্রভাবে একটা বিপ্লব ঘটিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত আপোষ করিয়া সমাজরক্ষার উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গড়িলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষা-প্রণালীর সাহায্যে দেশীয় ছাঁচে পাশ্চাত্য ভাব ও কথা এ দেশে প্রচুরপরিমাণে আমদানী করিলেন। পাশ্চাত্য হিসাবে তিনিই প্রথম সমাজ-সংস্কারক হইলেন। পক্ষান্তরে, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র এক দিকে, আর বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব অন্য দিকে, সাহিত্যের পথে স্বদেশীয় আবরণে এ দেশে পাশ্চাত্য ভাব-তত্ত্বের আমদানী করিলেন। ইঁহারাই আধুনিক Indo-European Renaissanceএর প্রচারক ও প্রবর্ত্তক স্বরূপ।

প্রথমেই, ইংরেজের সাহিত্যে যাহা আছে, আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে যাহা নাই, তাহারই আমদানী আরম্ভ হইল। মাইকেল মিল্টনের অনুকরণে অমিত্রাক্ষরে মহাকাব্য মেঘনাদবধ রচনা করিলেন। এ কাব্যে পাশ্চাত্য Individualism পূর্ণ পরিস্ফুট। আদিম মহাভারত বা বিষ্ণুপুরাণে যেমন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, হিরণ্যকশিপু, ভীষ্ম প্রভৃতি পুরুষার্থপ্রবণ চরিত্রকথা আছে, ইস্‌লাম যুগে অদৃষ্টবাদের প্রাবল্যে, ভক্তির আত্মনিবেদনের অধিক্যে জাতীয় সাহিত্যে ঐরূপ চরিত-কথার অভাব হইয়াছিল। মাইকেল সে অভাব পূর্ণ করিলেন;—রাবণ, মেঘনাদ প্রভৃতির পুরুষার্থপ্রবণ চরিতের অঙ্কন করিয়া জাতীয় সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিবেন। কবি হেমচন্দ্র এই Individualismকে বা পুরুষকারকে দেশহিতৈষণায় পরিবর্ত্তিত করিবেন। তাঁহার কবিতাবলী, গাথা ও বৃত্রসংহারে দধীচির চরিত্র ইহার পরিচায়ক। খাঁটী Patriotism ইউরোপের সামগ্রী—এ দেশের নহে। কবি হেমচন্দ্র উহা এ দেশে কবির ভাষায় ফুটাইয়াছিলেন।

কবি নবীনচন্দ্র প্রথমে মাইকেল ও হেমচন্দ্রের ভাবমোহে পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য পলাশীর যুদ্ধ। উহাতে Patriotism অতি মধুর ভাবে বর্ণিত ও বিন্যস্ত আছে।

এই সময়ে এ দেশে ডাক্তার কংগ্রীভের মুখে অগস্ত কোম্‌তের মতের

আমদানী হয়। সে Humanitarianism আমাদের চক্ষে সম্পূর্ণ নূতন বোধ হইল। সে Humanitarianismএর প্রভাবে ভারতের নানা জাতি ও নানা ধর্ম্মের সমন্বয় সম্ভব মনে হইল। এই সময়ে আবার Nationalism বা জাতীয়তার প্রথম বিকাশ বাঙ্গালায় হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইউরোপীয় ভাবকে দেশীয় ছাঁচে ঢালিয়া বিলাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের culture তত্ত্বটাকে কালা আদমীর শাস্ত্রসঙ্গত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণকে ভারতের বিস্‌মার্ক বানাইয়া খাড়া করিতেছেন।—পক্ষান্তরে ভূদেব বাবু অপূর্ব্ব মনীষার প্রভাবে হিন্দুর খাঁটী সমাজ-তত্ত্ব ও পারিবারিক তত্ত্বকে ইংরেজি যুক্তিতে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন। ঠিক এই সময়ে কবি নবীনচন্দ্র পাশ্চাত্য Humanitarianismকে মহাভারতের গল্পের ছাঁচে ফেলিয়া নূতন Nationalismএর সৃষ্টি পুষ্টি করিয়া, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস, এই তিনখানি কাব্য গ্রন্থে বিংশশতাব্দীর অভিনব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন। কোলরিজ প্রমুখ 'লেক' কবিগণের Susquehannaর স্বপ্ন, কোমতের বিশ্বমানবতার তত্ত্ব, অর্থাৎ Humanitarianism, এবং টেনিসনের লক্‌স্‌লিহলে বিশ্ববান্ধবতার বিবৃতি, এই সকলগুলি সম্পিণ্ডিত করিয়া আমাদের সনাতন মহাভারতের ছাঁচে ফেলিয়া নবীনচন্দ্র তিনখানি কাব্য গ্রন্থের রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রৌঢ় শরতের শেফালী-বর্ষার ন্যায় তাঁহার ভাষা আপনি আসে, আপনি ফুটে, আর আপন সৌরভে দশ দিক আমোদিত করিয়া দেয়। তাই তাঁহার এই তিনখানি কাব্য উদ্দেশ্যমূলক ও সিদ্ধান্ত-বিন্যাসক হইলেও, ভাষার গুণে অনেকের আদরের হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে ও ধর্ম্ম-তত্ত্বে যাহা শিখাইয়াছেন, সূত্র ও ভাষ্যাকারে যাহার বিন্যাস করিয়াছেন, উপকথার ছলে দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ ও সীতারাম, এই তিনখানি উপন্যাসে যাহার আংশিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নবীনচন্দ্র তাঁহার তিনখানি কাব্যে সেই সকল তত্ত্বই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই চেষ্টা সার্থক হউক আর নাই হউক, এই চেষ্টার জন্যই তিনি নূতন যুগের শেষ মহাকবি। কেন না, মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষায় আর তাত্ত্বিক কাব্যের প্রয়োজন নাই। তাই এখনকার কবিগণ Lyrics Idylls লিখিয়া তাঁহাদের কাব্যশক্তির পর্য্যাবসান করিতেছেন।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের সংঘর্ষণের জন্য পূর্ব্বে যে অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, তাহাতে ভাব-প্রবহ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে বা বাঙ্গালায় আসিয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের

সংঘর্ষণে ও ইংরেজের অধিকার-বিস্তার হেতু যে বিপ্লব এখন ঘটিয়াছে, তাহাতে ভাব-প্রবাহ বাঙ্গালা হইতে যুক্তপ্রদেশে ও পঞ্জাবে যাইতেছে। কাশীর হিন্দুস্থানী কবি হরিশ্চন্দ্র প্রথমে হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কবিতা হিন্দীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার পর হইতে বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর নাটক, নভেল ও কাব্যগ্রন্থ সকল বর্ষে বর্ষে হিন্দীতে ভাবান্তরিত হইয়া প্রচারিত হইতেছে। কালমাহাত্ম্যে ভাবের উজান গতি হইয়াছে।

এই সঙ্গে বলা ভাল যে, ইস্‌লাম সভ্যতার জন্য যে বিকৃত রুচি আমাদের সাহিত্যে দেখা দিয়াছিল, তাহার অনেকটা অপনোদন হইয়াছে। হিন্দুর সহজ বুদ্ধি অতীন্দ্রিয়বাদ-প্রসারিণী বা Transcendental। তাই সুরদাস ও চণ্ডীদাস প্রেমটাকে ভগবানের পারিজাত-হারে পরিণত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের ইংরেজিনবীশ বাঙ্গালী কবিগণ ব্রাউনিং ও গেটের লেখায় উহারই সম্যক্ পরিচয় পাইয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রকারান্তরে সেই সকলের আমদানী করিতেছেন। ইহার ফলে রুচি অনেকটা পরিশুদ্ধ হইয়াছে। কবি নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ইউরোপের এই বিচিত্র Transcendentalismএর কতকাংশে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যশক্তির পরিচয় দিবার এখনও সময় আসে নাই। তবে বঙ্গসাহিত্য ও সমাজে তাঁহার স্থান ও মান কেমন, তাহার পরিচয় যথাশক্তি প্রদত্ত হইল। তিনি বর্ত্তমান অভ্যুত্থানের শেষ মহাকবি—শেষ ব্যাখ্যাতা ও প্রচারক। জয়ানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণ কবিতার প্রভাবে ও কাব্যগ্রন্থ-প্রচারে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম উদ্দেশ্যে না হউক, তদনুরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়াসে কবি নবীনচন্দ্র ইদানীং কবিতাগ্রন্থ সকল লিখিয়া গিয়াছেন। আপাততঃ ইহাই তাঁহার যথেষ্ট পরিচয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীনচন্দ্র।

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আজ রামমোহন লাইব্রেরির সভ্যগণ কর্ত্তৃক এই সভা আহূত হইয়াছে; এবং

তাঁহাদের দ্বারা আমি এই সভার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছি। এ আমার মহৎ সম্মান। সে বিষয়ে আমার কোনই আক্ষেপ থাকিত না, যদি যে পদে আজ বৃত হইয়াছি, সেই পদে আমি বরণীয় হইতাম। আমার অনেক আপত্তি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও যখন এ সম্মান আমাকে দেওয়া হইয়াছে, তখন আমি সে সম্মান মস্তকে ধারণ করিতে বাধ্য। বিশেষতঃ, সাহিত্যের ও বন্ধুর হিসাবে মৃত কবিবরের স্মৃতির প্রতি আমরা একটা কর্ত্তব্য আছে। আমি সেই জন্য এই সম্মান-ভার বহন করিতে শেষে স্বীকৃত হইয়াছি।

ভদ্রমহোদয়গণ! আজ যাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য আমরা সমবেত হইয়াছি, এখানে বোধ হয় এমন এক জন ব্যক্তিও উপস্থিত নাই, যিনি তাঁহার নাম শুনেন নাই। একদিন হেমচন্দ্র আর নবীনচন্দ্রের নাম প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহস্থের গৃহে অমৃতময় ছিল। বোধ হয়, তৎপরে কোনও কবি বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে তাঁহাদের মত প্রতিপত্তি অদ্যাবধি লাভ করেন নাই। তৎকালীন কাব্যামোদীরা হেমচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের কাব্য ভিন্ন আর কাহারও কাব্য পড়িতেন না। অনেকে হেমচন্দ্র বড় কবি কি নবীনচন্দ্র বড় কবি, এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিতেন, এবং কোনও পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিতেন না।

অবশ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে আমি এই তর্কের আবর্ত্তে ফেলিতেছি না। তাঁহার প্রতিভা যেরূপ যুগান্তরকারিণী ছিল, হেমচন্দ্র কি নবীনচন্দ্রের প্রতিভা সেরূপ যুগান্তরকারিণী ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক গদ্য সাহিত্যে যেরূপ নূতন যুগ আনিয়া দিয়া গিয়াছেন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত পদ্য সাহিত্যে সেই রকম একটা তোলপাড় করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মাইকেল বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করেন, চতুর্দ্দশপদী কবিতার সৃষ্টি করেন, খণ্ড কাব্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহার মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, চতুর্দ্দশপদী কবিতা অদ্যাবধি অননুকরণীয়। হেমচন্দ্র আর নবীনচন্দ্র সে ভাবে স্রষ্টা না হইলেও, তাঁহারা নূতন নূতন ধরণের প্রবর্ত্তক। হেমবাবু কড়ি পর্দ্দায় গাহিয়া গিয়াছেন, এবং নবীন বাবু কোমল পর্দ্দায় গাহিয়া গিয়াছেন। এবং উভয়ের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাদা পর্দ্দায় তাঁহার অপূর্ব্ব সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন।

হেমবাবু ও নবীন বাবু এই দু' জনের মধ্যে তৎকালীন কাব্যামোদীদের কাছে কাহার প্রভুত্ব অধিক ছিল, তাহা এখন নির্ণয় করা কঠিন। যদি

অনুকারকের সংখ্যা দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় নবীন বাবুরই অধিক প্রভুত্ব ছিল। কারণ, আমার যত দূর স্মরণ হয়, তখনকার পদ্য-রচয়িতারা হেমবাবুর তূরীনিনাদের অপেক্ষা নবীনচন্দ্রের এস্রাজের ঝঙ্কারই সমধিক ভালবাসিত, এবং তাহার অনুকরণ করিতে সমধিক প্রয়াসী হইত। আমার বোধ হয় যে, নবীন বাবুর মধুর পলাশীর যুদ্ধ যেরূপ আদর পাইয়াছিল, হেমচন্দ্রের গম্ভীর বৃত্রসংহার তখন নব্য যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ আদর পায় নাই। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গেলে একটা দস্তুর মত তুলনায় সমালোচনা হইয়া পড়ে। অতএব এ ক্ষেত্রে সে বিষয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। আমার শুদ্ধ বলা বলা উদ্দেশ্য যে, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা এক দিন সমস্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী অবনতশিরে স্বীকার করিয়াছিল; আর যাঁহাদের কিছু ছন্দোজ্ঞান ছিল, তাঁহারাই নবীনচন্দ্রের ধরণের কবিতা রচনা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

এককালে নবীনচন্দ্র এক শ্রেণীর যুবকদিগের কাছে দেবতা ছিলেন, এবং তাঁহার কবিতা তাঁদের কাছে অমৃতবৎ মধুর বোধ হইত। এক দিন যাঁহার এমন প্রভুত্ব হইয়াছিল, তাঁহাকে এখন নগণ্য বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। আজ বঙ্গদেশে নূতন যন্ত্রে নূতন ধরণে নূতন সঙ্গীত বাজিয়া উঠিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নবীনচন্দ্রের তান বঙ্গদেশ হইতে লুপ্ত হইবে না। লোকে হয় ত আজ টপ্পা খেয়ালের চেয়ে কীর্ত্তন কি থিয়েটারের গান ভালবাসে, কিন্তু তাই বলিয়া টপ্পা যে সে টপ্পা, খেয়াল যে সে খেয়ালই থাকিবে। লোকের রুচির পরিবর্ত্তন হইতে পারে। আজ হয় ত কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়ার চেয়ে কাটলেট লোকের কাছে স্বাদু। কিন্তু সরপুরিয়া এখনও সেই সরপুরিয়া। আজ আমরা যাহাই বলি না কেন, এ বিষয়ে বোধ হয় মতদ্বৈধ নাই যে, নবীনচন্দ্রের প্রতিভা অসাধারণ ছিল। ভাষার উপর তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাঁহার ছন্দোবন্ধের আশ্চর্য্য মাধুর্য্য, তাঁহার বর্ণনা আশ্চর্য্যরূপে মনোহারী ও সজীব; এবং তাঁহার ভা[illegible] আশ্চর্য্যরূপে মধুর ও বৈচিত্র্যময়।

নবীন বাবু সিরাজদ্দৌলাকে কালো রঙ্গে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়া কোনও কোনও নব্য সমালোচক তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক সমালোচকদিগের চীৎকারে কবিগণ ভাবিবার অবসর পান না। বঙ্কিমচন্দ্র একখানি উপন্যাসের ভূমিকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস

নয়। একদিন আমি নবীনচন্দ্রের কাছে এই সমালোচকদিগের বিষয় উল্লেখ করায় তিনি শুদ্ধ হাসিয়া এই সমালোচকদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঐতিহাসিকের মূল্য অধিক কি কাব্যকারের মূল্য অধিক, তাহা জানি না। ঐতিহাসিকগণ যতক্ষণ তর্ক করেন, কবি ততক্ষণ কল্পনা-রাজ্যে পক্ষবিস্তার করিয়া চলিয়া যান। ঐতিহাসিকের তর্ক তাঁর কাছে বাচালের বাচালতা। ঐতিহাসিক কবির প্রতি যে ধূলিনিক্ষেপ করেন, তাহা সেই ঐতিহাসিকের উপরেই আসিয়া লাগে; কবিকে তাহা স্পর্শ করে না। নবীন বাবু কবি ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে বসেন নাই। তিনি তাঁহার ধারণা-অনুসারে সিরাজের চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন। আর সে ধারণা অন্ততঃ কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতের অনুযায়ী। তাহাতে যে তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছিল, আমি তাহা বুঝিতে পারি না।

যদি ঐ ঐতিহাসিকগণ কাব্য হিসাবে সিরাজদ্দৌলার সমালোচনা করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতেন যে, নবীন বাবু কত বড় কবি ছিলেন। নবীনচন্দ্র সিরাজকে ঘোরতর পাপী বলিয়া বর্ণনা করিয়াও সিরাজের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইয়া বালকের মত কাঁদিয়াছেন। এইখানেই কবির প্রাণ। তাঁহার হৃদয় দেবতার হৃদয়; তাঁহার অশ্রু দেবতার অশ্রু।

যে দিন তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, আমার আজও সেদিন মনে পড়ে। আমি তখন বালক, আর তিনি তখন যুবক। তখন তিনি পলাশীর যুদ্ধ লিখিয়াই কৃষ্ণনগরে আসিয়াছেন। তাঁহার নূতন যশোরশ্মি তখন তাঁহার মস্তক ঘিরিয়া ছিল। তিনি অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। গাইতে পারিতেন না। তবে বাঁশী বাজাইতে পারিতেন। আমি তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ পড়িয়া তাঁহার "প্রিয়ে কেরোলাইনা আমার" গানটির একটি সুর দিয়াছিলাম। সেই সুরটি তাঁর বড় ভালো লাগিয়াছিল। কয় দিন ধরিয়া তিনি সে সুরটি আমার কাছ থেকে শিক্ষা করেন। তাঁহার স্নেহের পরিচয় আমি সেই দিন হইতেই পাইয়াছিলাম। এই অল্প দিনের পরিচয়; তিনি যশস্বী কবি, আর আমি তাঁর ভক্ত পাঠক। অথচ যখন তিনি কৃষ্ণনগরে তাঁহার বন্ধুবিশেষের কাছে পত্র লিখিতেন, তখন প্রতিবারেই আমাকে সস্নেহে স্মরণ করিতেন।

তাঁহার সঙ্গে আমার শেষ দেখা ত্রিপুরায়। আমি আবগারী বিভাগ পর্য্যবেক্ষণে গিয়াছিলাম। আমি ডাকবাংলায় উঠিয়াছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার বাসায় ডাকিয়া আনিয়া স্থান দিলেন। আমি সেখানে তিন দিন মাত্র ছিলাম। সেই তিন দিন তাঁহার সঙ্গে কাব্যালোচনায় অতিবাহিত করি। তিনি আমাকে তাঁহার ছোটভাইটির মত যত্ন ও আদর করিতেন। বন্ধুর মত বিশ্বাস করিয়া তাঁর ঘরের কথা বলিতেন। আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে তিনি আমায় লেখেন যে, সে তিন দিন তাঁহার দুর্গোৎসবের মত বোধ হইয়াছিল। এত বিনয়, এত সারল্য, এত স্নেহ।

সেই সময়ে তিনি তাঁহার পলাশীর যুদ্ধ রচনার ইতিহাস আমায় বলেন। সে ইতিহাস সাধারণের পক্ষে উপাদেয় হইবে বিবেচনা করিয়া আমি এখানে তাহা লিপিবদ্ধ করা অপ্রসঙ্গিক বিবেচনা করিলাম না। তিনি বলিলেন যে, তিনি পলাশীর যুদ্ধের প্রথম সর্গটুকু লিখিয়া তাহাই একটি খণ্ড কবিতার হিসাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশের জন্য পাঠান। বঙ্কিমবাবু নবীনবাবুকে তাহা ফেরৎ পাঠান, আর তাঁহাকে এই বিষয়ে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে উপদেশ দেন। তাহার পরে বীজস্বরূপ এই প্রথম সর্গ হইতেই তাঁহার এই অপূর্ব্ব বৃক্ষ পলাশীর যুদ্ধ বর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠে। বঙ্কিমবাবুর নিকট তাঁর এ বিষয়ে যেটুকু ঋণ ছিল, তিনি তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তাঁহার হৃদয়ে ক্ষুদ্রতা ছিল না, দ্বেষ ছিল না, অভিমান ছিল না। তাঁর পারিবারিক গুণ অনেক ছিল। কিন্তু এমন সরল উদার ভাবে বন্ধুকে বুঝি আর কোনও কবি ভালবাসেন নাই। আজ সেই কবিবর নিন্দার, কুৎসার, বিদ্বেষের রাজত্ব হইতে বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কীর্ত্তি বঙ্গদেশে অক্ষয় হউক। আমরা আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি। সে শোক-প্রকাশ আন্তরিক হউক। *

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

---

* গত ১৫ই মাঘ বৃহস্পতিবার কলিকাতা 'ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে' নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত।

স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

———:•:———

আমার আক্ষেপ, পীড়িত হইয়া বন্দী অবস্থায় গৃহে আবদ্ধ থাকায়, আমি নবীনচন্দ্রের শোকসভায় উপস্থিত হইতে পারিলাম না। কয়েক দিন পূর্ব্বে রামমোহন লাইব্রেরীর সভ্যগণের উদ্যোগে একটি শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতেও যোগদান করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম। ইহা আমার সামান্য ক্ষোভের বিষয় নয়। নবীনচন্দ্র আমার পরম বন্ধু ছিলেন। যিনি সেই উচ্চচেতা কবির সহিত কখনও আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে, নবীনচন্দ্রের হৃদয় অমৃতের খনি ছিল; সেই আলাপের দিন তিনি কখনও জীবনে বিস্মৃত হইবেন না।

এই মরালস্বভাব কবির চক্ষে কখনও কাহারও দোষ দৃষ্ট হইত না। তিনি রসাস্বাদী ছিলেন; রস আস্বাদন করিতেন, দোষ দেখিতে পাইতেন না। তাঁহার কবিত্বশক্তি তাঁহার ভাষাতেই কতক পরিমাণে বর্ণিত হয়,—

"সেই পিকবর কল, উছলে যমুনা-জল,
উছলিত ব্রজে শ্যাম-বাঁশরী যেমন,—"

ভাষার ছটায় ভাব-ঘটায় নবীনচন্দ্রের কবিতা অতি উচ্চশ্রেণীর, সে পরিচয় দিবার যোগ্যতা ও আবশ্যকতা আমার নাই। সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সহিত পরিচিত, এবং ভাবুকমণ্ডলী অদ্য তাহার পরিচয় সভাস্থলে উপযুক্ত বক্তৃতায় প্রদান করিবেন,—সন্দেহ নাই। যে সময়ে নবীনচন্দ্রের কাব্য প্রথম প্রকাশিত হইল, তখন লোকে যেমন মাইকেলকে বাঙ্গালার মিল্‌টন বলিত, তেমনই নবীনচন্দ্রকে বাঙ্গালার বাইরণ নামে বর্ণনা করিত। কিন্তু আমি বলিতাম, নবীনচন্দ্র—নবীনচন্দ্র। তাঁহার ভাষা ও ভাবসমষ্টির সম্মিলন আমার অতুলনীয় জ্ঞান হইয়াছিল। সে সকল কথার উল্লেখ আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। নবীনের কাব্য বঙ্গভূমে নবীনকে চিরদিন নবীন রাখিবে। সময়ে রুচির স্রোত তরঙ্গিত হইয়া চলে। এক সময় উচ্চ তরঙ্গশিখরে নবীনের কাব্য উঠিয়াছিল; এক্ষণে অপর তরঙ্গের খেলা দেখিতে পাই; কিন্তু আবার যে সেই বৃহৎ তরঙ্গের উত্থান হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। পূর্ণচন্দ্র মেঘে আচ্ছাদিত হইতে পারে, কিন্তু মেঘ স্থায়ী নয়—চন্দ্র স্থায়ী।

এই শোকসভায় নবীনচন্দ্রবিরহে শোকার্ত্ত ব্যক্তি অনেকেই উপস্থিত

আছেন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ও তাঁহাদের ন্যায় শোকার্ত্ত। যে দিন নবীনচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম আলাপ, সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত যত দিন একত্র বসিয়াছি, প্রতিদিনই আমার স্মৃতিতে জাগরিত। তিনি যখন রেঙ্গুনে, তথা হইতে আমায় পত্র লিখিতেন; সে পত্রের মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। পীড়িত অবস্থায় তাহা পাঠ করিয়া কত দিন শান্তি উপভোগ করিয়াছি। আমি ভাবিতাম, যদি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সহিত একত্র কালযাপন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার বার্দ্ধক্য সুখে অতিবাহিত হইবে। আমার এই মনের সাধ পত্রের দ্বারা তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম। তৎপূর্ব্বে তিনিও প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আমাকে তিনি রেঙ্গুনে পাইলে দুই মাস আবদ্ধ রাখিয়া একখানি নাটক লিখাইয়া লইবেন। আমার মনে মনে কল্পনা ছিল যে, তাঁহার অভিপ্রায়মত একখানি নাটক লিখিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইব। মানব-হৃদয়ে আশার তরঙ্গ উঠে, আবার অতলে ডুবিয়া যায়। আমারও আশা অতলে ডুবিয়াছে, নবীনচন্দ্র আর নাই!

নবীনচন্দ্র বঙ্গের কবি, কিন্তু আমার আত্মীয়—পরম সুহৃৎ—শুভাকাঙ্ক্ষী। যতদিন তাঁহার সহিত একত্র বসিয়াছি, সে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিলে বৃহৎ পুস্তক হইয়া উঠে। সে সমস্ত ঘটনাই তাঁহার মধুময় হৃদয়ের পরিচায়ক, কিন্তু তাহার বর্ণনায় আত্মশ্লাঘা প্রকাশ পায়। তিনি তো কাহারও দোষ দেখিতেন না। দেখা হইলেই আমার সুখ্যাতি করিতেন। আমি তাঁহার কাব্য শুনিতে চাহিতাম, তিনি আমার গান আবৃত্তি করিতেন। আমার সুপরিচিত যখন যাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নিকটেই আমার সংবাদ লইয়াছেন, এবং আমার সম্বন্ধে শত প্রশংসা-বাক্য লিখিয়াছেন। আমার উপর তাঁহার স্নেহের একটি পরিচয় দিই;—কোনও এক সময়ে আমি থিয়েটারে অভিনয় করিব, বিজ্ঞাপিত হয়; কিন্তু থিয়েটারের দিন প্রাতে বিজ্ঞাপন বাহির হইল যে, অসুস্থতা-নিবন্ধন আমি সেদিন অভিনয় করিতে পারিব না। নবীনচন্দ্র তখন কলিকাতায়। বেলা ৩টার সময় আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত, অতি ব্যাকুল, চুপি চুপি নিম্নতলে ভৃত্যের নিকট সন্ধান লইতেছেন—কিরূপ আছি। আমি উপরে ডাকিলাম। আমি বসিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতেছি, কিন্তু তাঁহার উদ্বেগ শান্ত হয় না। এই কথা স্মরণ হয়, এবং মনে আবেগ উঠে যে, এমন বন্ধুর সহিত আমার শেষ দেখা হইল না।

প্রেমিক নবীন চিরদিন প্রেমে উন্মত্ত। নবীনচন্দ্র প্রেমিক বৈষ্ণব কবি।

কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন থাকিতেন। থিয়েটারে কোনও কৃষ্ণবিষয়ক প্রসঙ্গ হইলে উন্মত্ত হইয়া যাইতেন, নাটক-কারের প্রশংসা তাঁহার মুখে ধরিত না।—বলিতেন, নাটক-কার তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও বিষয়-আবর্জ্জনা পতিত হইত না। সংসারে মুক্ত পুরুষ, প্রেমই তাঁহার জীবন। হিংসা, দ্বেষ, ঘৃণা, উপেক্ষা—তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে কখনও স্থান পাইত না। ভাবুক তাঁহার কাব্যে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখিবেন,—প্রেমের অনন্তধারা প্রবাহিত হইতেছে। জন্মভূমির প্রতি তাঁহার যে প্রগাঢ় প্রেম ছিল, তাহা তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' প্রকাশ। যদিচ তাঁহার সিরাজ-চরিত্র মসীলিপ্ত, তথাপি সেই দুর্ভাগ্য যুবকের জন্য তিনিই প্রথম অশ্রুধারা বর্ষণ করেন। কারাগারে সিরাজের খেদোক্তিতে পাষাণ বিদীর্ণ হয়। মোহনলালের খেদ,—

"কোথা যাও, ফিরে চাও সহস্রকিরণ,
বারেক ফিরিয়া চাও অহে দীনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব করিলে গমন,
আসিবে ভারতে চির-বিষাদ-রজনী!"

ইত্যাদি বঙ্গভাষায় অতুলনীয়। জন্মভূমির জন্য অনেক শোকোক্তি দেখিতেছি, কিন্তু এরূপ গভীর মর্ম্মভেদী শোকধ্বনি বিরল। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনয়ের নিমিত্ত তাঁহার "পলাশীর যুদ্ধ" নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করি। এক দিন তিনি অভিনয় দেখিতে যান। অভিনয়ান্তে তিনি বলেন, "দেখিতেছি, তুমি 'ধারাপাত' নাটক করিতে পার।" আমি উত্তর করিলাম, "হয় তো পারি, যদি নবীনচন্দ্র সে ধারাপাত লেখেন!"

নবীনচন্দ্র সঙ্গীত অতি অল্পই রচনা করিয়াছেন। কিন্তু যদি—

"কেন দুখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল!
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল?
ডুবিলে অতল জলে, প্রেমরত্ন তবে মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল।"

ইত্যাদি তাঁহার সঙ্গীত-রচনার আদর্শ হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গীত যে কাব্যের ন্যায় উপাদেয় হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই গীতটি সম্বন্ধে আমার সিরাজদ্দৌলা নাটক-পাঠান্তে তিনি যে আমায় একখানি পত্র লেখেন, তাহার এক স্থলে উল্লেখ আছে,—"আমি নবযুবক সিরাজের

পত্নীর মুখে শোক-সঙ্গীত প্রথম সংস্করণ 'পলাশীর যুদ্ধে' দিয়াছিলাম। শোকের সময় সঙ্গীত মুখে আসে কি না---বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন গোঁয়ার। দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।"

নবীনচন্দ্র করুণ রসে সিদ্ধ কবি ছিলেন। "ভ্রমের ঝর ঝর রব বিপুল ঝঙ্কার"ও শোনা যায়। সকল রসেরই উচ্ছ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু করুণ রসে একবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়। তাঁহার স্বর্গগমনেও সেই করুণ প্রবাহ প্রধাবিত! যোগ্য ব্যক্তির পরলোকগমনে কর্ত্তব্যবোধে শোকসভার অধিবেশন হয়। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বন্ধুগণের হৃদয়ে দারুণ শোক-শেল বিদ্ধ। তিনি কীর্ত্তিমান, তিনি কবি,—তাঁহার যশঃসৌরভ অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—কেবল এই সকল আন্দোলনে তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয় শান্ত হইবে না। নবীনচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গের ন্যায় তাঁহার বন্ধুবর্গেরও সেই আনন্দমূর্ত্তি সর্ব্বদা মানসক্ষেত্রে উদিত হইবে; তাঁহার অকপট সরল মধুর আলাপ ভুলিবার নয়; ইহজীবনে তাঁহারা ভুলিবেন না। তাঁহাদের নিকট নবীনচন্দ্রের প্রসঙ্গ সর্ব্বদাই উঠিবে। কাল সকলই হরণ করেন, কিন্তু যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে, নবীনচন্দ্রের যশঃসৌরভ হরণ করিতে পারিবেন না। নবীনচন্দ্র গিয়াছেন, কত দিনে তাঁহার অভাব পূর্ণ হইবে—কে জানে! *

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

নবীনচন্দ্র।

দুই দিন পূর্ব্বে অদ্যকার সভায় কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হয়। নবীন বাবুর কবিতা শৈশবে পড়িয়াছিলাম; তাহার পরে আর বেশী পড়ি নাই। সভাতে কিছু বলিতে হইলে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক; সময় সঙ্কীর্ণ; এবং এই দুই দিনের মধ্যেও আমাকে একবার হুগলী যাইতে হইয়াছিল। নবীন বাবুর সমস্ত গ্রন্থ পড়িয়া উঠিবার সুবিধা পাই নাই। শুধু প্রতিশ্রুতি-পালনের জন্য আমাকে এখানে দাঁড়াইতে হইয়াছে।

* গত ২০শে মাঘ মঙ্গলবার ষ্টার থিয়েটারে নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত।

নবীন বাবুর কবিতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। সকল কবির সম্বন্ধেই তাহা থাকে। প্রভেদ এই, এ ক্ষেত্রে বিরুদ্ধমতাবলম্বিগণ চরমপন্থী। কেহ কেহ মনে করেন, নবীন বাবু ব্যাস ও বাল্মীকির দরের কবি। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত রসিকলাল সেন মহাশয় এক জন সাহিত্যতত্ত্বজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁহার মতে 'কুরুক্ষেত্র' মহাভারতেরই মত উচ্চ শ্রেণীর কাব্য। প্রিয়বন্ধু হীরেন্দ্র বাবু এই অভিমতে সায় দিবেন কি না, জানি। না কিন্তু তিনি যে নবীন বাবুর প্রতিভার বিশেষ ভক্ত, তাহা সাহিত্যসমাজে অবিদিত নাই। ব্যাস ও বাল্মীকির সঙ্গে এই যুগের অন্য কোনও কবির তুলনা দিতে শুনি নাই। যাঁহারা এই মত প্রকাশ করিয়াছে, তাঁহারা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; তাঁহাদের উক্তি বাতুলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। অপর দল নবীন বাবুকে নিম্নশ্রেণীর শব্দ-কবি বলিয়া মনে করেন। স্তব ও নিন্দা, উভয়ই একটু অতিরিক্ত মাত্রার। আজ কবির জন্য শোক-প্রকাশের দিনে, এই দুই দলের তর্কব্যূহে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, শৈশবে নবীন বাবুর কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তখন ভাল মন্দ বিচারের প্রবৃত্তি বা শক্তি ছিল না। বাল্যসুলভ ক্রীড়াচ্ছলে বন হইতে একটি কুন্দ কুসুম আমোদের জন্য তুলিয়া লইতাম; সহসা দক্ষিণবায়ু বাগানের যুঁই ফুলের যে সুরভি বহিয়া আনিত, তাহাতেও তৃপ্ত হইতাম। এ সকলের মধ্যে যেমন বিচার ছিল না, কবিতা পাঠ করিতেও সেইরূপ বিচারের প্রয়োজন হইত না। যাহা ভাল লাগিত, তাহাই পড়িতাম। সে সময় ধলেশ্বরীর তীরে বসিয়া কতবার দেখিয়াছি, হরিশ্চন্দ্র পালের প্রাসাদের ভগ্ন স্তূপের পার্শ্ববর্ত্তী সাভারের তটান্তভূমি সিন্দূরমণ্ডিত প্রাচীরের মত উত্তাল তরঙ্গের গতি অবরোধ করিতেছে; সেই স্থানে কতবার উর্ম্মির বেগদর্শনে বলিয়াছি,—'এমন করিয়া কেন বহিয়া না যায় রে মানব-জীবন'। যখন কোনও আত্মীয়ের মৃত্যুতে শিশুহৃদয়ে অসহ্য যাতনা ভোগ করিতাম, এবং দিবারাত্র কাঁদিতাম, তখন বারংবার মনে হইত,—

'তরল না হ'ত যদি নয়নের নীর,
ছুঁইত আকাশ তব সমাধিমন্দির।'

নর্ত্তকীর নৃত্যদর্শনে 'ভুজঙ্গিনী সম বেণী দুলিতেছে পাছে' কতবার মনে পড়ি-

য়াছে। যখন আকাশে সহসা বিদ্যুৎপুঞ্জ স্ফুরিত হইত, এবং সেই আলোকে ধলেশ্বরীর শ্যাম তটের স্বর্ণবর্ণ ধান্যশীর্ষ ক্ষণকাল উদ্ভাসিত হইত, তখন

'দেখিতে বঙ্গের দশা সুরবালাগণ
গগন-গবাক্ষ যেন চকিতে খুলিয়া'

প্রভৃতি কতবার মনে হইয়াছে। যে কবির কাব্য শিশুর মানস-পটে নানা রেখায় নানা বর্ণে স্বীয় পংক্তিনিচয়-মুদ্রিত করিয়াছিল, তিনি নিশ্চয় স্বাভাবিক কবি। কারণ, শিশুকে আনন্দ দিবার শক্তি সকলের নাই। সে কোকিলের কুহু শুনিয়া স্তব্ধ হয়; তরঙ্গের ঝঙ্কারে মুগ্ধ হইয়া দাঁড়ায়, এবং বনফুল তুলিতে ছুটে; প্রকৃত কাব্য-কথা তাহার সুকুমার চিত্তে বিফল হইবার নহে।

এই দুই দিনে যদিও নবীন বাবুর সমস্ত কবিতা পড়িয়া উঠিতে পারি নাই, তাহাদের কতকাংশ পড়িয়াছি। তাঁহার সুবিখ্যাত রৈবতক ও কুরুক্ষেত্র অনেক দুর পাঠ করিয়াছি। এই কাব্যদ্বয়ের অনেক স্থলে প্রকৃত হৃদয়োচ্ছ্বাস ও চিত্রকরের তুলির সমাবেশ আছে। কিন্তু নবীন বাবু যে যুগের কবি, সে যুগে শিক্ষিত ব্যক্তিরা ভারতবর্ষকে নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও য়ুরোপীয় আদর্শের আলোতে দেখিতেছিলেন; এই জন্য তৃষিত অভিমন্যুকে রণক্ষেত্রে সার ফিলিপ সিড্‌নির মতন জনৈক মুমূর্ষু যোদ্ধার হস্তে স্বীয় জলের গ্লাসটি দিতে দেখিয়া বিস্মিত হই নাই। ভদ্রা যখন জরৎকারুর নিকট আমরা আর্য্য, অনার্য্য এক পিতার সন্তান বলিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তখন তাঁহার অভিপ্রায় বেশ বুঝিয়াছি; জরুৎকারু আর্য্যনারীর সতীত্বধর্ম্মের নিন্দা করিয়া কেন স্বাধীন প্রেমে মুক্তির সোপান দেখিতেছেন, এবং কেন ডাইডোর মত স্বীয় প্রেমাস্পদকে বধ করিতে চাহিতেছেন, কিংবা ব্যাসদেব কেন নিউটনের মত 'আমি অনন্ত সমুদ্রের তীর হইতে শম্বূক সংগ্রহ করিতেছি' বলিয়া বিনয় জানাইতেছেন, এবং কৃষ্ণের উক্তিই বা কেন বহুপত্রব্যাপী বক্তৃতার আকার ধারণ করিয়াছে,—এ সকলের মর্ম্ম বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। প্রাচীন টিকিকে এলবার্ট ফ্যাশনের কাছে পথ ছাড়িয়া দিতে দেখিয়া বিস্মিত হই নাই। যুগের প্রভাব হইতে কবি মুক্ত হইতে পারেন না; যুগের প্রধান ভাব কবি-প্রভাবে উজ্জ্বল হয়। রাম-চরিত্র মাইকেলকে আকর্ষণ করে নাই। তিনি রাক্ষসের বীরপণায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন; অযোধ্যার সৌধমালা তাঁহার চক্ষে তত প্রভাবিত মনে হয় নাই;—স্বর্ণসৌধকিরীটিনী লঙ্কা তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই

যুগে বিলাতের সাহিত্য তির্য্যক আলোপাত করিয়া আমাদিগকে এমন একটি স্থল দেখাইয়াছিল, যাহা অতীতকালে আমরা দেখি নাই। মন্দিরের চূড়ায় আলো অস্তমিত হইয়াছিল; উহা মিউজিয়মের উপর উদিত হইয়াছিল, এবং ঐতিহাসিক অধ্যায় উজ্জ্বল করিয়াছিল। সত্ত্ব গুণের কোমল প্রভা হইতে রজোগুণের খর রশ্মি চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়াছিল।

আজ এ সকল বিচারের প্রয়োজন নাই। আমি এই দুই দিনের মধ্যে নবীন বাবুর স্বীয় জীবন-চরিত প্রথম খণ্ড সমস্ত পাঠ করিয়াছি। এই পুস্তকখানিতে তাঁহার সময়ের সামাজিক ইতিহাস আলোচিত্রের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এমন সরল কবিত্বপূর্ণ ভাষায় মনের সমস্ত কথা বলা সাধারণ শক্তির পরিচায়ক নহে। এই পুস্তক সাহিত্যিক বিবিধ গুণের সমাবেশে উপাদেয় হইয়াছে। কিন্তু তাহাই ইহার প্রধান আকর্ষণ নহে। ইহা একখানি অপূর্ব্ব ধর্ম্মকথা। পিতৃভক্তির এরূপ নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে আর নাই। এই ভক্তির কথা নানা বিচিত্র প্রসঙ্গে, কখনও অশ্রুরুদ্ধ ভাষায়, কখনও বীণাধ্বনির সকরুণ ঝঙ্কারে, কখনও গদ্‌গদ স্বরে, কখনও মুক্তকণ্ঠে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা পড়িয়া বুঝিলাম, যে দেশে রামের মত পুত্র হইয়াছিল, নবীন সেই দেশেরই বালক। এখানে নবীন বাবু জ্ঞানের উচ্চ রৈবতক শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করেন নাই; এখানে তাঁহার ধূলিধূসরিত অশ্রু-অভিষিক্ত বালকের বেশ। এই বেশ বাঙ্গালীর ছেলের আপন বেশ; গার্হস্থ্য চিত্রের এই মাধুর্য্য আমাদের মন মুগ্ধ না করিয়া যায় না। বাল্যকালে একটি কবিতা লিখিয়া তিনি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন; তৎপ্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "আমি কবিতাটি কাড়িয়া নিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া গবাক্ষপথে নিক্ষেপ করিলাম। আমার সমস্ত কবিতা সে পথে প্রেরণ করিতে পারিলে, এত ঈর্ষ্যা, এত শত্রুতা, এত দুর্গতি ভোগ করিতে হইত না।" ইহা পড়িয়া বুঝিলাম, নবীন বাবু মথুরার রাজবেশ চান না; বৃন্দাবন-লীলাই তাঁহার প্রিয়। বুঝিলাম যে, তিনি প্রকৃত কবি; এ জন্য শেফালিকা তরুর ন্যায় অজস্র কবিতাকুসুম উৎপাদন করিয়া তাহা নিমেষে গাত্র হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া মুক্ত হইতে পারেন। কবি স্বীয় কাব্য অপেক্ষা বড়।

এই জীবনবৃত্তপাঠে আরও জানা গেল, হেম বাবুর 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে—' শুধু বাঙ্গালা কাব্যে ইংরাজি নিরাশ প্রেমের নকল নহে। এই 'নকল' শিক্ষিত সম্প্রদায় বাঙ্গালার ঘরে অভিনয় করিতেন; বিবাহিতা

বিদ্যুতের মুখে নবীন বাবু যে কথার আরোপ করিয়ছেন, তাহা পড়িয়া মনে হয়, ঘরের তুলসীর চারা তুলিয়া ফেলিয়া তিনি বিলাতী আইভি লতা রোপণ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জীবনচরিত নানা পবিত্র কথায় সরস। ইহাতে পশ্চিম সাগরের নোনা ঢেউয়ের কয়েকটা ছিটা ফোঁটা না পড়িলেই যেন ভাল হইত।

চট্টলের প্রিয় কবি প্রকৃতই আমাদের প্রিয়তম। আজ তাঁহার দ্বারা আমরা চট্টগ্রামকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। চট্টগ্রামের ভাষা যেরূপই হউক না কেন, চট্টগ্রাম এখন বঙ্গদেশকে, এবং বঙ্গদেশ এখন চট্টগ্রামকে আর ছাড়িতে পারিবে না। কবি নীল-সিন্ধু-ধৌত সেই স্থান হইতে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, যে স্থান হইতে একদা বঙ্গীয় পোত জাবা, সুমিত্রা প্রভৃতি দ্বীপ-পুঞ্জে গমন করিয়াছিল,—যে দেশের পোত বিশ্ববিশ্রুত বরবোদব মন্দিরের শিল্পীদিগকে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল,—এবং জাবার রাজমহিষী চন্দ্রকিরণার প্রেমবার্ত্তা পিতৃগৃহে আনয়ন করিয়াছিল। সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বঙ্গের গৌরব-স্থল চট্টগ্রাম যে আমাদের এই দেশের বিশেষ সম্মানিত একাংশ, আজ আবার নবীন বাবু সেই পরিচয় ঘনীভূত করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের যে মধুর আলেখ্য আঁকিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গদেশের সেই প্রাচীন রমণীয় তীর্থের প্রতি শিক্ষিতমণ্ডলীর দৃষ্টি পড়িয়াছে। দুঃখের বিষয়, আসাম হইতে নবীন বাবুর ন্যায় মনস্বী আমরা পাই নাই; তাহা হইলে, সেই দেশের ভাষা আজ বাঙ্গলা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যাইত না। আজ নবীনচন্দ্র চট্টল ত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু চট্টলকে তিনি যে সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন,—তাহা চন্দ্রশেখর পর্ব্বতের শিখরস্থ আলোকশিখার ন্যায় বাঙ্গালীর চক্ষে বহুযুগ দীপ্যমান থাকিবে। তাঁহার স্থলে চট্টল হইতে আজ কবি নবীনচন্দ্র দাস ও তদগ্রজ লামা শরচ্চন্দ্র বঙ্গের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। এই শোকের মুহূর্ত্তে, চট্টলের স্বনামধন্য ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি স্বভাবতঃই আমাদের সমধিক আদর-দৃষ্টি পড়িতেছে। *

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

---

* গত ২০শে মাঘ মঙ্গলবার ষ্টার থিয়েটারে নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত।

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা।

—:০:—

কাব্য ও বিজ্ঞানে অনেক অঙ্গে প্রভেদ আছে। গদ্যেই হউক, বা পদ্যেই হউক, কাব্য রসাত্মক বাক্য। "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং।" সুরুচির বিকাশ, সৌন্দর্য্যের পরিচয়, মানব-হৃদয়ে রসের উচ্ছ্বাস, কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সময়বিশেষে, অবস্থাবিশেষে, মানব-চরিত্রের, প্রকৃতির ও পরিবর্ত্তনের বর্ণনাও মহাকাব্য ও নাটকাদির বিষয়ীভূত। কিন্তু, বাক্যে রসাত্মকত্ব অনেক পরিমাণে শব্দ-ব্যবহারে ও ভাষা-পারিপাট্যের উপর নির্ভর করে, কেবল ভাবের উপর নির্ভর করে না। পদলালিত্য ও অর্থগৌরব ও সময়ে সময়ে উপমা কাব্যের আধার। প্রবাদ আছে যে, একদা রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্নসভার সভ্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে একটি পত্রশূন্য শুষ্কশাখ বৃক্ষ দেখিয়া-বররুচিকে তাহার বর্ণনা করিতে বলেন। বররুচি বলিলেন, "শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে।" বাক্যটি রসাত্মক হইল না, এবং বৃক্ষের বর্ণনাও রাজার মনোনীত হইল না। তিনি কালিদাসকে বৃক্ষের বর্ণনা করিতে বলিলেন। ভারতীর বরপুত্র অদ্বিতীয় কবি কালিদাস বলিলেন, "নীরসতরুবরঃ পুরতো ভাতি।" সরস শব্দের প্রয়োগে ও যোজনায় শুষ্ক তরুও সরসভাবে মনকে আকৃষ্ট করিল; রাজাও সন্তুষ্ট হইলেন। "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" পৃথিবীর সমস্ত নাটকের অগ্রণী। কিন্তু অন্য ভাষায় তাহার সমস্ত মধুরত্ব থাকে না; পদলালিত্য সামান্যই থাকে। মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণ অনুবাদে তত ভাল শুনায় না। হোমারের ২।৩ খানি ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়াছি, এবং গ্রীক ভাষায় হোমার পড়িতে শুনিয়াছি, উভয়ের প্রভেদ সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ভবভূতিও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "সীতার বনবাসে" ততটা ভাল লাগে না। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপিয়ারকে অনেক প্রসিদ্ধ লেখকই সমগ্র ভূমণ্ডলের কবি বলিয়াছেন; বস্তুতঃ তাঁহার মানব-চরিত্র-বর্ণনা অদ্বিতীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু, সেক্সপিয়ারের মূল নাটক সকল পড়িয়াছি, এবং বঙ্গভাষায় কতকগুলির অনুবাদও পড়িয়াছি। অনুবাদে কবির কবিত্বের সম্পূর্ণতা দেখিতে পাই না; অথচ অনুবাদকদিগের কবিত্বের অভাব ছিল না। ফলকথা এই যে, কবি যে দেশে ও যে ভাষায় লেখেন, সে দেশে ও সেই ভাষাতেই তাঁহার কবিত্বের পরিপুষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে দেশের,

কবি সেই দেশবাসীদিগেরই, সেই দেশের ভাষাবিদ্‌দিগেরই তিনি কবি; তিনি তাঁহাদের জন্যই সুমধুর রসস্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন; অপর দেশের লোকদিগকে আপ্লুত করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। কবিগুরু বাল্মীকি, অনন্তরত্নপ্রভব ব্যাস, সুমধুর কালিদাস, অর্থগৌরবান্বিত ভারবি, গুণরাশি সমুজ্জ্বল মাঘ, নৈষধচরিত-লেখক শ্রীহর্ষ, কাদম্বরী-প্রণেতা বাণ প্রভৃতি কাব্যরচয়িতৃগণ সংস্কৃতজ্ঞ আর্য্যগণকে বিমোহিত করিবার জন্যই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদিগকে কাব্যরসে আপ্লুত করিবার জন্যই রসকুম্ভ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা হয় ত একবারও মনে করেন নাই যে, পাশ্চাত্য অনার্য্য জাতিসমূহ সভ্যতাপদে আরোহণ করিয়া সংস্কৃত কাব্যরস আস্বাদন করিবে; তাঁহাদিগের কাব্য অনার্য্য ভাষায় অনূদিত হইতে আরম্ভ হইবে। কালিদাস কখনই মনে করেন নাই যে, "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্" অধিকাংশ ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদিত হইবে, এবং সমস্ত সভ্য জগৎই তাঁহাকে কাব্য-সংসারে উচ্চাসন প্রদান করিবে। গেটহে (Goethe) ও শিলার (Schiller) আমাদের জন্য নিজ নিজ কবিত্বশক্তির পরিচয় দেন নাই। জার্ম্মাণ কাব্য ও নাটক রচনা করিয়া যশস্বী হন। প্রকৃতপ্রস্তাবে যিনি যে দেশের কবি, তিনি সেই দেশেরই নিজস্ব, বলিতে পারা যায়।

কিন্তু বিজ্ঞানের কথা পৃথক। বিজ্ঞান কোনও এক দেশের নিজস্ব নহে; বিজ্ঞানবিদ্‌ সমস্ত জগতের জন্য জ্ঞানালোচনা করেন; সমস্ত জগতের জন্য নৈসর্গিক নিয়মের আবিষ্কার করিবার জন্য যত্ন করেন। তাঁহার জাতিভেদ নাই, দেশভেদ নাই।

তাঁহার গ্রন্থ সমস্ত জগতের ধন। ভাষান্তরিত হইলে তাঁহার ভাবের পার্থক্য হয় না; তাঁহার আবিষ্কারের মূল্যের কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। নিউটনের প্রিন্সিপিয়া সকল ভাষায়ই সমান আদরের; গ্যালেলিও ও লাপ্লাস সর্ব্বত্র সমান পূজিত। হাক্সলী কি ইংরাজীতে, কি ফরাসীতে, কি বাঙ্গালা ভাষায়, কি জাপানী ভাষায়, সর্ব্বত্রই এক দরের। ভাষাভেদে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের কোনও ক্ষতি হয় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ভাষান্তরিত হইলে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার, বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিবর্ত্তন আবশ্যক কি না? কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্থির করিবার জন্য যত্নবান হইয়া সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। মতভেদের অনেক কারণ ছিল, এবং আমার ক্ষুদ্র

বিবেচনায় তখন পরিভাষা স্থিরীকরণের বেশ সহজ উপায়ও অবলম্বিত হয় নাই। বিজ্ঞানে ও বিজ্ঞান-পরিভাষায় যে সজাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ বিকাশ হইতে পারে না, তাহা তখন বিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় নাই। যাহা সমস্ত জগতের, তাহাতে একজাতীয়ত্বের আরোপ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক; বিজ্ঞান সজাতীয়ত্বের (Nationalism) সঙ্কীর্ণ রেখান্তরালে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না; তজ্জন্য চেষ্টাই অকর্ত্তব্য। এরূপ চেষ্টায় বিফলতাই খুব সম্ভবপর। আমার বিবেচনায় অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক শব্দ সকল ভাষায়ই এক হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে বিজ্ঞানপাঠ সহজ হয়। অনুবাদে লাভ নাই। পুরাকালে ভারতবর্ষে গণিত শাস্ত্রের ও বিজ্ঞানের বিলক্ষণ চর্চ্চা ছিল। যে সময়ে ইউরোপ অন্ধকারাবৃত ছিল, যখন আরবের খলিফাগণ বিদ্যালোচনার জ্যোতি বিকাশ করিতে পারেন নাই, তখনও ভারতবর্ষে সুধীগণ গণিত, জ্যামিতি প্রভৃতি অঙ্কশাস্ত্রের ও পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের যথাসম্ভব আলোচনা করিতেছিলেন। শারীরবিদ্যা, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েরই গ্রন্থ এখনও বিদ্যমান আছে। সুতরাং অনেক বৈজ্ঞানিক শব্দ ভারতবর্ষে পুরাকাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্রের দুই শত বৎসরের মধ্যে সমধিক উন্নতি হইয়াছে। ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেক নিয়মের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য আবিষ্কার হইয়াছে। জগতের বিজ্ঞানের সীমা বিলক্ষণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং সেই পরিবর্দ্ধনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাবপ্রকাশের জন্য নৈসর্গিক নিয়মসমূহ বুঝাইবার জন্য অনেক নূতন শব্দের প্রণয়ন হইয়াছে। সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে তৎকালের বিজ্ঞানের প্রয়োজনার্থ সে সকল শব্দের প্রয়োজন ছিল না; ইউরোপীয় ভাষাসমূহের নূতন শব্দ-সৃষ্টির আকর গ্রীক ও লাটিন। যে সকল শব্দের অধুনা প্রণয়ন হইয়াছে, তাহা প্রায়ই গ্রীক ও লাটিন ধাতু মূলক। গ্রীক ও লাটিন, ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহের আকর সংস্কৃত হইতে প্রকৃতি ও উচ্চারণে অনেকটা বিভিন্ন। গ্রীক ও লাটিন ধাতুমূলক শব্দ আমাদের পক্ষে অনেকটা অসুবিধাজনক, সন্দেহ নাই; কিন্তু ক্রমশঃ অভ্যাসে অনেক কষ্টই বহন করা যায়। আর দেখিতে হইবে, কোন্‌টি বেশী অসুবিধাজনক। ভারতবর্ষে যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে, তাহা ব্যবহার করা আমাদের অবশ্যই কর্ত্তব্য। যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ বাঙ্গালা দেশে চলিত আছে, তাহাদের গুণ ও ব্যাপ্তি বাচনে (Connotation, Denotation) বিশেষ দোষ না থাকিলে

প্রথমতঃ তাহাই আমাদের ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তেরিজ ও জমাখরচের পরিবর্ত্তে Addition বা Subtraction শব্দের ব্যবহার হাস্যজনক হইবে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের স্থানে Aurum বা Argentinum ব্যবহার করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই। বৃহস্পতি বা শনির স্থলে Jupiter বা Saturn ব্যবহার করা অকর্ত্তব্য। Arich, Taurus, Jemini, Cancer প্রভৃতি ইউরোপীয় শব্দকে বাঙ্গালা ভাষায় মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট প্রভৃতি দ্বাদশ রাশির স্থান গ্রহণ করিতে দেওয়া যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে ব্যবহারোপযোগী বৈজ্ঞানিক শব্দের সংকলনে আমাদের চিরব্যবহৃত শব্দের সংকলন প্রথম আবশ্যক। ১৮৭৪।৭৫ খৃষ্টাব্দে আমি ও আমার পরমাত্মীয় স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দকৃষ্ণ বসু ভারতবর্ষে চিরব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দের সংকলন করিতেছিলাম। বৈজ্ঞানিককোষ প্রণয়ন করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। ঐ কার্য্যে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলাম। আনন্দবাবু খুব পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আইন ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হওয়ায় আমাদের উদ্দেশ্যসাধনে যত্নের শৈথিল্য হয়। আনন্দ বাবুও পীড়িত হন। আমাদের যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা আনন্দ বাবুর নিকটেই ছিল; তাঁহার মৃত্যুর পর আমি আর তাহা পাই নাই। এখনও তাহা পাওয়া যাইতে পারে। তাহার পর অনেকেই এ ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষৎ হইতেও যত্ন হইয়াছে। অধুনা Central Text Book Committeeও উদ্যোগক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বৈজ্ঞানিক শব্দ আমাদের পুরাতন সুধীগণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন, তাহারও চয়ন আবশ্যক। বিশেষ কোনও দোষ না থাকিলে, গুণ ও ব্যাপ্তি নির্ব্বাচনে মোটামুটি সামঞ্জস্য থাকিলে, আমাদের সে সকল শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। আমরা আমাদের নিজের জিনিস ছাড়িতে সম্মত হইতে পারি না। আমি ও আনন্দ বাবু এই শ্রেণীর শব্দ কতকটা চয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু বোধ হয় সে পরিশ্রম বিফল হইয়াছে। আশা করি, সাহিত্য-পরিষৎ সেই সংকলনের আয়োজন করিবেন। ভারতবর্ষীয় ঋষি বা ঋষিকল্প মহাত্মাদিগের ব্যবহৃত শব্দ, যত দূর সম্ভব, বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় বৈজ্ঞানিকগণের গ্রহণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

তৃতীয়তঃ, দেখিতে হইবে, কি কি বৈজ্ঞানিক শব্দ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে। পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর-

বিজ্ঞান বিষয়ক শব্দ বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় ভাষাসমূহে রচিত অনেক পুস্তকেই অনুদিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শব্দ এরূপ সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহাদের গ্রহণ অপরিহার্য্য। অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ সেই শ্রেণীর কথা। বৈজ্ঞানিক শব্দসমষ্টির ভিতর এরূপ শব্দ গ্রহণ করিলেও ক্ষতি নাই ; তবে আবশ্যকতাও বেশী নাই। অনেকেই অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ কথার পরিবর্ত্তে Microscope ও Telescope শব্দ ব্যবহার করেন। এরূপ বিষয়ে চলিত ব্যবহারের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। অনুদিত শব্দমাত্রই অব্যবহার্য্য হওয়া উচিত নহে। আবার অনুদিত শব্দ চলিত হইলেও ব্যবহার্য্য নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। অম্লজান শব্দ Oxygen-এর প্রতিবাক্য। কিন্তু বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়াছেন যে, Oxygen শব্দ (Connotative) গুণবাচক নহে। Oxygen শব্দ খুব ব্যবহৃত হইয়াছে ; অম্লজান প্রায়ই পুস্তকে আছে মাত্র। তবে ভ্রমমূলক অনুবাদের আর প্রয়োজন কি ? দাম্লজনক কথাটি গুণবাচকও নহে, শ্রুতিমধুরও নহে। Dionide বলিলে ক্ষতি কি ? Logarithm-এর পরিবর্ত্তে "লাগনিষ্পত্তিক" না বলিলেই ভাল।

অবশেষে দেখা যাউক, যে সকল কথা নূতন, যার প্রতিবাক্য এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয় নাই, তাহাদের কি ? আমার সামান্য বিবেচনায় সে সকল শব্দ যেমন আছে, তেমনই গ্রহণ করা উচিত। প্রতিবাক্যের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। প্রতিবাক্য প্রস্তুত করা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। সহজও নয়। অনর্থক শক্তির অপব্যয় ও সময় নষ্ট করিয়া ফল কি ? বর্ত্তমান সময়ে বিজ্ঞানে, বিশেষতঃ রসায়নে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ যে সকল নূতন নূতন শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদের অধিকাংশই গ্রীক্ লাটিন ধাতুমূলক শব্দ। কতক কতক আরবী ও সংস্কৃত ধাতুসাধ্য। একটু একটু শ্রুতিকঠোর হইলেও তাহা ভারতবর্ষীয় ভাষায় ব্যবহারে দোষ দেখা যায় না। বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহের অনায়াস-পাঠের জন্য ইউরোপীয় শব্দের যথাযথ গ্রহণ কর্ত্তব্য। আজ অম্লজান শিখিয়া কাল ইংরাজী পুস্তকে Oxygen পড়ায় সার্থকতাই বা কি ? তবে যৎসামান্য পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইতে পারে। অভ্যাসে ক্রমশঃ বিদেশীয় শব্দের শ্রুতিকঠোরত্ব যাইবে। আগে আমরা কালেজ বলিতাম। এখন স্ত্রীলোকেরাও College বলে। School কথাও চলিয়াছে। সেইরূপ, অনেক বৈজ্ঞানিক

কথাই সহজেই চলিবে। আমি mucous fermentationএর পরিবর্ত্তে শ্লৈষ্মিক গাঁজন কথা ব্যবহার করিতে আদৌ প্রস্তুত নহি। গ্রীক ও লাটিন মূলক ইউরোপীয় ও আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদিগের প্রণীত শব্দ ভারতবর্ষীয় ভাষা-সমূহের অন্তর্ভুক্ত হইলে কোনও ক্ষতির সম্ভাবনা দেখি না। তাহাতে স্বজাতীয়ত্বের হীনতা নাই। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজ্ঞান কোনও জাতির নিজস্ব নহে। বৈজ্ঞানিক নিয়ম যে অবয়বেই পৃথিবীতে প্রকাশিত হউক না কেন, তাহা সকল জাতিরই সম্পত্তি। জাতীয় গৌরবের হ্রাস-বৃদ্ধির সহিত বৈজ্ঞানিক শব্দের, বৈজ্ঞানিক নিয়মের কোনও সংস্রব নাই। যাহাতে বিজ্ঞা শিক্ষা সহজ হয়, যাহাতে অনায়াসে অধিকাংশ লোক বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিতে পারে, তাহাই ভারতবর্ষের অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে, কেবল ইউরোপ বা আমেরিকার সহিত নহে, সমস্ত ভারতবর্ষের একতার পথ প্রশস্ত হইবে। এক লিপি, একপ্রকার শব্দের প্রয়োগ, এক ভাষা,—সকলই একতার মূল। তদ্ব্যতিরিক্ত অনেক শব্দ আছে, যাহার প্রতিবাক্যের সৃষ্টি প্রায়ই অসম্ভব। বিশেষতঃ, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানে Genus বা order শব্দের অনুবাদ করা, বা সংস্কৃত-ধাতুমূলক প্রতিবাক্যের রচনা করা অত্যন্ত দুরূহ হইবে। *

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

দুর্দ্দিনে।

অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন শ্রাবণ-নিশীথে
তরঙ্গিত সিন্ধু সম আমার হৃদয়;
দুঃখ-জর্জ্জরিত এই আকুল পৃথ্বীতে
কোথা শান্তি, কোথা মোর বিশ্রাম-নিলয়!
তুমি কোথা হে দুর্লভ! হে বিশ্বের স্বামী!
চরণ-পল্লব তব স্পর্শিতে যে চাহি।
তোমার মহিম-জ্যোতি স্বর্গ হ'তে নামি'
না আসিলে রজনীর অবসান নাহি।
সুনিবিড় শান্তি আসে ঝটিকার পরে,
দগ্ধ ধরণীর দেহে স্নিগ্ধ বারি-ধারা;—
সেই মত এসো তুমি হে মহা-সুন্দর!
সার্থক কর গো মোর প্রাণ পুণ্যহারা;
এই ঝঞ্ঝা, এ দাহন, ঘন অন্ধকার
তোমার করুণা বিনা নহে ঘুচিবার।

মন্মথনাথ সেন।

* বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান।

——:০:——

ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের রাজি,

এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি?—শ্রীমধুসূদন।

শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সাহিত্য-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন, তখন আমি যুগপৎ বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত হইলাম। প্রথমতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকানা ভুলিয়া হয় ত তাঁহারা আমার নিকট আসিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লজ্জা হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথা সংযোগ করিতে হইলে আমার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনারা একবার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সে আসন গ্রহণ করা আমার ধৃষ্টতা ও বাতুলতা মাত্র। তার পর আমি এক প্রকার চিররুগ্ন। দূর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করা আমার শক্তি ও সামর্থ্যের অতীত। এই সকল কারণ প্রদর্শন করিয়া আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধর বাবু যখন পরদিন সাহিত্য-পরিষদের দুই প্রধান স্তম্ভস্বরূপ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ মশককে ধৃত করিবার জন্য জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম। আমি এক প্রকার বন্দিভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত। এই গুরুভার আমার স্কন্ধে চাপাইয়া আপনারা কত দূর সফলতা লাভ করিবেন জানি না, তবে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন" এই শাস্ত্রোক্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়া আজ সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করিতেছি।

স্থানীয় কমিটীর নির্দ্দেশ অনুসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

জাতীয় সাহিত্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক। যে কোনও দেশের কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের সাহিত্য নিবিষ্টভাবে পর্য্যালোচনা করিলে, সে দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ

করা যায়। কারণ, সাহিত্য জাতীয় চরিত্র ও প্রবৃত্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র। যেমন চিত্রকর নীরব ভাষায় চিত্রিত বিষয়ে কেমন এক প্রকার সজীবতা প্রদান করেন, যদ্দ্বারা আলেখ্যবিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি করা যায়, তেমনি সাহিত্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের সূচনা হইতেই তাহাতে ধর্ম্মপ্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মানিকচাঁদ ও গোবিন্দচন্দ্রের গীতাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত কেবল এই একই সুর। এই ভাবের চরম বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে। প্রেমের জয়, নামে রুচি যে সাহিত্যের মূলমন্ত্র, সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন-স্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব—ধর্ম্মপ্রবণতা। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আমরা আজ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের বীণা-নিক্কণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও স্বদেশকে গৌরবান্বিত মনে করি। চণ্ডীদাস তাঁহার প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার পদাবলী সম্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব। ইহার আদ্যোপান্ত "নিকষিত হেম"।

এই ধর্ম্মসাহিত্যের স্রোত মাণিকচাঁদের সময় অর্থাৎ খৃঃ একাদশ শতাব্দী হইতে প্রবাহিত হইয়া,বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টিসাধন ও কলেবর-বৃদ্ধি করিয়াছে। সেই স্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে। এমন কি, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের গুরুস্থানীয় (inspirer) জয়দেবের সময় হইতে কৃষ্ণকমল গোস্বামীর সময় পর্য্যন্ত—এই সাত শত বৎসর—একই প্রসঙ্গ চলিতেছে। গীত-গোবিন্দে যে তরঙ্গ আলোড়িত, "রাই উন্মাদিনীতে"ও তাহারই সংঘাত দেখি। এমন কি, ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী গ্রন্থকারেরাও এই সংক্রামকতা এড়াইতে পারেন নাই। পদাবলী সাহিত্যের ভণিতায় ৭৪।৭৫ জন মুসলমান কবিরও নাম পাওয়া যায়। গত কয় বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় যত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মবিষয়ক।

বাঙ্গালা সাহিত্যে কোন্ সময়ে গদ্যের প্রথম আবির্ভাব হয়, তাহার আলোচনা করিবার আমাদের সময় নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে যে, গদ্য সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজ স্থাপন সময় হইতে, বঙ্গ সাহিত্য নবযুগে পদার্পণ করিয়াছে। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামরাম বসু, রামমোহন রায় প্রভৃতি মাহাত্মগণ এই যুগের প্রবর্ত্তক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজ-প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতিহাস সবিস্তারে বিবৃত করিয়া, নিম্নলিখিত কথা কয়টি বলিয়া তাঁহার সারবান গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন,—

"ইংরেজ-আগমনের সঙ্গে সামাজিক জীবনে ও রাজনৈতিক জীবনে, নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সমস্ত জাতি অভ্যুত্থান করিয়াছে। সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গদ্য সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। বাঙ্গালী এখন বাঙ্গালা ভাষাকে মান্য করিতে শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেমন সমুদ্রতীরে খেলা করিতে করিতে একান্তমনে গভীর উর্ম্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসঙ্গে ব্যাপৃত থাকিয়া আমিও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের অদূরবর্ত্তী উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত হইয়াছি। অর্দ্ধ শতাব্দীতে বঙ্গীয় গদ্য যেরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশা অঙ্কুরিত না হয়!"

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসামান্য প্রতিভা-প্রভাবে তাহার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যকে অনেকে বিদ্যাসাগরীয় যুগের সাহিত্য এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাহিত্যের শব্দবিন্যাস বর্ত্তমান হইতে অনেকটা বিভিন্ন। তাঁহার বেতালপঞ্চবিংশতি সংস্কৃত সমাসবদ্ধ পদে পরিপূর্ণ। এক পংক্তি রচনার মধ্যে ২।৪ টি দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান পাঠকদিগের নিকট কিরূপ সুখপাঠ্য হইবে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। Fort William College এর পাঠ্যপুস্তক "প্রবোধচন্দ্রিকা" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। "কোকিলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ-কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে" ইহাই তখনকার আদর্শ ভাষা ছিল। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র "আলালের ঘরের দুলালে"র মুখবন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ-যোগ্য। অধ্যাপকেরা ঘিকে "আজ্য" বলিতেন, কদাচ 'ঘৃতে' নামিতেন। খইকে "লাজ", চিনিকে "শর্করা" ইত্যাদি শব্দে অবিহিত করিয়া ভাষার সৌষ্ঠব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক, নূতন বন্যায় সে ঢেউ চলিয়া গেল। বসন্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে যেমন এক দিকে বিরহের উচ্ছ্বাস-গীতিকা গাহিতে লাগিল, আবার 'আনন্দমঠে' স্বদেশপ্রেমিকতার ভৈরবনিনাদ, অপর দিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, যোগ, অনুশীলন, সুখ, দুঃখ,

ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই অলোকসামান্য প্রতিভায় উদ্ভাসিত হইয়া আজ বাঙ্গলা সাহিত্য সমগ্র ভারতসাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অক্ষয়কুমার, দীনবন্ধু, কালীপ্রসন্ন, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সেচন করিয়া উর্ব্বরতা সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, শ্রীমধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও আজ আমাদের সম্মুখে একটি ভীষণ বিপদ উপস্থিত। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে মাত্র, সাহিত্যের উপন্যাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে, ইহাও সত্য বটে, কিন্তু একটিমাত্র কারণে ভাষার সার্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙ্গের চালনা হয়, সেই অঙ্গ দৃঢ় ও সবল হইতে থাকে ; আবার যে অঙ্গের চালনা হয় না, তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্ষীণতর হইয়া পরে একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদিগের সাহিত্যে বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকের একান্তই অভাব।

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানের জন্য ঋষিরা ব্যস্ত থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লুপ্ত হইল। চৌষট্টি কলার অন্তর্ভুক্ত যিনি যত বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিতসমাজে তত জ্ঞানবান বলিয়া আদৃত হইতেন। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, ধাতুবাদ (Chemistry and Metallurgy) ঐ সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়া ও বাছিয়া লইবার জন্য উদ্ভিদ্-বিদ্যালাভের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং সুশ্রুতে শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্যা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের মধ্যে শল্যতন্ত্র (Surgery) একটি প্রধান অঙ্গ। সুশ্রুতে যে ক্ষারপাকবিধি বর্ণিত আছে, তাহা নব্য রসায়ন শাস্ত্রের এক অধ্যায় বলিয়া অবিকৃতভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু হায় ! যে ভারতের পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বর্ত্তমান জগতের আদর্শ, যাঁহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্যজগতের সাহিত্যমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বনভবনে উচ্চারিত ও গীত হইয়া ভারতে ধর্ম্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাযমুনা আবহমানকাল হইতে কুলুকুলুনিনাদে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ করিয়া, আজও হিন্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর-সঙ্গমে

ধাইতেছে, সেই ভারতের, সেই পুণ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্তের জ্ঞানরবি, দুর্ভাগ্য বংশধর, আমাদিগের দোষে অস্তমিত হইল! সত্যই কবি গাহিয়াছেন :—

"অবসাদহিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে.........

তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

অনুসন্ধিৎসা তিরোহিত হইল, ঔষধ-সংগ্রহের জন্য উদ্ভিদ-পরিচয়ের ভার বেদিয়া জাতির উপর সমর্পিত হইল। অস্ত্রচালনার দুঃসাধ্য ভার নরসুন্দরের উপর ন্যস্ত হইল। যাহা হউক, অতীতের আলোচনা ও অনুশোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আর প্রয়োজন নাই। এখন সময় আসিয়াছে।

গত কয় বৎসর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীভুক্ত। দুই একখানিমাত্র সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপখণ্ডে ও আসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই; বাঙ্গালা সাময়িক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় পদার্থবিদ্যাবিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল "বিবিধার্থসংগ্রহে" ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে বিজ্ঞানের যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে, তজ্জন্য এই দুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঋণী থাকিব। ইঁহাদের কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় Lord Hardingeএর আনুকূল্যে Encyclopœdia Bengalensis অথবা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" আখ্যা দিয়া কয়েক খণ্ড পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত হইত। রাজেন্দ্রলাল ও কৃষ্ণমোহন, উভয়েই অশেষশাস্ত্রবিৎ ও নানাভাষাভিজ্ঞ ছিলেন; যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষয়কুমারের রচনার ন্যায় স্থায়ী প্রচলিত সাহিত্যের (Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়া চিরকাল মান্য হইবেন। কিন্তু ইঁহাদের পূর্ব্বেও বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরের মিশনারীগণকে বর্ত্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাঁহারাই আবার বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-প্রচারেরও প্রথম প্রবর্ত্তক। আমাদের জাতীয় অভিমানে আঘাত প্রাপ্ত হয় বলিয়া এ কথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, কিংবা 'খৃষ্টানী বাঙ্গালা' বলিয়া তাঁহাদের কৃত কার্য্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক ন্যায়ের ও সত্যের তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া যাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন।

১৮২৫ খৃঃ অঃ উইলিয়ম ইয়েটস্ প্রথমে "পদার্থ-বিদ্যাসার" বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থবিদ্যা ভিন্ন মৎস্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য জীবের বর্ণনা আছে। এতদ্ভিন্ন "কিমিয়া-বিদ্যাসার" নামক রসায়নবিদ্যা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ শ্রীরামপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিস্তার সমালোচনা করিয়াছেন। ১৮১৮ খৃঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ 'সমাচার-দর্পণ' নামে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাঁহারাই আবার "দিগ্‌দর্শন" নামক নানাতত্ত্ববিষয়িণী পত্রিকা পরিচালিত করিতেন। এই পত্রিকাতেই বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চ্চার প্রথম সূত্রপাত হয়।

ইহার পর ১৮২৮ খৃঃ "বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি" (Society for translating European Sciences) নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইলসন্ এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন, এবং উক্ত সমিতির চেষ্টায় "বিজ্ঞানসেবধি" নামক গ্রন্থের ১৫ খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ খৃঃ অঃ Vernacular Literary Society নামে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি ও প্রসার এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইলেও, যাহাতে বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা বেথুন ও বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; এতদ্ভিন্ন গবর্মেণ্ট মাসিক ১৫০৲ চাঁদা দিয়া ইহার আনুকূল্য করিতেন। এই সভার উদ্‌যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" প্রকাশ করেন। মহামতি হড্‌সন প্র্যাট্ এই সমিতির স্থাপয়িতাদিগের মধ্যে অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। তিনি উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার স্থুল মর্ম্ম এই :—

"বাঙ্গালার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানাদিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং জাতীয় ভাষায় ইহাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর

করা কর্ত্তব্য। এই নিমিত্ত বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। * * ইহাদের নিমিত্ত সরল সুখপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া পাঠলিপ্সার সৃষ্টি করিতে হইবে। জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত তৃষ্ণা বৃদ্ধি করিতে হইবে, নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্রন্থ প্রচার করিতে হইবে। সেই সকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সহজ ও চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ থাকিবে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি লিখিয়া প্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশসূচক গ্রন্থ প্রচারও অতি প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে। এই সকল প্রয়োজনসাধনের নিমিত্ত সহজ ও সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্যক। এই সমিতিকে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।"

বিজ্ঞান-প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশা তাদৃশী ফলবতী হয় নাই। ১৭খানি পুস্তক-প্রকাশের পর সমিতি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, গল্প ও আমোদজনক পুস্তকই এ দেশের পাঠকসাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে, কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা, এই তিন স্থানে তিনটি নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি বাঙ্গালা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবৃত্তি ও মাইনর পরীক্ষার উপযোগী পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মেডিক্যাল স্কুলসমূহের পাঠ্য অস্থিবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, রসায়নবিদ্যাঘটিত অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাঙ্গালা ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ-প্রচারেও যে বাঙ্গালা ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

এখন আলোচনার বিষয় এই যে, অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাঙ্গালা ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফললাভ হইয়াছে কি না? বিজ্ঞানবিষয়ক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট্‌তি আছে, তাহা Text book committeeর নির্ব্বাচিত তালিকাভুক্ত, সুতরাং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ। একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকদিগের গলাধঃকরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রকৃতপ্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২।৩ টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় বিশেষ ফললাভ হয় না।

এই জ্ঞান-স্পৃহার অভাবেই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গীভূত বিদ্যালয়সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসম্পন্ন ব্যুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না; কেন না, ইংরাজিতে একটি কথা আছে, ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই! এক্‌জামিনে পাশই যেখানকার ছাত্র-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বৃথা। সেই সকল মৃতকল্প, স্বাস্থ্যবিহীন যুবকগণের যত্নে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিংবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যবসায়মূলক কার্য্যের সাফল্যসম্পাদনের আশা নিতান্তই সুদূরপরাহত। বস্তুত, একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হস্যোদ্দীপক উন্মত্ততা পৃথিবীর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চিরবিদায়গ্রহণ,—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোনও দেশেই নাই। আমরা এ দেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া আত্মাদরে স্ফীত হই, অপরাপর দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চ্চার কাল আরম্ভ হয়। কারণ, সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথার্থ অনুরাগ আছে; তাঁহারা এ কথা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরস্থ রত্নরাজি দৃষ্টি-গোচর না করিয়াই ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক-পঞ্জিকা পরীক্ষোত্তীর্ণগণের নামে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। এক বৎসর হয় ত উদ্ভিদবিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্. এ. পাশ হইলেন। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এখানেই নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইল; সে সমুদয় যুবককে ২।১ বৎসর পরে আর বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না! পিপাসাশূন্য জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাম। জাপানের জ্ঞান-তৃষ্ণা আর আমাদের যুবকগণের তৃষ্ণা, দুই তুলনা করিলে অবাক্ হইতে হয়। সম্প্রতি "সঞ্জীবনী"তে কোনও বাঙ্গালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল:--

"জাপানীদের জ্ঞানতৃষ্ণা যেরূপ, অন্য কোনও জাতির সেরূপ আছে কি না সন্দেহ। কি ছোট, কি বড়, কি ধনী, কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন বিষয় জানিতে এত দূর আগ্রহ

প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে যে আভাস পাইয়াছিলাম, তাহাতেই মনে করিয়াছিলাম, এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

* * * *

চাকরাণীগুলি পর্য্যন্ত বাগিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই তাহা জানেন না।"

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়া দেখা যাউক। ফরাসী বিপ্লবের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই জ্ঞানপিপাসা কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল, তাহা বক্‌ল্ (Buckle) সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। যখন লাবোয়াসিয়ে, লালাণ্ড, বাঁফো প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও সরস ভাষায় জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রম্য হর্ম্ম্যে ও দরিদ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান-সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত, তাহা শুনিবার জন্য দুই চারি জন বিশেষজ্ঞমাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু এই নূতন বারতা শুনিবার জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ ইতর লোকের সংস্পর্শে আসিলে নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাঁহারাই পদমর্য্যাদা ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্য নগণ্য লোকের সহিত ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া বসিবার একটু স্থান পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু অর্থব্যয়ে যন্ত্রাগার (Laboratory) প্রস্তুত না হইলে বিজ্ঞান শিখা হয় না। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের গ্রামে ও নগরে, উদ্যানে ও বনে, জলে ও স্থলে, প্রান্তরে ও ভগ্নস্তূপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিরিগহ্বরে, অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাসুর যে কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়ান রহিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে? বাঙ্গালার দয়েল, বাঙ্গালার পাপিয়া, বাঙ্গালার ছাতারের জীবনের কথা কে লিখিবে? বাঙ্গালার মশা, বাঙ্গালার সাপ, বাঙ্গালার মাছ, বাংলার কুকুর, ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের জানিবার কিছুই বাকী নাই? এদেশের সোঁদাল, বেল, বাবলা ও শ্যাওড়ার কাহিনী শুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেতাব পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি,—এ সবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না?

রসায়ন, পদার্থবিদ্যাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও ভূতত্ত্ববিদ্যার মৌলিক গবেষণা যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবেও

কতক দূর চলিতে পারে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ছুরি, কাঁচি, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০৲ টাকার অধিক মূল্য লাগে না; কিন্তু গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণ্য পিপাসা কোথায়?

এদেশের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্রকৃতিবিদ্যার্থী যুবকের কথা শুনুন। বিদ্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্য জ্ঞানপিপাসু ইউরোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহের অনুসন্ধানের নিমিত্ত আহার নিদ্রা ভুলিয়া কার্য্য করিতে থাকেন, ভোগলালসা তখন তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞানপিপাসা তাঁহাদের হৃদয়ের একমাত্র আসক্তি। আপনারা অনেকেই জানেন, উদ্ভিদ্‌নিচয় আহরণের জন্য Sir Joseph Hooker ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে কত বিপদ আলিঙ্গন করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের বহু উচ্চদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়াছিলেন; সে সময়ে Darjeeling-Himalayan Railway হয় নাই। কাজেই তখন হিমাচলা-রোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থব্যয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা হইয়াছে; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। পাশ্চাত্য দেশে কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞানপিপাসা! যখন ন্যানসেন (Neansen) ফিরিয়া আসিলেন, সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকা তাঁহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার জন্য ব্যাকুল।

আমাদের [illegible] আলোচ্য বিষয়,—বাঙ্গলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য,—ইহার বর্ত্তমান অবস্থা ও ইহার ভাবী উন্নতিবিধানের উপায়নির্দ্দেশ। তিনটি দেশের সাহিত্যের ইতিহাস এ বিষয়ে আমাদিগের সহায়তা করিবে। কারণ, ইতি-হাসে সদৃশ ঘটনাই ঘটিয়া থাকে। যাহা জর্ম্মাণীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুসিয়া দেশে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে, তাহা বাঙ্গালা দেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অল্প সময়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে জর্ম্মন সাহিত্যের কি দুর্গতি ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে ইহার আদর ও চর্চ্চা বাড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্যালয়ে লাটীন ও গ্রীকই অধীত হইত, এবং রাজসভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি, Frederic the Great মাতৃভাষা ব্যবহার করিতে

লজ্জা বোধ করিতেন। তিনি ফরাসী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বলটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন, এবং তাঁহার নিকট একটু বাহবা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

কিন্তু Fredericএর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই Schiller, Goethe, Kant, Hegel প্রভৃতি এক দিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে Liebig, Wohler প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে, জর্ম্মণ ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া তুলিলেন। [illegible]০ বৎসর পূর্ব্বে রুষিয়ার যে কি দুরবস্থা ছিল, তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মহামতি Buckle ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে সুসভ্য আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনার্য্য জাতির ভাষা আজ আদর্শস্থানীয়। যে ভাষা রুষভল্লুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলষ্টয়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে সমুপস্থিত করিয়াছেন। সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুস রসায়নশাস্ত্রবিৎ Mendeleef স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর পণ্ডিতদিগকে রুস ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিবার প্রকৃষ্ট উপায়।

অধিক কি, এসিয়াখণ্ডে ইহার দৃষ্টান্ত [illegible] ৩০ বৎসর পূর্ব্বে জাপান কি ছিল, আর আজ কি হইয়াছে, তাহা বলা [illegible]প্রয়োজন। যে সমুদয় স্বদেশপ্রেমিক বর্ত্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাঁহারা উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবৃন্দকে প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তৎতৎদেশীয় পণ্ডিতদিগকে জাপানে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। বলা বাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার সাহায্যেই শিক্ষা প্রদান করিতেন, তথাপি শীঘ্রই সে সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর বুঝিল; বুঝিল, বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে না; বুঝিল, মাতৃভাষার সৌষ্ঠবসাধন অবশ্যকর্ত্তব্য।

দেশের দুর্গতি ও দুরবস্থার বিষয় এখন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আলোচনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন যে, যত দিনে এক দিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতসম্প্রদায়, এবং অন্য দিকে কোটী কোটী নরনারী অজ্ঞান অন্ধকারে নিমগ্ন থাকিবে, ততদিন আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার আশা খুব কম। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়া

বিজ্ঞান শিখিতেছেন, তাঁহারা অগাধ জলরাশির মধ্যে শিশিরবিন্দুর ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। মহামতি বকল্ ইংলণ্ড ও জর্ম্মান দেশের শিক্ষাবিস্তারের তুলনা করিতে গিয়া দেখাইয়াছেন যে, জর্ম্মান দেশে সর্ব্ববিদ্যায় অসামান্য প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথচ রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে ইংলণ্ড অপেক্ষা পশ্চাৎপদ। ইহার কারণ এই যে, জর্ম্মনদেশীয় পণ্ডিতগণ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া এমন এক 'পণ্ডিতী' ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন যে, তাহা কেবল সঙ্কীর্ণ 'গণ্ডী'র মধ্যে সীমাবদ্ধ; সে সমস্ত উচ্চভাব সমাজের নিম্নতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইতে পারে না। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, মুষ্টিমেয় শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও জনসাধারণের বোধগম্য অনেক সরল পুস্তক প্রকাশিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে তাহার ভাব ও স্থূল মর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারিয়াছে। এই প্রকার শ্রেণীগত পার্থক্য আমাদের দেশে অত্যধিক প্রবল। আরও একটি কথা;—আমরা এতক্ষণ ইংরাজী-শিক্ষা-প্রাপ্ত ও নীরেট অজ্ঞদলের কথা বলিলাম। ইহার মাঝামাঝি এক দল পড়িয়া রহিলেন। অর্থাৎ, যাঁহারা কেবলমাত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যানে ব্রতী। ইঁহারা কলাপ ও পাণিনি; কালিদাস মাঘ, ও ভারবি; জটিল ন্যায়শাস্ত্র; এতদ্ভিন্ন বেদ ও বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। মোটামুটি বলিতে গেলে তাঁহারা ১৫০০ হইতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের ভারতে বাস করেন। ইঁহাদিগকে আমরা অবশ্য আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করিতে কুণ্ঠিত হই; কিন্তু আবার ইঁহারাই সমাজে 'পণ্ডিত' উপাধিধারী, এবং ইঁহাদের আধিপত্য জনসাধারণের উপর ব্রিটিশশাসন অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ও কঠোর। এই শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। কেহ কেহ বলিবেন যে, ইংরাজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণী লোপ প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গবর্মেণ্ট্ হইতে 'উপাধি'-প্রদানের যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহার 'আদ্য', 'মধ্য' ও 'উপাধি', এই তিন বিভাগে কেবল বঙ্গদেশে প্রতি বৎসর অন্যূন ৪৫০০ পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়া থাকেন। সমগ্র টোলের ছাত্রসংখ্যা ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক। অতএব দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ সকল প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে এমন সহস্র সহস্র ইংরাজী-অনভিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের হাতে পঁহুছিবে, যাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের পক্ষে কদাচ সম্ভব নয়। অবশ্য যাঁহারা বিজ্ঞানচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মৌলিকতত্ত্বের নির্ণয় ও গবেষণায়

সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা ইংরাজী কেন, জর্ম্মণ ও ফরাসী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীও পাঠ করিতে বাধ্য হন।

আমাদের বলার উদ্দেশ্য এই যে, যাঁহারা 'শিক্ষিত' বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের বিজ্ঞানের মূল তাৎপর্য্যগুলি জানা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অর্থাৎ, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিজ্ঞানশাস্ত্রসম্বন্ধীয় সাধারণ বিষয়গুলি মোটামুটি জানা বিশেষ আবশ্যক।

ফল কথা এই যে, আমরা যত দিন স্বাধীনভাবে নূতন নূতন গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়া মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, তত দিন আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘুচিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব হারাইয়া নিঃস্বভাবে কালাতিপাত করেন, অথচ পূর্ব্বপুরুষগণের ঐশ্বর্য্যের দোহাই দিয়া গর্ব্বে স্ফীত হন, আমাদেরও দশা সেইরূপ। লেকি বলেন যে, খৃঃ অঃ দ্বাদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপখণ্ডে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়, প্রায় সেই সময় হইতেই ভারত-গগন তিমিরাচ্ছন্ন হইল। অধ্যাপক বেবর (Weber) যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্করাচার্য্য ভারত-গগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে, আমরা নব্যস্মৃতি ও নব্যন্যায়ের দোহাই দিয়া বাঙ্গালীমস্তিষ্কের প্রখরতার শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু ইহা আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবমবর্ষীয়া বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করিলে তাহার পিতৃ ও মাতৃ-কুলের ঊর্দ্ধতন অধস্তন কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন, ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ বিবিধ জটিল টীকা, টিপ্পনী রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছিলেন, যে সময়ে এখানকার জ্যোতির্ব্বিদবৃন্দ প্রাতে দুই দণ্ড দশ পল গতে নৈঋত কোণে বায়স কা কা রব করিলে সেদিন কিপ্রকার যাইবে, ইত্যাদি বিষয় নির্ণয় পূর্ব্বক কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে সময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ 'তাল পড়িয়া ঢিপ করে কি ঢিপ করিয়া পড়ে' ইত্যাকার তর্কের মীমাংসায় সভাস্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের অন্তরে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা উৎপাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে

গ্যালিলিও, কেপ্লার, নিউটন প্রভৃতি মনস্বিগণ উদিত হইয়া প্রকৃতির নূতন নূতন তত্ত্ব উদ্ঘাটন পূর্ব্বক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি, আজ সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিঃস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। যাহা হউক, বিধাতার কৃপায় হাওয়া ফিরিয়াছে; মরা গাঙ্গে সত্য সত্যই বাণ ডাকিয়াছে; আজ বাঙ্গালী জাতি ও সমগ্র ভারত নূতন উৎসাহে, নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত। যে দিন রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনই ভবিষ্য ভারতের সমৃদ্ধিসোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, সেই দিনই বুঝি বিধাতা ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ দৃষ্টিপাত করিলেন। জগতের ইতিহাস পর্য্যা-লোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল জাতি পুরাতন আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই গোঁড়া, যাঁহারা প্রাচীন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নামে আত্মহারা হন, যাঁহারা বর্ত্তমান জগতের জীবন্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত করা হঠকারিতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বর্ত্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায়; এমন কি, এই সমস্ত জাতি নূতনের প্রবল সংঘর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্ত্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা অত্যল্পকাল হইল আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু আমরা ইহা যেন না ভুলি যে, বর্ত্তমান অবস্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়া বিজ্ঞান ও সাহিত্যের পূর্ণোন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার স্বতঃই মনে হয়, আমাদের এই অধোগতির কারণ,—পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক সময়ে অহেতুকী আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও অগ্রাহ্যের ভাব। এ স্থানে অবশ্য স্বীকার্য্য যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আচার পদ্ধতি ও শিক্ষা অনেক সময়ে বর্ত্তমান সভ্য-জাতিগণের আচার পদ্ধতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল, এবং সে সমুদায়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢ়তার লক্ষণ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে অনেক বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে—যেমন বাহ্যিক জগতে, তেমনই মানসিক রাজ্যে। এ স্থানে প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে কাহারও মনে অপ্রীতি সঞ্চার করিয়া ফেলি; কিন্তু যদি স্বাধীনচিন্তা মানবমাত্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে, পরকীয় শিক্ষা ও

জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই ; যদি থাকিত, তাহা হইলে অন্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা আমাদের অনুকরণীয় হইত। এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সংমিশ্রণের উপরেই, আমার মতে, ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে। যে জাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বে ঘোরতমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব (ঐতিহাসিক হিসাবে) সন্দেহের বিষয় ছিল, সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজিত করিয়া আজ কি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া আসিয়ার পূর্ব্ব প্রান্তে বিরাজ করিতেছে।

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পার্থিব জগতেও ততোধিক। নূতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে ; নচেৎ ভয় হয়, ভারত-ভাগ্যরবি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অস্তমিত হইবে।

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। জাপানীরা জর্ম্মনি ও রুষিয়ার ন্যায় যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মাতৃভাষায় প্রচার করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা মধ্য-পথ অবলম্বন করিয়াছেন ; অর্থাৎ, মৌলিক গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জর্ম্মাণ ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতত্ত্ব প্রচারিত হইতে পারে, তজ্জন্য মাতৃভাষা অবলম্বন করিয়াছেন। ইয়োরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য থাকিলেও, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই ; সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই পরিভাষা হইলে কত দূর সুবিধা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা এই সুবিধাটুকু হৃদয়ঙ্গম করিয়াই মধ্য-পথ অবলম্বন করিয়াছেন। আমাদেরও তাহাই অবলম্বনীয় ; কেন না, উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার বিশেষ সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সৃষ্টি সাহিত্য-সম্মিলনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয়, কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য-পরিষৎ এ বিষয়ে যত্নবান হইয়াছেন, এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি মহোদয়গণ তজ্জন্য পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদানন্দ রায় সাময়িক পত্রিকায় যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, তাহাতেও এ বিষয়ে সহায়তা হইতেছে। নাগরী-প্রচারিণী সভা ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা প্রভৃতি ঘটিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন। পরলোকগত জগন্নাথ

স্বামী তেলেগু ভাষায় রসায়নশাস্ত্রবিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহাতে সংস্কৃত-মূলক অনেক পরিভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। সম্প্রতি Vernacular Text Book Commitee বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন করিয়াছেন, এবং আশা করা যায়, সাহিত্য-সম্মিলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি (committee of experts) নিয়োজিত করিয়া কি ভাবে পরিভাষা গৃহীত হইবে, তাহার নিষ্পত্তির উপায়-বিধান করিবেন।

বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্মিলনের অনুষ্ঠাতৃগণ বাঙ্গালা সাহিত্যকে সাধারণ সাহিত্য ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া শেষোক্ত বিভাগের কার্য্যক্ষেত্র British Association for the Advancement of Learning and Scienceএর আদর্শে যে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা সদ্‌যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। মানবতত্ত্ব (Anthropology) পুরাতত্ত্ব, ইতিহাস, লোকতত্ত্ব (Ethnology), ভূগোল, পদার্থ-বিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, ভূ-বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হইয়া যাহাতে তৎতৎবিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারিত হয়, তজ্জন্য আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। আশা করি, এই অধিবেশনে রাজসাহী বিভাগের লোকতত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটি সারবান প্রবন্ধ পঠিত হইয়া ইহার সূচনা হইবে। অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, রাজসাহীর কয়েক জন কৃতবিদ্য সন্তান পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নূতন পথ দেখাইয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙ্গালী যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ইতিহাস রচনা করিতে সক্ষম, সিরাজ-দ্দৌলা-প্রণেতা শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। আমার বন্ধু, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে বহু দুর্লভ পারসী পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্নাবলী আহরণ করিতেছেন। তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়াছি, এবং আপনাকে কল্পনায় অনেক সময়ে ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সমকালীন বলিয়া মনে করিয়াছি। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ মহৎকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন, এবং মোগলরাজ্যের বিশাল ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমাদিগের আন্তরিক প্রার্থনা। আমাদিগের সম্মি-

লনের এক জন প্রধান উদ্‌যোক্তা শ্রীযুত শশধর রায় মহাশয় "মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ" প্রভৃতি শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি অভাব মোচন হইবার সূচনা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল বহু পরিশ্রমে মুসলমান বৈষ্ণবদিগের প্রাচীন পদাবলী সংগ্রহ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন।

আজ আমরা নূতন জাতীয় জীবনের প্রাসাদের প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন' ইত্যাদি আশা ও উৎসাহের কথা, অলীক ও কবি-কল্পনা-প্রসূত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত হইত, যে দেশে স্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতাব্দী যাবৎ বিস্মৃত ছিল, যে দেশ মাতৃভাষা ভুলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচনা করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণে কি এক অমৃতবারি সেচন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাষ্ঠহাসি দর্শনে পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আত্মপ্রবঞ্চনামূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি এক অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুবক সরসবদনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল. সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহুকষ্টসঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল! ইহা কি আশার কথা নহে,—ইহা ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? দুই বৎসর পূর্ব্বে যে বাঙ্গালী যুবক পিতামাতার স্নেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া, অথবা নবপরিণীতা ভার্য্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য সুদূর দেশে যাইতে কুণ্ঠিত হইত, আজ জানি না, কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব, অচিন্ত্যপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়া জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে সেই যুবক বিদেশ যাত্রা করিল! তাই বলিতেছিলাম, আমরা জাতীয় জীবনের সোপানে আজ দণ্ডায়মান—আজ নূতন আশা, নূতন উদ্দীপনার দিন।

বাঙ্গালায় এমন দীন হীন কাঙ্গাল হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহূত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনী! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলী! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অর্জ্জিত বিদ্যা লইয়া, সকলে সমবেত হও।

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের

দিকে সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে; স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্য্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটিমাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্ত্তির, মধ্যপথে আর কিছুই নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়েসে মজিয়া ভবিষ্যৎ-প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে; ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষার উন্মেষেই হায়, আবার অস্তমিত হইবে।

কিন্তু আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাঙ্গালা এ আহ্বান উপেক্ষা করে নাই—সতীশচন্দ্র ও রাধাকুমুদের ন্যায় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী যুবক, সুবোধচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রকিশোর, সূর্য্যকান্ত, মণীন্দ্রচন্দ্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ধনাঢ্যগণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ নিশ্চয়ই উঠিবে—সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। যাহাতে অধীতবিদ্য বিজ্ঞানবিদ্ ছাত্রগণ বৃত্তি লাভ করিয়া অন্নচিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, এবং অনন্যমনে বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা দেশের সেবায় মনঃপ্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় নির্দ্ধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন্ কৃতবিদ্য ও নিষ্ঠাবান ছাত্রের অভাব নাই। তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাশী নহে; যাহাতে তাহাদের সাংসারিক অভাবমোচন হয়, এবং তাহারা একান্তমনে বিজ্ঞানসেবায় ব্রতী হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্টিসাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চ্চা প্রবর্ত্তিত হউক।*

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়।

* রাজসাহীর ঘোড়ামারার সাহিত্য-সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি মহোদয়ের 'অভিভাষণ'-স্বরূপ পঠিত।

সহযোগী সাহিত্য।

ফিলিপাইনে মার্কিণ শিক্ষক।

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ চীনসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যস্থলে বিরাজিত। ইহার দক্ষিণেই মালয় দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। প্রশান্ত-মহাসাগর-শীকর-সিক্ত মলয়ানিল শস্যশ্যামলা, কানন-কুন্তলা, সৌরকরোজ্জ্বলা ফিলিপাইন-ভূমিকে অহোরাত্র বীজন করিতেছে। এই বেলা-বেষ্টিত দ্বীপাবলিকে প্রকৃতি নিজের সম্পদ-গৌরবে গৌরবান্বিত করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ফিলিপাইন ভূমির স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন। অপার প্রশান্ত-জলধির দিবাকর-করদীপ্ত ললাট-ফলকে এই দ্বীপরাজি দ্যুতিমান্ মণির ন্যায় বিরাজমান। প্রশান্ত-পারাবারের বৈষম্যবিহীন বারিরাশির নীলকান্তি দর্শনে ক্লান্তচক্ষু নাবিক দূর হইতে যখন ভানুকিরণে ভাস্বর ফিলিপাইনের 'তমালতালীবনরাজিনীলা' বিচিত্র-সৌন্দর্য্যশালিনী বেলা-ভূমি দেখিতে পায়,—তখনই তাহার হৃদয় অপার আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

এই অসাধারণ সৌন্দর্য্যই ফিলিপাইনের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। ফিলিপাইন পরের অধীন; বন্দিনী। বিখ্যাত পর্ত্তুগীজ নাবিক ফর্দ্দিনান্দ মাগিলান ১৫২১ অব্দে ফিলিপাইনের এই অতুল সৌন্দর্য্য স্পেনাধিপের গোচর করেন। ১৫৬৯ অব্দে ফিলিপাইনকে স্পেনের লৌহনিগড় পায়ে পরিতে হয়। প্রায় সাড়ে তিন শত বর্ষ কাল ফিলিপাইন স্পেনের দাসীবৃত্তি করিয়াছে।—এই সাড়ে তিনশত বর্ষ ধরিয়া ফিলিপাইনের কৃষ্ণচর্ম্ম সন্তান সন্ততি জগৎসমক্ষে দাসীপুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। তাহারা শৌর্য্য হারাইয়াছে, বীর্য্য হারাইয়াছে। স্পেনের অধীনে হলকর্ষণই তাহাদের একমাত্র বৃত্তি ছিল। সেই হলকর্ষণের ফলভাগী ছিল,—ফিলিপাইনের অধিস্বামী স্পেন।

কালচক্রনেমির অপরিহার্য্য আবর্ত্তনে স্পেনের গৌরবভাস্কর অস্তমিত। তাই মার্কিণ সুযোগ পাইয়া বীরভোগ্যা ফিলিপাইনের চরণ হইতে দাসীত্বের লৌহনিগড় কাটিয়া দিয়াছেন। কিন্তু ফিলিপাইন স্বতন্ত্রা হইতে পারেনি নাই। এখন মার্কিণই ফিলিপাইনের অধীশ্বর। মার্কিণের শৃঙ্খল এখনও তাঁহার চরণে বদ্ধ। কিন্তু মার্কিণ বলিতেছে,—'আমার প্রদত্ত শৃঙ্খল লৌহনিগড় নহে,—ইহা হেম-শৃঙ্খল; আমি ফিলিপাইনকে কিঙ্করী করিতে চাহি না; আমি সখীত্ব-ডোরে উহার সহিত বদ্ধ হইতে চাহি। কিন্তু সভ্য মার্কিণের সখীত্বের উপযুক্ত হইতে হইলে ফিলিপাইনকে সুশিক্ষিত ও সভ্য হইতে হইবে।' সেই জন্য মার্কিণ ফিলিপাইনকে শিক্ষিত, সুসভ্য ও মর্য্যাদাসম্পন্ন করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিতেছেন। এই শিক্ষা-পদ্ধতির কথা লইয়া সহযোগী সাহিত্যে অনেক আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। জানুয়ারী মাসের 'মডারণ্ রিভিউ' নামক ইংরেজী মাসিকপত্রে এই সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে। সেই প্রবন্ধই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

প্রাচ্যদেশ জয় করিয়া প্রতীচ্য-বিজেতৃগণের মুখে একই প্রকার আশার কথা প্রকাশিত হয়। বিজেতা প্রতীচী শিক্ষকরূপে বিজিত প্রাচীর সমক্ষে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রায়ই এই কথা বলিয়া থাকেন,—'আমি আসিয়াছি, আমার শিক্ষাগুণে তোমার তমসাচ্ছন্ন হৃদয়-কন্দরে জ্ঞানালোক সমুদ্ভাসিত হইবে,—আমার প্রদত্ত শিক্ষার ফলে তুমি প্রচুরপরিমাণে জ্ঞানালোক লাভ করিবে।' প্রাচী এই আশা-বাণীর সাফল্যের আশায় প্রতীচীর মুখাপেক্ষিণী। আশার কাল কাটিয়া গেল,— সাফল্য পূর্ব্বের মত সুদূর-পরাহতই রহিল। প্রমাণস্বরূপ উক্ত প্রবন্ধের লেখক ইংলণ্ড কর্ত্তৃক ভারত-বিজয় ও ওলন্দাজ কর্ত্তৃক যাভা-বিজয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ওলন্দাজগণ যবদ্বীপে এই আশাবাণী রক্ষা করিবার জন্য কিরূপ যত্ন করিতেছেন, লেখক তাহা মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌টের কথা তুলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। টাফ্‌ট বলিয়াছেন,—'যবদ্বীপবাসীরা প্রাথমিক শিক্ষালাভেরও সমান সুযোগ পাইতেছে না। ওলন্দাজদিগের ভাষা শিক্ষা করিতে পাইলেও উহারা বহির্জগতের অনেক জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইত বটে, কিন্তু ঐ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য উহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিজেতৃগণের সমক্ষে অতি সামান্য শিক্ষার আবশ্যকতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যবদ্বীপ বিশাল কৃষিক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির পণ্যের বিপণি বিস্তৃত করিবার জন্য যবদ্বীপের গভীরতম অঞ্চলে রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। কিন্তু যবদ্বীপবাসীদিগকে তণ্ডুলোৎপাদন ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্যের উপযোগী শিক্ষা-প্রদানের জন্য কোনও ব্যবস্থাই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। উহারা সমাজে একটিমাত্র সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক স্থান অধিকৃত করিবার জন্য শিক্ষিত হইতেছে, কিন্তু দেশে উৎপন্ন ধন সমাজ-শরীরের সর্ব্বত্র বণ্টন করিবার উপযোগী শিক্ষা ও সুযোগের অভাবে বাধ্য হইয়া উহাদিগকে একটিমাত্র বৃত্তিশিক্ষায় রত থাকিতে হইতেছে। এই প্রকারে, উহারা সমাজের একটি ভগ্নাংশ স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে।'

মার্কিণ ফিলিপাইনে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা ইংরেজ ও ওলন্দাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত নীতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। ফিলিপাইনের যাহাতে সমৃদ্ধির বৃদ্ধি ও জ্ঞানের উন্নতি হয়, মার্কিণ সর্ব্বতোভাবে এখন তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখক টাফ্‌টের নিম্নলিখিত কথা কয়টি উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন,—'বৃটিশ ও দিনেমারগণ যে উদ্দেশ্যে তাহাদের রাজ্য অধিকার করিয়াছেন,—আমাদের উদ্দেশ্য সেরূপ নহে;—সুতরাং আমরা স্বতন্ত্র নীতি প্রবর্ত্তিত করিতে বাধ্য হইয়াছি। ঐ সকল উষ্ণপ্রধান দেশের লোকের সহিত তাঁহারা যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন,—তাহার সহিত আমাদের ব্যবহারের পার্থক্য এই যে, আমরা উহাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসনের উপযোগী করিতে চাহি। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদিগকে বিনা বেতনে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া আমরা উক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি। দ্বিতীয়তঃ, কার্য্যক্ষেত্রে স্বয়ং অর্জ্জিত বহুদর্শিতা লাভ করিয়া যাহাতে উহারা স্বায়ত্তশাসনের ও বহুলোকের মতানুসারে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক বিভিন্নমতাবলম্বী লোক-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহার উপযোগী অনুষ্ঠানাদি বিস্তৃত করিয়া সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার চেষ্টা করিতেছি।'

ইহার পর টাফ্‌ট দেখাইয়াছেন যে, ইংরেজ এক শত পঁচিশ বৎসর কাল ভারতে

রাজত্ব করিতেছেন,—কিন্তু এখনও ভারতবাসী জনগণের মধ্যে শতকরা ১·৩৭ জন মাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যায়। পক্ষান্তরে, মার্কিণ চারি বৎসর কাল ফিলিপাইন অধিকার করিয়াছে; কিন্তু এই অল্প কালের মধ্যেই তথায় শতকরা ৩·৫৩ জন ফিলিপিনো বিদ্যামন্দিরে শিক্ষালাভ করিতেছে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ফিলিপাইন দ্বীপে পাঁচ বৎসর হইতে ষোল বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার সংখ্যা বিশ লক্ষ। তন্মধ্যে চারি লক্ষ বালক বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। এই চারি লক্ষ ছাত্রের তিন ভাগের মধ্যে দুই ভাগের বয়ঃক্রম নয় বৎসর হইতে বার বৎসর। ষোড়শ ও সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে কিশোর-কিশোরীগণ উচ্চশিক্ষা পাইবার জন্য স্কুল-কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। উনি দেখাইতেছেন যে, যবদ্বীপে শতকরা ৪ জন মাত্র স্কুলে যায়। টাফ্‌ট আরও বলেন,—এই নীতি অবলম্বন করিবার একটি কারণ আছে। সে কারণটি এই,—'পিতৃস্থানীয় বলবান্ শাসকের অধীনে প্রজা যদি অশিক্ষিত থাকে, তাহা হইলে তাহারা সহসা অসন্তুষ্ট হয় না। ইহা ভিন্ন ঐ সকল অশিক্ষিত লোককে শাসকগণ সহজেই কৃষি প্রভৃতি সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে পারেন। পক্ষান্তরে, শিক্ষালাভ করিলে জ্ঞানের প্রসার বৃদ্ধি পায়, সুতরাং তাহারা জল তোলা, কাঠ কাটা প্রভৃতি সামান্য কুলীর কাজ হইতে উচ্চতর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে চায়। অল্প লোক অতিশিক্ষা লাভ করিয়া যে জ্ঞান লাভ করে, সেই জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার জন্য যে দোষ ঘটে, সেই দোষ অপেক্ষা সার্ব্বজনীন শিক্ষাজনিত গুণেরই গুরুত্ব অধিক,—ইহাই আমাদের মত। অশিক্ষিত জনসমাজের উপর চিরকালের জন্য শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া উহাদের শ্রম দ্বারা স্বদেশের স্বার্থসাধন করিবার উদ্দেশে মার্কিণ গবর্মেণ্ট ফিলিপাইন বিজয় করেন নাই। ফিলিপাইনবাসীরা শান্ত ও বিনীতভাবে আমাদের গবর্মেণ্টের অধীনতা স্বীকার করুক, ইহাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে।'

মার্কিণগণ যে মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন,—তাহার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। বহু বর্ষ ধরিয়া অবিশ্রাম পরিশ্রম করিলে তবে মার্কিণ এই মহাব্রতে ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। অন্যান্য সভ্যজাতির সহিত সমকক্ষতা লাভ করিতে ফিলিপাইনের অনেক সময় অতিবাহিত হইবে। ফিলিপাইনের পূর্ব্ব অধিস্বামী স্পেনবাসীরা অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির ন্যায় আত্মস্বার্থ-সংসাধনার্থ এসিয়া খণ্ডের এই দেশ জয় করিয়াছিল। প্রায় সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ ব্যাপিয়া স্পেন ফিলিপাইনের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিল; কিন্তু ফিলিপাইনের প্রজাপুঞ্জ অজ্ঞানতার অমানিশায় আচ্ছন্ন ছিল। ঐ দ্বীপে সত্তর লক্ষ প্রজার বাস। ইহাদের অধিকাংশই ঘোর মূর্খ ও দরিদ্র। অনেকের পরিধানে বসন নাই, উদরে অন্ন নাই। সাধারণ লোক অতি অস্বাস্থ্যকর পর্ণকুটীরে বাস করে। যাহাদের কিছু সংস্থান আছে,—তাহারা নগরেই থাকে। সহরের দেশীয়দিগের আবাস-অঞ্চল অস্বাস্থ্যকর। গৃহাদি-নির্ম্মাণে বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানের গৌরব রক্ষিত হয় না। শিল্প সম্বন্ধে ইহারা নিতান্ত অজ্ঞান। ইহাদের যাহা কিছু শিল্পজ্ঞান আছে, তাহা অতি পুরাতন,—বর্ত্তমান যুগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বহুকাল কঠোর শাসনের অধীনে থাকিয়া উহারা নিতান্ত অলস ও উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছে। দৈহিক শ্রমকে উহারা অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করে। সামান্য লেখা-পড়া শিখিয়া ক্ষেতখামারের কাজ ছাড়িয়া

রাজ-সরকারে সামান্য কেরাণীগিরি পাইলেই ইহারা আপনাকে ধন্য মনে করিয়া থাকে। 'ভদ্রয়ানা কাজ' করিতে পারিলেই ইহারা বিশেষ সন্তুষ্ট,—বাবুয়ানার কার্য্যে ইহাদের অত্যধিক রতি। শিল্পকার্য্যে ইহাদের স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। মার্কিণদিগের ন্যায় ইহাদের হাতের কাজে কৌশল ও পরিচ্ছন্নতা দৃষ্ট হয় বটে,—কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত নিখুঁত কার্য্য করিবার শক্তি ইহাদের নাই। অভ্যাসের দোষে ইহারা শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায় হারাইয়াছে। মার্কিণ-শিক্ষকগণ এখন উহাদিগকে কেরাণীগিরির দোষ বুঝাইয়া শ্রমশিল্পে রত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ফিলিপিনো বালক যাহাতে অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হয়, মার্কিণগণের প্রদত্ত শিক্ষার এখন তাহাই উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য সফল হইলে মার্কিণ অতুল কীর্ত্তির অধিকারী হইবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ছেলেবেলার গল্প ও তাহার পরে।

১

অনেকে শৈশবের গল্প ভালবাসে না। কিন্তু আমি বাসি। শৈশবের স্মৃতি বড় মধুর। ক্লেশ-বিজড়িত হইলেও মধুর।

আমি জন্মিবার পরেই আমার অগ্রজ সিংহাসন হইতে অবরোহণ করিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ অধিকার করিয়াছিলেন। আমি মাতৃকোলে যথারীতি রাজা হইলাম।

আমার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দাদা 'অপ্রতিহতপ্রভাবে' প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

প্রজার মধ্যে বাবা ও দীনু কাকাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি বাবাকে বেশী ভাল-বাসিতাম না। তিনি আমাকে 'খোকা' বলিয়া ডাকিতেন। রাজার পক্ষে 'খোকা' অতি কদর্য্য নাম। কাকা আমাকে 'অমল' বলিয়া ডাকিতেন, আমি তাহাতে বড় সন্তুষ্ট হইতাম। খোসামোদ কে না ভালবাসে?

ইতর প্রজাগণের মধ্যে রামা চাকর, বিশ্বেশ্বরী ঝি ও বদন ঠাকুর আমার প্রিয় ছিল। রামা চাকর আমাকে কাঁধে করিত, ঝি কোলে লইত, এবং ঠাকুর পৃষ্ঠে চড়াইত। এইরূপে পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ অল্পকালের মধ্যেই পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম।

মার সহিত আমার সর্ব্বদাই কলহ হইত। তাহার প্রধান কারণ যে, তিনি আমার শরীর নানাবিধ বস্ত্রাদি দিয়া আবৃত রাখিতেন। আমি তখন এক দুই গণিতে জানিতাম না, কিন্তু এখন পারি।

প্রথমতঃ পায়ে একজোড়া মোজা, এবং তাহার উপর বার্ণিশ জুতা। ত্বকের উপরেই একটা পাতলা জামা, তাহাতে পচা দুগ্ধের 'এসেন্স' সর্ব্বদাই সৌরভ বিকীর্ণ করিত। সেই জামার উপর ফ্লানেলের জ্যাকেটের মত একটা কিছু, তাহার উপর মেরুণোর পেনি। গলা ও মাথার মধ্যে পশমের গলা-বন্ধ, তাহার শীর্ষে একটা রক্তবর্ণ টুপি। সর্ব্বশুদ্ধ সাতটা।

তখন আমার বয়স ছয় মাস। প্রত্যূষে দীনু কাকা বেদান্ত পড়িতেছিলেন। আমি বুঝিতেছিলাম। কাকা বলিলেন যে, বেদান্তসার বৃদ্ধ ও শিশুদিগের জন্য। আমি বলিলাম, "হুম্।"

কাকা। এই মনুষ্য-দেহ সপ্ত-আবরণ-বিশিষ্ট, এবং পঞ্চকোশে গঠিত।

আমি। হুম্।

কাকা। ইহা হইতে বাহির হইলেই জীবের মুক্তি হয়। সুখ, দুঃখ, আপদ-বালাই সকলিই ইহার মধ্যে।

আমি। হুম।

কথাটা চট্ করিয়া মনে লাগিয়াছিল। সেদিন দারুণ শীত। তাহার পর-দিনই আমার অন্নপ্রাশন।

গভীর রাত্রি। মা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। বিশ্বেশ্বরী ঝি সুষুপ্তা। সুযোগ বুঝিয়া আমি শয্যায় বসিয়া অবাধে হস্তপদ ছুড়িতে লাগিলাম।

২

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে পঞ্চকোশ ও সপ্ত আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া সগর্ব্বে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম যে, শিয়রেই প্রদীপ জ্বলিতেছে।

প্রদীপটা হাতে টানিয়া শয্যায় আনিলাম। পঞ্চকোশ নির্ব্বিবাদে জ্বলিয়া উঠিল। আমি গড়াইয়া ভূমিতলে পড়িলাম, এবং ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে দীনু কাকার ঘরে গেলাম। সেখানে কেহ নাই। কেবল পুস্তক-রাশি! আমি তাহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া সুখে নিদ্রিত হইলাম।

কতক্ষণ এইরূপে কাটিয়াছিল জানি না; কিন্তু মার চীৎকারধ্বনি শুনিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

বোধ হইল, আমার প্রাচীন শয়ন-গৃহ ধূমে পরিপূর্ণ। সেই ধূমের মধ্যে "ওরে, আমার খোকা কৈ! ওরে আমার বাছা কই! ওগো, তোমরা এস গো! সর্ব্বনাশ হয়েছে!" ইত্যাদি প্রলাপময় বৃথা চীৎকার! কোনও অর্থ নাই!

দীনু কাকা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া হায়! হায়! করিতেছিলেন। ঝি, বাবার আজ্ঞানুসারে একটা বড় কলসী জলে পরিপূর্ণ করিয়া শয্যায় ঢালিতেছিল।

আমি দীনু কাকার রঙ্গ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। পঞ্চকোশ হইতে মুক্ত হইলে "হায়, হায়" করা কেন?

আমি সকলের ভাবগতিক বুঝিতে না পারিয়া আমার অস্তিত্বজ্ঞাপনার্থ "ট্যাঁ" করিয়া উঠিলাম। জন্মিবার সময় এইরূপ করিয়াছিলাম, এবং জানিতাম, এই প্রকার ধ্বনি করিলে মনুষ্য জাতি, বিশেষতঃ মাতা, পিতা, আত্মীয়, স্বজনেরা প্রফুল্লচিত্ত হইয়া থাকে।

ঠিক তাই। সর্ব্বপ্রথমে মা, তৎপরে বাবা, এবং তৎপরে দীনু কাকা এবং তৎপরে অনেকে আসিয়া আমাকে পুস্তকরাশির মধ্যে আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া বসিল।

মা বলিলেন, আমি 'হারানিধি'। ইহা 'খোকা' অপেক্ষাও কদর্য্যতর নাম! ইহা অপেক্ষাও অধিকতর আপদ যে, সকলে চুম্বনার্থ মুখপ্রসারণ করিতে লাগিল। আমি আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ অনেক প্রকার কৌশল করিয়াছিলাম, সেই জন্য আমাকে সকলে চাটিতে পারে নাই। চাটিলে সর্ব্বশরীরে তামাকুর দুর্গন্ধ হইত। বিশেষতঃ, বদন ঠাকুর কড়া তামাকু খাইত, এবং হুঁকার জল প্রত্যহ বদলাইত না।

এই ঘটনার পর পিতা সাব্যস্ত করিলেন যে, ছেলেপুলের গায়ে অনেক কাপড় রাখা ভাল নয়, আগুন ধরিতে পারে। সেই দিন হইতে আমার সপ্ত আবরণের মধ্যে একটি পেনি মাত্র অবশিষ্ট রহিল। আমি সাহ্লাদে দন্তহীন মাড়ি দিয়া তাহাকে দুই বেলা চর্ব্বণ করিতাম।

৩

বিবাহ কি সুখের! তিন বৎসর বয়সে আমার বিবাহ হয়।

আমার প্রণয়িনীর সহিত রাধাবাজারে দেখা হয়। বাবার সহিত গাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম।

প্রণয়িনী একটি দোকানের মধ্যে চতুর্দ্দিক আলো করিয়া বসিয়াছিলেন। টুকটুকে রক্তবর্ণ গাল। পরিধানে সবুজ ঘাগ্‌রা। গলায় মুক্তার মালা। হাতে করতালি। আমি দেখিবামাত্র ভালবাসিলাম।

দাম পাঁচ সিকা!

বাবা তৎক্ষণাৎ কিনিয়া দিলেন।

সেই দিন হইতেই জীবনের কত পরিবর্ত্তন! তাহার কতই সুষমা! কোথায় রাখি? কি খাইতে দি? পাছে কেউ চুরি করিয়া লয়! পাছে কেউ দেখিয়া ফেলে!

মার একটা টিনের বাক্স ছিল। মা বলিলেন, "বৌকে ইহার মধ্যে রাখ্, আর মাথার কাছে লইয়া শো।"

মাতৃদত্ত টিনের বাক্সের মধ্যে অতিযত্নে শয্যা রচনা করিয়া প্রস্তরময়ীকে রাখিয়াছিলাম।

তাহার হৃদয়ের মধ্যে একটা কল ছিল। টিপিয়া ধরিলে সে 'ক্যাঁক' করিয়া উঠিত, এবং করতালি-ধ্বনি!

প্রথম প্রথম সেটা ভাল লাগিত, কিন্তু পরে ভাবিলাম, তাহার মধ্যে মধুরতা নাই। এ সম্বন্ধে দীনু কাকার সহিত অনেক কথা হইয়াছিল।

দীনু কাকার মতে ওটা কলহপ্রিয়তার লক্ষণ।

প্রণয়িনীকে টিপিয়া ধরিলেই কলহ নিঃসন্দেহ। উহাতে হৃদয়ে আঘাত লাগে, এবং আঘাতের সহিত হাতের সঞ্চালন হয়। চক্ষুও কোটরে ঘুরিতে থাকে।

আমি। তবে কি আমাকে ভালবাসে না?

কাকা। বাসেন বৈ কি। তবে উনি একলা ঘর-সংসার ভালবাসেন না। ছেলেপুলের দরকার।

তাই দীনু কাকা আবার পয়সা দিয়া কতকগুলি ছেলেপুলে আনিয়া দিয়াছিলেন। আমি তাহাদিগকে পাশাপাশি সারি সারি সাজাইয়া গৃহসংসার আলোকিত করিয়াছিলাম।

সেই টিনের গৃহমধ্যে আর্সি, চিরুণী, এসেন্স, ঢাকাই শাড়ী, খোকার বহি, খুকীর ফুল, গহনা, প্রেমপত্রিকা, কতই কি ছিল! যখন বসন্তবায়ু বহিত, আকাশে চাঁদ উঠিত, স্বপ্নোত্থিতা প্রণয়িনী বাক্সের মধ্যে খট্ খট্ করিত, তখন অতি সাবধানে, নিভৃতে, তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া, সন্তানগণের পার্শ্বে সাজাইয়া রাখিতাম। এইরূপে দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছিল।

৪

মনুর মতে, ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহসংসার ও বিবাহ। কিন্তু শৈশবের শাস্ত্র তাহার বিপরীত। আমার বিবাহ ও গৃহসংসারে অরুচি জন্মিলে পর আড্ডিদের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। এইরূপ সকলেরই হয়।

সংসার-বৈরাগ্য না জন্মিলে লেখাপড়া হয় না। আমি স্কুলে প্রবেশ করিবামাত্র সকলে বুঝিল যে, রত্ন উদীয়মান।

প্রথম সহপাঠী বালকদিগের মুখ বেশ করিয়া দেখিলাম। বাবা একবার

টালিগঞ্জে ঘোড়া কিনিতে গিয়া তাহাদিগের দাঁত দেখিয়াছিলেন, কিন্তু দীনু কাকা বলিয়াছিলেন যে, মুখ দেখিলেই যথেষ্ট। অকর্ম্মণ্য তমোগুণবিশিষ্ট অশ্ব প্রায়শঃ চক্ষু বুজিয়া ঘাস চর্ব্বণ করে। রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট ঘোড়া, হয় একদৃষ্টে চাহে, নয় কটাক্ষে বিমোহিত করে।

ঘোষজা মহাশয়ের পুত্র হারাণ কটাক্ষের গুণে আমার প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল। বন্ধুত্ব সংসারে অমূল্য রত্ন। হারাণ সেই বন্ধু।

রাজদ্বারে এবং শ্মশানেই বন্ধুত্বের শেষ পরিচয়। দুর্ভিক্ষে, ব্যসনে, রাষ্ট্রবিপ্লবেও সেই পরিচয়। ইহার গোড়াপত্তন গাছে। আমরা নিমগাছে ও আম্রবৃক্ষের উপর প্রথমতঃ সখ্য-স্থাপন করিয়াছিলাম। স্কুলের কোনও নির্জ্জন বারান্দায়, কখনও পথে, কখনও গোলদিঘীর ধারে তাহার প্রসারণ হইত।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমাদিগের মধ্যে কখনও কলহ হয় নাই। আমি হারাণের নিকট ইষ্টদেবতা-স্বরূপ, এবং হারাণও আমার পক্ষে তাহাই।

লেখাপড়া যত দূর হউক না কেন, বন্ধুত্বের বিমল জ্যোতির সহিত হৃদয়ের কোনও না কোনও দিক্ বর্দ্ধিত হয়। ঠিক কোন্ দিক্ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা উভয়েই সন্ন্যাসী হইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম।

সন্ন্যাসী হইলেই ভ্রমণ অনিবার্য্য। ভ্রমণ করিতে হইলেই পাথেয় আবশ্যক। পাথেয় সংগ্রহ হইলেই পলায়নতৎপরতা।

আমরা ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত পলাইব, স্থির করিলাম। পাথেয় হারাণ সংগ্রহ করিয়াছিল। আমাদিগের বিশ্বাস ছিল, ডায়মণ্ডহারবারের নিকটেই সমুদ্র।

রবিবার প্রাতঃকালে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া সমুদ্র-দর্শনাভিলাষে রেলে উঠিলাম। বৈকালে সমুদ্রের সম্মুখীন হইলাম।

সমুদ্র নহে, নদী! কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহাই সমুদ্রবৎ! অনেক জাহাজ পালভরে যাইতেছিল।

তটে হারাণের সহিত অনেকক্ষণ নির্জ্জনে বসিয়া ছিলাম। যদি বাল্যস্মৃতির এখনও কণামাত্র অবশিষ্ট থাকে, তবে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই নীরব সম্মিলন কতই মধুর ভালবাসা-পূর্ণ—কতই নিঃস্বার্থ!

আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে,জীবনে পরস্পরের জন্য আত্মদান করিব। অর্থ জানিবার পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা বাল্যকালের বন্ধুত্বের লক্ষণ।

৫

প্রায় বাইশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন যাহা বলিতেছি, তাহা অনেক দিনের পরের কথা। পুরাণো কথা এখন স্বপ্নের মত। কিন্তু কি জানি কেন, নূতন ও পুরাতনে একটা সম্বন্ধ না থাকিয়া যায় না।

আমি এখন বহু দূরে। কলিকাতা হইতে প্রায় সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে, পর্ব্বতপ্রদেশে। বাবা নাই, কিন্তু মা ও দীনুকাকা আছেন। আমি ডাক্তারি পাশ করিয়া এখানে আসিয়াছি। স্থানটি পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত।

দারুণ শীত। তুষারস্নাত পাদপ ও প্রস্তর, কুটীর-শ্রেণীর সহিত একাকার হইয়া সারি সারি দাঁড়াইয়া আছে। প্রাতঃকাল, পশুপক্ষীর সাড়াশব্দ নাই। আমার মনে পড়িল, 'জেন্'কে দেখিতে যাইতে হইবে।

'জেন্' ষ্টেশন-মাষ্টারের কন্যা। তাহার সাত দিন হইতে জ্বর।

বরফ পড়িলে পার্ব্বতীয় পথ দুর্গম হইয়া পড়ে। তথাপি বোধ হইল, যেন কে হঠাৎ আমার সম্মুখ দিয়া দৌড়িয়া গেল।

একটা হরিণশাবকের পশ্চাতে একটা কুকুর দৌড়িতেছিল। শাবককে আক্রমণ করাই তাহার উদ্দেশ্য।

হরিণ-শাবক প্রাণভয়ে এক কুটীর হইতে অন্য কুটীর, এবং ফিরিয়া আবার অন্য কুটীরে আশ্রয় লইতে উদ্যত, কিন্তু কোনও কুটীরের দ্বারই খোলা নাই।

সহসা গবাক্ষ দিয়া একটি বালিকা বাহিরে আসিয়া শাবককে কোলে লইল। কুকুর সক্রোধে আশ্রয়দাত্রীকে আক্রমণ করিল, এবং তাহাকে কামড়াইয়া ক্ষত-বিক্ষত করিল। আর্ত্তনাদ শুনিয়াই আমি ছুটিয়া গেলাম।

কুকুরকে লগুড়াঘাত করিয়া নিরস্ত করিতে অধিক সময় লাগে নাই। কিন্তু বালিকার অবস্থা দেখিয়া মনে ভয় হইল। কুটীরের দ্বারে ডাকিয়া কাহারও শব্দ পাইলাম না। পদাঘাতে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

একটি রুগ্ন ভদ্রলোককে বাটীর অভ্যন্তর হইতে ব্যস্ততাসহকারে বাহিরে আসিতে দেখিয়া আমি বলিলাম,—

"শীঘ্র আসুন, একটি মেয়েকে কুকুরে সাংঘাতিক রূপে কামড়াইয়াছে।"

ইত্যবসরে একটি স্ত্রীলোক আসিয়া সভয়ে বলিলেন, "ও মা, সে কি কথা, সরলা নয় ত?"

হরিণশাবকের সহিত সরলাকে টানিয়া আনিতেই একটা হুলস্থূল ক্রন্দন-ধ্বনি পড়িয়া গেল।

আমি বলিলাম, "কোনও ভয় নাই, আমি ডাক্তার, শীঘ্র খানকতক ছিন্ন বস্ত্র লইয়া আসুন।"

তাহার পর বালিকাকে শয়ন করাইয়া তাহার সংজ্ঞালাভের যত্ন করিলাম, কষ্টিক্ দিয়া ক্ষতগুলি দগ্ধ করিলাম, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিলাম; ঔষধ ও ব্রাণ্ডি দিলাম। বালিকার জ্ঞানসঞ্চার হইল। কৃতজ্ঞ হরিণশিশু অনিমেষ-লোচনে তাহা দেখিয়াছিল।

৬

আমি অমলেন্দু ডাক্তার, উনত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমে যে একটা বিপাকে পড়িব, তাহা স্বপ্নের অগোচর! আখ্যায়িকা অতি সামান্য। বালিকাও যে একটা অনির্ব্বচনীয়া চিত্রলেখার মত সুন্দরী, তাহা নহে। হরিণ-শাবকও যে তপোবনের, এবং কুটীরও যে ঋষ্যশৃঙ্গের, তাহাও নহে। কিন্তু সাত দিনের মধ্যে আমি আত্মহারা হইয়াছি।

সেই সাত দিন, স্বপ্ন অপেক্ষাও অতি সূক্ষ্ম জগতের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রেমের ইতিহাসের প্রথম ও শেষ পরিচ্ছেদ, উভয়ই প্রাণান্ত।

কথাটা কিছুই নহে, কিন্তু ঘটনাটা সঙ্গীন। যদি আমি হঠাৎ সান্নিপাতিক জ্বরে পড়িতাম, তাহা হইলেও উপায় ছিল। কিন্তু এ রোগের গোড়াতে কেহ ঔষধ খাইতে চাহে না।

বালিকার পিতা হুগলীর বর্দ্ধিষ্ণু উকীল। বায়ু-পরিবর্ত্তনার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। না আসিলে আমাকে এহেন বিপদে পড়িতে হইত না। অধিকতর বিপদ এই যে, সরলা নিতান্ত বালিকা নহে। পিতামাতার চেষ্টা থাকিলে প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ হইতে পারিত।

এই সকল নানাবিধ ঘটনায় জড়ীভূত হইয়া আমি কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়িলাম।

সরলার আরোগ্যে তাহার পিতা, মাতা ও বিনোদ নামক ভ্রাতা, সকলেই প্রফুল্ল।

আমিও যে প্রফুল্ল, তাহা নিজে বুঝিতে পারি নাই। বৈকালে জেন্‌কে দেখিতে গিয়া বুঝিতে পারিলাম।

ষ্টেশন-মাষ্টার-তনয়া জেন্ চুল বাঁধিতেছিল। তাহার জ্বর সারিয়াছে।

জেন্। অমলবাবু, আজ তোমাকে বড় প্রফুল্ল দেখ্‌ছি।

আমি। আপনাকে সামধিক প্রফুল্লা বোধ হইতেছে।

জেন্। তাহার কারণ, আমার বিবাহ হইবে। ঈশ্বর করুন, আমার বোধ হয়, আপনিও যেন সেই কারণে প্রফুল্ল হইয়াছেন।

আমি। মিস্ জেন্! আমার বিবাহের কোনও সম্বন্ধ আসে নাই।

জেন্। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক, ভাবে বুঝিতে পারি যে, আপনি কোনও সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া অন্ততঃ কল্পনায় সুখী হইয়াছেন।

আমি। কিন্তু সে কল্পনা ফলিবে কি?

জেন্। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ফলিবে। কিন্তু আপনি প্রথমেই তাহার মন বুঝেন নাই কেন? ইহা আপনাদিগের দুর্ব্বল স্বভাব।

আমি ধন্যবাদসহকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। কি আপদ্! মন চুরি করিলে আবার বুঝা-পড়া কি? আমি কি জিজ্ঞাসা করিব? 'ওগো, তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ, কিন্তু আমি তোমার মন চুরি করিয়াছি কি না, জানিতে চাহি!' কি লজ্জার কথা!

ইহার কি কোনও উত্তর আছে?

প্রশ্ন। ওগো, তুমি আমার মন চুরি করিয়াছ। ঠিক নয় কি?

উত্তর। আমি কি চোর? কি পাপ! ইচ্ছা হইলে বলিয়াই লইতে পারিতাম। চুরি করিব কেন?

প্রশ্ন। আমি কি তোমার মন চুরি করিয়াছি?

উত্তর। তা তুমিই জান।

মন চুরি নামক প্রক্রিয়ার দর্শনশাস্ত্র অতি জটিল। আমি প্রথমে জানিতাম না। ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী আসিতেছিলাম। পথিমধ্যে সরলার ভ্রাতা বিনোদের সহিত দেখা হইল।

৭

বিনোদ বলিল, "ডাক্তার বাবু, দিদির সঙ্গে যাঁর বিয়ে হবার কথা, তিনি আজ রাত্রে আস্‌বেন। তিনি খুব বড়লোক।"

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল, মুখ শুষ্ক হইল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের এইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু অর্জ্জুনের সহায় ছিল, আমি নিঃসহায়।

আমি হঠাৎ বলিলাম, "তবে উপায়?"

বিনোদ। তিনি আপনার বাটীতেই রাত্রিকালে শুইবেন।

আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। আমি নিজের উপায়-হীনতার কথা ভাবিতেছিলাম। তিনি যমের বাটীতে শুইলেও আমার কোনও আপত্তি থাকিত না।

কিন্তু আমি বলিলাম, "উদ্দেশ্যটা কি? বিবাহ বোধ হয় স্থির হইয়া গিয়াছে?"

বিনোদ। না, কল্য আশীর্ব্বাদ হইবে।

ধীরে ধীরে বাড়ী গেলাম। মাকে বলিলাম যে, একটি স্বদেশী বন্ধু আসিবে। যেন আহারাদির ক্রটী না হয়, এবং আমার কিছু ক্ষুধা নাই। হঠাৎ মাথা ধরিয়াছে, হয় ত ব্রংকাইটীস হইতে পারে।

একখানা র‍্যাপার মুড়ি দিয়া ইজি-চেয়ারে লম্বমান হইলাম।

আমি কি মূর্খ! সরলার সেই সস্নেহ দৃষ্টি, সেই সতৃষ্ণ-নয়নে পথপানে চাহিয়া থাকা, সেই ঔষধ-সেবনের নবীন উৎসাহ! সকলই কি মরীচিকা? কেন আমি মনের কথা খুলিয়া বলি নাই?

আবার ভাবিলাম, ইহাই কি শৈশবের প্রতিজ্ঞা? ইহাই কি সন্ন্যাসব্রত? কি ছার মানুষের জীবন!

তাই ক্রমে ক্রমে বাল্যস্মৃতি মনে পড়িল। সেই ডায়মণ্ডহারবারের পরিভ্রমণ, সখা! সখা হারাণ, তুমি কোথায়? তুমি হয় ত কলিকাতায় সুখে নিদ্রা যাইতেছ, আর আমি অভাগা সংসারত্যক্ত এখানে—

তখন ধীরে ধীরে দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া একটি মনুষ্য-মূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিল।

৮

কখনও কখনও জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনা উপন্যাসের মত উদয় হয়। আমি প্রথমে বিশ্বাস করি নাই যে, হারাণ সম্মুখে। কিন্তু বাস্তবিকই সেই। দুইটি হৃদয় নিমেষের মধ্যে আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

নিমেষের মধ্যে সরলাকে ভুলিয়া গেলাম। কেন? বুঝিলাম, আমার সরলা হারাণের হইবে। তবে আর দুঃখ কিসের?

দুঃখ অশ্রুস্রোতে ভাসিয়া গেল। দুই বন্ধু দুটি ক্ষুদ্র সহোদরের ন্যায় এক পাত্রে বসিয়া পেট ভরিয়া খাইলাম।

"হারাণ, তুই সত্য সত্য বিবাহ করিতে আসিয়াছিস্। এত দিন কোথায় ছিলি? তুই কি নিষ্ঠুর।"

হারাণ সুন্দর মুখের সুন্দর আঁখি দুটি আমার প্রতি অনিমেষভাবে আরোপিত করিয়া কি দেখিতেছিল।

আমি আবার বলিলাম, "কথা ক' না?"

হারাণ। কোন্ কথা?

আমি। সেই বাল্যকথা।

হারাণ। মনে আছে?

আমি। আছে।

হারাণ। ঠিক ত? ভুলিস নাই?

আমি কানে কানে বলিলাম, "প্রাণের সখা! তাহা ভুলি নাই।"

হারাণ। সেই সন্ন্যাসব্রত, সেই আত্মদানের কথা?

আমি। না।

সারানিশি হারাণকে নিকটে লইয়া অষ্টাদশ বৎসরের ইতিহাস, আমার প্রণয়ের কাহিনী, আমার সকল কথা বলিলাম।

"হারাণ! প্রথমে মনে করিয়াছিলাম বুঝি অন্য কেহ, কিন্তু এখন আমার কত আহ্লাদ, কত সুখ হৃদয় প্লাবিত করিয়াছে!"

হারাণ। তুই একটু ঘুমো। কাল সকালে আশীর্ব্বাদের সময় যেতে হবে।

আমি শান্তিপূর্ণ হইয়া ঘুমাইলাম।

প্রত্যূষে যাত্রা। যাইবার সময় হৃদয় একবার কাঁপিয়াছিল। সরলাকে দেখিয়া আর একবার কাঁপিয়াছিলাম।

তার পর আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদটা এ জগতের মত হইল না।

কথাটা অতি সোজা। আমার একটা হাত ধরিয়া ও সরলার অন্য হাত তাহাতে স্থাপন করিয়া, হারাণ তাহার দেবতুল্য সহাস্যমুখে কেবলমাত্র বলিল, "তোমরা সুখে থাক, এইমাত্র আমার আশীর্ব্বাদ!"

হারাণ চলিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, সরস্বতী আশ্রমের নিকট কোনও পর্ব্বতে আছে। তাহার ঐশ্বর্য্যের রক্ষক আমি। আমার সরলা আছে, সকলই আছে, কিন্তু হৃদয়টি বাল্য-সখা লইয়া গিয়াছে। কবে ডাকিয়া লইবি ভাই?

সৌন্দর্য্য ও আকাঙ্ক্ষা।

—————:•:—————

সুন্দরকে বাসো ভাল, কে তোমরা চাহ
লুব্ধ মুগ্ধ ভৃঙ্গ সম করিবারে পান
উজ্জ্বল উচ্ছল মধু—রূপের প্রবাহ—
সম্ভোগ মদিরা-ধারা ? কহ, কার প্রাণ
সমস্ত ইন্দ্রিয় মন সরবস্ব দিয়া
ভুঞ্জিতে মাধুর্য্য-মদ সদা লালায়িত ?
কে তোমরা আত্মহারা সকল ভুলিয়া
ভোগের পশ্চাতে সদা হ'তেছ ধাবিত ?
ও পিপাসা মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মার মতন—
সম্ভোগ-সমুদ্র মথি' তুলিবে অনল,
অতৃপ্তির বজ্রশিখা ; দগ্ধ প্রাণ মন
খুঁজিবে উন্মত্ত সম কোথা স্নিগ্ধ তল
নিত্য সৌন্দর্য্যের গঙ্গা, কোন পদতলে
তৃপ্তির অমৃত-উৎস আনন্দে উছলে !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী।

—:০:—

একে ত কবি দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর সহিত বঙ্গদেশের সেকালের ও একালের সকল পাঠকই সুপরিচিত, তাহার উপর আবার কবির কৃতী পুত্রগণ যে সুলভ সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে দরিদ্র বাঙ্গালী পাঠকের গৃহে গৃহে ঐ গ্রন্থাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই পাঠকেরা অতি সহজেই আমার বক্তব্যগুলির দোষ গুণ বিচার করিতে পারিবেন। যখন ঐ সুলভ সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন (১২৮৩ সালে) কবির বন্ধু ও একালের বঙ্গসাহিত্যের নবজীবনদাতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত ও কাব্য-সমালোচনায় কবি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য ও শিক্ষাপ্রদ কথা লিখিয়াছিলেন। বন্ধুর কাব্য-সমালোচনায় পাছে পক্ষপাত ঘটে, এই ভয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধুর কোনও কোনও ত্রুটীর কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করিয়াছিলেন। পক্ষপাত অতিক্রম করিবার প্রয়াসে যে কখনও কখনও সুধীদিগের বিচার অতিমাত্রায় কঠোর হইয়া দাঁড়ায়, এ সংসারে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমার মনে হইয়াছে যে, বঙ্কিমবাবুর কয়েকটি মন্তব্য তেমন সুবিচারিত নহে। বঙ্কিমবাবুর সমালোচনা অবলম্বন করিয়াই কবি দীনবন্ধুর কাব্যের অনুশীলন করিব।

১। নীলদর্পণ।—বঙ্কিমবাবুর সমালোচনায় অবগত হই যে, ১৮৫৯ সালে "পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অস্তমিত", এবং "নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের অভ্যুদয়।" এ কথাও লিখিত আছে যে, যে বৎসর মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য "তিলোত্তমাসম্ভব" প্রকাশিত হইতেছিল, "তার পর বৎসর দীনবন্ধুর প্রথম গ্রন্থ নীলদর্পণ প্রকাশিত হয়।" আমার মনে হয় যে, কবির এই প্রথম কাব্য, বঙ্গসাহিত্যের নবযুগের এই প্রথম প্রচারিত দৃশ্যকাব্য অতি অসাধারণ গ্রন্থ। ইহাও মনে করি যে, আজ পর্য্যন্ত "অঙ্ক" শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যে এমন একখানি কাব্যও প্রকাশিত হয় নাই, যাহা উহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। নীলদর্পণের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য্য ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে একবার বঙ্কিমবাবুর মন্তব্যটুকু বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করি।

বঙ্কিমবাবু নীলদর্পণ-প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর পরদুঃখকাতরতা, স্বদেশবৎসলতা ও নির্ভীকতার কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দীনবন্ধু দীনের বন্ধু ছিলেন, এবং প্রপীড়িতা মাতৃভূমির সেবায় তিনি তখন অগ্রগণ্য ছিলেন;—কবির নীলদর্পণ ইহার সাক্ষী; বঙ্কিম বাবুর মত মহৎ ব্যক্তি ইহার সাক্ষী; বঙ্গের নীলকরদিগের কলঙ্কিত ইতিহাস ইহার সাক্ষী। এ ত গেল কবির চরিত্রমাহাত্ম্যের কথা; ইহাতে কাব্যমাহাত্ম্য কিছু বলা হইল না। দীনবন্ধু "নীলদর্পণ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিয়াছেন", ইহা যথার্থ কথা। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যে এই গ্রন্থের গৌরব কতখানি, তাহা বলা হয় নাই। একেবারে যদি কিছু বলা না হইত, ক্ষতি ছিল না; কিন্তু বঙ্কিমবাবু যখন এই গ্রন্থের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের কথা বলিবার পর লিখিলেন যে, এ দেশে সামাজিক অনিষ্টের সংশোধনের উদ্দেশ্যে লিখিত কোনও কাব্যই ভাল হয় নাই, এবং হইতে পারে না, তখন একটু স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। ঐ কথাগুলি লিখিয়া তাহার পরে যখন নীলদর্পণের প্রশংসায় লিখিলেন যে, "গ্রন্থকারের মোহময়ী সহানুভূতি সকলই মাধুর্য্যময় করিয়া তুলিয়াছে", তখন বিষয়ের গুণে কাব্যের মনোহারিত্ব বুঝিলাম। ইংরেজি একটি বচনের অনুবর্ত্তিতায় বলিতে পারি যে, ইহাকে বলে,—"ক্ষীণ প্রশংসায় দমিয়ে দেওয়া।"

আদৌ বঙ্কিমবাবুর এই মন্তব্যটুকুই যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না যে, যে সকল কাব্য উদ্দেশ্য লইয়া রচিত হয়, "সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট; কারণ, কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।" যে ইউরোপীয় মন্তব্যের অনুবর্ত্তনে উহা লিখিত, তাহার মূল গেটের একটি বচনে। উহার অত দূর অর্থ করা সঙ্গত মনে করি না। যাহা সুন্দর নয়, তাহা যে কেবল ভাল সাহিত্য নয়, তাহাই নয়; সাহিত্যে অসুন্দর বা কুৎসিতের স্থানই নাই। কিন্তু যাহা "হিত" বা মঙ্গলের জন্য মূলতঃ বিকশিত, সে "সাহিত্য" যে "সংস্করণে"র উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইলে সুন্দর হইতে পারে না, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। যাহা অসুন্দর, কুৎসিত, নীচ ও অকল্যাণকর, তাহা দূর করিয়া দিয়া উৎকৃষ্ট সাহিত্যে অতি মহান, কল্যাণপ্রদ ও সুন্দর আদর্শ স্থাপিত হয়; আমরা সাহিত্যের আদর্শে মুগ্ধ হইয়া নীচতার প্রতি আসক্তি অতিক্রম করি।

একটা উদ্দেশ্যহীন খেয়াল লইয়া প্রকৃতির যে কোনও ছবি দর্পণে প্রতিফলিত করিয়া লইলেই, কাব্য গড়া যায় না; সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করা যায় না। যাঁহারা ছবি তুলিতে জানেন, ছবি কি তাহা বুঝেন, তাঁহারা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া যে কোনও দৃশ্য তুলিবার জন্যই "ক্যামেরা" পাতেন না। আমরা কোনও জিনিস সুন্দর দেখি কেন, সে তত্ত্বের একটা আলোচনা না করিলেও, এই সহজ কথাটা সকলেই বুঝিতে পারি, যেগুলি মনুষ্যত্বের কল্যাণময় বিকাশের ফল, তাহা আমাদের চক্ষে পরম সুন্দর; অকৃত্রিম স্নেহ সুন্দর, অচল ভক্তি সুন্দর, আত্মবিস্মৃত প্রণয় সুন্দর, নিঃস্বার্থ হিতৈষণা সুন্দর। কৃত্রিমতা, চপলতা, নীচতা ও স্বার্থপরতায় যেখানে ডুবিয়া থাকি, সেখানে কবি-সৃষ্ট সৌন্দর্য্য সংস্করণ ও উদ্ধারের কার্য্য সাধন করে। কবির সেই আদর্শসৃষ্টি একটা খেয়ালের ফলে নয়; যাহা সুন্দর, তাহাই সম্ভোগ্য ও হিতকর বলিয়া সে আদর্শ উপস্থাপিত হয়।

কাহারও মনে যদি কোনও সমাজ-সংস্কারের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে, তবে তিনি যাহা অকল্যাণকর ও অসুন্দর, তাহার পরিবর্ত্তে যাহা জীবনপ্রদ ও সুন্দর, তাহাই স্থাপন করিতে চাহেন। সেই উদ্দেশ্যটাই যখন সুন্দর, তখন কাব্য-কৌশলের অভাব না থাকিলে, সেই উদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য কেন যে সুন্দর করিয়াই প্রদর্শন করা যাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। দুঃখপ্রপীড়িত পথভ্রান্ত মানবের পরমকল্যাণকামনায় ভগবান বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা উদান গ্রন্থে পাই; উদানে যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, জগতের কোন্ সাহিত্যে তাহা আছে? নিঃস্বার্থ মঙ্গলকামনার মত সুন্দর যখন কিছুই নাই, এবং সংস্করণের উদ্দেশ্য যখন তাহাই, তখন সে উদ্দেশ্যকে কাব্য-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির পরিপন্থী বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না। যদি শিল্প-চাতুর্য্য না, থাকে, তবে খেয়ালেই হউক, উদ্দেশ্য লইয়াই হউক, কিছুতেই কাব্যের সৌন্দর্য্যবিধান সম্ভব হয় না।

নীলকরেরা যে ভীষণ অত্যাচারে বাঙ্গালার প্রজাবর্গকে পিষিয়া মারিতেছিল, দীনবন্ধু যে তাহার প্রকৃতি ছবি আঁকিয়াছেন, এ কথা বঙ্কিম বাবু স্বীকার করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পল্লীচিত্র ও চাষার জীবনের সহিত দীনবন্ধুর মত অল্প লোকই সুপরিচিত ছিলেন, এবং দীনবন্ধু "ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যার, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সীর ও তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজার নাড়ী নক্ষত্র

জানিতেন।" তাহা হইলে, নীলদর্পণে উপস্থাপিত চিত্রগুলি যে প্রকৃতির মুখের উপর দর্পণ ধরিয়া অঙ্কিত, তাহাতে সন্দেহ রহিল না। তবে ঐ ছবিগুলি কাব্যের উপযোগী হইয়া চিত্রিত হইয়াছে কি না, তাহা দ্রষ্টব্য।

নাটকের রঙ্গমঞ্চখানি পল্লীর চিত্রপট দিয়া সাজানো। ঘরে বসিয়া পড়িবার সময়েই হউক, আর অভিনয় দেখিবার সময়েই হউক, যদি মনে হয় যে, আমরা যথার্থ পল্লীর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, তবে রঙ্গমঞ্চখানি সুরচিত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে। আমি পল্লীগ্রামবাসী; এবং আমাদের সেই ক্ষুদ্র পল্লীর নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রাম বহু দিন নীলকরের দখলে ছিল। আমি যখনই নীলদর্পণ পড়ি, বা উহার অভিনয় দেখি, তখনই সহর নগর ভুলিয়া, পল্লীবাসী কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াছি বলিয়া অনুভব করি। মহানগরীর সৌধমালার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথ যখন পল্লীর মাধুর্য্য বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার মনোহর বর্ণনায় একটা কবিসৃষ্ট সৌন্দর্য্যময় রাজ্যে প্রবেশ করি। কিন্তু ঠিক পল্লীচিত্রটি ফুটিয়া উঠে না। "বামেতে মাঠ", "ডাহিনে বাঁশবন", এবং তার মাঝখানে "পথ সে বাঁকা", এবং সেই পথ দিয়া "কলসী লয়ে কাঁখে", কবির চিত্রিত বধূ যাইতেছেন; মালমশলা সবই আছে, তবুও পল্লীভ্রান্তি হয় না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" গ্রন্থে দুই একটি কথায় তর্কভূষণের পরিবার ও পল্লী এমন ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, পল্লীবাসী ও পল্লীপ্রিয় পাঠকেরা সে সকল পড়িতে পড়িতে বাল্যলীলাভূমিতে বিচরণ করেন। ক্ষেত্রমণি ও রেবতী যখন জল নিয়ে আসে, রাইচরণ যখন লাঙ্গল হাতে করিয়া যায়, সৈরিন্ধ্রী যখন চুলের দড়ী বিনায়, সরলা যখন আদুরীর সঙ্গে রহস্যালাপ করে, তখন কাহার সাধ্য যে, ভুলিয়াও একবার সহরের কথা ভাবিতে পারে? প্রাকৃতিক ছবির এই সমাবেশই কি যথার্থ শিল্পচাতুর্য্য নয়?

রঙ্গমঞ্চের পরে অভিনেতৃগণের প্রতি দৃষ্টি করিব। বঙ্কিমবাবু অতি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে,—"যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে।" বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম বাবুর রায়, হাইকোর্টের শেষ নিষ্পত্তির মত। এই এক কথায় নীলদর্পণের গৌরব একবারে মাটী হইয়া যায়। অঙ্ক শ্রেণীর দৃশ্য-কাব্যে করুণ রস স্থায়ী হইলেই কাব্য সার্থক হয়। সমগ্র নাটকখানি

পড়িয়া উঠিবার পর যে সে ভাব ঐ কাব্যে ও পাঠকের মনে সম্পূর্ণ স্থায়ী হয়, এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারি। বন্ধুবর্গের সঙ্গে বসিয়া গ্রন্থখানি পড়িয়াছি; অভিনয়ে বহু দর্শকের মনের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি; তাহাতে উহার করুণরসাত্মক ভাবের অভিব্যক্তিই অনুভব করিয়াছি। আমরা কেহ বঙ্কিমবাবুর মত রসজ্ঞতার দাবী করিতে পারি না, কিন্তু আমাদের মত সাধারণ পাঠকেরাও যদি নীলদর্পণ পড়িয়া দলে দলে অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তবে নীলদর্পণে করুণ রসের অভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। সমষ্টিভাবে সমগ্র গ্রন্থে যে রস স্থায়ী, তাহা যে নাটকের প্রযুক্ত পাত্রে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা কিরূপে স্বীকার করিব? অত্যাচারীর নিষ্পেষণে নিরীহ গ্রামবাসীরা যে ভাবে ধনে প্রাণে মারা যাইতেছে, বঙ্কিম বাবু তাহা ত অপ্রাকৃতিক চিত্র বলেন নাই; তবে কি কারণে বলিব যে, ঐ চিত্রগুলি করুণরসরঞ্জিত তুলিকায় অঙ্কিত নহে?

সাবিত্রী ও সৈরিন্ধ্রীর নীরব আত্মত্যাগে ও পতিপুত্রসেবায় যে ছবি পাই, তাহা কোমল, মধুর ও অকৃত্রিম বলিয়াই বুঝি। গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সাবিত্রীর দুর্দ্দশা ও সুকোমলা গৃহবধূ সরলার দুঃখে যদি অতি কোমল অকৃত্রিম করুণভাব না থাকে, তবে বঙ্গসাহিত্যে উহা কোথায় আছে, জানিতে চাই। হাঁ ও না লইয়া তর্ক চলে না; নাটকের সমগ্র দৃশ্যও তুলিয়া দেখাইবার উপায় নাই। পাঠকেরা নিজে নিজে পড়িয়া বলুন যে, বঙ্কিম বাবু কঠোর সমালোচনা উপযুক্ত হইয়াছে কি না? চাষার মেয়ে ক্ষেত্রমণির সতীত্ব-মাহাত্ম্য যে "স্থূল" কথায় প্রকাশিত, তাহার মধ্যে কি অতি "সূক্ষ্ম" সৌন্দর্য্য নাই? গরীবের মেয়ের অতি কোমল, মধুর, অকৃত্রিম ও প্রশান্ত পতিভক্তি যেখানে পদদলিত হইতেছে, সেখানকার করুণ রসে সিঞ্চিত হইলে, অত্যাচার-সংহারের জন্য মনে যে তেজ সংক্রামিত হয়, তাহাকে কোন্ রসের অভিব্যক্তি বলিব?

(২) লীলাবতী।—বঙ্কিম বাবু এই সুরচিত নাটকখানি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"লীলাবতী বিশেষ যত্নের সহিত রচিত, এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব-সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে।" এই প্রশংসার পর আবার অপর স্থানে আছে যে, "লীলাবতী"র চিত্র জীবন্ত নয়, বরং ঐ চরিত্র "বিকৃত"। "লীলাবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকার সম্বন্ধে তাঁহার (দীনবন্ধু) কোন

অভিজ্ঞতা ছিল না —কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গালা সমাজে ছিল না। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টসিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না—কেবল আজ কাল নাকি দুই একটা হইতেছে শুনিতেছি।......দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যের নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই।” দীনবন্ধু প্রাচীন সংস্কৃত ছাঁচে কিংবা হালের ইংরাজী ছাঁচে লীলাবতী ঢালিয়াছিলেন কি না, বিচার করিয়া দেখিব।

যাহা “আজকাল না কি দু একটা হইতেছে” বলিয়া বঙ্কিম বাবু কেবল দূর হইতে শুনিয়াছিলেন, তাহা যে ঠিক্ বঙ্কিম বাবুর নিকট ঐ অস্বাভাবিক জনশ্রুতি পঁহুছিবার দিন কি তৎপূর্ব্ব দিন ঘটিয়াছিল, তাহা নয়। এ দেশের অনেক লোক যে স্ত্রীশিক্ষা ও একটু বেশী বয়সে মেয়ের বিবাহ দিবার জন্য অনেক পূর্ব্ব হইতেই উদ্যোগ ও সংকল্প করিয়া আসিতেছিলেন, দীনবন্ধুর পূর্ব্ববর্ত্তী “পুরাণ দলের শেষ কবি” ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও তাহা জানিতেন। গুপ্ত কবি তাঁহার অবজ্ঞার জিনিসটা একটা দূরে শোনা কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই; তিনি তাহার বিরুদ্ধে কলম ধরিয়া পরিহাস করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

“আগে মেয়েগুলো ছিল ভাল ব্রত ধর্ম্ম কর্‌ত সবে ;
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন্ পাবে ?
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে,
তখন্ এ. বি. শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল্ কবেই কবে।”

দীনবন্ধু বহুদর্শী ছিলেন ; সকল শ্রেণীর লোকের সহিতই তিনি মিশিতেন ; এ কথা বঙ্কিম বাবু বার বার লিখিয়াছেন। যে সকল পরিবারে “ধেড়ে মেয়ে” পোষা ও স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছিল, সে সকল পরিবারের অনেকগুলির সহিতই দীনবন্ধু মিত্রের মিত্রতা ছিল। ইহার প্রমাণ যথেষ্ট আছে। তবে সুরধুনী কাব্যখানির সাক্ষ্যেই সে কথা বলিতে পারি। যাহা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অতি অল্পসংখ্যক পরিবারে বদ্ধ ছিল বলিয়াই যে নাটকের প্রতিপাদ্য নহে, তাহা কেহ বলিতে পারেন না। এই যে নূতন শিক্ষার স্রোতে নূতন ভাব ধীরে ধীরে সমাজে প্রবেশ করিতেছিল, তাহার শুভ অশুভ ফলের কথা সকলেই ভাবিতেন। সেই নূতনত্বটুকু প্রাচীন

সমাজের মধ্যে খাপ্ খাইতেছিল কি না, শিক্ষার ফলে প্রাচীনতার দিকে নূতনেরা কি প্রকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এ কথা নাটকের বিশেষ আখ্যানবস্তু মনে করি। ঐ প্রথা যদি অবজ্ঞার জিনিসও হয়, তবুও উহার একটা প্রভাব সমাজের উপর যে ভাবে পড়িতেছিল, তাহাও প্রদর্শিত হইতে পারে। বিলাত ফিরিয়া আসিয়া যদি কেহ সাহেব সাজে, এবং রেবেকা সংগ্রহ করিয়া আনে, তবে তাহার কথা নাটকে লিখিলে কি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অস্বাভাবিক কথা লিখিতেছেন, বলিব?

লীলাবতীকে হিন্দুর ঘরে ঠিক হিন্দুর মেয়ের মতই দেখিতে পাই। তবে সে লেখা পড়া শিখিয়াছে, এবং শৈশব অতীত হইবার পূর্ব্বে বিবাহিতা হয় নাই। ঠিক এই অবস্থায় হিন্দুর ঘরে ও কৌলীন্য প্রথার মাঝখানে, প্রাকৃতিক ভাবে যাহা ঘটিতে পারে, দীনবন্ধুর গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত দেখি। দীনবন্ধু ঐ প্রথাকে অবজ্ঞার জিনিস মনে করেন নাই বলিয়া, "ধেড়ে মেয়ে" গোছের কথাগুলি গুলির আড্ডার লোকের মুখেই দিয়াছেন। বিরোধ-বাদেও দীনবন্ধু শিষ্টাচারের পরিহার করিতেন না; ভদ্রলোকের মেয়ের কথা সসম্মানেই উল্লেখ করিতেন।

ললিতমোহন ও লীলাবতীতে বিলাতী ধরণের কোর্টসিপ্ চলিত, এ কথা বঙ্কিম বাবু কোথায় পাইলেন? তিনি দীনবন্ধুর গ্রন্থ যথেষ্ট পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সমালোচনা লিখিবার সময়ে হয় ত স্মৃতির উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন। হিন্দুর গৃহের কুমারী কন্যার সহিত স্বাভাবিক ভাবে যাহাদের সঙ্গে দেখা শুনা হয়, তাহাদের সঙ্গেই হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় বয়ঃপ্রাপ্তা শিক্ষিতা কুমারী পরিবারের কোনও বন্ধু যুবকের প্রতি যদি আকৃষ্টা হয়, তবে তাহাতেও কিছু অস্বাভাবিকতা নাই। বিবাহের উদ্যোগে যে কোর্টসিপ্ হয় নাই, তাহা স্পষ্ট করিয়াই বুঝান আছে; ললিতমোহন ও লীলাবতী বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও জানিতেন না যে, তাঁহাদের এক জনের অনুরাগের কথা অপরে জানিতেন। আর যে দোষ থাকে থাকুক, বর্ণনায় অস্বাভাবিকতা দীনবন্ধুর রচনায় কুত্রাপি নাই।

দীনবন্ধুর সময়ের অনুষ্ঠিত প্রথার প্রতি যে কবির অনুরাগ ছিল, তাহা বুঝিতে পারি। সেই জন্যই শিক্ষিতা বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী তাঁহার গ্রন্থের নায়িকা, এবং সেই জন্যই সুশিক্ষিতা ধর্ম্মপ্রাণা শারদাসুন্দরী তাঁহার নাটকে

আদর্শ মহিলা। মহিমময়ী শারদাসুন্দরী তাঁহার কুশিক্ষিত ও শিথিলচরিত্র স্বামীর চরণে প্রেমভক্তি ঢালিয়া তাঁহাকে সুপথগামী করিয়াছিলেন। এ আদর্শ ইংরাজি ছাঁচে ঢালা নয়। শারদাসুন্দরী স্বামীর মুক্তিমণ্ডপের সংবাদ জানিতেন; ভ্রমরের মত ক্ষীরী দাসীর মুখে শোনেন নাই; কুসংসর্গের কথা সুস্পষ্টই জানিতেন; রোহিণীর মিথ্যা ছলে জানিয়া লইতে হয় নাই। তবুও তিনি অনুরাগিণী হইয়া স্বামীকে টানিয়া ধরিয়া ভাল করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইংরেজি ছাঁচ, ইংরেজি প্রেম, ইংরেজি কোর্টসিপ্, বরং নব-বঙ্গ-সাহিত্যের কর্ণধারের রচনায় বেশি লক্ষ্য করিতে পারি। যখন অতুল-প্রতিভাশালী বঙ্কিমচন্দ্র আইভানহোর ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্গে নূতনবিধ সরস কথাগ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ ফুটাইবার জন্য রাজপুতের পরিবার অবলম্বন করিয়াছিলেন। জোর করিয়া অতি সম্ভ্রান্ত মুসলমান নবাবের ঘরের মেয়েকে বন্দীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া, খাঁটী ইউরোপীয় ধরণের প্রেমের প্রগল্‌ভতায় ওস্‌মানকে দশ কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন। প্রথম সময়ের গ্রন্থগুলি লিখিবার সময়ে বঙ্কিম বাবুর ভাষাও ইংরেজিগন্ধি ছিল। "যদি তন্মুহূর্ত্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতেন না।" এ ভাষা বঙ্কিম বাবুর পরবর্ত্তী গ্রন্থে অবশ্যই নাই।

বঙ্কিমবাবু অবজ্ঞার সহিত যে সমাজের "ধেড়ে মেয়ে"র সংবাদ শুনিয়াছিলেন, সে সমাজের ধেড়ে মেয়ে লইয়া কবি রবীন্দ্রনাথ "নৌকাডুবি" লিখিয়াছেন। উহাতে সরল, স্বাভাবিক ও পবিত্র ভাবে কোর্টসিপেরও বর্ণনা আছে। ঐ বর্ণনা যে জাতীয় সাহিত্যের জঞ্জাল নয়, বরং অলঙ্কার, তাহা যে কোনও পাঠক পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিমবাবু যদি নূতনের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া দূরে না থাকিতেন, তবে আমাদের সামাজিক অবস্থা হইতেই অনেক উপাদান পাইতেন; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রাজপুতের অন্দরমহলের সংবাদ লইতে হইত না।

এ কালের মেয়েরা রাত্রিকালের ধামাচাপা ভাত পাথার বাতাসে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলে না বলিয়া, তিনি এ কালের মাথার উপর যত দিন বাজ পড়িবার আদেশ দেন্ নাই, তত দিন তিনি ইউরোপের আদর্শকেই ঘষিয়া মাজিয়া স্বদেশী করিতেছিলেন। যে যুগে তাঁহার 'সাম্য' রচিত, সেই

যুগেই বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর সকল কথাগ্রন্থই সুমিষ্ট, সুপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ হইলেও, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া আমার ধারণা। বিষবৃক্ষে একটি আদর্শ রমণীচরিত্র গড়িতে কাব্যশিল্পীকে কত চেষ্টাই না করিতে হইয়াছে। বড়মানুষ জমীদারের ঘরে একটা অতিরিক্ত উপসর্গ জুটিলে গৃহিণীটি বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়া যান না; হিন্দু নারীর সামাজিক শিক্ষায় এ শ্রেণীর অসূয়া ও অভিমান জন্মে না। তাহা না জন্মাইলেও ঠিক্ এ কালের রুচির মত পারিবারিক ট্রাজিডি ঘটাইতে পারা যায় না। এই জন্য শিল্পদক্ষ বঙ্কিম প্রথমতঃ নগেন্দ্রনাথকে সুশিক্ষিত জমীদার করিয়াছেন; এবং সে পরিবারে কিংবা নিকটবর্ত্তী সমাজে তাঁহার অভিভাবকের শ্রেণীর কোনও লোক পর্য্যন্ত রাখেন নাই। বাড়ীতে যে সকল স্ত্রীলোক থাকিত, তাহারা কেহ সূর্য্যমুখীর কাছে যাইতে সাহস করিত না। অর্থাৎ, নগেন্দ্রনাথ ও সূর্য্যমুখী সম্পূর্ণরূপে দশ জনের সংস্রব ও মতের প্রভাব হইতে দূরে থাকিতেন। সেই স্থানে পত্নীবৎসল নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীকে গাড়ী হাঁকাইতে দিতেন, সর্ব্বস্বের উপর আধিপত্য করিতে দিতেন। তাই সূর্য্যমুখী সহিতেই পারিলেন না যে, যে গৃহে তিনি ও তাঁহার স্বামী তুল্যরূপে প্রভু, যে শয্যা "তাঁহার", সে গৃহ ও সে শয্যা অন্যা কি করিয়া কলুষিত করিবে। বঙ্কিমচন্দ্র কৌশলপূর্ব্বক সূর্য্যমুখীকে এ কালের মত করিয়া নূতন আদর্শে গড়িয়া লইয়াছিলেন। স্বামী যখন অন্যার প্রতি অনুরাগী, তখন সে যেন একেবারে সংসার হইতে মুছিয়া গিয়াছে। ভাবের এই তীব্রতা আর দশটি কমলমণির সঙ্গে বাস করিলে জন্মিত না। বঙ্কিমচন্দ্র অসাধারণ কাব্যকৌশলে নূতন ছাঁচের জিনিসটি স্বাভাবিক ও সুন্দর করিয়া গড়িতেন। এ সংসারে তাহার কেহ ছিল না, এমনি করিয়া কুন্দনন্দিনীটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়াই সে জমীদারের ঘরে আশ্রিতা ছিল। সুযোগের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া, নগেন্দ্রনাথ বাপীতটে খাঁটী ইউরোপীয় ধরণে কুন্দকে 'কোর্ট' করিতে পারিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু সুকৌশলে বিলাতী ছাঁচ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু দীনবন্ধু সর্ব্বদাই স্বদেশের ছাঁচ বজায় রাখিয়া নূতন উন্নত ভাব ফুটাইতেন। নারী জাতি কেবলমাত্র উপভোগের পদার্থ নয়, তাঁহাদের একটা মাহাত্ম্য ও মর্য্যাদা আছে, তাঁহাদের শিক্ষার প্রভাবে গৃহ উজ্জ্বল হয়, সমাজ পবিত্র হয়; এ আদর্শ দীনবন্ধুর পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে

কেহ স্থাপন করিয়াছেন কি ? তাঁহার হাস্যরস ও নাটকের চরিত্রবৈচিত্র্যের মধ্যে কুত্রাপি এমন কিছু নাই, যাহা অসাধু, অকল্যাণকর, কিংবা নারীজাতির মাহাত্ম্যের বিরোধী। এ সকল কথা বিশেষ করিয়া পরে বলিবার সুবিধা পাইব।

(৩) সুরধুনী কাব্য।—বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন যে, সুরধুনী কাব্য যাহাতে প্রচারিত না হয়, "আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই।" যে বিষয়ের বর্ণনায় ঐ কাব্য লিখিত, তাহাতে উহা খুব উচ্চদরের খণ্ডকাব্য হইতেই পারে না। দীনবন্ধু নিজে যে ঐ কাব্যখানি কাব্যকৌশলের একটা বিশেষ সৃষ্টি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না। তবে কেন যে তিনি বঙ্কিমবাবুর মত বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করেন নাই, কাব্যখানি পড়িলেই তাহার কারণ বুঝিতে পারি। সে কথা পরে বলিতেছি। কাব্যখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন রেবরেণ্ড লালবিহারী দে উহার নিন্দা করিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। সে সমালোচনায় কবির ছন্দ ও ভাষার দোষের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হয় নাই। এ নিন্দার কোনও মূল্য নাই; কারণ, দীনবন্ধুর ভাষা সর্ব্বত্রই সুমার্জ্জিত, এবং ছন্দ অতি নির্দ্দোষ। শ্রীযুত রমেশচন্দ্র দত্ত যথার্থই বলিয়াছেন যে, কোথাও ছন্দঃ-পতন হওয়া দূরে থাকুক, বরং সুরধুনীর মত উহার ধারা বহিয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয়ান রেবরেণ্ড হয় ত "সুরধুনী" নামের কাব্য দেখিয়াই বিরক্ত হইয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে সিঁদুরে মেঘের ভয় অত্যন্ত অধিক। এই গ্রন্থে অনেক কৃতী ব্যক্তির প্রশংসায় তাঁহার ঈর্ষ্যাও হইয়াছিল, ইহাও অনুমান করা যায়।

গঙ্গাকে ভগীরথ আনিয়াছিলেন কুলপাবনের জন্য; কিন্তু দীনবন্ধু সেই বঙ্গসৌভাগ্যবিধায়িনী তটিনীর কূলে কূলে বহু শতাব্দীর নির্জীবতার পর নবজীবন-সঞ্চার দেখিয়া, সেই নবজীবন-মাহাত্ম্যের বর্ণনা করিবার জন্য গঙ্গাস্রোতকে আহ্বান করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু স্বদেশবৎসল ছিলেন; স্বদেশের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা উৎসুক ছিলেন। তাই তিনি যখন দেখিতেছিলেন যে, নূতন সভ্যতার দীপ্তিতে দেশ ঝলসিয়া না গিয়া, আবার মাথা তুলিতেছে, তখন গঙ্গাবাহিনী ধরিয়া নব দেশের নূতন বর্ণনা লিখিয়াছিলেন। 'বাসুদেব সার্ব্বভৌম হইতে আরম্ভ করিয়া নবীন সমাজ-

সংস্কারক পর্য্যন্ত সকলের কথাই সাগ্রহে ও সোৎসাহে লিখিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মা নব-বঙ্গে নবজীবন দিয়াছেন, কবি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদের মহিমা গাহিয়াছেন;—রামগোপাল, রসিককৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, রামতনু, কৃষ্ণমোহন, রাজেন্দ্রলাল, মধুসূদন, নবীনকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ, কেশবচন্দ্র, ইঁহারা সকলেই সগৌরবে উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রাণ খুলিয়া সমকালের লোকদিগকে মহাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। যাঁহারা হতভাগ্য বঙ্গের উন্নতিকল্পে একখানি ভাল নূতন ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, স্বদেশবৎসল তাঁহাদের নাম করিতেও ভুলেন নাই। যিনি তাঁহার কাব্যের নিন্দা করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ভাগে তাঁহার প্রশংসা করিতেও বিস্মৃত হয়েন নাই; প্রথম ভাগে কৃষ্ণমোহনেরও প্রশংসা ছিল। দীনবন্ধুর মত গুণগ্রাহী উদারচরিত ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। সুরধুনী কাব্যখানি কবির উৎকৃষ্ট কাব্যশিল্পের সাক্ষী না হউক, উহা তাঁহার পবিত্রতা, স্বদেশবৎসলতা ও উদারতার অক্ষয় সাক্ষী।

ভোঁতারাম ভাটের প্রতি প্রযুক্ত পরিহাসে যখন কিছুমাত্র তীব্রতা নাই, এবং কবি যখন লালবিহারীর গুণকীর্ত্তনেও অকুণ্ঠিত, তখন, অন্যায় সমালোচনার প্রতি একটা কটাক্ষকে দীনবন্ধুর চরিত্রের "ক্ষুদ্র কলঙ্ক" রূপেও বর্ণনা করিতে পারা যায় না।

বঙ্কিম বাবুর চতুর্থ আপত্তি, কবির রুচি বিষয়ে। সে বিষয়ে বারান্তরে কিছু লিখিবার ইচ্ছা রহিল। যখন সমগ্র গ্রন্থের সমালোচনা সাধারণ ভাবে করিব, রুচির কথা তখন বলাই সঙ্গত হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাজা কৃষ্ণ রাও খটাওকর।

Kishen Rao Kuttaokar, a Brahmin, raised by the Moghuls, took post in the country about the Mahadeo hills and without joining either party, plundered the districts on his own account. ....Two expeditions were prepared at Sattara,—the one under the Pieshwa, Byhroo Punt............and the other, commanded by Ballajee Wishwanath, was ordered to suppress Kishen Rao Kuttaokur. This Brahmin

had become so bold and confident that he marched to Ound to meet Shahoo's troops, but he was totally defeated, principally by the bravery of Sreeput Rao.........Kishen Rao, after perfect submission, was pardoned, and received the village of Kuttao in *enam*, a part of which is still enjoyed by his posterity.—*Grant Duff's History of the Marathas. Chapter XII. p. 193.*

জেতৃজাতি কর্ত্তৃক বিজিত জাতির ইতিহাস লিখিত হইলে, তাহা কিরূপ সংক্ষিপ্ত, নীরস ও বিকৃত হইয়া থাকে, রাজা কৃষ্ণ রাও খটাওকরের উপরি-উদ্ধৃত বিবরণটি তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। অওরঙ্গজেবের সেনাদলের সহিত ত্রিংশবর্ষকাল অনবরত যুদ্ধ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বাধীনতা লাভ করিলে, মহারাজ শাহু মোগলদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। তাঁহার বন্দী অবস্থায় তদীয় পিতৃব্যপুত্র মহারাষ্ট্র-সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শাহুর আগমনে রাজ্যের অংশ লইয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে কলহ উপস্থিত হয়। মহারাষ্ট্র সর্দ্দারগণও দুই দলে বিভক্ত হইয়া উভয় ভ্রাতার পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। এই কলহে পরিশেষে শাহুর পক্ষই জয়যুক্ত ও প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সামান্য রাজ্যাংশ লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে বাধ্য হন। রাজা কৃষ্ণ রাও খটাওকর রাজবংশের পূর্ব্বোক্ত কলহে যোগদান না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে স্বীয় অধিকার-সীমার বিস্তারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্যকে ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ "লুণ্ঠন" নামে অভিহিত করিয়াছেন! তাঁহার পরিচয়প্রসঙ্গে গ্রাণ্ট ডফ লিখিয়াছেন,—

"কৃষ্ণ রাও খটাওকর জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মোগলেরা তাঁহার পদোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি মহাদেও পর্ব্বতের আশ্রয়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, এবং রাজবংশের কলহে যোগদান না করিয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠন করিয়া আত্মশক্তির বৃদ্ধি করিতেছিলেন। মহারাজ শাহু তাঁহার দমনের জন্য বালাজী বিশ্বনাথের অধীনতায় এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ রাও ইহাতে ভীত না হইয়া বালাজী বিশ্বনাথের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের পরিচালিত সৈন্যদলের অন্যতম সেনানী শ্রীপতি রাওয়ের শৌর্য্যপ্রভাবে কৃষ্ণ রাওয়ের পরাভব ঘটে। তিনি সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিলে মহারাজ শাহু তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া খটাও প্রদেশটি পুরস্কারস্বরূপ দান করেন।"

স্বীয় গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের একটি পাদ-টীকায় গ্রাণ্ট ডফ লিখিয়াছেন,—১৬৮৮।৮৯ সালে মোগলদিগকে মহারাষ্ট্র-বিজয় কার্য্যে বিশেষরূপে সহায়তা করিয়া কৃষ্ণ রাও প্রথমতঃ "রাজা" ও পরে "মহারাজা" উপাধি সহ "খটাও" পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত হন।

জেতৃজাতীয় লেখকের রচিত ইতিহাসে কৃষ্ণ রাওয়ের চরিত্র এইরূপ কৃষ্ণ বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যে দোষসংস্পর্শশূন্য ছিল, এমন কথা কেহই বলেন না। কিন্তু দেশীয় ইতিহাসলেখকের সংগৃহীত বিবরণে কৃষ্ণ রাওয়ের চরিত্রে অনেক সদ্‌গুণ স্থানলাভ করায়, উহা যেরূপ সরস, চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে, ডফের অঙ্কিত চরিত্র সেরূপ হয় নাই। পক্ষান্তরে, গ্রাণ্ট ডফের বর্ণনার শেষাংশ ঐতিহাসিক সত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। দেশীয় লেখকের বর্ণিত কৃষ্ণ রাওয়ের চরিত্র এইরূপ,—

খটাও প্রদেশের মহারাজ কৃষ্ণ রায়ের পূর্ব্বপুরুষেরা কর্ণাটক প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতামহ রাঘব পণ্ডিত বিদ্বান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাঘব পণ্ডিতের পুত্র ভগবন্ত রাও পৈতৃক বৃত্তি-পরিত্যাগ করিয়া গোলকোণ্ডার সুলতানের অধীনতায় কর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক হায়দ্রাবাদে গিয়া বসতি করেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র তুরগ-বাহিনীর নায়কতা করিতেন। তৎপুত্র কৃষ্ণ রাও বাল্যকালে পিতামহের নিকট থাকিয়া ন্যায় ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরে পিতার নিকট আসিয়া তিনি ক্ষাত্র-চর্য্যা শিক্ষা করেন। ভগবন্ত রায়ের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ রাও সুলতানের তুরগ-সেনাদলে প্রবেশ-লাভ করিয়া স্বীয় কার্য্য-দক্ষতা-গুণে শীঘ্রই উন্নতিপথে পদার্পণ করিলেন। সেই সময়ে 'খটাও' পরগণায় সুলতানের যে কর্ম্মচারী ছিল, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মোগলদিগের পক্ষাবলম্বন করে। এই বিশ্বাস-ঘাতক কর্ম্মচারীকে দণ্ডিত করিবার ভার সুলতান কৃষ্ণ রাওয়ের প্রতি অর্পণ করেন। কৃষ্ণ রাও এক দল তুরগ-সেনা লইয়া খটাও প্রদেশ আক্রমণ করিয়া বিশ্বাসঘাতকের প্রাণসংহার করিলেন। তাঁহার এই কার্য্যে প্রীত হইয়া সুলতান খটাও প্রদেশটি কৃষ্ণ রাওকে জাইগীর-স্বরূপ দান করেন।

ইহার পর অওরঙ্গজেবের সেনাদল খটাও প্রদেশের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিলেও, কৃষ্ণ রাও বহু দিন পর্য্যন্ত স্বীয় জাইগীরের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি হায়দ্রাবাদ অঞ্চলেও কিছু

জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরে দক্ষিণাপথে মোগলদিগের শক্তি অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগের আনুগত্য স্বীকার করেন। তখন হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের জাইগীর তাঁহার হস্তচ্যুত হয়।

মোগল সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছত্রপতি মহারাজ শিবাজী একদা কৃষ্ণ রাওয়ের স্বজাতি-বাৎসল্য-বশে পলায়ন-পূর্ব্বক আত্মরক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্র দেশে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, তাহার সুযোগে কৃষ্ণ রাও স্বীয় জাইগীরের সীমাবর্দ্ধনপূর্ব্বক প্রথমে 'রাজা' ও পরে 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করেন। পরিশেষে অওরঙ্গজেবকেও তাঁহার এই উপাধির ন্যায্যতা স্বীকার করিতে হয়। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী বিপ্লবে কৃষ্ণ রাও স্বীয় রাজ্যের সীমা বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত করিতে সমর্থ হন। সেই সময়ে ইঁহার রাজ্যের বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা হইয়াছিল। খটাও নগরে ইনি একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণাপথে মোগলদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইবার পর তিনি আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তারা বাঈর (মহারাজ শাহুর পিতৃব্যপত্নীর) সেনাদল তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলে, তিনি সম্মুখসমরে তাহাদিগের পরাজয় সাধন করিয়া স্বীয় স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। তিনি মহারাজ শাহুর প্রাধান্য স্বীকার করিতে চাহেন নাই।

কৃষ্ণ রাও মধ্বাচার্য্যের মতানুযায়ী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ক্ষাত্র-চর্য্য অবলম্বন করিয়াও তিনি পাণ্ডিত্য-গৌরব নষ্ট হইতে দেন নাই। তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও বিষ্ণুসহস্রনামের দ্বৈতমতানুসারিণী টীকা ও একখানি বীররসাশ্রিত সংস্কৃত কাব্যের রচনা করিয়াছিলেন। কবিবৎসল ও পণ্ডিতদিগের আশ্রয়দাতা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। খটাও প্রদেশ মহারাজ শাহুর রাজধানী সাতারা সহর হইতে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। রাজধানীর এত নিকটে থাকিয়াও কৃষ্ণ রাও মহারাজ শাহুর সার্ব্বভৌম শক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিতেন। এই কারণে তাঁহার দমন করা শাহুর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বালাজী বিশ্বনাথকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কৃষ্ণ রাও বালাজীর অভিযানের সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে বাধা দান করিবার জন্য 'খটাও' ত্যাগ-পূর্ব্বক সসৈন্যে পঞ্চ ক্রোশ অগ্রসর হইয়া আসেন। বালাজী

প্রথমে তাঁহাকে খটাও পরগণার অন্তর্ভুক্ত ৪০ খানি গ্রাম জাইগীর-স্বরূপ রাখিয়া তাঁহার অধিকৃত অবশিষ্ট ভূভাগ মহারাজ শাহুকে প্রদান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ রাও সে প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে অসীম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণ রাও নিহত হইলেন; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রও সাংঘাতিকরূপে আহত হওয়ায় তাঁহার সৈন্যদল পলায়ন-পর হইল। তদ্দর্শনে কৃষ্ণ রাওয়ের পুত্র-বধূ রণ-রঙ্গিণীবেশে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ছত্র-ভঙ্গ সৈন্যগণকে আশ্বাসদান করিয়া পুনরায় ব্যূহিত করিলেন। এই বীর-রমণী মুমূর্ষু স্বামীর ক্ষত-স্থানসমূহ স্বহস্তে বন্ধন করিয়া তাঁহাকে হস্তি-পৃষ্ঠে স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং ধনুর্ব্বাণহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং সেনা-দলের অগ্রভাগে হস্তিচালনা করিয়া শত্রু-পক্ষের উপর অনবরত শর-বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ আরব্ধ হইল। কিন্তু সৈন্যসংখ্যার অল্পতা-হেতু এই বীর-রমণীকে বালাজীর সৈন্য-দলের হস্তে বন্দিনী হইতে হয়। ইত্যবসরে কৃষ্ণ রাওয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও জীবন-লীলার অবসান হয়। তখন সেই বীর-রমণী জয়শালী শত্রুর নিকট পতির অনুগমন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। বালাজী বিশ্বনাথ তাঁহার শৌর্য্যের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া তাঁহার চিতারোহণের সমস্ত আয়োজন করিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই পবিত্র সমর-ভূমির মধ্য-স্থলে সতীর দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেল! অতঃপর বালাজী বিশ্বনাথ খটাও প্রদেশে মহারাজ শাহুর বিজয়-কেতন উড্ডীন করিয়া সাতারায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কৃষ্ণ রাওয়ের অবশিষ্ট দুই পুত্র শাহুর শরণাপন্ন হইলেন, মহারাজ তাঁহাদিগকে খটাও প্রদেশ জাইগীর-স্বরূপ দান করিলেন। তদবধি তাঁহারা মহারাজ শাহুর সর্দ্দার-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেন।

দেশীয় ইতিহাসলেখকের অঙ্কিত এই চরিত্রের সহিত গ্রাণ্ট ডফের অঙ্কিত চরিত্রের কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! ডফ অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষগণের ন্যায় ব্রাহ্মণসন্তান কৃষ্ণ রাওকেও অকাতরে ধর্ম্মজ্ঞানহীন সমাজদ্রোহী দস্যুরূপে চিত্রিত করিয়াছেন! দেশীয় লেখকের তুলিকায় তাঁহার যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা তাঁহার দোষগুণের সমান বিকাশ দেখিতে পাই।—সে চিত্রে তদানীন্তন মহারাষ্ট্রসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থারও প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়াছে। ডফের বিবরণ যেমন নীরস, বিকট ও বিকৃত, দেশীয় লেখকের বিবরণ তেমনই সরস, মনোহর ও বৈচিত্র্যময়,—এবং সেই হেতু শিক্ষাপ্রদ। জেতৃজাতির তুলিকায় বিজিত জাতির ইতিহাস কখনও সরস ও শিক্ষাপ্রদরূপে বর্ণিত হয় না;—উহা অবিকৃতরূপে বর্ণিত হইবার সম্ভাবনাও অতি অল্পই থাকে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

হিমাচলের ডালি।

——ঃ০ঃ——

হিমালয়াষ্টক।

নমঃ নমঃ হিমালয়!
গিরিরাজ তুমি, মানচিত্রের মসীর চিহ্ন নয়!
বর্ষা-মেঘের মত গম্ভীর,
দিগ্‌বারণের বিপুল শরীর,
অবাধ বাতাস বাধ্য তোমার, তোমারে সে করে ভয়।
নমঃ নমঃ হিমালয়!

নমঃ নমঃ গিরিরাজ!
অযুত ঝোরার মুক্তা-ঝুরিতে উজ্জ্বল তব সাজ;
সূত্রবিহীন কুসুমের হার
উল্লাসে শোভে উরসে তোমার;
স্বপণ-পর্ণী করিছে অঙ্গে পত্র-রচনা কাজ!
নমঃ নমঃ গিরিরাজ!

নমঃ মহা মহীয়ান্!
নতশিরে যত গিরি সামন্ত সম্মান করে দান।
গুহার গূঢ়তা, ভৃগুর ভ্রুকুটী,
তোমাতে রয়েছে পাশাপাশি ফুটি',
ভীম অর্ব্বুদ ভীষণ তুষারে গাহিছে প্রলয়-গান!
নমঃ মহা মহীয়ান্!"

নমঃ নমঃ গিরিবর!
স্থির-তরঙ্গ-ভঙ্গিমাময় দ্বিতীয় রত্নাকর!
শিখরে শিখরে, শিলায় শিলায়,—
চপল চমরী পুচ্ছ-লীলায়,—
সাগরফেনের মত সাদা মেঘ নাচিছে নিরন্তর!
নমঃ নমঃ গিরিবর!

নমঃ নমঃ হিমাচল !
মৌনে শুনিছ বিশ্বজনের দুঃখ-সুখের গান ;
নিখিল জীবের মঙ্গল-ভার,
নিজ মস্তকে বহ অনিবার—,
চির-অক্ষয় তুষার তোমার শত চূড়ে শোভমান ;
নমঃ নমঃ হিমবান্ ।

নমঃ নমঃ ধরাধর !
নাগবেণী আর সরল শালেতে মণ্ডিত কলেবর ;
মেঘ উত্তরী, তুষার কিরীট,
ছত্র আকাশ, ধরা পাদপীঠ ;
অমর আত্মা মৃত্যুর মাঝে চির-আনন্দকর !
নমঃ নমঃ ধরাধর ।

নমঃ নমঃ হিমাচল !
কত তপস্বী তব আশ্রয়ে পেয়েছে কাম্যফল ;
মোরে দেছ তুমি নব আনন্দ,
মহা মহিমার বিশাল ছন্দ,—
তোমারে হেরিয়া পরাণ ভরিয়া উছলিছে অবিরল !
নমঃ নমঃ হিমাচল ।

অতীত-সাক্ষী নমঃ ;
ক্ষুদ্র কবির ক্ষীণ কল্পনা অক্ষম ভাষা ক্ষম ;
বাল্মীকি যার বন্দনা গান,—
কালিদাস যার অন্ত না পান,—
সেই মহিমার ছবি আঁকিবার দুরাশা ক্ষম হে মম ;
বিশ্বপূজিত নমঃ ।

কাঞ্চন-শৃঙ্গ ।

কোথা গো সপ্ত ঋষি কোথা আজ, কোথায় অরুন্ধতী ?
শিখরে ফুটেছে সোনার পদ্ম, এস গো তুলিবে যদি !

প্রত্যূষে সে যে ফুটিয়া প্রদোষে নিঃশেষে লয় পায়,
সোনার কাহিনী বলিতে একটি পাপড়ী না রহে হায়
কে জানে কখন্ অপ্সরাগণ সে ফুল চয়ন করে,
সোনালী স্বপন থেকে যায় শুধু নরের নয়ন' পরে!
নিত্য প্রভাতে ফাগুয়া তোমার ও গো কাঞ্চনগিরি!
দেব-হস্তের কুঙ্কুম ঝরে নিত্য তোমারে ঘিরি';
সোনার অতসী—সোনার কমলে নিত্যই ফুলদোল!
নিত্যই রাস জ্যোৎস্না-বিলাস হরষের হিল্লোল!
নিত্য আবার বিভূতি তোমার ঝরে গো জটিল শিরে,
কন্‌কনে হিম তুষার-প্রপাত সর্পের মত ফিরে!
দিনে তুমি মহা-জীবনের ছবি রজত-শুভ্র কায়া,
নিশীথে তুমিই ভীষণ পাংশু মহা-মরণের ছায়া;—
আঁধারের পটে যখন তোমার পাণ্ডু ললাট জাগে,
ভয়-বিস্ফার নয়নে যখন তারাগণ চেয়ে থাকে!
তুমি উন্নত দেবতার মত, তুমি উদ্ধত নহ;
নিগূঢ় নীলের নির্ম্মলতায় বিরাজিছ অহরহঃ।
দৃষ্টি আমার ধৌত করিছে রুচির তুষার তব,
হৃদয় ভরিছে হরষ-জোয়ার বিস্ময় নব নব;
এ কি গো ভক্তি? বুঝিতে পারি না, ভয় এ ত নয়—নয়,
সকল-পরাণ-উথলান এ যে সনাতন পরিচয়!
তোমার আড়ালে বাস করি মোরা, তোমার ছায়ায় থাকি,
তোমাতে করেছে স্বর্গ-রচনা মুগ্ধ মোদের আঁখি;
ভূলোকের হ'য়ে দ্যুলোক কেড়েছ, স্বর্লোক আছ চুমি',
অমরধামের যাত্রার পথে দিব্য শিবির তুমি!
নমঃ নমঃ নমঃ কাঞ্চনগিরি! তোমারে নমস্কার,
তুমি জানাতেছ অমৃতের স্বাদ অবনীতে অনিবার;
তোমার চরণে বসিয়া আজিকে তোমারি আশীর্ব্বাদে,
সোনার কমল চয়ন করেছি সপ্ত ঋষির সাথে।

———

মেঘলোকে।

গিরিগৃহে আজ প্রথম জাগিয়া আহা কি দেখিনু চোখে,
মর্ত্ত্যলোকের মানুষ এসেছি জীবন্তে মেঘলোকে!
গিরির পিছনে গিরি উঁকি মারে, চূড়ায় লঙ্ঘে চূড়া,
বিন্ধ্যের মত কত পাহাড়ের গর্ব্ব করিয়া গুঁড়া;
তারি মাঝে মাঝে এ কি গো বিরাজে? এ কি ছবি অদ্ভুত!
গিরি উপাধান, সানুতে শয়ান কোন্ যক্ষের দূত?
চারি দিকে তার তল্পি যত সে ছড়ান ইতস্ততঃ,
পাশমোড়া দিয়া ঘুমায় রৌদ্রে ক্লান্ত জনের মত!
কে জানে কাহার কি বারতা লয়ে চলেছে কাহার কাছে,
বসনপ্রান্তে না জানি গোপনে কার চিঠিখানি আছে!
সে কি যাবে আজ অলকাপুরীতে ক্রৌঞ্চ-দুয়ার-পথে?
তুষার-ঘটার জটিল জটায় লঙ্ঘিয়া কোন মতে?
কূপ নদী নদ সমুদ্র হ্রদ যার যাহা দেয় আছে,—
সব রাজস্ব সংগ্রহ ক'রে পবনের পাছে পাছে,
সে কি আসিয়াছে গিরিরাজ-পদে করিতে সমর্পণ?
কিংবা তাহার কুটজ ফুলের জীবন-বাঁচান পণ?

*　　*　　*　　*

রৌদ্র বাড়িল, নিদ্রা ছাড়িয়া উঠিল মেঘের দল,
শিখরে শিখরে চরণ রাখিয়া চলিয়াছে টলমল;
দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ের এই পাষাণ-যজ্ঞশালে,
শত বরণের সহস্র মেঘ জুটিল অচিরকালে!
চমরী-পুচ্ছ কটিতে কাহার (ও) ময়ূরপুচ্ছ শিরে,
ধূমল বসন পরিয়া কেহ বা দাঁড়াইল সভা ঘিরে;
সহসা কুহেলি পড়িল টুটিয়া; অমনি সে গরীয়ান্
উদিল বিপুল কাঞ্চন চূড় গিরিরাজ হিমবান্।
গগন-গরাসী প্রলয়ের ঢেউ, আজি প্লাবনের স্মৃতি,
প্রাচীন দিনের পাগল ছন্দ, কল্লোলময়ী গীতি,
মহান্ মনের উচ্ছ্বাস যেন সফল হ'য়েছে কাজে,
[illegible]

নীল আকাশের প্রগাঢ় নীলিমা যেন গো সবলে চিরি'
ধরার পরশ ঠেলিয়া গগন ফুঁড়িয়া উঠেছে গিরি!
এ কি মহিমার মহান্ চিত্র আকাশের পটে আঁকা,
দ্যুলোকে তুলিছে স্বর্গের জ্যোতি, স্বর্গের স্মৃতি মাখা;
নিখিল ধরার ঊর্দ্ধে বসিয়া শাসিছে পালিছে দেশ,
বজ্র টুটিছে, বিজলী ছুটিছে, নাহি ভ্রূক্ষেপ-লেশ।

আজি দলে দলে গিরিসভা তলে মেঘ জুটিয়াছে যত,
প্রমথ-নাথেরে ঘিরিয়া ফিরিছে প্রমথ-দলের মত।
নীরবে চলেছে গিরি-প্রধানের সভার কর্ম্মচয়,
সৃষ্টি পালন যত ব্যবস্থা ওই সভাতলে হয়;
কোন্ ক্ষেতে কত বর্ষণ হবে, কোন্ মেঘ যাবে কোথা,
সকলের আগে হয় প্রচারিত ওইখানে সে বারতা;
শিখরে শিখরে তুষার-মুকুরে ঠিকরে কিরণজ্বালা,
মুহূর্ত্তে যায় দেশদেশান্তে গিরির নিদেশ-মালা!
বার্ত্তা বহিয়া শূন্যের পথে মেঘ ওঠে একে একে,
রৌদ্র-ছায়ার চিত্র বসনে নানা গিরি বন ঢেকে;
আমি চেয়ে থাকি অবাক্-নয়ান পাথরের স্তূপে বসি,'
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন পড়েছি সহসা খসি'!
হাজার নদের বন্যা-স্রোতের নিরিখ সেখানে রয়,
লক্ষ লোকের দুঃখ-সুখের ভাঙ্গা গড়া যেথা হয়,
মেঘেরা যেথায় দূর হ'তে শুধু বৃষ্টি মারে না ছুড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে, পড়ে থাকে সানু জুড়ে,
কখন দাঁড়ায় ভঙ্গি করিয়া কীর্ত্তনীয়ার মত,
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি, কেহ নর্ত্তনে রত,
কখন আবার মেঘের বাহিনী ধরে গো যোদ্ধৃবেশ,
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত্য-কলহ হয় নাই নিঃশেষ।
কৌতুকে মিহি চাঁদের সূতার ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু নিমেষে নিমেষে ভাঙ্গিয়া পড়িছে দেহ।

আমি বসে আছি ইহাদেরি মাঝে এই দূর-মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার নিরখি চর্ম্ম-চোখে।
স্বর্গের ছায়া মর্ত্ত্যে পড়েছে, শান্ত হয়েছে মন,
নয়নে লেগেছে ধ্যানের সুষমা, দেবতার অর্জ্জন;
চক্ষে দেখেছি দেবতার দেশ, দূরে গেছে গ্লানি যত,
মেঘের ঊর্দ্ধে করেছি ভ্রমণ গ্রহ-তারকার মত!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

নবীনচন্দ্র।

নবীনচন্দ্রের শোকসভায় উপস্থিত হইতে না পারায় আমি আক্ষেপ করিয়াছিলাম, এবং আক্ষেপ-উক্তি লিখিতে লিখিতে এই কবির সম্বন্ধে যাহা মনে উদিত হইয়াছিল, তাহাই বলিয়াছি। তাহা যে মুদ্রিত হইবে, আমার অনুমিত হয় নাই। সে ক্ষুদ্র পত্রে আমার হৃদয়ের কথা কিছুই বলা হয় নাই। সেই পত্রের শেষে নিম্নলিখিত শোকোচ্ছ্বাস যোগ করিয়া দিলে বাধিত হইব। সৌভাগ্যক্রমে আমার যতদিন এই কবিবরের সহিত একত্র বসিয়া আলাপ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলাম, এবং যত তাহা স্মরণ করি, হৃদয়ে আঘাত লাগে যে, কি প্রকৃত বন্ধু হারাইলাম! নবীনের আত্মজীবনবৃত্ত প্রাপ্ত হইয়া ভাবিয়াছিলাম যে, আমার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তাঁহার কাব্যের ও তাঁহার জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা ঘটিল না। আমি পীড়িত হইলাম, এবং বহুদিন রুগ্নশয্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে করিতে অনেক সময় তাঁহার কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু প্রতিবারেই সে চেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমি প্রশংসা করিলেই তিনি বলিতেন, 'তুমি যে আমার কবিতাপাঠে আনন্দ পাইয়াছ, ইহা অপেক্ষা আমার প্রশংসা কি করিবে!' এই বলিয়া বাধা দিতেন। ভাবিয়াছিলাম, পত্রে লিখিলে সে বাধা দিতে পারিবেন না। কিন্তু আমার সে কল্পনা রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির ন্যায় কল্পনাতেই রহিয়া গেল।

কোনও কোনও সমালোচকের নিকট শুনিতে পাই, নবীন বাবুর "পলাশীর যুদ্ধ"ই ভাল, অপরাপর কাব্য তাদৃশ সুন্দর নয়। অবশ্য, সমালোচক তাঁহার রুচি-অনুসারে বলিয়াছেন। হয় ত সাধারণ পাঠক নবীনের পলাশীর যুদ্ধের ন্যায় তাঁহার অন্যান্য কাব্যের আদর করেন না, কিন্তু তাহাতে তাঁহার অন্যান্য কাব্যের সমুচিত দোষগুণ বিচার হয় নাই। কবির জীবনে যদি একখানি কাব্যেরও আদর হয়, তাহা সামান্য ভাগ্যের কথা নয়। অনেক উচ্চ কবিরও বহু কাব্যের আদর নাই; কিন্তু নবীনের অপর কাব্যগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে কোন্ স্থান অধিকার করিবে, তাহার মীমাংসা পরবর্ত্তী সময়ে হইবে, বর্ত্তমানে হইতে পারে না। কোনও উচ্চশ্রেণীর কাব্যের সম্যক্ আদর কবির জীবিত-অবস্থায় হয় না, হইতে পারে না। সাময়িক দৃষ্টির অতিরিক্ত দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কবির উচ্চাসন প্রাপ্ত হন না। তাঁহার মনোভাব সময় অতিক্রম করিয়া যায়; তিনি সাময়িক স্রোতে চালিত নন। তাঁহার হৃদয়ে নব নব ভাব প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। চিন্তাই তাঁহার জীবন। হৃদয়ের গভীর স্তর হইতে তাঁহার কবিতা-প্রস্রবণ উচ্ছ্বসিত হয়। সুতরাং সাধারণ পাঠকে সেই সুস্বাদু বারির আস্বাদন সমর্থ হন না। হৃদয়ের গভীর স্তরে নামিয়া তাহা পান করিতে হয়। এ নিমিত্ত অনেক সময়েই উচ্চ কবির কাব্য অর্থশূন্য বলিয়া প্রথমে অগ্রাহ্য হইয়া থাকে। প্রকৃত কবির আর এক বাধা, ভাবুকমাত্রেরই রচনা একরূপ হয় না। নব রস সমান ভাবে আস্বাদন করিতে পারেন, এরূপ মহাত্মা উচ্চ কবির ন্যায় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেন। অনেক ভাবুক, যে কাব্যের রস তাঁহার মনোমত নয়, তাহার আস্বাদ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন না। চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রত্যেক সুন্দরীকে সুন্দরী দেখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত সুন্দরী একজনমাত্র হয়। সকল সৌন্দর্য্যই তাঁহার অনুভূত হয়, কিন্তু কোনও এক বিশেষ সৌন্দর্য্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করে। সেই জন্য ভাবুকের মনোমত রসের কাব্য না হইলে, তিনি তাহার যোগ্য প্রশংসা করেন না। তৃতীয় বাধা, প্রতিদ্বন্দ্বীর ঈর্ষ্যা, শ্রেণীবিশেষের পক্ষপাতী নীচতাপূর্ণ সমালোচনা। সকলের উপর বাধা, দোষ ধরিলেই বিজ্ঞ হওয়া যায়, এই প্রকার সামান্যচেতা সাধারণের ধারণা। কালে ধীরে ধীরে সেই উচ্চ কবির ভাব সকল ছড়াইয়া পড়ে; ভাবুক ব্যক্তির ব্যাখ্যাও তাহার সহায়তা করে। তখন আর সাহিত্যিকের ঈর্ষ্যাদ্বেষ নাই, নীচ সমালোচকও জলবুদ্বুদের ন্যায় কালস্রোতে বিলীন হইয়াছে। তখন সে কাব্যের আদরের

আর সীমা থাকে না! কিন্তু সে আদরে কবির কিছু আসিয়া যায় না। তাঁহার আত্মপ্রসাদ-লাভ হইয়াছিল, অবশ্য ইহা সাধারণ ভাগ্য নয়; কিন্তু তাঁহার যশোলিপ্সা পূর্ণমাত্রায় তৃপ্ত হয় না। তিনি হৃদয়ে সত্যের মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন বটে, এবং সত্যের মূর্ত্তি কালে গুপ্ত থাকিবে না, ইহাও তিনি মনে-জ্ঞানে জানিয়া যান; কিন্তু সেই উজ্জ্বল মূর্ত্তি তিনি সকলকে দেখাইয়া যাইতে পারিলেন না, ইহা ক্ষোভের বিষয়। তিনি আত্মপ্রসাদে তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ক্ষোভ—তাহাতে সন্দেহ নাই। এ ক্ষোভ নবীনের হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু তাহার জন্য আমার ক্ষোভ আছে। যদি শক্তি থাকিত, তাঁহার কবিতা সমালোচনা করিয়া সাধারণকে তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু যখন সে শক্তি আমার নাই, তখন আমার আক্ষেপ বৃথা। তবে প্রাণের উচ্ছ্বাসে দুই একটি কথা বলিতেছি। আমার মনে হয়, তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কবির গভীর ধ্যানের ছবি, তাঁহার ভক্তিস্রোতও তাঁহার ধ্যানের কৃষ্ণের চরণ ধৌত করিবার উপযোগী নির্ম্মল। শ্রীকৃষ্ণের অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ নবীনের কাব্যে পাঠ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে কপিধ্বজ রথে শ্রীকৃষ্ণ-সারথি পার্থ-রথীকে গীতা বলিতেছেন, তাহার ছবি আমার মানসক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিল। ভদ্রার্জ্জুনের প্রেমানুরাগ নির্ম্মল প্রেম-তূলিকায় চিত্রিত। শরশয্যায় যোগারূঢ় ভীষ্মদেব কবির কুহকে, স্বর্গীয় জ্যোতির্মালায় মানসক্ষেত্রে উদিত হন। তাঁহার সকল চিত্রই প্রকৃত চিত্রকরের চিত্র। তাঁহার কাব্যের যে যে স্থান আমার মনোহর বোধ হইয়াছে, তাহা সমস্ত উদ্ধৃত করিলে 'সাহিত্যে' স্থান সঙ্কুলান হইবে না। তাঁহার ভাষা সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, গভীর আধ্যাত্মিক ভাব সকল যে এরূপ সরল ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে, তাহা নবীনের কাব্য পাঠ না করিলে আমি বিশ্বাস করিতাম না।

তাঁহার কাব্য-বর্ণিত আর্য্য ও অনার্য্য এবং কৃষ্ণদ্বেষী ব্রাহ্মণ লইয়া অনেক কঠোর লেখনী চালিত হইয়াছে। সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, নবীনচন্দ্র বৈষ্ণব কবি, তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি, তিনি শ্রীকৃষ্ণের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে মুগ্ধ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের শূলধারী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি করেন নাই। মুরলীধর তাঁহার ইষ্টদেব, অন্য মূর্ত্তি তাঁহার তৃপ্তিসাধন করিত না, এবং কৃষ্ণদ্বেষীকে ব্রাহ্মণ হইলেও চণ্ডালের ন্যায় হীন জ্ঞান করিতেন। ইহা বৈষ্ণব কবির দোষ নয়—গুণ। মহান্ত নরোত্তম দাস প্রভৃতির কবিতা পাঠে তাহা উপলব্ধ হয়। নিষ্ঠাভক্তি বৈষ্ণবের জীবন। পুরাণে শুনি, খগরাজ গরুড় নারায়ণের করে

ধনু ছাড়াইয়া বাঁশী দিয়াছিলেন, এবং রুদ্রাবতার বীর হনূমান্ বাঁশীর পরিবর্ত্তে ধনু দিয়া হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান্ নবীনচন্দ্র তাঁহার আর্য্য অনার্য্য লইয়া নিন্দা উচ্চপ্রশংসা-জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

প্রেমিক নবীন জগৎপ্রেমে মগ্ন ছিলেন। ধরায় এক সংসার হউক, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় এক রাজার শাসনে থাকুক, হিংসাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য পরস্পরের বন্ধু হউক, 'একমেবাদ্বিতীয়ং' জ্ঞানে পরপীড়ন আত্মপীড়ন অনুভব করুক, ধরায় স্বর্গ বিরাজিত হউক, প্রেমিক নবীন—এই ধ্যানে বিভোর ছিলেন। আপনার বক্তৃতায় তাঁহার মৃত্যু-বর্ণনায় আমার বোধ হইয়াছিল যে, নবীনচন্দ্র সার্ব্বজনিক প্রেম লইয়া ইষ্টদেবদর্শনে গিয়াছেন। নবীন তাঁহার ইষ্ট স্থানে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধুবর্গ তাঁহার শোক ইহজীবনে ভুলিবে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ।

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য।

ভারতবর্ষে মুসলমানপ্রবেশ উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতেই হইয়াছিল। অতএব ভারতের উত্তর-পশ্চিমদিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যাধিক্য দেখা যায়।

বঙ্গে কিন্তু অনেকটা বিপরীত দেখা যাইতেছে। সকলেই অবগত আছেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বখ্‌তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপ রাজধানী অধিকার ও বঙ্গদেশে মুসলমান-রাজত্বের সূত্রপাত করেন, এবং তথা হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্ববঙ্গ অধিকৃত হয়। অথচ আদমসুমারিতে দেখা যায়, নদীয়া প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা বর্ত্তমানে পূর্ব্ববঙ্গস্থ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের সংখ্যার অনুপাত অধিকতর। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের কোনও সমাধান হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ের আলোচনাই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আরব, পারস্য, আফ্‌গানিস্থান বা তুর্কিস্থান হইতে সমাগত মুসলমান কর্ত্তৃক যে বঙ্গভূমিতে মুসলমান-জনতার বীজ উপ্ত হইয়াছে, এ কথা

ঠিক বলা যায় না। তাদৃশ মুসলমানগণ কাশ্মীর, পঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, বিহার প্রভৃতি প্রদেশেই উপনিবিষ্ট হওয়াতে অতি অল্পসংখ্যকই বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। তবে ভারতের উক্ত প্রতীচ্যোদীচ্য-প্রদেশগুলির অধিবাসী যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, এতাদৃশ অনেকেই বঙ্গবিজেতার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া নবাধিকৃত বঙ্গাংশে স্থানলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু রাজধানীর সমীপস্থ স্থানে জনতার আধিক্য থাকাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ নবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভাগীরথীতীরবর্ত্তী স্থান; গঙ্গাস্তোত্রে আছে :—

বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ কৃশঃ শুনীতনয়ঃ।
ন চ পুনর্দূরস্থঃ করিবরকোটীশ্বরো নৃপতিঃ॥ *

ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, বঙ্গের যে অঞ্চল মুসলমান কর্ত্তৃক প্রথমাক্রান্ত হইল, সেই স্থানে উপনিবিষ্ট হইবার উপযোগী স্থান অতি অল্পই ছিল। অতএব বিজেতার অনুচরবর্গের মধ্যে যাহারা নববিজিত প্রদেশে থাকিতে ইচ্ছা করিল, উহাদের অধিকাংশকেই পূর্ব্বাঞ্চল-বিজয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল। অপেক্ষাকৃত বিরল-বসতি স্থান যথা—বগুড়া, মালদহ প্রভৃতি তাহাদের বসতিস্থান হইল, এবং ক্রমশঃ মুসলমান-রাজত্বের সীমানা পূর্ব্ব-উত্তর-দক্ষিণ দিকে সমন্তাৎ বিস্তৃত হইতে লাগিল। মুসলমানগণও অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বর আগ্রা, অযোধ্যা, বিহারাদি প্রদেশ ছাড়িয়া পালে পালে আসিয়া 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গ-মাতার ক্রোড়ভাগ অধিকার করিতে লাগিল।

সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইতে অবশ্যই বহুদিন লাগিল। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সময়েও শ্রীহট্ট অঞ্চলে গৌরগোবিন্দ নামক হিন্দু-নৃপতি রাজত্ব করিতেছিলেন, দেখা যায়। শ্রীহট্ট কিরূপে মুসলমানের অধিকৃত হইল, তাহা এ স্থানে পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

---

* গঙ্গাতীরে অধিবাস, কাক কিংবা কৃকলাস,
বরঞ্চ হইব কৃশ কুক্কুরী-তনয়।
গঙ্গাহীন দেশ তভু † করিবর-কোটী-প্রভু
নৃপতি হইতে মম সাধ নাহি হয়।

† অল্পপ্রাণ বর্ণসমন্বিত কদাপি হইতে 'কভু' হইলে একটি মহাপ্রাণযুক্ত 'তথাপি' শব্দ হইতে 'তভু' হওয়াই উচিত।

তখনকার সময়েও হিন্দু রাজার রাজত্বমধ্যে শ্রীহট্ট নগরে একটি মুসলমান বাস করিত। সে ছেলের মানসিক আদায় করিতে গিয়া শ্রীহট্টে একটি গরু জবাই করে; একটা চিল উহার একখণ্ড লইয়া গৌরগোবিন্দের সাক্ষাতে ফেলিয়া দেয়। রাজা এ বিষয় অবগত হইয়া সেই মুসলমান বালকটিকে মারিয়া ফেলেন। ইহাতে ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া মুসলমানটি দিল্লী গিয়া নালিশ রুজু করে। বাদশাহ এক জন সেনাপতিকে সেই রাজার শাসনবিধানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরগোবিন্দের অগ্নিবাণ প্রভৃতি 'যাদুগিরী'তে বাদশাহের সৈন্য পলায়নপর হইয়াছিল। সেই মুসলমান, প্রতীকার হইল না ভাবিয়া, পয়গম্বর সাহেবের সমাধিতে তাহার দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিবার জন্য আরব দেশে যাত্রার উদ্‌যোগ করিল। তখন ভারতে নবাগত ফকীর শাহ জলাল মজঃরদের * সঙ্গে দিল্লীতে তাহার সাক্ষাৎ হইল। শাহ জলাল তাহার বিবরণ জানিতে পারিয়া সম্রাটের ভাগিনেয় সিকন্দর শাহকে ও কিছু সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে লইয়া গৌরগোবিন্দ-পরাজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। শাহ জলালের আধ্যাত্মিকবলে "যাদুগীর" গৌরগোবিন্দ শ্রীহট্ট হইতে নিরাকৃত হইলেন, এবং সেই অবধি শ্রীহট্টভূমি মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল।

এই শাহ জলালের সঙ্গে ৩৬০ জন আউলিয়া ছিলেন। শাহ জলাল শ্রীহট্টের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া, ইহা নাকি বড়ই আধ্যাত্মিকতার অনুকূল মনে করিয়া, এই স্থানেই জীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং তদনুচর ৩৬০ জন আউলিয়াও শ্রীহট্টের নানা স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার আরম্ভ করিলেন। কেবল শ্রীহট্ট অঞ্চলেই যে ইঁহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ক্রমশঃ ইঁহাদের বংশধরদিগের দ্বারা ইসলামধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অধুনা পূর্ব্বাঞ্চলে যত সম্ভ্রান্ত মুসলমান-পরিবার আছেন, তন্মধ্যে এই আউলিয়াগণের বংশীয়দের সঙ্গে স্বতঃ পরতঃ সম্পর্ক নাই, এমন ব্যক্তি অল্পই দেখা যায়।

বিজেতৃ-জাতির ধর্ম্মে তখন বহু লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুজাতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, তৎকালে, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে, ধর্ম্মবন্ধন যে কিছু শিথিল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

* ইঁহার জীবনচরিত বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক 'প্রদীপ' পত্রিকার ১৩১১ কার্ত্তিক ও ১৩১২ কার্ত্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তাহা না হইলে জাতীয় অধঃপতন এত দ্রুত হয় না। বিশেষতঃ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিম্নস্তরের হিন্দু-সমাজে ব্যক্তিগত সাধন-ভজনের বিশেষ কোনও পথ ছিল, এমনও বোধ হয় না। তান্ত্রিকী দীক্ষা সমস্ত বর্ণের জন্য বিহিত হইলেও, জল-চল-জাতীয় লোক ভিন্ন অন্যজাতীয়েরা যে ঐ দীক্ষা লাভ করিত, এরূপ বিবেচনা হয় না।

এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে যাহাদের হীনাবস্থা ছিল, তাদৃশ ব্যক্তিগণ দলে দলে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাদশাহী জাতিমধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। ভাগ্যে চৈতন্যদেব নিম্ন-বর্ণের নিমিত্ত পবিত্র হরিনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক লোকেরই ধর্ম্ম-সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন; নচেৎ ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের ন্যায় বঙ্গদেশেও শতকরা অশীতিসংখ্যক মুসলমান দেখিতে পাইতাম। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের ঈদৃশ প্রচার পশ্চিম-বঙ্গে বোধ হয় কুত্রাপি হয় নাই।

উচ্চতর বর্ণের কেহ যে সহজে মুসলমান হইয়াছিল, এ কথা বলা যায় না। এই স্থলে একটু জোর-জবরদস্তী চলিত বলিয়াই বোধ হয়। এই বিষয়ের উদাহরণ অনেক আছে। কাহারও রাজ্য বিজিত হইলে, সেই ব্যক্তি মুসলমান-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিলে, আপন বিষয় ফিরিয়া পাইতেন। * অথবা অধীন ভূম্যধিকারী কেহ দেয় কর প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হইলে, বা বিলম্ব করিলে, ধৃত হইয়া, বাদশাহ বা নবাবের-সমীপে নীত হইয়া নিহত কিংবা জাতিচ্যুত হইতেন। পূর্ব্ববঙ্গের ভূম্যধিকারিগণ মুসলমান-রাজধানী হইতে দূরতর স্থানে বাস করিতেন। তাঁহাদের রাজস্ব দিতে ও সুতরাং বিলম্ব বা ঔদাস্য অধিক হইত। অতএব ইঁহাদের জাতিচ্যুতিও অধিক ঘটিয়াছিল। বিশেষতঃ, নবাবের রাজধানীর সমীপস্থ, অর্থাৎ, পশ্চিম-বঙ্গীয় হিন্দু ভূম্যধিকারিগণ নবাব বা নবাব-কর্ম্মচারিবর্গের নিকট হইতে যতটা সদয় ব্যবহার লাভ করিতেন, পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা ততটা প্রত্যাশা করিতেও পারিতেন না। পরাক্রান্ত জমীদার মুসলমান হইয়া হিন্দু জ্ঞাতিকুটুম্ব ও প্রজাবর্গের মধ্যে স্থাপিত হইলে যে তদনুবন্ধে অনেকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে—স্বেচ্ছায় না হউক অনিচ্ছায়—প্রবৃত্ত হইত, একথা বলাই বাহুল্য।

* লেখকের পূর্ব্ব-পুরুষেরা শ্রীহট্টের এক তৃতীয়াংশব্যাপী বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বাদশাহের চর কর্ত্তৃক ছলে বলে ধৃত হইয়া কাত্যায়ন-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ রাজা গোবিন্দ দিল্লীতে নীত হন, এবং জাতিভ্রষ্ট হইয়া জমীদাররূপে পুনশ্চ বাণিয়াচঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

এইরূপে যখন একবার মুসলমান-জনতার বীজ উপ্ত হইল, তখন উহার সংবর্দ্ধন হইতে আর কতক্ষণ? এই বিষয়ে মুসলমানের সামাজিক রীতি-নীতি বড়ই অনুকূল। বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকাতে হু হু করিয়া বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। একমাত্র বহুবিবাহে বংশ কীদৃশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণরূপে এই বলিলেই হইবে যে, কিঞ্চিদূন এক সহস্র বর্ষে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পাঁচটি ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের অনুচর পাঁচটি কায়স্থের সন্তান-সন্ততিতে আজ প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ।

তার পর, কেবল অধিকপরিমাণে সন্তানোৎপাদন হইলেই যে বংশ-বিস্তার হয়, এমন নহে; পুষ্টির নিমিত্ত খাদ্যাদিরও প্রাচুর্য্য চাই, এবং তৎকল্পে নূতন উপনিবেশের স্থানও আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গে তাহার অপ্রতুল ছিল না। পশ্চিম-বঙ্গে নূতন আবাদের নিমিত্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে জঙ্গল ও চরভূমি, পর্ব্বতের কচ্ছ ও সানুপ্রদেশ তখন ভূরিপরিমাণে অনধিকৃত ছিল। বর্দ্ধমান মুসলমানগণ ঐ সকল অধিকার করিয়া লইতে লাগিল।

উপনিবেশ-সংস্থাপন-বিষয়েও মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজ-পদ্ধতি অতীব অনুকূল। প্রথমতঃ, বিবাহাদিতে হিন্দু-সমাজে যেরূপ বাছবিচার, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। দুইটিমাত্র ভাই সপরিবারে লোক-সমাজ হইতে দূরান্তরিত স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেও, একের কন্যা অপরের পুত্রে বিবাহ করিতে পারায় বংশ-রক্ষা ও বৃদ্ধির বিষয়ে কোনও বাধা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ, জাতি-বিচার না থাকাতে উপনিবিষ্ট মুসলমানগণের বন্য ও পার্ব্বত্য-জাতীয় লোকদিগের সঙ্গেও বিবাহাদি সম্বন্ধ-স্থাপনে কোনওরূপ আপত্তি হইবার কথা নাই—কেবল ধর্ম্মটি গ্রহণ করাইতে পারিলেই হইল; এবং মুসলমানধর্ম্ম ত সকলের নিমিত্তই সতত অবারিতদ্বার। তৃতীয়তঃ, সাহসিকতা না থাকিলে সুদূর স্থানে উপনিবেশ-স্থাপনে প্রবর্ত্তনা জন্মে না।

মুসলমানদের তখন দেশে প্রবল প্রতাপ, এবং ভিন্ন-জাতীয়ের মধ্যে অল্পসংখ্যকের অবস্থান হেতু পরস্পর সহানুভূতি খুব প্রবল ছিল। এখনও কি কম? রাজার জাতি ইংরেজগণকে যেমন আজকাল আমরা সসম্ভ্রমে দেখিয়া থাকি, মুসলমানকেও হিন্দুসাধারণ সেইরূপ দেখিত। ইংরেজ যেমন নির্ভীকভাবে সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করিয়া থাকে, তখন মুসলমানেরাও সেইরূপ অকুতোভয়ে সকল স্থানেই সঞ্চরণ করিত। মাংস-পলাণ্ডু-

ভূয়িষ্ঠ-আহার-সেবী মুসলমান স্বভাবতই হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। ঈদৃশ আহার মুসলমানকে সন্তানোৎপাদনেও অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে।

যে জাতির এইরূপে বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছিল, তাহাদের জন-সংখ্যা যে অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। আবার মুসলমান-সমাজে মৃত্যু ব্যতীত ক্ষয়ের অপর কোনও কারণ ছিল না; ধর্ম্মের অনাচরণে মুসলমানের ধর্ম্মত্যাগ হয় না, এবং কোনও নৈতিক বা সামাজিক অপরাধেও তাহাকে 'মুসলমান' আখ্যা পরিত্যাগ করিতে হয় না।

এ দিকে হিন্দু-সমাজে ক্ষয়ের কারণ বহু বিদ্যমান। বিশেষতঃ, পূর্ব্ব-বঙ্গে সামাজিক শাসনের দৃঢ়তা অত্যন্ত অধিক ছিল। পশ্চিমবঙ্গে মাতা ভাগীরথী অনেক অনাচার কদাচার শুধরিয়া লইতেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের এই মহা সুবিধাকর উপায়টি বর্ত্তমান না থাকায় অনেকে ধর্ম্মান্তর-গ্রহণে অর্থাৎ মুসলমান হইতে বাধ্য হইত।

মুসলমান এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কেহ পতিত হইলে চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিম্ন-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইত, এবং নিম্নতম শ্রেণীতে কাহারও পাতিত্য জন্মিলে একঘরিয়া হইয়া কষ্টে কাল কাটাইত; তৎপরে দণ্ড দিয়া আপন সমাজে উঠিত। মুসলমান দেশে আসিবার পর এইরূপ পতিত ব্যক্তিরা অনায়াসে সেই সমাজে স্থান লাভ করিতে লাগিল। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বঙ্গে সুপ্রচারিত হইলে পর, পতিত-উদ্ধারের পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল। সমাজ-বহিষ্কৃত ব্যক্তিরা, তথা বারবনিতা প্রভৃতি পতিতেরা 'ভেক' লইয়া হিন্দুনামটি বজায় রাখিতে লাগিল। কিন্তু 'ভেক' লইলেও কলঙ্কের চিহ্ন কিছু থাকিয়া যায়। ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে আর বাছিয়া বাহির করিবার সুযোগ থাকে না। সুতরাং এখনও এই উপায়ে অন্য ধর্ম্ম কথঞ্চিৎ পরিপুষ্ট হইতেছে।

দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে যখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হইত, তখন অনেক স্থলে সম্পন্ন মুসলমানের আশ্রয়ে প্রাণ রক্ষা করিত, এবং সপরিবারে মুসলমান হইয়া সেই সমাজের পুষ্টিসাধন করিত। এইরূপ ঘটনা পূর্ব্ব-বঙ্গে অনেক শুনা গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরা কিরূপে মুসলমান হইত, তাহার উদাহরণস্বরূপ একটি গল্প বলিতেছি।

বরিশাল জেলার বর্থাকাঠী গ্রামে ৩৬০ ঘর নমঃশূদ্র বাস করিত; তন্মধ্যে একটি মুসলমান-পরিবারও স্থান পাইয়াছিল। মুসলমানকে একাকী ও সহায়শূন্য দেখিয়া সমস্ত নমঃশূদ্র মিলিয়া উহাকে আপন জাতির অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া লইল। কিয়দ্দিবস পরে পীর সাহেব তদীয় মোরিদের অন্বেষণে ঐ গ্রামে আসিয়া সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিলেন। তখন তিনি গর্জ্জন করিয়া নমঃশূদ্রদিগকে বলিলেন,—"তা হইবে না; মুসলমান কখনও হিন্দু হইতে পারে না; এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাদিগকে মুসলমান হইতে হইবে।" বস্তুতঃই ৩৬০ ঘর হিন্দু তদবধি মুসলমান হইয়া গেল! পীরসাহেব রাজার জাতি, তাঁহার দৃঢ় আদেশ লঙ্ঘন করিতে বা তদর্থে সহায়তা করিতে কি কেহ সাহসী হইতে পারিত? মুসলমানী আমলে হিন্দু জমীদারদিগের মুসলমান প্রজারা হিন্দু প্রজা অপেক্ষা অধিকতর সুবিধা ভোগ করিত; রাজার জাতি বলিয়া হিন্দু জমীদারগণ উহাদের সঙ্গে সাবধানে ব্যবহার করিতেন। * ইহাতেও হিন্দু প্রজাদিগের মধ্যে মুসলমান হইবার আকাঙ্ক্ষা উপজাত হইবার কথা, এবং স্বধর্ম্মে যাহাদের বিশ্বাস শিথিল-মূল ছিল, উহারা সুতরাং মুসলমান হইয়া পার্থিব সুখ-সুবিধার অধিকারী হইত।

আরও একটি কারণে পূর্ব্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দুর অনুপাত অধিক দেখা যায়। পূর্ব্ববঙ্গে যখন এই ধর্ম্ম-বিপ্লব উপস্থিত, তখন অনেকে নিজ বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া ভাগীরথীতীর-সমাশ্রিত হইতে লাগিল। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের চরিত-গ্রন্থাবলী-পড়িয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, নবদ্বীপে তখন পূর্ব্ববঙ্গের এক প্রকাণ্ড উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। চৈতন্যের পিতা, মাতামহ, শ্বশুর ও শ্রীবাস, অদ্বৈত প্রভু প্রভৃতি ব্রাহ্মণবর্গ, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি কায়স্থ ও বৈদ্য, পূর্ব্ববঙ্গ—শ্রীহট্ট—ছাড়িয়া আসিয়া নদীয়ায় ঘর বাড়ী বাঁধিয়াছিলেন। কেবল গঙ্গাস্নানের সুবিধার্থই যে উঁহারা সেইখানে গিয়াছিলেন, তাহা নহে। আমার বিশ্বাস, নব-প্রবর্ত্তিত

* বর্ত্তমানে নদীয়া প্রভৃতি জেলায় হিন্দু জমীদারগণের খ্রীষ্টীয়ান প্রজারা নাকি ঈদৃশ সুবিধা ভোগ করে। মিশনরী উঁহাদের মুরুব্বী;—জেলার কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট মিশনরীর বন্ধু। যদি নেটিভ খ্রীষ্টীয়ানগণ সকলেই সাহেবী নাম ধারণপূর্ব্বক ইংরেজদিগের সঙ্গে সামাজিকতায় সমানভাবে মিশিতে পারিত, তাহা হইলে দলে দলে লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়া যাইত। মুসলমানদের কিন্তু এইরূপ বৈষম্য খুব অল্প ছিল।

মুসলমানধর্ম্মের প্রভাব-বিস্তার দেখিয়াই উঁহারা ভীতভাবে জন্মভূমির মায়া অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মরক্ষার্থ গঙ্গাতীর আশ্রয় করিয়াছিলেন।

যেখানে রোগ প্রবল হয়, ঔষধও সেইখানেই আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। তাই দেখিতে পাই, শ্রীহট্টের লাউড়ের চাণক্য কুবের পণ্ডিতের পুত্র কমলাক্ষ (অদ্বৈতাচার্য্য) পিতৃপ্রদর্শিত রাজনীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া, দেশে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইতেছে দেখিয়া গঙ্গাগর্ভে নামিয়া তৎপ্রতীকারকল্পে তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, এবং শ্রীহট্ট হইতে আগত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নবদ্বীপে বসিয়া ব্যাকুলভাবে ভগবৎকৃপার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্ গীতায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন :—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

তাই সাধক ও ভক্তের আহ্বান বিফল হইল না। সেই মাতৃভূমি-পরিত্যক্তে পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ জগন্নাথ মিশ্রের গৃহ আলোকিত করিয়া চৈতন্য-চন্দ্র সমুদিত হইলেন। যদি ভগবান্ এই "আত্মার সৃষ্টি" না করিতেন, তবে বঙ্গদেশে হিন্দুর সংখ্যা যে আজ অত্যন্ত বিরল হইত, তাহা ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এ স্থানে অবান্তরভাবে আর একটি প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতে হইতেছে। কোনও কোনও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্গে মুসলমানের অতিবৃদ্ধি দেখিয়া কালে হিন্দুর বিলোপ হইবে বলিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহার প্রতিবিধানার্থ হিন্দু-সমাজে বিধবা-বিবাহ-প্রচলিত করিবার উপদেশও দিয়া থাকেন। ইহার একটু আলোচনা আবশ্যক। ১৯০১০ অব্দের বঙ্গীয় সেন্‌সস্ রিপোর্টের ১ম ভাগ ২৮৫ পৃষ্ঠে অঙ্কিত বিবরণী হইতে দেখা যায় যে, ১৮৮১ সাল হইতে ১৯০১ অব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুর সংখ্যা সমগ্র বঙ্গে শতকরা ৯.৩, এবং পূর্ব্ববঙ্গে ১৭.৯ বাড়িয়াছে। মুসলমানের সংখ্যা এই কুড়ি বৎসরে সমগ্র বঙ্গে ১৭.৪ এবং পূর্ব্ববঙ্গে ৩১.৩ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হিন্দুদের ক্ষয় ত দেখা গেল না, বরং বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হইল। মুসলমানের বৃদ্ধির অনুপাত অধিক। কিন্তু এই অতি-বৃদ্ধি কি সমাজের ইষ্টজনক? দেশ-কালের অবস্থা-বিবেচনায় আমার বোধ হয়, হিন্দুর যা বৃদ্ধি ঘটিয়াছে, ইহাই প্রচুর। মুসলমানের অতিবৃদ্ধি

হেতুক সেই সমাজে দরিদ্রতাও এত অধিক। তাই শিক্ষা-বিবরণীতে মুসলমানের স্থান অতিশয় নিম্নে; অথচ কারা-বিবরণীতে মুসলমানের অনুপাত অতিশয় অধিক দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ, আমাদের দেশের লোক ভারতবর্ষ ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া যে অন্ন-সংস্থান করিবে, সে পথও রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে।

যাঁহারা দেশহিতেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বিধবা-বিবাহ-প্রচলন দ্বারা হিন্দুর সংখ্যা-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে চান, তাঁহারা আরও একটু ভাবিয়া দেখিবেন যে, মুসলমানের বংশবৃদ্ধি কেবল বিধবা-বিবাহ দ্বারা হয় নাই। বহুবিবাহই তাহার প্রধান কারণ। বহুবিবাহ প্রচলিত করিতে অবশ্যই কেহ পরামর্শ দিবেন না, এবং স্থলবিশেষে যে উহা ছিল, তাহাও উঠাইয়া দিতেই বর্ত্তমান দেশ-হিতৈষীরা উপদেশ দিয়া থাকেন। বিধবা-বিবাহ জনতা-বৃদ্ধির উপায়স্বরূপ সেই স্থলেই পরিগৃহীত হইতে পারে, যেখানে অনেক লোক পাত্রীর অভাবে বিবাহ করিতে পারে না, কিংবা যেখানে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। হিন্দু-সমাজে আজকাল 'কন্যাদায়' বলিয়া একটা কথা শুনা যাইতেছে! তাহাতে পাত্রীর অভাব ঘটিয়াছে. এ কথা বলা যায় না। যাহারা বিবাহ করিতে পাত্রী পায় না, তাহাদিগকে, অর্থাৎ অপাত্রদিগকে বিবাহ করিতে বোধ হয় দেশ-হিতৈষীরাও উপদেশ দিবেন না। আবার সমর্থ পুরুষকে একাধিক বিবাহ করিতেও যখন কেহ পরামর্শ দিবেন, তখন বিধবা-বিবাহ-প্রচলনে কেবল কন্যাদায়টা আরও বাড়িয়া উঠিবে মাত্র। সমাজে যে প্রত্যেক কন্যার বিবাহ দিতে হইবে, এই একটি শুভকরী রীতি আছে, তাহা তুলিয়া দিতে হইবে। কতকগুলি কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে জনতা-বৃদ্ধির পক্ষে কি উহা প্রতিকূল হইবে না?

হিন্দু-সমাজের নিম্নস্তরে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে যে কারণেই হউক, সে স্তর হইতেও বিধবা-বিবাহ ক্রমশঃ উঠিয়া যাইতেছে। শ্রেষ্ঠবর্ণের অনুকরণে যে উহা উঠিতেছে, এ কথা বলিতে পারিতেছি না। আজকাল আচারবান্ ব্রাহ্মণ ভদ্রের অনুকরণ কেহ করে না; শিখা, মালা, তিলক ধারণ কেহ করিতে চায় না। অথচ সাহেবী ধরণে দাড়ি রাখা, চুল কাটা প্রভৃতির অনুকরণ আপামর সাধারণ সকলেই করিতেছে। ইংরেজ-সমাজে প্রচলিত যৌবন-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ-প্রথা সুশিক্ষিত উচ্চবর্ণের লোকেরা, যাঁহাদের মধ্যে কখনও এ সকল ছিল না, গ্রহণ

করিবার জন্য ব্যাকুল। তথাপি নিম্নস্তরের হিন্দুরা, যাহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতেছে, দেশহিতৈষী মহাশয়েরা ইহা ভাবিয়া দেখিবেন কি? অথচ বিবাহ করিতে এই সকল শ্রেণীর লোকদেরই অধিক অসুবিধা হয়।

বঙ্গে, তথা ভারতবর্ষে, মুসলমানের অতিবৃদ্ধি দেখিয়া যদি কাহারও প্রাণ হিন্দুর বিলোপ-আশঙ্কায় আতঙ্কিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে প্রতীকার-বিধানার্থ শ্রীচৈতন্য বা কবীরের পথের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। হিন্দুর সংখ্যা প্রবর্দ্ধিত করিবার জন্য বিধবা-বিবাহাদি অপকৃষ্ট উপায়ের উপদেশ প্রদান না করিয়া যাহাতে আরণ্য ও পার্ব্বত্য জাতীয়েরা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করে, সে বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া উচিত, এবং যদি পারা যায়, মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করাও আবশ্যক। আসাম-প্রদেশে বৈষ্ণব মহাপুরুষ শঙ্কর ও মাধবদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে কাছাড়ী প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতীয় ব্যক্তিরা ক্রমশঃ হিন্দুধর্ম্ম-পরায়ণ হইতেছে। শ্রীহট্টের বৈষ্ণব গোস্বামী, অধিকারী প্রভৃতির যত্নে সেই অঞ্চলের নিকটস্থ মণিপুরী, ত্রিপুরা প্রভৃতি জাতিও বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে। শ্রীহট্টের প্রান্তস্থিত খাসিয়াগণ পরম বৈষ্ণব হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু মিশনরীদিগের চেষ্টায় উহারাও খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছে। এইরূপে গারো কাছাড়ীদের মধ্যেও অধুনা হিন্দুধর্ম্মের প্রসার অনেকটা কমিতেছে; মিশনরীদের প্রভাব দিন দিন বাড়িতেছে। পূর্ব্বে গারো, কাছাড়ী, লুসাই, মণিপুরী, এমন কি, খাসিয়ারা পর্য্যন্ত বাঙ্গালা বা আসামী ভাষা শিখিত; এখন ইংরেজী অক্ষরে স্থানীয় ভাষার শিক্ষাদান হইতেছে। গারো, খাসিয়া ও কাছাড়ীদের শিক্ষার একপ্রকার সম্পূর্ণ ভার মিশনরীদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। ইহার ভাবী ফল কি, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ফলতঃ, হিন্দু-ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও প্রসারের পথ এই দিকে একপ্রকার রুদ্ধ হইতে যাইতেছে। কিন্তু সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার নিতান্ত কষ্ট-কল্পনার জল্পনা নহে। বৈরাগী ও ফকীরের প্রভেদ এত অল্প, এবং নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমান—যাহাদের অধিকাংশই পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, এবং নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে আচার, আচরণ ও সংস্কারগত এত সাদৃশ্য যে, মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের বিস্তার নিতান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তজ্জন্য দেশের শক্তিমান্ পুরুষেরা যত্নবান্ হইবেন কি?

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

কবিবর নবীনচন্দ্র।

নবীন প্রবীণ কবি দেখালে নবীন খনি,
ভাব সনে অপূর্ব্ব ভাষার,
নিপুণ শিল্পীর মত আহরি' মণির রাশি
রচিলে নবীন ছন্দে হার।
শুধু অশ্রুজল নয়, আজ প্রতিভার পায়
বাঙ্গালীর প্রাণ-সমর্পণ,
উঠে লক্ষ বক্ষপুটে অভিনন্দনের ধ্বনি—
লহ, কবি, জাতির তর্পণ!
বাণী-পদপ্রান্তে ছিন্ন, হে নবীন, তব বীণ!
নমস্কার, তারে নমস্কার!
দেবের প্রসাদ সম বাঙ্গালী মাথায় ক'রে
বহিবে সে সঞ্জীবনী-ভার।
যত দিন বঙ্গভাষা— রবে এ বাঙ্গালী জাতি,
তব নাম হবে না বিলীন,
মহাকাল বক্ষে করি' হে নবীন, তব স্মৃতি
চিরদিন রহিবে নবীন!
পশি পদ্য-পদ্ম-বনে শ্রীমধুসূদন কবি
মধুচক্র করিল রচন;
সে ত শুধু মধু নয়,— সে যে সঞ্জীবনী-সুধা—
শৌর্য্যের বীর্য্যের প্রস্রবণ;
সে সঙ্গীতে মত্ত মুগ্ধ হেম-কবি রচিলেন
মহাকাব্য বিবিধ যতনে,
তুলি' নানা খনি হ'তে বিচিত্র মণির রাশি,
সাজাইলা রতনে যতনে।
হে চির-নবীন কবি, তুমি গেলে ভিন্ন পথে,
তুমি খুলে দিলে এক দ্বার,
যাহা কলঙ্কিত জানি' কোন শিল্পী স্পর্শে নাই—
অন্ধকারে ছিল সে আঁধার,—

সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা তুমিই দেখালে খুলে'—
বাঙ্গালীর নিজস্ব সে ধন,
তুমিই লেপিয়া কালী তুমিই অশ্রুর জলে
ধুয়াইয়া করিলে পাবন!
তুমিই অপূর্ব্ব গানে ফুটাইলে প্রাণে প্রাণে,—
কাপুরুষ নহে বঙ্গবাসী;
তুমি দেখাইলে আঁকি' বঙ্গ-অন্তঃপুরমাঝে
নারীজাতি পোষে অগ্নিরাশি!
গদ্যের রাজশ্রী লয়ে উদিলা বঙ্কিম যবে,
ভাষার সে একচ্ছত্রী ভূপে,
নমিল বিস্ময়ে সবে;— তুমি পদ্য-পদ্মবনে
আহরিতে ছিলে মধু চুপে,
অকস্মাৎ নব কাব্যে তোমার বিজয়-ভেরী
ঘোষিল জাতির জাগরণ;
আজ যার ভাব-স্রোতে বঙ্গদেশ ডুবু-ডুবু,
ভেসে যায় ভারত-ভুবন!
সাহিত্য-সম্রাট সাথে মিলিয়া পদ্যের রাজা
গতি-রথ চালালে কখন?
নিজে নারায়ণ তার সারথি;—সে রথ আর
মানে কি কাহারো নিবারণ!
তার পরে গেল ভেদ, হ'ল দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর,
ডুবে গেল দেশ কাল কূল,
লোকেশ্বর-পদে রাখি' লোকাতীত গীত-অর্ঘ্য
ভক্ত কবি কাঁদিয়া আকুল!
গৈরিক-নিঃস্রব সম অশান্ত উত্তাল ছন্দ—
গদ-গদ তবু সে ঝঙ্কার,
সে উদাত্ত পুণ্যশ্লোক কাঁদিয়া কাঁদালে সবে,
পাষাণে বহালে সুধা-ধার,
সার্থক জনম তব, সার্থক নবীন নাম,
ধন্য তুমি কবি-কীর্ত্তীশ্বর,

যত দিন বঙ্গভাষা, রবে বাঙ্গালীর নাম,—
কহি,—তুমি অমর অমর!

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

হিন্দু স্থাপত্য।

২

অনুসন্ধান করিলে এখনও ইহার মধ্যে দুই চারিখানি পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে। এসিয়াটিক সোসাইটীর সংগৃহীত পুঁথি সকলের মধ্যে "মানসার" "ময়মত", "কশ্যপ" ও "বৈখানস", এই চারিখানি পুঁথির অনেকাংশ বিদ্যমান আছে। অন্য কয়খানির কোনওখানির দুই পরিচ্ছেদ, কোনওখানির এক পরিচ্ছেদ, কোনওখানির বা দুই চারিখানি পৃষ্ঠামাত্র পাওয়া গিয়াছে। পুঁথি-গুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। উহার অনেক প্রয়োজনীয় স্থানই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংগৃহীত পুঁথির যে সমস্ত স্থান একটু পড়িবার মত, তাহা অজ্ঞ লিপিকরদিগের প্রমাদে এরূপ পরিপূর্ণ, এবং উহা এরূপ বিকৃত যে, ঐ সকল পরিভাষা হইতে অর্থগ্রহণ একেবারে দুঃসাধ্য। ইহার মধ্যে "মানসার"-খানির অবস্থা একটু ভাল। এখানি অনেকটা প্রকৃত অবস্থায় আছে। দক্ষিণ-ভারতে এই গ্রন্থখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ, এবং প্রধানতম শিল্পগ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত। মানসার নামক ঋষি এই গ্রন্থখানির প্রণেতা। কেহ কেহ বলেন, 'মান'=পরিমাণ+সার। এই পুস্তকে ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য প্রভৃতি বিবিধ কলাদির "মান=পরিমাণ" নির্দ্দেশ করা আছে বলিয়া উহার নাম "মানসার"। কিন্তু ঐ গ্রন্থেই লিখিত আছে যে, মানসার ঐ পুস্তকের লেখক। এই গ্রন্থে গৃহাদি ও দেবমন্দিরের নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং স্থাপত্য-কার্য্য-সম্বন্ধীয় নানা কথা বিস্তৃত-ভাবে লেখা আছে। পূর্ব্বে অনেক সময় স্থাপত্য-বিষয়ক কূট প্রশ্নের মীমাংসার জন্য এই পুস্তকের সাহায্য গৃহীত হইত। ইহার অনু-ক্রমণিকায় লিখিত আছে যে, এই গ্রন্থখানি আটান্নটী অধ্যায়ে বিভক্ত।*

---

* সাধারণের অবগতির জন্য 'ময়মতে'র অনুক্রমণিকা-বর্ণিত অধ্যায়গুলি নিম্নে যথাযথভাবে লিখিত হইল।—১ম অধ্যায়ে ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য ও সূত্রধরের কার্য্যের নানা পরিমাণ। ২য় অধ্যায়ে শিল্পীর কি কি বিষয়ে অভিজ্ঞতা আবশ্যক ও বিশ্বকর্ম্মা হইতে সমুদ্ভূত ভাস্কর, বন্ধকী, কাংসকার কর্ম্মকার ও মণিকার, এই পঞ্চ শিল্পীর বংশ-বিভাগ ও তাহাদের বিবরণ।

প্রত্যেক অধ্যায়ে এক একটি বিষয় বিস্তৃতভাবে লিখিত। সংগৃহীত পুস্তকে একচত্বারিংশৎ অধ্যায়ের অধিক নাই। ইহাতে স্থাপত্য ও ভাস্কর-কার্য্যের পরিমাণ-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলি, গৃহ ও মন্দিরনির্ম্মাণের উপযোগী ভূমি-নির্ব্বাচন, দিঙ্‌নির্দ্দেশ-প্রণালী, পল্লী, নগরী, মহানগরী, প্রাসাদ, অট্টালিকা, মন্দির, তোরণ, মণ্ডপ, মঞ্চ, স্তম্ভ, স্তম্ভের শিরোভূষণ, বেদী, স্তম্ভগাত্রের ও ভিত্তিগাত্রের নানা প্রকার কারুকার্য্য, ক্ষুদ্র হইতে বৃহদায়তনের দ্বাদশতল পর্য্যন্ত নানা প্রকারের মন্দিরনির্ম্মাণ, মনুষ্য-মূর্ত্তি ও নানাপ্রকারের দেবমূর্ত্তির

৩য়, ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে মন্দির ও গৃহ হর্ম্ম্যাদির নির্ম্মাণোপযোগী ভূমির নির্ব্বাচন। ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে শঙ্কুক্ষেত্র নির্ম্মাণ ও তাহা হইতে দিঙ্‌নির্দ্দেশ। ৭ম অধ্যায়ে মহানগরী, নগরী, মন্দির, প্রাসাদ ও গৃহাদি বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করিবার নিয়ম। অষ্টম অধ্যায়ে গৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে কর্ত্তব্য যাগযজ্ঞাদির প্রণালী। ৯ম অধ্যায়ে পল্লী ও নগরীতে কিরূপ পথাদি নির্ম্মিত করিতে হয়, কোন স্থানে মন্দিরাদি স্থাপন করিতে হয়, তাহার বিধান ও বিভিন্ন জাতির বাসস্থাননির্দ্দেশ। ১০ম অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের নগরাদির বর্ণনা। ১১শ অধ্যায়ে গৃহাদি নির্ম্মাণের পরিমাণ। ১২শ অধ্যায়ে গর্ভবিন্যাস, (laying of the foundation stone), ১৩ অধ্যায়ে উপপীঠ (Pedastals), ১৪শ অধ্যায়ে অধিষ্ঠান (basement), ১৫শ নানাবিধ স্তম্ভাদির পরিমাণ।

১৬শ অধ্যায় প্রস্তরা, ১৭শ অধ্যায়ে বন্ধকীয় কার্য্যের নানা বিবরণ, ১৮শ অধ্যায়ে বিমান, মন্দির, এবং প্রাসাদনির্ম্মাণ, ১৯ হইতে ২৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই কয় অধ্যায়ে পিরামিদাকার মন্দিরের চূড়া এবং একতল হইতে দ্বাদশতল পর্য্যন্ত মন্দিরনির্ম্মাণ। ২৯ অধ্যায়ে মন্দিরের প্রাকার নির্ম্মাণ। ৩০ অধ্যায়ে মন্দিরের মধ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগের স্থাননির্দ্দেশ, ৩১ অধ্যায়ে গোপুর, ৩২ অধ্যায়ে মণ্ডপ, ৩৩ অধ্যায়ে শালা নির্ম্মাণ, ৩৪ অধ্যায়ে মহানগরী সম্বন্ধে, ৩৫ অধ্যায়ে মনুষ্যালয় সম্বন্ধে, ৩৬ ও ৩৭ তোরণাদির পরিমাণ, ৩৮,৩৯ অধ্যায়ে প্রাসাদ ও তাহার আনুষঙ্গিক অংশ সম্বন্ধে, ৪০ অধ্যায়ে রাজউপাধিবর্গ কথন, ৪১ অধ্যায়ে বিগ্রহাদি-বহনের নানাপ্রকার রথ ও যানাদি কথন, ৪২ অধ্যায়ে নানাপ্রকার বসিবার আসনাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধে, ৪৩ বিগ্রহ ও রাজাদিগের নানাপ্রকার সিংহাসন নির্ম্মাণ, ৪৪ অধ্যায়ে খিলানের কারুকার্য্য সম্বন্ধে, ৪৫ অধ্যায়ে ইন্দ্রালয়ে সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরু রোপণের কথা, ৪৬ অধ্যায়ে বিগ্রহাদির অভিষেক, ৪৭ অধ্যায়ে বিগ্রহের ও মানবদিগের নানাপ্রকার অলঙ্কার নির্ম্মাণ, ৪৮ অধ্যায়ে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেব মূর্ত্তির নির্ম্মাণ, ৪৯ অধ্যায়ে শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ, ৫০ অধ্যায়ে বিগ্রহ বসাইবার নানাপ্রকার আসনের গঠন প্রণালী, ৫১ শক্তিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ৫২,৫৩ অধ্যায়ে বুদ্ধ ও জৈনদিগের বিগ্রহাদির গঠন, ৫৪ অধ্যায়ে যক্ষ ও বিদ্যাধরদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ৫৫ অধ্যায়ে মুনি, ঋষিগণের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ৫৬,৫৭ অধ্যায়ে দেবমূর্ত্তি ও তাহাদিগের বাহন সম্বন্ধে, ৫৮ অধ্যায়ে বিগ্রহাদির চক্ষুদান ক্রিয়া সম্পর্কীয় পূজাদি বিবরণ লিখিয়া গ্রন্থকার গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন।

নির্ম্মাণ ও নানাবিধ ভাস্কর্য্য ও সূত্রধরের কার্য্য, বাস্তুপূজা, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, দেবতা-প্রতিষ্ঠা, অভিষেক প্রভৃতির সময় অনুষ্ঠেয় যাগ, যজ্ঞ. পদ্ধতি ও জ্যোতিষশাস্ত্র মতে বাস্তুনির্ম্মাণের শুভাশুভ কালাদির বিচার অতিবিস্তৃত-ভাবে লিপিবদ্ধ আছে।

দ্বিতীয় গ্রন্থখানির নাম "ময়মত"। এই গ্রন্থখানি ময়দানব কর্ত্তৃক লিখিত। সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষ-গ্রন্থখানিও ময়দানব কর্ত্তৃক লিখিত। রামায়ণ ও মহাভারতে ময়দানবের বিষয় লিখিত আছে। ময়দানব রাবণের শ্বশুর। ইনি অযোধ্যার রাজা দশরথের যজ্ঞবেদী ও যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের অনুপম সভা-গৃহাদি নির্ম্মিত করিয়াছিলেন। "মানসারে" লিখিত বিষয়গুলির সহিত "ময়মতে" লিখিত বিষয়গুলির পার্থক্য অতি সামান্য। ময়মত-প্রণেতা প্রথমে বাস্তুপূজাপদ্ধতি লিখিয়া গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। পরে ক্রমশঃ গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী ভূমির নির্ব্বাচন, ভূমি-শোধন, শঙ্কুক্ষেত্র-নির্ম্মাণ, তাহা হইতে দিঙনির্দ্দেশ, গৃহ, পীঠ. সাংসারিক ও পূজাদি কার্য্যের জন্য গৃহাদি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিবার নিয়ম, এবং গৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে পূজা ও বলিদানের কথা লিখিয়াছেন। ইহা ভিন্ন এই পুস্তকে পল্লী, নগরী, মহানগরী, দুর্গ, উপপীঠ (pedastals), অধিষ্ঠান (basement), পাদ (pillars), প্রস্তরা (entablature) কারুকার্য্যখচিত গম্বুজ (cupola), বিগ্রহ বসাইবার বেদিকা, মন্দিরের শিখর, গৃহসমাপ্তির পর অনুষ্ঠেয় পূজা, প্রাকার, পিরামিদাকার তোরণ, মণ্ডপ, অলিন্দ, বেদী ও মূর্ত্তিনির্ম্মাণ পর্য্যন্ত নানা বিষয় এই পুস্তকে লিখিত আছে।

তৃতীয় পুস্তকখানির নাম কশ্যপ। প্রজাপতি কশ্যপ এই গ্রন্থের রচয়িতা। উপরি-লিখিত পুস্তক দুইখানি অপেক্ষা এই পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ইহাতে দেবমন্দির ও ভাস্কর্য্য-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বিশদভাবে লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানিতে একটু বিশেষত্ব বর্ত্তমান। দুই জনের কথোপকথনচ্ছলে গ্রন্থের সমস্ত বিষয় লিখিত। এক জন দেবদেব মহাদেব, অন্য জন গ্রন্থকার কশ্যপ। গ্রন্থে গ্রন্থকার মহাদেব কর্ত্তৃক দ্বিজোত্তম বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। এই পুস্তকেও "মানসা'রে" লিখিত প্রায় সমস্ত বিষয়ই লিখিত হইয়াছে। ইহারও প্রারম্ভে গৃহাদিনির্ম্মাণোপযোগী ভূমির লক্ষণাবলি,

* আমরা সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভাস্করাচার্য্যের লিখিত বলিয়াই জানি। ইহা ভিন্ন 'ময়দানব'-লিখিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিষয় আমরা অবগত নহি।

তৎপরে বাস্তু-পুরুষের পূজা, বলিদান, শঙ্কুক্ষেত্র-নির্ম্মাণাদি, নির্দ্দেশ, গর্ভ-বিন্যাস (laying of fouudation stone) উপপীঠ, অধিষ্ঠান, গোপুর, তোরণ, স্তম্ভ, স্তম্ভের শিরোভূষণ ও অন্যান্য অলঙ্কার, মন্দিরপীঠে নির্ম্মিত নানা প্রকারের আসন, মূর্ত্তি-সংস্থাপনের জন্য ভিত্তিগাত্রে কুড্যাঙ্গ-নির্ম্মাণ (Niche) পয়ঃপ্রণালীনির্ম্মাণ, ক্ষুদ্র ও বৃহদায়তনের ষোড়শতল পিরামিডাকার বিমান, কারুকার্য্যভূষিত স্তম্ভবিশিষ্ট তোরণ ও তাহাদিগের গঠনাদির পরিমাণ, দেবমূর্ত্তি, ঋষি ও সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয় লিখিত হইয়াছে।

চতুর্থ গ্রন্থখানির নাম বৈখানস। বৈখানস নামক ঋষি এই গ্রন্থের প্রণেতা। ইনি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংস্থাপয়িতা বলিয়া গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি গদ্যে ও পদ্যে লিখিত। ইহাতে স্থাপত্য-বিষয় অপেক্ষা তৎসম্পর্কীয় পূজা ও ক্রিয়া-কর্ম্মাদির কথাই বিশদভাবে বিবৃত আছে। গ্রন্থকর্ত্তা এই পুস্তকের অনেক স্থলে কশ্যপের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে লিখিত আরও অনেক বিষয় দেখিয়া মনে হয়, এই পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। মঙ্গলাচরণে গ্রন্থকার আর্য্য-ঋষিগণের বাসভূমি ভারতবর্ষের পবিত্রতার বিষয়ে স্তুতি করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। তৎপরে পুত্র, ধন ও জ্ঞান-লাভার্থ অনুষ্ঠেয় কতকগুলি বৈদিক ক্রিয়ার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎপরে বাস্তু-পূজা, বেদীনির্ম্মাণ, পল্লী, নগরী ও মহানগরীর নির্ম্মাণ, তাহাতে ব্রাহ্মণকে আশ্রমপ্রদানের ফল, বিষ্ণুমন্দির-নির্ম্মাণ, বিষ্ণুমূর্ত্তিনির্ম্মাণ প্রভৃতি ভক্তিসহকারে লিখিত হইয়াছে।

পঞ্চম গ্রন্থখানির নাম "সকলাধিকার"। ইহা সুবৃহৎ ও উপাদেয় গ্রন্থ। মহর্ষি অগস্ত্য এই গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছেন। এই অমূল্য গ্রন্থের কিয়দংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত অংশে কেবল ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। প্রাপ্ত অংশের বিস্তারিত লিখনপদ্ধতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, সম্পূর্ণ পুস্তকখানির কলেবর "মানসার" অপেক্ষাও বৃহৎ ছিল।

অন্য কয়খানি গ্রন্থের অতি সামান্য অংশই পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্য তাহাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিলাম না। ইহাদের কোনও-খানিতে মন্দির-নির্ম্মাণ, কোনওখানিতে গোপুরনির্ম্মাণ; কোনওখানিতে ভিত্তিসংস্থাপন, কোনওখানিতে বাস্তু-নির্ম্মাণের কালাকালাদির কথন ও

কোনওখানিতে মূর্ত্তিনির্ম্মাণপ্রণালী লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কয়খানির শিল্পকার্য্য-সম্বন্ধীয় মতামতের সহিত "মানসারে" লিখিত মতামতের বহু সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান।

আরও একখানি পুস্তকে ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য সম্বন্ধে অনেক বিষয় লিখিত আছে। এই পুস্তকখানির নাম "শুক্রনীতি"। ইহা মহর্ষি শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত। অধুনা বোম্বাই প্রদেশস্থ বেঙ্কটেশ্বর ছাপাখানার ক্ষেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি অনেক বিষয় লিখিত আছে। ইহার চতুর্থ অধ্যায়ে মিশ্রপ্রকরণের মধ্যে শিল্পের চতুঃষষ্টি কলার নাম, তাহাদের লক্ষণ ও ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য শিল্পের নাম ও বিষয় লিখিত আছে। * ইহা ভিন্ন এই

* শুক্রনীতির চতুর্থ অধ্যায়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি দেখিতে পাওয়া যায়।—৯৬ শ্লোকে নগরাদির চতুষ্পথের মধ্যে বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি-স্থাপনের ব্যবস্থা; ৯৭ শ্লোকে মেরু আদি ষোল প্রকারের মন্দির; ২০০ শ্লোকে মেরুমন্দিরের লক্ষণ; ২০১ শ্লোকে মন্দর, ধ্বক্ষমালী, দ্যুমণি, চন্দ্রশেখর, মাল্যবান, পারিযাত্র, রত্নশীর্ষ, ধাতুমান্, পদ্মকোষ, পুষ্পহাস, শ্রীকর, স্বস্তিক, পদ্মকূট, বিজয় প্রভৃতি ষোল প্রকার মন্দিরের নামাদির উল্লেখ; ২০৩ শ্লোকে মণ্ডপাদি পরিমাণ; ২০৪ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি তিন প্রকারের প্রতিমা; ২০৫ শ্লোকে সাত্ত্বিকাদি প্রতিমার লক্ষণ; ২০৯ অঙ্গুলাদি প্রমাণ; ২১০ শ্লোকে প্রতিমার উচ্চতার প্রমাণ; ২১৩ অবয়বের প্রমাণ, ২২৫ রম্য প্রতিমার লক্ষণ; ২২৭ অবয়বের আকৃতিবর্ণন; ২৩৪ অবয়বের হৃদয়ের প্রমাণ; ২৩৭ অবয়বের পরিধির পরিমাণ; ২৪৮ প্রতিমার দৃষ্টির প্রমাণ; ২৪৯ প্রতিমার আসনপ্রমাণ; ২৫০ দ্বারপ্রমাণ; ২৫১ দেবলয়ের উচ্চতার প্রমাণ; ২৫২ মন্দিরের প্রমাণ; ২৫৪ প্রাসাদের আকৃতি ও উহার চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মশালা ও মণ্ডপাদির নির্ম্মাণ; ২৫৫ মন্দিরাদির স্তম্ভের প্রমাণ, ও স্তম্ভের নিষেধ; ২৫৬ বিস্তারবিচার ও প্রতিমার বাহনবিচার; ২৫৭ প্রতিমার রূপ ও আয়ুধবিচার; ২৫৯ আয়ুধস্থান বিচার; ২৬১ বহুমস্তকযুত প্রতিমার ব্যবস্থা; ২৬২ বহুভুজযুক্ত প্রতিমার বিচার, ব্রহ্মার মুখনির্ম্মাণের ব্যবস্থা ও হয়গ্রীবাদির আকৃতি; ২৬৬ অনিষ্টকারক প্রতিমা; ২৬৭ সৌম্যদায়ক প্রতিমা ও সাত্ত্বিক প্রতিমার লক্ষণ; ২৭০ বিষ্ণুপ্রতিমার ২৪ প্রকার ভেদকথন; ২৭২ লক্ষণাদির অভাবে দোষরহিত প্রতিমা; ২৭৩ প্রমাণ দোষরহিত প্রতিমা; ২৭৬ যুগভেদে সৌবর্ণাদি প্রতিমা বিভাগ, ২৭৮ অনুক্ত প্রতিমাস্থাপননিষেধ; ২৮০ ভক্তিমান্ পূজকের তপোবলে প্রতিমার দোষ নষ্ট হইয়া যায়; ২৮১ বাহনস্থাপনবিচার; ২৮২ বাহন-লক্ষণ; ২৮৭ গজাননমূর্ত্তি; ২৯০ মনুষ্যের অবয়বের পরিমাণ; ৩০১ স্ত্রীলোকের অবয়বের পরিমাণ; ৩০২ সকলের মুখের পরিমাণ; ৩০৩ বালকদিগের অবয়বের পরিমাণ; ৩০৬ শরীরের পূর্ণতাপ্রাপ্তির বর্ষপরিমাণ; ৩০৮ সপ্ততালপ্রমাণ মনুষ্যাবয়বের পরিমাণ; ৩১০ অষ্টতালপ্রমাণ মনুষ্যাবয়বের পরিমাণ; ৩১২ দশতালপ্রমাণ অবয়বের পরিমাণ; ৩১৯ শিল্পী দেবমূর্ত্তি

পুস্তকপাঠে ধনুর্ব্বেদ ও যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে ব্যূহ-রচনা, সৈন্য-চালনা, ব্যূহাদির নাম, যুদ্ধের নিয়মাবলি, ধনুঃ, বাণ, রথ, গদা, চক্র, প্রাস, তোমর, লঘুনালিক, (বন্দুক), বৃহন্নালিক (কামান), অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) ও গোলাগুলি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা ও নানাপ্রকারের দুর্গাদির নাম ও লক্ষণ লিখিত আছে।

হিন্দুর পুরাণ ও কাব্যাদির রচনাকাল-নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অনেক মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানির রচনাকাল সম্বন্ধেও সেইরূপ নানা মত আছে। ফলে এই সকল গ্রন্থ যে কত কাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। প্রবাদ আছে যে, এই গ্রন্থগুলি পৌরাণিক যুগে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে এ সম্বন্ধে কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। এখন এই সকল গ্রন্থের প্রণয়ন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্যই বিস্মৃতির গভীর তমসায় আবৃত হইয়া গিয়াছে। মানসার নামক গ্রন্থের রচয়িতার নাম মানসার। তিনি এক জন ঋষি। আমরা আর কোনও গ্রন্থে মানসার ঋষির নাম দেখিতে পাই নাই। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রন্থের লেখক কশ্যপ ও ময়দানবের কথা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, এবং আধুনা সাধারণের নিকট পরিচিত। এখন অনেকে মনে করেন যে, এই গ্রন্থগুলি দাক্ষিণাত্যেই লিখিত হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে যে সমস্ত প্রাচীন মন্দিরাদি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা এই সকল পুস্তকে কথিত নিয়ম অনুসারেই নির্ম্মিত। সেই জন্যই তাঁহারা অনুমান করেন যে, ঐ গ্রন্থগুলি ঐ অঞ্চলেই লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐ মতের সমর্থন করি না। পঞ্চনদ ও উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলি বারবার মুসলমান প্রভৃতি জাতির আক্রমণে, লুণ্ঠনে ও অত্যাচারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই জন্য হিন্দুর প্রাচীন তীর্থ কাশী ও বৃন্দাবনেও আধুনিক মন্দিরাদি ভিন্ন অন্য কিছুই দেখা যায় না। ফা-হিয়ান তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে কাশীতে এক শত ফিট উচ্চ তাম্র-নির্ম্মিত যে বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন, আজকাল তাহার কোনও নিদর্শনই পাওয়া যায় না। ৺বৃন্দবনধামেও যে যাবনিক বিপ্লবে বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা সকলেই

মূর্ত্তি কখনও বৃদ্ধসদৃশ কল্পনা করিবেন না; ইত্যাদি। আমাদের সংগৃহীত শুক্রনীতিখানি বোম্বাইনগরে মুদ্রিত। উহার উপক্রমণিকায় শ্লোকের সংখ্যা যেরূপ লিখিত আছে, গ্রন্থে তাহা দেখা যায় না।

অবগত আছেন। আজকাল বৃন্দাবনের যাহা কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ও তদীয় ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তবৃন্দের প্রগাঢ় ভগবদ্ভক্তির নিদর্শন।

এই শিল্পশাস্ত্রগুলির মধ্যে মানসার ও অন্য দুই একখানিতে জৈন ও বৌদ্ধদিগের মন্দির ও বিগ্রহাদিনির্ম্মাণের কথা, এবং ঐ সকল মন্দিরাদি গ্রাম ও নগরীর কোন স্থানে নির্ম্মিত হইবে, তাহার কথা লিখিত আছে। উহা দেখিয়া সহজেই মনে হয়, ঐ সকল পুঁথি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে লিখিত। কেবল তাহাই নহে। বৌদ্ধ ও জৈনদিগের জন্য নির্ব্বাচিত স্থানগুলি হিন্দুদিগের মন্দিরাদির জন্য নির্ব্বাচিত স্থান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহা দেখিয়া মনে হয় যে, ঐ সকল গ্রন্থ বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সময় লিখিত হইয়াছে।

৺রামরাজ বলেন,—"মানসারের যে অধ্যায়ে মুনি, ঋষি ও সাধুদিগের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সেই স্থানে কতকগুলি সাধু ও সন্ন্যাসীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা শালিবাহনের তৃতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" গ্রন্থখানি মন দিয়া পাঠ করিলে বুদ্ধিমান্ পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, এই গ্রন্থের কতক অংশ অতি প্রাচীন, আর কতক অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ঐ সকল স্থান প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির স্থানে স্থানে অপ্রাসঙ্গিক কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইন্দ্রালয়ে সর্ব্বফলপ্রদ কল্পতরু-রোপণের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল অংশ প্রক্ষিপ্ত।

সকলাধিকারের যে ক্ষুদ্র অংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কেবল ভাস্কর্য্য শিল্পের বিষয় লিখিত আছে। ঐ অংশ হইতে উক্ত গ্রন্থের রচনাকাল নির্ণয় করা যায় না। এই খণ্ডিত অংশের কোনও স্থানে অগস্ত্যের নাম দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাস এই যে, মহর্ষি অগস্ত্য পাণ্ড্য-রাজ্য-সংস্থাপনের পূর্ব্বে কিংবা সময়ে পুরী ও নগরাদির নির্ম্মাণের জন্য এই গ্রন্থখানির রচনা করিয়াছিলেন। এই জনপ্রবাদে যদি বিশ্বাসস্থাপন করা যায়, তাহা হইলে এই গ্রন্থ যে বহু প্রাচীন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রীতনামা।

২

নন্দলালের রীতনামায় যে সকল রীতির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি প্রহ্লাদ রায়ের রীতনামার পুনরুল্লেখ, কতকগুলি বা তাহার আংশিক রূপান্তরমাত্র। এতদ্ব্যতীত অনেক নূতন রীতও ইহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। শিখদিগের নৈতিক জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহ যে তাহাদের প্রত্যেককার্য্যে কঠোর দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাও ইহাতে জানিতে পারা যায়। শিখেরা তাঁহার মতে কার্য্য করিলে যে বিশেষ উন্নতিলাভ করিবে, এবং ভারতবর্ষ তুর্ক-হস্ত-চ্যুত হইবে, সে বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। সে জন্যই তিনি নন্দলালকে শিখদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের উপদেশ দিয়া রীত নামোক্ত শেষ কথাগুলি এত দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিয়াছিলেন। নিম্নে এই সুন্দর শিখ-সংহিতার বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল।

নন্দলাল (১) শিখদিগের অবশ্যকর্ত্তব্য ও নিষিদ্ধ কার্য্যগুলি জানিবার জন্য গুরুগোবিন্দ সিংহকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলে, গুরু উত্তর করেন,— "শিখদিগের কি করা উচিত বা অনুচিত, তাহা বলিতেছি, শুন ;—

১। স্নান, দান ও প্রার্থনা সকলেরই নিত্যকরণীয়।

২। যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে সঙ্গতে (২) গমন করে না, সে মহাপাপী। এ কার্য্যটিকে যে অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করে না, কি ইহকাল কি পরকাল, কোথাও সে সুখ পাইবে না।

৩। পূজার সময় যে অন্য বিষয়ের আলোচনা করে, পরকালে তাহাকে নিরয়-গামী হইতে হইবে।

৪। দরিদ্র ব্যক্তিকে দেখিয়াও যে তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করে না, সে মহাপাপী।

(১) শুনা যায়, ইনি গুরু গোবিন্দ সিংহের মাতুল ছিলেন।

(২) যে স্থলে পঞ্চ জন খালসা মিলিত হইয়া 'গুরুগ্রন্থ' পাঠ করেন, তাহাই সঙ্গত। সঙ্গত শিখদিগের দেবালয়স্বরূপ। প্রায় প্রতি সঙ্গতেই একটি করিয়া পাঠশালা থাকে; তথায় গুরু-গ্রন্থের পঠন-পাঠন সম্পাদিত হয়।

৫। গুরূপদেশের বিরুদ্ধাচারী হইলে এ জগতে কোনও কল্যাণই পাইবে না।

৬। গুরূপদেশশ্রবণান্তে যে ভূমিতে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করে, সে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হয়।

৭। লোভপরতন্ত্রতাবশতঃ যে প্রসাদ গ্রহণ করিবে, অথবা পক্ষপাতিতা-বশতঃ কাহাকেও তাহা অধিকতর এবং কাহাকেও বা অল্পতর পরিমাণে পরিবেশন করিবে, সে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

৮। কড়াহ প্রসাদ প্রস্তুত করিবার যে বিধি আছে, তাহা সর্ব্বদাই মান্য করিবে।—সমপরিমাণ ঘৃত, ময়দা ও মিষ্ট (৩) একত্র পক্ব করিয়া প্রসাদ প্রস্তুত করিতে হয়। পাক করিবার পূর্ব্বে পাকক্ষেত্রটি গোময়লিপ্ত করিয়া লইবে। (৪) পাত্রাদি সুন্দরভাবে মাজিয়া ধুইয়া লইবে। স্নানান্তে শুদ্ধাচত্তে কেবল 'শ্রীবাহি গুরু' (৫) জপ করিতে করিতে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিবে। লৌহপাত্র সহযোগে কূপ হইতে জল তুলিয়া নূতন কলসে করিয়া সেই জল ব্যবহারার্থ পার্শ্বে রাখিয়া দিবে। যে এই বিধিগুলি সুচারুরূপে মান্য করিবে, গুরু তাহাকে পুরস্কার দিবেন। এইরূপে প্রসাদ প্রস্তুত হইলে তাহা ভূমি হইতে উচ্চ স্থানে রাখিবে, এবং সকলে বেষ্টন করিয়া স্তোত্র পাঠ করিতে থাকিবে। নন্দলাল! ভগবানের প্রীতিপ্রদ এই বিধিগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মান্য করিও।

৯। (ক) তুর্কের বস্ত্র অথবা তাহার অধিকৃত কোনও দ্রব্য মস্তকে ধারণ করিলে, এবং (খ) কোনও লৌহখণ্ড পদদলিত করিলে বহুবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে।

---

(৩) যে কোনও মিষ্ট দ্রব্য হইলেই চলিতে পারে—এ বিষয়ে কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। কিন্তু সাধারণতঃ চিনিই ব্যবহৃত হয়।

(৪) পশ্চিম-ভারতে এরূপ সুসংস্কৃত স্থানকে 'চৌকা' বলে। পাক করিবার পূর্ব্বে পাক-ক্ষেত্রটি এরূপ সুসংস্কৃত করা চাই-ই। একবার চৌকায় প্রবেশ করিলে, পাক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করিবার নিয়ম নাই।

(৫) শিখেরা হ্রস্ব 'ই'কার ও হ্রস্ব 'উ'কার কতকটা হসন্ত করিয়াই উচ্চারণ করে। এ জন্য 'বাহি' উচ্চারিত হয় 'বাহ্', গুরু=গুর, হরি=হর্, মন্দির=মন্দর, সতি=সৎ, প্রসাদি=প্রসাদ্, জপুজী=জপ্জী, জাপুজী=জাপ্জী ইত্যাদি।

(৬) লৌহখণ্ড শিখদিগের পূজ্য। অঙ্গে লৌহধারণ করা শিখদিগের একটি অবশ্য-প্রতিপাল্য রীতি। ১৮ ও ৪৭ সংখ্যক বিধিগুলি দ্রষ্টব্য।

১০। কোনও শিখ সঙ্গতের অধিবেশন দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া তাহাতে যোগ না দিলে,

১১। দানবিধি সম্যক্‌রূপে পালন না করিয়া অন্নদান করিলে,

১২। রক্ত-বস্ত্র পরিধান করিলে,

১৩। নস্য গ্রহণ করিলে,

১৪। সঙ্গতে (শিখ-সভায়) বসিয়া কোনও ব্যক্তির মাতা কিংবা ভগ্নীর প্রতি বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে,

১৫। অন্যায় ক্রুদ্ধ হইলে,

১৬। যথাকালে স্বীয় কন্যাকে বিবাহিত না করিলে,

১৭। কন্যা কিংবা ভগ্নীর বিবাহ দিয়া অর্থগ্রহণ করিলে,

১৮। ছুরিকা, অঙ্গুরি প্রভৃতি যে কোনও আকারেই হউক, লৌহখণ্ড ধারণ না করিলে,

১৯। অন্যায় বলপূর্ব্বক ভিক্ষুকের ধন গ্রহণ করিলে,

২০। তুর্ককে অভিবাদন করিবার নিমিত্ত হস্তোত্তোলন করিলে,— তাহাকে বিষম নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এই একাদশটি বিধি ভঙ্গ করিলে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হইবে।

২১। শিখেরা দিনে দুইবার তাহাদের কেশ আঁচড়াইবে ; (৭)

২২। কেশ সুবিন্যস্ত করিয়া তবে শিরস্ত্রাণ ধারণ করিবে ;

২৩। প্রতিদিন দন্ত মার্জ্জনা করিবে। এই বিধিগুলি মানিলে দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবে।

২৪। যে স্বকীয় আয়ের এক দশমাংশ গুরুকে প্রদান না করিয়াই আপনি ভোগ করিতে থাকে, সে অবিশ্বাসী, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই।

২৫। যে শীতল জলে স্নান করে না, (৮)

---

(৭) গোবিন্দের এই বিধিটি বিলাসিতার পরিপোষক নহে। প্রত্যুত শিখদিগের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যেই ইহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। পাছে শিখেরা নিষ্প্রয়োজন-বোধে মস্তকের কেশ না আঁচড়াইয়া, কেশ-রাশি কীটাচ্ছন্ন করিয়া তুলে, এই ভয়েই এইরূপ বিধি প্রণীত হইয়া থাকিবে। ১৩১৫ সালের ৬ষ্ঠ সংখ্যার "জাহ্নবী"তে শাখীনামার ৩০শ (ত্রিংশ) শাখীতে ভাই ফৈরুর যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ ভয়ের যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৮) এ বিধিটিও শিখদিগের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে ও সেই সঙ্গে বিলাসিতা-পরিবর্জ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

২৬। যে 'জপুজী' পাঠ না করিয়াই আহার গ্রহণ করে,

২৭। যে 'রহিরাস' পাঠ না করিয়া সায়ংকাল অতিবাহিত করে,

২৮। পূজাদি না করিয়াই যে নিদ্রা যায়,

২৯। যে হীন নিন্দাবাদ দ্বারা অপরের অনিষ্ট করে,

৩০। শিখের সন্তান শিখ হইয়া যে স্বীয় ধর্ম্মের উপদেশাবলী উপেক্ষা করে,

৩১। কোনও কথা স্বীকার করিয়া শেষে যে তাহা আবার অস্বীকার করে,

৩২। কশাইএর নিকট হইতে যে আহারার্থ মাংস ক্রয় করে, (৯)

৩৩। যে গুরুনির্দ্দিষ্ট সঙ্গীত ব্যতীত অপর সঙ্গীত গান করে, (১০)

৩৪। যে বারস্ত্রী অথবা পরস্ত্রীর সঙ্গীত শ্রবণ করে, নরকেও তাহার স্থান হইবে না।—সর্ব্বথা নিন্দনীয় এই একাদশটি পাপ প্রত্যেক শিখের নিকটই অবশ্য হেয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৫। ফকীরসুলভ আচরণ না করিয়াই যে আপনাকে 'ফকীর' বলিয়া পরিচিত করিবে, এবং যে জীবদেহের অসারতার ও অকালপুরুষের নিত্যত্বের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাহীন, সে বিশ্বাসঘাতক। সেরূপ ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ না করাই উচিত।

৩৬। যে 'আরদাস (১১) পাঠ না করিয়াই কোনও কার্য্য আরম্ভ করে,

৩৭। প্রথমে গুরুকে কিয়দংশ নিবেদন না করিয়া, অথবা তাঁহার

(৯) 'জবাই' করা মাংসাহার শিখদিগের একান্ত পরিত্যাজ্য। যে পশুর মাংস আহার করিতে হইবে, কোনও শিখকে খড়্গের এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিতে হইবে। এরূপ বলিদানকে শিখেরা 'ঝুট্কা' বলে।

(১০) এখানে, অপর সঙ্গীত অর্থে কুসঙ্গীত বা বিলাস-সঙ্গীত গান করা অন্যায়, ইহাই বুঝাইতেছে, মনে হয়।

(১১) সর্ব্বকর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে আরদাস পাঠ করা শিখদিগের একটি অবশ্য-প্রতিপাল্য বিধি। গুরু গোবিন্দসিংহের প্রণীত দশ বা পাদশাহকা গ্রন্থের অধ্যায় বিশেষ 'চণ্ডীকী বার' বা চণ্ডীর কথা হইতে উহার প্রথম শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে। সে শ্লোকটির অনুবাদ এইরূপ,—'সর্ব্বপ্রথম গুরু নানক দেবী ভগবতীর অর্চ্চনা করেন; তৎপরে গুরু অঙ্গদ, গুরু অমর দাস ও গুরু রামদাস তাঁহার পূজা করেন। দেবী তাঁহাদের সকলের প্রতিই প্রসন্ন হইয়াছিলেন। গুরু অর্জ্জুন, গুরু হরগোবিন্দ, গুরু হররায় ও গুরু তেগ বাহাদুর তাঁহার পূজা করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন, গুরু গোবিন্দ সিংহকেও তিনি সর্ব্বদা সাহায্য করেন।

উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ পৃথক্ না রাখিয়াই যে আহার গ্রহণ করে, (১২)

৩৮। অপরের পরিত্যক্ত দ্রব্য যে ব্যবহার করে,

৩৯। স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অপর রমণীর সহিত যে নিদ্রা যায়,

৪০। ভিক্ষুক দেখিয়া যে তাহার দুঃখবিমোচনে চেষ্টা না করে,

৪১। প্রার্থনা করিতে ও ধর্ম্মোপদেশপালনে যে উপেক্ষা করে,

৪২। কোনও শিখ-ভিক্ষুককে যে তিরস্কার করে, অথবা তাহার অহিতাচরণ করে,

৪৩। জ্ঞাতসারে যে অপরের অন্যায় নিন্দাবাদ করে,

৪৪। জুয়া পাশা খেলে, এবং

৪৫। পরদ্রব্য বিষবৎ ত্যজ্য জানিয়াও যে পরদ্রব্য অপহরণ করে, বা বলপূর্ব্বক গ্রহণ বরে, সে এই একাদশটি পাপের শাস্তিস্বরূপ কঠোর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে।

৪৬। গুরুর কোনও অপবাদে কর্ণপাত করিও না (১৩) যে এরূপ গুরুনিন্দা করে, সে অসির আঘাতে অবশ্য-বধ্য।

৪৭। গুরুকে অসি অথবা অন্য কোনরূপ অস্ত্র উপহার দিতে হয়। গুরুর সমীপে উপস্থিত হইয়া অসি স্পর্শ করিতে হয়। কাহারও সহিত

(১২) ভোজনের প্রারম্ভে ভোজ্য দ্রব্য ইষ্টদেবতাকে ও পঞ্চ বায়ুকে নিবেদন করা ভারতীয় আর্য্যবিধি। গোবিন্দও এই বিধিটি বলবৎ রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, দেখা যায়। গুরুই শিখদিগের ধ্যান ধারণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাহাদের ইষ্টদেবতা হইয়াছিলেন। শিখেরা তাঁহার তৃপ্তিসম্পাদনের জন্য সর্ব্বদা তৎপর থাকিত।

(১৩) ইহা নূতন বিধি নহে। আবহমান কাল ধরিয়া হিন্দু সমাজে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র মনুসংহিতায় দৃষ্ট হয়,—

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ। ২।২০০
পরীবাদাৎ খরো ভবতি শ্বা বৈ ভবতি নিন্দকঃ।
পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী। ২।২০১

যেখানে গুরুর পরীবাদ (বাস্তব-দোষোক্তি) অথবা নিন্দা (মিথ্যা-দোষোক্তি) হয়, তথায় হস্তাদি দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছন্ন করা অথবা অন্যত্র গমন করা শিষ্যের অবশ্যকর্ত্তব্য। গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি এবং নিন্দা করিলে কুকুর যোনি প্রাপ্ত হইতে হয়। গুরুর দ্রব্য অন্যায়রূপে ভোগ করিলে কৃমি ও গুরুর উৎকর্ষ সহ্য করিতে অক্ষম হইলে কীট হইয়া জন্মিতে হয়। ২য় অধ্যায়; ২০০।২০১ শ্লোক॥

সাক্ষাৎ করিবার কালে শিখেরা অনুধারণ করিবে। সর্ব্বদাই সঙ্গে অস্ত্র রাখিবে, (১৪)

৪৮। মূলধন না লইয়া যে ব্যবসায় করিতে যাইয়া অপরকে প্রবঞ্চনা করে, সে সহস্র সহস্র বার নরকে গমন করিবে।

৪৯। যে ফুৎকার দিয়া আলো নিবাইয়া দেয়; (১৫) অথবা

৫০। যে পানাবশিষ্ট জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করে,

৫১। যে 'শ্রীবাহিগুরু' উচ্চারণ না করিয়া আহার গ্রহণ করে,

৫২। যে বারস্ত্রী গমন করে,

৫৩। যে পরস্ত্রীর সহিত 'ঠাট্টা তামাসা' করে,

৫৪। যে গুরুর সহিত প্রবঞ্চনা করে,

৫৫, যে গুরু-পত্নীকে পাপদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে,

৫৬। যে গুরুকে ত্যাগ করিয়া অপরের ধর্ম্মমত গ্রহণ করে,

৫৭। কটিদেশের নিম্নভাগ উলঙ্গ রাখিয়া যে নিশিযাপন করে,

৫৮। স্ত্রীর সহিত যে উলঙ্গাবস্থায় শয়ন করে,

৫৯। অবশ্যপরিধেয় 'কাচ' পরিধান না করিয়া অথবা 'ধুতি' পরিয়া যে স্নান করে, এবং

৬০। (ক) যে স্ত্রীলোকের নিকট উলঙ্গ হয়, (খ) যে হস্ত প্রক্ষলন না করিয়া আহার গ্রহণ করে ও (গ) যে যথোচিত বস্ত্রাদি পরিধান না করিয়া আহার্য্য পরিবেশন করে, সে শিখের পক্ষে মহাপাপী বলিয়া গণ্য। এই ত্রয়োদশটি পাপের জন্য তাহাকে বিষম শাস্তি ভোগ করিতে হইবে,

৬১। যে অপরের নিন্দা করে না,

৬২। সম্মুখ-রণে প্রবৃত্ত হয়,

৬৩। (দরিদ্রকে) ভিক্ষা দেয়,

(১৪) ক্ষত্রিয়-রাজ গুরু গোবিন্দসিংহের এই বিধিটি চিন্তনীয়। দেশের স্বাধীনতা-সংস্থাপন করাই যে জাতির প্রধানতম উদ্দেশ্য হইয়া উঠিয়াছিল, এরূপ নিয়ম তাহাদেরই শোভা পায়। যাহা সৎ, যাহা উত্তম, তাহাই গুরুকে নিবেদন করিতে হয়। ক্ষত্রিয় বীরের নিকট অসি অপেক্ষা উত্তম আর কি আছে?

(১৫) আমাদের এই বাঙ্গলাতেও এরূপ ভাবে আলো নিবাইয়া দেওয়া রমণী-সমাজে রীতি-বিরুদ্ধ। তাঁহারা কাপড় দোলাইয়া, বা হস্ত দ্বারা বায়ুসঞ্চালন করিয়া আলো নিবাইয়া থাকেন। এরূপ প্রথার উদ্দেশ্য কি?

৬৪। তুর্ককে হত্যা করে,

৬৫। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রণয়, (১৬) অহঙ্কার—এই পঞ্চ রিপুকে যে জয় করে,

৬৬। যে ব্রাহ্মণদিগের ষোড়শ সামাজিক বিধি (১৭) অগ্রাহ্য করে, ও

৬৭। একমাত্র পরমেশ্বরে বিশ্বাস করে,

৬৮। দিবারাত্রি সতর্ক থাকে,

৬৯। গুরুর উপদেশ ভালবাসে,

৭০। শরীরের কেবল সম্মুখ অংশেই অস্ত্রাঘাত ধারণ করে, (১৮)

৭১। মনুষ্য ভগবৎ-সৃষ্ট জানিয়া যে তাহার কষ্টের কারণ হয় না, (কারণ, মানুষকে কষ্ট দিলে জগৎ-প্রসবিতা অকালপুরুষ রুষ্ট হয়েন) সেই যথার্থ খালসা। (১৯)

৭২। যে দরিদ্রদিগকে পালন করে,

৭৩। স্বীয় ধর্ম্মের শত্রুদিগকে যে নষ্ট করে,

---

(১৬) এখানে প্রণয় অর্থে বৃথা কার্য্যে অত্যধিক আসক্তি, মনে হয়। প্রকৃত খালসার নিকট গুরু-চিন্তাই সারাৎসার হইয়া উঠিবে, তাঁহার আবার অন্য বিষয়ে আসক্তি কেন?

(১৭) (১) গর্ভাধানাদি সংস্কার, (২) জাতকর্ম্ম, (৩) নামকরণ, (৪) গৃহনিষ্ক্রমণ, (৫) অন্নপ্রাশন, (৬) চূড়াকরণ, ও পরে কেশান্তসংস্কার, (৭) উপনয়ন, (৮) গুরুগৃহে পাঠারম্ভ, (৯) বিবাহ, এবং (১০) ঊর্দ্ধদৈহিক সংস্কার, মনূক্ত এই দশবিধ সংস্কার হিন্দুরা অতীব শ্রদ্ধার সহিত মান্য করিয়া থাকেন। শিখেরাও ষষ্ঠ ও সপ্তম সংস্কারটি ব্যতীত অপরগুলি পালন করিয়া থাকেন। গোবিন্দ হিন্দুসংস্কার অমান্য করাকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেও, তাহারা বংশানুক্রমিক রীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তবে তাহারা হিন্দু শাস্ত্রের শাসন সম্যক্ পালন করে না, এ কথাও সত্য।

অবশিষ্ট ছয়টি হিন্দুসংস্কার এই, (১) বেদ-বিধান মত স্নান, (২) প্রাতে ব্রহ্মা, মধ্যাহ্নে বিষ্ণু ও সায়ংকালে উপাসনা (৩) পিতৃপুরুষদিগের তর্পণ, (৪) আহার্য্যগ্রহণকালে দেব ও জীবোদ্দেশে খাদ্যের কতকাংশ পৃথক্‌স্থাপন, (৫) শ্রাদ্ধাদিকালে পিতৃপুরুষদিগকে পিণ্ডদান, (৬) ভিক্ষাদান। এগুলিও শিখেরা, হিন্দুশাস্ত্রমতে না হইলেও, প্রকারান্তরে পালন করিয়া থাকে। জপুজী ও জাপুজী পাঠ করিতে করিতে স্নান তাহাদের নিত্য কর্ম্ম। তাহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির উপাসনা না করিলেও 'রহিরাস' পাঠ করিতে করিতে গুরুর উপাসনা করে। অপরগুলি পালন করিবার জন্য তাহাদের পৃথক্ বিধি দৃষ্ট হয়।

(১৮) অর্থাৎ, রণে পশ্চাৎ-প্রদর্শন না করিয়া সম্মুখরণে আহত হয়।

(১৯) গোবিন্দ সাধারণ শিখ হইতে যে কৌশলে প্রথমে খালসা (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ শিখ) পঞ্চ জনকে সংগ্রহ করেন, তাহা বড়ই সুন্দর। সংক্ষেপে সে বৃত্তান্তটি নিম্নে প্রদত্ত হইল। গোবিন্দ

৭৪। ঈশ্বরকে একমেবাদ্বিতীয়ং জ্ঞান করিয়া যে তাঁহার পূজা করে, (২০)
৭৫। যে প্রবল শক্রদিগকে পরাজিত করে,
৭৬। অশ্বারোহণ করে,
৭৭। সর্ব্বদা যুদ্ধরত থাকে,
৭৮। সর্ব্বদা অস্ত্র ধারণ করে,
৭৯। তুর্ক বধ করে, (২১)
৮০। শিখ-ধর্ম্মের প্রচারে সাহায্য করে,

৺নয়নাদেবীর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত শিখদিগকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই উদ্দেশ্যে সমস্ত শিখমণ্ডলী এক মেলায় সমবেত হইলে, গোবিন্দ উন্মুক্ত অসি হস্তে তাহাদের নিকট গমনপূর্ব্বক বলিলেন—"পাঁচ জন শিষ্যের পবিত্র শির চাই। কে দিবে?" এই অভিনব প্রার্থনা শুনিয়া শিখ-সমাজ চমৎকৃত হইয়া উঠিল, কেহই সে আহ্বানের উত্তর প্রদান করিল না। এইরূপে দ্বিতীয় আহ্বানও বিফল হইল। কিন্তু তৃতীয়বারে দয়াসিংহ নামক লাহোরনিবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় শিখ 'শির'-প্রদানে অগ্রসর হইলেন, এবং প্রথম দুই আহ্বান অবহেলা করিয়াছিলেন, এই জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে লইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একটি ছাগ বলি দিলেন। লোকে ভাবিল, বুঝি দয়াসিংহের মস্তক দেহচ্যুত হইল। একবার কেহ প্রথম পথ দেখাইলে, অনেকে সেই পথে অগ্রসর হইতে সাহস পায়, ইহাই মানব-রীতি। দয়াসিংহের পর আরও চারি জন যথাক্রমে গুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন; গুরু তাঁহাদের প্রত্যেককে লইয়া যাইয়া প্রতিবারেই ছাগবধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চ বিশ্বাসীকে একত্রিত করিয়া যখন তিনি শিখমণ্ডলীর মধ্যে আবার দেখা দিলেন, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। সকলেই আনন্দে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। এইরূপে সাধারণ শিষ্যগণ হইতে পাঁচ জনকে পৃথক্ করা হইল। ইহারাই শেষে খালসা হইয়াছিলেন। এই পঞ্চ মহাত্মার নাম যথাক্রমে (১) দয়াসিংহ, লাহোরবাসী ক্ষত্রিয়; (২) ধর্ম্মসিংহ, হস্তিনাপুরনিবাসী জাঠ; (৩) মাহকম, দ্বারকানিবাসী জনৈক ছিপা, (যাহারা কাপড়ে ছাপ দেয়, তাহাদিগকে ছিপা বলে); (৪) সাহেব সিংহ, বিদর্ভপুরনিবাসী জনৈক নাপিত; (৫) হিম্মত সিংহ,—৺পুরীনিবাসী জনৈক কাহার।

(২০) সাধারণ হিন্দুরা নানা দেবদেবীর উপাসক হইলেও, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়—এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। আশ্চর্য্য, পণ্ডিতেরা ও খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়াই হিন্দুকে পৌত্তলিক বলিয়া থাকেন। যে মূর্ত্তিতেই ঈশ্বরের পূজা করা যাউক না, সকল পূজোপহারই সেই একই সনাতন পুরুষের পাদপদ্মে গিয়া উপস্থিত হয়। শিখেরাও এই তত্ত্ব মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

(২১) এ বিধিটি গুরু গোবিন্দের একটি প্রিয় বচন ছিল, দেখা যায়। তিনি শিখদিগকে পুনঃপুনঃ বলিতেন, বৃথাগর্ব্বিত তুর্কশক্তি নষ্ট না করিলে, হিন্দুশক্তি প্রকৃতভাবে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে

৮১। শক্তিমান্ হয়, মস্তকে ছত্র ধারণ করে, ও চামর ঢুলায়; এক কথায়, যে অপর জাতিকে পরাভূত করিতে পারে, সেই যথার্থ খালসা। খালসা-পন্থীরা এই একবিংশটি বিধি প্রতিপালন করিবে।

সর্ব্বদা একমাত্র অকালপুরুষকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া হৃদয় সবল রাখিলে, পরিণামে শিখের শত্রুচয় পর্ব্বতকন্দরে পলায়ন করিবে, এবং খালসা ধর্ম্মের জয় সর্ব্বত্র গীত হইবে; শুন নন্দলাল! আমার (এই ধর্ম্ম) রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করিবে। আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, সকলকে মিশাইয়া এক (অপূর্ব্ব নূতন) জাতি সংগঠন করিব। সকলকে আমি "শ্রীবাহিক গুরু"র পূজা (২২) করিতে শিখাইব। তাহারা সকলে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিবে, শিকারী পক্ষী লইয়া শিকারান্বেষণে রত হইবে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া তুর্কেরা ভয়ে পলাইয়া যাইবে। আমার এক একটি শিখ সওয়া লক্ষ তুর্কের সহিত যুদ্ধ করিবে। যে সকল শিখ রণক্ষেত্রে নিহত হইবে, তাহাদিগের মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। বর্ষা ঢুলিতে থাকিবে, হস্তিযূথ ব্যূহাকারে সজ্জিত হইবে গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি গীত হইবে। যখন সওয়া লক্ষ সৈন্য সজ্জিত হইবে, তখন খালসা পূর্ব্ব পশ্চিম সমস্ত জয় করিবে।

খালসাই শেষে জয়যুক্ত হইবে, আর কোনও শক্তি তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। সকল রাজশক্তিই পরাভূত হইবে, এবং সম্পূর্ণ বিধ্বংসের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহারা সকলে খালসা শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে।"

শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২১)। তুর্কশক্তির অধঃপতনে হিন্দুশক্তির জয় অনিবার্য্য, ইহা গুরু গোবিন্দের দৃঢ় ধারণা ছিল। কিন্তু শিখেরা তাঁহার বাক্যের যথার্থ মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, আজ পর্য্যন্ত মুসলমানকে বৈর চক্ষে নিরীক্ষণ করে। তাহাদের এ ব্যবহার নিন্দার্হ, সন্দেহ কি? জাতি বিদ্বেষের ফল কখনও শুভাবহ হইতে পারে না।

(২২) শিখেরা বলেন যে, 'বাহি গুরু' কলিযুগের মন্ত্র। নানকের সময় হইতেই শিখদিগের মধ্যে এই মন্ত্রের প্রচলন হইয়াছে। তাঁহারা এই মন্ত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন,—বা=বাসুদেব, -হ=হরি, গ=গোবিন্দ, ক—র=রাম। এই চারি নামের আদ্যাক্ষর লইয়া এই মন্ত্রটি গঠিত হইয়াছে।

ষ্ট্রাবো।

ষ্ট্রাবোর ভূগোলবৃত্তান্ত একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। পুরাকালে পৃথিবীর ভূগোলবৃত্তান্ত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই গ্রন্থে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসমূহের সভ্যতার বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থের একাংশে ভারতবর্ষের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ষ্ট্রাবো অতি প্রাচীন লেখক। সম্রাট অগষ্টসের রাজত্বকালে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ষ্ট্রাবো বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই পর্য্যটনলব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহার গ্রন্থের বহুল অংশ লিখিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবো বহু দেশ পর্য্যটন করিলেও, কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে যে সকল গ্রীক লেখক ভারতবর্ষে আগমন করেন, তাঁহাদের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই ষ্ট্রাবো স্বগ্রন্থের ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় অধ্যায় সংকলিত করিয়াছিলেন।

ষ্ট্রাবো ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় অধ্যায় সংকলিত করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। তিনি আমাদের আলোচ্য অধ্যায়ের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন,—"আমি পাঠকবৃন্দকে এই অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া তীক্ষ্ণ সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কারণ, ভারতবর্ষ বহু দূরে অবস্থিত। আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই ঐ দেশে গমন করিয়াছেন। যাঁহারা ভারতবর্ষে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও সেই সুবিস্তৃত দেশের একাংশমাত্র স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহাদের সংকলিত ভারত-বিবরণীর অধিকাংশ জনশ্রুতি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রীক-লিখিত ভারত-বিবরণীর পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহচর লেখকগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তাহাতেও পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য রহিয়াছে। সহচর লেখকগণের প্রত্যক্ষদর্শনমূলক বৃত্তান্তেও অনৈক্য পরিদৃষ্ট হইতেছে। এরূপ অবস্থায় জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সকল বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা যে ভ্রম প্রমাদে পূর্ণ, ইহা নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে যে সমুদয় গ্রীক বণিক নীল নদ, আরব্য উপসাগর

অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে কদাচিৎ কেহ গঙ্গানদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত গমন করেন। এই সকল বণিক অশিক্ষিত। তাঁহারা আপনাদের পরিদৃষ্ট স্থানের বৃত্তান্ত-সংগ্রহে অক্ষম। যদি আমরা আলেকজাণ্ডারের সহচর লেখকগণের বৃত্তান্ত পরিত্যাগ করিয়া তৎপূর্ব্ববর্ত্তী লিখিত বৃত্তান্ত অবলম্বন করি, তবে ভারত-তত্ত্ব আরও অস্পষ্ট হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ, আলেকজাণ্ডার আত্মম্ভরিতা নিবন্ধন এই সকল বৃত্তান্ত যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। লিয়র কক লিখিয়া গিয়াছেন যে, আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে গিড্রোসিয়া দেশ অতিক্রম করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বে সম্রাজ্ঞী সেমিরেমিস ও সম্রাট সাইরাস ঐ পথে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই শত্রু হস্তে পরাজিত হন। সিমিরেমিস বিংশতিসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে পলায়ন করেন। সাইরাসের সঙ্গে তদপেক্ষাও ন্যূনসংখ্যক (সাত) সহচর ছিল। আলেকজাণ্ডার বিবেচনা করেন যে, যদি তিনি বিজয়গৌরবে সিড্রোসিয়া অতিক্রম করিয়া ভরতবর্ষে উপনীত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কীর্ত্তিসৌরভে চারি দিক পূর্ণ হইবে। সম্রাজ্ঞী সিমিরেমিস ও সম্রাট সাইরাস কর্ত্তৃক ভারত অভিযানের বৃত্তান্ত আলেকজাণ্ডার সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যশোমাল্যে ভূষিত হইবার সংকল্প করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভারত-অভিযানের বৃত্তান্ত কি বিশ্বাসযোগ্য? মেগাস্থিনিসও এই সকল বৃত্তান্তে বিশ্বাস স্থাপন করেন নাই; তিনি ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের তাদৃশ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তৎসংক্রান্ত যাহা কিছু আলৌকিক নহে, তাহাই আমাদিগকে যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।"

ষ্ট্রাবো এইরূপ উপক্রমণিকার পর ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা ঐ বিবরণের কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষ নদীমাতৃক দেশ; এই দেশের অনেক নদ নদী গঙ্গা ও সিন্ধুতে পতিত হইয়াছে; বহুসংখ্যক নদ নদী সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে; ভারতীয় নদ নদীর মধ্যে গঙ্গা ও সিন্ধুই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষে বর্ষাকালে শণ, যোয়ার, তিল ও ধান, এবং শীতকালে গম, যব ও দাইল ইত্যাদি বপন করা হইয়া থাকে। ইথিওপিয়া ও মিশরে যে সকল পশু পক্ষী পালিত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষেও তৎসমুদয় দেখা যায়। ভারতবর্ষে কেবল পর্ব্বত ও উপত্যকাভূমিতেই বৃষ্টি ও তুষারপাত হয়; সমতল ভূমি কেবল নদীর জলে সিঞ্চিত হইয়া থাকে। শীত কালে পর্ব্বতমালা তুষারাবৃত হয়; বসন্তের প্রারম্ভে বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়; ক্রমশঃ এই বৃষ্টি বাড়িতে থাকে; তার পর দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হয়; এই সময় ইটিসিয়ান বায়ু প্রবাহিত হয়; নদ নদী সকল

তুষার ও বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ হইয়া তীরবর্ত্তী সমতল ভূমি প্লাবিত করে। ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নগর মৃত্তিকার বাঁধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল নগর বর্ষাকালে দ্বীপের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বর্ষান্তে মৃত্তিকা অর্দ্ধ-শুষ্ক হইতে না হইতেই শস্য বপন করা হইয়া থাকে। কৃষিবিদ্যানভিজ্ঞ শ্রমজীবীরা ক্ষেত্রকর্ষণাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; তৎসত্ত্বেও বৃক্ষ সকল সতেজ হইয়া উঠে, এবং পর্য্যাপ্তপরিমাণে শস্য পাওয়া যায়। ধান্য বৃক্ষ আইলের উপর রোপিত হয়, এবং বর্ষার জলেও বিনষ্ট হয় না।

ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহুসংখ্যক নগর ও প্রদেশের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা তাঁহার গ্রন্থপাঠে জানিতে পারি যে, খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে তক্ষশীলা নগরী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং তাহার শাসনের জন্য সুব্যবস্থা সকল প্রবর্ত্তিত ছিল। তক্ষশীলার চতুঃপার্শ্বস্থ দেশ জলপূর্ণ ও উর্ব্বর ছিল। তক্ষশীলাপতির শাসিত দেশের এক প্রান্তে ঝিলম প্রবাহিত ছিল। এই ঝিলমের অপর পারে চিরখ্যাত পুরু রাজার রাজ্যে। সেই প্রাচীন কালে পুরু রাজার রাজ্যে ন্যূনাধিক তিন শত নগর বিদ্যমান ছিল; সমগ্র দেশ শস্যশ্যামল ও সুবিস্তীর্ণ ছিল। এই রাজ্যের পার্শ্বেই কাথাইয়া নামে আর একটি রাজ্যের পশ্চিমে রাভি প্রবাহিত হইত; সম্ভবতঃ বর্ত্তমান অমৃতসর জেলাই পুরাকালে কাথাইয়া নামে পরিচিত ছিল। এই দেশের প্রকৃতিপুঞ্জ সাতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয় ছিল। তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিত। কাথাইয়া রাজ্যে একটি অদ্ভুত প্রথা প্রচলিত ছিল; কোনও শিশুসন্তান দুই মাসে পদার্পণ করিলে রাজকর্ম্মচারিগণ আসিয়া তাহাকে পরিদর্শন করিতেন। পরিদর্শনের বিষয়ীভূত সন্তানের শারীরিক সৌন্দর্য্য যথেষ্ট কি না, এবং তাহাকে জীবিত রাখা সঙ্গত কি না, তাহাই নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ তাহাকে পরিদর্শন করিবার জন্য উপনীত হইতেন। তাঁহারা পরিদর্শনান্তে শিশু সন্তানটিকে জীবিত রাখিতে হইবে, কি মারিয়া ফেলিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে আদেশ দিতেন। কাথাইয়ার অধিবাসীরা নানা প্রকার তরল রং দ্বারা দাড়ি গোঁফ রঞ্জিত করিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও এই প্রথা পরিদৃষ্ট হইত। কাথাইয়ার অধিবাসীরা মিতব্যয়ী ছিল; কিন্তু তাহাদের অলঙ্কারপ্রিয়তা অত্যধিক ছিল। আমরা কাথাইয়া রাজ্যের আর একটি প্রথার বিষয় উল্লেখ করিতেছি। বিবাহকালে বর কন্যা ও কন্যা বর মনোনয়ন করিত। পতি মৃত হইলে স্ত্রী স্বামীর চিতায় জীবন বিসর্জ্জন দিত। কখনও কখনও ভারতমহিলা পরপুরুষে আসক্তা হইয়া স্বামীকে হত্যা করিত; তাহাদিগকে এই পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্যই সহমরণপ্রথা প্রচলিত হইয়াছিল; বিষপ্রয়োগে হত্যার নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যেই সতীদাহ হইত।

সিন্ধু ও ঝিলামের মধ্যবর্ত্তী দেশে নয়টি বিভিন্ন জাতির বাস, এবং

পাঁচ হাজার নগরের অবস্থান ছিল। এই সকল নগরের কোনটির পরিমাণই এক ক্রোশের ন্যূন ছিল না। এই স্থানে মালই নামে এক বৃহৎ জাতির বাস ছিল। মালই জাতি হইতেই বর্ত্তমান মুলতান নগর মুলতান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। মালই জাতি সাতিশয় পরাক্রমশালী ছিল। মালই জাতির একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণকালে মহাবীর আলেকজাণ্ডার আহত হন। এই আঘাতে তাঁহার জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। মালই জাতিকে পরাজিত করিবার জন্য আলেকজাণ্ডারকে ঘোর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ঐ প্রদেশে সাবোস নামে আর একটি জাতির বাস ছিল। সাবোস জাতির রাজ্যের রাজধানীর নাম সিন্ধুমান ছিল। ম্যাকরিণ্ডিল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সিন্ধুমানের বর্ত্তমান নাম সেওয়ান। সাবোস জাতির বাসভূমির পার্শ্বে মৌসিকনোস নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই মৌসিকনোস রাজ্য পরবর্ত্তী কালে উত্তর সিন্ধু রাজ্য নামে পরিচিত হয়। আলোর উত্তর সিন্ধু রাজ্যের রাজধানী ছিল। গ্রীক লেখকগণের গ্রন্থে মৌসিকনোস রাজ্যের বহু প্রশংসাবাদ বিদ্যমান। তাঁহারা আরও নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ভারতীয় জাতিমাত্রই মৌসিকনোসবাসিগণের সদ্গুণের অধিকারী ছিলেন। যাহা হউক, ঐ দেশের অধিবাসীরা অতিশয় দীর্ঘজীবী ছিল; তাহারা সাধারণতঃ ১৩০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিত। মৌসিকনোস রাজ্য ধন ধান্যে পূর্ণ থাকিলেও মিতব্যয়িতা তাহাদের চরিত্রের লক্ষণ ছিল। তাহাদের স্বাস্থ্য অনবদ্য ছিল। মৌসিকনোসবাসীদের মধ্যে কতকগুলি অনন্য-সাধারণ রীতি নীতিও পরিদৃষ্ট হইত। আমরা এই সকল রীতি নীতির উল্লেখ করিতেছি। উৎসব-উপলক্ষে মৌসিকনোসবাসীরা কেবল মৃগয়ালব্ধ মাংস ভোজন করিত। তাহাদের দেশে স্বর্ণ রৌপ্যের আকর বর্ত্তমান ছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার পরিধান করিতে বিরত থাকিত; তাহারা মনোযোগপূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। তদ্ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রের অধ্যয়নে বিশেষ মনোযোগ দিত না। কারণ, কোনও বিদ্যায় (যেমন যুদ্ধবিদ্যা) সবিশেষ পারদর্শিতালাভের জন্য যত্ন করা তাহাদের মধ্যে অন্যায় আচরণ বলিয়া পরিগণিত ছিল। নারীর মর্য্যাদা-রক্ষা এবং নরহত্যার প্রতিশোধ-গ্রহণের জন্য আবশ্যক না হইলে তাহারা কখনও আইনের শরণাপন্ন হইত না।

ষ্ট্রাবো পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশস্থিত রাজ্য ও জাতিসমূহের বর্ণনার পরই মগধ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তৎকালে পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ও মগধ রাজ্যের মধ্যে বহুসংখ্যক রাজ্য বিদ্যমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গ্রীক লেখকগণের ভারত-বিবরণীতে ঐ সমুদয় রাজ্যের উল্লেখ নাই। আলেকজাণ্ডার বিপাশা ও চন্দ্রভাগার তীর হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই জন্য তদীয় সহচর লেখকগণের অভিজ্ঞতা সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশেই

আবদ্ধ ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে হিরোডোটাস ও টিসিয়াস প্রধান। মেজর রিলেন সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, সিন্ধুনদের পূর্ব্ববর্ত্তী মরুভূমির অতিরিক্ত স্থান হিরোডোটাসের অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে টিসিয়াসের অভিজ্ঞতাও এইরূপ সঙ্কীর্ণ। আলেকজাণ্ডারের পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে মেগাস্থিনিস প্রধান। তিনি রাজদূতরূপে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে অবস্থিতি করিতেন। এই কারণ তাঁহার অভিজ্ঞতা মগধ রাজ্যে আবদ্ধ ছিল। বিশেষতঃ, তৎকালে মগধ রাজ্যই বিপুল বৈভবে ও প্রবল প্রতাপে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল; এই জন্য মেগাস্থিনিস ও তাঁহার অনুবর্ত্তী লেখকগণ সমগ্র ভারতবর্ষের আদর্শস্থল মগধ রাজ্যের সভ্যতার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে, ঐ অসম্পূর্ণ বিবরণী হইতেই ভবিষৎবংশীয়গণের নিকট ভারতীয় সমস্ত তথ্য উদ্ঘাটিত হইবে। ষ্ট্রাবো স্বয়ং কখনও ভারতবর্ষে আগমন করেন নাই; পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় বিবরণী সংকলন করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার গ্রন্থেও পঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ ও মগধ রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য ও জাতিসমূহের বৃত্তান্ত অলিখিত রহিয়াছে। তিনিও পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের পরেই মগধ রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর বর্ণনা হইতে প্রাচীন কালের মগধ রাজ্যের ঐশ্বর্য্যাদির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা এখানে সে বর্ণনার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি। (ক্রমশঃ।)

সত্য।

হে শুভ, হে দিব্য, ধ্রুব, নিখিল-নন্দন!
তোমার অম্লান জ্যোতি শাশ্বত সুন্দর
ছিন্ন করি' অন্ধতার কবন্ধ-বন্ধন
পড়িয়াছে পতিতের আত্মার উপর।
তাই আজি দুর্ল্লভের তপস্যার তরে
কোটী কোটী নর নারী উদগ্র উদ্দাম!
ক্ষুদ্র রুদ্র তেজে পূর্ণ,—গর্ব্বমদভরে
মিথ্যারে দলিতে পদে করিছে সংগ্রাম!
ঢালো, ঢালো আরো আলো—দেখাও সকলে
বিশ্বাসের শতদলে, চৈতন্য-মণ্ডলে
বিরাজিতা পরা শক্তি আত্মার মন্দিরে!
তব বলে মৃত্যুর এ নাগপাশ ছেদি'—
হে দৃপ্ত! গড়িব মোরা তব যজ্ঞবেদী!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সাহিত্য, ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।

রাজশাহীর ঐতিহাসিক বিবরণ। *
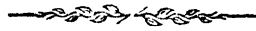
দেশীয় প্রবাদে সাধারণের বিশ্বাস যে, রাজশাহীর উত্তরাংশ মহাভারতের মৎস্য-দেশ। রাজশাহীর ইতিহাস লেখকও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-বঙ্গ রেলের পাঁচবিবি নামক ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে বিরাটনগর নামে গ্রাম আছে; ঐ স্থানেই মৎস্যরাজ বিরাটের রাজধানী ছিল, বলা হয়। এই বিরাট নগরের এক ক্রোশ দক্ষিণে এক স্থানে লোকে কীচকের ভবন, এবং তাহার নিকটেই পাণ্ডবের ধনুর্ব্বাণ-রক্ষার শমী-বৃক্ষের স্থান বলিয়া দেখাইয়া থাকে। কিন্তু মহাভারত-বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা করিয়া পণ্ডিতেরা রাজপুতানার উত্তরাংশে বিরাটের প্রাচীন মৎস্যদেশের স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেখানে এখনও বিরাটের রাজধানী বিরাট নামক স্থান আছে। এ রাজশাহীর 'মৎস্য' সাধারণ মৎস্য কি না, বৈজ্ঞানিকেরা তাহার বিচার করুন। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, রাজশাহীর অধিকাংশই অধুনাতন কালে নদীবাহিত মৃত্তিকার দ্বারা উদ্ভূত। কিন্তু তাঁহাদের কাল নরলোকের কালের মত নহে; দশ বিশ, হাজার, বা লক্ষ বৎসর তাঁহারা বড় একটা গ্রাহ্যই করেন না। রাজশাহীর বরিন্দ্র অংশ অন্ততঃ প্রাচীনকালে গঠিত, ইহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এ ভাগেও রামায়ণ, মহাভারত, বা পুরাণাদিতে বর্ণিত অন্য কোনও স্থান নাই—এ কথা বিবেচনা করিতে হইবে।

উল্লিখিত ব্যাপার যাহাই হউক, রাজশাহীর পশ্চিমোত্তর ভাগ যে প্রাচীন পৌণ্ড্র জনপদের অন্তর্ভূত ছিল, এ কথা আমরা ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের তমোময় অরণ্যে কণ্টকজাল-পরিবৃত নানা জটিল সমস্যার মধ্য হইতেও স্থির করিয়া

* রাজশাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

লইতে পারি। মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণে কয়েক স্থানে পুণ্ড্র ও পৌণ্ড্রের নির্দ্দেশ পাওয়া গিয়াছে ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দাঃ না হয় অন্য স্থানের লোক, স্বীকার করা গেল। বিষ্ণুপুরাণে এক পুণ্ড্র দক্ষিণাপথের দেশসমূহের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। আবার অন্যত্র বলি রাজার ক্ষেত্রে দীর্ঘতমার ঔরসে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, এই পঞ্চ পুত্রের কথা, এবং তাঁহারাই ঐ সকল রাজ্যের স্থাপয়িতা,—এই আখ্যায়িকা আছে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে আর এক পৌণ্ড্রদেশ হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরাংশে স্থান পাইয়াছে। অন্যত্র 'জ্যোতিষ্মান্ পৌণ্ড্রান্' প্রাচ্য প্রদেশের অধিবাসী বলিয়া কথিত হইয়াছে। মনু-সংহিতায় নির্দ্দেশ আছে, পৌণ্ড্রক, ওড্র, দ্রবিড় প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতিরা ক্রিয়ালোপের এবং ব্রাহ্মণাদর্শনের হেতু অর্থাৎ সর্ব্ববিধ সংস্কারের অভাবে বৃষলত্ব (শূদ্রতা) প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বচনটি বর্ত্তমানে মুদ্রিত মনু-সংহিতা গ্রন্থে নাই বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু পরবর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধ গ্রন্থে যখন ইহা মনুর বচন বলিয়া ধৃত হইয়াছে, তখন ইহা মনুতে ছিল, বা বৃহন্মনুর বচন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে মনুর সময়ে পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়েরা 'ব্রাত্য' বলিয়া আংশিক ম্লেচ্ছ-ভাবাভাষী—'দস্যু' নামে কথিত হইয়াছেন, দেখা গেল। কিন্তু মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে যে, পৌণ্ড্র, মগধ ও কলিঙ্গ দেশের মহাত্মারা সকলেই শাশ্বত পুরাতনধর্ম্ম অবগত আছেন। মহাভারতের এই উক্তি মনুর পরবর্ত্তী, এরূপ নির্দ্দেশ করিলে বোধ হয় কোনরূপ ভ্রমের আশঙ্কা নাই। তাহা হইলে, পুণ্ড্রদেশ মনুর সময়ে অসভ্যের দেশ ছিল, কিন্তু মহাভারতের সময়ে সুসভ্য হইয়া আর্য্য-সমাজে বরণীয় হইয়াছিল. তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মহাভারতের সভাপর্ব্বে উল্লিখিত মহাবল পুণ্ড্রক বাসুদেব যে এই প্রাচ্য পুণ্ড্রের অধীশ্বর, এ কথায় বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। প্রাচীন পুরাণেতিহাস প্রভৃতির উক্তির সহিত বর্ত্তমান পুণ্ড্র বা পুঁড়ো জাতির বাসভূমি লক্ষ্য করিয়া পণ্ডিতেরা পুণ্ড্র জনপদের যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই মতই এক্ষণে সাধারণে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সংহিতাকারের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান পুঁড়ো বা পুণ্ডরীক মহাশয়েরা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ত্বের কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হউন বা না হউন, তাঁহারাই যে পুণ্ড্র দেশের প্রাচীন লোক, তাহাতে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোনও

কারণ নাই। (১) বর্ত্তমান রাজশাহী বিভাগ সেই লোকবিশ্রুত পুণ্ড্রের অধিকাংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

এই পুণ্ড্রের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কথা লইয়াও নানা তর্কের অবতারণা হইয়াছে। কেহ বা বগুড়ার মহাস্থান গড়কে এই প্রাচীন রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চান, কিন্তু অনেকেই বড় পেঁড়োর—হজরৎ পাণ্ডুয়ার পক্ষপাতী। রাজতরঙ্গিণীতে উল্লিখিত আছে যে, গৌড়বিজয়ী কাশ্মীররাজ জয়াপীড় গঙ্গাতীরে সৈন্য-সামন্ত রাখিয়া ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করেন। চীন পরিব্রাজক প্রথিতনামা হুয়েন্ সাংএর বিবরণীর যথাযথ সমালোচনা করিলেও পাণ্ডুয়া নগরই পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির রাজধানী ছিল বলিয়া মনে হয়। এখনও উহা প্রাচীন হিন্দু কীর্ত্তির এবং ভাস্কর-শিল্পের ধ্বংসাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। পররর্ত্তী রাজধানী গৌড় নগর ইহার অনতিদূরে অবস্থিত। বর্ত্তমানে গঙ্গা পাণ্ডুয়া ও গৌড় হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে; কিন্তু ভাগীরথীর প্রবাহলীলা লক্ষ্য করিলে পূর্ব্বকালে গতি যে অন্যরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। এই পুণ্ড্র নাম হইতেই পুঁড়ি বা পুরী ইক্ষুর নাম হইয়াছে, এবং বৈদ্যক গ্রন্থে সমাদৃত 'পুণ্ড্র-শর্করা'ও এখানকার বস্তু, ইত্যাদি মতও প্রচারিত হইতেছে। কেহ বা আর একটু অগ্রসর হইয়া 'গুড়' হইতে গৌড় নাম হইয়াছে বলিতে চান। সে কালে এ প্রদেশ ইক্ষুর জন্য প্রসিদ্ধ ছিল কি না, বর্ত্তমানে তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন। কিন্তু অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে এই পৌণ্ড্র জনপদ সভ্যতার পদবীতে আরোহণ করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, এই তিন সম্প্রদায়ের নানা পুণ্যস্থান এই প্রদেশে সংস্থাপিত ছিল। জৈনগণের তৃতীয় শাখা 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধনীয়া, এই পুণ্ড্রবর্দ্ধন হইতেই নাম গ্রহণ করিয়াছে। এখনও ভাগীরথী হইতে করতোয়াতীর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে গৌড়ের পুরাতন কাহিনীর আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমির অধিকাংশ যে গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের

---

(১) শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
ম্লেচ্ছবাচশ্চার্য্যবাচঃ সর্ব্বে তে দস্যবঃ স্মৃতাঃ॥

অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত। রাজশাহী যে পূর্ব্বে 'গৌড় বিষয়ে'র মধ্যে ছিল, ইহা স্মরণ করাইয়া দিলেই আমাদের উপস্থিত কার্য্যসাধন হইল। নিকটবর্ত্তী বলিয়া বরেন্দ্রভূমি পূর্ব্বাহ্নেই গৌড়ীয় সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

করতোয়া, আত্রেয়ী ও বারাহী নদী বহু দিন হইতে পুণ্যতীর্থ বলিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে পরিজ্ঞাত হইলেও, প্রাচীন গ্রন্থে ইহাদের নাম নাই। বৈদিক 'সদানীরা' করতোয়া—এই করতোয়া কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। (১) তবে তীর্থ উপলক্ষেই এই সকল নদীতীরে স্থানে স্থানে পরবর্ত্তী বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজদিগের উৎসাহে বিহার বা হিন্দু দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার কতকগুলি ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। নাটোর হইতে ১৮ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে ভবানীপুর নামক গ্রাম আছে। পূর্ব্বে এখানে করতোয়া, আত্রেয়ী ও যমুনার সঙ্গমস্থল ছিল। ইহা ভবানী দেবীর অন্যতম পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উপাসকেরা বলেন, এই স্থানে সতীর তল্প বা বাম কর্ণ পতিত হইয়াছিল। (২) প্রথম যুগের মুসলমান শাসনে এই তীর্থ লুপ্ত হয় বলিয়া কথিত আছে। জনপ্রবাদ এই যে, জনপ্রিয় গৌড়-বাদশা হোসেন শাহের সময়ে মোহন মিশ্র নামক সাধু এই পীঠের উদ্ধার করেন। জনৈক মুসলমান সেনাপতি দেবীর কৃপায় আরোগ্যলাভ করিয়া এখানে এক জোড়-বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। সেই বাঙ্গালা ১২৯২ সালের ভূমিকম্পে নষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি কথাও প্রচলিত আছে। বারেন্দ্র-সমাজে প্রবাদ এই যে, উক্ত মোহন মিশ্র ভবানীর আজ্ঞায় কুমুদানন্দ চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করেন; এই বিবাহ লইয়া একটি ছড়া আছে,—

"কোথা হ'তে এলো বামুন পাকুড়তলা বাড়ী,
কেহ বলে কামরূপী কেহ বলে রাঢ়ী।"

প্রকৃত কথা এই যে, কুমুদানন্দ এই অজ্ঞাতকুলশীল মিশ্রকে কন্যাদান করায়

(১) স্কন্দ পুরাণের অন্তর্গত করতোয়া-মাহাত্ম্যে নির্দ্দেশ আছে,—

করতোয়া-সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়সে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে।

এ বচন আধুনিক হইলেও, রঘুনন্দনের কৃত বলিয়া তত আধুনিক বলা যায় না।

(২) করতোয়াতটে তল্পং বামে বামনভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥—(পীঠমালা)।

সমাজে কিছু দিন পতিত ছিলেন। পরে বারেন্দ্র-সমাজপতি তাহিরপুর-রাজ কংসনারায়ণ তাঁহাকে ও মোহন মিশ্রকে সমাজে তুলিয়া লন। এইরূপে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের মধ্যে 'ভবানীপুর পটি'র উৎপত্তি হয়। সান্তোষের রাণী শর্ব্বাণী এবং রাণী ভবানী এই পীঠের সংস্কার ও দেবসেবার নিমিত্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন, এবং এই সময় হইতেই এই পীঠের নাম লোক-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা গণেশ—যিনি গৌড়ের স্বাধীন মুসলমান বাদশার হস্ত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া লইয়া হিন্দুরাজ্য পুনঃস্থাপন করিয়া হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীর অনুরাগভাজন হইয়া আদর্শ নরপতি হইয়াছিলেন, সেই গণেশ বরেন্দ্রভূমির হিন্দু ভূস্বামী ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে দিনাজপুরনিবাসী বলিয়াছেন; কিন্তু প্রামাণিক ইতিহাস রিয়াজ উস্ সালাতিন্ গ্রন্থে তিনি ভাতুড়িয়ার রাজা বলিয়া উল্লিখিত। ভাতুড়িয়া পরগণা বর্ত্তমান রাজশাহীর উত্তরাংশে। কেহ কেহ মুসলমান ইতিহাসে 'কংস' নাম পড়িয়া তাহেরপুরের প্রসিদ্ধ রাজা কংসনারায়ণের সহিত গণেশের গোলযোগ বাধাইয়াছেন। কিন্তু ঈশান নাগর রচিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে স্পষ্ট "শ্রীগণেশ রাজা" গৌড়িয়া বাদশাহ মারিয়া রাজা হইয়াছিলেন, এই উল্লেখ থাকায়, এই তর্কের সম্পূর্ণ মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ পরবর্ত্তী সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাহেরপুরের প্রাচীন রাজবংশ পূর্ব্বকালের ভৌমিক। বারাহী নদীর পূর্ব্ব-তীরে তাঁহাদের গড়-বেষ্টিত রাজধানীর চিহ্ন রামরামা গ্রামে এখনও দৃষ্ট হয় বলিয়া কথিত আছে। সম্প্রতি মহাকবি কৃত্তিবাসের যে আত্মপরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হয় যে, কবি বড়গঙ্গা-পারে পাঠ শেষ করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় গিয়া শ্লোক পাঠ করিয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। এই বর্ণনায় রাজপারিষদবর্গের অনেকে যে কংসনারায়ণের আত্মীয় বা সমসাময়িক, বারেন্দ্র ঘটক গ্রন্থের সাহায্যে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই জন্য রাজা কংসনারায়ণ এক সময়ে প্রবল হইয়া গৌড়েশ্বর উপাধি লইয়া থাকিবেন, এই মত আমরা কয়েক বর্ষ পূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছি (বঙ্গদর্শন; ১৩১০)। রাজা কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারসাধন করেন। বর্ত্তমান তাহেরপুর-রাজবংশ পূর্ব্ব-রাজবংশের দৌহিত্র সন্তান।

সান্তোল বা সাঁতুল রাজ্য।— আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে

প্রাচীন সান্তোল বা সাঁতুল রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই সাঁতুল রাজ্য বা জমিদারী রাজা গণেশের সমকালীন বলিয়া প্রবাদ আছে। প্রথমে তপ্পে ভাতুড়িয়া ও তাহার অন্তর্ভূক্ত ১৩টি পরগণা এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ভূস্বামীর হস্তে আইসে। এই রাজবংশের বিলোপসাধনের বিবরণ রাজশাহীর জমিদারী সনন্দ হইতে আমরা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশিত করিয়াছি (১)। কথিত আছে, সান্তোলরাজ সীতানাথ বৃদ্ধাবস্থায় নিজ কনিষ্ঠ রামেশ্বরের হস্তে বিষয়কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করেন। শেষে রামেশ্বরের দারুণ অবিশ্বাসের কার্য্যে শোকসন্তপ্ত হইয়া সীতানাথের মৃত্যু হয়। রামেশ্বর 'পঞ্চ পাতকী' বলিয়া প্রবাদ আছে, এবং লোকের বিশ্বাস যে, তাঁহার পাপেই সাঁতুল রাজ্যের ধ্বংস হয়। রামেশ্বরের পুত্র রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে তাঁহার বিধবা পত্নী ধর্ম্মশীলা রাণী শর্ব্বাণী পুণ্যকীর্ত্তির জন্য উত্তর-বঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি করতোয়া-তীরে ভবানী মাতার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কেহ কেহ বলেন, তিনিই এই পীঠের উদ্ধারসাধন করেন। যাহা হউক, তাঁহার সময়ে যে এই তীর্থ বিশেষ জাগ্রত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তিও অনেক ছিল। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম জন্মান্ধ ও বধির উল্লেখে জমিদারী কার্য্য পরিচালনে অসমর্থ বলিয়া বিস্তীর্ণ ভাতুড়িয়া জমিদারীর কার্য্যভার তৎকালের একমাত্র সমর্থ নাটোরবংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দন তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন (২)। প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী করতোয়া-তটের মন্দির প্রভৃতির সংস্কার করাইয়া দেবসেবার সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে পুনরায় এই পীঠের অবস্থা হীন হইয়া পড়িয়াছে।

পুঁটিয়া-রাজবংশের অনুগ্রহে নাটোর-বংশ-স্থাপয়িতা রঘুনন্দনের অভ্যুদয়ের কথায় এবং নাটোরের অনুগৃহীত দিঘাপাতিয়ার প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামের বিবরণে আমার বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক স্থান পূর্ণ হইয়াছে। সেই সমস্ত কথা লইয়া পুনরায় আপনাদের কর্ণজ্বালা উৎপাদন করিতে চাহি না। তবে একটি কথার পুনরুক্তি আবশ্যক মনে করি। রাজশাহী হইতে প্রকাশিত 'উৎসাহ' পত্রে দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি রাজশাহী নামের উৎপত্তির

(১) উৎসাহ মাসিক পত্র—১৩০৪ ও নবাবী আমলের ইতিহাস।

(২) ভাতুড়িয়া সনন্দ—নাটোর-রাজ (নবাবী আমলের ইতিহাস)।

কথা আলোচনা করিয়াছি; পরে আমার সামান্য ইতিহাসেও সেই কথার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু জনপ্রবাদের জীবন বড় কঠিন। কা'লও কথায় কথায় এখানকার এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন, 'এ রাজশাহী—এখানে রাজার অভাব নাই'। এখনকার রাজার সঙ্গে রাজশাহী নামের যে কোনও সম্বন্ধ নাই, সে কথা প্রত্যেকের জানা উচিত। 'নিজ চাক্‌লা রাজশাহী, রাজমহলের দক্ষিণ হইতে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর-পূর্ব্ব দিকে বোয়ালিয়ার অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 'শাহী" অর্থাৎ বাদশাহী রাজা মানসিংহের নামে রাজশাহী নাম হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। আইন্-আক্‌বরীতে রাজশাহী পরগণার নাম নাই। নিকটবর্ত্তী কুমার-প্রতাপ পরগণা মানসিংহের ভ্রাতা কুমার প্রতাপ সিংহের নামে কথিত বোধ হয়। রাজশাহীর ইতিহাস-লেখক কালীনাথ বাবু বলেন, এ অনুমান আমি সঙ্গত মনে করি না, কারণ, 'শ' এবং 'স'য়ে বৈষম্য দৃষ্ট হয়। দন্ত্য 'স' দিয়া বানান করা যে উচিত নয়, তাহা তাঁহার মনে হয় নাই। নিজ চাক্‌লা রাজশাহী যখন পূর্ব্ব-জমীদার উদয়নারায়ণের হস্ত হইতে রঘুনন্দনের কৃতিত্বে রাজা রামজীবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন অবধি তিনি রাজশাহীর জমীদার বলিয়া কথিত হইলেন। পরে তাঁহার প্রাপ্ত সমস্ত জমিদারী লইয়া এক লাটে সমগ্র রাজশাহী চাক্‌লা এক জন কলেক্টরের হস্তে স্থাপিত হইয়া রাজশাহী জেলা নাম হইল। কিন্তু তখন লস্করপুর (পুঁটিয়া) ও তাহেরপুর ইহার অন্তর্গত ছিল না; এ দুই পরগণা মুর্শিদাবাদের অধীন ছিল—এক জন সহকারী কলেক্টর এই দুইটির রাজস্ব আদায় লইতেন। তখনকার রাজশাহীর আয়তন কিরূপ ছিল, তাহা কোম্পানীর রাজস্ব সেরেস্তাদার গ্রাণ্টের নিম্নে উদ্ধৃত বিবরণী হইতে অনুমিত হইবে।

"Rajshahi the most unwieldy and extensive Zemindary in Bengal or perhaps in India; intersected in its whole length by the great Ganges &c, producing within the limits of its jurisdiction at least four fifths of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the empire of Hindustan, with a superabundance of all the other richest productions of nature and art to be found in the warmer climates of Asia fit for commercial purposes; enclosing in its circuit

and benefitted by the industry and population of the overgrown capital of Murshidabad, the principal factories of Kasimbazar, Banleah Kumar khali &c. &c, and bordering on almost all the other great provincial cities &...was conferred in 1725 on Ramjeon, a Brahmin, the first of the present family"

Grant's Analysis—Fifth Report.

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজশাহী (নাটোর জমিদারী) পশ্চিমে রাজমহল হইতে পূর্ব্বে ঢাকী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার অর্দ্ধাংশ, নদীয়া যশোহরের উত্তরাংশ, সমগ্র পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুরের কিয়দংশ পুঁটিয়া, তাহেরপুর বাদে এখনকার রাজশাহী এবং মালদহের অর্দ্ধাংশ এই রাজশাহীর অন্তর্গত ছিল। তখন ইহার পরিমাণফল ১২৯০৯ বর্গমাইল। এক জন জজ—কলেক্টরের দ্বারা ইহার কার্য্য চালান অসম্ভব বলিয়া দুই জন সহকারী কলেকক্টর (নাটোর ও মুরাদবাগে) নিয়োজিত ছিলেন। ইহাতেও কোম্পানীর প্রথম আমলে রাজস্ব আদায়ে মহা গোলযোগ এবং চলনবিল প্রভৃতি স্থানে ভয়ানক ডাকাইতি ও রাহাজানী হইত। শেষে ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে—যখন জেলা-বিভাগ ভাগ করিবার কথা হইল, তখন এই রাজশাহীর পার্শ্বের স্থানগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া রাজশাহী জেলাকে পদ্মার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্বে স্থাপিত করা হইল। এই সময়েই 'নিজ রাজশাহী' ইহা হইতে বাদ গেল। কিন্তু তখনও মহানন্দা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র রাজশাহী জেলার সীমা থাকিল। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে চোর-ডাকাইতের দমন প্রভৃতি কারণে রাজশাহী জেলা হইতে চাঁপাই, রোহনপুর প্রভৃতি থানা লইয়া এবং পূর্ণিয়া ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বর্ত্তমান মালদহ জেলা গঠিত হইল। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় রাজশাহী হইতে সেরপুর, বগুড়া প্রভৃতি মহকুমা কাটিয়া এবং রঙ্গপুর ও দিনাজপুর হইতে কিছু কিছু লইয়া বগুড়া জেলা হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে—অবশিষ্ট রাজশাহী জেলা হইতে শাজাদপুর, পাবনা প্রভৃতি পাঁচথানা ও যশোহর হইতে কিছু লইয়া বর্ত্তমান পাবনা জেলা হইয়াছে। এ প্রবন্ধে পূর্ব্বতন রাজশাহী জেলাই আমাদের লক্ষ্য। ইহা প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণাংশ।

সাহিত্যচর্চ্চা ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত বরেন্দ্রভূমি বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ।

বল্লাল সেন বরেন্দ্রভূমির অনিরুদ্ধ নামক মহাপণ্ডিতের ছাত্র ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চতুর্ব্বেদাচার্য্য এবং সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার নান্ন্যাসী গ্রামী কুল্লুকভট্ট বরেন্দ্রের মুখউজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কুসুমাঞ্জলিপ্রণেতা উদয়নাচার্য্যও এই বরেন্দ্র-সমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে গৌড়ের মুসলমান বাদশা এবং বরেন্দ্রভূমির ভৌমিক রাজাদিগের সভায়ও বহুতর পণ্ডিত ও মনস্বী লোকের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। রাজা কংসনারায়ণের প্রধান পণ্ডিত মুকুন্দ ও তৎপুত্র ধর্ম্মাধিকার শ্রীকৃষ্ণ এবং পরবর্ত্তী কালের লঘুভারতকারের নাম এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাজা রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (বাং ১১৩০ সাল) পদাঙ্কদূত রচনা করিয়া শেষ যুগের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের প্রতিভা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুণ্যকীর্ত্তি মহারাণী ভবানী অসংখ্য সৎকার্য্যের মধ্যে বঙ্গীয় পণ্ডিতবর্গের জন্য যে সমস্ত বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া যান, তাহার কথা এখনও দেশীয় প্রবাদে পরিচিত আছে ;—

কৃষ্ণচন্দ্রের ব্রহ্মোত্তর, রাণী ভবানীর বৃত্তি।
দিনাজপুরের নগদ দান, বর্দ্ধমানের কীর্ত্তি॥

প্রাতঃস্মরণীয়া ভবানী দান, বৃত্তি, ব্রহ্মোত্তর-দান বা কীর্ত্তিতে কাহারও অপেক্ষা ন্যূন না হইলেও, তাঁহার বিদ্যা-বিতরণের নিমিত্ত দেশব্যাপী বৃত্তিই উক্ত কবিতার প্রধান লক্ষ্য। বর্ত্তমান রাজশাহীতে মুসলমান কীর্ত্তির মধ্যে বাঘার মস্জীদ্ (১৫৩০ খৃঃ) এবং কুসুম্বা মস্জীদ্ (১৫৫৮) প্রধান।

প্রাচীন রাজশাহী শিল্প-বাণিজ্যের নিমিত্তও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পুণ্ড্রদেশ বহু প্রাচীন কাল হইতে রেশমের চাষ ও ব্যবসায়ের স্থান ছিল। রামায়ণের একটি শ্লোকের (১) ব্যাখ্যায় অনেকে পুণ্ড্রই কোষকারদিগের ভূমি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীট বা কৃমির অন্যতম নাম পুণ্ডরীক। এখনও মালদহ জেলায় পুণ্ডরীক বা পুঁড়ো জাতিই প্রধানতঃ রেশম কীট পালন করিয়া থাকে। ইহারই অপভ্রংশে পৌঁড়ু, পোলু, বা পলু হইয়াছে ; সমগ্র বাঙ্গালায় রেশম-কীটের বর্ত্তমান নাম পলু। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত প্রদেশে এককালে প্রচুরপরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত। অনেকে 'চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য'—শকুন্তলার এই

(১) মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রান্ বঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোষকারাণাংভূমিঞ্চ রজতাকরাম্।—কিষ্কিন্ধ্যা—৪০।২৩।

শ্লোক এবং অন্যান্য উল্লেখ হইতে বলিতে চান, রেশমের চাষ চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু মনু প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে অংশুপট্ট বা রেশম বস্ত্রের কথা আছে; এই 'অংশু' কথার সহিত 'চীন' শব্দ যোগ করায় বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, রেশম ভারতে বহু দিন অবধি ছিল। মহাভারতের রাজসূয়পর্ব্বাধ্যায়ে দৃষ্ট হয় যে, চীনেরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে রেশমবস্ত্র উপহার দিয়াছিল। চীনদেশীয় পট্টবস্ত্র উৎকৃষ্ট ছিল বলিয়া বিলাসীরা উহা ব্যবহার করিতেন। ক্রমে চীনা পলুও এ দেশে আসিয়া থাকিবে। পুণ্ড্রীকের প্রাচীন বাসস্থল এই বরেন্দ্রভূমি ভারতে রেশম-চাষের প্রবর্তিত না হউক, রেশমের যে অন্যতম প্রধান স্থান ছিল, তাহা প্রতিপন্ন হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় কোম্পানীরা কাশিমবাজারে প্রধান কুঠী করিয়া মালদহ ও রাজশাহীর আড়ঙ্গ হইতে রেশমী বস্ত্র আনাইয়া লইতেন। সে সময়ে মুর্শিদাবাদ রেশম-ব্যবসায়ের প্রধান স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজশাহীতে ইংরেজ কোম্পানী এক পৃথক্ কুঠী করেন। সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ব্যাপিয়া রাজশাহী অঞ্চলের রেশম কোম্পানীর লাভের অন্যতম সহায় ছিল। এখনকার অবস্থা কি, কাহারও অজ্ঞাত নাই। রেশমের কথা দূরে থাকুক, রাজশাহীর প্রচুর রবিশস্যে প্রসিদ্ধ বন্দর গোদাগাড়ী সে কালের বাণিজ্যের প্রধান স্থান ছিল, তাহাই বা আজ কোথায়? রাজশাহী কি উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য প্রসিদ্ধ, এই প্রশ্নের উত্তরে এক বালক বলিয়াছিল, 'গাঁজা'!

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ফুলকর ব্রত।

পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে ফুলকর ব্রত প্রচলিত আছে। এই ব্রত চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ এবং বৈশাখের সংক্রান্তির দিন শেষ করিতে হয়। প্রতি মঙ্গলবার ব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে প্রত্যহ স্নান করিয়া ব্রতের কথা বলিতে হয়। ব্রতীকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহার করিতে হয়। রাত্রে আহার নিষিদ্ধ।

ব্রত-কথা।

এক ছিল ভিক্ষাপুত্র ব্রাহ্মণ। নদীর ধারে তার ঘর ছিল। তার এক

পূর্ণবয়স্কা কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণ বহু চেষ্টা ক'রে মেয়ের বিবাহ দিতে পাল্লে না। মেয়ে অবিবাহিতা রহিয়া গেল।

এক দিন তার কন্যা নদীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখে, মহাদেব পূজা কর্‌চেন। তাঁর পূজার ফুল বেলপাতা নদী-ড'রে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কন্যা স্নান করতে নামল—না—একটা ফুল এসে কন্যার নাভিতে লাগ্‌লো। তাতে কন্যা গর্ভবতী হলেন। এইরূপে দিন যায়। পাড়া-প্রতিবেশী সকলে কানাকানি কর্‌তে লাগ্‌লো। দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিছুই জান্‌তে পাল্লে না।

এক দিন এক মেছুনী মাছ বেচ্‌তে পাড়ায় এসেছে—সে ব্রাহ্মণের বাড়ীতেই এলো। তখন ব্রাহ্মণ বাড়ী নেই। ব্রাহ্মণকন্যা একাকিনী, হাতে পয়সাটি নাই। কন্যা গর্ভবতী কি না, তাই মাছ খেতে তার বড় সাধ হলো। কি করে, মেছুনীর কাছ থেকে জোর ক'রে কিছু মাছ রেখে দিল। মেছুনী অনন্যোপায় হয়ে রাজদ্বারে অভিযোগ করলে। সেখানে কন্যার কলঙ্কের কথা বলতেও মেছুনী ছাড়্‌লে না।

রাজা ব্রাহ্মণকে ডাক্‌লেন, কন্যার কলঙ্কের কথা ব্রাহ্মণকে বল্লেন। ব্রাহ্মণ অবাক্, বিশ্বাস কর্‌তে পাল্লেন না; অগত্যা মেয়েকে আন্‌তে লোক গেল। মেয়ে হাজির। রাজা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "তোমার নামে এ কলঙ্ক কেন?" কন্যা বল্লেন, "আমি রোজ নদীতে স্নান ক'রে থাকি। এক দিন স্নান কর্‌তে গিয়ে দেখি, মহাদেব নদীর ধারে পূজা করতে বসেছেন, তাঁর পূজার ফুল বেলপাতা সব নদীতে ভাস্‌তে ভাস্‌তে যাচ্ছে। আমি যখন স্নান কর্‌তে নাম্‌লাম, তখন একটা ফুল এসে আমার নাভি স্পর্শ করলে, তাতেই আমার গর্ভ হলো।" রাজার এ কথায় বিশ্বাস হলো না। তিনি কন্যাকে কারারুদ্ধ কর্‌লেন, এবং বল্লেন যে, যদি দেবতার চক্রান্তে তোমার গর্ভ হয়ে থাকে, তবে দশ দণ্ডের মধ্যে তোমার সন্তান হবে, আর যদি মনুষ্য কর্তৃক হয়ে থাকে, তবে ১০।১২ দিন পর সন্তান প্রসব হবে।

কন্যা কারাগারদ্বারে যেতে না যেতেই প্রসব-বেদনা উঠ্‌লো, কন্যা অস্থির। দেখ্‌তে দেখ্‌তে চার দণ্ড যেতে না যেতেই পাঁচটি সন্তান হলো। রাজসভায় খবর গেল। রাজা দৌড়ে এলেন, কন্যাকে যথোচিত শুশ্রূষা ক'রে ব্রাহ্মণগৃহে দিয়ে পাঠালেন।

পাঁচটি সন্তান ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হলো। যে দেখে, সেই বলে,—"আহা, ছেলে নয় তো, চাঁদের কণা।" ব্রাহ্মণ নাতি পাঁচটিকে বড় আদরে বড় যত্নে

মানুষ করতে লাগ্‌লেন। ব্রাহ্মণের ঘরে আনন্দের সীমা রইলো না। গরীবের ঘরে এমন সুন্দর ছেলে কেউ কখন দেখেনি—যেন এক বৃন্তে পাঁচটি পদ্ম-ফুল! ছেঁড়া কাপড়, ময়লা সাজ, গায়ে কোনও ভাল কাপড়-চোপড় নেই, তবু রূপ যেন ফেটে পড়্‌ছে! যেখান দিয়ে চলে, সেখানটা আলো ক'রে যায়।

বয়সের সঙ্গে ছেলেদের হাতে খড়ি পড়্‌লো—মা যত্ন করে গ্রামের পাঠশালায় পড়্‌তে দিলেন। কত দিন গেল।

এক দিন পাঠশালা থেকে এসে ছেলে কয়টি বড় ক্ষুণ্ণমনে বসে আছে। মা জিজ্ঞাসা করেন, কেউ কিছু উত্তর করে না। মার মনে বড় কষ্ট হলো। নিজের হাতে খাওয়ায় দাওয়ায়, লালন-পালন করছে, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, কোন দিন ত এমনটি হয় নি—কোন দিন মা ছাড়া থাকে না—মা না হ'লে যে এক দণ্ড চলে না। এমন হলো কেন? বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগ্‌লেন—না পেরে ছোটটি বল্লে, "মা, আমাদের বাবা কই? সহপাঠীরা আমাদিগকে জারজ বলে; আমাদিগকে বাবা দেখাও!" পুত্রের মুখে ইহা শুনিয়া মাতা লজ্জিতা হইলেন, এবং পরদিন স্নানের সময় বাবাকে দেখাইবেন বলিয়া মাতা আশ্বাস প্রদান কল্লেন।

পর দিন বাবাকে দেখ্‌বার জন্যে বালকেরা পাগল হয়ে। উঠ্‌লো, বাধ্য হয়ে স্নানের ঘাটে গেলেন। "বাবা কোথায়, বাবা কোথায়" ব'লে ছেলেরা সব ব্যগ্র হয়ে উঠলে মাতা বল্লেন, "ঐ যে দেখ মহাপুরুষ সোনার গাড়ু হাতে পূজায় মগ্ন, ইনিই তোমাদের বাবা।" বালকেরা বাবা পাইবামাত্র কেহ হাতে কেহ পায় ধরে পিতাকে বাড়ী আস্‌তে অনুনয় বিনয় করতে লাগ্‌লো, এবং বল্‌তে লাগ্‌লো যে, "তুমি না গেলে লোকে আমাদিগকে জারজ ব'লে গাল দেয়।" মহাদেব গোলে পড়ে গেলেন, কি করেন!—

অনেক ক্ষণ ভেবে ভেবে বিমর্ষভাবে বল্লেন—"কাল এম্নি সময় তোমরা এখানে আস্‌লে দেখ্‌তে পাবে, এক সওদাগর বহু ধন-দৌলৎ নিয়ে নৌকায় যাচ্ছে,—তখন তোমরা তাকে জিজ্ঞাস করো যে, 'তোমার নৌকায় কি?' সওদাগর রাগ ক'রে বল্‌বে, 'এতে লতা-পাতা'; তখন তোমরাও বলো যে,'তাই হউক।' তখন দেখ্‌বে; দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার সেই নৌকা-বোঝাই ধন-দৌলত সব লতা-পাতা হয়ে যাচ্ছে। তখন সওদাগর তোমাদের পূজা দেবে, তবে তোমাদের নাম পৃথিবীতে পরিচিত হবে।" এই ব'লে মহাদেব অদৃশ্য হলেন।

পরদিন যথার্থই এক সওদাগর বহু ধন-রত্ন নৌকা ভরাট ক'রে পাল তুলে চলে যাচ্ছে; তীর থেকে সেই পাঁচ ভাই ডেকে জিজ্ঞাসা করলে, "সওদাগর, তোমার নৌকায় কি?"

সওদাগর বিরক্ত হয়ে বল্লে, "তোমরা অতি শিশু, নৌকা জেনে কি করবে? আমার নৌকায় লতা-পাতা।"

পাঁচ ভাই তখন সমস্বরে বলে উঠ্‌লো, "তাই হউক।"

যেই কথা, সেই দেখ্‌তে দেখ্‌তে সওদাগরের নৌকা বোঝাই সেই হীরা, মাণিক, জহর, সব পাতা-লতা হতে আরম্ভ হলো! সওদাগর বড় বিপদে পড়্‌লো, লোকজনকে ডেকে বল্লে, "এ বালকেরা মানুষ নয়, দেবতা, নৌকা সত্বর তীরে ভিড়াও।" মাঝী নৌকা লাগালে। সওদাগর লাফ দিয়ে তীরে পড়ে' তাদের পায় ধন্না দিল। কেবল কাঁদে—উপায় কি?

পাঁচ ভাই বল্লে, "আমরা অতি বালক, কি জানি কি করব।" সওদাগর কিছুতেই নিরস্ত হলো না, এক এক বার পঞ্চ ভ্রাতার পায় লুটাতে লাগ্‌লো। অগত্যা বালকগণ বল্লে, "আমরা যা বলি শুন—আমরা পাঁচ ভাই—নাম ফুলকর, সফলকর, দুধকর, নীলকর, জলকর। ব্রাহ্মণ আনিয়া পঞ্চদেবতার নৈবেদ্য দ্বারা পূজা দিও। চৈত্রসংক্রান্তি থেকে আরম্ভ ক'রে প্রতি মঙ্গলবারে পূজা দিও; বৈশাখের সংক্রান্তির দিন ব্রত শেষ করিও।

ব্রতের প্রথম দিন ও শেষ দিন দৈ চিঁড়া দ্বারা বারান দিয়ে ব্রতিনীকে উহা খেতে দিও। চৈত্র ও বৈশাখের সংক্রান্তি দিন ব্রতিনীকে নিজ হাতে নানা ডাইল, ভাজা, মিষ্টান্ন, নিরামিষ পাক করে খেতে হবে। বৈশাখের সংক্রান্তির দিন রাত্রিতে আম্র ভক্ষণ ও দুগ্ধ পান করিয়া ব্রতভঙ্গ করতে হয়।"

সওদাগর বাড়ী যেয়ে ফুলকর ব্রত ক'রে সব ধন-দৌলত ফিরে পেলেন। এই ব্রত ঘরে ঘরে প্রচারিত হলো।

শিক্ষা-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন প্রথাগুলি ক্রমে লয় প্রাপ্ত হইতেছে। পল্লীগ্রামের নিভৃত কুটীরে এক দিন এই সকল মেয়েলি বার-ব্রত সর্ব্বদা অনুষ্ঠিত হইত; কিন্তু কালের অচিন্তনীয় পরিবর্ত্তনে ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল সংঘর্ষে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইতেছে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

সুখ দুঃখ।

সুখ নিমেষের স্বপ্ন, মুহূর্ত্তের মায়া,
সায়াহ্নের রাঙ্গা মেঘে স্বর্ণ-মরীচিকা!
নিতান্ত বন্ধনহীন কায়াহীন ছায়া
মত্ত করে জ্বালি' দীপ্ত লালসার শিখা;
ছড়াইয়া চারি ভিতে চারু বর্ণরাগ—
বাঁধি' চিত্ত কি বিচিত্র ইন্দ্রজাল-বলে,
সে শুধু বাড়ায় নিত্য মিথ্যার সোহাগ
সত্যের অমৃত-দীপ্তি রাখি' অন্তরালে!
দুঃখ—দৃপ্ত বজ্রসম—প্রচণ্ড আঘাতে
চূর্ণ করে কামনার স্বর্ণ-কারাগার।
ব্যথিত ব্যাকুল প্রাণে অকস্মাৎ ভাতে
সত্য-সুন্দরের রূপ—সৌন্দর্য্য-সম্ভার!
দুঃখের দুঃসহ দাহে চিত্ত যত জ্বলে,
আত্মার অমৃত তত হৃদয়ে উছলে!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

ষ্ট্রাবো।

গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে পালিবোথরা (পালীপুত্র) অবস্থিত ছিল। (১) এই নগর দৈর্ঘ্যে ৮০ ষ্টেডিয়া (১ ষ্টেডিয়া ৬০৬¾ ফিট) এবং প্রস্থে ১৫ ষ্টেডিয়া ছিল। পাটলীপুত্রের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর পরিদৃষ্ট হইত। শর নিক্ষেপ করিবার জন্য ঐ প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য ছিদ্র ছিল। যে প্রদেশে এই নগর অবস্থিত ছিল, তাহার অধিবাসীরা ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করে, এবং প্রাসাই নামে পরিচিত হয়।

---

(১) বর্ত্তমান পাটনার অদূরে প্রাচীন পাটলীপুত্র অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান পাটনার অদূরেই শোণ গঙ্গার সহিত মিলিত ছিল; তার পর ১৩৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ মাইল সরিয়া গিয়াছে।—The ruins of the old city of Pataliputtra now lie deep entombed below the foundation of the modern city (Patna). This fact was brought to light in

পালিবোথরা পাটলিপুত্র নগরের বর্ণনার পর ষ্ট্রাবো নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন,—গ্রীকগণ মগধ ও অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই দূরতা ও অজ্ঞতা নিবন্ধন অলৌকিক অথবা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। ষ্ট্রাবো এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া অলৌকিকতা ও অতিরঞ্জনের কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তার পর তিনি স্বাভাবিক ও অলৌকিক,—উভয়বিধ বহু বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। আমরা তন্মধ্য হইতে যাহা যাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিলাম, তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

যে রমণী তাহার প্রণয়পাত্রের নিকট হইতে হস্তী উপহার প্রাপ্ত হইত, তাহার সমাদরের সীমা থাকিত না; গ্রীক লেখক নিয়ারকস এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু অন্য এক জন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নরপতি ব্যতীত অপর কাহারও রাজবিধিক্রমে হস্তী ও অশ্ব পালন করিবার অধিকার ছিল না। বর্ষাকালে সর্পাদির অত্যন্ত উপদ্রব হইত; এ জন্য ভারতবাসীরা সমুচ্চ খট্টা নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি শয়ন করিত। অসংখ্য সর্প জলে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইত; এইরূপে সর্পকুলের ধ্বংস না হইলে সমগ্র দেশ জনশূন্য মরুভূমিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা ছিল। ভারতবাসীরা পত্রাদি লিখিবার জন্য এক প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিত। এই বস্ত্র লিখনোপযোগী করিবার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত ঘনভাবে বয়ন করিয়া লওয়া হইত। ভারতবাসীরা কোনও উৎসব উপলক্ষে শোভা-যাত্রা করিলে, মহিষ, পালিত সিংহ প্রভৃতি বন্য পশু ও বিচিত্রপক্ষ বিহঙ্গমসমূহ লইয়া যাইত।

পুরাকালে ভারতীয়গণ সংযমাচারের জন্য বিখ্যাত ছিল। সুরা ভারতীয় সমাজে অত্যন্ত ঘৃণ্য ছিল। ভারতবাসীর সুরাপান সম্বন্ধে ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে যে

1876 when the workman employed in digging a tank between the market place of Patna and its Ry statian discovered at a depth of some twelve or fifteen feet below the swampy surface the remains of a long built wall with a line of palisades of strong timber running near and almost parallel to it and slightly inclined towards it. It would thus appear that the wooden wall of Palibothra was in reality a line of palisades in front of a wall of brick.

বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই যে, ভারতবর্ষের রাজন্যকুলে সুরার প্রচলন ছিল। কিন্তু গ্রীক লেখক এথেন আইওসের মতে, ভারতীয় রাজন্যগণের পক্ষেও মিতাচারই প্রশংসার্হ ছিল। কারটিয়াস নামক এক জন গ্রীক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, ভারতবাসিমাত্রই সুরাপানে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু মেগাস্থিনিস অন্য প্রকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তাঁহার মতে, কেবল যজ্ঞের সময় সুরাপান করিবার নিয়ম ছিল। মালবারের বন্দরসমূহে মদ্য বিক্রীত হইত। কিন্তু উহার মূল্য অত্যন্ত অধিক ছিল বলিয়া কেবল ধনীর সন্তানেরাই তাহা ক্রয় করিতে পারিত। অনুগঙ্গ প্রদেশে কেহ সুরাপান করিয়া মত্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহার কঠোর দণ্ডের বিধান করিতেন। ভারতবর্ষে সোম নামক লতা হইতে মদ্য প্রস্তুত হইত; ভারতীয়গণ সুরাপান করিবার পূর্ব্বে তাহা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইত।

পুরাকালে সংযম ও কষ্টসহিষ্ণুতা ভারতবর্ষীয়দিগের চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তাঁহাদের সুরাপাম-বিরতিতে সংযমের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের জীবন কত দূর কষ্টসহিষ্ণু ছিল, সাধু সন্ন্যাসিগণের বৃত্তান্ত পাঠ করিলেই তাহা আমাদের উপলব্ধি হইতে পারে। সিসেরু লিখিয়াছেন,—"আর কোন দেশ ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত ও বনরাজি পূর্ণ নহে। এই দেশে যাঁহারা মুনি ঋষি নামে পরিচিত, তাঁহাদের চিরজীবন উলঙ্গভাবে অতিবাহিত হয়; তাঁহারা অবিচলিতচিত্তে পার্ব্বত্য তুষার ও শীতের তীক্ষ্ণতা সহ্য করেন। যে সময় তাঁহারা জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাদের মুখ হইতে কাতরধ্বনির লেশমাত্রও উত্থিত হয় না।" সিসেরুর এই মতের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিবার জন্য আমরা এরিয়ানের গ্রন্থ হইতে কিয়দংশের অনুবাদ প্রদান করিতেছি।—"ভারতীয় সাধু সন্ন্যাসিগণ উলঙ্গ অবস্থায় গমনাগমন করেন; তাঁহারা শীতকালে দেহ উষ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত আকাশতলে অবস্থিতি করেন, তার পর গ্রীষ্মসমাগমে সূর্য্যতাপ অসহ্য হইয়া উঠিলে, ছায়াশীতল বৃক্ষতলে গমন করেন।" ষ্ট্রাবো কতিপয় সাধুর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাহা হইতে প্রচীন কালের সাধু সন্ন্যাসিগণের জীবনযাপনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা জানিতে পারি। এ জন্য আমরা পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণার্থ তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

সম্রাট আলেকজাণ্ডার তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া তদ্দেশীয় সাধু সন্ন্যাসিগণের

অদ্ভুত আচার ব্যবহারের বিষয় অবগত হন। তিনি স্বচক্ষে তাঁহাদের আচার ব্যবহার দেখিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কতিপয় সাধু সন্ন্যাসীকে সমীপে আহ্বান করেন। কিন্তু কেহ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা আহ্বানকারীকেই তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইতে বলিতেন। সম্রাট এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে বলপূর্ব্বক স্ব-শিবিরে আনয়ন করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করেন; অপর পক্ষে, তাঁহাদের বাসস্থানে তাঁহার নিজের গমনও অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। এই কারণে তিনি অনেসি ক্রিটস নামক এক জন সহচরকে প্রেরণ করেন। অনেসি ক্রিটস তক্ষশিলার সাধু সন্ন্যাসিগণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—তক্ষশিলা নগরী হইতে ২০ ষ্টেডিয়া দূরবর্ত্তী সাধু সন্ন্যাসিগণের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাই যে, পনর জন সাধু বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কেহ উলঙ্গ অবস্থায় শয়ন করিয়া, কেহ বা উলঙ্গ অবস্থায় দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত এই ভাবে নিশ্চল মূর্ত্তির ন্যায় অবস্থিতি করেন। সন্ধ্যা সমাগত হইলে তাঁহারা ঐ আবাসস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগরীতে গমন করেন। সূর্য্যের উত্তাপ সহ করাই সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টকর। এই স্থানের রৌদ্র এত প্রখর যে, দ্বিপ্রহর কালে নগ্নপদে ভ্রমণ করিলে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাইতে হয়। আমি কলানস নামক এক জন সাধুর সহিত আলাপ করি। আমার সঙ্গে আলাপের সময় তিনি প্রস্তরখণ্ডসমূহের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনারা কিরূপ জ্ঞানবান, তাহা পরীক্ষা করিয়া সম্রাটকে জানাইবার নিমিত্ত তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন। কলানস আমার আলখেল্লা, প্রশস্ত টুপি ও লম্বা জুতা দেখিয়া হাস্য করিয়া উঠিলেন; তার পর বলিতে লাগিলেন,—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবী যেরূপ ধূলিপূর্ণ, পুরাকালে সেইরূপ শস্য-পূর্ণ ছিল। তৎকালে জল, মধু, দুগ্ধ, তৈল ও সুরার পৃথক পৃথক প্রস্রবণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মানব জাতি বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতা নিবন্ধন গর্ব্বিত ও অশিষ্ট হইয়া উঠিল; এ জন্য ইন্দ্র ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ সমুদয়ের বিলোপসাধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে চিরজীবন পরিশ্রম করিয়া অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত অভিশাপ দিয়াছেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারের অবসান হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান অবস্থা দূরীভূত হইবে বলিয়া বোধ হয়। যদি আমার উপদেশ শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে সমস্ত গাত্রবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উলঙ্গ,

অবস্থায় আমার সঙ্গে একাসনে উপবিষ্ট হইয়া আমার কথা শ্রবণ কর। কলানসের বাক্যে কি কর্ত্তব্য, আমি তাহা চিন্তা করিতেছিলাম, এমন সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞানগরিষ্ঠ মন্দনিস কলানসকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন. তুমি যে সকল দোষের নিন্দা করিতেছ, তোমার বাক্যে তৎসমুদয় অর্থাৎ অশিষ্টাচারাদি প্রকাশ পাইতেছে। অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সম্রাট প্রশংসাভাজন; কারণ, তিনি বিপুল ভূভাগের অধীশ্বর হইয়াও জ্ঞানান্বেষণে নিরত রহিয়াছেন। আমি এ পর্য্যন্ত আলেকজাণ্ডার ব্যতীত আর কোনও সশস্ত্র দার্শনিক দেখি নাই। যাঁহাদের অনুগত লোকদিগকে উপদেশপ্রদান ও অবাধ্য লোকদিগকে বলপ্রয়োগ করিয়া সংযমাচার শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যদি জ্ঞানবান হয়েন, তবে পৃথিবীর মহত্তম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। যে নীতি আমাদিগকে সুখ ও দুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত করিতে সমর্থ, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। দুঃখ পরিশ্রম হইতে স্বতন্ত্র। দুঃখ মনুষ্যের শত্রু, পরিশ্রম মনুষ্যের বন্ধু। লোকে মানসিক শক্তির বিকাশের জন্যই শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। তাহারা কেবল মানসিক শক্তিবলেই বিবাদ বিসংবাদের নিরারণ করিতে সমর্থ হইয়া সর্ব্বসাধারণকে সদুপদেশ দিতে পারিবে। তক্ষশিলার অধিবাসিগণের পক্ষে আলেকজাণ্ডারকে সাদরে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য। যদি তক্ষশিলার অধিবাসীরা আলেকজাণ্ডারের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান হয়, তবে তাঁহার উপকার হইবে; আর যদি তিনি জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হন, তাহা হইলে তক্ষশিলার অধিবাসীরা উপকারলাভ করিবে।" গ্রীক জাতির মধ্যে পূর্ব্বোদ্ধৃত মত সকল প্রচলিত আছে কি না, তৎসম্বন্ধে মন্দনিস আমাকে প্রশ্ন করেন। আমি তদুত্তরে বলি, পিথাগোরোস এই প্রকার নীতির প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং শিষ্যবর্গকে মাংসাহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি সক্রেটিস ও ডাওজিনিসের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছি, তাঁহারাও ঐ প্রকার মতাবলম্বী। আমার বাক্যে মন্দনিস উত্তর করেন, "আমার বিবেচনায় আপনাদের সমস্ত মতামতই সমীচীন; আপনারা কেবল একটি ভুল করেন,—আপনারা প্রকৃতি অপেক্ষা অভ্যাসের অধিক পক্ষপাতী, ইহাই আপনাদের ভুল। আপনারা এই প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাসী বলিয়াই উলঙ্গ অবস্থায় বাস ও যৎসামান্য আহার করিতে কুণ্ঠিত হন। যে গৃহের সংস্কারের প্রয়োজন অল্প, তাহাই খুব মজবুত। আমরা প্রাকৃতিক দৃশ্য, ভাবী শুভাশুভ, বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও লোকপীড়া-সম্বন্ধীয় তত্ত্বানু-

সন্ধানে ব্যাপৃত থাকি।” এই সকল সাধু সন্ন্যাসীর নিকট প্রত্যেক ধনবানের গৃহদ্বার উন্মুক্ত। তাঁহারা অবাধে অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিতে পারেন। সাধু সন্ন্যাসিগণ ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভোজন ও কথোপকথন করেন। যদি কোনও সাধু পীড়াগ্রস্ত হন, তবে তাঁহার সম্মানের অত্যন্ত লাঘব হয়; তজ্জন্য পীড়িত হইলে তাঁহারা জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া নির্বিকারভাবে জীবনবিসর্জ্জন করেন।

আলেকজাণ্ডারের আগমনকালে প্রাগুক্ত সাধু সন্ন্যাসিগণ ব্যতীত আর দুই জন সাধু তক্ষশিলায় বাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব ছিলেন। জ্যেষ্ঠ সাধুর মস্তক মুণ্ডিত ছিল; কিন্তু কনিষ্ঠ সাধুর মস্তক কেশাবৃত ছিল। এই দুই জন সাধুরই অনেক শিষ্য ছিল। তাঁহারা অবসরকাল হাট বাজারে অতিবাহিত করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের উপদেষ্টা ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। তাঁহারা বিনামূল্যে বিক্রেতাদিগের জিনিসপত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহারা তিল ও মধু দ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। এই সাধুদ্বয় একদা সম্রাট আলেকজাণ্ডারের শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা রাজশিবিরে আসন পরিগ্রহ করিতে অস্বীকৃত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া আহার করেন। তার পর তাঁহাদের এক জন উন্মুক্ত স্থানে পৃষ্ঠোপরি শয়ন করিয়া এবং অপর জন একপদে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হাতে তিন হস্ত পরিমিত কাষ্ঠদণ্ড ধারণ করিয়া সমস্ত দিন রৌদ্র বৃষ্টি সহিয়া কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন। কনিষ্ঠ সাধু আলেকজাণ্ডারের সহিত কিয়দ্দূর গমনপূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হন; সম্রাট তাঁহাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়া পাঠান; তদুত্তরে তিনি বলেন যে, প্রয়োজন হইলে সম্রাট তাঁহার সমীপে আগমন করিতে পারেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ সাধু সম্রাটের সমভিব্যাহারে গমন করেন। রাজসহবাসে তাঁহার জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই কারণে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে তিরস্কার করেন। তিনি তিরস্কৃত হইয়া উত্তর করেন, আমি চল্লিশ বৎসর তপশ্চর্য্যা করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম; আমার এই ব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। (১)

(১) যেরূপে সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সহিত সাধুযুগলের সাক্ষাৎ ঘটে, তাহা কৌতুকাবহ। আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে গমন করিতেছিলেন; এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, দুই জন সাধু তাঁহাকে দেখিয়া পদ দ্বারা মাটীর উপর সজোরে আঘাত করিলেন;

তক্ষশিলার সাধু সন্ন্যাসিগণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া ষ্ট্রাবো তক্ষশিলার ও অন্যান্য প্রদেশের প্রকৃতিপুঞ্জের আচার ব্যবহার ও রীতি নীতির বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা তাহার সারসংগ্রহ করিয়া দিলাম। এই দেশের ব্যবস্থাসমূহ অলিখিত, এবং অন্যান্য জাতির ব্যবস্থা অপেক্ষা বিভিন্ন ছিল। ভারতবর্ষের কোনও জাতির কন্যা বিবাহযোগ্যা হইলে তাহার পাণিপ্রার্থিগণ তদীয় পিত্রালয়ে সমাগত হইয়া মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। যিনি ইহাতে জয়শ্রী লাভ করিতেন, তিনি কন্যা-রত্নের অধিকারী হইতেন। (১) যদি কেহ দারিদ্র্যনিবন্ধন কন্যার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইত, তবে সে কন্যা সহ বাজার গমনপূর্ব্বক ঢাক বাজাইত। এই ঢক্কা-নিনাদ শ্রবণ করিয়া বিবাহার্থিগণ সমাগত হইলে, কন্যা যাহার মনোনীত হইত, তাহার হস্তেই কন্যাকে সমর্পণ করিবার নিয়ম ছিল। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া সন্তোষসহকারে জীবন বিসর্জ্জন করিত। কোনও রমণী পুড়িয়া মরিতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করিলে তাহার বড় নিন্দা হইত। (২) এই দেশে আর একটি প্রথা বিদ্যমান ছিল; কতিপয় পরিবারের লোক এক সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিত; তার পর শস্য পক্ক হইলে তাহা বিভাগ করিয়া লইবার নিয়ম ছিল। প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য প্রাপ্ত হইলে তাহারা উহা দগ্ধ করিয়া ফেলিত, এবং আবাদের সময় সমাগত

সম্রাট তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন, হে সম্রাট। আমরা যতখানি ভূমি আঘাত করিয়াছি, পৃথিবীর মনুষ্যমাত্রই কেবল ততখানি ভূমির অধিকারী; যদিও আপনি আমাদের ন্যায়ই এক জন মনুষ্য, তথাপি অনধিকারচর্চ্চাপ্রিয়তা ও দাম্ভিকতাবশতঃ পৃথিবীর বিপুল অংশ অধিকার করিয়া নিজের ও অন্যের কষ্টের কারণ হইয়াছেন; কিন্তু শীঘ্রই আপনার মৃত্যু হইবে, এবং কবরের জন্য যে পরিমাণ ভূমি আবশ্যক, কেবল তাহাই আপনার অধিকারে থাকিবে।

(১) বিবাহ সম্বন্ধে এই প্রথা আমাদিগকে স্বয়ংবরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(২) ভারতবর্ষের সতীদাহপ্রথার প্রসঙ্গে সিদেরু যাহা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—Women in India, when the husband of any of them dies, dispute and try in court which of them he loved best, for several of them are married to one man. She who comes victorious, joyfully amongst friends and relatives is placed along with her husband on his funral pile. The widow who has been unsuccessful departs full of sorrow.

হইলে পুনর্ব্বার ক্ষেত্রকর্ষণে নিযুক্ত হইত। ফলতঃ, যাহাতে আলস্য প্রশ্রয় না পায়, তজ্জন্যই প্রয়োজনাতিরিক্ত শস্য বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ধনু ও বাণ এই দেশের সাধারণ অস্ত্র ছিল। ঐ সকল বাণ তিন হস্ত পরিমিত দীর্ঘ হইত; কেহ কেহ বা বল্লম, ঢাল ও প্রশস্ত তরবারি ব্যবহার করিত। এতদ্দেশীয়েরা তাম্রপাত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু তৎসমুদয় ঢালাই হইত, পেটা পাত্র তখন ছিল না, এ কারণ মাটীতে পড়িলেই মৃৎপাত্রের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইত। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিত না; উচ্চ নীচ প্রজামাত্রই তাঁহাকে প্রার্থনাসূচক সম্বোধন-বাক্যে অভিবাদন করিত। ভারতীয়গণ ইন্দ্রদেব, গঙ্গা ও অন্যান্য দেবতার উপাসক ছিলেন। কোনও নরপতি কেশ ধৌত করিলে তাঁহার প্রজাবর্গ মহোৎসবে নিরত হইত, এবং রাজসমীপে মহার্ঘ্য উপঢৌকন প্রেরণ করিত। তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট উপঢৌকন প্রেরণ সম্বন্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত। তাহারা উৎসব উপলক্ষে মিছিল বাহির করিত। এই সকল মিছিলের প্রথম অংশে স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কারে সজ্জিত হস্তী, চতুরশ্ব-পরিচালিত রথ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বলীবর্দ্দের শ্রেণী পরিদৃষ্ট হইত। তার পর বহুসংখ্যক পরিচারক সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া স্বর্ণনির্ম্মিত নানাবিধ পানপাত্র ও তাম্রনির্ম্মিত ও মণিমুক্তাখচিত সুখাসন, সিংহাসন, পানপাত্র, জলপাত্র ও স্বর্ণের কারুকার্য্য-বিশিষ্ট পরিচ্ছদ বহনপূর্ব্বক গমন করিত। পরিচারকশ্রেণীর শেষে মহিষ, তরক্ষু, পালিত সিংহ ও বিচিত্রপক্ষ ও সুকণ্ঠ বিহঙ্গমসমূহ নীত হইত। চতুশ্চক্র যানে সপল্লব বৃক্ষ সকল উত্তোলন করিয়া তাহাতে পক্ষীর পিঞ্জর-গুলি ঝুলাইয়া রাখা হইত।

ষ্ট্রাবোর গ্রন্থ হইতে আমরা হিন্দুর ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের শ্রমণ—উভয় শ্রেণীর সম্বন্ধই কিঞ্চিৎ বিবরণ অবগত হইতে পারি। ব্রাহ্মণগণের অনেকে রাজ-নীতির আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং রাজন্যবৃন্দের উপদেষ্টার কাজ করিতেন; আবার অনেকে প্রকৃতির গ্রন্থ পাঠেই সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। আর্য্যনারীবৃন্দও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া অধ্যয়নে নিযুক্ত থাকিতেন। এই সকল মহিলা সাতিশয় সংযতভাবে জীবনযাপন করিতেন।

ষ্ট্রাবো শ্রমণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—শ্রমণগণ ব্রাহ্মণগণের বিরোধী, তার্কিক ও বাক্‌বিতণ্ডাপ্রিয় ছিলেন। যে সকল ব্রাহ্মণ জ্যোতিষ ও শারীরস্থান বিদ্যার শিক্ষায় নিরত হইতেন, শ্রমণগণ তাঁহাদিগকে প্রতারক ও

নির্ব্বোধ বলিয়া উপহাস করিতেন। শ্রমণগণ পর্ব্বতে, নগরে ও পল্লীতে বাস করিতেন। পর্ব্বতবাসী শ্রমণগণ কৃষ্ণাজিন পরিধান করিতেন, এবং নানাপ্রকার বৃক্ষমূল ও ঔষধ সঙ্গে রাখিতেন। তাঁহারা যাদুবিদ্যাবলে রোগ-নিবারণ সক্ষম, এইরূপ প্রকাশ করিতেন। বৌদ্ধ বিহারে শ্রমণগণের সঙ্গে বৌদ্ধরমণীরাও বাস করিতেন; কিন্তু তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। নগরবাসী শ্রমণগণ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতেন।

পুরাকালে ভারতবাসিমাত্রই শুভ বস্ত্র পরিধান করিত। তাহাদের দীর্ঘ কেশ ও শ্মশ্রু ছিল। তাহারা এই দীর্ঘ কেশরাজি দ্বারা বেণী বন্ধন করিত।

ষ্ট্রাবো স্বগ্রন্থে ভারতবর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—পুরাকালে আয়ারসি নামক এক জাতি তানাইস নদীর কূলে বাস করিত। একারভিয়াস নদীর কূলে সিরাসেস নামক আর এক জাতির বাস ছিল। কাস্পিয়ান উপসাগরের কূলবর্ত্তী অধিকাংশ স্থান এই দুই জাতির অধিকৃত ছিল বলিয়া ভারতীয় পণ্য সহজেই তাহাদের হস্তে আসিয়া পড়িত। তাহারা আর্ম্মেনিয়ান ও মেদেস জাতির নিকট হইতে ঐ সকল পণ্য ক্রয় করিয়া লইত। তাহারা স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আপনাদের ধনগৌরবের পরিচয় দিত। বৈদেশিক বণিকগণ কাস্পিয়ান উপসাগরের প্রবেশ-দ্বার পরিত্যাগপূর্ব্বক হেকটমফিনস (সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দামাঘন) নামক স্থানে (১৯৬০ ষ্টেডিয়া), তথা হইতে হিরাটে (৪৫৩০ ষ্টেডিয়া), তথা হইতে বর্ত্তমান সিস্তান প্রদেশের প্রধান নগর ফারে (১৬০০ ষ্টেডিয়া), তথা হইতে বর্ত্তমান উনানবরাট নামক স্থানে (৪১২০ ষ্টেডিয়া) এবং তথা হইতে কাবুলে (২০০০ ষ্টেডিয়া) আগমন করিত। তাহার পর তাহারা কাবুল পরিত্যাগপূর্ব্বক ১০০০ ষ্টেডিয়া অতিক্রম করিয়া ভারতসীমায় উপনীত হইত। তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নৌযোগে অক্সস নদীর পথে কাস্পিয়ান উপসাগরের কূলে ভারতীয় পণ্য আনয়ন করিত। (১)

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

---

(১) ষ্ট্রাবোর গ্রন্থেও ভারতীয় বর্ণভেদপ্রথার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে বৃত্তান্ত মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত; এই জন্য আমরা তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিলাম।

ভক্ত।

ও পাদপদ্মের পুণ্য অমৃত সৌরভে
মাতিয়াছে যার চিত্ত—মন্ত্রদীপ্ত প্রাণ,
মহৎ যে মহীয়ান কর্ম্মের গৌরবে,
যে পেয়েছে মৃত্যুকালে সুধার সন্ধান,
শক্তি তার ফুটায় মা! পূজার কমল,
প্রভাত-তপন সম লক্ষ হৃদি মাঝে,
ভক্তি তার আনি দেয় অভয়-মঙ্গল,
মৃত্যু তার মহিমায় অবনত লাজে,
সে জানে ত্যাগীর অস্থি বজ্ররূপ ধরি',
দম্ভদৃপ্ত দৈত্যশক্তি করে ভস্ম শেষ,
সুধা ফেলি' হলাহলে পদ্মহস্ত ভরি
কেন বিষ খান হর্ষে আপনি মহেশ।
ত্যাগ তার ধ্রুব ধর্ম্ম—কর্ম্ম আত্মদান,
অমৃত বিলায়ে নিজে করে বিষপান।

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কবি ৺ ঠাকুরদাস দত্ত।

বাঙ্গলা ভাষার লুপ্ত গ্রন্থ ও লুপ্ত কবির অনুসন্ধান ও প্রচারের উৎসাহ আজকাল যথেষ্ট বাড়িয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত দীনেশচরণ সেন, শ্রীযুত রসিকলাল বসু, শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী, শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির যত্নে অনেক রত্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমরাও আজ আর এক জন গুপ্ত কবির বিবরণ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছি। নব্য সাহিত্যসেবীর নিকট ইঁহার কীর্ত্তিরাশি যতটা অজ্ঞাত, প্রাচীনের নিকট ততটা নহে।

কবি বলিলেই এখন বাঙ্গালা সাহিত্যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা মনে পড়ে। এক শ্রেণীতে কবি কৃত্তিবাসাদি, এবং আর এক শ্রেণীতে নব্য কবি-সম্প্রদায়। কিন্তু ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালায় 'কবি' বলিলে যাঁহাদিগকে বুঝাইত, এখনকার সাহিত্যসমাজ তাঁহাদিগকে 'গীতকর্ত্তা' কবি বলিয়া,

বিশেষ আখ্যা দিয়া থাকেন। রাম বসু, হরু ঠাকুর, নিধুবাবু প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কবি কৃত্তিবাসাদির নামে সাহিত্যসেবীদিগের প্রাণে কবি সম্বন্ধে যে ভাব জাগিয়া উঠে, আমাদের আলোচ্য কবি ৺ঠাকুরদাস দত্ত সে ভাবের কবি নহেন; কবি রাম বসু হরু ঠাকুর যে শ্রেণীর, কবি ঠাকুরদাসও সেই শ্রেণীর। তবে সেখানেও তাঁহার একটু বিশেষত্ব আছে। কবি দাশরথির ন্যায় তিনি পাঁচালী-কর্ত্তা, কবি রাম বসু ন্যায় তিনি কবির গীতকর্ত্তা, এবং গোবিন্দ অধিকারীর ন্যায় তিনি যাত্রার সাট-(পালা)-রচয়িতা ছিলেন।

ঠাকুরদাস দত্ত এখন জীবিত নাই। তবে বড় বেশী প্রাচীন কালের লোকও তিনি নহেন। তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহার নিজ মুখে তাঁহার রচিত সঙ্গীতাদি শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, এমন লোক এখনও বর্ত্তমান আছেন। কবি দাশরথি রায় যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, কবি ঠাকুরদাসও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেনে; কিন্তু তিনি দাশরথি অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁহার পূর্ব্বেই কবি-খ্যাতি লাভ করেন। নব্য সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যেও যাঁহারা ত্রিশ বৎসরের অধিক সাহিত্যসেবা করিতেছেন, তাহাদেরও অনেকে ইঁহার কীর্ত্তিরাশির সহিত একবারে অপরিচিত হয়েন।

কবি ঠাকুরদাস পাঁচালী রচনা করিতেন, কবির গান বাঁধিতেন, যাত্রার সাট লিখিতেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কীর্ত্তিরাশি আজিও পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয় নাই; পুঁথি বা খাতার আকারেও কোথাও রক্ষিত হয় নাই। কবির কীর্ত্তির অধিকাংশ এখনও মুখে মুখেই রহিয়া গিয়াছে। সুখের বিষয়, দাশরথির ন্যায় ইঁহার বংশাভাব ঘটে নাই। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার দুই পুত্র ও তিনটি পৌত্র বর্ত্তমান। তাঁহারা এক্ষণে পৈত্রিক কীর্ত্তি-উদ্ধারের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।*

কবি ঠাকুরদাসের অনেকগুলি মনোহর গীত সাধারণের মুখে যথেষ্ট

* কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম শ্যামাচরণ দত্ত ও কনিষ্ঠ পুত্রের নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত। শ্যামাচরণ বাবুর এক পুত্র হরিদাস দত্ত, এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বাবুর দুই পুত্র,—শ্রীহরিপদ দত্ত ও শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত। শ্যামাচরণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু ও সুমিষ্ট সুললিত গীতাবলীর রচনা করিয়াছেন। কিরণ বাবুরও কবিতাদি লিখিবার ক্ষমতা আছে, মাসিকপত্রাদিতে তিনি লিখিয়া থাকেন। কবির পিতামহও ৺রাম বসুর কবির দলে ছিলেন।

প্রচারিত হইয়া আছে; কিন্তু গানের শেষে তখনকার কাল-সুলভ রচয়িতার ভণিতা না থাকায়, সেই সকল গানের প্রণেতাকে ধরিবার উপায় ছিল না। কোনও কোনও গানের শেষে ঠাকুরদাসের 'দাস' শব্দযোগে অসতর্ক ভাবে বিন্যস্ত ভণিতাও দেখা যায়।

কলিকাতার পশ্চিমে গঙ্গাপারে হাবড়ার মধ্যে, ব্যাঁটরা একখানি বদ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই গ্রামের উত্তর খণ্ডে দত্ত মহাশয়দিগের বাস। কবির পৌত্র পর্য্যন্ত গণনা করিলে, এই গ্রামের ইঁহাদের বাস ১৭শ পুরুষ; অর্থাৎ ৫৯০ শত বর্ষেরও অধিক। ইঁহারা কায়স্থ, দক্ষিণরাঢ়ীয় নওয়াগা সমাজের দত্ত। কবির পিতামহের নাম রামকানাই দত্ত ও পিতার নাম রামমোহন দত্ত। ঠাকুরদাস কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা ঠিক বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ২১শে বৈশাখ ১২৮৩ সাল। আনুমানিক ৭৫ বৎসর বয়সে তাঁহার স্বর্গলাভ হয়।

ঠাকুরদাসের পিতৃপিতামহের অবস্থা মন্দ ছিল না। বাড়ীতে খোড়ো দালান হইলেও, বারোমাসে তেরো পার্ব্বণ হইত; কেবল জগদ্ধাত্রী পূজা হইত না। কবির পিতা রামমোহন ৺রাম বসুর সহিত 'মিতা' পাতাইয়াছিলেন, এবং একত্র কবির দল চালাইতেন। কবির পিতা তখনকার ফোর্ট উইলিয়মে কেরাণীগিরি করিতেন; বেশ উপার্জ্জনও করিতেন; সুতরাং বাল্যকালে কবির লেখাপড়া হইয়াছিল। ঠাকুরদাস পিতা মাতার একমাত্র সন্তান; সুতরাং অতি আদরের ছিলেন। একে সংসারের স্বচ্ছলতা, তায় পিতা মাতার আদরের সন্তান; তবুও কবি বাল্যকালে উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন নাই। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল; কিন্তু বাঙ্গালা বড় ভাল লিখিতে পারিতেন না। সেকালে গ্রামে গ্রামে ইংরাজী স্কুল ছিল না। কোনও ধনীর আলয়ে এক জন ইংরাজী-অভিজ্ঞ ব্যক্তি আশ্রয় লইয়া সেই ধনীর ও গ্রামের আরও কতিপয় ভদ্রসন্তানকে বিদ্যাদান করিতেন। কবিও এইরূপে রামময় মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির নিকট ইংরাজী শিখিয়াছিলেন।

ঠাকুরদাসের যখন ২৪।২৫ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে ফোর্ট উইলিয়মের কোনও এক আফিসে একটি চাকুরী করিয়া দেন; কিন্তু ঠাকুর-দাসের তাহা ভাল লাগিল না। তিনি তাঁহার পিতার সঙ্গীতপ্রিয়তা গুণের পূর্ণমাত্রায় উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এবং এখন হইতে সে বিষয়ে একটু

রসবোধ হইয়াছিল, তখন হইতেই তিনি তাহার আলোচনায় মগ্ন থাকিতেন। তখন কবি পাঁচালীর বড় প্রাদুর্ভাব। অতি ক্ষুদ্র গ্রামেও কবির বা পাঁচালীর দল ছিল, বা গাওনা হইত। ঠাকুরদাস বাল্যকাল হইতেই যেখানে কবি বা পাঁচালীর গাওনা হইবে শুনিতেন, সেইখানেই ছুটিয়া যাইতেন। কাজেই তাঁহার সঙ্গীতাসক্তি অতিমাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছিল। যখন তিনি চাকুরীতে গেলেন, তখন তিনি কবি ও পাঁচালীর সখে একপ্রকার ডুবিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে চাকুরী কাজেই বড় বিরক্তিকর হইল। পাঁচালী কবির কথা শুনিলেই তিনি আফিস হইতে পলাইয়া শুনিতে যাইতেন, আফিস কামাই করিতেন। কিছু দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল, তাঁহার পিতা একদিন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'থড়ম পেটা' করেন। তাহাতে কবি পিতাকে বলিয়াছিলেন, "আমি চাকুরী করিব না, পরাধীনতা আমার পোষাইবে না।" রামমোহন দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রস্নেহে কাতর হইয়া পুত্রকে আর কিছুই বলিলেন না। রামমোহন যেখানে কার্য্য করিতেন, সেখানে ইংরেজ প্রভুর নিকট বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। পুত্রের বিবাহের সময় তিনি আফিসের কতকগুলি ইংরেজ নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যাঁটরার বাড়ীতে আনাইয়াছিলেন, এবং লুচি কচুরী খাওয়াইয়াছিলেন! এইরূপে ঠাকুরদাসের চাকুরীব্যাধি আরোগ্য হইয়া গেল। তিনি স্বাধীনভাবে সঙ্গীতামোদে লিপ্ত হইলেন। কিছু দিন পরে, তাঁহার ২৯।৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হইল। শ্রাদ্ধশান্তির পর তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া সঙ্গীতচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন। পিতৃ-উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি নিজেই একটি সখের যাত্রার দল করিলেন। এই দলে তিনি নিজে 'বিদ্যাসুন্দরে'র সাট বাঁধিয়া দেন। আনুমানিক ১২৩৭।৩৮ সালে এই সাট রচিত হয়। কবির ইহাই প্রথম রচনা। ব্যাঁটরা-নিবাসী উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলে মালিনী সাজিতেন। দুঃখের বিষয়, এই পালার একটি বর্ণও এখনও সংগৃহীত হয় নাই। কাজেই কবির প্রথম রচনার কোনও নমুনা দিতে পারিলাম না।

ইহার পর ঠাকুরদাস আরও দু' একটি পালা বাঁধিয়া গাহিয়াছিলেন, কিন্তু কি কি বিষয়ে পালা বাঁধিয়াছিলেন, তাহার নাম পর্য্যন্ত কাহারও স্মরণ নাই। তৎপরে অর্থাভাবে কবির নিজের সখের দল উঠিয়া যায়। এই দল ২।৩ বৎসর চলিয়াছিল। তাহার পর বন্দীপুরের নিকট গজা চিত্রশালাপুরের জমীদার শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যত্নে গজার সুবিখ্যাত জমীদার ভট্টাচার্য্যদিগের

বাড়ীতে এক সখের যাত্রার দল গঠিত হয়। কবি ঠাকুরদাস এই দলে একখানি 'বিদ্যাসুন্দরে'র সাট বাঁধিয়া দেন। এই সাট তাঁহার নিজের দলে গীত সাটখানি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ব্যাঁট্‌রা-নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত এই দলে মালিনী সাজিতেন। গঙ্গার সখের দলের সুখ্যাতি হইলে, টাকীর সুবিখ্যাত জমীদার মুন্সী বাবুরা একটি সখের দল করিলেন। তখন গোপালে উড়ের * দলের অশ্লীলতাপূর্ণ বিদ্যাসুন্দর যাত্রার যথেষ্ট প্রভাব। মুন্সী বাবুরা অশ্লীলতা বাদ দিয়া এই বিদ্যাসুন্দরের পালাই গাহিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু কে পালা বাঁধিয়া দিবে, এই কথা উঠিলে, গঙ্গার সখের দলের কথা উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে কবি ঠাকুরদাসের নামও উঠিল। তখন মুন্সী বাবুরা (বৈকুণ্ঠনাথ, মথুরানাথ ইত্যাদি) লোক পাঠাইয়া আগ্রহসহকারে ঠাকুরদাসকে টাকীতে লইয়া গেলেন। কবি সেখানে গিয়াই অতি অল্প দিনের মধ্যেই একখানি অশ্লীল-ভাব-বর্জ্জিত 'বিদ্যাসুন্দর' রচনা করিয়া দিলেন। মুন্সী বাবুরা তাঁহার রচনা-কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হন। প্রথম তিন আসর গাওনায় তাঁহারা ১৮০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় করেন। গোবরহাঁড়ার মিত্র-বাড়ীর কুচিল মিত্র ও বেলুড়ের ঘোষবংশীয় যদুনাথ ঘোষ নামক তখনকার কালের প্রসিদ্ধ দুই জন গায়ক এই দলে 'দোয়ার' ছিলেন। †

ইহার পর কবি ফিরিয়া আসিয়া নিজবাড়ীতে একটি পাঁচালীর দল করেন। টাকীর দলের কুঁচিল মিত্র ইঁহার দলে আসিয়া যোগ দেন। কিছু দিন সখের দলে থাকিয়া পেশাদার হইয়া যায়।

পাঁচালীর দল চালাইবার জন্য কবি কয়েকখানি যাত্রার সাট রচনা করেন। এই কয়েকখানিতেই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

---

* গোপালে উড়ুরে যাত্রার গান বলিয়া যে সকল অশ্লীল বিদ্যাসুন্দরের টপ্পা চলিত আছে, তাহার অধিকাংশ গোপালে উড়ের মূল পালার নহে। উহা পরবর্ত্তী যোজনা। গোপালে উড়ে নিজেও গীতরচক নহে। এক সময় ৺বীরনৃসিংহ মল্লিক (যোড়াসাঁকোর) নিজ বাড়ীতে এক সখের দল করেন। ভৈরব হালদার নামক এক ব্যক্তি এই দলের গীত ও পালা রচনা করিতেন। চলিত বিদ্যাসুন্দর টপ্পার কবিত্বপূর্ণ রসময় গানগুলি তাঁহারাই; তাঁহার গানে অশ্লীলতা অল্প। গোপালে উড়ে বীরনৃসিংহের প্রিয়বন্ধু ছিল। সে চাকুরী-ত্যাগের পর বাবুদিগের নিকট ঐ পালা চাহিয়া লইয়া দল করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে থাকে। তাহার পর তাহার দলের ভোলানাথ (ভুলো) ও উমেশ ঐ পালা গাহিত।

† মুন্সীদিগের স্বনামধন্য বংশধর শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই পালার গান সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

(১) কলিকাতায় হাড়কাটার গলিতে দুর্গাচরণ দত্ত নামক এক জন কায়স্থ থাকিতেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের 'ঘড়িয়াল' (ঘড়েল, অর্থাৎ পেটাঘড়ি-বাদক) খ্যাতি ছিল। এই দুর্গাচরণ (দুগো ঘড়েল) যাত্রার দল করিয়া ঠাকুরদাস দত্তের শরণাপন্ন হন। ঠাকুরদাস তাঁহাকে নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন ও শ্রীমন্তের মশান নামক তিনটি পালা রচনা করিয়া দেন। দুর্গাচরণ এই তিনটি যাত্রার পালা গাহিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তখন সহরে এমন বড়মানুষের বাড়ী ছিল না, যেথানে দুগো ঘড়েলের যাত্রা হইত না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাড়ী এই দলের একচেটিয়া ছিল। দুর্গাচরণ শেষ পর্য্যন্ত এই তিনটি পালাই গাহিয়াছিলেন, আর কাহারও পালা গাহেন নাই, গাহিতেও হয় নাই। এই তিনটি পালার গানগুলি এত সুললিত ও মর্ম্মস্পর্শী যে, স্ত্রীলোকেও কণ্ঠস্থ করিয়া লইত। ইহাদের সুর-তাল এত সুন্দর যে, আজিও ইহাদের সমকক্ষ যাত্রার গান হয় নাই বলিয়াই অনেক প্রাচীনের মত।

এই দুগো ঘড়েলের দলে লোকনাথ রজক (লোকা ধোপা) ও কালীনাথ হালদার নামক দুই জন 'ছোক্‌রা' ছিল। কালে ইহারাও গীতবিদ্যায় পটুতা লাভ করিয়া স্বতন্ত্র যাত্রার দল গঠিত করে; এবং লোকনাথ ঠাকুরদাসের ঐ তিনটি পালাই গাহিতে আরম্ভ করে। যত দিন তাহার দল ছিল, লোকনাথ তত দিন তাহার গুরুর ন্যায় ঐ তিনটি পালা ব্যতীত আর কোনও পালা, বা আর কাহারও পালা গাহে নাই। লোকনাথ এই তিন পালা গাহিয়া গুরুর ন্যায় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। এখন আর তাহার যাত্রার দল নাই। লোকনাথ কবির নাম শুনিলেই উদ্দেশে প্রণাম করিত। লোকনাথ বলিত, "দত্ত মহাশয়ের গানের কথা কি বলিব? যে সে গান শুনিয়াছে, বা গাহিয়াছে, সে আর কাহারও গান শুনিতে বা গাহিতে চাহিবে না। আমায় কে চিনিত? গুরুর দলে (দুগো ঘড়েলের দলে) যখন ছিলাম, তখন এই গানের প্রসাদেই আমার নাম হয়। আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তাহাও দত্ত মহাশয়ের প্রসাদে।" এই দুই যাত্রার দল হইতে কবির অনেকগুলি গান মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

কবির সঙ্গীতশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে এই লোকনাথ ও পাঁচালী-লেখক রসিকচন্দ্র রায় ঘটিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। রসিক বাবু একবার লোকনাথের সহিত দেখা করিয়া বলেন, "লোকনাথ! সেই দুর্গাচরণের

আমোল হইতে তুমি দত্ত মহাশয়ের ঐ তিনটি পালাই গাহিতেছ; কিন্তু উহাতে আর রস আছে কি? অনেকেই উহা শুনিয়াছে। আমার ইচ্ছা, তুমি আমার একটা পালা গান কর।" লোকনাথ শুনিয়া বলে, "রায় মহাশয়! যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা যথার্থ; পালা তিনটি বড় পুরাতন হইয়াছে; কিন্তু সুরগুলার জন্য ছাড়িতে মায়া হয়। আপনি যদি এই সকল সুর বজায় রাখিয়া আমায় গান বাঁধিয়া দেন, তাহা হইলে আপনার পালা গাহিতে পারি।" এই বলিয়া লোকনাথ ঠাকুরদাসের একটি গান রসিক বাবুকে শুনাইয়া দিল। শুনা যায়, রসিক বাবু অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়াও সেই সুর খাপাইয়া কোনও গীত রচনা করিতে পারেন নাই। তখন লোকনাথ বলে, "রায় মহাশয় মাপ করিবেন! এই সুরগুলার জন্যই পালাগুলি গাই; আর লোকেও এই সুরের জন্যই শুনে; নতুবা বক্তৃতাগুলা * তাঁহারও মন্দ নহে, বা আপনার আরও ভাল হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে বড় আসিয়া যায় না।+

ভগো ঘড়েলে ও লোকনাথ কবির যে তিনটি পালা গাহিত, তাহার দু' একটি গানের নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। নলদময়ন্তী হইতে :—

দময়ন্তীর সর্প দর্শনে উক্তি :—

বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গে দংশন করেছে এ অঙ্গে।
আবার তুমি দংশন করবে তায়,—
হবে বিষে বিষক্ষয়, যদি হে আমার প্রাণ যায়,
ভাবি নাক তায়,—
খেদ এই দেখা হবে নাক পতির সঙ্গে॥
বিচ্ছেদ-বিষে প্রাণ দেহে নাহি রবে,
তুমি দংশন কর তাতেও প্রাণ যাবে,
নারী-বধের ভাগী তোমায় হ'তে হবে,
আমি ত ভেসেছি অকূল তরঙ্গে॥

* যাত্রার কথোপকথনগুলিকে সাধারণতঃ 'বক্তৃতা' বলে, এবং পাঁচালীতে, কোনও গীত গাহিবার পূর্ব্বে যে রসভাষে ভূমিকা করা হয়, তাহাকে 'ঘটকালী' বলে।

+ কবির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামাচরণ বাবু এই ঘটনাটি বলিয়াছেন।

২। শ্রীমন্তের মশান হইতে :—

"যার মায়ের বাস রে মশানে।
পিতা মৃত্যুঞ্জয়, কালের তনয়,
সে কি করে ভয় রাজা শালবানে ॥
ওরে ভয় করি কিরে দেখে তোদের মুখ,
আমার মায়ের পদে পড়ে পঞ্চমুখ,
শ্রুতিপর হয়ে আছে চতুর্ম্মুখ,
কাল অধোমুখ যে নাম স্মরণে।
ওরে মা ধরে ভালে অর্দ্ধশশী,
রণ মাঝে দাঁড়ায় হয়ে এলোকেশী,
তার তনয় ডরায় দেখে তোদের অসি,
ওরে গয়া গঙ্গা কাশী আমার মায়ের চরণে ॥

৩। ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদলবাসিনী।
লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশিবদনী ॥
এই যে দেখি কালীদয়, সকলি ত জলময়,
কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয় ;—
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, জ্ঞান হয় হর-ঘরণী ॥

৩। শ্রীমন্তের মশান হইতে ঃ—

বিভাস—আড়াঠেকা।

তোর রাজার কি রাজ্য, করিস্ তার কি মাৎসর্য্য,
আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য, তাকি জান না।
চরণে দিলে বল, ধরা যায় রসাতল,
মহা প্রলয় হয়, কেহ বাঁচে না ॥
জান না রাজ্যখণ্ড শুনরে * * পাষণ্ড
ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে ;—
বিধি যাঁর আজ্ঞাকারী, কুবের হন যাঁর ভাণ্ডারী,
ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা ॥

৪। কলঙ্কভঞ্জন হইতেঃ—

বিভাস—আড়াঠেকা।

যা জান তাই কোরো নাথ, আমি ত চলিলাম জলে।
বড় লজ্জা পাবে হরি! দাসী তোমার লজ্জা পেলে॥
চল্‌লেম লয়ে ছিদ্র-ঘটে, যদি কোন ছিদ্র ঘটে,
গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে, ত্যজিব প্রাণ কৃষ্ণ বলে॥
একে, বুদ্ধি শূন্য ঘটে, অঘটন ঘটনা ঘটে,
যদি পড়েছি সঙ্কটে, রেখ হে সে সময়,—
কমলিনীর হৃদ্‌কমলে, দাঁড়াও একবার বামে হেলে,
দেখে যাই যমুনার জলে, দেখি কি ঘটে কপালে॥

২। দুর্গা ঘড়েলের ছাত্র কালী হালদার যে দল করেন, তাহাতে ঠাকুরদাস একখানি "বিদ্যাসুন্দর" ও একখানি "রাবণবধ" রচনা করিয়া দেন। পূর্ব্বকথিত তিনখানি বিদ্যাসুন্দর হইতে ইহার রচনা পৃথক্। "রাবণবধ" গাহিয়া কালীবাবু বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। এই দলও পেশাদারী ছিল।

৩। তৎপরে খষড়ানিবাসী ৺ কৈলাসচন্দ্র বারুই (কৈলেস বারুই) এক পেশাদারী দল করে। এই দলেরও যশ মন্দ ছিল না। কবি ঠাকুরদাস এই দলের জন্যও আবার একখানি স্বতন্ত্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া দেন। *

৪। এই সময় হাবড়ার অন্তর্গত কোণার জমীদার ৺ দীননাথ চৌধুরীর যত্নে এক সখের যাত্রার দল গঠিত হয়। ঠাকুরদাসই নিমন্ত্রিত হইয়া এই দলের জন্য "হরিশ্চন্দ্র" রচনা করেন। এই পালায় ৩১ খানি গান ছিল। গানগুলি সমস্তই সংগৃহীত হইয়াছে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ দুই চারিটি উদ্ধৃত হইল।

(১) রাগিণী জঙ্গলা ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

করি মিনতি হে ভূপতি! শুন দাসীর কথা।
আমায় বাঁধা দিয়ে তুমি ঘুচাও মনের ব্যথা॥

---

* এই বিদ্যাসুন্দর রচনায় কবির অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় এক জন কবি পাঁচখানি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কোনওখানির সহিত কোনখানির এক পংক্তিরও মিল নাই; ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় নহে।

প্রকাশে বলা নয় অধিকার, আমাকে বিক্রয় অধিকার
বিধিমতে আছে তোমার, তাতে কি ক্ষুণ্ণতা,
সকল ধর্ম্ম রক্ষা হবে, অন্য চিন্তা বৃথা ॥
দাসীকে বন্ধন রেখে, মুক্ত তুমি হও নরকে,
ঘুষিবে সুখ্যাতি লোকে, শুন দাসীর কথা নয় অন্যথা ॥
পতির দায়ে সতীর দায় ; কথা নয় অন্যথা ॥

(২) রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।
কি হল কি হল নাথ ! কোথায় রেখে কোথায় যাবে।
তোমার বিচ্ছেদ খেদে দেহেতে কি প্রাণ রবে ॥
লজ্জা বাস দিয়ে শিরে, আনিয়াছিলে আমারে,
সে লজ্জা আজ বিলাইয়ে, পতি ছাড়া কি সম্ভবে ॥
সদা আঁখিতে রাখিতে, হবে ভার পাওয়া দেখিতে
কি দিবা কি রজনীতে পরসেবায় দিন যাবে ॥

৫। কলিকাতার আধুনিক পেশাদার যাত্রাওয়ালাদিগের মধ্যে ফুলেশ্বর-নিবাসী ৺ আশুতোষ চক্রবর্ত্তীর যাত্রা অনেকেই শুনিয়াছেন। এই আশুবাবু সর্ব্বপ্রথম এক সখের দল করেন। যত দিন আশুবাবু এই দল চালাইয়া সর্ব্বস্বান্ত না হইয়াছিলেন, তত দিন এই দল অবৈতনিক ভাবেই চলিত। এই অবৈতনিক দলে ঠাকুরদাসবাবুর রচনাই গীত হইত। তিনি প্রথমে ইঁহাকে একটি পালা রচনা করিয়া দেন। তাহার নাম পাওয়া যায় নাই। পরে "লক্ষ্মণ বর্জ্জন" রচনা করিয়াছেন। আশুবাবু পেশাদার হইয়াও কিছু দিন "লক্ষ্মণ-বর্জ্জন" গাহিয়াছিলেন।

৬। ইহার পর সাধু ও বোকা নামে দুই ভ্রাতা প্রথমে একত্র এক যাত্রার দল করে। পরে দল ভাঙ্গিয়া দুই দল হয়। ইহারা মুসলমান, কিন্তু দলে হিন্দুর পৌরাণিক বিষয়ই গাওয়া হইত। সাধুর দলে কবি ঠাকুরদাসের রচিত "লবকুশের পালা" গীত হইত।

৭। তাহার পর হাবড়ার অন্তর্গত মাকড়দহ গ্রামের ৺ বেণীমাধব পাত্র এক পেশাদারী দল করেন। এই দলে ঠাকুরদাস "অক্রূর-সংবাদ" ও "দুর্গা-মঙ্গল" নামক দুইটি পালা রচনা করিয়া দেন।

৮। তৎপরে কোঁণানিবাসী ৺ গোপীনাথ দাস এক পেশাদারী দল করিয়া "শ্রীরামের দেশাগমন" নামক একটি পালা কবি ঠাকুরদাসের নিকট

হইতে গ্রহণ করেন। ইহার গীতগুলি অতি মিষ্ট হইয়াছিল। কবি নিজেও ইহার অনুরক্ত ছিলেন। এমন কি, শেষে এই পালার অনুকরণে নিজের পাঁচালীর দলেও একটি সাট প্রস্তুত করেন, তবে তাহার গান

৯। ইহার পর বাগবাজার-নিবাসী শ্রীঝড়ুদাস অধিকারীকে কবি ঠাকুরদাস "রাবণ-বধ" ও "অক্রূর-সংবাদ" নামক দুইটি পালা-লিখিয়া দেন। বলা বাহুল্য, ৺ কালী হালদারের দলের "রাবণবধ" ও ৺ বেণীমাধব পাত্রের দলের "অক্রূর-সংবাদ" হইতে এই দুইখানি সাট সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

১০। তৎপরে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাবড়া শিবপুরে উমাচরণ বসু মহাশয় এক সখের দল গঠন করেন। কবি ঠাকুরদাস এই দলের জন্য "শ্রীবৎস-চিন্তা" রচনা করেন। শ্রোতৃবর্গ বহু আদরে ইহার গান শুনিতেন।

এই সকল যাত্রার সাট-রচনার যে পৌর্ব্বাপর্য্য আমরা স্থির করিয়া দিলাম, তাহা অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ, কাহারই রচনা-কাল পাইবার উপায় নাই। তবে ৺ কালী হালদারের যাত্রার দলের রচনা পর্য্যন্ত যাহা স্থির করা গিয়াছে, তাহা ঠিক; এবং শেষোক্ত "শ্রীবৎস-চিন্তা"র রচনা-কালও ঠিক। কবি নিজের পাঁচালীর দল চালাইতেন, এবং মধ্যে মধ্যে এই সকল রচনা করিয়া দিতেন; কাজেই ইহার কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

কবির আরও দুইটি কীর্ত্তি আছে। এক সময়ে হাবড়ার অন্তর্গত বাক্‌সাড়া গ্রামে এক সখের কবির দল ও চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডিহি-পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে সীঁথিতে এক সখের পাঁচালীর দল হয়। কবি ঠাকুর-দাস এই দুই দলেই গান বাঁধিয়া দিতেন।

কবি ঠাকুরদাসের এই সকল রচনায় বেশ আয় ছিল। প্রাচীন সখের দল-গুলির পালা লিখিয়া তিনি বড় কিছু পান নাই; কিন্তু পেশাদার দলগুলির জন্য যে সকল পালা লিখিয়া দিয়াছিলেন, সে জন্য পারিশ্রমিক পাইতেন; এতদ্ভিন্ন যাত্রা গাহিয়া আসিয়া যাত্রার অধিকারীরা প্রশংসা-প্রফুল্লিত হৃদয়ে কবিকে নানাবিধ ভেট পাঠাইয়া দিতেন। তাঁহার নিজের পাঁচালীর দল হইতেও বেশ অর্থাগম হইত। কবির রচিত এই যাত্রার পালাগুলিকে সখের ও পেশাদারী ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

সখের দলের রচনা।

১। নিজ দলের
বিদ্যাসুন্দর
ও অন্য ২।৩ খানি।

২। গঙ্গার বিদ্যাসুন্দর।

৩। টাকীর বিদ্যাসুন্দর।

৪। কোণার হরিশ্চন্দ্র।

৫। আশু চক্রবর্ত্তীর দলের
প্রথম একখানি, পরে
লক্ষ্মণ-বর্জ্জন।

৬। শিবপুরের শ্রীবৎস-চিন্তা।

৭। বাক্‌সাড়ার কবিরদলের
গীতাবলী।

৮। সাঁথির পাঁচালীর দলের
গীতাবলী।

পেশাদারী দলের রচনা।

১। দুর্গা ঘড়িয়ালের
(ক) নলদময়ন্তী।
(খ) কলঙ্কভঞ্জন।
(গ) শ্রীমন্তের মশান।

২। কালী হালদারের
(ক) রাবণ-বধ।
(খ) বিদ্যাসুন্দর।

৩। কৈলাস বারুয়ের
বিদ্যাসুন্দর।

৪। সাধুর দলে
লব-কুশ।

৫। বেণী পাত্রের
(ক) অক্রূর-সংবাদ।
(খ) দুর্গা-মঙ্গল।

৬। গোপীনাথ দাসের
শ্রীরামচন্দ্রের দেশাগমন।

৭। ঝড়ুদাসের
(ক) রাবণ-বধ।
(খ) অক্রূর-সংবাদ। *

ইহার পর কবির বিশেষ কীর্ত্তি পাঁচালীর দলের বিবরণ দিয়া আমরা প্রবন্ধ শেষ করিব। কবি প্রথমে সখের পাঁচালীর দল করেন। এই দলই শেষে পেশাদার হয়। ইহার জন্য কবি ক্রমশঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি সাট প্রস্তুত করেন। ১। শ্রীচণ্ডী; ২। শিব-বিবাহ; ৩। রাবণ-বধ হইতে রামের দেশাগমন পর্য্যন্ত; ৪। পারিজাত-হরণ; ৫। অক্রূর-সংবাদ;† ৬। দান-লীলা; ৮। মাথুর-লীলা; ৯। ধ্রুব-চরিত্র; ১০। প্রেম

---

* এই দুই তালিকায় পৌর্ব্বাপর্য্য ঠিক আছে, কিন্তু উভয়ে মিলাইয়া পৌর্ব্বাপর্য্য স্থির করা দুঃসাধ্য।

† এই কয় পালার গীত যাত্রার পালার গীতগুলি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তবে এই দল নিজের বলিয়া ঐ সকল যাত্রার পালার এক একটী গান, যাহা তাঁহার নিজের ভাল লাগিত, তাহা এই কয়টি সাটের মধ্যে বসাইয়া দিয়াছিলেন।

ও বিরহ। এই দলের গাওনার মহা সুখ্যাতি হইয়াছিল। অনেক স্থলে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সহিত গাহিতে গিয়া, ইঁহার দলই আসর-জয়ী হইয়া আসিয়াছিলেন। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র বলেন, কোনও আসরেই এই দলের হার হয় নাই। কবির জীবদ্দশায় ত হয়ই নাই, কবির মৃত্যুর পরেও হয় নাই।

এই স্থানে কবির পাঁচালীর গীত রচনার নমুনা দিবার পূর্ব্বে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। বহুদিন পূর্ব্বে "বঙ্গবাসী" পত্রে "আগমনী" শীর্ষক প্রবন্ধে ৺দাশরথি রায়ের পাঁচালী হইতে ঐ দুই পালার আলোচনা করা হয়। প্রথম প্রবন্ধলেখক এক স্থলে লিখিয়াছিলেন, দাশরথি হইতেই পাঁচালীর উৎপত্তি ও শেষ। উক্ত প্রবন্ধ-লেখক এ তথ্য কোথা পাইলেন, জানি না। বোধ হয়, যদি রায় মহাশয় জীবিত থাকিয়া এইরূপে কাহাকেও তোষামোদ করিতে শুনিতেন, তাহা হইলে তিনিও সঙ্কুচিত ও ক্রুদ্ধ হইতেন। লেখকের কৃত্তিবাসী রামায়ণখানাও কি পড়িবার অবসর ছিল না? তাহা পড়িলে, তিনি প্রতিপদে দেখিতেন যে, প্রায় প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে "পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কবি কৃত্তিবাস" বলিয়া ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। পাঁচালী, কবি, হাফ্ আথ্ড়াই, যাত্রা প্রভৃতি বাঙ্গালার যত প্রকার মজ্‌লিসী সঙ্গীতামোদ আছে, তাহার মধ্যে পাঁচালীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অন্ততঃ কবি কৃত্তিবাসের সময় অপেক্ষাও যে প্রাচীন, তাহার সাক্ষ্য স্বয়ং কৃত্তিবাসই দিয়া গিয়াছেন। যদি গীতময় পাঁচালীর কথা ধরা যায়, তবে কবিকঙ্কণের গ্রন্থেও ধূয়া নামক গীতাংশ দেখা যায়। তাহার পর প্রবন্ধ-লেখক যে দাশরথি রায়কে পাঁচালীর আদিকর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সেই দাশরথি রায়ই এই কবির সহিত পরিচিত ছিলেন, ইঁহাকে 'দাদামহাশয়' বলিয়া ডাকিতেন, এবং এক আসরে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে নামিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছিলেন যে, আমি গানে ভক্তিরস ফুটাইতে পারি, কিন্তু দাদামহাশয়ের (অর্থাৎ ঠাকুর-দাসের) ক্ষমতা সকল রসেই সমান; তাঁহার প্রেমবিষয়ক গানগুলি অতুলনীয়।

☞ এই স্থলে কবির নিজ পাঁচালীর দলের কয়েকটি গান উদ্ধৃত হইল।

১। আগমনী হইতে :—

গিরি, কারে আনিলে।
এনে কার তনয়া প্রবোধিলে॥

অপরূপ রূপ এ যে দশভুজা,
কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান, এমন ভুলিলে ॥
নারায়নী বাণী দু পাশে দাঁড়ায়,
দশভুজে পাশ শোভা পায়,
বলে গেলে হে গিরি যা'
আনিগে গিরিজা,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায়,—
শশী ভানু আসি উদয় পদে পদে,
উভয় পদে উভয়ে আছে অবিবাদে,
দাসের আশায় আশা হয় সায় ও পায় পাইলে ॥

২। চণ্ডী হইতে ঃ—

দীনের কবে দুখ নাশিবে শিবে, গেল দিন।
গেল দিন, দীনে দে মা দিন, ডাকি প্রতিদিন,
দীনের প্রতি দিন দিতে দীনময়ী,
তুমি হয়ো না মা দীন ;
দিনে দিনে দিন গত, দিনমণির সুতাগত,
আশু সুখে দীন কত রত হয়ে ফুরায় দিন ॥
দিবে না দিন দেখতে (তাই) ডাকি তারা! দিন থাকৃতে,
শেষের দিন এলে ভুক্তে এ দাস না হয় পরাধীন ॥

৩। চণ্ডী হইতে ঃ—

কত দুখ দিবা, অবশান দিবা,
নিকট হ'ল আসি যামিনী।
হলে ঘোর অন্ধকার, তখন অন্ধকার
পায়ে ধরে তরে তারিণী।
শুনি তব পায় মুক্তির উপায়,
কৃপায় রাখ পায় ; দীন দিন পায়
ডাকি তাই তোমায়,—
যদি ভাব শিবের ধন, ও রাঙ্গা চরণ,
সুতে দিতে আছে ঈশানী।

পিতার ধনে কার আছে অধিকার
বল অধিক আর ; সহজে আমার,—
আমি কি তনয় নয়,—
যে জন কালী কালের সুত,
তারে লয় কালের দুত, অদ্ভুত জননী ॥

এই দুইটি গীত 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' সাটের গান হইলেও, কবির দুইবার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সময় রচিত হইয়াছিল। শেষ গীতটি তাঁহার চরমকালের গীত ও শেষ রচনা। গান দুটিতে সেকালের কবিজনপ্রিয় বাক্‌কৌশল ও ভক্তিভাবের বেশ সামঞ্জস্য আছে। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র এই দুইটি সাটের অন্তর্গত করিয়া দিয়াছিলেন।

৪। দান-লীলা হইতে :—

বিভাস—শ্লথ ত্রিতালী।

চিন্তে তোমায় পারা ভার।
কে চিন্তে পারিবে তোমায় তুমি হে চিন্তার পার ॥
তব মায়া সিন্ধু, তাহে বিন্দু এ বপু আমার,
তরঙ্গে ফেলে ত্রিভঙ্গ! রঙ্গ দেখ অনিবার,—
নারী কি চিনিব, অর্দ্ধনারী* মানে পরিহার ॥
ওহে চক্রী! তব চক্র, বুঝে সাধ্য আছে কার,
বিজ্ঞর বিলোম বাধ্য হয়েছে বপুতে যার,
পারে কি না পারে তারা এ অপারে হতে পার ॥

৫। ঐ পালা হইতে :—

কালরূপ দেখে ভয় করে।
ওহে কর্ণধার, কেমন করে পার হবে গোপিনীরে ॥
একে তুমি নব-নীরদ-বরণ,
ভ্রমে যদি বাদী হয় হে পবন,
ভগ্ন তরী মগ্ন হইলে তখন বাঁচিব কি করে ॥
স্বয়ং সিদ্ধ নহ, তাতেই মনে বাধে,
অন্ধস্কন্ধে গতি শাস্ত্রেতে নিষেধে,

* অর্দ্ধনারী—অর্দ্ধনারীশ্বর—হরগৌরী-মূর্ত্তি=শিব।

তোমার দোষে আমরা পড়িলে বিপদে
ডাকি তখন বল কারে ॥
দুকূল হলেও বরং ত্যজেও পেতাম কূল,
কাল অঙ্গ তোমার, তাতেই হে আকুল,
তোমা প্রতি পবন হলে প্রতিকূল
মজে দুখিনীরে ॥

কৃষ্ণের নীরদবরণ দেখিয়া যদি নব মেঘ ভাবিয়া পবন প্রবল হইয়া উঠে, তাই গোপীদিগের আশঙ্কা হইয়াছে। তাঁহারা কৃষ্ণকে নিজ নীলবরণ দুকূলের (বস্ত্রের) উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন, এগুলা খুলিয়া ফেলিয়াও না হয় কূল পাইতে পারি, কিন্তু তোমার বর্ণের দায়ে বোধ হয় মারা যাইতে হইবে।

৭। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা ঃ—

একরূপ প্রেমধন নয়।
বহুরূপী বহুজন যে যা বেছে লয়।
পুরুষপ্রকৃতি প্রেম শশীর সম উদয়,
যৌবন পূর্ণিমা পরে ক্ষয় কলা লোকে কয় ॥
কুসুম ফুটিলে যেমন বাসি হলে বাস ক্ষয়,
নিশীথে সৌরভ যত, প্রভাতেতে তত নয় ॥
জোয়ার ভাঁটার বারি, কোন্‌খানে স্থিতি রয়,
(ও লো) ঠিকে প্রেমের মুখে আগুন, কিছু সুখ, দুখময় ॥
আর এক প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়,
সুখত্যেজে শুকদেব গৃহবাসী কভু নয়,
ধ্রুব ধ্রুব জ্ঞানে এক প্রেমে হয়ে মত্ত
চরমেরি ধন পেলে পরম পদার্থ;
সেরূপ প্রেমেতে মন মজে যার যথার্থ,
আপত্তি কি তার ঘটে, ত্রিলোকে সুখ্যাতি রয় ॥

কবির গীত-সংগ্রহ ভালরূপ নাই। গায়কদিগের মুখে শুনিয়া যে কয়টা পারা গেল, বাছিয়া নমুনা দেওয়া গেল। যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা অপেক্ষাও ভাল ভাল গান যে কবি লিখিয়াছিলেন, তাহার সাক্ষ্য এই উদ্ধৃত গানগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্রের গীত-সংখ্যা ৩১টী। যদি

ইঁহার সকল যাত্রার পালাতেই যদি ৩১টি করিয়া গান ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল যাত্রার পালাতেই কবির গীত-সংখ্যা প্রায় ৫৫০ শত হয়। এতদ্ভিন্ন কবির রচিত পাঁচালীর গীত-সংখ্যাও আনুমানিক আর দুই তিন শত ধরা যাইতে পারে।

সে কালের বড়মানুষ ও প্রায় প্রত্যেক গণ্য মান্য লোকের বাড়ীতেই কবির পাঁচালীর গাওনা হইত। তবে সাতক্ষীরার ৺প্রাণনাথ চৌধুরী, উলার ৺শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীগণ, গজার জমীদার ভট্টাচার্য্য-গণ, মূলঞ্চগ্রামের ৺গৌরীপ্রসাদ মৈত্র, তেলিনীপাড়ার বন্দোপাধ্যায়গণ (ইঁহারা কবির বাসগ্রামের জমীদার, পাইকপাড়ায় রাজা বৈদ্যনাথ রায়, রাজা ৺ কান্তিচন্দ্র সিংহ, কলিকাতা সিমলার ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ, চোরবাগানে রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক প্রভৃতির বাড়ীতে ইঁহার বিশেষ আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। ৺ কাশীপ্রসাদ ঘোষ ও রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক ইঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। রাজেন্দ্র মল্লিক মজলিসে কবিদিগের মধ্যে ইঁহাকেই উচ্চাসন দিতেন। পণ্ডিতসমাজেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; ভাটপাড়া ও নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁহাকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। ঠাকুরদাস সালিখানিবাসী নবদ্বীপের পণ্ডিত গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি ও ব্যাঁটরা নিবাসী ৺ শম্ভুচরণ ন্যায়রত্ন (The New Indian Schoolর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা) অতিশয় প্রিয় ছিলেন। একবার বেলেগেছিয়া-ষষ্ঠীতলায় কবি ঠাকুরদাসের পাঁচালী হইতেছিল। বিখ্যাত ৺ সন্ন্যাসী চক্রবর্ত্তী বাজাইতেছিলেন; গাওনা খুব জমিয়াছে। গঙ্গানারায়ণ গান শুনিতে শুনিতে এতটা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া আসরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া গিয়া নিজ হস্তে নিজের পায়ের ধূলা কবির মাথায় দিয়া দরবিগলিতধারনয়নে কবিকে আলিঙ্গন করেন। কবির খ্যাতিও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাঁশবেড়িয়া, হালিসহর, টাকী, সাতক্ষীরা ত্রিবেণী প্রভৃতি স্থানে তাঁহার নাম করিলে লোক মাতিয়া উঠিত। কবির উপর সাধারণের প্রীতিও এত অধিক ছিল যে, কবির নামে সামান্য লোকেও নিজের ক্ষতি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। কবির দলের নন্দ দাস নামক এক ব্যক্তি, গাওনার পূর্ব্বে দলের লোকদিগকে খবর দিয়া ডাকিয়া আনিত। একবার সে কাহাকে ডাকিয়া

হরিপাল হইতে ফিরিবার সময় নিঃসম্বলে তারকেশ্বরে উপস্থিত হয়। তৎপরে সেখান হইতে কোনও গতিকে বৈদ্যবাটীতে আসিয়া খাদ্যাভাবে ক্লান্ত হইয়া এক ময়রার দোকানে গিয়া বসে। ময়রা নন্দকে দেখিয়াই বলে, "কি গো! তোমরা ভাল আছ ত? কোথায় গিয়াছিলে? গাওনা কোথা হ'ল? আমরা খবর পেলেম না। দল কোথা?" নন্দ অবশ্য তাহাকে চিনিত না। কিন্তু নন্দ তাহাকে অতটা আত্মীয়তা করিতে দেখিয়া তাহাকে নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিলে সে বলিল, "দত্ত মহাশয়ের দলের লোক তুমি, তোমার জন্য আমাদের ভাবনা কি? তুমি আহারাদি কর, তাহার পর খরচপত্র লইয়া কলিকাতায় যাইও।" পরে তাহাই হইল।

কবির উপস্থিত রচনার ক্ষমতাও ছিল। একাবর বনওয়ারীলাল রায় নামে জনৈক গীতরচক কবি তাঁহাকে আসিয়া বলে, "মহাশয় 'অর্দ্ধ ফোটা পদ্ম-ফুল' এই কয়েকটি কথা কোনও একটি গানে প্রয়োগ করিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে, কিন্তু কোন স্থানে কোন ভাবের গানে দিলে ঠিক খাপিয়া যাইবে, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যদি আপনি একটি গীতে ঐ কথা কয়টি ব্যবহার করেন, তবে আমি তৃপ্ত হই।" কবি তখন ধ্রুব-চরিত্রের গান বাঁধিতেছিলেন। ধ্রুবের বন-গমনের পর সুনীতির বিলাপসূচক একটি গানের রচনায় তখন তিনি ব্যস্ত ছিলেন। বনওয়ারীর কথা শুনিয়াই তিনি হাতের সেই অর্দ্ধরচিত গানেই ঐ কথা কয়টি সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন। গানটির শেষ দুই চরণ এইরূপ—"অর্দ্ধ ফোটা পদ্মফুলে বিম্ব ওষ্ঠাধর। থেকে থেকে বলে কোথা ধ্রুব বংশধর॥" "অর্দ্ধফোটা পদ্মফুলে" অর্থে কবি এখানে সন্ধ্যা-কালের অর্দ্ধমুদিত পদ্মের সহিত সুনীতির চিরলাবণ্যময় মুখের বিষাদ-ছায়া-ঙ্কিত ভাবের তুলনা করিয়াছেন।

কবির রচনা শক্তিও অতি দ্রুত ছিল। একবার হাবড়া মনসাডিঙ্গীর যাত্রার দলের জন্য কবির নিকট যাত্রার পালা বাঁধিয়া লইতে আসিয়াছিল। কবি সেই লোকের সহিত যাইতে যাইতে পথে মুখে মুখে একটি পালার অধিকাংশ গান রচনা করেন। মনসাডিঙ্গী ব্যাটরা হইতে দুই ক্রোশ দূর মাত্র। অর্থের ব্যবস্থা ভাল না হওয়ায় এ পালা শেষ হয় নাই।

কবির নিজের দোষ অপরে সংশোধন করিলে চটিতেন না। কবির প্রেমবিষয়ক গীতগুলি পাঁচালীর দলে গায়কেরা আসরে বিরহ বলিয়া চালাইয়া দিত। কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র তখন অল্পবয়স্ক হইলেও গায়ক দলের

প্রধানকে বলিয়াছিলেন যে, "বাবার এ গানগুলি বিরহের নহে, আর যদি বিরহের বলা হয়, তবে ভুল বলা হয়।" এই বলিয়া তিনি প্রেমের কয়েকটি অবস্থার বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রধান গায়ক গিয়া কবিকে সেই কথা বলেন। ঠাকুরদাস পুত্রের বিচারের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া বলেন, "শ্যাম ঠিক বলেছে, আমি কাল তোমাদের খাঁটী বিরহ বেঁধে দিব।" খাঁটী বিরহের গান ঠাকুরদাসের অতি অল্প আছে।

সে বৎসর ছোট লাট মেকেঞ্জী যখন রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীতে আসেন, তখন রাজা তাঁহাকে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতামোদ শুনাইবার জন্য বিপুল আয়োজন করেন। তন্মধ্যে কবি, পাঁচালী, হাফ্ আখড়াই, যাত্রা, সবই ছিল। পাঁচালীর জন্য কবি ঠাকুরদাসের দলেরই নিমন্ত্রণ হয়। কয়েক জন ভাল গায়ক উপস্থিত থাকিয়া বঙ্গেশ্বরকে পাঁচালী শুনাইয়াছিলেন।

এক দিন বাগবাজারে এই দলের গাওনা হইতেছিল। জনৈক প্রাচীন পথিক যাইতে যাইতে ঐ গান শুনিয়া আসরের দ্বারে আসিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠেন, "ওরে ঠাকুরদাস দত্ত মরেছে কে বলে? এই যে বেঁচে আছে দেখিতেছি। তোরাই তাকে চিরজীবী করে রেখেছিস্।" কবির পুত্র পৌত্রেরা সেখানে ছিলেন, তাঁহারা ইঁহাকে মহা আদর অভ্যর্থনা করিয়া গান শুনাইতে বসাইলেন। কবির প্রতি প্রাচীনদিগের প্রগাঢ় প্রীতি দেখা যায়। অনেক ভিখারী ইঁহার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।

এই কবির সম্বন্ধে যতটা জানা গিয়াছে, তাহা সংগৃহীত হইল। এক্ষণে ইঁহার গীতরাশি ও যাত্রার পালা কয়টি সংগৃহীত হইলে, বাঙ্গালা ভাষার তদানীন্তন সাহিত্যের অবস্থা-অনুসন্ধানে অনেকটা সাহায্য হইতে পারে।

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী।

মহাপ্রস্থান।

(১৩১৫)

ব্রত শেষ আজি তব এ মর্ত্ত্য মন্দিরে,
হে রুদ্র, হে দিব্যদ্যুতি—হে কর্ম্ম-করাল!
পূজেছ শক্তির পদ বলির রুধিরে
ছিন্ন করি' মরণের মহা ইন্দ্রজাল!
ভেঙ্গেছ মুগ্ধের মোহ,—সর্ব্ব প্রাণ মনে
দিয়াছ অমৃত তেজঃ অভয় মঙ্গল!
শিখায়েছ ত্যাগ-ধর্ম্ম মন্ত্র-উদ্দীপনে,
আহুতির দীপ্তালোকে পূর্ণ যজ্ঞস্থল!
তাই এ বিদায়ক্ষণে পরম গৌরবে
দাঁড়ায়েছ যজ্ঞাগারে জয়-শঙ্খ হাতে,
আমোদিত দশ দিশি, হবির সৌরভে,
কোটী কণ্ঠ প্রকম্পিত তব জয়নাদে!
তোল শঙ্খে শেষ মন্ত্র—এ ব্রহ্মাণ্ডময়,
প্রণাম, বিদায় দেব! জয়, তব জয়!

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ